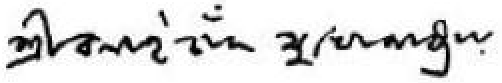


বনফুল

রচনাবলী ০৯

বনফুল রচনাবলী

নবম খণ্ড



গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা ঃ
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
সহযোগী ঃ
শ্রীশুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ-রূপায়ণ ঃ
শ্রীশৈলেন শীল
শ্রীসমরেশ বসু

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

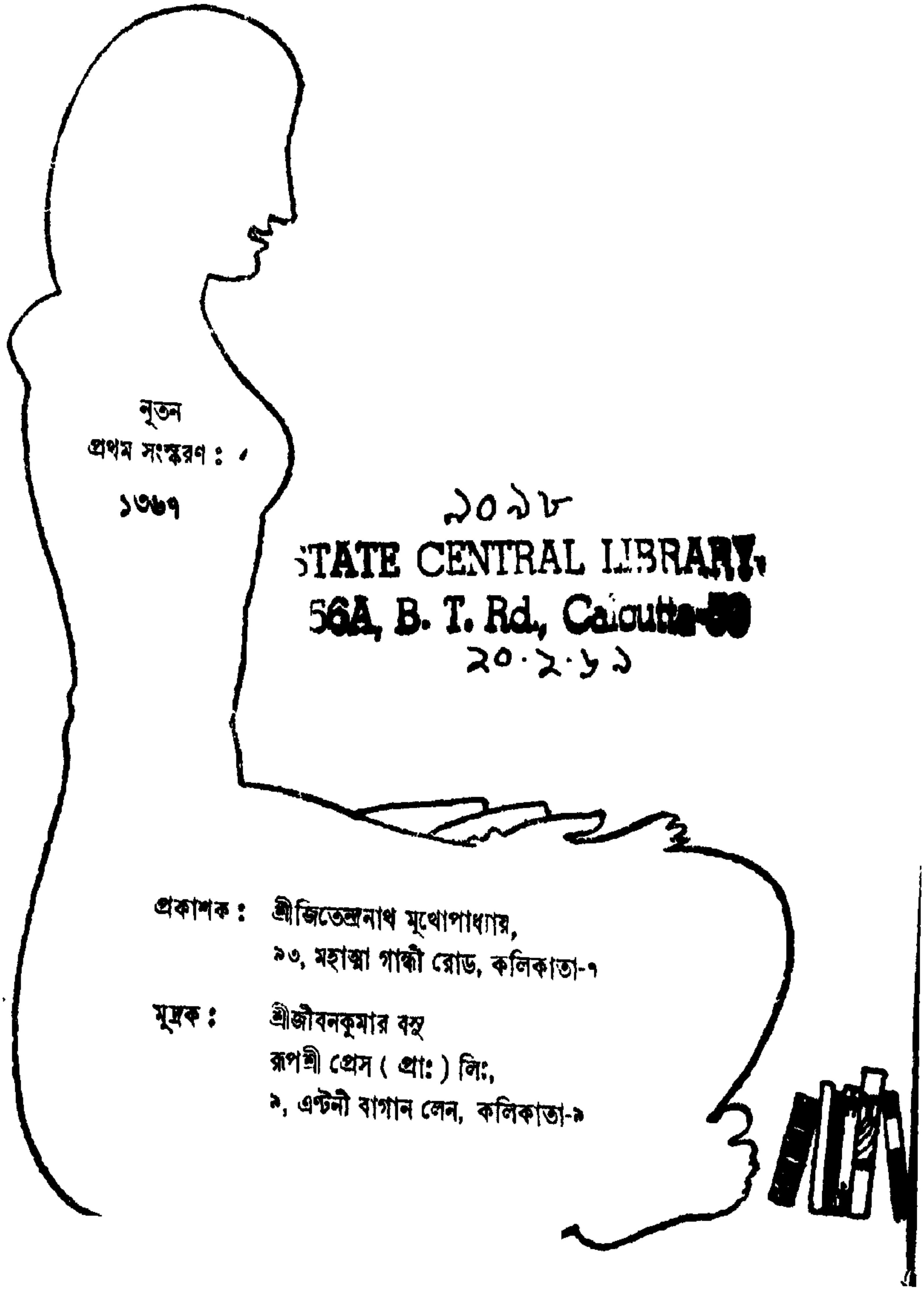
সূচীপত্র

নবদিগন্ত

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(বনফুল)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭



নূতন
প্রথম সংস্করণ :
১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীজীবনকুমার বসু
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ,
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীমান অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

এক

আগার সঙ্গে গোড়ার, সবুজের সঙ্গে ধূসরের, গদ্যের সঙ্গে কবিতার অমিলটাই চোখে পড়ে যাদের তাদের সংখ্যাই বেশী পৃথিবীতে। গোড়া যে কেবলই মিলতে চাইছে আগার সঙ্গে, ধূসর যে অহরহ সবুজের চিন্তাতেই আকুল এ খবর খুব বেশী লোক জানে না। তার চেয়েও কম লোকে জানে উলটো খবরটা। অগ্রগামী আগাও যে গোপনে গোপনে স্থাণু গোড়ার সমর্থন কামনা করে, সবুজও যে কখনও ধূসরের মায়া কাটাতে পারে না, আধুনিক গদ্য-প্রগতি যে সনাতন কবিতা-বন্ধনে বাঁধা পড়তে চাইছে নানা ছলে এর রহস্য তাদের চোখে কখনও ধরা পড়ে না যারা নিষ্প্রাণ সূত্রের সাহায্যে প্রাণবন্ত জীবনের মীমাংসা করবার ব্যর্থ প্রয়াস করে' মরছে। নিকষে ঘসে' কমলের মূল্য নিরূপণ করার মতো তা যে যুগপৎ করুণ এবং হাস্যকর হ'য়ে উঠছে তা বুঝতেও পারছে না তারা। ছন্দে না মিললেও নূতন এবং পুরাতন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। আসলে তারা পরস্পরকে চায় কিন্তু পায় না। রূপান্তরিত হ'য়েও একজন আর একজনকে চিনতে চায়, কিন্তু পারে না, নাগাল পায় না। এইখানেই জমে' উঠেছে নাটক।

উকীল সূর্যকান্ত চৌধুরী যখন তাঁর এম. এসসি পাশ কৃতী পুত্র দিবসকে ল' কলেজে ভর্তি করে' দিয়েছিলেন তখন তাঁর মানস-লোক যে বর্ণসম্ভারে রঞ্জিত হয়েছিল তা যে দিবসের চিত্তকে রঞ্জিত করছিল না এ খবর তিনি অনেকদিন পান নি। এর কোনও লক্ষণও দেখতে পান নি। প্রথমে দিবস দু' একবার বলেছিল যদিও যে রিসার্চ নিয়েই সে থাকতে চায় কিন্তু তা তিনি কবিত্ব বলে' উড়িয়ে দিয়েছিলেন। নগদ পয়সা নেই যাতে তা কবিত্ব ছাড়া আর কি! বিজ্ঞান পড়লেও দিবসের প্রকৃতিটা যে আসলে কবি-প্রকৃতি (যে

প্রকৃতি সমুদ্রের মতো পুরাতন দ্বীপ নিমজ্জিত করে' সৃষ্টি করে নূতন দ্বীপ) তা সূর্য চৌধুরীর অবিদিত ছিল না। এর প্রত্যক্ষ একটা প্রমাণ তিনি পেয়েছিলেন অন্তত। দিবসের সঙ্গীতানুরাগ। একটা সরোদ নিয়ে যখন তখন মেতে ওঠে ও। সরোদটা যদিও নিজেই কিনে দিয়েছিলেন তিনি (মাতৃহীন একমাত্র পুত্রের কোনও আবদারে বাধা দেওয়ার শক্তি তাঁর ছিল না, তা' ছাড়া ছিল ব্রজ) কিন্তু ও সরোদটাকে সু-চক্ষে দেখবার মতো উদারতা কিংবা নিরপেক্ষতা ছিল না তাঁর। কেবলই মনে হ'ত তাঁর এবং তাঁর পুত্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে' রেখেছে ওই যন্ত্রটা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বেশী কিছু বলবার সাহস তাঁর ছিল না যে কারণে তা আপাতদৃষ্টিতে গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে অদ্ভুত ঠেকলেও তার আসল উৎস মনুষ্যত্বের সেই সত্তা যে সত্তায় জন্মগ্রহণ করে বিবেক, সত্যকে সত্য বলে' চিনতে দ্বিধা করে না যে একমুহূর্ত। সরোদ বাজিয়ে দিবস যে কোনও অন্যায় করছে না এ তিনি বুঝতেন, দিবস যে রিসার্চ করতে চেয়ে অন্যায় কিছু করে নি এ-ও তিনি মানতেন। তবু তিনি ব্রজর কাছে সরোদ বাজানোর অলীক অপকারিতার কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করতেন, তবু তিনি দিবসকে প্রায়-জোর-করে' ল' কলেজে ভর্তি করে' দিয়েছিলেন। চিন্তা-বৈষম্যের বিভিন্ন আলোকেই তো বিচিত্র হয়েছে মানব-জীবন। মানুষ আকাশের স্বপ্ন দেখে বটে কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না যে সে স্বপ্নটা আসলে ঘুড়ি, তার একটা খুঁট বাঁধা থাকে মর্তের মাটিতে। ঘুড়ি যখন সুতো কেটে উড়ে যেতে চায় অসীম শূন্যে তখন ঘুড়ির মালিক হাহাকার করে' ওঠেন যে সুরে সেই সুরে হাহাকার করে' উঠল সূর্য চৌধুরীর মন অনিবার্য ঘটনাটা যেদিন ঘটে গেল। যে ছেলে চিরকাল শান্ত সুবোধ বাধ্য, বৃত্তি পেয়ে এসেছে যে বরাবর, সে যে ল' ক্লাসে এমন করে' বেঁকে দাঁড়াবে তা তাঁর কল্পনাতীত ছিল।

দিবস নিজেও আত্ম-আবিষ্কার করল অকস্মাৎ। বই-মুখস্থ-

করার কুস্তিগিরিতে অনর্থক সে সময় নষ্ট করছে একথা আবছাভাবে বারবার তার মনে হচ্ছিল যদিও অনেকদিন থেকে, কিন্তু স্পষ্টভাবে সে তখনই সচেতন হ'য়ে উঠল যখনই বুঝল মনে মনে নানা রঙের স্বপ্নজাল বয়ন করা ছাড়া কার্যত আর কিছুই সে করে নি। পিতা-বনস্পতির স্কন্ধারূঢ় হ'য়ে পরগাছার মতো সে নানারকম থিয়োরির ফুল ফুটিয়েছে কেবল।

সচেতন হওয়া মাত্রই তার সজাগ শক্তি বেরিয়ে পড়ল পথের সন্ধানে। সব আবিষ্কারের মতো তার আত্ম-আবিষ্কারটাও হঠাৎই হ'ল সেদিন। ডিম ফুটে বার হবার আগে পক্ষী-শিশু যেমন বাড়তে থাকে নেপথ্যলোকে, তার দুর্গম-পথানুরাগী ব্যক্তিত্বও তেমনি বাড়ছিল নামহীন কোনও যবনিকার অন্তরালে। বড় বড় আবিষ্কারের মতোই তার আবির্ভাবটাও হ'ল আকস্মিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে উপলক্ষকে অবলম্বন করে' আত্মপ্রকাশ করল সেটা, সেই উপলক্ষটাই বড় হ'য়ে রইল সকলের চোখে কিছুদিন। এত সস্তা চেহারা নিয়ে বড় হ'য়ে রইল যে সুবিধা হ'ল গোবিন্দ সাণ্ডেলদের। তাঁরা চোখ বড় বড় করে' বলবার সুযোগ পেলেন—"দেখলে? বলেছিলাম তো!"

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে উপলক্ষটা তুচ্ছ হ'য়ে যায়। এক্ষেত্রে হ'ল না তার কারণ আত্মা জিনিসটা (যা আবিষ্কার করলে দিবস) স্যাকারিন বা এক্স্-রে বা ওই জাতীয় সহসা-আবিষ্কৃত বস্তুর চেয়ে সূক্ষ্মতর। চোখ এড়িয়ে গেল সেটা সকলের, এমন কি দিবসের নিজেরও। সে-ও ব্যাপারটা নিজে বুঝতে পারে নি কিছুদিন, সদ্যোজাত শিশু প্রথমটা যেমন বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি হ'ল। পিতার সঙ্গে সংঘর্ষ হ'য়ে যাবার ফলে যে বেগে সে ছিটকে পড়ল তার পরিচিত আবেষ্টনীর গণ্ডী থেকে, সেই বেগই খানিকক্ষণ অভিভূত করে' রাখলে তাকে। তা' ছাড়া তার ওই যন্ত্রটা (মানে, সরোদ) ষড়যন্ত্র করে' তাকে লক্ষভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করল যেন। রঞ্জনাও—

থাক সে কথা পরে হবে। হ্যাঁ সংঘর্ষই হয়েছিল। সংঘর্ষ বলতে আমরা সাধারণতঃ যে ধরনের রক্তারক্তি কাণ্ড বুঝি তার চেয়ে ঢের বেশী নিদারুণ সংঘর্ষ হয়েছিল, রক্ত যদিও এক ফোঁটাও পড়ে নি। কিন্তু সংঘর্ষ হয়েছিল বলেই যে উকীল সূর্যকান্ত চৌধুরী—ধূসর সূর্যকান্ত চৌধুরী—সবুজ দিবসের প্রতি নির্মম হ'য়ে পড়লেন এজন্য এ কথাও যেমন সত্য নয়, সবুজ দিবসও আত্ম-আবিষ্কার করে' তার ধূসর পিতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে পড়ল এ কথাও তেমনি মিথ্যে। প্রকাণ্ড একটা ব্যবধানের অন্তরালে লুকোচুরি চলল যেন কিছুদিন প্রাচীন কবিতা এবং আধুনিক গদ্যের।

সঙ্গীতাচার্য গহনচাঁদও তার একমাত্র কন্যা রঙ্গনা সম্পর্কে যে ধরনের পরস্পর-বিরোধী আচরণ পরম্পরা প্রকট করলেন তারও মূল সুর স্নেহ এবং রঙ্গনা সেটা জানত। জানত বলেই যা-খুশী করবার সাহস হ'ল তার। এ যুগের কলেজে-পড়া মেয়ে সে ('লেডীজ্' লেবেল মারা ট্রামের সীটগুলোর দিকে চেয়ে লজ্জায় মাথা কাটা যায় যার) তার অবশ্য সাহসের অভাব হওয়ার কথা নয়, কিন্তু সেই অস্ফুট সাহস প্রস্ফুটই হ'ত না হয়তো যদি অদৃশ্য পথে গহনচাঁদের স্নেহ-লোকের খবর সে না পেত।

পত্নী বিয়োগের পর (এ ভদ্রলোকও বিপত্নীক, আশ্চর্য যোগাযোগ!) তাঁর একমাত্র কন্যাটির ভার আত্মীয় চুনীলালের উপর ন্যস্ত করে' সঙ্গীতাচার্য গহনচাঁদ যখন নিশ্চিন্ত মনে কাশীতে রমজান-সাতারামের শ্রদ্ধা-সিংহাসনারূঢ় হ'য়ে সঙ্গীতচর্চায় মেতে ছিলেন তখন তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবেন নি যে কাশীর বাসা উঠিয়ে কোলকাতায় এসে তাঁকে 'সঙ্গীত ভবন' খুলতে হবে। সনাতনী পন্থায় তাঁর আধুনিক কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে যে এত নাকাল হ'তে হ'বে এও তাঁর কল্পনাতীত ছিল। ব্যাপারটা জটিল হ'য়ে উঠল সুতরাং।

চিরকালই হচ্ছে। বামপন্থী ছেলেমেয়েদের হিতাকাঙ্ক্ষায় উদ্বাহু

পিতামাতার দল চিরকালই ছুটে' চলেছেন দক্ষিণ পথে। নাগাল পাচ্ছে না কেউ কারও। কিন্তু আকর্ষণ আছে, দুর্নিবার আকর্ষণ…

ব্যাপারটাকে জটিলতর করে' তুলেছে বন্ধুবান্ধবের দল। দিবসের ট্রাম-ড্রাইভার বন্ধু কিরণ, সূর্যকান্তের প্রধান মন্ত্রী গোবিন্দ, গগনচাঁদের আত্মীয় চুনীলাল না থাকলে এই দুই পরস্পর-আকৃষ্ট অথচ বিভিন্নমুখী দল হয়তো একটু কম দিশাহারা হতেন। কিন্তু এঁরা চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। এবং থাকবেন সেই সব অনাত্মীয়-অথচ-পরম-আত্মীয় ব্যক্তিগণ। (সৌদামিনী এবং দিবসের সেই সাহেব প্রফেসারের মতো) যাঁরা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হবেন ঊনপঞ্চাশবায়ু-বাহিত হ'য়ে এবং আরও দিশাহারা করে' দেবেন ধূসরের দলকে।

আরও থাকবেন তাঁরা যাঁরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, স্বার্থের স্নেহের অথবা খেয়ালের প্রেরণায় সেতু-নির্মাণের প্রয়াস পান দুই দলের মধ্যে। এ হিসেবে মেসের বাসিন্দা অঘোর-গোবর্ধন-হরিদাস-ধূর্জটির দলের সঙ্গে সারেঙ্গী রমজান বা তবলচি সীতারাম অথবা মকোর্দমা-প্রিয় হরলালের বিশেষ তফাত নেই। কিন্তু একটা মজার কথা এই যে এঁরা সেতু বাঁধতে গিয়ে পরিখা খনন করে' বসেন প্রায়ই। আঘাত করতে গিয়ে জাগিয়ে তোলেন সুর, বাজাতে গিয়ে করে' ফেলেন আঘাত।

রঙ্গনা যেটাকে আঘাত বলে' ভেবেছিল সেটা সুর হ'য়ে বেজে উঠল তার জীবনে। ঊর্মি যেটাকে সুর বলে' ভেবেছিল সেটা হ'য়ে গেল আঘাত।

সুরই আঘাত হ'য়ে বাজল এই কাহিনীরও প্রাথমিক পর্বে। সেই সরোদটা। তীরের মতো এসে বিঁধল যেন, সূক্ষ্ম ফাটল দিয়ে প্রবেশ করল অব্যর্থ সন্ধী আলোক রেখার মতো বদ্ধ অন্ধকার ঘরে। শিউরে উঠল ঘরটা, চমকে উঠল, চটে' গেল শেষে। 'তুমি বদ্ধ তুমি অন্ধকার'—আলোক রেখার এই নিঃসন্দিগ্ধ নীরব বাণী অসহ্য

হ'য়ে উঠল যেন তার পক্ষে। সে বদ্ধ ? সে অন্ধকার ? মিছে কথা। সত্যিই তার মনে হ'ল মিছে কথা। মনে হ'ল ওরা বাহাদুরি করছে, মনে হ'ল ওরা হেরে যাবে, ভুল পথে চলেছে, বাধা দেওয়াটা কর্তব্য তার। মনে হ'ল—।

সুরটা শুনেও উকীল সূর্যকান্তবাবু তাঁর বিদেশাগত মক্কেল হরলালকে মকদ্দমা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে যেতে লাগলেন, যেন কিছুই হয় নি। যেন-কিছুই-হয়নি ভাবটা মুখভাবে প্রস্ফুট রাখবার কৌশল (বা দক্ষতা) সূর্য চৌধুরীর এমন আয়ত্ত ছিল যে তাঁর নিতান্ত পরিচিত গোবিন্দ সাণ্ডেল এবং পুরাতন ভৃত্য ব্রজও সে ভাব-ব্যূহ ভেদ করে' তাঁর মানস-লোকে প্রবেশ করতে পারত না সব সময়।

"দেখুন এ মকদ্দমা জিততে হ'লে গোটা কয়েক মিথ্যে সাক্ষী যোগাড় করতে হ'বে।"

ফাইলে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে যন্ত্রচালিতবৎ বলে' গেলেন তিনি কথা-গুলো। হরলালের চোখে মুখে শৃগাল-সুলভ যে ভাবটা ফুটে উঠল তা লক্ষ্য করলেন না তিনি। বরং পরমুহূর্তেই চোখ তুলে উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে তাঁর দৃষ্টি যা দেখতে পেল (ওটা অনেকদিন থেকেই আছে, এতদিন দেখতে পান নি তিনি) এবং তাঁর মনে যে চিন্তাধারার পত্তন করল তার সঙ্গে হরলাল বা তার মকদ্দমার কোনও সম্পর্ক নেই। আবার তাঁর দৃষ্টি ফাইলে নিবদ্ধ হ'ল যদিও কিন্তু তিনি যা দেখতে লাগলেন এবার তা ফাইলের লেখা নয়। যে সবুজ কচি অশ্বত্থ চারাটা চোখে পড়েছিল তাঁর ক্ষণকাল পূর্বে সেইটের সঙ্গে ভিত্তি-বিদারী একটা ফাটলের ছবিও ফুটে উঠেছিল তাঁর মানসপটে। তিনি শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন সেই ফাটলটার দিকে। যে ভিত্তির উপর তাঁর এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্তিসৌধ মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে', পাশ্চাত্য সভ্যতার পাকা ইঁট আর বাঙালী প্রতিভার সিমেন্টে দুর্ভেদ্য মনে

হয়েছিল যে বস্তুটাকে, যার উপর উঠেছে কত রকম ইমারত, চাকরির, পেশার, বিদ্যার, বুদ্ধির—হঠাৎ সেই ভিত্তিটার একধারে ফাটল দেখা দিয়েছে। সুরটা বাজতেই লাগল পাশের ঘরে—মনে হ'তে লাগল সুর নয়, অশ্বত্থ চারা, ছোট, কচি, কিন্তু শক্তিমান।

"উপড়ে ফেলতে হ'বে"—কথাগুলো উচ্চারণ করেই লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন সূর্য চৌধুরী।

"আজ্ঞে ?"—বিস্মিত হরলাল প্রশ্ন করলেন আবার।

"মিথ্যে সাক্ষী চাই কয়েকটা।"

"মিথ্যে সাক্ষী ?"

"হ্যাঁ, মশাই। অনেক সময় মিথ্যে সাক্ষী না দিলে সত্যি কথাও প্রমাণ করা যায় না আদালতে।"

অনাবশ্যক জোর দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করেই আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন সূর্য চৌধুরী। জানলা দিয়ে আবার চাইলেন বাইরের দিকে। অশ্বত্থ চারাটা হাসছে যেন হাওয়ায় দুলে দুলে।

হঠাৎ মনে হ'ল দিবসকে চেনেন না তিনি। রোজ দেখছেন তবু চেনেন না। চেনবার কোনও চেষ্টাই করেন নি এতদিন, প্রয়োজন হয় নি। মাটির উপর রোজ নিশ্চিন্ত-চিত্তে চলা-ফেরা করে সবাই। মাটিকে চেনবার তাগিদ থাকে না, প্রয়োজন থাকে না তার নিচে কি আছে জানবার। ভূমিকম্প হয়ে যাবার পর সে আগ্রহটা জাগে। আবিষ্কৃত হয় ধৈর্যের প্রতিমূর্তি আপাত-শীতল মাটির বুকের ভিতরও আগুন আছে, আকাশচুম্বী পর্বতশিখরের দুর্ভেদ্য শিলাকে চৌচির করে' মূর্ত হ'য়ে উঠতে পারে যা আগ্নেয়গিরিতে যে কোনও মুহূর্তে।

পথ চলতে চলতে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি এসে পড়লে গম্ভীর পথিকও যেমন বিব্রত হয়ে ছুটতে থাকে (বিশেষত ছাতা না থাকে যদি) সূর্য চৌধুরী তেমনি মনে মনে ছুটছিলেন, হোঁচট খেলেন হঠাৎ একজায়গায়। কিরণ, দিবসের বন্ধু কিরণ, কোথায় থাকে

ছোকরা তাও তো জানি না, ছোকরা কবি শুনেছি, দিবসের সঙ্গে পড়ত, কিরণই দিবসকে সরোদের-হুজুকে মাতিয়েছে—এই ধরনের নানা এলোমেলো চিন্তা প্রস্তরীভূত হ'য়ে উঠল যেন হঠাৎ, হোঁচট খেলেন তাতে। তারপর সন্তর্পণে অন্ধকার একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন যেন নামহীন অবাস্তব একটা ঘরের দিকে যেখানে দিবস ষড়যন্ত্র করছে প্রচলিত ভিত্তির বিরুদ্ধে। সঙ্গে কিরণ আছে কি? তৈরি করছে সুরের হাতুড়ি!

হঠাৎ মনে পড়ল গোবিন্দ সাণ্ডেলকে, তাঁর আবাল্যবন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলকে যাঁর চতুর্ভুজাকৃতি চিবুকের নিম্নতম বাহুটি উভয় দিকে প্রসারিত হয়ে কর্ণস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে প্রায়। আপদে বিপদে যে গোবিন্দ সাণ্ডেল নির্ভরযোগ্য পরামর্শ দিয়ে এসেছেন এতকাল, তাঁর বলিষ্ঠ মুখটা মনে পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সুইচ টিপে দিলেন হরলাল আবার।

"ক'টা মিথ্যে সাক্ষী চাই?"

"গোটা তিনেক অন্তত।"

"আচ্ছা, তাই চেষ্টা করি গিয়ে তাহলে। কোর্টে কি বলতে হবে তাদের?"

"সে আমি শিখিয়ে দেব। আপনি তাঁদের এইখানেই নিয়ে আসবেন।"

"আচ্ছা তাই আনব। আমি উঠি এবার?"

"আপনি উঠেছেন কোথায়?"

"যে মেসটায় আমি বরাবর উঠি তাতেই উঠেছি।"

"অসুবিধা হ'লে এখানেও থাকতে পারেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে জোর তো আছেই।"

সরোদটা বাজছিল পাশের ঘরে, সূর্য চৌধুরী আবার ছুটছিলেন মনে মনে, হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন তিনি। সুরের শিলাবৃষ্টি হ'য়ে গেল যেন। ছন্দে উদ্দাম হ'য়ে উঠল গৎটা।

মুচকি হেসে সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে হরলাল খোশামোদ করবার প্রয়াস পেলেন একটু।

"দিবুবাবু বাজাচ্ছেন বুঝি, বাঃ, খাশা হাত হয়েছে তো!"

আশানুরূপ ফল কিন্তু ফলল না। সূর্য চৌধুরীর কুঞ্চিত ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হ'য়ে গেল এবং নাসারন্ধ্রপথে যে 'হুঁ'-টি ছিটকে বেরিয়ে এল সেটি তপ্ত গুলির মতো মনে হ'ল হরলালের। নমস্কারান্তে ছাতাটি বগলে নিয়ে সুট করে' বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সূর্য চৌধুরী গুম্ হ'য়ে বসে' রইলেন খানিকক্ষণ। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হচ্ছিল যে তিনি ফী'য়ের টাকাগুলোর দিকেই সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কিন্তু আসলে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি 'গ্রীনরুমে' অর্থাৎ সাজঘরে, নিজের অজ্ঞাতসারেই। অপমানিত অভিভাবকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হ'লে যে ধরনের সাজসজ্জা প্রয়োজন তাই নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। আমরা সকলেই যে স্বপ্নরঙ্গমঞ্চে অভিনেতা মাত্র এই বৈদান্তিক বোধ সব সময়ে আমাদের মনে জাগরূক থাকে না সম্পূর্ণরূপে, সূর্য চৌধুরীরও তা ছিল না। তাছাড়া এক্ষেত্রে আর একটা গোল হ'ল। যে সরোদ নিয়ে দিবসকে মাতামাতি করতে মানা করেছেন তিনি—সেই সরোদে এই দুপুর বেলা পাশের ঘরে বসে' অমন একটা তুফান-তোলা গৎ বাজানোর অর্থ তাঁকে অপমান করা এই অলীক ধারণার ঢিলটা অহংকার-সর্পের গায়ে লাগবামাত্রই ফোঁস করে' উঠল সেটা এবং সেই তর্জনের নেশায় নিমেষে এমন অভিভূত হ'য়ে পড়লেন তিনি যে স্বকীয় অন্তর্নিহিত আসল সত্তাটার (যে সত্তা বহির্জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপকে স্বপ্ন বলেই জানে) দিকে মনোযোগ দেবার আর অবসর পেলেন না। অর্থাৎ অজ্ঞাতসারেই রঙ্গমঞ্চে নূতন ভূমিকায় নেবে পড়লেন এবং রুষ্টকণ্ঠে হাঁক দিলেন—"ব্রজ—"

তাঁর অন্তর্নিহিত আসল সত্তাটার সম্বন্ধে তিনি যে বরাবর উদাসীন থাকতে পারেন নি এর বহু প্রমাণ পরে পাওয়া যাবে, কিন্তু

তাঁর এই রুষ্ট কণ্ঠস্বরের মধ্যেই ব্রজ কি করে' যে সে সত্তার আমেজ পেলে তা ব্রজই জানে। পুরাতন ভৃত্যদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে বোধ হয় যা দিয়ে তারা মনিবের স্বরূপটা ঠিক ধরতে পারে যে-কোনও অবস্থায়।

রুষ্ট আহ্বানের উত্তরে ব্রজ তাই হন্তদন্ত হ'য়ে এল না। খুব ধীরে-সুস্থেই এল।

"কিছু বলছ?"

ব্রজ সূর্য চৌধুরীর বাপের আমলের চাকর। সূর্যকে বালক অবস্থায় দেখেছে, মাতৃহীন দিবসকে মানুষ করেছে। সুতরাং সূর্য চৌধুরীকে অসঙ্কোচে সে 'তুমি' বলে।

"দিবুই বাজনা বাজাচ্ছে নাকি ও-ঘরে?"

"হ্যাঁ।"

"কলেজে যায় নি?"

"কই না তো। খায়ও নি সকাল থেকে কিছু। কি যে এক বাজনা কিনে দিয়েছ ওকে, দিনরাত ওই নিয়ে আছে।"

"কলেজে যায় নি কেন?"

"ও তো বলছে কলেজে আর যাবে না, উকীল হওয়ার ওর ইচ্ছে নেই।"

"ইচ্ছেটা কি তাহ'লে?"

"তা তো জানি না!"

যেমন নির্বিকারভাবে এসেছিল তেমনি নির্বিকারভাবে চলে' গেল ব্রজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল, রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসার গোবিন্দ সাণ্ডেল। তাঁর ধারণা তিনি সূর্যকান্তের বন্ধু ও বিবেক-রক্ষক। বর্ণ-চোরা আম বলে' যাঁরা এ জাতীয় লোকেদের বর্ণনা করেন, তাঁরা ঠিক সুবিচার করেন না। আমের প্রতিও না, এঁদের প্রতিও না। কড়া পাকের সন্দেশ বললেও ঠিক হয় না। এদের পাকটা যে কড়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এরা

ঠিক সন্দেশ নন। এঁরা মাধুর্যের অধিকারী (না হ'লে সূর্যকান্তের মতো লোক আকৃষ্ট হয়েছেন কেন) কিন্তু তা সরল মিষ্টতা নয়। কড়া সিগার বা বিলিতি চীজের সঙ্গে উপমিত করলে এঁর চরিত্রের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, তাও ঠিক পাওয়া যায় না, কারণ এঁদের উপমা এঁরা নিজেরাই। মেকি চার্চিল-মার্কা উদ্ধত মনোভাবের মুখে বহু সাহেবের পাদুকা প্রহারের চিহ্ন ঢাকবার জন্যে যাঁরা মুখোশ পরেছেন নানারকম সারা জীবন ধরে', যাঁদের শাস্ত্রে বাঙালীত্ব বজায় রাখবার একমাত্র মন্ত্র অবাঙালীদের তাচ্ছিল্য করা, নিজের মহত্ব বজায় রাখবার উপায় অপরকে হীন চক্ষে দেখা এবং কথায় কথায় প্রতিবেশীদের উপর টেক্কা দিয়ে ঈর্ষার বীজ বপন করা, মূর্খ হ'য়েও যাঁরা সবজান্তা সেজে কাটিয়েছেন, নির্ধন হ'য়েও ধনীর চাল বজায় রেখেছিলেন যাঁরা চাকরি-জীবনে এবং চাকরি-শেষে সে চাল বজায় না রাখতে পেরে' নির্মম বাজেটের দাঁড়িপাল্লার উপর সন্তর্পণে চড়ে' বসে আছেন যাঁরা, এক কথায় তাঁদের বর্ণনা করা শক্ত। ইংরেজি 'চীজ' বললে যা বোঝায় তা এঁরা নন ঠিক, হিন্দি চীজ 'শব্দটি' বরং বেশী লাগসই এঁদের সম্বন্ধে। খুব বেশী লোকের সঙ্গে সত্যিকার বন্ধুত্ব এঁদের হয় না। কারণ এঁদের চরিত্রের নিগূঢ় মাধুর্য অধিকাংশ লোকেরই মর্মগোচর হয় না, তাছাড়া এঁদের চারিদিকে এমন একটা বর্ম থাকে যা অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুর্ভেদ্য। কিন্তু যদি কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে' যায় এঁদের দৈবাৎ, তাহ'লে বিলিতি পাকা রঙের মতোই নির্ভরযোগ্য হ'য়ে ওঠে তা। সূর্য চৌধুরীর সঙ্গে গোবিন্দ সাণ্ডেলের বন্ধুত্ব জমেছিল।

দিবস উকীল হ'তে চায় না ব্রজর মুখে এই কথা শুনেই সব গুলিয়ে গিয়েছিল সূর্য চৌধুরীর। যে সম্ভাবনাটা মনের ভিতর লুকিয়ে ছিল সেটা হঠাৎ মূর্ত হ'য়ে উঠল যেন—'হায় হায়, কেটে' গেল বুঝি ঘুড়িটা অমন মানজা দেওয়া সত্ত্বেও' গোছের একটা শঙ্কিত

ক্ষোভের দাপটে তাঁর সমস্ত চিন্তাধারা নিরবয়ব হ'য়ে পড়ল যেন মুহূর্তের মধ্যে। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি যেন, মনে মনে ছুটে' এলেন তাঁর দিকে, অকূল সমুদ্রে ভেলা দেখতে পেলেন যেন একটা। ছুটে আসবার আর একটা কারণও ছিল, নিমিষের মধ্যে আর এক কাণ্ডও করেছিলেন তিনি, অতীতে ফিরে গিয়েছিলেন, নিজের সেই অর্ধবিস্মৃত যৌবনলোকে। রাজপুত্র প্রবীরের দিকে চেয়েছিলেন সবিস্ময়ে, মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে জরিদার মখমলের পোশাক, বাম স্কন্ধে বিলম্বিত ধনু, ললাটে তিলক। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য কথা, তিনিই প্রবীর সেজেছিলেন একদিন পিতার নিষেধ তুচ্ছ করে'। অবলুপ্ত ছবিটার দিকে অবিশ্বাস ভরে' চেয়েছিলেন তিনি, স্নিগ্ধরস ধারায় কোমল হ'য়ে আসছিল মনটা, এই সময় গোবিন্দ সাণ্ডেল না এসে স্বয়ং দিবস যদি আসত তাহলে এ কাহিনীর চেহারা অন্যরকম হ'য়ে যেত হয়তো। কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেল এলেন এবং তাঁকে দেখেই সূর্য চৌধুরী পালিয়ে এলেন স্বপ্নলোক থেকে।

পাশের ঘরে সরোদটা তখনও বাজছিল, যে সরোদের ভগ্ন-মূর্তি পরে ব্যথিত করেছিল ব্রজকে, লুকোচুরিতে প্রবৃত্ত করেছিল গম্ভীর সূর্যকান্তকেও, সেই সরোদটা বেজে চলেছিল তখনও।

গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখে নয়, চোখে ফুটে উঠল একটা ভাষা। 'ও বাবা একি আবার'-গোছ ভাবের সঙ্গে সকৌতুক বিদ্রূপই শুধু ছিল না তাতে 'বেফাঁস কিছু না বলে' চুপটি করে' মজা দেখা যাক দূর থেকে দাঁড়িয়ে'—এই ধরনের একটা আভাসও ফুটে উঠেছিল ভাষাভরা সে অপরূপ চাহনিতে। দিবসের আধুনিক চাল-চলন সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন (এবং বেশ কিছু করেছিলেন; কারণ পরের সম্বন্ধে নানাবিধ রোচক সংবাদ সংগ্রহ করার যে পারদর্শিতা তাঁর ছিল তা আধুনিক যুগের টিকিট সংগ্রহ করার পার-দর্শিতার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়) তাতে দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজা

উপভোগ করবার মতো যথেষ্ট উপকরণ যে নিশ্চয়ই আছে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

বাপের কানের পাশে সরোদের গৎ বাজানোটা যে দিবসের আধুনিকতার একটা লক্ষণমাত্র এটা বুঝতে দেরি হয় নি গোবিন্দ সাণ্ডেলের। সূর্য চৌধুরীরও হয় নি, যদিও তিনি এই অবিশ্বাস্য জ্ঞানটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণে। "পেশা হিসেবে ওকালতি ব্যাপারটার সার্থকতা আমি আর দেখতে পাচ্ছি না ভবিষ্যৎ সমাজে। ভবিষ্যৎ ভারতের প্রচেষ্টা হবে সব রকম ঝগড়া নিরারণ করা, ঝগড়াকে অবলম্বন করে' পয়সা রোজগার করা নয়"—অনেকদিন পূর্বে উচ্চারিত দিবসের এই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু শুনতে চাইছিলেন না। সরোদের গৎ ভেদ করে' তবু ভেসে আসছিল কথাগুলো, রুষ্টতর করে' তুলছিল তাঁকে। তিনি যে দিবসের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে রুষ্ট হচ্ছিলেন তা নয়, রোষের আসল কারণ তিনি অপমানিত বোধ করছিলেন এতে। যে ঠুনকো সম্মানের পোশাক পরে' তিনি সগৌরবে সামাজিক মর্যাদা কুড়িয়ে এসেছেন এতদিন সেই পোশাকটার গায়ে কাদা লাগিয়ে দিয়েছে দিবস যেন তাঁর মনে হচ্ছিল। তিনি কল্পনানেত্রে দেখছিলেন যে দিবস— তাঁর একমাত্র ছেলে দিবস—মুখে না বললেও মনে মনে তাঁকে অশ্রদ্ধা করছে এই ওকালতি পেশার জন্য, যে পেশার ভিত্তি, দিবসের মতে, মনুষ্যত্ব নয়, পশুত্ব। কি মূর্খতা! এই মূর্খতার কথাটা কিন্তু মুখ ফুটে তিনি বলতে পারেন নি দিবসকে, বলবার সাহস সংগ্রহ করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, (সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এইটেই এবং এইটেই সূর্য চৌধুরীর বিশেষত্বও), দিবসকে তিনি জোর করে' ল' ক্লাসে ভর্তি করে' দিয়ে মনে মনে অপরাধী হয়েছিলেন যেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বৃদ্ধবয়সে দিবসকে নিজের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন করবার জন্য, তিনি যেন তাঁকে তার বিবেকের বিরুদ্ধে আটকে রাখতে চাইছেন জোর করে'। "না না

দিবসকে তিনি উকীল করতে চাইছেন তার নিজের ভালর জন্যেই। নিতান্ত ছেলেমানুষ, ছুনিয়ার ও বোঝে কি, রিসার্চ করে' ক'টা পয়সা পাবে ও এ বাজারে—তাছাড়া যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ সংকীর্ণতার বিষ জর্জরিত করে' রেখেছে আবহাওয়াকে সে দেশে বিজ্ঞানের গবেষণা হওয়া সম্ভব নাকি! এখানে সব জায়গাতেই তো ক্লিক্—" এই সব কথা আর একবার মনে মনে আউড়েও সাহস সংগ্রহ করতে পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর হঠাৎ-ক্রুদ্ধ দৃষ্টির শিখা ম্লান হ'য়ে আসছিল, এমন সময় প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের দর্শন পেয়ে অকূল সমুদ্রে কূল পেলেন তিনি যেন সহসা।

"কি খবর ?"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের এই তুচ্ছ কথা ছু'টিই যেন প্রচুর সাহস সঞ্চার করলে তাঁর মনে। প্রদীপ্ততর হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি।

"খবর ? খবর ওই শোন না"—বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন পাশের ঘরটা।

টং টং টং টং টং মনের আনন্দে সরোদ বেজে চলেছিল। ভাষা-ভরা চক্ষু নিয়ে পাশের কোচটায় বসলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। পা দোলাতে লাগলেন সূর্য চৌধুরী। গোবিন্দ সাণ্ডেলের স্থূল উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে' মনে মনে কিন্তু তিনি দিবসের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলেন কল্পনায়।

"এটা প্রত্যাশা করি নি তোমার কাছে। আশা করি নি যে লেখাপড়া শিখেও অবাধ্য হ'বে তুমি।"

"অবাধ্য ? কই না! সরোদ বাজাতে আপনি মানা করেন নি তো ?"

"ব্রজর কাছে তুমি নাকি বলেছ যে উকীল হওয়ার তোমার ইচ্ছে নেই ?"

"তা নেই।"

কাল্পনিক কথাবার্তা এর বেশী আর এগোল না। এই কাল্পনিক

'তা নেই'-এর বিরুদ্ধে কল্পনাতে তিনি কিছু বলতে পারলেন না। সরোদটা সমানে বেজে যেতে লাগল।

"বাবাজি আজকাল বাজনা নিয়ে খুব মেতেছেন বুঝি? ভাল!"

টোপটি ফেলে উৎসুক হয়ে বসে' রইলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। দিবসের সম্বন্ধে সূর্যকান্তর দুর্বলতার কথা অবিদিত ছিল না তাঁর। সুতরাং বেশি কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না। সরোদ কিনে দিতে আগেই মানা করেছিলেন তিনি। এখন—!

সূর্য চৌধুরী কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না, তিনি কাল্পনিক 'তা নেই'-এর উত্তরটা ভাবছিলেন পা দোলাতে দোলাতে। কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে গোবিন্দ সাণ্ডেল নিজের কেশবিরল মস্তকে হাত বুলোলেন একবার। আড়চোখে সূর্য চৌধুরীর দিকে চাইলেনও একবার।

"আমিই অবশ্য বাজনাটা ওকে কিনে দিয়েছি"—সূর্য চৌধুরী বললেন সে চাউনির উত্তরে।

"তা তো জানি।"

"কিন্তু ও যে ও নিয়ে এতটা মেতে উঠবে তা ভাবি নি"—প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখভাবে বিদ্রূপের আভাস দেখে থেমে গেলেন একটু তিনি, তারপর আর একটু থেমে শেষ করলেন কথাটা—"কলেজে না গিয়ে সরোদ বাজাচ্ছে, দেখ দিকি কাণ্ড!"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সহসা বিদ্রূপের আভাসটা। বস্তুতঃ, আভাস রইল না তা আর প্রকাশ হয়ে পড়ল, আর তা লক্ষ্য করবামাত্র সশস্ত্র হ'য়ে উঠলেন সূর্য চৌধুরী মনে মনে।

"বাজনা জিনিসটা খারাপ নয়, বুঝলে, কিন্তু মা সরস্বতীর দক্ষিণ হস্তের ওই ব্যাপারটি মা সরস্বতীকেই মানায়। আমাদের মতো সাধারণ লোকেরা ও নিয়ে বেশী মাতামাতি করতে গেলেই আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি বন্ধ হয়ে যায়, বিশেষত আমাদের দেশে।"

ঠিক এই মুহূর্তে সূর্য চৌধুরীর মনে যা হচ্ছিল তা জানতে পারলে চমকে যেতেন রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার গোবিন্দ সাণ্ডেল। হঠাৎ তাঁর, মানে সূর্য চৌধুরীর, অন্তরাত্মা (যা কখনও মরে না, যাতে কখনও মরচে ধরে না, যা সমস্ত পাঁক পলি ঠেলে কমলের মতো বেরিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে) আত্মপ্রকাশ করল তাঁর দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলকে তিনি শঠ, জুয়াচোর, ঘুষখোর, মূর্খ, খোশামুদে, অহঙ্কারী, পাজি, ঝুনোনারকেল-রূপে প্রত্যক্ষ করলেন সহসা। ক্ষণকালের জন্য কিন্তু। তার পর মুহূর্তেই আবার চলে গেলেন তিনি দিবসের কাছে। ভাবতে লাগলেন দিবস কি—কিন্তু ভাববার দরকার হ'ল না—তিনি নিঃসংশয় হলেন যে দিবসকে নোয়ানো যাবে না, কিছুতেই নিজের মত পরিবর্তন করবে না ও। পুত্রের মুখখানা মানসনেত্রে দেখতে লাগলেন। অসাধারণ নয়, কিন্তু বিশিষ্ট, চরিত্রের ছাপ আছে। নোয়ানো যাবে না। অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের দিকে চাইলেন আবার। মনে হ'ল, হোক ঝুনোনারকেল, তবু এই লোকটাই নির্ভরযোগ্য!

"কলেজে না গিয়ে সরোদ বাজাচ্ছে, মানে? ওকালতি আর পড়বে না?"

"না।"

"তার মানে?"

মানেটা কিন্তু স্পষ্ট করে' খুলে' বলতে পারলেন না সূর্য চৌধুরী। আসল কথাটা চেপে গেলেন। সবুজ প্রাণের দুঃসাহসকে তিনি যে আমল দেন নি, তাকে যে রিসার্চ করতে বাধা দিয়েছিলেন, এ কথাটা ঝুনোনারকেল গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছেও স্বীকার করতে বাধল তাঁর। গোড়াগুড়িই বেধেছিল। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে এ কথা তিনি একবারও বলেন নি। প্রিয় বন্ধুর কাছে থেকেও অনেক সময় অনেক কথা গোপন করতে হয়। কিন্তু এই বিশেষ কথাটি

গোপন করে' তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন তা যদি দিবস জানতে পারত তাহ'লে সে হয়তো অমন হঠকারিতা করত না।

"বুঝলাম না ঠিক, গান বাজনাকেই ও পেশা করতে চায় নাকি তাহলে ?"

"হয়তো"

ঠিক এইখান থেকেই উপলক্ষটা বড় হয়ে উঠতে লাগল, প্রায় ডালপালা বিস্তার করে' ক্রমশ আবৃত করে' ফেলল লক্ষ্যকে। ধূসর-পক্ষ সরোদটাকেই বড় করে' দেখলেন এবং সবুজ-পক্ষের জীবনেও তা ঘটনাচক্রে বড় হ'য়ে উঠল কিছুদিনের জন্য। রঞ্জনা প্রভৃতির অভ্যাগমে জটিলও হয়ে গেল একটু। দিবসের আন্তরিক আকূতি ইপ্সিত পথে বাধা পেয়ে ভিন্ন খাতে বইল কিছুদিন।

"দিবুকে তো অত বোকা মনে হয় না"—মন্তব্য করলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল, "উকীল হ'য়ে বসলে তোমার তৈরি প্রাকটিসটা পেত, এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি ওর আছে বলেই তো বিশ্বাস করি।"

"কি জানি ভাই আজকালকার ছেলেদের মতিগতি বুঝতে পারি না"—মামুলি ফরমূলাটা আওড়ালেন সূর্য চৌধুরী।

গোবিন্দ সাণ্ডেল মাথায় হাত বুলোলেন। তারপর একটু থেমে' বললেন, "ভিতরে অন্য ব্যাপার আছে—নিশ্চয় কিছু। খোঁজ কর।"

"অন্য ব্যাপার মানে ?"

"তা তো জানি না, খোঁজ কর সেটা।"

অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়লেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। যে দিবসকে তিনি চেনেন তার সঙ্গে ঘটনাটা কিছুতেই মেলাতে পারছেন না যেন।

"কি ধরনের ব্যাপার সন্দেহ করছ তুমি ?"—সূর্য চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে একটু ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেল।

"সন্দেহ ?"

উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি একবার বাইরের দিকে, যেন জানলার বাইরেই প্রশ্নটার উত্তর মূর্ত হ'য়ে আছে। জানলার বাইরে

কেউ নেই দেখে কিন্তু হতাশ হলেন তিনি, আশ্বস্ত হলেন। নিম্নকণ্ঠে বললেন, "দেখ গান-বাজনার সঙ্গে প্রায়ই যে জিনিসটা জড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তা' প্রায়ই, মানে হ্যাপি হয় না। বিশেষত আমাদের মতো মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পক্ষে। পাখিরা গান গায় কখন জান? ব্রিডিং সিজনে।"

হঠাৎ ধস ভেঙে সূর্যকান্ত পড়ে গেলেন যেন খরস্রোতা নদীর আবর্তে। উত্তাল তরঙ্গমালার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তলিয়ে গেলেন যেন ক্ষণকালের জন্য, আবার উঠলেন, আবার সাঁতরাতে লাগলেন প্রাণপণে,—হঠাৎ দূরে দ্বীপ দেখতে পেলেন একটা, চেনা দ্বীপ, সাঁতরে গিয়ে উঠলেন সেখানে। কিরণ।

"মানুষের বেলায় ও কথা সত্যি কি সব সময়ে?"—চেনা দ্বীপে উঠে আশ্বস্ত সূর্যকান্ত বললেন মুখে হাসি টেনে—"তাছাড়া দিবু গান শিখছে তার বন্ধু কিরণের কাছে। তুমি যা ভাবছ তা নয়।"

"কিরণ? কোন্ কিরণ? সেই ট্রাম ড্রাইভারটা নাকি! তার সঙ্গে দিবসের বন্ধুত্ব আছে?"

"কলেজে একসঙ্গে পড়েছিল যে। খুব বন্ধুত্ব দু'জনে। ওই তো সরোদের হুজুকে মাতিয়েছে ওকে।"

ভাষা-ভরা হয়ে উঠল গোবিন্দ সাণ্ডেলের দৃষ্টি। 'এই সেরেছে'র সঙ্গে 'তাহ'লে-তো-যা-ভাবছিলাম-তাই'-এর একটা হৃষ্ট সম্মিলন জ্বলজ্বল করতে লাগল তাঁর চোখে।

"কিরণ ছেলে কিন্তু খুব ভাল। খুব আত্মসম্মান বোধ আছে, বেশ ভদ্র, তাছাড়া—"

যদিও কিরণের সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু জানতেন না তিনি, সে কোথায় থাকে সে ঠিকানাটা পর্যন্ত জানতেন না, তবু যতটুকু জানতেন তাতেই রং চড়িয়ে বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেলের চোখের দিকে চেয়ে দমে' গেলেন তিনি। থেমে গেলেন। আমতা আমতা করে' কেবল বললেন, "না না, তুমি যা ভাবছ তা নয়।"

"আমি স্বচক্ষে কিন্তু সেটা দেখেছি"—মৃদু হেসে বললেন গোবিন্দ সাণ্ডেল এবং বলেই থেমে গেলেন। অভিজ্ঞ লোকেরা চট করে' পুরো কথাটা বলেন না, অভিজ্ঞতার জটে কথাগুলো আটকে যায় বোধ হয়, এবং যতটুকু বলেন তা অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিতে শ্রোতাকে যখন দিশাহারা করে' তোলে তখন জট খুলতে খুলতে সেটা উপভোগও করেন তাঁরা। অর্থাৎ কথা কইতে কইতেও তাঁরা দাবা খেলেন।

গোবিন্দ সাণ্ডেল ওইটুকু বলেই মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। উৎকণ্ঠিত সূর্য চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, "কি দেখেছ স্বচক্ষে?"

জানলার দিকে আর একবার চকিতে দৃষ্টিপাত করে' এবার পুরো উত্তরটাই দিলেন গোবিন্দবাবু। অবশ্য নিম্নকণ্ঠে।

"আমাদের পাড়ায় উর্মি বলে' একটা বখা মেয়ে আছে, নেচে নেচে বেড়ায় চারদিকে। তোমার ওই কিরণের সঙ্গে প্রায়ই দেখতে পাই তাকে পথেঘাটে। সেদিন দেখি একটা রিক্শা চড়ে' আসছে দু'জনে!"

বখা মেয়ে! সর্বনাশ! দিবসের বন্ধু কিরণের সঙ্গে রিক্শা চড়ে' বেড়ায়? ভীতি-বিহ্বল বিস্ফারিত নেত্রে চেয়েছিলেন যদিও তিনি গোবিন্দ সাণ্ডালের মুখের দিকে, কিন্তু তাঁর পরবর্তী কথাগুলো আর কানে ঢুকছিল না সূর্য চৌধুরীর; তিনি কল্পনায় পুনরায় দিবসের কাছে চলে' গিয়ে তার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

"কিরণ নাকি উর্মি বলে' একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে' ঘুরে' বেড়ায়?"

"বেড়ায় শুনেছি। তাতে হয়েছে কি!"

"ওরকম ভাবে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে' ঘুরে' বেড়ানোটা কি ভাল?"

"ক্ষতি কি?"

কল্পনায় দিবসের মুখে এই সম্ভাব্য উত্তরটা শুনে' সূর্য চৌধুরীর চক্ষু আরও বিস্ফারিত হ'য়ে গেল। কল্পনাতেও এর প্রতিবাদ করবার

মতো জোর খুঁজে পেলেন না তিনি। তাঁরও মনে হ'ল, সত্যিই তো, একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে' বেড়ালে ক্ষতি কি। তারপর হঠাৎ তিনি শ্রবণশক্তি ফিরে' পেলেন আবার। শুনলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল বলে' চলেছেন, "ধরে' নিলুম না হয় কিরণ ভাল ছেলে এবং দিবস তার কাছেই গান-বাজনা শিখছে, কিন্তু আমি গোড়ায় যে কথাটা বলেছিলুম সেটা তুমি উড়িয়ে দিতে চাইলেও উড়িয়ে দেবার মতো নয়। দিবস যার কাছেই গান-বাজনা শিখুক তাতে এসে যায় না কিছু, আমি যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে গান-বাজনা জিনিসটাই একটু 'সেক্‌সি'। অত কথায় কাজ কি, খোদ সরস্বতীর পৌরাণিক কাহিনীটাই মনে করে' দেখ না। আমরা গরীব-গুরবো মানুষ, আমাদের কি ওসব সরোদ-ফরোদ পোষায় ভায়া। শাক-ভাতের ব্যবস্থা করতেই নাজেহাল হ'তে হ'বে আমাদের। আমার পরামর্শ যদি শোন, প্রশ্রয় দিও না ওসব।"

কথাটা খুবই সমীচীন মনে হ'ল সূর্য চৌধুরীর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিবসের মুখটা মনে পড়ে' গেল—নাঃ, কিছুতেই নোয়ানো যাবে না ওকে।

"কি করব বল"—ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সূর্য চৌধুরী।

"সিট্ অন্ হিম," হঠাৎ ইংরেজি ভাষায় উপদেশ দিলেন সাণ্ডেল মশাই।

"তার মানে?"

"রাশ টেনে' ধর হে। এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছ না?"

হঠাৎ একটা অদ্ভুত উপমা মনে এল সূর্য চৌধুরীর।

"পারছি না। পাহাড় ফেটে যখন ঝরণা বেরোয় তখন তার রাশ টেনে' রাখতে পার তুমি?"

"পারি বইকি"—একটু ঝাঁজের সঙ্গেই উত্তর দিলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল—"মানুষ চিরকালই পারছে। বাঁধ দেওয়া ব্যাপারটা খুব নতুন নয় তো।"

বাঁধ! দিবসের চারদিকে বাঁধ দিতে হ'বে! বিরাট একটা কংক্রিটের দেওয়াল মূর্ত হ'য়ে উঠল চোখের সামনে।

"দিবুকে একটা কংক্রিটের বেড়ার মধ্যে বেঁধে' রেখে' দেব বলছ ?"

"মানুষকে যে বেড়ার মধ্যে বেঁধে' রাখতে হয় তা যে কংক্রিটের নয় তা তুমিও জান, আমিও জানি। যাক্ ও আলোচনা এখন থাক, একটা মোকদ্দমার নথি এনেছি সেইটে দেখ দিকি। চুনীলাল বলে' আমার একটি বন্ধু আছে, ঠিক বন্ধু নয়, বন্ধুর বন্ধু, সে এক ব্যবসা করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে। বাঙালীর যা হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিল সে। ক্রিমিনাল কেসে পড়ে' গেছে বেচারা। দেখতো এর কোনও উপায় করতে পার কি না।"

সূর্য চৌধুরী সাগ্রহে হাত বাড়ালেন নথিটার দিকে। এই অপ্রিয় আলোচনার ধোঁয়ায় তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল যেন। ধূমায়মান ভিজে ঘুঁটেটা সরিয়ে নেওয়াতে তিনি বাঁচলেন যেন।

নথির দু'এক পাতা উলটেই তিনি বললেন, "ও, এ কেস তো জানি আমি। হরলাল সিংহির সঙ্গে মকদ্দমা তো ? আমিই তো হরলালের পক্ষে উকীল, এখুনি তো হরলাল এসেছিল। তোমার চুনীবাবু যদি নির্দিষ্ট দিনে টাকা দাখিল করতে না পারেন জেল হয়ে যাবে।"

"বল কি ! জেল হ'য়ে যাবে ?"

"নির্ঘাত !"

ঠিক এই সময়ে ব্রজ এল আবার। এবং ঈষৎ ধমকের সুরেই বললে, "তুমি আর বেলা করছ কেন। এগারোটা বাজে যে—কাছারি যাবে না নাকি আজ ?"

"হ্যাঁ যাব বইকি।"

"আমিও উঠি তাহ'লে এবার"—গোবিন্দ সাণ্ডেল উঠে পড়লেন। সরোদটা তখনও বাজছিল। পাশের ঘরটার দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে'

চোখ মট্‌কে গোবিন্দ সাণ্ডেল বললেন, "খুব জমিয়েছে দেখছি। আমি বুড়ো মানুষ, আমার বুকের ভেতরটাই খলবল করে' উঠছে"— বলেই চলে' গেলেন।

সূর্য চৌধুরী হঠাৎ অপমানিত বোধ করলেন এতে। তাঁর ঊনবিংশ-শতাব্দী-লালিত আত্মসম্মানের কান লাল হ'য়ে উঠল লজ্জায়। ব্রজর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "কি কাণ্ড!"

"তুমিই তো কিনে দিয়েছ ওকে সরোদ"—নির্বিকার কণ্ঠে বললে ব্রজ। তার মুখের চেহারাটাও এমন ভাব-লেশহীন হ'য়ে উঠল (অনেকটা ঢালের মতো) যেন সে পরবর্তী চীৎকারটা প্রত্যাশাই করেছিল।

"না, ওসব বেলেল্লাগিরি আমার বাড়িতে চলবে না। ডেকে দাও ওকে"—গর্জন করে' উঠলেন সূর্য চৌধুরী।

ব্রজ চলে' গেল। ভ্রূ কুঞ্চিত করে' বসে' বসে' পা দোলাতে লাগলেন তিনি। দিবস এল না, মানে ঠিক পরমুহূর্তেই এল না। সূর্য চৌধুরী এতে অযৌক্তিকভাবে আরাম পেলেন একটু। আবার তাঁর মনে হ'ল দিবসকে চেনেন না তিনি। দিবস দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট অতিশয় স্পষ্ট, তবু তার সবটা তিনি দেখতে পান নি। তার অত্যুজ্জ্বলতাই যে আড়াল করেছে তার সমগ্রতাকে, দিনের আলো যেমন আড়াল করে' রাখে আকাশ-ভরা নক্ষত্রের রূপকে, এ তথ্য স্পষ্টরূপে না জানলেও এটা তিনি আবার আবছাভাবে উপলব্ধি করলেন যে দিবসকে চেনেন না তিনি! প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে যে দিবসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, সুসজ্জিত বাক্যাবলী-অলংকৃত নানাবিধ মুখোশের অন্তরালে নানাবিধ রাজনৈতিক দলাদলির নানাবিধ নীচতা বারংবার বিমর্ষ করে' তোলে যে দিবসকে, তথা-কথিত ভদ্র পেশার পোষাকী ছাঁদের অন্তরালে বারবনিতা-বৃত্তির কদর্য রূপ দেখে' শিউরে উঠে যে দিবস, স্বাধীনতার উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল সংজ্ঞা-সমুদ্রে ডুবে' ডুবে' একটি মাত্র সত্য মুক্তা

আহরণ করেছে যে ধৈর্য সহকারে, যার মন অভাবনীয়ের ভাবনায় মশগুল থাকতে চায়, ধরতে চায় অধরাকে, অজানাকে জানবার আশায় যার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হ'তে চায় নিউক্লিয়ার এনার্জির নব নব সম্ভাবনার মধ্যে, পাখা মেলতে চায় সুরের আকাশে, তাকে শুধু সূর্য চৌধুরী নয়, কেউ চেনে না। সে নিজেও ভাল করে' চেনে না নিজেকে।

"আমাকে ডাকছেন?"

চমকে উঠলেন সূর্য চৌধুরী। দিবস কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা তিনি টের পান নি। দিবসের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি ভদ্র হ'য়ে গেলেন। একটু অপ্রস্তুতও হলেন যেন।

"তুমি আজ কলেজ যাও নি?"—বেশ ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করলেন। অঙ্কশাস্ত্রের-সমস্যায়-নিমগ্ন আহত গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্ আঘাতকারী বিজয়ী রোমান সৈন্যদের দিকে যেমন সবিস্ময়ে চেয়ে ছিলেন ঠিক ততটা বিস্ময় দিবসের চোখে না ফুটলেও সেই জাতীয় বিস্ময় ফুটে উঠল। যে কথা একাধিকবার স্পষ্ট করে' সে বলেছে তা আবার জিজ্ঞাসা করবার মানে কি? দিবসের চোখের এ দৃষ্টিতে ভড়কে গেলেন সূর্য চৌধুরী এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু চটেও গেলেন আবার।

"তুমি আজ কলেজ যাও নি?" দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন।

"না, আমি আর কলেজ যাব না। আগেই বলেছি উকীল হওয়ার ইচ্ছে নেই।"

"কি করবে তাহ'লে?"

"যাহোক কিছু করব একটা।"

"কি সেটা, তাই তো জানতে চাইছি।"

"তা ঠিক করি নি এখনও।"

"রিসার্চ করার নামে কলেজে গিয়ে আড্ডা দেবে আর বাড়িতে বসে' দিনরাত সরোদ বাজাবে এই যদি তোমার মতলব হয়—"

"এ বছর এখানে রিসার্চ করবার কোনও সুযোগ তো আর পাবো না। অন্য লোক নেওয়া হ'য়ে গেছে।"

"কি করবে তাহ'লে এখন? দিনরাত সরোদ বাজাবে? রোজগার করবার কোনও চেষ্টা করবে না? কোনও কাজ করবে না?"

"কাজ ক'রব বইকি, এমন কাজ যাতে গ্লানি নেই।"

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাজ সম্বন্ধে, বাঙালী ছেলেমেয়েদের বেকার জীবনের কারণ সম্বন্ধে, তার যে ধারণাটা মনের তলায় থিতিয়ে ছিল, এই আলোড়নে সেটা স্পষ্টরূপে আত্ম-প্রকাশ করল সহসা। নিমেষের মধ্যে তার মনে হ'ল এতদিন যা ভেবেছি তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবার সুযোগ এসেছে এবার। যে বক্তৃতা সে পরে ছাত্রসভায় দিয়েছিল (এবং যা 'সেন্টিমেন্টাল' বলে' উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সূর্য চৌধুরী) সেই বক্তৃতার প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করে' তুলল তার সদ্য-জাগ্রত চেতনাকে। তার মনে হ'ল সৃষ্টির যে-কোনও প্রকাশের মতোই আত্মপ্রকাশ করতে হ'বে তাকে, আর কিছু নয়। নিজের বিশিষ্ট প্রেরণার মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে শুধু। নিমেষের মধ্যে তার দুঃসাহসী চিত্ত দুরূহ দুর্গম পথে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে উঠল। তার যে কল্পনা উন্মুখ হয়েছিল রিসার্চের ছায়াপথে অভিযান করে' নব নব সৌরলোক আবিষ্কার করবার জন্যে, সক্রিয় হয়েছিল সরোদের সুরলোকে আনন্দের সন্ধানে আত্মহারা হ'বার ছন্দোময় প্রয়াসে, তার সেই কল্পনাই এখন অতি রূঢ় বাস্তবক্ষেত্রেই ফোটাতে লাগল আকাশ-কুসুম। এর জন্য কারও কাছে কোনও জবাবদিহি করবার প্রয়োজনও অনুভব করল না সে। তার মনে হ'ল আত্মপ্রকাশ করতে হ'বে শুধু, এর বেশি তার আর দায়িত্ব নেই। জবাবদিহির নোংরামির মধ্যে তাকেই যেতে হয়, যার প্রকাশটা মুখোশ, আত্মপ্রকাশ নয়। অঙ্কুর যখন বীজ বিদীর্ণ করে' বার হয়, প্রতিদিন আকাশপটে বর্ণকাব্য

লেখা হয় যখন মেঘে মেঘে, পাখির কণ্ঠে ঝংকৃত হ'য়ে ওঠে যখন কলকাকলী, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করে না তারা। কে কি ভাববে এ নিয়ে চিন্তা নেই তাদের। আত্মপ্রকাশের আনন্দেই তারা মশগুল। সেই বা হ'বে না কেন? সুরসপ্তকের ঘাটে ঘাটে তার আঙুলগুলো যেমন বিদ্যুৎগতিতে খেলে যায় এই কথাগুলোও রাগিনীর গতের মতো তেমনি বেজে' উঠল তার মনে নিমেষের মধ্যে। সে নিজের ঘরে এসে ভাবতে লাগল কি করা উচিত এবার।

"গ্লানি নেই মানে? ওকালতিটা তুমি গ্লানিকর বলতে চাও?" সূর্য চৌধুরী পুত্রের অনুসরণ করেছিলেন।

"গ্লানিকর তো বটেই। আইনের ফাঁদে ফেলে—" এইটুকু বলেই দিবস থেমে' গেল, জানলা দিয়ে চাইল বাইরের দিকে। এ নিয়ে তর্ক করতে ইচ্ছে হ'ল না তার। সূর্য চৌধুরী কিন্তু থামলেন না। পুত্রের ভ্রান্ত ধারণাটা অপনোদিত করাটা ঠিক সেই মুহূর্তেই কর্তব্য মনে হ'ল তাঁর, কারণ তিনি চটেছিলেন, তাঁর আত্মসম্মান আহত হয়েছিল।

"মানুষ মাত্রকেই সমাজে বাস করতে হ'বে, আর সমাজ রক্ষা করতে গেলেই আইন চাই। সেটাকে ফাঁদ মনে করবার মানে?"

যেন একটু শ্লেষ টংকৃত হয়ে উঠল সূর্য চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে। দিবস কিন্তু উত্তর দিলে শান্ত কণ্ঠে।

"কারণ ওতে বোকারা ধরা পড়ে আর গরীবরা সাজা পায়। বুদ্ধিমান কিংবা ধনীদের কিছু করতে পারে না ও আইন। ও পেশা সমাজ রক্ষা করে না, শয়তান ধনীদের রক্ষা করে। ও আমি পারব না।"

কৌশলপূর্ণ যুযুৎসুর প্যাঁচ দেখিয়ে, টপাটপ দেওয়াল ডিঙিয়ে, ফস করে' অপ্রত্যাশিতভাবে কপাট খুলে' বা টপ্‌ করে' সিঁড়ি নাবিয়ে মুখোশপরা একটা শয়তান গুণ্ডা তার সহকারী বন্ধুবান্ধবের

সর্ববিধ সংকট থেকে ত্রাণ করছে এই ধরনের একটা রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্র কিছুদিন আগে সূর্য চৌধুরী দেখেছিলেন। দিবসের কথা শুনে হঠাৎ সেই চিত্রটা ভেসে' উঠল তাঁর মানসপটে এবং নিজেকে তিনি সেই মুখোশপরা গুণ্ডারূপে কল্পনা করে' আরও চটে' উঠলেন। কণ্ঠস্বরে রীতিমত উষ্মা প্রকাশ পেল এবার।

"আমি তাহলে সারাজীবন যা করে' এসেছি তা শয়তানী বলতে চাও তুমি, এত বড় আস্পর্ধা তোমার!"

দিবস চুপ করে' রইল।

"কোন্ বিশুদ্ধ পেশা তুমি করবে ঠিক করেছ শুনি?"

"ঠিক করি নি কিছু এখনও।"

বলেই তার লজ্জা হ'ল, মনে হ'ল কেন সে ঠিক করে নি; যে-কোনও মুহূর্তেই তা ঠিক হ'য়ে যাবে যদিও, কিন্তু সেই মুহূর্তটাকে এতদিন ধরে' পেছিয়ে দেওয়ার মধ্যে তার মানসিক জড়তার একটা প্রমাণ সে দেখতে পেল যেন সহসা। দমকা হাওয়ায় বাথরুমের কপাটটা হঠাৎ খুলে' গেলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হ'য়ে যাহোক একটা কিছু দিয়ে নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে, দিবসও তেমনি ঢাকতে চেষ্টা করল নিজেকে।

"ঠিক করি নি যদিও, কিন্তু ঠিক করতে দেরি লাগবে না।"

"তবু সেটা কি ধরনের হ'বে জানতে পারি কি? সরোদ বাজাবে তা বুঝতে পারছি, কিন্তু ও ছাড়া আর কোন্ বিশুদ্ধ পেশা করবে তুমি?"

স্বল্পভাষী দিবস একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে' ফেললে এর উত্তরে। তার মুখ সহসা অনর্গল হ'য়ে গেল যেন।

"আমি এই বাঁধা-ধরা গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। ভদ্রলোকের ছেলে হ'লেই যে উকীল ডাক্তার মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা কেরানী হ'তেই হ'বে এবং তার জন্যে মিথ্যে মুখোশ পরে' পরে' বেড়াতে হ'বে এ কারাগার থেকে আমি মুক্তি চাই। এই

কারাগারের বাইরে যে জগৎ আছে সেইটের সন্ধানে বেরুতে চাই আমি।"

"মানে ?"—সূর্য চৌধুরীর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হ'য়ে গেল, কারণ সত্যিই তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিছু।

"মানে সরল পরিশ্রম করে' রোজগার করতে চাই।"

"সরল পরিশ্রম ? তার মানে মুটেগিরি করবে ?"

"আপত্তি নেই, কিন্তু ঠিক কি করব তা জানি না এখনও।"

সূর্য চৌধুরীর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে' গিয়েছিল। রজ্জুকে যে তাঁর সর্পভ্রম হ'ল তা নয়, ফস্ করে' সেটা যেন পাখি হ'য়ে উড়ে' গেল। মুটেগিরি করতে করতে সরোদ বাজাবে ? দিবসের চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু যে দীপ্তি তিনি দেখলেন তা উন্মাদের চোখে দেখা যায় না, তা অস্বস্তিকর, কিন্তু অর্থহীন নয়। তার 'ঠিক-কি-করব-তা-জানি না-এখনও'র আসল অর্থ যে ঠিক কি করব তা জানি ভাল করে' তা সূর্য চৌধুরী যে পরিষ্কার দেখতে পেলেন এই প্রদীপ্ত দৃষ্টির আলোকে। ঘাবড়ে গেলেন। হতবাক্ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। খাঁচার পাখি দরজা খোলা পেয়ে উড়ে' চলে' যাচ্ছে যেন। পরমুহূর্তেই নিরুপায় ক্ষোভ অহংকারের ছোঁয়াচ লেগে' রূপান্তরিত হ'ল ক্রোধে এবং সেই মুহূর্তে উকীল সূর্য চৌধুরী ধরবার ছোঁবার মতো যে জিনিসটা দেখতে পেলেন সেইটেকেই আঁকড়ে ধরতে গেলেন, যদিও ধরতে গিয়ে যা করে' বসলেন তা করবার কল্পনাও ছিল না তাঁর।

"কবে সেটা জানবে ? ক্রমাগত সরোদের গৎ বাজিয়ে গেলেই কি ঠিক হ'বে সেটা ?"

দিবসের জড়তার পাথরটা সহসা ফেটে গেল। নির্ঝর ছুটে বেরুল গিরি বিদারণ করে'। নিঃশঙ্ক আবেগে যাত্রা শুরু হ'ল তার অনির্দিষ্ট পথে অমিত শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে। মৌন ভাবাকুলতা ভাষা পেল যেন হঠাৎ।

"আমি চললুম।"

"কোথায় ?"

"নিজের পথ নিজেই ঠিক করব এখন থেকে।"

বাইরের দুয়ারটা খুলে দিবস বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল। এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় সূর্য চৌধুরীও অদ্ভুত অচিন্ত্যপূর্ব কাণ্ড করে' বসলেন একটা।

"এটাও নিয়ে যাও না, এ নিয়ে আমি আর কি করব"—পাশের টেবিলে সরোদটা ছিল সেটা তুলে' ছুঁড়ে' দিলেন তিনি দিবসের দিকে।

ঝন্‌ঝন্ করে' মেজেতে পড়ে' চুরমার হ'য়ে গেল সেটা।

দিবস ফিরে দেখলে এবং সেই মুহূর্তেই ঠিক করে' ফেললে যে সরোদ কিনতে হবে আর একটা। সেই মুহূর্তে সরোদটা ভেঙে না গেলে হয়তো সরোদটা এত প্রবল হয়ে উঠত না অব্যবহিত ঘটনা-পরম্পরায়। রঙ্গনাও আসত না হয়তো।

দিবস চলে গেল। পর মুহূর্তেই দ্রুতপদে প্রবেশ করল ব্রজ। সরোদ ভাঙার শব্দটা শুনতে পেয়েছিল সে।

"কি হ'ল, দিবু কোথা ?"

"চলে' গেল।"

"কোথা ?"

"জানি না।"

"সরোদটাকে অমন করে' আছড়ে ভাঙবার কি দরকার ছিল ? কি যে কর কাণ্ড !"

হঠাৎ সূর্য চৌধুরীর মনে হ'ল দিবস যদি স্বেচ্ছায় ফিরে না আসে তাহ'লে তার নাগাল হয়তো আর পাবেন না তিনি। কোলকাতার বিরাট জনসমুদ্রের ছবিটা ভেসে' উঠল মানসপটে।

"তেল দাও আমাকে, কোর্টের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে"—অতি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।

নির্বাক ব্রজ ভাঙা সরোদটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দুই

দিবস যখন পথে বেরিয়ে পড়ল ঠিক সেই সময়ে আরও কয়েকটা ঘটনাও ঘটল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হ'লেও এগুলো যে পরস্পর যুক্ত তা পরে বোঝা যাবে অদৃশ্য যোগসূত্রটা দৃশ্য হয়ে উঠবে যখন। যে কৌশলী রূপকার অদৃশ্য-লোকে বসে' সৃষ্টি করেন নিত্য নতুন নট ও নাটক, তাঁরই প্ররোচনাতেই হয়তো সেই সময় বাদ্যযন্ত্রের দোকানদার নিতাই নন্দী তাঁর দোকানে সিগারেটমুখী বিদেশিনী তরুণীর আলেখ্য-অলংকৃত ক্যালেণ্ডারটি টাঙাচ্ছিলেন সানন্দে, স্বপ্নেও তিনি ভাবছিলেন না যে এই ক্যালেণ্ডারকে কেন্দ্র করে' যে ঘটনা ঘটবে তার ধাক্কা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। মহেন্দ্র কুণ্ডুও ঠিক সেই সময়ে মুখ ছুঁচলো করে' সৌদামিনীর কাছে শুনছিলেন যে তাঁর বাড়ির কোনও ভাড়াটে পাওয়া যায় নি এবং ভাবছিলেন তাঁর বন্ধু রাখহরি যে ভাড়াটের খোঁজটা দিয়েছিল সে আর এসেছে কিনা কে জানে। রাখহরির চায়ের দোকানে একবার খোঁজটা নেবেন ঠিক করলেন তিনি তখনই, অন্নদা বিশ্বাসও (ঝোলা গোঁফ, সদা-শুষ্ক-মুখ) ঠিক এই সময়ে যে খবরটি পেলেন তাতে তাঁর মাথায় বজ্র ভেঙে পড়ল যেন এবং তিনি ছুটলেন চুনীলালকে সে খবরটি দিতে। যে বৈদ্যুতিক কারবারের বেড়াজালে ম্যানেজিং ডিরেক্টার চুনীলাল বিদ্যুদ্বেগে হরলাল প্রভৃতিকে ডুবিয়েছিলেন, সেই বেড়াজালেই ধরা পড়েছিলেন ক্ষুদ্র-প্রাণ অন্নদা বিশ্বাসও। অন্নদা বিশ্বাস স্ত্রীকে লুকিয়ে পোস্টাফিস থেকে যথাসর্বস্ব বার ক'রে 'ইলেক্‌ট্রিক গুড্‌স্‌'-এর ব্যবসায়ে বেশি লাভবান হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ব্যবসা যখন ডুবে গেল তখন তিনি স্বপ্ন-বিবর্জিত সাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে হরলাল সিংহির মতো মকদ্দমা করবার সামর্থ্য তাঁর নেই। তার চেয়ে বরং যে বৈদ্যুতিক দ্রব্য-সম্ভার দোকানে এখনও মজুত আছে

সেগুলি যদি দাঁও-মাফিক বিক্রি করে' ফেলা যায়, তাহ'লে তাঁর টাকাটা অন্তত উঠে আসবে। সেই চেষ্টাই তিনি করছিলেন এবং বিকাশবাবুর সন্ধানও পেয়েছিলেন। ধনী বিকাশবাবু একটা নতুন বাড়ি করাবেন, সেখানে অনেক ইলেক্‌ট্রিক গুড্‌স্‌ নাকি দরকার, তাছাড়া ইলেক্‌ট্রিক গুড্‌স্‌-এর একটা দোকান করবারও ইচ্ছা আছে নাকি তাঁর। উল্লসিত অন্নদা বিশ্বাস তাঁর কাছে গিয়ে কথাবার্তাও ঠিক করে' ফেলেছিলেন প্রায়, কিন্তু এখন তাঁর বন্ধু সমরেশের কাছে যে খবরটি পেয়ে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক আঘাত লাগল (চলতি বাংলায় যাকে বজ্রাঘাত বলে) তার ফলে ছুটলেন তিনি আবার চুনীলালের কাছে। প্রেম নামক স্বর্গীয় বস্তুটি যে এমনভাবে তাঁর সর্বনাশের কারণ হ'য়ে উঠতে পারে, ছা-পোষা অন্নদা বিশ্বাস তা কল্পনাও করেন নি। এবং ঠিক এই সময়েই গহনচাঁদও রঙ্গনাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যদি সে আধুনিক গান শুনিয়ে তাঁকে খুশি করতে পারে তাহ'লে তাকে একটা সেতার উপহার দেবেন। ফ্রেণ্ডস্‌ মেসের বাসিন্দা-চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রসিক এবং স্বল্পভাষী যিনি সেই হরিদাসবাবুরও 'এন্‌ডাউমেণ্ট পলিসি'টি মেচিওর হ'ল সেদিন। তিনি টাকাটা বার করে' পোস্টাফিসে রেখে' দেবেন ঠিক করলেন। হরিদাসবাবু ব্যাচিলার মানুষ, গভর্নমেণ্ট আপিসে চাকরি করেন, চাকরি-শেষে পেন্সন পাবেন। তাঁর লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করবার সার্থকতা কোথায় এ প্রশ্ন যাঁরা করবেন, তাঁরা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স এজেণ্টদের চেনেন না। বিশেষত এই বিশেষ এজেণ্টটি হরিদাসবাবুর বন্ধু হওয়াতে হরিদাসবাবুকে টোপ গিলতে হয়েছিল। হরিদাসবাবু ঠিক করেছিলেন টাকাটা কোন সৎকার্যে দান করে' যাবেন। কিন্তু ঠিক কোন্‌ কার্যকে সৎকার্য বলে তা ঠিক করতে না পেরে টাকাটা আপাতত পোস্টাফিসে রেখে' দেবেন ভাবলেন বন্ধু অঘোরের পরামর্শ তুচ্ছ করে'। অঘোরের ইচ্ছে টাকাটা কোন ব্যবসাতে খাটুক।

এই ঘটনাপুঞ্জ অদূর ভবিষ্যতে যে পরিবেশ সৃষ্টি করবে তারই অভিমুখে দিবস হেঁটে চলেছিল কিছু না জেনেই। পথের দিকে ভাল করে' না চেয়েই চলেছিল সে। নিজের মনের খবরটাই সে নিচ্ছিল আগে, বিবেকের কষ্টিপাথরে নিজের মতবাদকে বারবার যাচিয়ে আত্মসম্মানের প্রকৃত রূপটা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল সে। নিত্য-নতুন-এক্স্‌পেরিমেণ্ট করতে উৎসুক তার যে বিজ্ঞানী-মন পরিচিত আবেষ্টনী ত্যাগ করে' অজানা পরিবেশে জীবন নিয়েই এক্স্‌পেরিমেণ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই মনটারই স্বরূপ দেখবার চেষ্টা করছিল সে নানাভাবে এবং তা করতে গিয়ে তার সমস্ত মন এমন একটা আনন্দ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠছিল যে অনিশ্চয়তার আশঙ্কাটাও ভীত করছিল না আর তাকে। যে মুহূর্তে সে আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়ভূমিতে এসে দাঁড়াল সেই মুহূর্তেই নিঃশঙ্ক হ'ল সে। তারপর পথের দিকে চাইবার অবসর পেল।

বিরাট শহরের কর্মব্যস্ত জনতাকে আজ সে নতুন দৃষ্টিতে দেখল যেন সহসা, দেখে' মুগ্ধ হ'ল। প্রথমেই যে দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল সে দৃশ্য ইতিপূর্বে সে অনেকবার দেখেছে কিন্তু তা দেখে দেবদর্শনের আনন্দ সে এই প্রথম পেল। বোঝার ভারে একটা ঝাঁকা-মুটের ঘাড় বেঁকে গেছে, দরদর করে' ঘাম পড়ছে বলিষ্ঠ পিঠ বেয়ে, তবু সে থামে নি, চলেছে ভিড় ঠেলে। তার পিছু-পিছু চলেছে একটা রিক্শওলা। তারপরই প্রকাণ্ড একটা মোষের গাড়ি থেমে' গেল হঠাৎ মোড়ের পুলিশের ইঙ্গিতে। দুহাতে রাশ টেনে দাঁড়িয়ে উঠেছে গাড়োয়ানটা। তার পেশীসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ দেহটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দিবস। লোভীর মতো চেয়ে রইল, হিংসা হ'ল তার। ঢং ঢং করে' ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ফেরিওলা চানাচুর ফেরি করছে। কাচের প্রকাণ্ড একটা গাড়ি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আর একজন, কাচের গাড়িতে নানা রকম মনোহারী জিনিস। সবাই অবাঙালী, —হঠাৎ মনে হ'ল দিবসের। ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল একটা, ড্রাইভার

পাঞ্জাবী। ঢং ঢং করে' ট্রাম আসছে, ড্রাইভারটার দিকে চেয়ে দেখলে দিবস, উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে,—না কিরণ নয়, ট্রামে ঝুলছে অসংখ্য বাঙালী, আপিস-মুখো কেরানীর দল, যারা ওই ঝাঁকা-মুটে, রিক্শওলা, গাড়োয়ান, ট্যাক্সি-ড্রাইভার, দোকানদারদের ছোটলোক বলে' অবজ্ঞা করে।

হাঁটতে হাঁটতে সে কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার পার হয়ে ধর্মতলার মোড়ে এসে দাঁড়াল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, আস্তানা ঠিক করতে হবে একটা সর্বাগ্রে, টাকা দরকার কিছু, তখনই মনে পড়ল তার স্বোপার্জিত কিছু টাকা ব্যাঙ্কে আছে, তার স্কলারশিপের টাকা, কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ল···এই দ্বিতীয় কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার, সূর্য চৌধুরীর, মুখটা মনে পড়ল। ব্রজকে মনে পড়ল। চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল সে অনেকক্ষণ। একটা ফায়ার ব্রিগেড বেরিয়ে গেল চতুর্দিক সচকিত করে', পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে আবার সচেতন হ'ল সে। চতুর্দিকে মানুষের ভিড়, নানারকম মানুষ। রিকশায়, ট্যাক্সিতে, বাসে, ট্রামে, নানা ধান্দায় চলেছে। অনেকদিন আগে এক ডাক্তার বন্ধুর ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোস্কোপে এক ফোঁটা ব্যাকটিরিয়ার ইমালশান্ দেখেছিল সে। সেই ছবিটা মনে পড়ল হঠাৎ। কোনও এক বিরাট মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে' আমাদেরও দেখছে নাকি কোনও অদৃশ্য চক্ষু ? মোড়ের একধারে একটা ভিখারী বসেছিল। তার পাশে যে শিশুটা বসেছিল সেটা কেঁদে উঠল হঠাৎ। সমস্ত কলরব ছাপিয়ে তার কান্নাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। বিরাট জনতার দুর্নিবার স্রোত ক্ষণিকের জন্য মন্থর হ'য়ে গেল যেন। পয়সা দেবার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিবস অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল, মনিব্যাগ ফেলে এসেছে। কাছেই একজন ভদ্রলোক বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ; তিনি পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে' হাত ঢুকালেন তাতে, হাত বার করলেন

আবার, ব্যাগটা ফাঁক করে' ঝুঁকে দেখলেন একটু, আবার হাত ঢোকালেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে', তারপর একটা পয়সা বার করে' দিলেন ভিখারীটাকে। সঙ্গে সঙ্গেই 'বাস' এসে গেল তাঁর। বাসে স্থান নেই, লোক ঝুলছে। তবু নিজের হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে প্রায় ছুটে এগিয়ে গেলেন তিনি এবং বহু যাত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও উঠে পড়লেন 'বাস'টায়, গুঁজে দিলেন যেন নিজেকে ওই ভিড়ের মধ্যে। দিবসের মনে হ'ল আপিসের কেরানী বোধ হয়, 'লেট' হ'য়ে গেছে। 'বাস' চলে' গেল। আবার একটা 'বাস' এল, ঠিক তেমনি ভিড়। নানারকম মুখ চোখে পড়ল আবার। কারও মুখে বিড়ি, কারও সিগারেট, কারও পান, কারও হাসি, কারও বিরক্তি। কেউ ভিড় থেকে আত্মরক্ষা করছে কেবল। সেই ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ কত রকম লোক। নিজের অতীত জীবন থেকে চ্যুত হ'য়ে দিবস সহসা যেন আগন্তুক হ'য়ে পড়েছে। আগন্তুকের দৃষ্টি নিয়ে দেখছে যেন অপরিচিত জনতাকে। সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখছে। সবাই কেরানী? অস্বীকার করতে পারলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু অস্বীকার করতে পারল না। হাঁ, অধিকাংশই কেরানী, অধিকাংশই দরিদ্র, অধিকাংশই অসুখী। বন্দীর দল। এক জেল থেকে চলেছে আর এক জেলে। সত্যিকার পরিশ্রম করতে হয় অপারগ, না হয় অনিচ্ছুক। শৌখিনতা বজায় রেখে' যতটা হয় তার বেশি কিছু কিছুতে করবে না কেউ। পাখার তলায় চেয়ারে বসে' অধস্তন কর্মচারীদের উপর চোখ রাঙিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের খোশামোদ করে' দশটা পাঁচটা কলম পিষে যা হয় তাতেই খুশী সবাই। ওই কলম পিষে কেউ পাচ্ছে পঞ্চাশ, কেউ পাঁচশ', কেউ আরও বেশী। আরও বেশীর দলে মুষ্টিমেয় লোক, কিন্তু ওই আলেয়াই মুগ্ধ করে' রেখেছে অধিকাংশকে। সবাই কেরানী হবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু সবাই ছুটেছে, যারা উপযুক্ত তারাই হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে ভিড়ে। ঘুষ-খোশামোদ-তদ্বির-সুপারিশের খানা-খন্দ-জলা-নালায় নাকানি-চোবানি খেতে খেতে হিংসা-কলহে

জর্জরিত হ'য়ে ওই দুর্লভ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে সবাই ছুটে চলেছে। ওরা স্বাধীন শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত থাকত যদি, তাহ'লে শুধু যে বেশী রোজগার করতে পারত তা নয় দেশের চেহারাও বদলে দিতে পারত। কিন্তু তা করবে না কেউ। অন্যমনস্ক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ অনুভব করল—খিদে পেয়েছে, খুব খিদে পেয়েছে এবং পরমুহূর্তেই মনে পড়ল যে সঙ্গে একটি পয়সা নেই। এই সমস্তর অন্তরালে কিন্তু আর একটি প্রশ্ন সর্বদা জাগছিল তার মনে—কি করবে, কি করবে এখন, এখনই কিছু আরম্ভ করা দরকার, কিন্তু কি সেটা,—।

"আরে দিবু যে, এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে?"

অপ্রত্যাশিতভাবে অকূলে কূল পেল এ জাতীয় মনোভাব হ'ল না দিবসের। অত্যন্ত প্রত্যাশিত যেটা সে খুঁজছিল এতক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে সেইটেই পেয়ে গেল যেন। একটা ট্রাম থেকে কিরণ কথা বলল, ট্রাম চালাচ্ছিল সে। কিরণের সঙ্গে দিবসের বন্ধুত্ব ছিল এবং বন্ধুত্ব ছিল বলেই খুঁটিনাটি অসংখ্য বিষয়ে মতের অমিল ছিল। অর্থাৎ বন্ধুত্ব ছিল বলেই অমিলগুলো প্রকট হবার সুযোগ পেয়েছিল। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকে না তাদের সঙ্গে আমরা মৌখিক ভদ্রতা করি, তাদের কথায় সায় দিয়ে স্বল্প পরিচয়ের আবরণে আত্মরক্ষা করি, কারণ সকলের সঙ্গে মতের অমিল নিয়ে তর্ক করবার সময় বা সামর্থ্য সকলের নেই। কিরণের সঙ্গে দিবসের বন্ধুত্ব ছিল বলেই ভয়ও ছিল কিরণ তার এ আচরণ সমর্থন করবে না হয়তো। তা' ছাড়া আর একটা ব্যাপারও ছিল। বৈজ্ঞানিক দিবসের কথায়-বার্তায় আচরণে যেমন মনে হ'ত সে কবি তেমনি কবি কিরণের ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হ'ত সে যেন বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেক জিনিসের চুলচেরা বিচার করে' মূল্য-নির্ধারণ করাই যেন তার স্বভাব। আসলে উভয়েই ছিল যুগপৎ কবি এবং বৈজ্ঞানিক, (কবি আর বৈজ্ঞানিক

যে একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ তা কে না জানে) কিন্তু দিবসের বাইরেটা ছিল কবি, কিরণের ঠিক ছিল তার উলটো। তাই দিবসের ভয় করছিল যে কিরণ হয়তো—।

দিবস তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ট্রামটাতে।

"আমাকে কিছু পয়সা দে তো। পয়সা আছে সঙ্গে তোর ?"

কিরণ ব্যাগটা বার করলে।

"ব্যাগটাই আমাকে দে।"

"কি হয়েছে বল্ তো ?"

কিরণ কিন্তু কথা শেষ করতে পারলে না। কণ্ডাক্টার ঘণ্টা দিলে, দিবস লাফিয়ে পড়ল ট্রাম থেকে, ফুটপাথে এসে চেঁচিয়ে বলল, "পরে বলব সব, ডিউটির পর তোর বাড়ি যাব।"

মিনিট খানেকের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল। ট্রাম চলে' গেল। এবং তারপর দিবস যন্ত্রচালিতবৎ ঢুকল গিয়ে সামনের চায়ের দোকানটায়।

"দেখ, একটা কিছু নিয়ে নাটক করে' তুলতে না পারলে বাঙালী তৃপ্তি পায় না। আমার মনে হচ্ছে তোমাকেও সেই নাটকের নেশায় পেয়েছে। বাবার সঙ্গে এমনভাবে ঝগড়া করে' চলে' আসার আর কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

"ঝগড়া করে' চলে' এসেছি অবশ্য, কিন্তু ঝগড়াটাই বড় নয়, আদর্শটাই বড়। আদর্শবাদীকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। আমার আচরণকে নাটকীয় বলে' তুমি যদি ঠাট্টাই কর তা-ও সহ্য করতে হ'বে আমাকে।"

"তোমার আদর্শটা কি, তাইতো ভাল বুঝতে পারছি না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থোপার্জন করাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তাহ'লে ওকালতি কি দোষ করলে ? তোমার বাবাকে কি কম মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে ? তুমিও ইচ্ছে করলে ফেলতে পার।"

"আমার মতে সরল পরিশ্রম করে' সকলেরই রোজগার করা উচিত। যে ব্রাহ্মণত্ব সমাজের প্রাণ তাকে পেশায় পরিণত করলে তা প্যাঁচ হ'য়ে দাঁড়ায়। বিদ্যে-বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে' কাউকে পীড়ন করবার ইচ্ছে নেই আমার।"

"কিন্তু সরল পরিশ্রম বলতে যা বোঝায় তা কি পারবে তুমি? অ্যাটমিক কেমিস্ট্রির অনন্ত সম্ভাবনার আকাশে উড়ে' বেড়াচ্ছে তোমার মন—"

"কি চাই বাবু আপনার?"

চায়ের দোকানদার রাখহরির কথায় আত্মস্থ হ'ল দিবস। এতক্ষণ সে কল্পনায় কিরণের সঙ্গে তর্ক করছিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে দোকানের মালিক রাখহরি মল্লিক ঘরের একধারে নিজের ক্যাস বাক্সটি আগলে বসে' আছেন। তাঁর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। লম্বা টেবিলটার একপ্রান্তে নিবিষ্ট চিত্তে আহার করছেন আর একটি ভদ্রলোক। আরও জন দুই চা খাচ্ছে।

"আমাকে এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট দিন।"

রাখহরি পরদাবৃত দরজাটার দিকে চেয়ে হাঁকলেন—"একটা চা, দুটো টোস্ট"—তারপর দিবসের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "অমলেট?"

"বেশ অমলেটও দিতে বলুন।"

"সিংগিল না ডবল?"

"ডবল।"

রাখহরি আবার সেই পরদাবৃত দ্বারটার উদ্দেশে ফরমাশ প্রেরণ করলেন—"ডবল ডিমের অমলেট একটা—"

দিবসের মন অ্যাটমিক কেমিস্ট্রির অনন্ত সম্ভাবনার আকাশেই উড়ে' বেড়াচ্ছিল। তখনই সে ঠিক করে' ফেললে সেই সায়েব প্রফেসারটিকে চিঠি লিখবে। অন্য কিছু নয়, তার সমস্ত স্বপ্ন যে ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে এই কথাটি তাঁকে জানিয়ে দেবে শুধু। ওই বিদেশী

অধ্যাপককে হঠাৎ তার অত্যন্ত আপনজন বলে' মনে হ'ল। মনে হ'ল ওই ব্যক্তিটাই আসল দিবস চৌধুরীকে চিনেছিল। হঠাৎ উঠে পড়ল সে। রাখহরির দিকে চেয়ে বললে—"আমি আসছি এখনই" —এবং বেরিয়েই সামনের একটা দোকান থেকে কিছু খাম আর চিঠি লেখার একটা প্যাড কিনে নিয়ে ঢুকল।

চা টোস্ট অমলেট শেষ করে' দোকানদারকে দাম চুকিয়ে দিয়ে বললে—"আপনার এখানে বসে' একটা চিঠি লিখতে পারি কি ?"

"নিশ্চয়"—একমুখ হেসে সম্মতি দিলেন রাখহরি।

দিবসের পকেটে ফাউন্টেন পেন ছিল। চিঠি লিখতে লাগল সে। মনের আবেগে লিখে যেতে লাগল পাতার পর পাতা। রিসার্চের যে-সব কথা নীহারিকার মতো মনের গহনলোকে ভেসে' বেড়াচ্ছিল শত সৌরলোকের সম্ভাবনা নিয়ে, যে-সব স্বপ্ন কখনও সফল হ'বে না আর তারই কাহিনী লিখতে লাগল সে তন্ময় হ'য়ে।

চিঠিটা শেষ করে' যখন খামে পুরছে তখন মহেন্দ্র কুণ্ডু এসে ঢুকলেন এবং এসেই রাখহরিকে প্রশ্ন করলেন, "কি হে, লোকটা টাকা দিয়ে গেছে ?"

কুণ্ডুমশায়ের এই নিতান্ত গদ্যময় প্রশ্নেও হাসি ফুটল রাখহরির মুখে। দোকানদারি করে' করে' হাসিটা পোষা হ'য়ে গেছে তাঁর।

"কই না, সে আসে নি তো !"

মহেন্দ্র কুণ্ডু একটা চেয়ার টেনে' বসলেন এবং মুখটাকে ছুঁচলো করলেন। ছুঁচলো করেই বসে' রইলেন অনেকক্ষণ। মস্তিষ্কে চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হ'লেই মুখটা ছুঁচলো হ'য়ে যায় তাঁর।

"বাড়িতে তালা মেরেই চলে' যাই তাহ'লে, কি বল ? আজ আমাকে দেওঘর যেতেই হ'বে, কাল জয়েনিং ডেট্।"

রাখহরি, আর একটু হেসে, সমর্থন করলেন প্রস্তাবটি।

"তাই যাও, চাবিটা আমার কাছে রেখে' যেও। যদি পারি

ভাড়াটে যোগাড় করব। খোলার হ'লেও ভাড়াটে জুটে যেত, কিন্তু তোমার ঘরখানা একেবারে বে-মেরামত যে। তার উপর চারদিকে ড্রেন। পাড়াটাও সুবিধার নয় তো—"

মহেন্দ্র কুণ্ডু মুখ ছুঁচলো করে' শুনলেন, তারপর স্বাভাবিক মুখ করে' উত্তর দিলেন।

"না হে, সেদিন আর নেই। সদি আছে অবশ্য, কিন্তু সদিরও আর সেদিন নেই।"

আর একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করে' রাখহরি প্রথমোক্ত অসুবিধাগুলির উপর আর এক পোঁচ রং চড়াবার প্রয়াস পেলেন, অবশ্য আর একটু হেসে।

"তোমার আর একটা ফ্যাচাং আছে যে—হাঁসটা। ওটাকে বেচে দাও, বুঝলে? আমাকেই দাও, নগদ পাঁচ টাকা দিয়ে দিচ্ছি।"

"কি করবে তুমি?"

"রোস্ট্।"

"না ভাই, তা পারব না। ও হাঁসটি আমার স্ত্রীর স্মৃতি। দেওঘরে এখন কোয়ার্টার পাব না, তাই ওটাকে নিয়ে যেতে পারছি না। কোয়ার্টার পেলেই নিয়ে যাব।"

দিবস ভ্রূকুঞ্চিত করে' শুনছিল এদের কথাবার্তা। সে হঠাৎ কথা কয়ে' উঠল।

"আমার একটা ঘরের দরকার ছিল।"

তড়িদ্বেগে ফিরে বসলেন মহেন্দ্র কুণ্ডু।

"বেশ তো, নিন না আমার ঘরখানা।"

রাখহরি মল্লিক ঘরটাকে কেন্দ্র করে' গোপন মতলব ফেঁদেছিলেন একটা। তাতে বাধা পড়ায় মনে মনে তিনি বিব্রত হলেন একটু এবং একটু হেসে দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "খোলার ঘর কিন্তু।"

"তাতে আপত্তি নেই। ঘরটা কোথায়?"

"চিৎপুরে, একটি গলিতে।"

"ভাড়া কত?"

"ভাড়া মাসিক পনর টাকা"—মহেন্দ্র কুণ্ডু মুখ ছুঁচলো করলেন একবার—তারপর বললেন, "তবে যদি আপনি আমার হাঁসটাকে রাখেন কিছু কম হ'বে। তিনমাসের ভাড়া অগ্রিম চাই কিন্তু—"

"বেশ"—দিবস একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই যে প্রশ্নটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তাতে মহেন্দ্র কুণ্ডুর মুখ ছুঁচলো হ'য়ে গেল আবার।

"কাছাকাছি শালের ভালো দোকান আছে কোনও আপনার জানাশোনা?"

"শালের দোকান? শালের দোকানের অভাব কি?"

"চলুন তাহ'লে বেরোন যাক। আমাকে ব্যাংকটা হ'য়ে যেতে হ'বে একবার।"

"বেশ চলুন।"

বেরিয়েই সে আগে পোস্টাফিসে গিয়ে পোস্ট করে' দিলে চিঠিখানা লণ্ডনের উদ্দেশে। প্রফেসারের ঠিকানা তার জানা ছিল। বেশী টিকিট দিয়ে দিলে, যাতে 'এয়ার মেলে' যায়। চিঠিটা পোস্ট করে' অদ্ভুত আরাম পেলে সে একটা যেন, ভগবানের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করে' আশু ফললাভের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও, কেবল অর্ঘ্য নিবেদন করে' যে তৃপ্তি পায় লোকে সেই ধরনের তৃপ্তি সে পেলে যেন।

ঠিক এই ধরনের তৃপ্তি কিরণও পেলে যখন এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপোতে তার মনের ভাবটা প্রথম ভাষা পেল তার কবিতার প্রথম চরণ দুটোতে। গুনগুন করে' এল যেন কথাগুলো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো কোনও অজানা আকাশ থেকে, রেখে' গেল ছন্দ-মিলের পশরা।

অন্ধকারে পথ হারাল যারা
তারাই কি গো আকাশ-ভরা-তারা

এস্‌প্ল্যানেডে ট্রামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিচিত্র জনতার কলরবের মধ্যে কিরণ প্রতীক্ষা করতে লাগল মনে মনে, আবার কখন আর একদল ভ্রমর আসবে। কবিতাটা লিখে ঊর্মিকেই দিতে হ'বে। গহনচাঁদবাবুর মেয়ে রঙ্গনা তার গানে সুর দিয়ে দেবে, সেই গান রেকর্ড হবে···ঊর্মির আশা কত! গহনচাঁদবাবু এখানে এসে 'সঙ্গীত ভবন' খুলেছেন, এটা সুসংবাদ নিশ্চয়ই। তার বাঁশী শেখার ইচ্ছে খুবই, কিন্তু মাসিক দশ টাকা খরচ করে' (এই বেতনই চুনীবাবু ধার্য করেছেন নাকি) বাঁশী শেখবার সামর্থ্য তার নেই। তবে যদি টিউশনি যোগাড় করতে পারে একটা—এই প্রসঙ্গে ঊর্মির সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা মনে পড়ল কিরণের। ঊর্মি দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলেছিল, "আমি যদি টিউশনি যোগাড় করে' দিতে পারি আমাকে কি দেবেন বলুন?"

"সিনেমা দেখাব একদিন।"

"একদিন মোটে?"

"বেশ দু'দিন।"

"ফার্স্ট ক্লাসে যাব কিন্তু!"

"বেশ!"

"সেতার শেখাতে পারবেন একটি মেয়েকে?"

"অনায়াসে।"

"মাসে পনর টাকার বেশি দেবে না কিন্তু।"

"বেশ।"

"কাল খবর পাবেন তাহ'লে।"

ঊর্মি শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোয় দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে। ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল তার অপেক্ষায়। ঊর্মির চেহারাটা মনে পড়ল। দেখতে সুশ্রী নয়, রোগা, কালো চেহারা। কপালের

ছু'পাশে অতি সূক্ষ্ম কোঁকড়ানো কয়েক গোছা অলক কিন্তু অপরূপ শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে তার মুখে। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তার অন্তর্নিহিত রূপও যেন ফুটে উঠেছে ওই অবিরাম নর্তনশীল অলকগুচ্ছে। তার চোখ ছুটো ছোট, কিন্তু সেই চোখের কালো তারায় যখন আলো চিকমিক করে' ওঠে হাসির আভায় রঙীন হ'য়ে, অলকগুচ্ছের নর্তনের সঙ্গে তাল রেখে' তখন চোখের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের কথা মনে থাকে না। বাপ-মা-মরা মেয়ে, অযত্নে লালিত হচ্ছিল নাকি মাসির বাড়িতে, হঠাৎ তার মনে সুরের নেশা জাগল কি করে' সে খবর কিরণ জানে না। এইটুকু শুধু জানে ও বে-পরোয়া। যে সমাজ তার জন্যে এতটুকু মাথা ঘামায় নি সে সমাজের কিছু তোয়াক্কা করে না ও। সব রকম সমালোচনাকে তুচ্ছ করে' যা খুশি করবার সাহস আছে ওর। নিজেই এসেছিল একদিন তার কাছে ধূমকেতুর মতো। এসে বলেছিল—"আপনি শুনেছি ভাল সেতার বাজাতে পারেন। আমাকে শেখাবেন একটু? আমি কিন্তু কিছু দিতে পারব না।" সেই থেকেই ওর সঙ্গে পরিচয়। সুরের মাধ্যমে যে পরিচয়টা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে, ভৈরবীতে আশাবরীতে সারংয়ে ইমন-কল্যাণে বেহাগে বাগেশ্রীতে সে পরিচয়টা কিন্তু সামাজিক পরিচয় নয়। সামাজিক পরিচয় ঊর্মি দিতে চায় না। অনেক পীড়াপীড়ি করবার পর বলেছিল কেবল ওইটুকু। বাপ-মা-মরা, মাসির বাড়িতে ছেলেবেলাটা কেটেছে মাসতুত ভাই-বোনেদের সেবা করে' আর বাসন মেজে। এর বেশি আর কিছু বলে নি, কিরণও আর আগ্রহ প্রকাশ করে নি।

সামনে যে ট্রাম গাড়িটা লাইনচ্যুত হওয়াতে তার গাড়িটা আটকে পড়েছিল সেটাকে ঘিরে বেশ ভিড় হয়েছে একটা। তার পিছনে বয়ে' চলেছে জনস্রোত। জীবন-যুদ্ধ? সকলেরই কি যোদ্ধৃবেশ? হঠাৎ তার মনে হ'ল পথ হারিয়ে ফেলেছে এরা। পথ হারিয়ে অন্ধকার অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্ধ জোনাকীর দল যেন।

প্রত্যেকেরই দীপ্তি আছে, কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করছে কেবল, এদের ব্যর্থতার ইতিহাস কি ছন্দে গাঁথবে না কোন কবি? ঝংকৃত হ'য়ে উঠবে না কি তা অন্ধকারে শিহরণ তুলে? হয়তো অন্ধকারেই তাদের ইতিহাস লেখা হচ্ছে অলক্ষ্যে। আবার এল সেই বাণী ভ্রমরের দল অজানা আকাশ থেকে, গুনগুনিয়ে শুনিয়ে গেল—

আলোয় যারা কোনও খানেই নাইরে
তাদের কি গো আঁধার মাঝে পাইরে
সব নাগালের বাইরে
পথ পেল কি সকল পথহারা।

এই লাইনগুলো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘড়ি দেখলে। অর্থাৎ অধীর হ'য়ে উঠল। বাড়ি না পৌঁছনো পর্যন্ত তো কবিতাটা লেখা যাবে না। কথাগুলোকে কাগজে বন্দী না করা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। কবিতাটা লিখে···এর পরই দিবসের কথা মনে পড়ল তার, কারণ ঊর্মি ও দিবস ছাড়া আর কোন পাঠক নেই তার কবিতার। দিবস হঠাৎ অমনভাবে এসে ব্যাগটা চেয়ে নিয়ে গেল কেন? সিনেমা দেখতে গেল নাকি কোনও দুপুরের শো'য়ে? হঠাৎ রাস্তায় বিজ্ঞাপন দেখেছে হয়তো, সঙ্গে পয়সা ছিল না। ভ্রূকুঞ্চিত করে' চাইলে সে দেওয়ালগুলোর দিকে। কোনও ভালো সিনেমার বিজ্ঞাপন দিয়েছে না কি?

গলির গলি তস্য গলির মধ্যে নিজের শতজীর্ণ খোলার ঘরে দিবসের মতো ছেলেকে নিয়ে গিয়ে কুণ্ডুমশায় নিজেই অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলেন একটু। দিবস ছেলেটি যে সাধারণ ছেলে নয়, অন্তত তাঁর খোলার ঘরে ঠিক যে ওকে মানাবে না তা মহেন্দ্র কুণ্ডু বুঝেছিলেন। সঙ্গে চেক বই ছিল না, অথচ ব্যাংকের কেরানীর সঙ্গে একটু হেসে কথা কয়েই ও স্বচ্ছন্দে টাকাগুলি বার করে' নিলে। মহেন্দ্র কুণ্ডু পারতেন না। তাঁর বেলায় নানা বখেড়া

তুলত ওই কেরানীটাই। এ রকম ছেলে তাঁর খোলার ঘর ভাড়া নিচ্ছে কেন এ ঔৎসুক্য তাঁর যে হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু সেটাকে আমল দিতে চাইছিলেন না তিনি ভাড়াটা হস্তগত করবার পূর্বে। দিবস ঘরটা দেখছিল। তার চোখের দিকে চেয়ে আরও কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন মহেন্দ্র কুণ্ডু।

"ঘরখানা অবশ্য একটু বে-মেরামত আছে, তবে আমার দেওঘরের চাকরিটা যদি পাকা হ'য়ে যায় আর আপনি যদি বরাবর থাকেন, তাহ'লে সব ঠিক করে' দেব আমি। এখন কোনও অসুবিধা হ'বে না আপনার, বর্ষাকাল হ'লে অবশ্য—"

"ওই চৌকিটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে আপনিও ব্যবহার করতে পারেন ওটা।"

"আপনার হাঁস কোথা?"

"ওই যে"—খোলা দ্বার-পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে' দেখালেন। হাঁসটা উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাজহাঁস একটা।

"ওটাকে দেখবেন একটু"—মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন কুণ্ডুমশায়। কণ্ঠস্বরে যে আন্তরিকতা ফুটল তাতে দিবস বিস্মিত হ'ল বেশ,—"কিছুই করতে হ'বে না আপনাকে, সকাল-বিকেল চারটি চারটি ধান দেবেন আর সদিকে দু'চারটে পয়সা দেবেন মাঝে মাঝে গুগলি এনে দেবে।"

"সদি কে?"

"আপনার পাশেই থাকে। সদি, ও সদি—" উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করেই নিরস্ত হলেন না মহেন্দ্র কুণ্ডু, ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে ডেকে আনতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পা বাড়াবামাত্র সদির কাংস্যকণ্ঠ শোনা গেল।

"কি গো, কি বলছ?"

কুণ্ডুমশায়ের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বর মোলায়েম হ'য়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

"একবার এদিকে এস না—"

কুণ্ডুমশায়ের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বর মোলায়েম হ'লেও সদির বিষয়ে বর্তমানে তাঁর মনোভাব খুব মোলায়েম ছিল না। 'তুমি ভাড়াটে যোগাড় না করে' ঘরটি নিজেই ভোগদখল করবে ভাবছিলে কিন্তু আমি দেখ ভাড়াটে যোগাড় করে' এনেছি—এই ধরনের একটা টেক্কা-দেওয়া ভাব মনে জাগছিল তাঁর।

"কি বলছ গো?"

প্রবেশ করল সৌদামিনী। এ সৌদামিনীর সঙ্গে আকাশের সৌদামিনীর সাদৃশ্য কোনও কালে ছিল কি না জানি না, এখন কিন্তু নেই। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া বস্তিবাসিনী সে। বস্তিজীবনের সমস্ত রকম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে' অপমানিত নারীত্বের 'আহা কি দুর্দশা হয়েছে' কথায় কথায় এরকম খেদোক্তি করা যাঁদের স্বভাব, সৌদামিনীর মধ্যে তাঁরা কবিত্ব করবার বেশী মাল-মশলা পাবেন না। সৌদামিনীর হাব-ভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চিহ্নমাত্র নেই, তার নারীত্বও যে মোটেই অপমানিত হয় নি এ চিহ্নও তার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। ড্রয়িং-রুম-মার্কা বা গৃহলক্ষ্মী-ছাপ-দেওয়া কতকগুলি অর্ধমৃত নারীর অস্বাভাবিকতাকেই নারীত্ব আখ্যা দিয়ে যাঁরা তৃপ্তি পান অথবা যাঁরা স্বেচ্ছাচারের অসংযমের মধ্যেই কেবল নারীত্বের বিকাশ দেখে পুলকিত হন, তাঁরা সৌদামিনীর আসল রূপটি দেখতে পারেন কি না সন্দেহ। তাঁরা রূপ-রসিক নন, লেবেল-রসিক। ব্র্যাণ্ডির-বোতলে-পোরা রঙীন জল খেয়েই নেশায় মত্ত হ'য়ে যাবার ক্ষমতা আছে তাঁদের। এঁরা মানুষটাকে দেখেন না, জাত কুল কোষ্ঠি দেখেন। এঁদের বিচারে বস্তিটাই বড় হ'য়ে ওঠে, বাদ পড়ে' যায় সৌদামিনী।

মনিবকে দেখলে দুষ্কর্মরত ভৃত্যের মুখভাব যেমন হয়, মহেন্দ্র কুণ্ডুরও মুখভাব তেমনি হ'য়ে উঠল সৌদামিনীকে দেখে। সৌদামিনী সেটা লক্ষ্য করলে না, লক্ষ্য করবার প্রয়োজন নাই তার। তার ট্রেন

মহেন্দ্র কুণ্ডু নামক স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল বটে কিছুক্ষণ কিছুকাল আগে, কিন্তু সে স্টেশন বহুদিন সে ছেড়ে এসেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি আর তার নেই। এই খোলার ঘরটা মহেন্দ্র কুণ্ডু তাকে দেবে বলেই কিনেছিল, কিন্তু দেয় নি। এ নিয়েও কোনও দিনই মাতামাতি করে নি সে। বরং মহেন্দ্র কুণ্ডু পরে যখন বিয়ে করে' এইখানেই তার চিররুগ্ন স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এল, তখন সৌদামিনী সেবাই করেছিল তার স্ত্রীর। এখনও তার হাঁসটার দেখাশোনা সৌদামিনীই করে। পুরুষদের সে চেনে, ভাল করেই চেনে, সেই জন্যে রাগ নেই তার কারও উপর। মহেন্দ্র কুণ্ডু কিন্তু সৌদামিনীকে দেখলেই তটস্থ হ'য়ে পড়েন।

"এই বাবুটি আমার এই ঘরখানা ভাড়া নিচ্ছেন"—হাত কচলে কাচুমাচু ভঙ্গীতে বললেন কুণ্ডুমশায়—"হাঁসটাও এইখানেই রইল। একটু দেখাশোনা কোরো, বুঝলে, আমি দেওঘর চলে' যাচ্ছি আজই।"

"বেশ।"

সৌদামিনী মাথার কাপড়টা একটু টেনে, আঁচলটা গায়ে ভাল করে' জড়িয়ে ভব্য হবার চেষ্টা করলে একটু।

"বাবু তোমাকে পয়সা দেবেন, গুগ্‌লি-টুগ্‌লি এনে দিও, বুঝলে?"

"বেশ তা দেব" তারপর দিবসের দিকে চেয়ে বেশ ভদ্রভাবেই বললে, "যা যখন দরকার হ'বে বলবেন আমাকে, আমি পাশেই আছি"—বলে' ঈষৎ হেসে চলে' গেল।

দিবসের শরীরটা সেখানে দাঁড়িয়েছিল বটে কিন্তু মনে মনে সে ফিরে গিয়েছিল বাড়িতে: তার বাবার কাছে, ব্রজর কাছে। বিঘ্ন-লেশহীন আবেষ্টনীতে নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির তথ্য আহরণ করে' অথবা সরোদ আলাপ করে' এমন কি উকীল হ'য়েও যে নির্ঝঞ্ঝাট মধ্যবিত্ত জীবন সে যাপন করতে পারত তার থেকে স্বেচ্ছায় চ্যুত

হ'য়ে হঠাৎ এই খোলার ঘরে এসে মহেন্দ্র কুণ্ডুর হাঁসের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হ'তে তার আপত্তি ছিল না (এক নজর দেখে সৌদামিনীকেও তার ভাল লেগেছিল)—কিন্তু এই ছবির মধ্যে বাবা আর ব্রজ যদি থাকত, অযৌক্তিকভাবে মনে হ'ল তার এবং হঠাৎ রাগ হ'ল তারপর! কেন বাবা তাকে এমনভাবে বাধা দিলেন? ডিম ভেঙে যে পক্ষী-শিশু বেরিয়েছে, যার পালক গজিয়েছে, যে উড়তে শিখেছে সে কোন্ ডালে কতক্ষণ বসবে এরকম উদ্ভট ফরমাশ কোনও পক্ষী-পিতা করে না তো, কিন্তু,—সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হ'ল, পক্ষী-শিশু যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় তখন বাপ-মার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে কি তার? তার কি মন কেমন করে? এই মন কেমন করার মাধুর্য-রসে তলিয়ে গেল তার সমস্ত চিত্ত পরমুহূর্তে। যাদের কাছে আর সে ফিরে যাবে না, যেতে পারবে না, তাদের জন্যই আকুল হ'য়ে উঠল তার অন্তর, আর আকুল হ'য়ে উঠল বলেই মনুষ্যত্বের একটা সূক্ষ্ম আনন্দ রসায়িত করে' তুলতে লাগল তার বেদনাকে, তার অজ্ঞাতসারেই।

"ভাড়াটা দিয়ে দিন তাহ'লে, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক। টিকিট, রসিদ বই সব সঙ্গে আছে আমার।"

কোটের বোতাম খুলে ভিতরের ফতুয়ার পকেট থেকে ছোট একটি রসিদ বই বার করলেন মহেন্দ্র কুণ্ডু।

"উনচল্লিশ টাকা তো?"

"ওটা পুরোপুরি চল্লিশই করে' দিন, চৌকিটাতো ব্যবহার করবেন?"

"বেশ।"

চৌকিটার উপর দিবস অনেকক্ষণ বসেছিল একা চুপ করে'। সৌদামিনীর কথায় তার চিন্তাধারা মোড় ফিরল হঠাৎ।

"আপনার জিনিসপত্তর কই?"

"আনব, কিনে আনতে হ'বে সব।"

"ভাল দেখে ফুল-ঝাড়ু আনবেন তাহ'লে একটা। ভাল করে' পরিষ্কার করে' দেব ঘরটা। আপাতত আমার যেটা আছে সেইটে দিয়েই দিচ্ছি।"

"ও আচ্ছা।"

আর কিছু না বলে' দিবস উঠে বেরিয়ে চলে' গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে হাঁটতেই লাগল সে। যে-সব জিনিস কেনবার জন্যে সে বেরিয়েছিল, এখানে থাকতে গেলে যে-সব জিনিস তাকে কিনতেই হ'বে অবিলম্বে, সে-সবের দোকান একের পর এক অনেকগুলো পেরিয়ে গেল। যে নিঃসঙ্গতা কেবল ভিড়ের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব তার মধ্যেই মুক্তি পেয়েছিল সে খানিকক্ষণের জন্যে এবং খানিকক্ষণের জন্য বোধ হয় নিঃসঙ্গচারী গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতুর ধর্মও লাভ করেছিল, যে ধর্মের মূল প্রেরণা গতি, উদ্দেশ্য নয়। কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল এবং যার অসম্পূর্ণ ইতিহাস তিনি ছন্দে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করে' গেছেন (কারণ নিরুদ্দেশ যাত্রার সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা যায় না) সে রকম নিরুদ্দেশ যাত্রা আমরা সবাই করি মাঝে মাঝে কিন্তু জানতে পারি না। ঠিক এই সময় দিবস যে বস্তুনিচয়কে অতিক্রম করে' যে পথে দ্রুতবেগে চলেছিল, তার বর্ণনা নানা প্যাটার্নের বাড়ি, মানুষ, ডাস্টবিন, চিঠি ফেলবার বাক্স, টেলিগ্রামের খাম, দোকান, রিক্শা, ট্রাম, 'বাস' নয়,—তার বর্ণনা, (যদি তা বর্ণনা করা আদৌ সম্ভব হয়), মহাশূন্যের অসীম ব্যাপ্তি, দূরে দূরে খদ্যোতপুঞ্জের মতো জ্বলমান শত সহস্র সৌরলোক, মন ছুটে চলেছে সেই দেশের উদ্দেশে যেখানে সবই অপার্থিব, যেখানে আলোক ভেঙে পড়েছে সপ্ত বর্ণে নয়, সহস্র বর্ণে,' ছায়াপথের অজ্ঞাত জ্যোতিষ্কপুঞ্জ যার নাগাল পাওয়ার জন্যে স্পন্দিত হচ্ছে আগ্রহতরঙ্গের অবর্ণনীয় ছন্দে ।

"দিবুদা যে—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দিবস পরেশের ডাকে। স্কুলে কলেজে যে অসংখ্য ছেলেদের সঙ্গে মুখচেনা হয় কিন্তু অন্তরঙ্গতা থাকে না, পরেশ সেই পরিচিত-অথচ-অপরিচিত গোষ্ঠীর একজন। দিবসের চেয়ে নিচের ক্লাসে পড়ত পরেশ।

"কি খবর, অনেক দিন পরে দেখা," পরেশই হেসে বললে আবার।

বলবার মতো অনেক খবর ছিল, কিন্তু সে-সব খবর পরেশকে বলা যায় না। মনের নেপথ্যলোকে যে সমস্যাটা বিব্রত করছিল তাকে সেইটেই বাঙ্ময় হ'য়ে উঠল হঠাৎ প্রশ্নাকারে।

"কোনও একটা কাজের খোঁজ দিতে পার ভাই ?"

"ও ! কি কাজ, পড়া ছেড়ে' দিয়েছেন নাকি ?"

"হ্যাঁ, যে-কোনও কাজ"—তারপর একটু হেসে—"কেরানীগিরি ছাড়া।"

দিবসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখে' পরেশ মনে মনে হাসলে।

"আমি কিন্তু একটা কেরানীগিরি পেলেই বেঁচে যাই। দরখাস্ত করেছি কয়েক জায়গায়। ও হ্যাঁ তা"—হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে পরেশ একটা কাগজ বার করলে।

"প্রাইভেট ট্যুশনির খবর দিতে পারি কয়েকটা। আমি চেষ্টা করেছিলাম, হয় নি। আপনার হ'য়ে যেতে পারে। ওটা রেখে' দিন আপনার কাছে। চেষ্টা করুন একে একে, যেটা লেগে' যায়।"

প্রাইভেট ট্যুশনি যে কেরানীগিরির চেয়ে মহত্তর পেশা এ মোহ দিবসের থাকবার কথা নয় কিন্তু তবু সে হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে পকেটে পুরল তার কারণ শুধু যে সে অন্যমনস্ক ছিল তা নয়, অল্প-পরিচয় পরেশের কাছে নিজের মতবাদটা (যা খুব মৌলিকও নয়) আস্ফালন করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। বাবার কাছে আস্ফালন করেই যথেষ্ট অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিল সে।

"আচ্ছা চলি"—পরেশের 'বাস' এসে পড়ল পরমুহূর্তেই। দিবসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। ফাঁক পড়ল তার চিন্তাধারায়। আর সেই ফাঁক দিয়ে হুড়মুড় করে' ঢুকে পড়ল—কাপড়, জামা, গামছা, গেঞ্জি, বিছানা, আলো, টেবিল, চেয়ার, ফুলঝাড় ·আসন্ন জীবনের অতি রূঢ় দাবির ফর্দটা।

তিন

উপর্যুপরি দু'দুটো নিদারুণ সংবাদ পেয়ে চুনীলালের মুষড়ে যাবার কথা। মুষড়ে হয়তো গিয়েছিলও। কিন্তু অন্নদা বিশ্বাসের কাছে তা প্রকাশ করে' ফেললে যে অদূর ভবিষ্যতে আরও মুষড়ে পড়বার কারণ ঘটবে, এটুকু অনুমান করতে তার পোড়-খাওয়া বুদ্ধির দেরি লাগে নি। তাই কথাটা শুনে সে ভ্রূ কুঁচকে দুই কুঞ্চিত ভ্রূর মাঝখানে টোকা মারতে লাগল এবং তারপর মসৃণ-ভ্রূ হ'য়ে উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে' অন্নদা বিশ্বাসকে হবু রাষ্ট্রভাষাতেই আশ্বাস দিলে—"কুছ পরোয়া নেই।"

একটু আগে গোবিন্দ সাণ্ডেল তাকে জানিয়ে গেছেন যে হরলাল সিংহি নালিশ ঠুকে দিয়েছে, নির্দিষ্ট দিনে টাকা দাখিল না করলে জেল অনিবার্য। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই চুনীলাল হরলালকে টাকা দিয়ে দিত। কিন্তু দেবার মতো টাকা তার নেই। কোনও কালেই ছিল না। টাকা রোজগার করবার উদ্দেশ্যেই সে ব্যবসা ফেঁদেছিল, কিন্তু, গোবিন্দ সাণ্ডেলের ভাষায়—বাঙালীর যা হয়— !

চুনীলালকে যাঁরা জুয়াচোর বা ঠক্ আখ্যা দেবেন তাঁদের সঙ্গে তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তর্ক করে' কারও মত বদলানো যায় না, আমার মতটা সত্য কি না তাও আমার জানা নেই,

চুনীলালের চরিত্রও সবটা আমি জানি না। কিন্তু যতটুকু জানি তাতে চুনীলাল-প্রসঙ্গ উঠে পড়লেই একটা ছবি আমার মনে পড়ে' যায়। স্বচক্ষে দেখেছিলাম ঘটনাটা। মাঝগঙ্গায় ডুবছিল একজন লোক। ডুবছিল বললে সবটা বলা হয় না। ফেনিল ঘূর্ণাবর্তের নিষ্ঠুর টানে তলিয়ে যাচ্ছিল অতলের দিকে অসহায়ভাবে। আমরা সবাই তীরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলাম। দর্শকদের মধ্যে একজন ধনী ছিলেন। তিনি আর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। বলে' উঠলেন—ওকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে, নগদ একশ' টাকা দেব তাকে। তড়াক করে' লাফিয়ে পড়ল একটা ছোকরা এবং সাঁতরে এগিয়ে যেতে লাগল তার দিকে। মজ্জমান লোকটির বিপন্ন হাতটা দেখা যাচ্ছিল শুধু মাঝে মাঝে। যে ছোকরা তাকে বাঁচাতে গেল সে কাছাকাছি হ'তেই কিন্তু ঘটল আর এক কাণ্ড। ডুবন্ত লোকটি এমনভাবে জাপটে ধরলে তাকে যে দুজনেই ডুবে গেল। কেউ বাঁচল না। উপচিকীর্ষু ব্যক্তিটি যদি মজ্জমান প্রথম ব্যক্তিকে অকৃতজ্ঞ বলে' পরলোকে গিয়ে তার নামে নালিশ করে সে ঠিক কাজ করবে কিনা তাও জানি না। চুনীলালের কথা মনে হ'লেই কিন্তু ছবিটা ভেসে' ওঠে মনে। আর একটা কথাও মনে হয় যে আমাদের সমাজে অধিকাংশই চুনীলাল—যে চুনীলালদের ভীষণ সমাজব্যবস্থা এবং ভীষণতর রাষ্ট্রব্যবস্থা নামক দু'টি সিংহের সঙ্গে অহরহ লড়তে হচ্ছে একটা বদ্ধ অঙ্গনের মধ্যে। প্রাচীন রোমে এই ধরনের একটা খেলা ছিল শুনেছি। সেই স্থূল ব্যাপারটা একটু সূক্ষ্মতর হয়েছে আধুনিক যুগে। নরখাদক সিংহগুলোর আকার বদলেছে। আর একটু তফাতও হয়েছে। পরিবার ঘাড়ে করে' লড়তে হচ্ছে এদের। তারা একাই লড়ত···

"কুছ পরোয়া নেই, মানে? বিকাশবাবু যদি এখন গা না করেন তাহ'লে তো গেলাম আমি। পরিবার যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যে আমি পোস্টাফিস থেকে টাকা বার করে'—"

অন্নদা বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর কাঁদো কাঁদো হ'য়ে এল। চুনীলালের দু'টি হাত ধরে' নিরর্থক জেনেও তিনি আবার বললেন, "দেখো ভাই, আমার টাকাগুলো যেন মারা না যায়। ওই আমার যথাসর্বস্ব। আমাকে যা করতে বল আমি করতে রাজী আছি।"

চুনীলালের কণ্ঠস্বরও কাঁদো কাঁদো হ'য়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু প্রত্যেক খেলোয়াড়, লেখক বা অভিনেতার যেমন স্বকীয়তা থাকে, চুনীলালেরও তেমনি ছিল। অন্নদা বিশ্বাসের নকল না করে' দক্ষ সেনাপতির মতো তিনি বললেন, "ডিটেল্‌স্‌ সংগ্রহ কর।"

"কিসের ডিটেল্‌স্‌?

'কোথায় প্রেমে পড়েছে, কার প্রেমে পড়েছে, কিভাবে প্রেমে. পড়েছে—' এসব খবর পেলে চুনীলাল যে অবিলম্বে কিস্তি মাত করে' ফেলতে পারবেন তা নয়, কিন্তু এসব খবর যোগাড় করতে অন্নদা বিশ্বাসকে বেশ কিছু সময় ব্যয় করতে হ'বে এবং সময়ের মধ্যে চুনীলাল হয়তো কিছু—এই 'হয়তো কিছু'টা যে কি রূপ নেবে তা চুনীলাল এখনও জানে না—হয়তো জামাইবাবু (মানে, গহনচাঁদ) 'সঙ্গীত ভবন' ব্যাপারটাকে টাকাকড়ি দিয়ে সার্থক করে' তোলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠতে পারেন (এ কল্পনাটা কিন্তু আকাশকুসুমই মনে হচ্ছিল চুনীলালের, কারণ, প্রথমত জামাইবাবুর টাকা নেই, দ্বিতীয়ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাঁর ভাবভঙ্গীটা সেকেলে-মার্কা, দোকান করা দূরে থাক, মাইনে নিয়ে ছাত্রছাত্রীকে গানবাজনা শেখাতেও তিনি রাজী নন, বিদ্যা বিক্রয় করা না কি মহাপাপ। তবে একটা ভরসা আছে। রঙ্গনার বিয়ের জন্যে টাকা ঋণ করতে হ'বে তাঁকে এবং সেই ঋণ শোধ করবার জন্য উপার্জনের রাস্তা খুঁজতে হ'বে একটা, সেই দিক থেকে 'সঙ্গীত ভবন'-এর আর্থিক সম্ভাবনাটা হয়তো উপেক্ষা না-ও করতে পারেন তিনি, যদিও 'সঙ্গীত ভবন'টাকে অর্থকরী করতে হ'লে আরও টাকা ঢালতে হ'বে ওতে, মানে আরও ঋণ করতে হ'বে, কিংবা হয়তো মানিকলাল (চুনীলালের শালা)

কিছু সাহায্য করতে পারে তাকে এই দুঃসময়ে, লটারিতে বেশ কিছু পেয়েছে সে সম্প্রতি, পদ্মমুখীকে (চুনীলালের স্ত্রী) পাঠাতে হ'বে তার কাছে একবার, সাহায্য না করে ধার দিক, কিংবা (মানিকলাল যদি 'ফেল' করে তাহ'লে) অগত্যা কাবুলীওলার শরণ নিতে হ'বে— কেবল অন্নদাকে কোনও ওজুহাতে দিন কয়েকের জন্য সরিয়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়তে চাইল চুনীলাল। মকদ্দমারও তারিখ পড়ে, সময় পাওয়া যায়, এ লোকটা দম ফেলতে দিচ্ছে না, ছিনে জোঁকের মতো আঁকড়ে আছে।

'ডিটেল্‌স্' পেলে চুনীলাল যে নিশ্চয় কিছু করতে পারবে, অন্নদার কিন্তু এ বিশ্বাস ছিল। চুনীলাল যদিও তাকে ডুবিয়েছে কিন্তু চুনীলালের উপর আস্থা হারায় নি সে। বস্তুতঃ অবস্থাটাই অন্নদা-বিশ্বাস-জাতীয় লোকেদের একমাত্র অবলম্বন জীবনে। অনেক-বার অনেক রকমে হতাশ হ'য়েও এরা বিশ্বাস হারায় না। ভগবানের কাছে অনেক প্রার্থনা করেছে, একটাও সফল হয় নি, তবু ভগবানের প্রতি অচল বিশ্বাস এদের। শুধু ভগবান নয়, মাদুলি, বড় সাহেব, টাকা, অদৃষ্ট প্রভৃতি বহু বিচিত্র জিনিসের উপর বিশ্বাস করে' করেই বিচিত্র জীবনদর্শন গড়ে' তুলেছে এরা।

সোৎসাহে অন্নদা বিশ্বাস তাই বললে, "সমরেশের কাছ থেকে কিছু কিছু খবর পেয়েছি।"

তার মনে হ'ল এই খবরগুলোর প্রভাবেই হয়তো তার ডুবে-যাওয়া টাকাগুলো উদ্ধার হ'য়ে যাবে কোনও অভাবিত উপায়ে। চুনীলালের বুদ্ধিমত্তার উপর সত্যিই প্রগাঢ় আস্থা ছিল তার।

"সমরেশ কে?"—অন্যমনস্ক চুনীলাল প্রশ্ন করলে আত্মস্থ হ'য়ে— "ভদ্রলোকের নাম তো বিকাশ বলেছিল?"

চুনীলাল বিকাশবাবুর সম্বন্ধে কিছুই জানত না। বিকাশবাবু অন্নদা বিশ্বাসেরই আবিষ্কার। অন্নদার সময়ক্ষেপের ওজুহাত হওয়া ছাড়া বিকাশবাবু যে সত্যি কোনও কাজে লাগতে পারেন সে বিশ্বাস

চুনীলালের মোটেই ছিল না। ওই নিয়ে অন্নদা যতক্ষণ ভুলে থাকে থাক, এই ছিল চুনীলালের মনোভাব। অন্নদা কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে এমন একটা খবর এনেছিল যা শুধু চুনীলালের কেন, অনেকেরই চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলে কিছু কালের জন্য।

"সমরেশ? বাঃ কাল তোমায় বললুম না, সমরেশ হ'ল আমাদের আপিসের দাসমশায়ের আপন পিসতুতো শালা। ওঁর থ্রু দিয়েই তো ধরেছি বিকাশবাবুকে। বিকাশবাবুর সঙ্গে সমরবাবুর খুব বন্ধুত্ব কিনা। দাসমশাই হেল্‌প্‌ না করলে অতবড় লোকের নাগাল পাওয়া কি আমাদের মতো হেঁজিপেঁজি লোকের কর্ম ভাই। আমরা হলুম—"

অন্নদা যে সুরে কথাটা আরম্ভ করেছিল অর্থাৎ সে অতি দীন দরিদ্র নগণ্য ব্যক্তি, নিতান্ত সৌভাগ্যবশতই কারও থ্রু দিয়ে সে প্রকাণ্ড একটা লোকের সন্ধান পেয়ে যেন বর্তে গিয়েছে—এটা তার অতি প্রিয় সুর। এই সুরটাই আলাপ করছিল সে এবং চুনীলাল বাধা না দিলে আরও খানিকক্ষণ হয়তো করত।

"সমরেশের কাছ থেকে কি খবর পেয়েছ সেইটেই বল না আগে।"

"ও হ্যাঁ। বিকাশবাবুর এক মাস্‌তুতো বোনের নাকি বিয়ে হয়েছে দিন সাতেক আগে, দাঁড়াও—" হঠাৎ থেমে গেল অন্নদা।

"কি হ'ল?"

"মাস্‌তুতো না পিসতুতো ঠিক মনে করতে পারছি না। মাস্‌তুতোই সম্ভবত—"

"ধরে নিলাম মাস্‌তুতো, তারপর কি বল।"

"মেয়েটি কলেজে পড়ে। তার বিয়েতে তার কলেজ-ফ্রেণ্ড এসেছিল জন কয়েক। তাদের একজনকে দূর থেকে দেখে—"

আবার থেমে গেল অন্নদা। যে কথাটা বললে ঠিক লাগসই হ'ত সেই কথাটাই আটকে গেল তার মুখে। সে নিজেই যেন এজন্য

অপরাধী এইরকম একটা মুখভাব করে' আড়চোখে চাইতে লাগল চুনীলালের দিকে। প্রেমে-পড়া ব্যাপারটা খুবই সড়গড় হ'য়ে গেছে আজকাল, ও নিয়ে আলোচনা করা মোটেই লজ্জার কথা নয়, তাছাড়া বিকাশবাবু ধনী লোকও, এসব ছোটখাটো কলঙ্ক মানায় তাঁকে। কিন্তু এটা যে কলঙ্ক এই সেকেলে বোধটা থাকতে অন্নদা থেমে গেল।

"দূর থেকে দেখে ভাল লেগেছে, এই তো?"

"আর একটু বেশি" সলজ্জ হাসি হেসে বললে অন্নদা।

অন্নদার মুখের দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইল চুনীলাল। 'প্রেম' কথাটার সঙ্গে অন্নদার ভাসুর-ভাদ্দর-বৌ-শোভন এই আচরণে চুনীলাল বেশ কৌতুক অনুভব করছিল মনে মনে। এই জন্যেই—মানে এইসব সেকেলে সংকোচ এবং কুসংস্কারের জন্যেই—অন্নদাকে চুনীলাল ভালবাসে। পরিহাস-তরল কণ্ঠে স্নেহের সুর লাগল তাই। একটু পরেই অন্নদা যে কথাটা বলবে, যা শুনে বিস্মিত চুনীলালকেও খানিকক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়তে হ'বে এবং যা অবশেষে নিমজ্জমান চুনীলালের চক্ষে ভেলা-রূপে প্রতীয়মান হ'বে, তার আভাস পেলে চুনীলালের কণ্ঠস্বর পরিহাস তরল হ'ত কি না সন্দেহ। কারণ চুনীলালের চরিত্রে আর যে দোষই থাকুক প্রয়োজনীয় কাজের কথা নিয়ে ছ্যাবলামি করা তার স্বভাব নয়।

"বেশিটা কি রকম? চটচটে, গদগদে, না গাঢ়?"

"অতশত জানি না ভাই"—আর একটু বিব্রত হ'য়ে পড়ল অন্নদা—"তবে এই নিয়ে তার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে ঝগড়া হবার উপক্রম হয়েছে নাকি শুনলাম। বিকাশবাবুর বাবা নেই, জ্যাঠামশাই বেঁচে আছেন, তিনি নাকি কোথায় এক জায়গায় পঁচিশ হাজার টাকা পণ নিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখবার পর বিকাশবাবু নাকি ওখানে আর বিয়ে করতে

চাইছেন না। এই নিয়ে বাড়িতে হুজ্জত হচ্ছে, আমাদের ব্যাপারটা চাপা পড়ে' গেছে তাই—"

"কে বললে তোমাকে ?"

"সমরেশবাবু, আমাদের আপিসের দাসমশায়ের থ্রু দিয়ে যাঁকে ধরেছিলাম তিনি।"

"মেয়েটির নাম কি, বাড়ি কোথায়, এসব ডিটেল্‌স্ জান কিছু ?"

"বাড়ি কোথায় তা জানি না, তবে মেয়েটির নাম শুনলাম রঙ্গনা।"

"রঙ্গনা! বল কি!"

নিমেষের মধ্যে চুনীলালের মনে পড়ে' গেল, রঙ্গনা—তার ভাগ্নী, রঙ্গনা—এক কলেজ-ফ্রেণ্ডের বিয়েতে গিয়েছিল। হ্যাঁ, দিন সাতেক আগেই। মনে পড়া মাত্র চুপ করে' গেল চুনীলাল। গুলী খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে না মরলে বাঘ যেমন এক লাফে অদৃশ্য হ'য়ে যায় ঘন জঙ্গলে, চুনীলালও অনেকটা তেমনি করলে যেন। তফাত অবশ্য ছিল। গুলী খেয়ে বাঘ দারুণ চীৎকার করে একটা, চুনীলাল টুঁ শব্দটিও করলে না। গুম্ হ'য়ে গেল।

অন্নদা চুনীলালের এ ভাবান্তর হয় লক্ষ্য করলে না বা এর তাৎপর্য বুঝতে পারলে না। রঙ্গনা যে চুনীলালের ভাগ্নী হ'তে পারে এ তার কল্পনাতীত ছিল। চুনীলালের হাতে সে যথাসর্বস্ব সমর্পণ করেছিল, তার সঙ্গে হৃদ্যতাও ছিল, তার আরও নানা খবর জানত সে (যথা, সে রেসে বেশ ভাল 'টিপ' দিতে পারে, ভাল মাছ ধরতে পারে, শেয়ার মার্কেটের ব্যাপার খুব ভাল বোঝে) কিন্তু তার যে রঙ্গনা নামে এক ভাগ্নী আছে, এ খবর সে রাখত না। সে বরং কার কাছে যেন শুনেছিল এবং ঠিকই শুনেছিল যে চুনীলালের বউ নাকি বাঁজা। রঙ্গনার খবর সে জানত না। তাই চুনীলাল যখন চুপ করে' গেল তখন অন্নদার মনে হ'ল চুনীলাল বোধ হয় নূতন পরিস্থিতির জটিলতাটা সরল করবার উদ্দেশ্যে নতুন চাল ভাবছে

কোনও। ওস্তাদ দাবা-খেলোয়াড় চুনীলালের চালের উপর সত্যিই আস্থা ছিল অন্নদার। সে উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল।

চুনীলাল চালই ভাবছিল। আহত বাঘের মতোই তার মন অতি দ্রুতবেগে ভেবে চলেছিল অতর্কিত এই ব্যাপারটাকে সামলানো যায় কি করে'।

"নাম কি ভদ্রলোকের?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে।

"কার? সমরেশের? সমরেশ পাল।"

"আরে না, না, বিকাশবাবুর। কোন্ জাত, উপাধি কি?"

"ব্রাহ্মণ। বিকাশ চাটুজ্জে।"

শুনেই চুনীলাল বাঁ হাতে তুড়ি দিয়ে ফেললে সহসা কয়েকটা। অন্নদাকে যদিও সে খুলে' বললে না কিছু, কিন্তু চকিতের মধ্যে সে একটা পথ দেখতে পেলে, মতিস্থির করে' ফেললে এবং আশা করতে লাগল যে বিভিন্ন ধরনের বাধা সত্ত্বেও সুরাহা হ'য়ে যাবে বোধ হয় এইবার। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লৌহখণ্ডগুলোর মাঝখানে কোন এক অদৃশ্য হস্ত যেন চুম্বক রেখে' গেল একটা। হঠাৎ খুশি হ'য়ে উঠলে ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়ে যায় চুনীলালের, কুঞ্চিত ভ্রূর তলায় চকচক করে চোখ দুটো খালি।

"অমন করে' দেখছ কি?"

"বিকাশবাবুর ঠিকানাটা রেখে' যাও আমার কাছে।"

ঠিকানাটা দিয়েই অন্নদা বিশ্বাস বুঝলে এইবার তাকে যেতে হ'বে, অর্থাৎ চুনীলালের কাছে এখন আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু যে অকূল পাথারে সে পড়েছে তাতে চুনীলালই একমাত্র ভরসা, চুনীলালকে কাছ-ছাড়া করতে ইচ্ছে করে না।

"আচ্ছা তোমাকে খবর পাঠাব আমি পরে। দেখি কতদূর কি করতে পারি"—চুনীলাল বললে।

"যাই কর, আমার টাকা ক'টা যেন ফিরে পাই ভাই। তুমি তো সবই জান, তোমার কাছে লুকোচাপা তো নেই কিছু।"

"কিছু ভেব না, ঠিক হ'য়ে যাবে সব।"

"দেখো ভাই—"

"বিকাশবাবু আর তার জ্যাঠামশাই কি এক বাড়িতে থাকেন?" —হঠাৎ প্রশ্ন করলে আবার চুনীলাল।

"আরে না না—দু'জনে আলাদা বাড়িতে থাকে। বিষয়-সম্পত্তিও সব নাকি আলাদা"—চুনীলালের কাছে আর একটু থাকবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে গেল অন্নদা বিশ্বাস—"বিকাশবাবু নিজে আর একটা আলাদা বাড়িও করাচ্ছেন, সেইজন্যেই তো ইলেকট্রিক গুড্স্ দরকার তাঁর—তাছাড়া দোকান করবারও ইচ্ছে —অগাধ বড়লোক তো—"

"তাহ'লে ওর বিয়েতে জ্যাঠামশাই ঝগড়া লাগাচ্ছেন কি করে'?"

"বাঃ তা লাগাবে না? হিন্দু ফ্যামিলি তো হাজার হোক!"

"ও"—সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবতে ভাবতে 'ও'টি বললে চুনীলাল।

"মণ্ডাটা কিছু নয়, তবু নৈবেদ্যর ওপরেই ওটাকে স্থান দিতে হ'বে। এই যে ধর না আমার বিয়ের সময়েই, কোথাও কিছু নেই, আমার মামা ফট্ করে' বেঁকে দাঁড়িয়ে মাতুল-বিদায়-ফিদায়ের ফরকট তুলে' এমন হাঙ্গামা বাধিয়ে তুললে যে বিয়েই পণ্ড হ'য়ে যাবার যোগাড়—"

অন্নদা বিশ্বাসের বিবাহের ইতিহাস শোনবার আগ্রহ চুনীলালের ছিল না। সে ভাবছিল অন্য কথা। ভাবছিল রঙ্গনার যে ফটোটা কিছুদিন আগে তোলান হয়েছিল সেটা আছে পদ্মমুখীর বাক্সে এবং সে বাক্সের চাবি আছে পদ্মমুখীর আঁচলে। বাড়ির কারও কৌতূহল উদ্রিক্ত না করে' ফটোটা কি করে' সংগ্রহ করা যায়, এই কথাই চিন্তা করছিল চুনীলাল। পদ্মমুখীকে কিছু বললেই সে ঝংকার দিয়ে ওঠে। ব্যবসাটা ফেল করার পর থেকে ঝংকারটা আরও বেড়েছে। কিন্তু ফটোটা চাই।

অন্নদা বিশ্বাস কিন্তু বলে' চলেছিল—"শেষ পর্যন্ত মামা আরও একশ' টাকা আদায় করে' তবে ছাড়লে। ওই যে বললুম না হিন্দু ফ্যামিলিতে বিয়ের ব্যাপারে গুরুজনদের অমর্যাদা করা চলে না, তা তিনি যত বড়ই না কেন —"

"আচ্ছা। তুমি যাও এখন।"

হঠাৎ বাধা পেয়ে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল অন্নদা। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তারা। চুনীলাল নিজের হাতঘড়িটার দিকে একনজর চেয়ে আবার বললে—"যা হয় তোমাকে খবর পাঠাব আমি।"

"বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করবে ভাবছ ?"

"দেখি।"

বিশেষ কিছু ভাঙতে চাইলে না চুনীলাল। হঠাৎ সে বাড়িমুখো হ'ল দেখে' অন্নদা বিশ্বাসকেও বাড়িমুখো হ'তে হ'ল।

"আচ্ছা ফাইভ-বি নম্বরটা কোন্‌খানে হ'বে বলতে পারেন ?" অন্যমনস্ক চুনীলালকে যে যুবকটি প্রশ্ন করলে সে যে অদূর ভবিষ্যতে যে জালটা চুনীলাল মনে মনে বুনতে বুনতে চলেছিল সেই জালটাই ছিন্নভিন্ন করে' দেবে তা আন্দাজ করা চুনীলালের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং দিবসের মুখের দিকে ভাল করে' না চেয়েই সে উত্তর দিলে—"গলিটার ভিতর দেখুন" এবং আপন মনে ভাবতে ভাবতে চলতে লাগল ফটোটা এখনই যদি হস্তগত করা সম্ভব হয় তাহ'লে কি ভাবে সে টোপটা ফেলবে।

প্রত্যেক মানুষ নিজেকে জ্ঞাতসারে যে-সব দোষগুণের সমষ্টি বলে' বিশ্বাস করে অজ্ঞাতসারে সে সেইসব দোষগুলি অপরের উপরও আরোপ করে। অর্থাৎ সে নিজেকেই দেখে অপরের মধ্যে। অন্য-প্রকার কোনও দর্শন যে সম্ভবই নয় এ জ্ঞান যখন তার হয় তখন তার মানসিক রূপান্তর ঘটে' গেছে। ডিম হ'য়ে গেছে পাখি। চুনীলালের সে অবস্থান্তর ঘটে নি। সংসার সমরাঙ্গনে যে-সব অস্ত্র চালনা করে'

সে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে তার ধারণা সকলেই সে অস্ত্র লাভ করবার জন্যে সমুৎসুক। স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে বিশেষ করে' তার ধারণাটা এত বেশী বস্তুতান্ত্রিক যে তার সবটা লিপিবদ্ধ করা যাবে না।

বাড়িতে ঢুকেই সুতরাং পদ্মমুখীকে আড়ালে ডেকে সে প্রথমেই দু'খানা দশ টাকার নোট বার করে' দিলে।

"কোথা পেলে টাকা? আবার ধার করলে নাকি?"—সবিস্ময়ে জানতে চাইলে পদ্মমুখী।

টাকাটা সত্যিই যে ধার করতে হয় নি এতে বাস্তবিক চুনীলালও খুবই আনন্দিত হয়েছিল মনে মনে। বালুকাস্তূপের উপর বসে' বহুবার হতাশ হওয়া সত্ত্বেও যে বালক বালুর প্রাসাদ নির্মাণের স্বপ্ন ত্যাগ করে নি, সে যদি সহসা একটা বালুকা-প্রাচীরকে খানিকক্ষণ অভগ্ন অবস্থায় দেখে তাহ'লে তার মনে যে আনন্দের শিহরণ জাগে, প্রৌঢ় চুনীলালের মনেও সেই ধরনের শিহরণই জাগছিল একটা। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হ'য়ে গিয়েছিল তার এবং কুঞ্চিত ভ্রূ'র তলায় চকচক করছিল চোখ দু'টো।

"রঙ্গনা কোথায়?"—নিম্নকণ্ঠে প্রথমে জিগ্যেস করলে সে।

"ছাতে। কার কাছ থেকে ধার করলে টাকাটা? জামাইবাবু টাকা দিয়েছেন তো কিছু আপাতত।"

"ধার করি নি। তবে ধার কথাটার সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে বলতে পার। বুদ্ধির ধারও তো ধার"—বলেই হেসে ফেললে চুনীলাল।

"ঊর্মি আর সরলা বলে' দু'টি ছাত্রী আজ ভর্তি হ'ল গানের স্কুলে।"

"গানের স্কুল সত্যি খোলা হ'বে নাকি?"

স্মিতমুখে চেয়ে রইল চুনীলাল। অপেক্ষা করতে লাগল। পদ্মমুখী ঝংকার একটা দেবেই সে জানত।

"'সব কর্মে হয়েছ যশী, বাকি আছে এখন ভীম একাদশী'। ইন্‌সিওরের দালালি হ'ল, ইলেকট্রিকের দোকান খোলা হ'ল, শেয়ার মার্কেটে ফাটকা খেলা হ'ল, এবার বাকি আছে গানের স্কুল।"

"একের পর এক চেষ্টা তো করেই যাচ্ছি, লাগছে না, কি করব বল। ইলেকট্রিকের দোকানটা যে এমনভাবে ডুবে যাবে কে জানত!"

"আমি জানতাম। দোকান না খুললে দোকান চলবে কেন? দোকান কি খুলতে কখনও? আজ মাছ-ধরা, কাল রেস খেলা—"

"গানের স্কুল কিন্তু হু হু করে' চলবে দেখো। জামাইবাবুর যে রকম নাম।"

"কিন্তু উনি কি মাইনে নিয়ে তোমার গানের স্কুলের মাস্টারি করবেন?"

"তা কি করতে পারেন কখনও? উনি সঙ্গীতবিদ্যা বিতরণ করবেন। মাইনেটা নেব আমি, অবশ্য একটু গোপনে। দেখো জামাই-বাবু বা রঙ্গনা যেন এ টাকার কথা ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে।"

"এটা কি উচিত হ'বে!"

পদ্মমুখীর কণ্ঠস্বর মোলায়েম হ'য়ে এল একটু। মুখে সে যতই ঝংকার দিক, ভিতরে ভিতরে সেও কম ভীত হয় নি। এই বাজারে উপার্জনের পথ বন্ধ হ'য়ে গেলে ভবিষ্যতে চলবে কি করে' এ ভয় তারও হয়েছিল। ভাগ্যে জামাইবাবু এসে পড়েছেন তাই দৈনিক সংসার খরচটার জন্যে অপরের কাছে হাত পাততে হচ্ছে না। শেষে তার বাপের দেওয়া গয়নাগুলোও যাবে নাকি? এইসব ভয়াবহ চিন্তার আগুনে চুনীলালের নবোদ্ভাবিত উপার্জন-কৌশল—তা সে যতই অযৌক্তিক হোক না কেন—কিঞ্চিৎ বারি-সিঞ্চন করলে যেন। চুনীলালের পরবর্তী কথাগুলোতে কিছু যুক্তির আভাসও পেলে পদ্মমুখী।

"খুব হ'বে, খুব হ'বে। এ বাবা ব্ল্যাক-মার্কেটের যুগ, সোজা রাস্তায় কিছু হবার-জো নেই। তুমিও ওঁকে একটু অনুরোধ কর থাকতে। আজ উনি যখন খেতে বসবেন তখন পাখাটা হাতে নিয়ে কাছে বোসো, বুঝলে, শালাজের অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না—"

"কত রঙ্গই যে জান !"

হেসে ফেললে পদ্মমুখী। হাতে নগদ কুড়িটা টাকা পেয়ে সত্যিই চিত্ত কিন্তু বিগলিত হ'য়ে গিয়েছিল তার। তার ওই হাসি যে মর্মন্তুদ অশ্রুরই রূপান্তর, একথা ভাল করে' হৃদয়ঙ্গম করে নি বলেই হাসিটা ভারি সুন্দর দেখাল। ক্ষণিকের জন্য চুনীলালও নূতন করে' মুগ্ধ হ'ল আবার, ফিরে গেল অতীতের সেই পরম মুহূর্তটিতে যখন সে পদ্মমুখীকে প্রথম দেখেছিল। শুভদৃষ্টির সময় দেখা চেলি-গুণ্ঠিত চন্দন-চর্চিত মুখখানি ভেসে উঠল চোখের উপর। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় সাদা পাল-তোলা যে নৌকোটা তারা ভাসিয়েছিল ময়ূরাক্ষীর স্বচ্ছ জলে অনেকদিন আগে, কোথায় গেল সেটা? কোন্ নামহীন ঘাটে ভিড়েছে তা?—অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল চুনীলাল ক্ষণকালের জন্য। এবং চিন্তার সূত্র ধরেই ফিরে এল সে আবার বাস্তবলোকে।

"রঙ্গনার সেই ফটোটা যে তোলান হয়েছিল, কোথায় সেটা দাও তো" বলে' চুনীলাল একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল যেন মনে মনে। তার আবছাভাবে যেন মনে হ'ল যে রঙ্গনার সম্বন্ধে এখনই যে কথাটা সে শুনলে তাতে মামা হিসেবে এবং প্রচলিত সমাজবিধি অনুসারে তার চটে' যাওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে' সে…

"ফটোটা বাক্সে আছে।"

"দাও তো !"

"কি করবে এখন ?"

"একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি।"

অপ্রস্তুত ভাবটা কেটে' গেল চুনীলালের। প্রয়োজনের সঙ্গে বিবেকের যখন সংঘর্ষ হয়, তখন পুরাতন বিবেককে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। নূতন বিবেক এসে তখন দখল করে সেটা।

জানালাটা হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় খুলে' গেল। খোলা বাতায়ন-পথে সুর ভেসে' এল একটা। ও ধারের ঘরে বসে' গহনচাঁদ উদাত্তকণ্ঠে গান করছিলেন শিব-মানস স্তোত্রটি—

আত্মা ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং।
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ॥
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ-বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো।
যদযৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥

প্রচলিত সমস্ত শিবস্তোত্রগুলিতে সুর বসিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন গহনচাঁদ। কোন্ কোন্ সুর স্তোত্রে ঠিক লাগবে এই তাঁর প্রধান চিন্তা এখন।

চার

দৃশ্যমান অন্ধকার যে আসলে চোখের স্নায়ুমণ্ডলের উপর বহির্জগতের কতকগুলি অদৃশ্য তরঙ্গের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র, ওতে সত্যি সত্যি যে ভয় পাবার কিছু নেই, বস্তুত অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাওয়ার শক্তি যে মানুষের চোখেরও আছে, যাকে আমরা আলো বলি তার উৎস যে জাতীয় জ্যোতিষ্ক অন্ধকারেই যে তারা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে বেশি, তাছাড়া ওই সূর্যালোকের মহিমা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার জন্যেই যে অন্ধকারের প্রয়োজন, এই ধরনের চিন্তার স্তোক সত্ত্বেও দিবসের মন হয়তো ভেঙে পড়ত যদি সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে সে ভরপুর হ'য়ে না থাকত। ভরপুরই হয়েছিল সে। মশগুল হয়েছিল। পুরাতন বন্ধনের ছিন্নমুখগুলো রক্তাক্ত হয়েছিল তখনও, জ্বালা করছিল, অসংখ্য উপলখণ্ড তার আনন্দ-নির্ঝরের পথকে দুর্গম করে' তুলছিল, অনিশ্চয়তার গাঢ় কুয়াসায় আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল তার নবদিগন্তকে, কিন্তু তবু তার সমস্ত সত্তা গান গাইছিল যেন। উপলখণ্ডের বাধাগুলোই যেন সৃষ্টি করছিল নব নব ছন্দ।

উপর্যুপরি তিন জায়গায় প্রাইভেট ট্যুশনির চেষ্টা করে' ব্যর্থ-মনোরথ হয়েছে সে। মধ্যবিত্ত যে ভদ্রলোকটি তাঁর তিনবার-ফেল-করা ছেলেকে চতুর্থ বার পাস করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি চাইলেন মাসিক পনের টাকা বেতনের বিনিময়ে ('তা আপনি এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা যতক্ষণ পড়িয়ে পারেন আমার আপত্তি নেই' ভদ্রলোকের কথাগুলো তখনও কানে বাজছিল দিবসের) তাঁকে দেখে' রাগ হয় না, করুণা হয়। নিজের ছেলেকে দেখবার তাঁর নিজের সময় নেই। কারণ সকালবেলা আপিসের তাড়া, আপিস থেকে ফিরে নিজেই তিনি ট্যুশনি করেন দু'জায়গায়, ফেরেন রাত্রি দশটায়। তাঁর স্ত্রীর সামর্থ্য বা সময় কোনটাই নেই। তিনি ব্যস্ত সংসার নিয়ে সম্ভবত। দশটি ছেলেমেয়ে ভদ্রলোকের। যে পনের টাকা তিনি দিবসকে দিতে রাজী হয়েছিলেন সে টাকাটা নিশ্চয়ই ওদের খাদ্য কমিয়েই সংগ্রহ করতে হ'ত ভদ্রলোককে (ঘরের দ্বার দিয়ে যে শীর্ণকান্তি কয়েকটি শিশু উঁকি মারছিল, তাদের মুখগুলো মনে পড়ল আবার) কারণ খাদ্য ছাড়া আর কিছু কমাবার উপায় নেই। বাড়িভাড়া দিতেই হ'বে, ভদ্রসমাজে চলাফেরা করবার মতো কাপড়ও কিনতেই হ'বে, লোকলৌকিকতা বজায় রাখতেই হ'বে, ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পড়াতেই হ'বে, দরকার হ'লে প্রাইভেট টিউটার রাখতেই হ'বে—কমানো যায় কেবল খাদ্যটা। কিন্তু খাদ্য কমিয়ে প্রাইভেট টিউটারের মাইনে সংগ্রহ করতে হচ্ছে যাঁকে তাঁর চোখে-মুখে একটা লাটসাহেব-সুলভ ভাব ফুটে রয়েছে কেন, দ্বিতীয় যে ব্যক্তিটি (সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভদ্রলোক) তার কেমিস্ট্রি-বিদ্যা কতটা জানবার জন্যে তাকে অ্যালকহল, অ্যাসিটোন আর অ্যালডি-হাইডের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন (পড়াতে হ'বে তাঁর ম্যাট্রিক ক্লাসের ভাগ্নেকে, মাইনে মাসে কুড়ি টাকা) কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু কথা কয়েই যাঁর নিজের বিদ্যা প্রকট হ'য়ে পড়ল শোচনীয়রূপে, তাঁর চোখে-মুখেই বা অমন সবজান্তাভাব উগ্র হ'য়ে আছে কেন এবং

তিনি প্রাইভেট টিউটার পদপ্রার্থী যুবকমাত্রকেই মূর্খ মনে করেন কেন—এইসব কথাই দিবস ভাবছিল নানাভাবে। তাদের মুখচ্ছবি-গুলো যতবারই মনে পড়ছিল তার ততবারই মনে হচ্ছিল ওগুলো মুখ নয়, মুখোশ। কোনও বিশেষ প্রয়োজনে হয়তো বহুদিন আগে মুখোশটা পরে ছিল ওরা কিন্তু খুলতে ভুলে গেছে। মুখের সঙ্গে মুখোশটা এমন বেমালুম এক হ'য়ে গেছে যে, নিজেরাই ভুলে গেছে যে ওটা মুখোশ। কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে পরেছিল ওরা মুখোশটা? চাকরির? দাসত্বের? কতকালের চাকরি, কতকালের দাসত্ব··? সহসা অদ্ভুত একটা ছবি প্রত্যক্ষ করে' চমকে গেল সে। ওই মুখ দুটোকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছে যেন লক্ষ লক্ষ পা···আর্য···শক হুনদল পাঠান মোগল···ইংরেজ···। সুন্দর মুখ দুটোকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে দুমড়ে দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে মুখোশ। কিন্তু ওই মুখোশ ভেদ ক'রেও তাদের আসল জৈবিক সত্তাটাও আত্মপ্রকাশ করছিল (সে সত্তাটাকে বাঁচাবার জন্যে মুখকে মুখোশ করেছে তারা) সেটাকে কিছুতেই লুকোতে পারছিল না কেউ···"ছেলেটি দেখতে ভাল, লেখাপড়াও জানে, উপাধি কিন্তু বলছে চৌধুরী, চৌধুরী উপাধি অনেক জাতেরই হয়" পাশের ঘরের নিম্নকণ্ঠের যে আলাপটা শুনে ফেলেছিল দিবস সেইটেই আবার বেজে উঠল কানে। "কমলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব? কিন্তু তার আগে ওর জাতটা কি জেনে নেওয়া উচিত"—তৃতীয় যে স্থান থেকে চ'লে আসতে হয়েছিল দিবসকে—যারা দিবসের জাত জানতে চায় (কোষ্ঠি এবং ব্যাংকের খবরও জানতে চাইত যারা নিশ্চয় কিছুদিন পরে)—যারা তাদের যুবতী কন্যাকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পারদর্শিনী করবার জন্যে দিবসকে প্রাইভেট টিউটার রাখতে চেয়েছিল মাসিক কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে—তাদের জৈবিক সত্তাটা যে মুখোশের তলায় আত্ম-গোপন করেও ব্যর্থকাম হচ্ছিল বারংবার সেই মুখোশটার বিচিত্র চেহারাটার কথাই ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগল দিবস। তারা

সমাজের (যা, দিবসের মতে, জুতোর মতো বারংবার বদলানো দরকার) সবরকম নিয়ম বাঁচিয়ে সমাজবিধি লঙ্ঘন করতে চায়, কন্যাকে অসূর্যম্পশ্যা রেখেও টোপ স্বরূপ ব্যবহার করতে চায় এবং ধৃত মৎস্যটির কুল কোষ্ঠিবংশ সঙ্গতি বিচার করতে চায়। কোন 'কন্‌কেভ্' দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত জাতটাকে এমন বীভৎস দেখাচ্ছে, কোথায় সে আয়নাটা, সেইটেকেই চুরমার ক'রে ফেলা উচিত আগে। যে বীভৎস ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো ছবি নয় প্রতিচ্ছবি, বিকৃত প্রতিচ্ছবি, যে ছবিগুলো আড়ালে আছে সেগুলো সুন্দর, অতি সুন্দর—মহৎ, শিল্পী, স্নেহশীল, স্বাতন্ত্র্যকামী, স্পষ্টবাদী, সাহসী, প্রতিভাধর বাঙালী নর-নারীর একটা মিছিল ফুটে উঠল তার মানসপটে—হ্যাঁ, ওই বাঁকাচোরা আয়নাটাকে, ওই ঝুটো-আত্মসম্মানের দর্পণটাকে সরিয়ে দিতে হ'বে, যে আত্মসম্মানের ভিত্তি আত্মপ্রত্যয় নয় আত্মবঞ্চনা, অবলুপ্ত করতে হ'বে সেটাকে, যুবতী মেয়েকে কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে—হঠাৎ দিবসের মনে হ'ল এই ভাল-লাগাটা, মানে যুবতী মেয়েকে ভাল-লাগাটা, কিছু অন্যায় নয় তো, জীবনে সবকিছু ভাল লাগুক, সবকিছু মধুময় হ'য়ে উঠুক এইতো আমরা চাই, ভাল-লাগাই তো আনন্দ (যে রঙ্গনাকে দেখে' হঠাৎ ভাল লেগে' যাবে তার, সে যদিও তখন কল্পনার বাইরে ছিল তবু সে মনে মনে কল্পনা করে' চলেছিল যেন একটি তরুণীকে তার ভাল লেগেছে, তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু তাকে ভাল লাগছে), ওই রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগিনী মেয়েটিকে যদি তার ভাল লাগত কি ক্ষতি হ'ত তাতে, সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল কেন তার, পালিয়ে এল কেন, তখনই মনে হ'ল তৃতীয়পক্ষের ভণ্ডামির জন্যেই খারাপ লাগল, ওই তৃতীয়পক্ষ মনে মনে চায় মেয়েটিকে তার ভাল লাগুক কিন্তু সত্যি সত্যি ভাল লেগে' গেলে ওরাই ছদ্ম আতঙ্কে চীৎকার করবে সবচেয়ে বেশী এবং তারপর ভান করবে যেন সর্বনাশ হ'য়ে গেছে এবং সর্বশেষে দাবি করবে বিবাহ-মন্ত্রপূত করে' এই অশুদ্ধ ব্যাপারটাকে শুদ্ধ করে'

না দিলে এমন একটা কাণ্ড করবে তারা—ওটা ফাঁদ, ওটা ষড়যন্ত্র তাই পালিয়ে আসতে হয়েছে, এবং পালিয়ে আসতে হয়েছে বলে' দুঃখ হচ্ছে, কমলির সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে' ততটা নয় (কমলির সান্নিধ্যলাভের লোভ তার একেবারে ছিল না যে তা নয়) যতটা কমলির বাপের মতলবের পরিচয় পেয়ে—দোমড়ানো, ত্যাবড়ানো, পাক-খাওয়া কি অদ্ভুত মন ! কিন্তু আসলে ওটা ওরকম নয় মোটেই, নানারকম চাপে ওই রকম হ'য়ে গেছে—যে চাপে সাপ গর্তে ঢুকে পড়ে কিংবা ফণা ধরে, খরগোশ ঝোপে আত্মগোপন করে কিংবা পালায়—বহুবিধ জীবজন্তু পক্ষী-পতঙ্গ গাছপালার বিচিত্র ছদ্মবেশের কথা মনে পড়ে' গেল তার, আত্মরক্ষার কত বিবিধ আয়োজন জীব-জগতে। সবলের হাত থেকে দুর্বল আত্মরক্ষা করছে যে উপায়ে, (সে উপায়গুলো কখনও মনোহর কখনও ভীষণ), সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকেও কি সেই উপায়ে আত্মরক্ষা করতে হ'বে ? যে মানুষ এত বিভিন্ন রকমে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে (দিনকে রাত রাতকে দিন করেছে, ঘুচিয়েছে দূরত্বের বাধা সময়ের শাসন, বাড়িয়েছে দৃষ্টির সীমা শ্রবণ-শক্তির পরিধি, সংযত করেছে নিজেকে নানা অস্বাভাবিক উপায়ে) সেই মানুষদের মধ্যেও সবল দুর্বলের বিভেদ ঘুচবে না এখনও ? এখনও চলবে সেই নিষ্ঠুর আদিম দ্বন্দ্ব ? শ্রেষ্ঠ মানব মনীষা এখনও দুর্বল-দলনেই ব্যস্ত থাকবে ? নিউক্লিয়ার এনার্জির সার্থকতা হ'বে অ্যাটম্ বমে ? আগুন দিয়ে মানুষ ঘর পোড়াবে এখনও ? হঠাৎ বাবার মুখটা মনে পড়ল। বাবাও ওই দলে। তিনিও তাঁর সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি ব্যবহার করছেন সবলদের বলবৃদ্ধি করবার জন্যে। দুর্বলের তিনি কেউ নন—হঠাৎ দিবস আশ্চর্য হ'য়ে গেল। আশ্চর্য হ'য়ে গেল নিজের মনের দিকে চেয়ে। তাঁর উপর রাগ হচ্ছে না তো ! বরং—। কিছুদিন পরে যে তর্কটা সে বাবার সঙ্গে করবে তারই মহলা দিতে দিতে পথ চলতে লাগল সে। বাবার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করবার একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা টানতে লাগল তাকে বাড়ির দিকে। কিন্তু না,

এখন নয়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, স্বকীয় উপার্জনের পন্থা একটা ঠিক করে' তবে সে দেখা করবে বাবার সঙ্গে। এখন নয়।

ভজন গানটা শুনেই যে সে দাঁড়িয়ে পড়ল তা নয়। যে লোকটা পিছু ফিরে বসেছিল, পিছন থেকে সে দেখতে ঠিক ব্রজর মতো। ভাল করে' চেয়ে দেখলে জুতোর কারখানা একটা। যারা কাজ করছে তারা সবাই অবাঙালী। সেই বা জুতো তৈরি করতে পারবে না কেন? টলস্টয়ের মতো লোক তো জুতো তৈরি করতেন।

"এখানে কোনও কাজ খাল্লি আছে কি?"

"কৌন কাজ?"

"তোমরা যে কাজ করছ।"

"বাবু ভেইয়া ইসব কাজ শেকবে কি?"

"দিয়েই দেখ না, ঠিক পারব।"

যে লোকটা পিছন থেকে ব্রজর মতো দেখতে সে কাঁচি দিয়ে চামড়া কাটছিল, তার মুখে একটা ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠল। কিছু বললে না সে, চামড়াই কাটতে লাগল। ভদ্রভাবে উত্তর দিলে আর একটি লোক।

"কাম নেহি খালি হ্যায় বাবু।"

দোকান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেবে আসতে হ'ল দিবসকে ফুট-পাথের উপর। টলস্টয়ের আদর্শ অনুসরণ করবার কোনও সুযোগ পাওয়া গেল না আপাতত। যে লোকটা পিছন থেকে ব্রজর মতো দেখতে সে যে অর্ধস্বগতোক্তিটা করলে তা শুধু যে দিবসের কান এড়াল না তা নয়, মনে হ'ল উক্তিটা তার কান মলে' দিলে যেন।

"শৌখিন ধোতি পাঞ্জাবি পহিনকে ইসব কাম নেহি হোতা হ্যায়" —সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিলে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সে হাঁটতে লাগল। মনে হ'ল কেউ যেন ঠেলছে তাকে, গলাধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে, দূর করে' দিচ্ছে যেন কর্মজগৎ থেকে, বলছে যেন ওরে

ফোতো বাবু, কলম পিষতে পিষতে মুখে রাজা উজির মার গিয়ে, এসব তুই পারবি না—।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেলে একটা কুলি আর একটা কুলির মাথায় মোট চড়িয়ে দিচ্ছে একটা। মোটটা কিন্তু এত ভারী যে একলা চড়িয়ে দিতে পারছে না সে, দিবস ছুটে' গেল তাকে সাহায্য করতে, আগ্রহ ভরে' ছুটে' গেল (না ছুটে' গেলে যেন তার আত্মসম্মান আহত হচ্ছিল) কুলিটা কিন্তু তার সাহায্য নিতে চাইলে না। সে সাহায্য করতে চেয়েছে বলে' কুলিটার চোখে-মুখে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠল যদিও, কিন্তু দিবসের মনে হ'ল একটু অবজ্ঞাও যেন প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে তার মধ্যে। 'আপ ছোড় দিজিয়ে বাবু'—এই কথাগুলোর মধ্যেই একটু খোঁচা ছিল যেন।

ল্যাম্প-পোস্টে-সাঁটা কাগজের টুকরোটা দেখতে পেয়ে ধরবার ছোঁবার মতো কিছু পেলে যেন একটা সে অনেকক্ষণ পরে। এতক্ষণ সে হাঁটছিল কেবল।

"ফেরিওয়ালা চাই। খাবার ফেরি করিতে হইবে। বিশ্বাসযোগ্য লোক নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করিতে পারেন।"

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে আবার সে হাঁটতে লাগল। একটা উৎসাহ পেল যেন সে আবার। অতি তুচ্ছ জিনিসের জন্যও ছেলেবেলায় তার যে উৎসাহ যে আগ্রহ জাগত (একটা ছোট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি পাওয়ার জন্য সে চেতলা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল একবার, একটা কুকুর-বাচ্চা আনবার জন্য হাওড়ার পুল পার হ'য়ে চলে' গিয়েছিল ছেলেবেলায় যখন সে স্কুলে পড়ে) সেই ধরনের একটা উদ্দীপনা জাগল তার ওই বিজ্ঞাপনটা দেখে'। মনে হ'ল ওই বিশেষ কাজটা পেলে সে যেন চরিতার্থ হ'য়ে যাবে। পেতেই হ'বে ওটা।

খাবারের দোকান। বেশ বড় দোকান। সামনেই যে ছোকরাটি বসে' আছে সেও যেন মনুষ্যাকৃতি পানতোয়া একটি। কালো গোছের রং, গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট। বাঁ-হাতে একটি সোনার তাবিজ,

গলায় একটি সোনার সরু হার। মুখটি কচি, গোঁফ-দাড়ি ওঠে নি। ভিতরের দিকে চৌকিতে বসে' আছেন একটি ক্ষীণকান্তি বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হ'লেও শৌখিন। আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, পাকাচুলে তেড়িকাটা।

"এইটেই কি পঁচিশ নম্বর"—দিবস জিগ্যেস করলে। একটু ভয়ে ভয়েই জিগ্যেস করলে। পরীক্ষার 'হলে' ঢুকে যে ধরনের ভয় করত সেই ধরনের একটা অনির্দিষ্ট ভয় করতে লাগল তার।

"কি চাই আপনার"—ছোকরাটিই উত্তর দিলে।

"রাস্তায় আসতে আসতে দেখলাম আপনারা একটা ফেরিওয়ালার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—"

"হ্যাঁ, আছে কেউ জানাশোনা আপনার?"

"আমাকেই রাখুন।"

ছোকরার বর্তুলাকৃতি মুখ আরও বর্তুলাকৃতি হ'য়ে গেল। কোনও ছাগল এসে নিজমুখে যব মাড়বার প্রস্তাব করলেও এত বিস্মিত হ'ত না সে।

"আপনাকে!"

"হ্যাঁ, আমাকে। দিয়েই দেখুন না।"

দিবসের কণ্ঠস্বরে যে আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হ'ল, যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল ক্ষুদিরাম কানাইলালের কণ্ঠে, যে সুর বেজেছিল নেতাজীর উদাত্ত বাণীতে, বস্তুত প্রেরণা-প্রবুদ্ধ বাঙালীর কণ্ঠস্বরে যে সুর বেজেছে যুগে যুগে, সে সুরের মর্ম কিন্তু খাবারের দোকানদার বুঝলেন না। আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা ক্ষীণকান্তি বৃদ্ধ খেঁকিয়ে উঠলেন।

"না মশাই, মাপ করবেন, ভদ্রলোকের ছেলেকে ও-কাজ আমরা দিতে পারব না।"

"একবার দিয়েই দেখুন না।"

দিবসের কণ্ঠস্বরের আকুলতাটা ন্যাকামি বলে' ঠেকল বৃদ্ধের কানে। যে কারণে ঠেকল সেইটেই উল্লেখ করলেন তিনি এর পর।

"না মশাই, একবার দিয়ে শিক্ষা হ'য়ে গেছে। গরীব বাঙালী

বলে' ভদ্রচেহারার এক ছোকরাকে রেখেছিলাম একবার। নগদ পঁচিশটি টাকা মেরে সরে' পড়েছে। পরাতটা পর্যন্ত ফেরত দেয় নি, সেই থেকে নাক-কান মলেছি, আর নয়।"

সত্যি সত্যি তিনি নিজের নাক-কান মলে' কার উদ্দেশে নমস্কার করলেন যেন। এবং তারপর বক্তব্য শেষ করলেন এই কথাগুলি দিয়ে—"আমাদের ওই ছোট লোকই ভাল।"

বিজ্ঞানের ছাত্র দিবস নিঃসংশয়ে অনুভব করলে যে কথাটা সত্য। অনবধানতাবশত কপাটের চৌকাটে মাথাটা সজোরে ঠুকে গেলে মনের যে-রকম অবস্থা হয় দিবসের ঠিক তাই হ'ল। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ক্ষণকাল, তারপর মনে হ'ল এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা অশোভন হচ্ছে, মনে হ'তেই সরে' দাঁড়াল একটু। সরে' দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল কি করবে এখন। হঠাৎ, কানে গেল সেই বৃদ্ধ বলছেন—"পাঞ্জাবি উড়িয়ে তেড়ি কেটে' ফেরিওয়ালা-গিরি করতে এসেছেন। মতলববাজ, চোর সব!"—শোনা মাত্রই মনে হ'ল এটা সত্য নয়, এর প্রতিবাদ করা উচিত। দোকানের সামনে ফিরে এল সে আবার। চৌকাটে সজোরে মাথা ঠুকে গিয়েছিল বলেই সম্ভবত প্রতিবাদটা একটু ঝাঁজালো গোছের হ'য়ে গেল।

"একজন হয়তো আপনাকে ঠকিয়েছে, কিন্তু সবাইকে ওই দলে ফেলবেন না। আপনিও তো পাঞ্জাবি গায় দিয়ে তেড়ি কেটে' বসে' আছেন, আপনি কি চোর?"

মোটা ছোকরা ক্ষেপে উঠল।

"মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই।"

"আরে যেতে দাও, যেতে দাও"— চেঁচিয়ে উঠলেন সেই ক্ষীণকান্তি বৃদ্ধই আবার, (তাঁর গলার স্বর মোটেই ক্ষীণ নয়, অপ্রত্যাশিত রকম তীক্ষ্ণ বরং), দিবসের দিকে ফিরে বললেন—"আর কিছু কি বলবার আছে আপনার, না থাকে তো পথ দেখুন"—তর্জনী দিয়ে পথটা দেখিয়ে দিলেন।

তীক্ষ্ণ তীব্র তিক্ত সত্যটাকে নানাভাবে অনুধাবন করতে করতে পথ চলতে লাগল দিবস আবার। যে প্রচণ্ড হাতুড়িগুলো তার অহঙ্কারের জগদ্দল পাথরটার গায়ে ফাটল সৃষ্টি করেছিল, সেই হাতুড়িগুলো যে সত্য, তার অহঙ্কারের পাথরটা যে চুরমার হ'য়ে যাওয়াই উচিত (নিজেই একটু আগে সে এই কথাই ভাবছিল) এ কথা মেনে নিয়েও তার মনে হচ্ছিল, না তবু প্রতিবাদ করা উচিত, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

রঙ্গনা কিন্তু ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। সে তার কোণের ঘরটিতে বসে' বসে' চিঠি লিখছিল একজন আধুনিক লেখককে। যে কোণের ঘরটি চুনীলাল তাকে পড়াশোনা করবার জন্যে দিয়েছিল, সেই কোণের ঘর বসেই সে পরিচয় লাভ করেছিল বৃহৎ বিশ্বের, স্বদেশ-বিদেশের বহু লেখক ভিড় করে' আসত-যেত ওই কোণের ঘরটাতেই। বর্তমান অগ্রগতির যুগে তার স্থান যে কত পিছনে, কত রকম শৃঙ্খল যে তার হাতে পায়ে মনে জড়ানো, উপার্জনের-জন্য-ব্যতিব্যস্ত তার মামার সদাশংকিত মুখভাবে সপ্রতিভতা ফুটিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা, নিরতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তার মামীমার প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বের শোচনীয় মৃত্যু, এসবই সে অনুভব করত তার ওই কোণের ঘরটিতে বসে'। ওইখানে বসেই সে বুঝত যে তার চারিদিকেও জাল ফেলা হচ্ছে, তার বাবা কাশী থেকে এসেছেন ওই জন্যই, সেদিন হঠাৎ একজন ফটোগ্রাফার এসে ফটো তুললেন তারও কারণ ওই, বাবা ঋণ করেছেন, সবই শুনেছে সে এই কোণের ঘরে বসে' বসে' এবং এই কোণের ঘরে বসে' বসেই সে অনবরত মনে মনে রচনা করেছে প্রতিবাদ। এই কোণের ঘরেই সে অনেক স্বপ্ন দেখেছে, অনেক কান্না কেঁদেছে।

সেদিন হঠাৎ সে ভাষা খুঁজে পেয়েছিল।

লিখছিল—"আপনার আঁকা কুসুমের ছবি অতি বাস্তব। এত বাস্তব যে অপমানিত বোধ করেছি। কুসুমকে দেখে' মনে হয়েছিল ও বোধ হয় আমিই। আমাকেই বোধ হয় আপনি এঁকেছেন, আমাকেই দেখেছেন আপনার কল্পনার দূরবীণ লাগিয়ে। তাই আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। মনে হয়েছে আমাদের জন্যে যাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই, কণামাত্র সহানুভূতি নেই, যাঁরা আত্মতৃপ্তি সাধনের জন্য ছবি এঁকে চলেছেন কেবল, কি অধিকার আছে তাঁদের আমাদের এই নগ্ন মূর্তিকে লোকের কাছে বার করবার! আমাদের হ্যাংলামি, আমাদের ছলনা, আমাদের নীচতা, আমাদের দুর্বলতা আমাদেরই থাক, তা নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাতে হ'বে না। সত্যি কথা বলতে কি মাথা আপনারা ঘামানও না। লিখতে পারেন লিখে যাচ্ছেন; সত্যি সত্যি আমাদের জন্য ব্যথা অনুভব করে' যদি সমাজ সংস্কারের আন্দোলন চালাতেন, প্রণাম জানাতাম আপনাকে। সেদিন শুনলাম একজন লেখক (যাঁর লেখায় স্ত্রীজাতির প্রতি দরদ জবজব করে) তাঁর স্ত্রীকে ধরে' মারেন নাকি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর তিনি নাকি বিরোধী। আমাদের সমাজে কুসুমরা আছে, খুব ভাল করেই জানি। আমি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, নিজেকে চিনি, নিজের চারদিকে দেখিও, আমি জানি কি অবস্থা আমাদের। জীবনে কোনও আনন্দ নেই, সৌন্দর্য নেই, আশা নেই, নিজেদের যে কি অবস্থা তা বোঝাবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। শুধু গ্রাসাচ্ছাদনটুকুর জন্য কি অপমান লাঞ্ছনা গঞ্জনা যে আমরা সহ্য করি। ওইটুকু পাবার জন্যই হাতজোড় করে' দাঁড়িয়ে আছি সারি সারি ঘরে ঘরে। নিজেদের অবস্থাটা যে কি তাতো কাউকে বোঝাবার ক্ষমতা নেই, বোঝাতে গেলেও কেউ বুঝতে চায় না। চুপ করে' থাকে, অনেক সময় হাসে, টিটকারিও দেয়। নিজেদের দুরবস্থার কথা শুনতে চায় না, তাদের এ দুরবস্থা যে কখনও ঘুচবে এ বিশ্বাসও তাদের নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করতে তারা ভুলে গেছে। তারা বিশ্বাস করে কেবল তাদের হ্লাদিনী শক্তির উপর, যা ভাঙিয়ে তাদের এতকাল চলেছে। আপনার লেখায় একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুর ফুটে উঠেছে। আমার কিন্তু ও নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ভাল লাগে না, ওদের উপর রাগও করতে পারি না। আমি জানি আমরা একদিন জাগব। আমাদের মনুষ্যত্ব মরে নি, সেটা চাপা পড়ে' গেছে শুধু। সমাজের কুৎসিত নিয়ম, নানারকম কুসংস্কার, মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখানোর ছলে প্রতিপদে তাদের অপমান এসব অতিক্রম করে' আমরা একদিন জাগব। যেদিন জাগব সেদিন হয়তো সুস্থমনে আপনাদের—যাঁরা আমাদের ক্ষতের উপর লাথি মেরে মেরে আমাদের সচেতন করেছেন—ক্ষমা করতে পারব। লর্ড কার্জনকে পরাধীন ভারত যেমন ক্ষমা করতে পারে নি, আমরাও তেমনি আজ আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারলাম না।" ভ্রূকুঞ্চিত করে' লিখে চলেছিল রঞ্জনা, তার অধর স্ফুরিত হচ্ছিল।

—দিবস হাঁটছিল। ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল খুব। পাশের গলি থেকে একটা রিক্‌শ বেরুল।

"এই রিক্‌শ—"

রিক্‌শওয়ালা এগিয়ে এল তার দিকে।

"কাঁহা যানে হোগা হুজুর ?"

"সোজা চিৎপুরের দিকে।"

দিবস রিক্‌শয় উঠে বসল। রিক্‌শ চলতে লাগল। এতক্ষণ ঘুরে' ঘুরে' একটা কাজ যোগাড় করতে পারে নি সে। কাজ কিন্তু যোগাড় করতেই হ'বে। যে ক'টা টাকা আছে তাতে ক'দিন চলবে ? রিক্‌শ টানলে কেমন হয় !

"আচ্ছা, রোজ কত করে' বাঁচে তোমার ?" রিক্‌শওয়ালাটাকে জিগ্যেস করলে সে হঠাৎ।

"উস্‌কা কই ঠিকানা নেহি হুজুর। তিন রুপিয়া, চার রুপিয়া।"

"আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারিস ?"

"কোন্ কাজ ?"

"রিক্‌শ টানার।"

রিক্‌শওয়ালা ঘাড় ফিরিয়ে হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দিবসের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। মনে করলে বাবু রসিকতা করছেন বোধ হয়।

"ই সব কাম বাবু ভেইয়াকো বাস্তে নেহি হুজুর। আপ নেহি সেকিয়ে গা—।"

দিবস নেবে পড়ল রিক্‌শ থেকে। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বিদায় করে' দিলে তাকে। আবার হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত সব কথা মনে হ'তে লাগল তার। মনে হ'তে লাগল সত্যিই যখন টাকাগুলো ফুরিয়ে যাবে, যখন খাবার কেনবার পয়সা থাকবে না একটিও, তখনও যদি কাজ না পাওয়া যায় একটা, নিশ্চয়ই সে বাড়ি ফিরে যাবে না, কি করবে তাহ'লে ? পণ নিয়ে বিয়ে করবে ? হাসি পেল হঠাৎ। তার মতো নিঃস্বকে কন্যা সম্প্রদান করবে কে ! কিন্তু যদি করত বেশ হ'ত ! স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে রোজগার করা যেত। বিয়ে করা বিষয়ে তার মত খুব বৈজ্ঞানিক। অল্প বয়সে বিবাহ করার পক্ষপাতী সে। তার ধারণা, আজকাল ছেলেমেয়েরা বিবাহের দায়িত্বটা এড়িয়ে চলতে চাইছে বলেই আরও বেশী দায়িত্বহীন হ'য়ে পড়েছে। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে চায় সবাই রঙিন বেলুনের মতো। তার মতে পৃথিবীর সব জিনিসই যেমন স্ব স্ব স্থানে থেকে সুস্থ আছে মাধ্যাকর্ষণের টানে এবং হাওয়ার চাপে—সমাজের প্রত্যেক লোকও তেমনি ঠিক থাকে পারিবারিক আকর্ষণে এবং সামাজিক নিয়মের চাপে। আমাদের যুগটা যে বেঠিক পথে চলেছে তার কারণ পরিবার পালনের দায়িত্ব নিতে চায় না কেউ, সামাজিক নিয়ম অমান্য করবার দিকেই সকলের ঝোঁক বেশী। সামাজিক অনেক নিয়ম বদলানো প্রয়োজন, কিন্তু সেই পরিবর্তিত নিয়মও মানতে হ'বে। "আমি যা খুশী করব" অর্থাৎ তেমন কিছুই

করব না, স্রোতে গা ভাসিয়ে থাকব কেবল, এই মনোভাব পছন্দ নয় দিবসের। পছন্দমতো পাত্রী পেলে সে বিয়ে করতে প্রস্তুত এখনই, এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও—প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি লিখবে একটা ? বেশী কিছু নয়, কেবল—আমি এম. এস-সি পাস করেছি, পরিশ্রম করতে প্রস্তুত আছি, মানুষের মতো বাঁচতে চাই, আমাকে একটা কাজ দিন, যে কোনও কাজ—তখনই মনে হ'ল চিঠিটা তাঁর হাতে পৌঁছবেও না বোধ হয়, তাঁর সেক্রেটারী ভ্রূ কুঁচকে বা মৃদু হেসে ছিঁড়ে ফেলে দেবে সেটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে—চিঠি লেখার কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে' গেল তার—পরেশ তাকে যে ঠিকানাগুলো দিয়ে গিয়েছিল তার সব জায়গায় যাওয়া হয় নি, যাবার ইচ্ছেও নেই, সে ভেবেছে প্রত্যেক জায়গায় নিজের পরিচয় এবং ঠিকানা দিয়ে এক একটা চিঠি ফেলে দেবে, যদি কোথাও লেগে' যায়—সামনে একটা পোস্টাফিসও পেয়ে গেল, একগোছা পোস্টকার্ড কিনে একের পর এক চিঠি লিখে যেতে লাগল সে পোস্টাফিসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—চিঠি লেখা শেষ করে' একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেলে—চা খেতে খেতে মনে হ'ল কয়েকটা জিনিস কেনা হয় নি এখনও—হাঁসের জন্য ধান কিনতে হ'বে, লণ্ঠন কিনতে হ'বে একটা, লণ্ঠন কিনলে আবার কেরোসিন চাই কিন্তু (চমৎকার-শেড-দেওয়া তার ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্পটার কথা মনে পড়াতে মন-কেমন করে' উঠল একটু), কেরোসিন কিনতে হ'লে বোতল চাই, পারমিটও চাই, না, দরকার নেই লণ্ঠনে, মোমবাতি কিনলেই হ'বে, কিন্তু মোমবাতিতে খরচ যে অসম্ভব, কারণ তাকে পড়তেই হ'বে, না পড়লে ঘুম হয় না রাত্রে, হয়তো গোটা দুই মোমবাতি লাগবে রোজ, তা লাগুক, মোমবাতিই কিনতে হ'বে (এই মোমবাতির জন্যে যে সৌদামিনীর কাছে তাকে বকুনি খেতে হ'বে পরে এবং সেই বকুনি যে তার স্নেহবন্ধনে আর একটা গ্রন্থি যোজনা করবে এ তার স্বপ্নাতীত ছিল তখন)—সামনেই

একটা মনোহারি দোকান দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে সে—যেতে যেতে হঠাৎ মনে হ'ল বই কিনতে হ'বে একটা, সরোজও—এ ছুটো জিনিস অবিলম্বে কিনে ফেলা দরকার আগে—মনে পড়ল কিরণের কথা, বই এবং সরোদের সঙ্গে কিরণ যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—কিন্তু না, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'বে তাকে, তার আগে সে কারও সঙ্গে দেখা করবে না, উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের বাইরে যাবার প্রস্তাবে স্বাভাবিক মানুষের মন যেরূপ সংকুচিত হয় তারও অনেকটা তেমনি হ'ল যেন। বিবিধ তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত তরণীর মতো ভেসে' চলেছিল তার মন, চিন্তার তরঙ্গে, কিন্তু পালে লেগেছিল আনন্দের হাওয়া, অজানা সাগরের উদ্দেশে উড়ে' চলেছিল মন চাঁদসদাগরের ময়ূরপঙ্খীর মতো—কিছুদূর গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল সে মুগ্ধ হ'য়ে কতগুলো পাখি দেখে', একটা পাখিওয়ালা খাঁচায় করে' পাখি বিক্রি করছে, কি সুন্দর পাখিগুলো, কি চমৎকার গায়ের রং! তন্ময় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। খানিকক্ষণের জন্যে ভুলে গেল সব। সমস্ত ভুলে তন্ময় হ'য়ে যাবার অসাধারণ শক্তিই যে তার আসল। শক্তি, এই শক্তিই যে তাকে ঘরছাড়া করেছে, এ খবর নিজেও জানত না সে বোধ হয়। সুন্দর কিছু দেখলেই তার মনের ভিতরের কৌতূহলী শিশু আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে সেটার দিকে, আগ্রহ না মেটা পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে না সেটাকে, দরকার হ'লে তার পিছু-পিছুও যায় স্থান কাল পাত্র সব বিস্মৃত হ'য়ে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল এই জন্যই, একটা সুন্দর আদর্শকে অনুসরণ করে'—পাখিগুলোকে সে ঘুরে'-ফিরে দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে', বিলিতি পাখি, 'গোল্ড্ ফিন্চ্', কি সুন্দর ডানাগুলো, মনে হচ্ছে এক একটা প্রজাপতি যেন পিঠে চড়ে' বসে' আছে প্রত্যেক পাখিটার, বিলিতি পাখি যদিও কিন্তু ধান খাচ্ছে—হঠাৎ উঠে পড়ল সে, মনে পড়ল তাকেও ধান কিনতে হ'বে হাঁসের জন্য—

চুনীলালকে বেগ পেতে হ'ল না বেশী। বিকাশবাবু যে বেহালা বাজান এ খবর সে অন্নদার মুখে শুনেছিল। এসেই বেহালার আওয়াজ কানে ঢোকা মাত্রই তার অঙ্কটা মিলে গেল। সুতরাং নিমেষের মধ্যে সে ঠিক করে' ফেললে কি করবে, কি বলবে। এক ঢিলে এতগুলো পাখি মরবে এ আশাই সে করে নি। পাখিগুলো কিন্তু ঢিলের মুখে এক লাইনে সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে' ভারি আনন্দ হ'ল তার। খবরটা পাঠিয়ে দিয়ে দেওয়ালে বিলম্বিত ম্যাডোনার বিখ্যাত ছবিটির দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইল। চুনীলাল ছবিটাকে দেখছিল না, (ছবির কিছু বোঝে না সে, র‍্যাফেলের নামও শোনে নি) সে নিজের মনের আনন্দটাকে উপভোগ করছিল। কি করে' কথাটা পাড়া যায় এই সমস্যাটা সত্যিই ব্যাকুল করছিল তাকে। অন্নদা যেভাবে বিকাশবাবুর নাগাল পেয়েছিল সেভাবে নাগাল পাওয়ার ইচ্ছে মোটেই ছিল না চুনীলালের। কারও থ্রু দিয়ে কোন কিছু করা পছন্দ করে না সে। জীবনযুদ্ধে নানাভাবে বিক্ষত হ'য়ে সে এটুকু বুঝেছে যে লক্ষ্যে পৌঁছতে হ'লে লক্ষ্যটাকে উদ্দেশ্য করে' সোজা সবেগে দৌড়নই বুদ্ধিমানের কাজ। মাঝখানে থ্রু জাতীয় কিছু থাকলে সেটা 'হার্ডল্ রেস' হ'য়ে দাঁড়ায়। ওই মধ্যবর্তী ভদ্রলোকগুলি অনেক সময়ই সহায় না হ'য়ে বাধা হ'য়ে দাঁড়ান। সে সোজাসুজি বিকাশবাবুর সঙ্গেই কথা কইবে ঠিক করে' এসেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কি প্রসঙ্গ নিয়ে যে আলাপ শুরু করবে তা সে ভেবেই পাচ্ছিল না। শুধু আলাপ শুরু করলেই হ'বে না, আলাপটাকে বাঞ্ছিত পথে চালিয়ে নিয়ে যেতেও হ'বে। বেহালার সুর শুনে' নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে, কিন্তু বেশ ঘাবড়ে গেল বিকাশবাবু যখন এলেন। বিকাশবাবু লোকটিকে সে কল্পনায় যা ভেবেছিল (আমরা সবাই এই কাণ্ড করি, যাকে কখনও দেখি নি, নাম শুনেই কল্পনায় তার একটা চেহারা ঠিক করে' ফেলি এবং পরে হতাশ হই)

তিনি মোটেই সেরকম নন। চুনীলাল ভেবেছিল রোগা-পাতলা ছিমছাম তরুণ-তরুণ অর্থাৎ নাটকে নভেলে সিনেমায় প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যে ধরনের চেহারা-ওলা ছোকরারা, বিকাশবাবুকেও সেই ধরনের ভেবেছিল সে। কিন্তু যা দেখল তা একেবারে উল্‌টো। লোকটি বেশ বলিষ্ঠ। লম্বা চওড়া গড়ন। পরিধানে প্যাণ্টালুনের উপর ড্রেসিং গাউন। মুখে পাইপ। চোখ-মুখের ব্যঞ্জনায় কোমলতার আভাস মাত্র নেই। ভাবলেশহীন মুখ। এই লোকটাই বেহালা বাজাচ্ছিল? এরই ভাল লেগেছে রঙ্গনাকে? আশ্চর্য!

"আপনিই কি চুনীলালবাবু, আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?"

"হ্যাঁ, আমিই। বিকাশবাবু আপনারই নাম?"—স্মিতমুখে উঠে দাঁড়াল চুনীলাল।

"হ্যাঁ, কি দরকার বলুন তো?"

"বলছি—বসুন"—চুনীলাল কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুর ফুটিয়ে তুললে যেন সে-ই বাড়ির মালিক আর বিকাশবাবু যেন অতিথি। বসবার পর চুনীলালের চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল হঠাৎ, সে কি একটা যেন চেপে যেতে চাইছিল, কিন্তু পারলে না।

"মাপ করবেন, আগে একটা কথা জিগ্যেস করে' নি। এখনই বেহালার যে আওয়াজ শুনছিলাম তা কে বাজাচ্ছিল বলুন তো, অদ্ভুত বাজাচ্ছিল, এই বাড়িরই কেউ কি?"

বিকাশবাবুর ভাবলেশহীন মুখ ভাবলেশহীন রইল না আর। এক ঝলক কুণ্ঠিত হাসির কিরণে তার চেহারা বদলে গেল, ওই এক ঝলক হাসিই যেন তাঁর নিষ্প্রাণ পোশাকী আবরণটাকে সরিয়ে প্রকাশ করে' দিলে আসল মানুষটাকে। চুনীলাল আশ্বস্ত হ'ল, তার মনে হ'ল লোকটি ভদ্র, ভালমানুষ।

"আমিই বাজাচ্ছিলাম।"

এই দুটি কথা বলে' আরও যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন বিকাশবাবু। তাঁর কানের পাশটা লাল হ'য়ে উঠল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল

চুনীলাল, তার মনে হ'ল, বাঃ এক টোকাতেই পাহাড় থেকে ঝরনা বেরিয়ে পড়ল যে !

"আপনি ? আপনি অমন চমৎকার বেহালা বাজাতে পারেন ? একথা শুনলে তো জামাইবাবু আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন।"

বিকাশবাবুর মুখভাব আবার একটু কঠিন হ'য়ে গেল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি চুনীলালের দিকে।

বিকাশবাবুকে শুনিয়ে চুনীলাল যেন অর্ধ-স্বগতোক্তি করলে—"হ'য়ে যদি যায়, মণিকাঞ্চন যোগ হ'বে।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা"—সবিস্ময়ে এবং ঈষৎ সসংকোচে বিকাশবাবু বললেন।

"খুলেই বলি তাহ'লে। আমার ভগ্নীপতি হচ্ছেন গহনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মস্ত বড় ওস্তাদ একজন। গান-বাজনা নিয়েই সারা জীবনটা কাটিয়েছেন। একদম আত্মভোলা লোক। দিদি মারা যাবার পর থেকে আরও আত্মভোলা হ'য়ে গেছেন। কাশীতেই থাকেন বরাবর, সম্প্রতি এখানে এসেছেন। এসেছেন মানে জোর-জবরদস্তি করে' আমিই আনিয়েছি তাঁকে। তাঁর মেয়েটি—ওই একমাত্র সন্তান তাঁর—আমার কাছে থাকে। এখানেই পড়াশোনা করছে। এবার আই-এ দেবে। এইবার কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা করতে হ'বে তো তার। জামাইবাবুকে চিঠি লিখে তাই আনিয়েছি এবং ভাগ্নীর ফটো পকেটে নিয়ে পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি চারদিকে। আজ সকালেই আপনার খবর পেলাম একজনের কাছে—"

এই পর্যন্ত বলে' চুনীলাল পকেট থেকেই কাগজে মোড়া ফটোটি বার করে' আড়চোখে চাইলে একবার বিকাশের দিকে। বিকাশের মুখভাব আবার কঠিন হ'য়ে এসেছে দেখে' মনে মনে হাসলও একটু। 'গোমড়া মুখ করা বার করছি তোমার থাম না'—এই কথাগুলো মনে মনে আওড়ালও একবার। তারপর নিম্নকণ্ঠে বলল—"আপনার দাদার কাছে না গিয়ে আপনার কাছেই প্রথমে

এসেছি তার কারণ আপনি যদি মত দেন তাহ'লেই নিশ্চিন্ত মনে এগুতে পারি। ফটো দেখে' যদি পছন্দ হয় আপনার—কারণ ওইটেই হ'ল প্রধান জিনিস—"

ফটোর মোড়কটি খুলে' ফটোটি তুলে' ধরলে সে বিকাশবাবুর চোখের সামনে। তার জীবন্মৃত আত্মসম্মান ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করল যদিও দু'একবার কিন্তু তার কোনও আভাস চোখে-মুখে ফুটল না। বরং চোখে-মুখে যা ফুটল তা প্রত্যাশা।

ব্যাপারটা প্রত্যাশার অতীত ছিল কিন্তু বিকাশবাবুর কাছে। সত্যিই রঙ্গনাকে ভাল লেগেছিল তাঁর। যদিও আলাপ হয় নি, কিন্তু ভাল লেগেছিল। বিয়েবাড়ির সমস্ত আলো গিয়ে পড়েছিল যে মেয়েটির মুখে, সমস্ত উৎসব ছন্দিত হচ্ছিল যার কলহাস্যে, স্পন্দিত হচ্ছিল যার ভ্রূভঙ্গিতে, যে মেয়েটি তারপর হারিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ, যার খোঁজ সে একাধিকবার নেবার চেষ্টা করেছে তার বোনের কাছে এবং নিতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়েছে—তার ফটো এমনভাবে দেখবেন বিকাশবাবু সত্যিই আশা করেন নি।

কিন্তু চুনীলাল যা আশা করেছিল তা হ'ল না। বিকাশবাবু কোনরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। নির্বাক্ হ'য়ে রইলেন শুধু।

ফুটপাথ দিয়ে হনহন করে' হেঁটে আসছিল উর্মি গুনগুন করে' গান গাইতে গাইতে। বহুলোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগছিল ভিড়ে, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করছিল না সে। কাঁধের উপর থেকে মাঝে মাঝে খসে' পড়ছিল রঙীন ছাপা শাড়ির আঁচলটা, স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া স্যাণ্ডালটা বার-বার খুলে' আসতে চাইছিল পা থেকে, দু'একটা অসভ্য লোকের অশ্লীল দৃষ্টি খোঁচার মতো বিঁধছিল মনে, তবু কিন্তু তার মুখের হাসি নেবে নি, ম্লান হয় নি চোখের দৃষ্টি, কানের পাশের অলকগুচ্ছ নাচছিল ঠিক তেমনি করে'। হরিণীর মতো ছুটে' চলেছিল সে। চলেছিল কিরণের বাড়ির উদ্দেশে। দেবার মতো সুসংবাদ ছিল

কয়েকটা। প্রথম—একজন সিনেমা ডিরেক্টার তাকে ইণ্টারভিউ করতে চেয়েছেন। নাচ আর চেহারা যদি পছন্দ হয়—ওঃ তাহ'লে কি মজাই হ'বে! দ্বিতীয় সুসংবাদ, গহনচাঁদবাবুর মেয়ে রঞ্জনা রাজি হয়েছে কিরণের গানে সুর দিতে। তৃতীয় সুসংবাদ, গহনচাঁদবাবুর কথ্‌থকি নাচ শেখাবেন তাকে, বিশেষ করে' ময়ূর নাচটা। তিন-তিনটে পালে হাওয়া লেগেছিল। মোড়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি চুষতে চুষতে যে মোটা কালো লোকটা পিঁচুটি-ভরা চোখে মিটমিট করে' চাইছিল তার দিকে, সে লোকটাকে দেখতেই পেল না ঊর্মি। দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল সে।

সূর্যকান্তবাবু কাছারি থেকে ফিরে বেশ দ্রুতবেগেই বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। তিনি যদি বুঝতে পারতেন যে বেগটা অশোভন রকম দ্রুত হয়েছে, তাহ'লে হয়তো নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হ'তেন একটু। কারণ শুধু ব্রজর কাছে নয়, নিজের কাছেও তিনি ধরা পড়তে চাইছিলেন না। মনকে চোখ ঠারছিলেন বললে ঠিক তাঁর মনোভাবটি ব্যক্ত হয় না। কারণ 'ঠারা' কথাটির মধ্যে যে ভণ্ডামির আমেজ আছে তা তাঁর মধ্যে স্পষ্টভাবে ছিল না। যে চেতনা তাঁর গতিবেগকে দ্রুত করে' দিচ্ছিল তিনি সে চেতনার সম্বন্ধে সচেতনই ছিলেন না। 'আমি যা করেছি তা ঠিকই করেছি' অহং-স্ফীত এই সত্তাটা আড়াল করে' রেখেছিল সেটাকে। তিনি সেটাকে ভাল-ভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন না। দেখতে চাইছিলেনও না। কিন্তু সেটা ছিল এবং তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর গতিবেগকে দ্রুততর করে' দিচ্ছিল। তিনি ড্রাইভারকে মানা করে' দিয়েছিলেন যে তাঁকে কাছারি থেকে আনবার জন্য মোটর নিয়ে যাবার দরকার নেই। আপাতদৃষ্টিতে মানা করবার একটা সঙ্গত কারণও খাড়া করেছিলেন অবশ্য। কাছারি থেকে কখন তিনি ছুটি পাবেন তার স্থিরতা ছিল না কিছু, ড্রাইভারটা অনর্থক অপেক্ষা করবে কেন, তিনি কাজ শেষ হ'লে

'বাসে' কিংবা 'ট্রামে' ফিরতে পারবেন অনায়াসে। কিন্তু এরকম পরিস্থিতি তো ইতিপূর্বে আরও অনেকবার ঘটেছে, ড্রাইভারের প্রতি সদয় হ'য়ে তাকে ছুটি দেবার কথা ইতিপূর্বে কেন মনে পড়ে নি একথাটা সূর্যকান্ত চৌধুরী যে ভাবেন নি তা নয় (আড়ালে অবস্থিত তাঁর দ্বিতীয় সত্তাটা ইশারায় ইঙ্গিতে সচেতন করেছিল তাঁকে এ সম্বন্ধে, তাছাড়া তিনি বুদ্ধিমান লোকও)—কিন্তু তিনি ভাবতে চাইছিলেন না। কাছারি থেকে ফিরবার পথে ট্রাম-ডিপোতে তিনি যে কিরণের নাগাল পেতে চান এবং সেটা ড্রাইভারের কাছ থেকে গোপন রাখতে চান, এই তথ্যটার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে লজ্জা করছিল তাঁর এবং লজ্জা করছিল বলে' চটে' যাচ্ছিলেন তিনি। নিজের উপরই চটে' যাচ্ছিলেন, নিজের দুর্বলতা নিজের কাছেই স্বীকার করতে চাইছিলেন না। অপরে তা জেনে ফেলুক সেটা আরও বেশী করে' চাইছিলেন না, সুতরাং তার জন্যে এই যে লুকো-চুরি করতে হচ্ছে সেটা সোজাসুজি মানতে বাধছিল তাই তাঁর। তিনি নিজের কাছে, ব্রজর কাছে, ড্রাইভারের কাছে, গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে, বস্তুত সকলের কাছেই এই কথাটা জাহির করে' রাখতে চাইছিলেন যে তিনি যা করেছেন তা দিবসের ভালর জন্যেই করেছেন, দিবস যদি তাঁর অবাধ্য হ'য়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, যাক, তার জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই তাঁর, কর্তব্যের খাতিরে যতটুকু খোঁজখবর করা দরকার ততটুকু কেবল তিনি করবেন, রাস্তায় রাস্তায় হাহাকার করে' বেড়াবেন না। তিনি যদিও উপরোক্ত মর্মে কারও কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হন নি, তবু তাঁর মনে হচ্ছিল যে ওই ধরনের একটা বেপরোয়া কর্তব্যপরায়ণতা আস্ফালন করতে না পারলে পাঁচজনের কাছে (বিশেষত প্রিয়বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে যিনি ইংরেজি ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন 'সিট্ অন্ হিম্') তিনি খেলো হ'য়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর গোপন সত্তাটা দম্‌কা হাওয়ার মতো এসে বেসামাল করে' দিচ্ছিল তাঁকে যেন—-তাঁর

কেতাদুরস্ত বাইরের পোশাকটাকে বিস্রস্ত করে' ফেলছিল, উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যেন মাথায় টুপিটা টাকটাকে অনাবৃত করে'—চটে' যাচ্ছিলেন তিনি। ট্রাম-ডিপোতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কিরণের যখন নাগাল পেলেন না, কিরণ কখন 'ডিউটি'তে আসবে সে খবরও যখন পেলেন না কারও কাছ থেকে (আজকাল সবাই এমন আত্মকেন্দ্রিক যে তাঁর কথা ভাল করে' শুনলেই না অনেকে, যাঁরা শুনলে তারা দায়-সারা গোছ উত্তর দিয়ে দিলে) তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লেন তিনি খানিকক্ষণের জন্য। কিরণের বাসার ঠিকানা তো জানা নেই তাঁর। সে মাঝে মাঝে বাড়িতে আসত যেত, সে দিবসের বন্ধু, দিবস তারই উৎসাহে তার কাছ থেকে সরোদ বাজানো শিখেছে, এই সবই তিনি জানতেন। এর বেশী যে আর কিছু জানা দরকার একথা একবারও মনে হয় নি তাঁর। কত লোকের সঙ্গেই তো রোজ দেখা হয়, কত লোকের সঙ্গে হৃদ্যতাও আছে কিন্তু তাদের বাসার ঠিকানা তো জানেন না তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল দিবস হয়তো ফিরেছে এতক্ষণ। তিনি বৃথাই হয়তো সময় নষ্ট করেছেন এখানে। মনে হওয়ামাত্রই তিনি ট্রাম-ডিপো থেকে বেরিয়ে এলেন এবং একটি ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি ফিরলেন। ট্যাক্সিটাকে বাড়ির সামনে পর্যন্ত নিয়ে গেলেন না, কারণ এ ধরনের অপব্যয় করতে দেখলে ব্রজ বাড়ি মাথায় করবে, ট্যাক্সিটাকে মোড়ের সামনে দাঁড় করিয়ে বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে গেলেন। বেশ দ্রুতবেগেই গেলেন। তাঁর মনের সেই গোপন ব্যক্তিত্বটা (যার কাছে পরাভব তাঁকে স্বীকার করতেই হ'বে একদিন, যার প্ররোচনায় পড়ে' অসুখের ভান পর্যন্ত করতে হ'বে) তাঁর গতিবেগকে অশোভন রকম বাড়িয়ে দিলে।

বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই গেলেন তিনি দিবসের ঘরে। গিয়েই চোখে পড়ল ভাঙা সরোদটা টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। ব্রজই তুলে' রেখেছে নিশ্চয়। নিস্তব্ধ হ'য়ে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন সেটার

দিকে ক্ষণকাল। তারপর একটু এগিয়ে গেলেন টেবিলটার দিকে, স্পর্শ করতে ইচ্ছে হ'ল সরোদটাকে। কিন্তু ভয় হ'ল। মনে হ'ল ছুঁলেই বোধ হয় প্রতিবাদ করে' উঠবে সরোদটা। অযৌক্তিক ভয়টা কাটিয়ে উঠতে অবশ্য বেশী দেরি হ'ল না তাঁর, কিন্তু যে যুক্তিসঙ্গত দ্বিধাটা তারপর তাঁর মনে এল আবছাভাবে সেটা আরও হাস্যকর। ক্রিমিনাল কেসে প্র্যাকটিস করেন বলে' যে কারণে তিনি 'সিভিল' কেস ছুঁতে চান না, সঙ্গীত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হ'য়ে সরোদটা স্পর্শ করতে তেমনি ধরনের একটা সংকোচ হ'ল তাঁর ক্ষণিকের জন্য। তবু তিনি ইতস্তত করে' এগিয়ে গেলেন এবং সন্তর্পণে সরোদটা তুলে' নেড়েচেড়ে দেখলেন একবার। কিন্তু ধরা পড়ে' গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। ব্রজ ঘরে ঢুকলে সেই মুহূর্তে।

"দিবস ফেরে নি ?"

সরোদটা টেবিলে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"না। সমস্ত দিন তো হাপিত্যেশ করে' বসে' আছি"—এইটুকু বলেই ব্রজ থামল না, সমস্ত দিন ধরে' তার মনে যে কথাটা নানা-ভাবে পল্লবিত হচ্ছিল তার নির্যাসটুকুও ব্যক্ত করলে—"ছেলে এখন বড় হয়েছে, তাকে কি অমন করে' বকে ?"

সূর্যকান্ত অকারণে গোঁফটাকে বাঁ হাত দিয়ে মুছে চোখ-মুখে এমন একটা ভাব ফোটাতে চেষ্টা করলেন যার অর্থ—'তুমি ওকে মানুষ করেছ তা মানছি, কিন্তু ছেলেকে কখন কি ভাবে বকতে হ'বে তা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি। এ তুমি যা করছ তা অনধিকার চর্চা'—চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু ফুটল না এবং কেবলমাত্র চোখ-মুখের ভঙ্গিতে এত লম্বা ভাব প্রকাশ করা যে তাঁর সাধ্যাতীত একথাও তিনি যে না বুঝলেন তা নয়, কিন্তু কথা দিয়ে তা ফোটা-বারও চেষ্টা করলেন না। ব্রজর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

পথশ্রান্ত পদক্লান্ত দিবস সন্ধ্যার সময় যখন খোলার ঘরে ফিরে এল তখন তার উৎসাহ অনেকটা কমে' গেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে জেদটা যে বেড়ে গেছে তা নিজে সে স্পষ্টভাবে টের পায় নি তখনও। সূর্য অস্ত গেলে অন্ধকারটাকে যেমন আমরা বড় করে' দেখি, প্রথম প্রথম চাঁদটা যেমন চোখেই পড়ে না, দিবস হতাশার অন্ধকারেই তেমনি বিষণ্ণ হ'য়ে পড়েছিল, অন্তরের নিভৃতে ক্রমবর্ধমান আত্মশক্তিটাকে উপলব্ধি করতে পারছিল না ভাল করে'। সে বুঝতেই পারছিল না কি করে' কি হ'বে। অথচ—এই 'অথচ'টার আড়ালে উজ্জ্বলতর হচ্ছিল তার আত্মশক্তি।

অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে একটা দেশলাই কাঠি জ্বাললে সে প্রথম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগেই সব কিনে এনেছিল সে। টেবিল, চেয়ার, শেলফ, বিছানা। আয়না, চিরুনী—দু'খানা বই, ধানের পুঁটুলি (ধান কিনতে গিয়ে একটা গামছাও কিনতে হ'ল পুঁটুলি বাঁধবার জন্য) এবং মোমবাতির প্যাকেটটা টেবিলে রেখে' দিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা ফেলে দিলে সে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে'। তারপর হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে চৌকিটার উপর বসল। তার মাকে মনে পড়ল হঠাৎ, অর্থাৎ সেই ছবিটাকে যেটা বাবার শোওয়ার ঘরে টাঙান আছে। খুব ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে সে, জীবন্ত মায়ের মুখটা ভাল মনে নেই তার। ঘোমটা দেওয়া একখানি সুন্দর মুখের খানিকটা ঘেরা টকটকে একটা পাড় —এর বেশী আর কিছু মনে পড়ে না। অয়েল-পেন্টিং ছবিখানা আর স্মৃতির এই অস্পষ্ট টুকরোটা দুটোই ফুটে উঠল পাশাপাশি মনের ভিতরে। তার মনে হ'ল মা যদি বেঁচে থাকতেন তাহ'লে সে কি এমনভাবে চলে' আসতে পারত? কিন্তু তখনি আবার মনে হ'ল মা কি তাকে এমনভাবে বাধা দিতেন? বাবাকে বুঝিয়ে তিনি তাকে রিসার্চই করতে দিতেন ঠিক। স্মৃতির অস্পষ্ট টুকরোটা, টকটকে লাল-পাড়-ঘেরা সেই সুন্দর মুখখানা একটু নড়ে' উঠল

যেন, মনে হ'ল তার দিকে যেন ফিরে দেখতে চাইছে কিন্তু পারছে না। মায়ের একটা ছবি পাওয়ার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠল সে সহসা। কিন্তু তা পাওয়া যাবে না। মায়ের ওই একটা ছবিই অনেক কষ্ট করে' করেছিলেন বাবা অস্পষ্ট একটা ফটো থেকে, সেই সাহেব চিত্রকরও চলে' গেছেন দেশে বহুদিন আগে, হয়তো বেঁচেও নেই। অয়েল-পেন্টিংয়ের কচি মুখখানা আবার ভেসে' উঠল মনে। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি তরুণী। মুখে ফুটে উঠেছে লজ্জার আভার সঙ্গে মৃদু হাসি, চক্ষু দুটি আনত। অনেকদিন সে নির্নিমেষে চেয়ে থেকেছে ছবিটার দিকে, কিন্তু আনতদৃষ্টি আনতই থেকে গেছে, একবারও তার মুখের দিকে চেয়ে দেখে নি। পাশেই বাবার ফটোখানাও টাঙানো আছে। কত তফাত! বাবা প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে' চেয়ে আছেন সামনের দিকে, মনে হয় চোখে চোখ রেখে' কথা বললেন বুঝি এখনই। ফটোখানা সেই তুলিয়েছিল কিছুদিন আগে, তার এক বন্ধু ফটোগ্রাফার তুলেছিল ফটোটা। পরমুহূর্তেই যে কথাটা মনে হ'ল তার, যে প্রবল বাসনাটা জাগল, তাতে নিজেই অবাক্ হ'য়ে গেল সে। যে বাবার জেদের জন্য সে নিজের কাম্য পথে যেতে পায় নি, যাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে' বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরতে হচ্ছে, তাঁরই একখানা ছবি যোগাড় করে' টাঙিয়ে রাখবার ইচ্ছে হ'ল তার। ধূসরের জন্য আকুল হ'য়ে উঠল সবুজ। অসম্ভব হ'বে না এটা, তার সেই বন্ধুর কাছে গেলে একখানা কপি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ফটোতে বাবার চোখে যে প্রসন্ন দৃষ্টি ফুটে উঠেছে—হঠাৎ তার মনে হ'ল—সে দৃষ্টির অন্তরালে কোনরকম নীচতা হীনতা সংকীর্ণতা লুকিয়ে থাকতে পারে না। প্রচলিত কুসংস্কার, অর্থহীন চক্ষুলজ্জা, অতীতকে আঁকড়ে থাকবার প্রয়াস প্রভৃতি কতকগুলো জিনিস হয়তো তাঁকে আধুনিক হ'তে দেয় নি (আধুনিকতা নিয়ে গোবিন্দ সাণ্ডেলের সঙ্গে যে তর্ক সূর্য চৌধুরী পরে করবেন তা যদি শুনতে পেত দিবস!) কিন্তু—দিবসের

মনে হ'ল—ওই চোখের দৃষ্টিটা তো মিথ্যে নয়; তার বাবার স্বরূপ ধরা যেন পড়ে' গেছে ঐ চোখের দৃষ্টিতে—

"এ কি কপাট খোলা, ঘর অন্ধকার, কি গো বাবু ফিরেছেন নাকি?" সৌদামিনীর সাড়া পেয়ে দিবস চমকে উঠে দাঁড়াল।

"এখনই ফিরলাম।"

"আলো জ্বালেন নি?"

"জ্বালছি, এস।"

দিবস তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি জ্বেলে ফেললে। সৌদামিনী এসে ঢুকল ঘরের ভিতর। দিবস যে এ-পাড়ায় বেমানান তা সৌদামিনীর বুঝতে দেরি লাগে নি। যে ধরনের বাবুরা এ-পাড়ায় সাধারণতঃ থাকেন বা আসেন তাদের সৌদামিনী চেনে। তাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আছে, কিন্তু তাদের চালচলনে বস্তির এমন একটা ছাপ থাকে যা পেঁয়াজ বা হিংয়ের গন্ধের মতো কিছুতেই ঢাকা পড়ে না। দিবস 'হংসো মধ্যে বকো যথা' নয়। 'বকো মধ্যে হংসো যথা' বললেও ঠিক সেই ভাবটা বর্ণনা করা যাবে না যা সৌদামিনীর মনে জাগছিল। 'গোবরে পদ্মফুল' সৌদামিনী নিজেই বলত হয়তো জিগ্যেস করলে, কিন্তু তা-ও তার মনোভাব ঠিক প্রকাশ করত না। গোবর-গাদাতেও পদ্মফুল না হোক, ফুল ফোটে বইকি, আর পদ্মফুল যেখানে ফোটে তা গোবরগাদা না হ'লেও পাঁকের গাদা। সৌদামিনীর যা মনে হচ্ছিল, যা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিল না, তা 'আঁস্তাকুড়েতে জরির টোপর কে বসিয়ে দিয়ে গেল' গোছের কিছু একটা। দিবসের স্বল্পভাষণে, তার চোখের প্রদীপ্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে, পার্থিব বিষয়ে তার ঔদাসীন্যে (ঘরের কপাটটাই খুলে' রেখে' চলে' গিয়েছিল!), তার মুখভাবের শুচিতায় এমন একটা ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হচ্ছিল যার আভিজাত্য আয়ত্তাতীত বলে' চিরকাল শ্রদ্ধাবিষ্ট করে' রেখেছে সৌদামিনীদের। যা তারা জানে, খেলো হ'য়ে পড়বে না কিছুতেই, অর্থাৎ, যা (এটা

অবশ্য সৌদামিনী ভাবছিল না) দেবদাস-চন্দ্রনাথ-সতীশেও পর্যবসিত হ'বে না শেষ পর্যন্ত, যার শুভ্রতা পঙ্ক স্পর্শ করেও নির্মল থাকবে আলোকের মতো চিরকাল।

"বাইরে থেকে খেয়ে এসেছেন, না এইখানেই রান্নাবাড়া করবেন? পিছনের বারান্দার উনুনটা ঠিক করে' রেখেছি আমি।"

ঘরের ভিতর ঢুকে মৃদু হেসে বললে সৌদামিনী।

"পিছনের বারান্দায় উনুন আছে নাকি একটা!"

এই কথা শুনে' সৌদামিনীর শ্রদ্ধা—যা অনতিবিলম্বে স্নেহে পরিণত হ'বে—আরও বেড়ে গেল যেন। মনে হ'ল বাড়িভাড়া নিয়েছে অথচ বাড়ির কোথায় কি আছে তা ভাল করে' দেখে নি—আশ্চর্য লোক!

"উনুন আছে বইকি। ঢাকা বারান্দা, দিব্যি রান্না করা যাবে।"

"না, রান্নাবাড়া আমার পোষাবে না। কিনেই খেতে হ'বে। কাছে-পিঠে হোটেল আছে কোনও?"

"আছে। মোহন ঠাকুরের হোটেল। কিন্তু আগে থাকতে বলে' না দিলে—"

"সেইখানেই ব্যবস্থা করব কাল থেকে।"

"সে তো না হয় কাল থেকে হ'বে। আজ? আজ কি উপোস করে' থাকবেন নাকি?"

"বাজার থেকে কিছু কিনে-টিনে খাব এখন।"

"আমি তো বাজারের দিকেই যাচ্ছি, কি খাবেন বলুন, কিনে নিয়ে আসব এখন।"

"তাহ'লে তো ভালই হয়। কিছু লুচি আর তরকারি এনো তাহ'লে। এই নাও।"

দশ টাকার নোট দিলে একখানা। সৌদামিনী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে সন্ত-কেনা বই দুটোকে। আবার তার মনে হ'ল, আশ্চর্য

লোক, বই কিনে এনেছে, খাবার কিনে আনে নি। খিদেও পায় না নাকি এদের!

"কত লুচি আনব?"

এই প্রশ্নে মুশকিলে পড়ে' গেল দিবস। ভেগা নক্ষত্রের দিকে আমাদের সৌরমণ্ডল কত বেগে এগিয়ে যাচ্ছে অথবা পজিট্রনের চতুর্দিকে যে ইলেক্‌ট্রনরা নৃত্য করে' বেড়াচ্ছে তাদের চরিত্র কি রকম, এসব প্রশ্ন করলে দিবস সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত উত্তর দিতে পারত, কিন্তু কত লুচিতে তার পেট ভরে এ তো সে ঠিক জানে না। অথচ বেঠিক উত্তর দিতেও তার বৈজ্ঞানিক মন ইতস্ততঃ করতে লাগল। একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে তাই সে বললে, "আট-দশখানা এনো। তরকারি বেশী এনো একটু।"

সৌদামিনী চলে' গেল। সৌদামিনী চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গে দিবস ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইল জ্বলন্ত শিখাটার দিকে। মাঝে মাঝে কেঁপে যাচ্ছে বটে কিন্তু সোজা ঊর্ধ্বমুখে জ্বলবার চেষ্টা করছে। এর থেকে একটা বিশেষ নীতি আহরণ করে' তার অবসন্ন মন যে চাঙ্গা হ'য়ে উঠল তা নয়, কত ওজনের লুচিতে তার পেট ভরে এই সংবাদ না-জানার লজ্জাও তার অন্তর স্পর্শ করে নি মোটেই (ধান কোথায় পাওয়া যায় এই অতি সাধারণ খবরটাও সে জানত না, এবং এই অজ্ঞতার জন্যেও মুষড়ে পড়ে নি সে), বস্তুতঃ কোনরকম চিন্তাই জাগছিল না তার মনে, সে নির্নিমেষে জ্বলন্ত শিখাটার দিকে চেয়েছিল কেবল। অনবরত নিদারুণ চিন্তাভারে প্রপীড়িত হ'বার পর আমাদের মন মাঝে মাঝে ছুটি নেয়, কিছুই ভাবতে চায় না আর, ভাবতে পারে না, সমস্ত ভয়-ভাবনা থেকে সরে' গিয়ে আত্মগোপন করে' নিশ্চিতলোকে কিছুক্ষণের জন্য। এরকম নির্বিকার হবার ক্ষমতা মনের আছে, তাই মুমূর্ষু সন্তানের মাথার শিয়রে জননী ঘুমিয়ে পড়তে পারে, নেপোলিয়নরা বিশ্রাম নিতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে। জ্বলন্ত শিখাটার দিকে চেয়ে দিবসের মন বিশ্রাম নিচ্ছিল তেমনি। তারপর আবার

ধীরে ধীরে সক্রিয় হ'য়ে উঠল তা। বাড়ি থেকে চলে' আসবার পর সমস্ত দিন কি কি কাজ করেছে তারই হিসাব করতে লাগল সে।

তবলচি সীতারাম (বড় বড় চোখ, চমৎকার পাকানো গোঁফ) এবং সারেঙ্গি রমজান (গোলগাল মুখ, গালভরা ননমহেশ দাড়ি) দু'জনেরই কোলকাতা শহর খুব ভাল লেগেছিল। তাদের দু'জনেরই বাড়ির অবস্থা সচ্ছল, কোলকাতা শহরে কিছুদিন শফর করে' গেলে কারও সংসারই অচল হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। তাই কোলকাতা শহরে কিছুদিন কাটিয়ে যেতে আপত্তি ছিল না তাদের। ভয় ছিল গুরুজি (মানে গহনচাঁদ) যদি থাকতে রাজী না হন, কিন্তু তিনি রাজী হওয়াতে তারা খুশী হয়েছে। চুনীলাল কাছাকাছি একটি ছোট বাসা ঠিক করে' দেওয়াতে থাকবারও বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। একটি ছোট ঘরে দু'জনেই থাকে। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ, আর একজন মুসলমান। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি। মনের মিল থাকলে কোন কিছুতেই আটকায় না। তাছাড়া যে আর্টের ক্ষেত্রে তারা মিলেছিল সেখানে সুরই প্রধান কথা, বে-সুরের স্থান নেই। তাই ওই ছোট ঘরেও সীতারামের আহ্নিকপূজা, রমজানের নমাজে একটুও ব্যাহত হচ্ছিল না। আনন্দেই দিন কাটছিল তাদের। তাছাড়া সবচেয়ে আনন্দিত হয়েছিল তারা রঙ্গনাকে দেখে। গুরুজির বেটি যে এমন হ'বে তা তাদের কল্পনাতীত ছিল। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, আর তেমনি গানের গলা। ওর বিয়ে তো দেখে' যেতেই হ'বে। জরুর! সীতারামের মতে এ মেয়ের স্বয়ংবরা হওয়া উচিত। মতটা অবশ্য সে প্রকাশ্যে বলতে পারে নি গহনচাঁদকে। রমজানের ধারণা ঠিক উলটো। তার মতে বেগমের মতো পর্দানশীন করে' রাখলেই রঙ্গনাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। অমন একটা 'নেহায়েৎ নাজুক' সৌন্দর্যকে পথে-ঘাটে ছেড়ে দেওয়াটা কি ভাল? কিন্তু সে-ও মতটা প্রকাশ করতে পারে নি গহনচাঁদের কাছে। দু'জনেই কিন্তু মুগ্ধ হ'য়ে

গিয়েছিল রঙ্গনাকে দেখে'। সেদিন সন্ধ্যার সময় দিবস যখন তার খোলার ঘরে মোমবাতির শিখাটার দিকে চেয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল তখন চুনীলালের বাড়িতে জমে' উঠেছিল গানের সভা। রঙ্গনা গাইছিল, সঙ্গত করছিল রমজান আর সীতারাম। গহনচাঁদ মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিলেন বসে'। গান শেষ হ'য়ে যাবার পর গহনচাঁদ চোখ খুললেন।

"কেমন লাগল তোমাদের?"—হাসিমুখে চাইলেন তিনি প্রথমে রমজান, তারপর সীতারামের দিকে।

"ফার্স্ট ক্লাস"—সীতারাম ইংরেজিতেই বলে' উঠল। এই ধরনের দু'চারটে আংরেজি 'লবজ্' সে জানে এবং আওড়ায় মাঝে মাঝে।

"বহুত আচ্ছা"—রমজান মৃদু হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে এবং অনেকক্ষণ ধরে' ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল, যেন সে যা বলতে চায় তা ভাষার অতীত।

"ওর গান শুনে' ভাল লাগলে ওকে ভাল একটা সেতার কিনে দেব বলেছি। দেওয়া যাক তাহ'লে, কি বল?"

"জরুর"—'বেশক্'—সীতারাম, রমজান সমস্বরে বলে' উঠল। হেসে ফেললে রঙ্গনা।

"কি যে করছ তুমি বাবা, সামান্য একটা সেতার কেনা নিয়ে।"

"কাল নিয়ে আসিস।"

কন্যার দিকে স্নেহভরে চেয়ে বললেন গহনচাঁদ। গহনচাঁদের মুখের দিকে চেয়ে সাহস বেড়ে গেল রঙ্গনার। কলেজ থেকে ফিরে অবধি যে কথাটা সে বলব বলব করে' বলতে পারে নি তার মনে হ'ল এই তো বলবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। মামাকে বললে তিনি রাজি হ'য়ে যাবেন—সেবার বোলপুর যাবার সময় কিছু তো বলেন নি—কিন্তু বাবা হয়তো আপত্তি করতে পারেন। বোলপুরের কথা বাবাকে সে জানায়ও নি।

"বাবা আর একটা জিনিস দেবে আমাকে?"

"আবার কি ?"

"দু'তিন দিনের ছুটি। এক জায়গায় বেড়াতে যাব।"

"কোথায় ?"

"গিরিডি। আমাদের কলেজের মেয়েরা 'আউটিং' করতে যাচ্ছে। আমাকেও যেতে বলছে।"

"গিরিডি! ও বাবা, সে যে অনেকদূর। তোদের সঙ্গে থাকবে কে ?"

এই কথায় আত্মসম্মান আহত হ'ল রঞ্জনার। তার ধারণা পুরুষরা তাদের আগলে রেখে' রেখে' আর পাহারা দিয়ে দিয়ে আরও পঙ্গু করে' ফেলছে দিন দিন। তারা কি এতই ঠুনকো যে রক্ষণাবেক্ষণের 'ক্রেট্' দিয়ে মুড়ে না পাঠালে ভেঙে যাবে! কি আশ্চর্য!

"সঙ্গে ? মানে, পাহারা দেবার জন্যে ?"

"পাগলির কথা শোন। একা যাবি তোরা অতদূর ? যেতে পারবি ?"

"খুব পারব। না পারবার কি আছে ?"

রমজানের চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে গেল একটু। সীতারাম তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মুচকি হেসে বললে—"জরুর। কাহে নেহি শেকেগী ?"

"ক'জন যাবি তোরা ?"

"আট-দশজন।"

"এর আগে গেছিস কখনও ?"

"গেলবার বোলপুর গিয়েছিলাম।"

"সঙ্গে কেউ ছিল না ?"

"মাসীমা ছিলেন সেবার।"

"মাসীমা ? কার মাসীমা ?"

"হস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।"

"ও"—অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হ'লেন গহনচাঁদ—"এবারও যাবেন তিনি ?"

"যেতে পারেন। না-ও যদি যান কি ক্ষতি তাতে"—তারপর ঈষৎ হাসি, ঈষৎ ব্যঙ্গ, ঈষৎ অনুযোগ মিশিয়ে (অপরূপ হ'য়ে উঠল তার মুখশ্রী এই তিনের সংমিশ্রণে) বললে—"কি যে মনে কর তোমরা আমাদের, আমরা কচি খুকি নাকি ?"

"তা নয়তো কি। কোথা থেকে কখন কি বিপদ হয়—"

এর পর রঞ্জনা কিন্তু যা করে' বসল তা কচি খুকিকেই মানায়। দু'হাত দিয়ে গহনচাঁদের গলা জড়িয়ে ধরে' আবদারভরা কণ্ঠে বললে—"না বাবা আমি যাব। তুমি মানা কোরো না। কিছু হ'বে না।"

"এই দেখ, এই দেখ"—বিব্রত হ'য়ে উঠলেন গহনচাঁদ—আচ্ছা বেশ তো, চুনী আসুক তাকে জিগ্যেস করি।"

"মামা তো বোলপুর যেতে মানা করে নি।"

ঠিক এই সময় চুনীলালও এসে ঢুকল। বিকাশবাবুকে গাঁথতে পেরে বেশ পুলকিত হ'য়ে ফিরেছিল সে!

"মামা, আমরা সেবার বোলপুরে আউটিং করতে যাই নি ?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলে তো, কেন, কি হয়েছে ?"

"এবার গিরিডি যেতে চাইছে"—ভ্রূকুঞ্চিত করে' এবং ঈষৎ অসহায়ভাবে বললেন গহনচাঁদ।

"তা যাক না। কলেজের মেয়েরা ওরকম আউটিং করে মাঝে মাঝে।"

"তাহ'লে যাস। কবে যেতে হ'বে ?"

"সে এখনও দেরি আছে কয়েকদিন।"

"এই যদি রেওয়াজ হ'য়ে থাকে আজকাল, যাস।"

রঞ্জনার চোখে-মুখে হাসি ফুটে উঠল এবং তা দেখে' সীতারাম এবং রমজানের চোখে-মুখেও হাসি ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তারা

দু'জনেই রুদ্ধশ্বাসে যেন অপেক্ষা করছিল ব্যাপারটার কি 'ফায়সলা' হয় শোনবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত রঞ্জনার জয় হওয়াতে তারাও খুশী হ'ল। রমজান যদিও মনে মনে পর্দার পক্ষপাতী কিন্তু রঞ্জনা খুশী হওয়াতে তারও চোখে-মুখে ফুটে উঠল আনন্দ।

তার ছোট টেবিলটায় শালপাতার উপর লুচি তরকারি সাজিয়ে দিতেই দিবস গিয়ে খেতে আরম্ভ করে' দিল। খুব খিদে পেয়েছিল তার। সৌদামিনী সেদিকে আড়চোখে একবার চেয়ে আঁচলের গেরো খুলতে লাগল। একগাদা খুচরো ভাঙানি এনেছিল সে। সেগুলি টেবিলের একধারে স্তূপীকৃত করে' রাখতে রাখতে সে বললে—"আগেই যে খেতে আরম্ভ করে' দিলেন, এগুলো গুনে নিন।"

দিবস হাসিভরা চোখে তার দিকে এক-নজর চেয়ে লুচি মুখে পুরলে আর একখানা। কোনও কথা বললে না, গুনে নেবার কোনও দরকারও প্রকাশ করলে না। হঠাৎ এক ঝলক আনন্দ আবার আপ্লুত করে' ফেলেছিল তার সমস্ত মন। সমস্ত দিনের ব্যর্থতা, সমস্ত দিনের পরিশ্রম হঠাৎ যেন সার্থক হ'য়ে উঠেছে তার মনে হচ্ছিল। সে যে এই খোলার ঘরে বসে' খেলো টেবিলের উপর শালপাতা পেতে বাজারের অখাদ্য লুচি তরকারি খেতে পারছে, তার মনে যে কোনও গ্লানি কোনও অনুতাপ হচ্ছে না এই ঘটনাটাই তার চমৎকার মনে হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল এই তো পেরেছি, এইতো পেরেছি—।

"আগে এগুলো গুনে গেঁথে রেখে' দিলে পারতেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকব কতক্ষণ ?"

"দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার নেই।"

"এগুলো গুনে নেবেন না ?"

"পরে নেব এখন।"

সৌদামিনী মুচকি হেসে চেয়ে রইল একটু।

"কম হ'লে।"

"কি আর করব।"

"যাই তাহ'লে। আর কিছু দরকার নেই তো?"

"জল-

"ও, হ্যাঁ—"

তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে আনল সে।

"আর কিছু দরকার নেই তো?"

"ছিল আর একটা দরকার। কিন্তু থাক, সে কাল সকালে হ'লেও চলবে।"

"এখনই শুনি না।"

"একটা ময়লা কাপড় আর ময়লা জামা চাই। গেঞ্জি হ'লেও চলবে।"

"ওমা! ময়লা জামা-কাপড় নিয়ে কি হ'বে?"

"ময়লা কাপড় জামা না হ'লে চাকরি জুটছে না।"

"কি চাকরি করবেন আপনি?"

"যা জোটে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' রইল সৌদামিনী। দিবসের সম্বন্ধে পাকা-পোক্ত যে ধারণাটা সে করে' নিয়েছিল (যা যাচাই করে' নেবার প্রয়োজনও সে অনুভব করছিল না) সেই ধারণার সঙ্গে যে সংবাদটি সে দিতে যাচ্ছিল তা মোটেই খাপ খায় না। দিবসের মতো ছেলের পক্ষে ওটা সুসংবাদ না হবারই কথা। শোনামাত্রই হয়তো হো হো করে' হেসে উঠবে। কিন্তু ময়লা কাপড় জামার কথা যখন বলছে, তখন হয়তো—হঠাৎ শশীবাবুর কথা মনে পড়লো সৌদামিনীর, বড়লোকের ছেলে ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে পথের ভিখারী হ'য়ে পড়েছিল একেবারে—

"আচ্ছা আপনার দেশ কোথা ?

সন্তর্পণে কথাটা পাড়লে সৌদামিনী। তার ভয় হচ্ছিল হয়তো অসাবধানে নিদারুণ ব্যথার স্থানটিতেই বুঝি খোঁচা দিয়ে ফেলবে।

"দেশ হুগলি জেলায়। কিন্তু কোলকাতাতেই আছি বরাবর।"

"এখানে বাড়ি আছে আপনার ?"

সৌদামিনীর চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল যখন দিবস ঘাড় নেড়ে' জানালে কোলকাতাতেই বাড়ি আছে তার।

"এখানে বাড়ি আছে ? খোলার ঘরে আসা কেন তাহ'লে ?"

দিবসের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

"বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে' চলে' এসেছি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।"

সৌদামিনার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে' দিশাহারা হ'য়ে পড়েছিল, হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল তার। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, পিতার সঙ্গে পুত্রের, বস্তুতঃ যে-কোন পুরুষের সঙ্গে যে-কোন পুরুষের বিরোধ ঘটাবার যে সনাতন কারণটা সকলের মনে গাঁথা হ'য়ে আছে, সেইটে সৌদামিনীরও মনে হ'ল।

"সৎ-মা আছে বুঝি ?"

"না।"

"তবে ?"

"আমার মা আমার ছোটবেলায় মারা গেছেন। বাবা আর বিয়ে করেন নি।"

"বাবার সঙ্গে ঝগড়া হ'ল কেন তাহ'লে ?"

"বাবা চান আমাকে উকিল করতে। কিন্তু আমার তা ইচ্ছে নয়।"

"যত সব ছেলেমানুষি ! কালই বাড়ি ফিরে যান আপনি !"

সৌদামিনীর স্নেহতরল কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ভর্ৎসনার আমেজ এমন মধুরভাবে বাজল যে মুগ্ধ হ'য়ে গেল দিবস। এতক্ষণ ভাল করে'

সে চেয়েই দেখে নি সৌদামিনীর দিকে, এইবার ভাল করে' চেয়ে দেখলে। দেখলে গোলগাল মুখটিতে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো, স্নেহ আর বিস্ময়ের সঙ্গে ছদ্মকোপের দ্যুতি অপরূপ করে' তুলেছে চোখের দৃষ্টিকে।

"উকিল হ'তে দোষটা কি! ভদ্দর লোকের ছেলেরাই তো উকিল হাকিম জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট হয়—"

"উকিলরা গরীবদের কেউ নয়। ওদের কাজ হচ্ছে বড়লোক বদমাইসদের আইনের হাত থেকে বাঁচানো, ও আমি পারব না।"

ভারি কৌতুক লাগল সৌদামিনীর। বিশেষত এই শেষের কথা কটাতে।

"ও আমি পারব না"—ভারি মিষ্টি একটি আবদারের ঝংকার তুললে যেন। কিন্তু কার কাছে আবদার করছে ও?

"আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দাও, যদি পার, যে-কোনও কাজ।"—দিবস বলে' চলেছিল—"আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে উকিল, ডাক্তার, মাস্টার, কেরানী, না হ'য়েও আমরা মানুষের মতো বাঁচতে পারি—"

"কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে হ'লে—" সকৌতুকে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সৌদামিনী কিন্তু দিবসের কথার তোড়ে (যার জন্যে নিজেও সে পরে লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল একটু, কিন্তু যা তখন রোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল) ভেসে' গেল তার প্রতিবাদ।

"ভদ্রলোকের ছেলে হ'লেই কি একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা থাকতে হ'বে চিরকাল? তাছাড়া ভদ্রলোক মানে কি! তোমরা কি আমাদের চেয়ে কম ভদ্র? আমরা একটি মুখোশ পরে' আছি, তোমাদের সেটা নেই। আমি সেই মুখোশটি খুলে' তোমাদের কাছে এসেছি বলে' তোমরাও আমাকে তাড়িয়ে দেবে।"

দিবসের গলার স্বরটা কেঁপে উঠল একটু। এবং তা শুনে' সেই

মুহূর্তে সৌদামিনীর জন্ম হ'ল নব-জগতে। ওই কম্পনের ধাক্কাটা তার অন্তরলোকের এমন একটা দ্বার খুলে' দিলে হঠাৎ যা কখনও কেউ খোলে নি আজ পর্যন্ত। একটা নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল তার চিত্ত। সে বুঝল এই বলিষ্ঠকায় যুবকটি আসলে একটি শিশু, দুরন্ত দামাল শিশু। ওর এই গোঁয়ার্তুমির ঝক্কি তাকেই এখন পোয়াতে হ'বে। বাধা দিলে উল্‌টো ফল ফলবে। বাধা দিতে গিয়েই ওর বাপ এই কাণ্ডটি করেছে। মা নেই কিনা—মা থাকলে এমন হ'ত না। দিবসের খাওয়া শেষ হয়েছিল। কথাগুলো বলেই সে হাত ধুতে গেল। সৌদামিনী চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কি করা যায়। যে ছলনাময়ী নারী বহু সংকটময় মুহূর্তের জটিলতাকে যাতুমন্ত্র বলে সরল করবার কৌশল আয়ত্ত করে' জীবনের এতটা পথ অতিক্রম করেছে, সেই ছলনাময়ী নারী আত্মপ্রকাশ করল যেন তার মধ্যে। দিবস হাত ধুয়ে ফিরে আসতেই সৌদামিনী মিষ্টি হেসে বললে—"ওমা, ওকি অলুক্ষুণে কথা। তাড়িয়ে দেব কেন? থাকতে যদি পারেন মাথায় করে' রাখব। কাজও একটা যোগাড় করে' দিতে পারি। কিন্তু আপনি তা পারবেন কি? গিরি যে মেসে কাজ করে সে মেসে ফাই-ফরমাশ খাটবার জন্যে একটা চাকর দরকার। সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত আর বিকাল ৪টে থেকে ৮টা পর্যন্ত কাজ, মাইনে শুকো কুড়ি টাকা। আপনি যদি করতে পারেন হ'য়ে যেতে পারে কাজটা। কিন্তু আপনি কি পারবেন এ কাজ করতে?"

মুখে যদিও হাসির আভাস ছিল না মনে মনে কিন্তু হাসছিল সৌদামিনী। তার মনে হচ্ছিল কাজের বর্ণনা শুনেই পিলে চমকে যাবে বাবুর।

"খুব পারব। করে' দাও আমাকে কাজটা।"

"বেশ বলি তাহ'লে গিরিকে। গতর খাটালে আবার কাজের

ভাবনা। কিন্তু আপনাদের হ'ল সুখী শরীর, আপনারা কি আমাদের মতো পারবেন”—

“কি জিদি ছেলে বাবা,” মনে মনে বললে সৌদামিনী।

“খুব পারব। তুমি দিয়েই দেখ না। হ্যাঁ, আর একটা কথা—”

“কি ?”

“তুমি আমাকে আর আপনি বলতে পাবে না। আর আমি তোমাকে দিদি বলে' ডাকব এখন থেকে।

সৌদামিনী এটা প্রত্যাশা করে নি। সহসা অভিভূত হ'য়ে পড়ল সে। তারপর সামলে নিয়ে ডান হাতের তর্জনীটি চিবুকের একধারে ঠেকিয়ে বলে' উঠল—“কি কাণ্ড !”

চোখের দৃষ্টিতে উথলে উঠল স্নেহ।

পাঁচ

গোবিন্দ সাণ্ডেল সূর্য চৌধুরীর প্রকৃত বন্ধু এবং পাকা লোক, হাতে সময়ের অভাবও নেই, তাই তিনি থানা আর হাসপাতালগুলো তন্নতন্ন করে' খুঁজে ফেললেন। সমস্ত দিন সমস্ত রাত এবং তার পর-দিন সকাল দশটা পর্যন্ত যখন দিবসের কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না তখন এই নাতি-উপেক্ষনীয় ব্যাপারগুলো মিটিয়ে ফেলাই সঙ্গত মনে হ'ল তাঁর। অনুসন্ধানগুলো করলেন অবশ্য সূর্য চৌধুরীকে না জানিয়ে। তাঁর মনে যে এই সব নিদারুণ সন্দেহ জেগেছে এ কথা জানতে পারলে সূর্যকান্ত আরও ঘাবড়ে যাবেন তাঁর মনে হ'ল। দিবস যে মোটর চাপা পড়তে পারে কিংবা পুলিসের হাতে পড়তে পারে এ বিশ্বাস গোবিন্দবাবুর ছিল না। কিন্তু তিনি পাকা লোক, সব দিক সামলে কাজ করাই তাঁর অভ্যাস, ‘অধিকন্তু ন

দোষায়' নীতির অনুসরণ করে' তাই এ কষ্টটুকু বন্ধুর জন্যে তিনি করলেন। ট্রামে বাসে যাতায়াত করতে কিছু অর্থব্যয়ও হ'ল, তা হোক্, তবু তিনি তৃপ্তি পেলেন এতে। একটা কথা তিনি জানতেন না, জানলে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ত না তাঁকে। সূর্য চৌধুরীও গোপনে ঠিক ওই কাজই করেছিলেন। থানায় যান নি অবশ্য তিনি—কারণ দিবসকে যতটা তিনি চিনতেন তাতে তার থানায় যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা তাঁর মনে আসে নি—কিন্তু হাসপাতাল-গুলোতে তিনি গিয়েছিলেন। মোটর চাপা পড়া বিচিত্র নয়, এ কথা তাঁর মনে হয়েছিল।

দুই বন্ধুর সন্ধ্যাবেলায় যখন দেখা হ'ল তখন দু'জনেরই মনে দিবসের সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা গাঢ়তর রঙে আঁকা হ'য়ে গেছে। আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে গোবিন্দ সাণ্ডেলের ধারণা খুব উচ্চ নয় কোন কালেই। সূর্য চৌধুরী যদিও বেসুরো হওয়ার ভয়ে প্রিয় বন্ধু সাণ্ডেলের কথার প্রতিবাদ করতে চাইতেন না কখনও, (গল্পের আসরকে তর্কসভায় পরিণত করবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না, বরং গল্পকে জমাটি করবার জন্যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে দু'চারটে ফোড়নই তিনি ছেড়ে এসেছেন বরাবর) আসলে কিন্তু তিনি আজকালকার আদর্শবাদী ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা করতেন মনে মনে। যত ভুলই করুক—তাঁর মনে হ'ত—ওদের মনের মধ্যে কোনও রকম ভেজাল নেই, ভুল করে' করে'ও ওরা তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক রাস্তায় পোঁছবে। দিবস চলে' যাওয়াতে তিনি নিজেই একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলেন। এর জন্যে যে কষ্টটা ভোগ করছিলেন সেটাকে লঘু করবার জন্যেই সম্ভবত দিবসের আদর্শটাকে উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত করছিলেন তিনি মনে মনে, পুত্র-গর্বে গর্বিত হ'য়ে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন তির্যক পথে।

গোবিন্দ সাণ্ডেল এই শোচনীয় ঘটনাটাকেই বেশ তারিয়ে

তারিয়ে উপভোগ করবেন বলে' এসেছিলেন। তাই মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে আরম্ভ করলেন।

"হুঁঃ, আজকালকার ছেলে, আমি তখনই গোড়ায় যা সন্দেহ করেছিলাম—"

কথা অসমাপ্ত রেখে আড়চোখে তিনি চাইলেন একবার সূর্য চৌধুরীর দিকে এবং আশা করতে লাগলেন সূর্য চৌধুরী এক-আধটা ফোড়ন অন্তত ছাড়বেন। কিন্তু সূর্য চৌধুরী যা করলেন তাতে চম্‌কে গেলেন সাণ্ডেল। এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি।

"আজকালকার ছেলেদের কতটুকু জান তুমি ?"—হঠাৎ প্রশ্ন করে' বসলেন সূর্য চৌধুরী।

সাণ্ডেলমশায়ের চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে' গেলেও হেসেই উত্তর দিলেন তিনি।

"যতটুকু জানি ততটুকুতেই মুগ্ধ হ'য়ে আছি। আর জানবার বাসনা নেই।"

উত্তরটা দিয়ে মুখে মৃদু হাসিটি ফুটিয়ে রেখে' মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন তিনি। তাঁর হাসি থেকে নিষ্ঠুর একটা ব্যঙ্গ ইঁটের মতো ছিটকে গিয়ে সূর্য চৌধুরীর কপালে আঘাত করলে যেন। সূর্য চৌধুরী গম্ভীরভাবে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন প্রথমে—"কিচ্ছু জান না তুমি," কিন্তু পরমুহূর্তেই আর একটা ইঁট এসে লাগল এবং তার ফলে শুধু যে তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চতর গ্রামে উঠে গেল তা নয়, তিনি যে উপমাটা ব্যবহার করলেন তা দুর্বোধ্য ঠেকল সাণ্ডেলমশায়ের কাছে।

"আমরা কেউ কিচ্ছু জানি না। আমরা আমাদের সেকেলে জুতোগুলো ওদের পায়ে জোর করে' পরাতে যাচ্ছি, ওরা তো বিদ্রোহ করবেই।"

চোখ বড় বড় করে' চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ গোবিন্দবাবু।

"জুতো ! মানে ?"

"আমাদের সেকেলে মতামত একালে চলবে কেন? নূতন যুগের মানুষ ওরা, ওদের পথ তো আলাদা হ'বেই।"

নিজের অভিমতটা প্রাঞ্জল করেও কিন্তু সুবিধা হ'ল না। চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত এবং ভ্রূযুগল ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত করে' সাণ্ডেলমশাই বললেন, "পথ! ও বাবা! দেখ ভাই সূর্যকান্ত, কয়েকটি কথা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। 'নবযুগ' 'পথ' 'তরুণ' 'সবুজ'—এসব শুনলেই পট করে' মাথায় খুন চড়ে' যায় আমার। দোহাই তোমার, ও-কথাগুলি শুনিয়ো না আমাকে।"

সূর্য চৌধুরী আত্মস্থ হ'য়ে পা দোলাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। মৃদু হেসে বললেন, "বেঁচে থাকলেই শুনতে হ'বে। তোমার মাথায় খুন চড়ে' যায় বলে' সত্য মিথ্যা হ'য়ে যাবে না। সে তার পথে ঠিক চলবে।"

এইবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সাণ্ডেলের। একটু ঝুঁকে' বেশ একটু তিক্তকণ্ঠেই বলে' ফেললেন তিনি—"পথ পথ করছ, পথটা কি বুঝিয়ে বলতে পার?"

"খুব পারি"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন সূর্য চৌধুরী—"যে পথে আমাদের পূর্বপুরুষরা মধ্য এসিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, যে পথে আমরা পাড়াগাঁর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে শহরের ক্লাবে এসেছি, পঞ্চায়েত ছেড়ে আশ্রয় করেছি আদালতকে।"

"ও বাবা!"—মৃদু হাসি ফুটে' উঠল সাণ্ডেলমশায়ের অধরে। হাসিমুখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি বন্ধুর মুখের দিকে। তারপর বললেন, "এতই যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে তাহ'লে ছটফট করে' মরছ কেন?"

"ছটফট করে' মরছি কে বললে তোমাকে?"

"তোমার চোখ মুখ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চোখের কোলে কালি পড়েছে। রাত্রে ঘুমোও নি বোধ হয়।"

"ছটফট যদি করেই থাকি তাহ'লে সেটা আমার দুর্বলতা।"

"এতক্ষণ পরে খাঁটি কথা বলেছ একটি। দুর্বলতা একটু-আধটু নয়, ষোল আনা। গোড়াগুড়ি দুর্বলতা প্রকাশ করেছ, আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছ ওর।"

সূর্যকান্ত চুপ করে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "কথাটা একটু অশোভন হ'বে আমার মুখে, তবু তুমি বন্ধু বলেই বলছি তোমাকে, দিবুর মতো হীরের টুকরো ছেলেকে যতটা আদর করা উচিত তার সিকির সিকিও করি নি আমি। কড়া শাসনের উপরই রেখেছি বরাবর। মা-হারা ছেলে—"

হঠাৎ থেমে' গেলেন সূর্যকান্ত। গোবিন্দ সাণ্ডেলও অনুভব করলেন অন্য সুরে কথা কওয়া উচিত এবার। বড্ড দমে' গেছে লোকটা। দু'একবার মাথায় হাত বুলোবার পর তাঁর হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল। ব্যক্ত করলেন সেটা।

"রেস্ত ফুরুলেই বাছাধন ফিরে আসবেন। ক'টা টাকা নিয়ে গেছেন?"

"ওর স্কলারশিপের পাঁচ শ' টাকা ওর নিজের অ্যাকাউন্টে ছি[illegible] সেই টাকাগুলো ও বার করে' নিয়েছে খবর পেয়েছি।"

"ও বাবা, তাই নাকি! ওর অ্যাকাউন্টে টাকা রাখতে গেছ কেন? কি আপদ!"

"ওর টাকা ওর অ্যাকাউন্টে থাকবে না তো কার অ্যাকাউন্টে থাকবে?"

গোবিন্দ সাণ্ডেল চুপ করে' রইলেন ক্ষণকাল, তারপর বললেন, "টাকাগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরবে না। দু'চার দিন দেরি হ'বে আর কি। টাকাগুলি শেষ হ'লে সুড়সুড় করে' ফিরে আসবে দেখো। কোলকাতা শহরে পাঁচ শ' টাকা খরচ করতে অবশ্য বেশী সময় লাগে না।"

এই পর্যন্ত বলে' সামলে গেলেন তিনি। এর পর তার মনে হচ্ছিল 'আর আমি যেটা সন্দেহ করছি তা যদি হ'য়ে থাকে তাহ'লে

ও ক'টা টাকা তো ফুট কড়াই হ'য়ে যাবে দেখতে দেখতে'—কিন্তু একথাগুলো আর বললেন না তিনি। বন্ধুর মনে দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। ভাগ্যে বলেন নি, কারণ পরমুহূর্তেই যা ঘটল তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ব্রজ এসে ঢুকল একটা পার্শেল বগলে করে'।

"তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, এই পার্শেলটা আজ এসেছে দুপুরের ডাকে।"

"কিসের পার্শেল?"

"খুলে' তো দেখি নি। তোমার মুহুরি এসেছিল সেই সই করে' নিয়ে রেখে' গেল।"

"খোল দেখি। পার্শেল কোথা থেকে এল বুঝতে পারছি না।"

পার্শেল খুলে' দেখা গেল একটা শাল, একটা মোটা লুই আর একখানা চিঠি রয়েছে। দিবসের চিঠি। দিবস লিখছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আমার স্কলারশিপের টাকাগুলো আজ বার করে' নিলাম। আমার অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল আমার স্কলারশিপের টাকা দিয়ে আপনাকে একখানা শাল আর ব্রজদাকে একটা ভাল গায়ের কাপড় কিনে দেব। তাই কিনে আজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার হাতে যে কয়টা টাকা রইল তা দিয়ে অনায়াসে আমার কয়েকদিন চলে' যাবে। এর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই একটা কাজ যোগাড় করে' নিতে পারব। আমি পরীক্ষা করে' দেখতে চাই নিজের সামর্থ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কি না। আমার জন্য আপনারা অনর্থক মন খারাপ করে' থাকবেন না। আমি ভাল আছি। আমাকে অনর্থক খোঁজাখুঁজি করেও সময় নষ্ট করবেন না, আমি নিজেই সময় মতো একদিন গিয়ে দেখা করে' আসব আপনার সঙ্গে। একটা রিসার্চের পথে আপনি আমাকে যেতে দেন নি—হয়তো ভাল ভেবেই দেন নি—তাই আর একটা রিসার্চের পথে আমি

অগ্রসর হয়েছি। আমার শিক্ষা এবং শক্তি কতখানি তা আমি যাচিয়ে নিতে চাই। আমি জানি আপনি এ-পথেও আমাকে যেতে দেবেন না, তাই কিছুদিন আত্মগোপন করে' থাকব। আপনি আমার প্রণাম নিন। ইতি— প্রণত

দিবস

সূর্য চৌধুরী নীরবেই চিঠিখানা পড়লেন প্রথমে। এবং পড়বার পরও নির্বাক্ হ'য়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"কার চিঠি?"—ব্রজ প্রশ্ন করল।

"দিবুর।"

"দিবুর? কি লিখেছে?"

সূর্য চৌধুরী জোরে চিঠিখানা পড়লেন আবার। ব্রজ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গোবিন্দ সাণ্ডেলের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করেছিল, তাই ঠোঁট দুটো ফাঁক হ'য়ে গেল একটু।

কিরণ নিশ্চয়ই দিবসের কাণ্ড শুনে' চটে' উঠত কিন্তু দিবস ব্যাপারটাকে এমন একটা বিশিষ্ট উপমা দিয়ে এমন একটা বিচিত্র আলোকে ফুটিয়ে তুললে যে কিরণের কবি-মন রূপকথা-লোকের রঙীন আলোছায়ায় আবিষ্ট হ'য়ে পড়ল। রাগ করবার কথা মনেই হ'ল না তার। এ উপমাটার কথা দিবসেরও হয়তো মনে হ'ত না যদি না সে সস্তায় সেদিন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইয়ের দোকান থেকে আরব্য উপন্যাসখানা কিনে ফেলত। আরব্য উপন্যাস ইতিপূর্বে অনেকবার পড়েছে সে, দ্বিতীয়বার কিনে পড়বার দরকার ছিল না, কিন্তু মলাটের উপর যে ছবিখানা আঁকা ছিল তা এমন মুগ্ধ করে' ফেলল তাকে যে বইটা সে না কিনে পারল না। নিষ্ঠুর সুলতান শাহারজাদি দিনারজাদির কাছে বসে' গল্প শুনছেন। অন্ধকার আকাশের গায়ে আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। আলোর ছোঁয়া লেগে' অন্ধকার স্বচ্ছ হ'য়ে আসছে, সুলতানের নিষ্ঠুরতাও যেন

প্রেমে রূপান্তরিত হচ্ছে রূপকথার ছোঁয়া লেগে'। অদ্ভুত ছবিটা। রমাঁ রলাঁ্যার "I will not rest" বইখানাও কিনেছিল সে, কিন্তু প্রথমেই পড়ে' ফেলেছিল আরব্য উপন্যাসখানা। যদিও সমস্ত দিন অনেক হেঁটেছিল তবু রাত্রে অচেনা জায়গায় ভাল ঘুম হচ্ছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগেই ছিল সে। আর একটা কারণও ছিল— মশা। মশারি কেনা হয় নি। আরব্য উপন্যাস কিন্তু তাকে এমন একটা রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে মশার কামড়ের জ্বালা অসহ্য নয়।

কিরণের বাড়ির সামনাসামনি আসতেই আবার এমন একটা দৃশ্যের মধ্যে সে পড়ে' গেল যে দ্বিতীয়বার মনে পড়ল আরব্য-উপন্যাসের কথা। গলির সামনে ভিড় জমেছে একটা। লোক জুটেছে নানা জাতের, নানা বয়সের। গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে একটি নৃত্যপরা বেদে মেয়েকে দেখছে সবাই। কাছেই ঢোলক বাজাচ্ছে একটি বুড়ো। লম্বকর্ণ রামছাগলও রয়েছে একটি। মেয়েটি যেন রামছাগলকেই নাচ দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে এসে তার থুতনিটা নেড়ে' আদর করছে। মেয়েটির হাতে আছে একটি ট্যামবুরিন। পরনে ঘাগরা, ওড়না। বুকে কাঁচুলি বাঁধা। কোলকাতা শহরে মাঝখানে দিন-দুপুরে একটা ইরানী ছবি মূর্ত হ'য়ে উঠেছে যেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিবসও নাচ দেখতে লাগল। বেশী বয়স নয় মেয়েটির। ওই ঢোলক-বাজিয়ে বৃদ্ধ ওর বাপ বোধ হয়। দিবসের মনে হ'ল আমাদের তথাকথিত ভদ্রসমাজে ছেলে-মেয়েরা বাপ-মায়ের বোঝা-স্বরূপ। ছেলেকে পড়াতে আর মেয়ের বিয়ে দিতে অনেকেই সর্বস্বান্ত। যাদের আমরা ছোটলোক বলি তাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু অল্পবয়স থেকেই যে যতটুকু পারে উপার্জন করে। শিক্ষার আসল লক্ষ্য মনুষ্যত্ব লাভ। বিপুল অর্থ ব্যয় ও প্রাণপাত করে' বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত আমরা সে মনুষ্যত্ব যতটা লাভ করতে পেরেছি, স্কুল-কলেজে না গিয়েও ওরা যে তার চেয়ে কম লাভ করেছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

আমাদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অর্থোপার্জন-ক্ষমতা লাভ করা। কিন্তু আজকাল কলেজের ডিগ্রির আর সে মূল্য নেই। কিন্তু ওই তথাকথিত ছোটলোকেরা যে-সব কাজ করে' অর্থোপার্জন করে' আসছে চিরকাল, তার মূল্য কোনদিন কমবে না, বরং বাড়বে। হঠাৎ দেখতে পেলে দূরে কিরণ আসছে। কিরণ ফুটপাতের দিকে চেয়ে কবিতার লাইন ভাবতে ভাবতে আসছিল সম্ভবত। দিবসকে সে দেখতে পেল না। ভিড়ের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে একবার চেয়ে গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। নাচটাও শেষ হ'ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েটি ট্যামবুরিন পেতে পয়সা চেয়ে বেড়াতে লাগল সকলের কাছে। পয়সা, আনি, দোয়ানি পড়তে লাগল। দিবসের কাছে আসতেই দিবস একটা টাকা দিয়ে ফেললে হঠাৎ। মেয়েটি দিবসের মুখের দিকে চেয়ে সেলাম করলে তাকে। দিবস তারপর ভিড় থেকে বেরিয়ে ঢুকল কিরণের গলিতে। কিরণও খোলার ঘরে থাকে। কড়া নাড়তে হ'ল না, কপাট খোলাই ছিল।

"আরে দিবু যে!"

"আমি এখন দিবু নই, আমি হারুণ-অল্-রশিদ, ছদ্মবেশে রাজ্য পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছি।"

কিরণ তখনও স্বপ্ন-তরণী থেকে অবতরণ করে নি। তখনও তার মনে জাগছিল—

সব লগনের শেষে তাদের লগ্ন কি
নীহারিকায় মূর্তি ধরে স্বপ্ন কি
  ঠাঁই পেল না যারা দিনের আলোকে
  তাদের পথে এমন আলো জ্বাল কে
    আকাশ ভরা কালোকে
রূপ দিয়েছ তোমরা বল কারা
  অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারা।

দিবসের কথায় তার তরণীর পালে আবার হাওয়া লাগল যেন। অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল সে দিবসের মুখের দিকে।

"মানে? বুঝতে পারছি না কিছু!"

"ল' কলেজ ছেড়ে দিয়েছি বলে' বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন বাড়ি থেকে। সরোদটাও ভেঙে দিয়েছেন। দিনের হারুণ-অল্-রশিদ রাতের হারুণ-রল্-রশিদ হ'য়ে গেছে হঠাৎ। অন্ধকারে সে দেখতে চাইছে নিজেকে যাচিয়ে, আবিষ্কার করতে চাইছে উত্তরাধিকারসূত্রে যে রাজত্বটা সে দিনের আলোয় ভোগ করত, তার চেয়েও মহত্তর কোনও রাজত্ব অন্ধকারে লুকিয়ে আছে কি না!"

কিরণের চোখের দৃষ্টি আরও স্বপ্নময় হ'য়ে উঠল। উৎসাহিত হ'য়ে উঠল সে পরমুহূর্তে।

"সব খুলে' বল দেখি। ব'স, ভাল করে' ব'স।"

গহনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিটি যে কেউ-কেটা নন্ একথা বিকাশের চক্ষে প্রতিপন্ন করবার সুযোগ পেয়ে' চুনীলাল পুলকিত হ'য়ে উঠেছিল। যে মিউজিক কনফারেন্সে ভারতের বিখ্যাত গুণীরা আমন্ত্রিত হ'য়ে সমবেত হবেন সেখানে সরোদ বাজাবার জন্যে, গহন-চাঁদও যে অনুরুদ্ধ হয়েছেন এই গর্বে চুনীলাল যেন ফেটে পড়ছিল, কিন্তু তার গর্বের সঙ্গে স্বার্থ তো ছিলই, কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদও মিশল যখন সে খবর পেল বিকাশও সেই কনফারেন্সের টিকিট কিনেছে। বিকাশবাবুর সম্মতি পেয়ে সে বিকাশবাবুর জ্যাঠা প্রকাশবাবুর সঙ্গেও দেখা করেছিল ইতিমধ্যে। অন্নদা বিশ্বাস প্রকাশবাবুকে যতটা বীভৎসরূপে চিত্রিত করেছিল, চুনীলাল দেখল মোটেই তিনি সে রকম নন। চুনীলালের মনে হ'ল অন্নদা নিশ্চয় কারও 'থ্রু' দিয়ে পরের মুখে ঝাল খেয়েছে। প্রকাশবাবু লোকটি যদিও খুব গম্ভীর কিন্তু বেশ অমায়িক। বিবাহের প্রস্তাব বেশ মন দিয়ে শুনলেন,

ফটোটি দেখে পছন্দ করলেন, বিকাশবাবু যে রঙ্গনাকে দূর থেকে দেখে পছন্দ করেছেন এ সংবাদটাও প্রণিধান করলেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে', তারপর অমায়িকভাবে যে কথাগুলি বললেন তা আধুনিক-আধুনিকাদের কর্ণে মধু বর্ষণ করবে না হয়তো, কিন্তু চুনীলালের কাছে সঙ্গত বলেই মনে হ'ল। তিনি বললেন (অমায়িকভাবেই) —"দেখুন, আমাদের পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিকাশের বিয়েতে আমাকেই কর্তৃত্ব করতে হ'বে। আর আমাকে কর্তৃত্ব করতে হ'লে আমাদের পারিবারিক নিয়মগুলি, যা এতকাল সবাই মেনে এসেছে তা না মেনে আমি পারব না। সে নিয়মগুলি হচ্ছে এই : কন্যার কুষ্ঠি চাই। কুষ্ঠির যদি মিল হয় তাহ'লে আমরা মেয়েটিকে দেখতে যাব। বিকাশ যাবে না, আমরা, মানে কর্তৃপক্ষরা যাব। মেয়ে যদি পছন্দ হয় তখন দেনা-পাওনার কথা হ'বে। দেনা-পাওনা মানে এ নয় যে আমরা মেয়ের বাপকে পীড়ন করব। তবে খুব কম করে' ধরলেও আজকালকার দিনে হাজার পাঁচেক টাকা লাগবে তার। বিকাশের মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে বলেই এত কম করে' বলছি !"

প্রকাশবাবুর এই ধরনের কথাবার্তা অসঙ্গত মনে হয় নি চুনীলালের। এই দুর্মূল্যের বাজারে পাঁচ হাজার টাকায় যদি অমন একটা জামাই পাওয়া যায় তাহ'লে সেটা 'চীপ্'ই বলতে হবে। 'ড্যাম্ চীপ্' বলতেও আপত্তি নেই চুনীলালের।

আর একটা কথাও ভাবছিল চুনীলাল। ঘড়িতে দম না দিলে ঘড়ি যেমন চলে না, জামাইবাবুকেও তেমনি একটা প্যাঁচে না ফেললে উনি রোজগারের চেষ্টা করবেন না। বিয়ের খরচ অবশ্য ধার করে' যোগাড় করতে হ'বে, কাশীর বাড়িটা বাঁধা দিলে সে টাকা সংগ্রহ করাও অসম্ভব হ'বে না, কিন্তু সেই ধারটা শোধ করবার তাগিদে জামাইবাবু হয়তো এখানে 'সঙ্গীত-ভবন'-টাতে ভাল করে' মন দেবেন এবং উনি যদি ভাল করে' মন দেন তাহ'লে হু-হু করে' 'সঙ্গীত ভবন' চলবে, (গান-বাজনা শেখার যা ঝোঁক হয়েছে

আজকাল!) চুনীলালের সঙ্গে জামাইবাবু যদি হাপাহাপি ('হাফ এণ্ড হাফ'-এর বাংলা সংস্করণ) করেন তাহ'লে চুনীলালেরও সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা বাজনার দোকান খোলা যায়, কিংবা যদি কোনও দোকানদারের সঙ্গে কমিশনের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহ'লে তো—।

সুতরাং মিউজিক কন্‌ফারেন্সে গহনচাঁদ নিমন্ত্রিত হওয়াতে চুনীলালের আকাশ-কুসুমের পাপড়িতে পাপড়িতে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। বিকাশবাবুরা দেখুক যে গহনচাঁদ যে-সে লোক নয়। আর পাঁচজনও দেখুক! কত বড় পাবলিসিটি হ'বে একটা।

চুনীলাল ইতিমধ্যে নিজেই হ্যাণ্ডবিল ছাপতে দিয়েছিল।

গহনচাঁদ যদিও মিউজিক কনফারেন্সে যেতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু তারিখটা মনে ছিল না তাঁর।

চুনীলালের মুখে খবরটা শুনে' আকাশ থেকে পড়লেন তিনি।

"আজই নাকি? বল কি! সীতারাম আর রমজানকে খবর পাঠাও তাহ'লে—"

"পাঠিয়েছি"—স্মিতমুখে উত্তর দিলে চুনীলাল।

"রঙ্গনাও যাবে কি?"

"যাবে বইকি, রঙ্গনাকে গান গাইতে অনুরোধ করেছে যে ওরা।"

"রঙ্গনাকে? কেন?"

"আপনার মেয়ে বলে'।"

"ও তাই নাকি!"

কিরণের স্বপ্নাচ্ছন্নভাব কিন্তু রইল না বেশীক্ষণ। দিবসও বেশীক্ষণ স্বপ্ন-কুহেলী সৃজন করতে পারল না। যদিও সে বলল যে হারুণ-অল্‌-রশিদের ভূমিকা শেষ হ'লে হয়তো তাকে রবিন্সন ক্রুশো বা ক্যাপ্টেন কুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হ'বে কিন্তু কিরণের সহজ

বুদ্ধির আলোকে ব্যাপারটার স্থূলরূপ প্রকট হ'য়ে পড়ল একটু পরেই। দিবস যা ভয় করছিল তাই ঘটল শেষে। কিরণ খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বলল—"উকিল হওয়ার দোষটা কি ?"

দিবস এসবের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিল। মনের নেপথ্য-লোকে আর এক দিবস আস্তিন গুটিয়ে মালকোঁচা মেরে' অপেক্ষা করছিল। কবি দিবস অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে এল।

"প্রথম দোষ এযুগে ও-পেশা অচল। আমরা যে যুগের স্বপ্ন দেখছি সে যুগে ঝগড়া মারামারি নীচতা মিথ্যাকথার স্থান নেই। দ্বিতীয়ত এটা কি লজ্জার কথা নয় যে চিরকালই আমি নাবালক থাকব ? নিজের পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাব না ?"

"তাতে তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে"—গম্ভীরভাবে কিরণ প্রশ্ন করল।

"বাবার গদিতে বসে' পিতৃসম্পত্তি ভোগ করা মানেই তাই।"

"ইচ্ছে করলে সে সম্পত্তির সদ্ব্যবহার তুমি করতে পার। উকিল হ'য়েও ঝগড়া মারামারি নীচতা মিথ্যাকথার বিরোধিতা করা অসম্ভব নয়।"

যুক্তিটা অকাট্য বলে' মনে হ'ল দিবসের, ক্ষণকালের জন্য থমকে গেল সে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আর একটা কথা মনে পড়ে' গেল তার। চমৎকার কথা সেটা। তার পরবর্তী উক্তিতে তাই শুধু উৎসাহ নয় একটু ঝাঁজের আমেজও লাগল। কথাটা মনে পড়াতে শুধু যে সে উৎসাহিত হ'ল তা নয়, ক্ষুব্ধও হ'ল।

"আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী কি আমরা তোতাপাখির মতো আউড়েই যাব কেবল ? হাতে-কলমে সেটা করবার সামর্থ্য কি এযুগের ছেলেমেয়েদেরও হ'বে না ?"

"কি করতে চাস তুই ?"

"আমি অবিলম্বে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উপার্জন করতে চাই। অর্থাৎ সত্যিকারের শ্রমিক হ'তে চাই।"

"কিন্তু বাবার সঙ্গে এরকম ভাবে ঝগড়া না করেও সত্যিকারের শ্রমিক হওয়া যেত।"

"তুইও একথা বলছিস? তুই তাহ'লে কলেজ ছেড়ে ট্রাম-ড্রাইভার হ'তে গেলি কেন! তোর আদর্শই তো উদ্বুদ্ধ করেছে আমাকে।"

"আমার কথা আলাদা। আমার মা-বাবা কেউ ছিল না। মামার গলগ্রহ হ'য়ে আর থাকতে পারলাম না। আত্মসম্মানে বাধল বলেই চলে' আসতে হ'ল।"

"আত্মসম্মান জিনিসটা কি তোরই একচেটে? না, মামার জায়গায় বাবা বসালেই তার মানে বদলে যায়? বাবার উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে করতে তাঁর নির্দিষ্ট পথে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে চলাটাও কি আত্মসম্মানজনক? তুই-ই বল।"

কিরণ চুপ করে' রইল। সে বুঝল দিবসের সঙ্গে এখন তর্ক করে' লাভ নেই। বরং সে এখন ঠিক কি করবে সেইটে জেনে নেওয়াই উচিত।

"তুই বাড়ি ফিরবি না তাহ'লে?"

"আপাতত নয়।"

"আমার এখানেই থাকবি?"

"না, আমি আস্তানা ঠিক করেছি একটা কারফরমা লেনে। চাকরিও যোগাড় হয়েছে একটা।"

"কি চাকরি?"

"একটা মেসের চাকর হয়েছি।"

"মেসের চাকরি।"

"হ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে?"

দিবসের চোখে-মুখে যে গর্বটা ফুটে' উঠল তা নিতান্তই শিশু-সুলভ মনে হ'ল কিরণের। সে হেসে ফেললে।

"কিছু হয় নি। কিন্তু ওর চেয়ে ভাল চাকরি তুই পেতে পারিস নিশ্চয়।"

"তা হয়তো পারি। কিন্তু তাহ'লে হারুণ-অল্-রশিদ হওয়া যায় না। আমি দেখাতে চাই যে হারুণ-অল্-রশিদ সিংহাসনেও বসতে পারে, ছেঁড়া মাছুরেও বসতে পারে।"

দিবসের মুখের দিকে চেয়ে ভারি কৌতুক বোধ হ'ল কিরণের। ছেঁড়া মাছুরে বসবার শখ হয়েছে—ছেঁড়া মাছুরে বসে' সারাজীবন কাটাতে হচ্ছে যাদের তাদের অবস্থাটা তো জানে না। চকিতে উর্মির কথা মনে পড়ল একবার। হেসে বলল, "হঠাৎ হারুণ-অল্-রশিদ সাজবার শখ যে হ'ল তোমার!"

"আমি চাই নিজের মতে নিজের পথে চলতে। হারুণ-অল্-রশিদের মতো আমিও চাই একঘেয়েমির কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়তে। আবিষ্কার করতে চাই কোথায় আমার শক্তি, কোথায় আমার দুর্বলতা। সাধারণ প্রজার বেশ ধরে' হারুণ-অল্-রশিদ যেমন রাত্রির অন্ধকারে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করতেন নিজের স্বরূপ, আমিও তাই করতে চাই।"

কিরণের চোখ আবার উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল, আবার স্বপ্নের ছোঁয়াচ লাগল তার মনে।

"একটু চা কর দিকি"—দিবস বলল হঠাৎ।

কিরণের স্বপ্নের ঘোর কেটে' গেল। কবিকে সরিয়ে দিয়ে নানাভাবে-বিব্রত শ্রমিক কিরণ বেরিয়ে পড়ল রঙ্গমঞ্চে।

"স্টোভে তেল নেই। পারমিট পাই নি এখনও"—এবার কিরণের মুখে যে হাসি ফুটে' উঠল তার অর্থ—আগুন নিয়ে খেলা করতে যেও না। দারিদ্র্য ভয়ানক জিনিস।

"চল দোকানে তোকে চা খাওয়াচ্ছি" বলে' জুতোয় পা গলাতে গলাতে সে হেসে চাইলে একবার দিবসের দিকে। দিবস উঠে গিয়ে তার সরোদটাতে টুং-টাং করছিল।

"আমাকেও সরোদ একটা কিনতে হ'বে। শুরু করেছি যখন ভাল করে' শিখতে হ'বে বাজনাটা।"

"ভাল করে' শেখবার একটা সুযোগও উপস্থিত হয়েছে। ঊর্মি বলছিল কাশী থেকে গহনচাঁদবাবু এসে এখানে একটা গানের স্কুল খুলেছেন নাকি। সরোদের বিখ্যাত ওস্তাদ তিনি একজন। আমি ভাবছি ভর্তি হ'ব তাঁর স্কুলে যদি অবশ্য আর একটা টিউশনি পাই।"

আবার তার মুখে হাসি ফুটে' উঠল একটা। কিন্তু ম্লান হাসি।

"মাইনে ক'ত করে' ?"

"মাসে দশ টাকা শুনেছি।"

"চল না দু'জনেই একসঙ্গে ভর্তি হওয়া যাক, আমার কাছে কিছু টাকা আছে এখনও। মেসে যে চাকরিটা নিয়েছি তাতে আমার খাওয়াটা চলে' যাবে। তারপর আরও কিছু জুটে যাবেই একটা নিশ্চয়। সন্ধ্যের পর ভাল গোছের একটা টিউশনি পেলেই চলবে আপাতত। কালই সরোদ একটা কিনে ফেলি আগে, কি বল ?"

ছেলেমানুষের মতো উৎসাহিত হ'য়ে উঠল দিবস। কিরণ হেঁট হ'য়ে জুতোর ফিতে বাঁধছিল (পাম্পশু পরে না সে কখনও, মজবুত ডার্বি শু-ই তার পছন্দ) নিপুণভাবে ফিতে বাঁধা শেষ করে' সে যখন মুখ তুলে' চাইল তখন তার মনের গ্লানি কেটে' মুখে যে হাসি ফুটে' উঠেছে তা আর ম্লান নয়, অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছে সে।

"তোর প্ল্যানটা কি বল দেখি, ঠিক বুঝতে পারছি না, এই সব ছোটখাট উঞ্ছবৃত্তি করেই জীবন কাটাবি নাকি ?"

দিবসের মুখটা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল হঠাৎ।

"উঞ্ছবৃত্তি ? উঞ্ছবৃত্তি কাকে বলিস তুই ! মাইনে কম পেলেই সেটা উঞ্ছবৃত্তি হ'য়ে যায় নাকি ! তুই কি উঞ্ছবৃত্তি করছিস্ ?"

কিরণ আর একটু হাসলে। তার মনে হ'ল দিবসের মন এখন যে তুরীয় অবস্থায় আছে সেখান থেকে তাকে মর্ত্যে নাবিয়ে আনা

যাবে না। সে চেষ্টা না করে' সে বলল, "চল, বেরোন যাক। আমার ব্যাগটা এনেছিস তো ?"

"এনেছি।"

দু'জনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং নীরবেই পাশাপাশি হাঁটল খানিকক্ষণ। কিন্তু দিবসের মন নিষ্ক্রিয় যে ছিল না তা তার পরবর্তী কথাগুলো থেকেই বোঝা গেল। কিরণের যে কথাটা তাকে আঘাত দিয়েছিল সে কথাটা থেকে সে অনেক দূর সরে' গিয়েছিল। মাঝির হাতের ধাক্কা খেয়ে নৌকা যেমন তীর ছেড়ে ভেসে' যায়, তেমনি তার মন ভেসে' চলেছিল কল্পনার স্রোতে, পালে লেগেছিল আনন্দের হাওয়া। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকে যে অদ্ভুত একটা আনন্দ তার সমস্ত সত্তাকে ওতপ্রোত করে' রেখেছিল—যা বাইরের ঘটনা-সংঘাতের ধুলোয় মাঝে মাঝে আবৃত হ'লেও অবলুপ্ত হচ্ছিল না একবারও—সেইটা হঠাৎ যেন জোর হাওয়ার মতো লাগল হঠাৎ এসে তার নৌকার পালে। তর্‌তর্‌ করে' ভেসে' চলেছিল সে।

"তুই বুঝিস না কিছু"—ঈষৎ হেসে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে সে—"আমি এক জায়গায় বাঁধা থাকব একথা তুই ভাবছিস্ কেন ? ছাদে ওঠাই আমার লক্ষ্য, সিঁড়ি নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন ? সব সিঁড়িই সমান, সব সিঁড়িই ভাল। আপাতত একটা চাকর হয়েছি কিন্তু সম্ভাবনা অনেক আছে। হেনরি ফোর্ড, ডেল কার্নেগী, সার আর. এন., আচার্য জগদীশচন্দ্র,—সম্ভাবনা কি একটা ? অনন্ত। এই গণ্ডীর বিরুদ্ধেই তো আমার বিদ্রোহ।"

কিরণ যদিও মনে মনে ভাবছিল কি করে' দিবসকে আবার ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু দিবসের এই কথা শুনে' আবার তার মনের সুর বদলে গেল। সাদা কাপড়ে খানিকটা রং ঢেলে দিলে যেন কেউ। কাল ট্রাম চালাতে চালাতে যে কথাটা তার মনে হচ্ছিল (যার ফলে সে কবিতাটা লিখেছে) যা আজও মনে হচ্ছিল একটু আগে সেই কথাটাই মনে পড়ল আবার।

"গণ্ডীর বিরুদ্ধে আমরা সবাই বিদ্রোহ করতে চাই"—মৃদু হেসে বলল সে—"কিন্তু মুশকিল হয়েছে গণ্ডীটা কোথায় তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পথই দেখতে পাচ্ছি না আমরা। কাল আমার মনে হচ্ছিল আমরা সবাই যেন অন্ধ জোনাকির দল, আমাদের প্রত্যেকেরই দীপ্তি আছে, কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেউ, অন্ধকারে পরস্পর ঠেলাঠেলি করছি, মারামারি করছি, অন্ধ আবেগে হাত-পা ছুঁড়ছি, পরস্পরের চাপে মারা যাচ্ছি শেষে, শুয়ে পড়ছি পথের উপরই এবং শুয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত জানতে পারছি না যে এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের উপর নয়, শব-স্তূপের উপর।"

এই পর্যন্ত বলে' থেমে' গেল কিরণ, তার বাকরোধ হ'য়ে গেল আবেগের আতিশয্যে। দিবস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই কিন্তু সামলে নিল সে আবার। মৃদু হেসে বললে, "শেষকালে কি মনে হ'ল জানিস? মনে হ'ল অন্ধকারে যারা পথ হারিয়ে ফেলেছে তারাই বোধ হয় আকাশ-ভরা তারা।"

দিবস কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু থেমে' গেল। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল তারা। দোকানের ভিতর থেকে রেডিওতে সরোদের গৎ বেজে উঠল একটা।

"বাঃ চমৎকার তো, চল শোনা যাক, এই তো চায়ের দোকান", চায়ের দোকানে ঢুকে' পড়ল দু'জনে। দু' পেয়ালা চায়ের কথা বলে' তন্ময় হ'য়ে শুনতে লাগল সরোদের বাজনাটা।

"বাঃ, কে বাজাচ্ছে?"

"কোন বড় ওস্তাদ নিশ্চয়।"

পাশে আর একজন বসে' চা খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, "মিউজিক কনফারেন্স থেকে রিলে করছে—"

চা খাওয়া শেষ করে' দু'জনে আবার যখন ফুটপাথে নাবল তখনও সরোদ বেজে চলেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল দু'জনে। একটু পরেই বাজনা থামল, রেডিও ঘোষণা করল—

'কাশীর বিখ্যাত ওস্তাদ সঙ্গীতাচার্য গহনচাঁদ এতক্ষণ সরোদ বাজিয়ে শোনালেন।'

"ও, তাই।" কিরণ বললে।

"ইনি স্কুল খুলেছেন?"

"উর্মি বলছিল।"

কিরণ অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল একটু। এর পরই ঠিক তার যে কথাটা মনে পড়ল—যদিও অবশ্য উর্মিকে কথা দেয় নি সে—তাতে তার চিন্তাধারা কেমন যেন এলোমেলো হ'য়ে গেল একটু।

"একটা সরোদ কিনে ফেলা যাক এখনই, চল।"

"আমাকে টিউশনি করতে যেতে হ'বে এখন।"

"কাল তোর সময় আছে?"

"কাল সকালে বাড়িতে থাকব।"

"কিন্তু সে সময় আমার যে চাকরি!"

রেডিও আবার ঘোষণা করল—"এর পর গান গাইছেন শ্রীমতী রঙ্গনা দেবী।"

সরোদ কেনার কথাটা চাপা পড়ে' গেল। রঙ্গনার গান শুনতে শুনতে আবার পথ চলতে লাগল তারা। এই গানের সুরে নেপথ্য-লোকে যে যোগাযোগের সূচনা হ'ল তার ভবিষ্যৎ রূপের আভাস-মাত্রও যদিও দিবসের মনে জাগবার সম্ভাবনা ছিল না, তবু তার মনে হ'তে লাগল কি যেন একটা আসন্ন। আসন্ন বসন্তের আশায় গাছের শাখায় শাখায় যেমন কিশলয়ের ঘুম ভাঙে, রঙ্গনার গানের সুরে দিবসের মনে তেমনি কি যেন একটা জাগল, কি সেটা তা বিশ্লেষণ করবার জন্যে তার আগ্রহ হ'ল না, একটা অস্পষ্ট আবেশ তবু ধীরে ধীরে যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল উষালোকের মতো। কিরণ ভাবছিল উর্মির কথা। উর্মি নিশ্চয়ই গেছে কনফারেন্সে গান শুনতে। তাকেও যেতে বলেছিল! অনেক করে' বলেছিল। বলেছিল তার জন্যে সে একটা টিকিট কিনে রাখবে। পাগল নাকি!

"একদিন টিউশনি করতে না গেলে কি আর হয়?"—উর্মির আবদার-মাখা মুখখানা মনে পড়েছিল কিরণের। কিরণ মানা করেছিল তাকে টিকিট কিনতে। কেনে নি বোধ হয়। কেনা উচিত নয় অন্তত।

একই গানের সুর দু'জনকে নিয়ে গেল দুই জগতে। নীরবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল তারা।

ছয়

তার পরদিন দিবস পথ চলছিল একা। ঘাড় হেঁট করে' আপন মনে হাঁটছিল সে, কোলক্যাতা শহরে নয়, নিজের জগতে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। সরোদ কিনবে বলে' বেরিয়েছিল সে বাড়ি থেকে। যে দোকান থেকে প্রথম সরোদটা কিনেছিল সেই দোকানের উদ্দেশেই বেরিয়েছিল। ঠিক করেছিল পায়ে হেঁটেই সেখানে যাবে, ঠিক ভাবে গেলে পায়ে হেঁটেই সেখানে গিয়ে পৌঁছতেও পারত যথাসময়ে। কিন্তু তা হ'ল না, কারণ বাসা থেকে বেরিয়েই সে কোলকাতা শহরে নয়, নিজের জগতে হাঁটতে লাগল। বাবা এবং ব্রজর জন্যে মন-কেমন-করার পাতলা কুয়াসায় সে জগতের সমস্তটাই প্রায় ঢাকা। তার একগুঁয়েমিটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে অটল হ'য়ে। চারিধারে জঙ্গল, জঙ্গলের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা অদৃশ্য আলেয়ার মতো প্রলুব্ধ করছে, অচেনা পাখির কাকলী ভেসে' আসছে মাঝে মাঝে, মোড় ফিরতেই চোখে পড়ল একটা গাছ, প্রৌঢ় গাছ, অজস্র ফুলে ভরা, হেলে আছে, মনে হচ্ছে সস্নেহে অভ্যর্থনা করছে যেন তাকে। গাছের আড়াল থেকে সহসা ভেসে' এল সৌদামিনীর সস্নেহ ভর্ৎসনা

—'মাইনে তো পাবে মোটে কুড়িটি টাকা, মোমবাতি কিনে পয়সা নষ্ট করা কেন? কি কাণ্ড!' তারপর কুয়াসা, কুয়াসা, কুয়াসা। একটু পরে কুয়াসা ভেদ করে' দেখা দিল আর একটা গাছ। ঋজু, দীর্ঘ আকাশচুম্বী। আকাশ থেকে গাছটা যেন কথা কইলে তার সাহেব প্রফেসারের কণ্ঠে—'সুযোগ পেলে রিসার্চ করতে পারবে তুমি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পেলে খুব খুশী হ'ব।' মিলিয়ে গেল গাছটা। পরমুহূর্তেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেন গোবর্ধন, হরিদাস, অঘোর আর ধূর্জটি। যে মেসে সে চাকরি নিয়েছে সেই মেসের বাসিন্দা চারজন। তার মালিক চতুষ্টয়। রাজনীতিমত্ত গোবর্ধন, বিশেষত্বহীন অঘোর এবং সঙ্গীত-পাগল ধূর্জটি কলরব করতে করতে এলেন এবং চলে' গেলেন। রসিক স্বল্পভাষী হরিদাস কেবল দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে। যে জাতীয় লোক সাধারণতঃ মেসে চাকর হ'য়ে আসে দিবস যে ঠিক সেই জাতীয় নয় এ সন্দেহ হরিদাসেরই হয়েছিল! কিন্তু একটি কথা বলেন নি তিনি। না বললেও তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এ খবরটুকু টের পেয়েছিল দিবস। পরমুহূর্তেই সহসা ছবির ফ্রেমের কথা মনে পড়ল তার। হরিদাসবাবুর বিছানার ঠিক উপরে যে ফটোখানা টাঙানো আছে তার ফ্রেমটা চমৎকার। ওই রকম ফ্রেম দিয়েই সে বাবার ছবিটাও বাঁধাবে। ভোরে উঠেই সে চলে' গিয়েছিল তার ফটোগ্রাফার বন্ধুর কাছে। বাবার ফটোখানা নিয়ে এসেছে।—সব মিলিয়ে গেল আবার। কুয়াসা নেই, জঙ্গল পার হ'য়ে এসেছে সে অনেকক্ষণ, প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা-পথ বিসর্পিত রেখায় চলে' গেছে চক্রবালের দিকে। সূর্য উঠছে, লাল হ'য়ে উঠেছে পূর্বাশা, চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ—

হঠাৎ দিবসের খেয়াল হ'ল যে গলিটায় ঢুকলে সে বাজনার দোকানে সহজে দিয়ে পৌঁছতে পারত সে গলিটাকে সে পিছনে ফেলে এসেছে অনেকক্ষণ আগে। হেঁটে যেতে গেলে আরও মাইল

খানেক হাঁটতে হয় আবার উলটো দিকে। সামনে ট্রাম আসছিল একটা, যদিও ভিড় খুব, তবু তাতেই উঠে পড়ল দিবস। ট্রামে পুরুষের সীটগুলো সব ভর্তি। লেডিজ সীটগুলোও। একটি লেডিজ সীটে রঙ্গনা বসেছিল কেবল। তার পাশে জায়গা খালি ছিল খানিকটা। অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের দু'লাইন একটা কবিতা পড়ে' তার যে রকম মনে হয়েছিলে, রঙ্গনাকে দেখে সেই রকম মনে হ'ল তার প্রথমটা। দু'লাইন কবিতাটি একজনের পড়ে' তার সমস্ত রস সারা চিত্তে নিমেষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, রঙ্গনাকে দেখেও ঠিক তেমনি হ'ল। নিমেষের মধ্যে ওর সমস্ত রূপটা মনের মধ্যে আঁকা হ'য়ে গেল যেন ফটোগ্রাফের মতো ত্বরিত অথচ নিখুঁত পদ্ধতিতে। তার পাশে জায়গা খালি ছিল বলেই তার দিকে চেয়েছিল সে, ক্ষণকালের জন্য চেয়েছিল, কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটে' গেল।, রঙ্গনা দিবসকে দেখতে পায় নি, কারণ সে বাইরের দিকে চেয়েছিল। 'ট্রামে' 'বাসে' উঠলে সে বাইরের দিকেই চেয়ে থাকে একাগ্র দৃষ্টিতে, তার ভয় হয় অন্যমনস্ক হ'লেই বুঝি নাববার জায়গাটা পেরিয়ে যাবে। যে-সব ট্রাম-আরোহীরা সমস্তক্ষণ কোণে চোখ বুজে বসে' থেকে ঠিক সময়ে উঠে নেবে যেতে পারেন তাদের মতো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রঙ্গনার ছিল না। বাইরের দিকেই চেয়ে বসেছিল সে। দিবসের চকিত দৃষ্টি যে একবার তার সর্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে' অন্যদিকে সরে' গেল তাও সে টের পেল না। দিবসকে দেখতে পেল সে একটা দুর্ঘটনার ফলে। ট্রামটা ঘচাং করে' থেমে গেল হঠাৎ এবং দিবস হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। রঙ্গনার সঙ্গে চোখো-চোখি হ'য়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গনা একটু সরে' গিয়ে ভদ্রভাবে বললে, "বসবেন? বসুন না এইখানে?

"না থাক—দিবসের কণ্ঠস্বরে শুধু যে সমীহ ফুটে' উঠল তা নয়, একটু আতঙ্কের সুরও বেজে উঠল। কিছুদিন পরে এযুগের

স্ত্রীপুরুষের সান্নিধ্য বিষয়ে যে বক্তৃতা দিবস করবে রঙ্গনার কাছে, তার সঙ্গে তার এখনকার আচরণের কোনও মিল দেখা গেল না। ট্রামের ডাণ্ডাটা ধরে' সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অপ্রস্তুত মুখে। কানের পাশটা গরম এবং লাল হ'য়ে উঠল একটু। রঙ্গনাও আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলে না তাকে। দিবসও আর দ্বিতীয়বার ফিরে চাইলে না তার দিকে। দিবসের মনে যে-সব ভাব জাগছিল তা অবর্ণনীয় নয় এবং রঙ্গনা-বিষয়কও নয়। ট্রাম-গাড়ির আরও কি কি উন্নতি হওয়া উচিত তাই ভাবছিল সে। ট্রাম গাড়ি দোতলা হ'লে ক্ষতি কি? আর একটু চওড়া করা সম্ভব নয় বোধ হয়, সম্ভব হ'লে করত নিশ্চয় ওরা। আর একটা কথা মনে পড়াতে আরও অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল সে। তার মনে পড়ল এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ না কে একজন লিখেছেন ভবিষ্যৎ যুগে ফুটপাথই চলবে, মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে—নিউক্লিয়ার এনার্জির যুগে হ'বে হয়তো—হঠাৎ ট্রামটা থেমে গেল। দিবস দেখল অনেকেই নাবছে। তাকেও নাবতে হ'বে এখানে। তাড়াতাড়ি নেবে পড়ল। নেবেই দেখল সেই মেয়েটিও নেবেছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, পরমুহূর্তেই রঙ্গনা মৃদু হেসে তাকে যে প্রশ্নটা করল তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। অবাক্‌ হ'য়ে গেল।

"আচ্ছা, আপনার বসতে সঙ্কোচ হ'ল কেন বলুন তো?"

সঙ্কোচ কথাটা যেন চাবুকের মতো আঘাত করল তাকে। কথাটা সত্য বলেই আঘাতটা বেশী লাগল। সঙ্কোচের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যে কারণগুলো জড়িয়ে থাকে সেগুলো সে অজ্ঞাতসারে এই মেয়েটির উপর আরোপ করেছে বলে' লজ্জাও হ'ল বেশ। জবাবদিহির সুরে তাই বলল—

"সঙ্কোচ ঠিক নয়, ওটা আপনাদের প্রাপ্য সম্মান!"

"শুধু শুধু আমাকে সম্মানই বা করতে যাবেন কেন আপনি? কিন্তু আপনার ধরন-ধারণ দেখে সে কথাও তো মনে হ'ল না।

মনে হ'ল আমি যেন অস্পৃশ্যা আর আপনি যেন আমার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চাইছেন।"

"না না, ও-কথা ভাবছেন কেন?"

"না ভেবে কি করি বলুন? আমাদের নিশ্চয়ই আপনারা অশুচি মনে করেন তাই ট্রামে-বাসে 'ফর লেডীজ ওনলি' লেবেল সেঁটে আমাদের তফাতে রাখবার চেষ্টা করছেন, আর ভাবছেন আমাদের খুব সম্মান করা হচ্ছে। আপনাদের ওই নকল শিভাল্‌রি যে অপমানেরই উল্‌টো-পিঠ তা বুঝতে বাকি নেই আমাদের।"

রঙ্গনার চোখে একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলে গেল। সে আর কিছু না বলে' গটগট করে' চলে' গেল পিছন ফিরে। বিস্ময়-বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল দিবস। আজকালকার মেয়েদের মধ্যেও এমন মুখরা তার চোখে পড়ে নি তো! গায়ে পড়ে' ঝগড়া করে' গেল। রঙ্গনা যে দিকে গেল দিবসেরও পথ সেই দিকে। দিবস হয়তো অনুসরণ করত তার, কিন্তু বাধা পড়ে' গেল।

"এই যে দিবুদা—"

"আরে বিনোদ যে, কি খবর?"

"আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল ভালই হ'ল। আমাদের স্টুডেণ্টস্‌ গ্যাদারিং-য়ে আপনাকে কিছু বলতে হ'বে এবার। আপনারই বাড়ি যাচ্ছিলাম।"

"বলতে হ'বে? এত লোক থাকতে আমাকে কেন?"

"বাঃ, আপনাকে বলব না তো কাকে বলব? গেল বছর আপনি যা চমৎকার বলেছিলেন। আপনাকে এবার সভাপতি করেছি আমরা।"

"আমাকে না জিগ্যেস করেই?"

"হ্যাঁ, ছাপিয়েও ফেলেছি"—একমুখ হেসে বিনোদ ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র বার করলে পকেট থেকে—"আমার উপরই ভার ছিল আপনার মত নিয়ে কার্ড ছাপতে দেবার, কিন্তু আপনার বাড়ি গিয়ে

দেখা পেলাম না, তাই কপাল ঠুকে ছাপতে দিয়েছিলাম। আপনাকে রাজি হ'তেই হ'বে দিবুদা, তা না হ'লে ওই দীনেনবাবু খেয়ে ফেলবে আমাকে।"

"কি মুশকিল!"

"না, কোনও আপত্তি শুনব না দিবুদা।"

"কবে?"

"এই যে সব লেখা আছে এতে, দেখুন না।"

দিবস কার্ডটা পড়ে' দেখল।

"ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে?"

"হ্যাঁ। আপনি রাজী তো?"

"না হ'য়ে আর কি করি বল! তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই রাজী হ'তে হ'বে।"

বিনোদের হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হ'য়ে উঠল।

"আমি জানতাম আপনি আমার কথা ঠেলতে পারবেন না, তাই ভরসা করে' ছাপিয়ে ফেললাম। আচ্ছা চলি এখন, অনেক কাজ বাকি এখনও।"

বিনোদ চলে' গেল। দিবস যেদিকে যাবে ঠিক তার উল্‌টো দিকে চলে' গেল সে। দিবস দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। অভিভূত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল তার অতীত জীবনটা, যে জীবনের সঙ্গে তার বাবা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছেন, তাকে যেন ডাক দিয়ে গেল। পরমুহূর্তে সে ঘাড় তুলে' চাইল রঙ্গনা যেদিকে গেছে সেই দিকে। অযৌক্তিকভাবে তার মনে হ'ল ঐ মেয়েটি কি সভায় আসবে? কলেজের ছাত্রী হ'লে আসতে পারে। ধরন দেখে কলেজের ছাত্রী বলেই মনে হয়।

নিতাই নন্দীর বাদ্যযন্ত্রের দোকানে ঢুকে' রঙ্গনা বেশ ভদ্রভাবেই বললে, "আমাকে ভাল দেখে একটা সেতার দিন তো।"

"সেতার? ও আচ্ছা।"

নিতাই ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং যে সেতারটি বার করে' আনলেন তা পছন্দ হ'ল না রঙ্গনার। এবারও বেশ ভদ্রভাবে বললে সে, "আর একটু বড় হ'লে ভাল হ'ত। বড় নেই?"

"আছে।"

আবার ঢুকে গেলেন তিনি ভিতরে। রঙ্গনা এদিক ওদিক চাইতে লাগল। হঠাৎ সামনের ক্যালেণ্ডারের একটি ছবির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল তার। একটি অর্ধনগ্ন যুবতী ঈষৎ অশ্লীল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টান্‌ছে। পরমুহূর্তেই নিতাই নন্দী একটি বড় সেতার নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। এইবার রঙ্গনার কণ্ঠে যে সুর ফুটল তা ভদ্র নয় মোটেই। বেশ রুক্ষকণ্ঠেই সে বললে, "আপনারা কি চান না যে কোনও ভদ্রমহিলা আপনাদের দোকানে আসুক?"

"নিশ্চয়ই চাই, এ কি কথা বলছেন!"

"ওই ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন কেন তাহ'লে?"

এর উত্তরে আমতা আমতা করা ছাড়া নিতাই নন্দীর অন্য উপায় ছিল না। কাচুমাচু ভঙ্গিতে হাত কচলে তিনি শুরু করলেন—"ওটা মানে, হয়েছে কি"—কিন্তু শেষ করতে পারলেন না।

রঙ্গনা থামিয়ে দিলে তাকে।

"খুলে' নামিয়ে রেখে' দিন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে টাঙাবেন যদি প্রবৃত্তি হয়।"

রঙ্গনার স্ফুরিতাধর ভেদ করে' কথাগুলি এমন একটা তেজের সঙ্গে বেরুল যে প্রৌঢ় নিতাই নন্দী তা অমান্য করতে সাহস করলেন না।

"বেশ, বেশ তাতে আর কি!"

তাড়াতাড়ি ক্যালেণ্ডারখানা নামিয়ে গুটিয়ে টেবিলের একধারে রেখে' দিলেন। রঙ্গনা হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' দেখতে লাগল দ্বিতীয় সেতারটা। তারপর মৃদু হেসে বলল, "এটাও পছন্দ হচ্ছে না।"

ঠিক এই সময় দিবসও ঢুকল এবং বলল, "আমাকে একটা সরোদ দেখান তো।"

"আসুন।"

তারপর রঙ্গনার দিকে ফিরে নিতাই নন্দী বললেন, "এটাও পছন্দ হচ্ছে না? আর একটা আনি তাহ'লে?"

আবার ভিতরের দিকে চলে' গেলেন তিনি। রঙ্গনাকে এখানে দেখে দিবস শুধু যে বিস্মিত এবং পুলকিত হ'ল তা নয়, তার সমস্ত পৌরুষ যেন আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠল নিজের মহিমা প্রমাণ করবার জন্য। যে মেয়েটি একটু আগে তাকে নিতান্ত হেয় প্রতিপন্ন করে' চলে' এসেছিল, তার কাছে নিজেকে প্রকাশিত করবার দুর্দম বাসনা উতলা করে' তুলল তার সমস্ত সত্তাকে সহসা। চোখোচোখি হ'তেই কিন্তু ছোট্ট একটা নমস্কার করা ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না সে। রঙ্গনাও প্রতি নমস্কার করল মৃদু হেসে। নিতাই নন্দী আবার ঢুকলেন আর একটা সেতার নিয়ে। রঙ্গনা নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল সেটা।

"এর ঘাটগুলো পছন্দ হচ্ছে না, আর একটা দেখাবেন?"

"দেখাব বৈকি!"

আবার ঢুকে গেলেন নিতাই নন্দী ঘরের ভিতর এবং আর একটা সেতার বার করে' নিয়ে এলেন।

দিবস চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মনে মনে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার এমন কি ঐশ্বর্য আছে যার প্রভাবে সে মুগ্ধ করে' দিতে পারে এই মেয়েটিকে? সন্ধান করতে গিয়ে হতাশ হ'য়ে পড়ছিল। যেখানে তার অনন্ত সম্পদ বিচিত্র অজস্রতায় ছড়িয়ে আছে সেই কল্পলোকে একে নিয়ে যাওয়া যাবে না এখন। কোনও কালেই যাবে না বোধ হয়। একটু পরেই তো এ চলে' যাবে, হারিয়ে যাবে ভিড়ের মধ্যে। জানতেও পারবে না ক্ষুদ্র পরমাণুর কি অসীম সম্ভাবনার স্বপ্ন তন্ময় করেছিল তাকে, সুযোগ পেলে

পৃথিবীর ইতিহাসই বদলে দিতে পারত হয়তো সে—হঠাৎ সেই প্রফেসারের মুখটা মনে পড়ল আবার—তিনি চিঠিটা পেয়েছেন কি—আজ কত তারিখ—বহুকাল আগে সে যেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে মনে হচ্ছিল—তারিখ মনে নেই—

এ সেতারটাও পছন্দ হ'ল না রঙ্গনার।

"এর তুম্বাটা বড় ছোট। তুম্বাটা আর একটু বড় হ'লে—"

"আপনি দয়া করে' একটা কাজ করুন না তাহ'লে। ভিতরে অনেকগুলো সেতার টাঙানো আছে, নিজেই বেছে নিন যেটা পছন্দ হয়। আসুন, ওই ভিতরের দিকে টাঙানো আছে।"

"সেই ভাল।"

রঙ্গনা ভিতরের দিকে চলে' গেল। নিতাই নন্দী তখন দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে সরোদ দেব একটা?"

দিবস তখন চারদিকে চেয়ে দেখছিল এবং এই প্রশ্নের উত্তরে সে যা বললে তা সরোদ-বিষয়ক নয়।

"আপনার এখানে ক্যালেণ্ডার দেখছি না? আজ কত তারিখ বলতে পারেন?"

"আজ তিরিশে। ক্যালেণ্ডার থাকবে না কেন, ছিল, ওই ভদ্রমহিলার ধমকে নামিয়ে রাখতে হ'ল।"

এর পরেই ক্ষুণ্ণ অথচ অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে নিতাই নন্দী বললেন, "আচ্ছা, এই ছবিখানা কি দোষ করেছে বলুন তো, ভাল বিলিতি ছবি—"

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানা খুলে' দেখালেন তিনি দিবসকে, কিন্তু পরমুহূর্তেই রঙ্গনার পায়ের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি আবার গুটিয়ে রাখতে হ'ল সেটা। খুব ভাল একটি সেতার হাতে করে' রঙ্গনা এসে ঢুকল।

"এইটে পছন্দ আমার, এইটে দিন। দাম কত এর?"

"পঞ্চান্ন টাকা।"

"পঞ্চান্ন টাকা ?"

রঙ্গনার মুখ শুকিয়ে গেল, একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল সে। এত কাণ্ড করবার পর কোন্ মুখে দোকানীকে সে বলবে যে তার কাছে মাত্র চল্লিশটি টাকা আছে! গহনচাঁদ তাকে চল্লিশ টাকার বেশী দেন নি, সে-ও ভাবেনি যে চল্লিশ টাকার বেশী লাগতে পারে। কিন্তু সত্যি কথাটা বলতেই হ'বে, উপায় নেই।

"অত টাকা তো সঙ্গে নেই। গোটা পনের টাকা কম পড়ছে, আচ্ছা, আপনি ওটা আলাদা করে' রেখে' দিন, আমি পরে এসে নিয়ে যাব।"

এইবার বাগ পেলেন নিতাই নন্দী। ঝালটা ঝাড়লেন। কিন্তু মধুর হেসে। পাকা দোকানদার তিনি।

"বেশ, আলাদা করেই রেখে' দিচ্ছি, আপনি যা বলেন তাতেই রাজী আমি। তবে ওরকম সেতার মাত্র একটিই আছে, নগদ টাকা নিয়ে যদি কোনও খদ্দের আসে তাহ'লে, মানে, একটু— বুঝতেই পারছেন—"

নিজের দলের গোল হয়-হয় দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ফুটবল খেলোয়াড় যেমন ছুটে আসে, দিবসও অনেকটা তেমনি করে' ছুটে এল মনে মনে। শোভন-অশোভন জ্ঞান রইল না তার আর।

"যদি কিছু মনে না করেন, টাকাটা আমি দিয়ে দিতে পারি। আমার কাছে টাকা রয়েছে। আপনি না হয় পরে দিয়ে দেবেন আমাকে।"

"আপনি দেবেন ? না থাক, আমিই পরে এসে নিয়ে যাব।"

"বিক্রি হ'য়ে যায় যদি। নিয়ে যান না, আমাকেই টাকাটা পরে দিয়ে দেবেন, ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।"

"বেশ, দিন তবে।"

মুচকি হেসে রঙ্গনা কথাটা এমন ভাবে বললে যেন সে দিবসকে অনুগ্রহ করছে।

দিবসের বাসার ঠিকানা এবং সেতারটা নিয়ে রঙ্গনা চলে' গেল। দিবস নির্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার নূতন জীবনে যে নূতনতর পর্ব আকস্মিকভাবে আরম্ভ হ'য়ে গেল, তারই অভিনবত্বটা আচ্ছন্ন ক'রে রাখল তার মনকে খানিকক্ষণ। এর পরিণতি কি হ'বে তা তখন যদিও সে ভাবতে পারে নি (কে-ই বা পারে) কিন্তু এই পরিচয়টা যে ক্ষণস্থায়ী সামান্য পরিচয় মাত্র নয়, এ যে অসামান্য কিছু একটা, এ যেন তার অন্তরাত্মা সভয়ে অনুভব করছিল। যে যোগাযোগ পরে উৎফুল্ল করবে গোবিন্দ সাণ্ডেলদের, বিভ্রান্ত করবে চুনীলালকে, হতভম্ব করবে গহনচাঁদকে, তার প্রথম সূত্রপাত ভীত করে' তুলেছিল দিবসকে। দুর্গপ্রাকারে শত্রু হানা দিয়েছে খবর পেলে সেনাপতির যেমন ভয় হয়, সংঘদ্বারে প্রথম নারীর আবির্ভাবে বুদ্ধ যেমন ভীত হয়েছিলেন, সেই ধরনের একটা ভয় যেন তাকে আচ্ছন্ন করে' ফেলেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও জটিলতর ব্যাপারও ঘটছিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে মনে মনে যেমন সশস্ত্র হ'য়ে উঠছিল, তেমনি জ্ঞাতসারে আবার উৎসুক হ'য়েও উঠেছিল। অধীর চিত্তে ভাবছিল কখন আবার দেখা হ'বে তার সঙ্গে। আজই সে দামটা দিতে আসবে কি? কখন?

"আপনাকে সরোদ দেখাই?"

দিবসের ঘোরটা কেটে' গেল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভাল জিনিস দেবেন।"

কিরণ নিজের ঘরে একা বসে কবিতা লিখছিল :

আমার হৃদয়ে মনে আস যাও ক্ষণে ক্ষণে
মুগ্ধ নয়ন-পথ দিয়া,
এই দেখা এই চাওয়া এই ক্ষণিকের পাওয়া
এই তব পরিচয় প্রিয়া,

এর বেশী আছে যাহা নাগাল পাব না তাহা
থাক দূরে থাক তা নিভৃতে
পেয়েছি যতটা আমি তাই মোরে দিবাযামী
ভরে' তোলে রঙে রসে গীতে।

এই পর্যন্ত লিখে থেমে' গেল সে। কলমটা নামিয়ে রেখে' বসে' রইল চুপ করে'। ঊর্মির কথাই ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে এসেছিল সে। সত্যিই সে তার জন্যে প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় করেছে একটা। মিউজিক কনফারেন্সে তার জন্যে টিকিটও কিনেছিল। ভর্তি হয়েছে গহনচাঁদবাবুর স্কুলে। রঙ্গনাকে তার গানগুলো দিয়ে এসেছে। নূতন বাসার একটা সন্ধান পেয়েছে নাকি! সেই বাসার সুবিধা-অসুবিধার নিখুঁত বর্ণনা করছিল এতক্ষণ ধরে'! এক মিনিট চুপ করে' ছিল না। ঝরণার মতো কলকল করছিল সর্বক্ষণ। কেন আসে, কি চায় ও? চুপ করে' বসে' রইল কিরণ। যা তার মনে হ'তে লাগল তাকে ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার প্রবৃত্তি আর হ'ল না। একটা অপূর্ব রস ধীরে ধীরে আবিষ্ট করে' ফেলতে লাগল তার সমস্ত চিত্তকে। চুপ করে' বসে' রইল সে।

মেস। আপিস থেকে ফিরেছেন সবাই। ধূর্জটিবাবু আপিসে যান না, তিনি দিবানিদ্রা শেষ করে' উঠেছেন একটু আগে। গোবর্ধনবাবুর সকালবেলায় কাগজ পড়বার অবসর হয় না। কাগজটা কেনেন হরিদাসবাবু, তিনিই পড়েন সকালে। তাঁর পড়া শেষ হ'তে না হ'তেই অঘোরবাবু ছোঁ মেরে নিয়ে নেন সেটা। ন'টার সময়ই আপিসে বেরুতে হয় গোবর্ধনবাবুকে। তাছাড়া অঘোরবাবুর মতো অমন করে' ছোঁ মেরে নিয়ে দায়-সারা-গোছ কাগজ পড়ায় তৃপ্তি হয় না গোবর্ধনবাবুর। তিনি প্রত্যেক খবরটি খুঁটিয়ে রসিয়ে রসিয়ে পড়তে চান। আপিস থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়ে' জলখাবার খেয়ে কাগজটি নিয়ে বসেন তিনি।

হরিদাসবাবু দাড়ি কামাচ্ছিলেন। হরিদাসবাবু লোকটিও সাধারণ-পন্থী নন। সকালবেলা দাড়ি কামান না। কারণ ঘুমোন অনেক রাত্রে, ওঠেন দেরিতে। উঠে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়ে' চিঠিপত্র লিখতে লিখতেই দশটা বেজে যায় তাঁর। এগারোটার সময় আপিস। তাই বিকেলে দাড়ি কামান।

গোবর্ধন নিবিষ্টচিত্তে বসে' কাগজ পড়ছিলেন। ভুরু এবং কপাল বেশ কুঁচকে ছিল।

ভৃত্যবেশী দিবস দু'জনের পাশে দু' পেয়ালা চা রেখে' গেল।

গোবর্ধন হঠাৎ হরিদাসের দিকে চেয়ে বললেন, "উফ্, এই লোকটাই ডোবাবে।"

হরিদাসবাবুর দাড়ি কামানো শেষ হয়েছিল। তিনি আয়নার সামনে নানারকম মুখভঙ্গি করে' নানাভাবে নিজের মুখশ্রী দেখছিলেন। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, "কে?"

"কে আবার! আমাদের জহরলাল। যারা বেশী বাক্যবাগীশ তারা কাজের লোক হয় না প্রায়ই। একেই তো দেশ ডুবে' আছে, তার উপর বক্তৃতার বান ডাকাচ্ছে ও।"

হরিদাস কোনও জবাব দিলেন না। তাঁর চোখ দুটি হাস্যদীপ্ত হ'য়ে উঠল শুধু। মুখটি মুছে চায়ের পেয়ালা তুলে' চুমুক দিলেন একটা। দিবস আবার ঘরে ঢুকল এবং ঘর ঝাড়ু দিতে লাগল। দিবস যতক্ষণ এখানে থাকে একটি কথা বলে না। নীরবে কাজগুলি শেষ করে' চলে' যায়।

"দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, সে-সব চুলোয় গেল, ইন্দোনেশিয়ার জন্যে মাথা ঘামিয়ে মরছেন উনি।"

হরিদাস তবু কোন কথা বললেন না, নীরবে চা খেয়ে যেতে লাগলেন। গোবর্ধন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি হরিদাস-বাবুর চোখের দৃষ্টি থেকেই তাঁর সম্ভাব্য জবাবটা অনুমান করে' নিয়ে বললেন—

"তুমি বলছ কি করবে তা'হলে? ওই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার-গুলোকে টপাটপ ধরুক আর লটকে দিক। এইটেই তো হ'ল প্রথম কাজ।"

হরিদাস তবু কিছু বললেন না। হাসলেন একটু।

"আমার মতে ঘরটি সামলানো দরকার আগে। ঘরটি সামলে-সুমলে তারপর যত খুশী ফপরদালালি কর না তুমি, কে বারণ করছে। কি বল?"

এর উত্তরে হরিদাস যে প্রশ্নটি করলেন তা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে হ'ল গোবর্ধনবাবুর।

"কিছু যদি মনে না করেন গোবর্ধনবাবু, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কোন্ বছর ম্যাট্রিক পাস করেছেন বলুন তো?"

"ম্যাট্রিক? ম্যাট্রিক তো পাস করি নি। কেন?"

"না এমনি। আচ্ছা, রাজনীতি চর্চা করছেন কতদিন থেকে?"

"রাজনীতি? সে আর করবার সময় পেলুম কোথায় ভাই? গোঁফ উঠতে না উঠতেই তো বাবা আপিসে ঢুকিয়ে দিলেন।"

"ও।"

হরিদাসবাবু গম্ভীরভাবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলেন। দিবস নীরবে ঝাড়ু দিয়ে যেতে লাগল। তার মুখের পেশী বিচলিত হ'ল না একটু। সে এদের সব কথা মন দিয়ে শুনছিলও না। সে দোকান থেকে সরোদটা কিনে সেটা সৌদামিনীর হাতে দিয়ে চলে এসেছে। কিরণকে সরোদটা দেখানো হয় নি এখনও। এই সব কথাই মনে হচ্ছিল তার। রঞ্জনার কথাও। দামটা দিতে আজই সে আসবে নাকি? তার ইচ্ছে হচ্ছিল সৌদামিনীকে বলে' আসতে যে একটি মেয়ে হয়তো আসতে পারে—কিন্তু লজ্জা করল—লজ্জাই বা করল কেন, ভাবছিল সে—।

"হঠাৎ এসব কথা জিগ্যেস করবার মানে?"—গোবর্ধন প্রশ্ন করলেন ভুরু কুঁচকে।

হাসি চিকমিক করে' উঠল হরিদাসবাবুর চোখে।

"আপনি যে একটা জিনিয়াস এ সন্দেহ আমার গোড়াগুড়িই ছিল, এখন অকাট্য প্রমাণ পেলাম। জহরলাল, বেভিন, স্ট্যালিন, মলটভ, ট্রুম্যান, টিটো, ম্যাকার্থার প্রতিদিন সকলকে এমনভাবে তুলো-ধোনা করা সহজ কথা নয়।"

গোবর্ধন বুঝলেন ছোকরা ইয়ার্কি করছে।

"খুব ইয়ার হয়েছ, নয়"—এই বলে' তিনি গিরিবালা মার্ডার কেসে মনঃসংযোগ করতে যাচ্ছিলেন—এমন সময় অঘোর এসে ঘরে ঢুকলেন।

"দিবু আমার সিগারেট এনেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে।"

ফতুয়ার পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে' দিলে সে অঘোরকে।

"আজও ছ' আনা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"উঃ, আর বাঁচতে দেবে না !"

তারপর হরিদাসের দিকে চেয়ে বললেন, "যদিও রবীন্দ্রনাথ বলে' গেছেন 'বোলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে'।"

"ভুল কোটেশন কর কেন !"—কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে' গোবর্ধন বললেন অপ্রত্যাশিতভাবে—"রবীন্দ্রনাথ নয়, নবীন সেন" —তারপর হরিদাসের দিকে তিনিও চাইলেন, "নবীন সেন নয় ?"

"আমার তো মনে হচ্ছে সেক্‌স্‌পীয়র"—হাস্যদীপ্ত চক্ষে গম্ভীর-ভাবে উত্তর দিলেন হরিদাস।

"দেখ, ইয়ার্কির একটা সীমা আছে। খুব বেশী ফাজিল হওয়াটা ভাল নয়।" উপদেশ দিয়ে আবার কাগজে মন দিলেন গোবর্ধন।

অঘোরবাবু কিন্তু কবিতা নিয়ে মাথা ঘামালেন না আর। হরিদাসবাবু লেখাপড়া করেন, তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবার

জন্যেই দু'লাইন কবিতা আউড়েছিলেন তিনি। মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে দেখে' একেবারে কাজের কথা পাড়লেন।

"তোমার সেই ইনসিওরেন্সের টাকাটার কি করলে হে ?"

"ব্যাঙ্কে রেখে' দিয়েছি।"

"এই সময়ে টাকাটা যদি গ্রেন্‌সে ইন্‌ভেস্‌ট্ করতে পারতে বেশ কিছু হ'ত! রোজ কেনো, রোজ বেচে দাও—বেশী কিছু করতে হ'বে না—ক্লিয়ার টেন পারসেণ্ট।"

"আমি তো গোড়াতেই বলেছি—আমি বড়লোক হ'তে চাই না।"

"অতগুলো টাকা ফেলে রাখবে ?"

হরিদাস এ কথার উত্তর দিলেন না। অঘোর একটা সিগারেট ধরিয়ে তর্ক করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। দিবস ঘর ঝাড়ু দেওয়া শেষ করে' চলে' গেল পাশের ঘরে। অন্য কথা পাড়লেন গোবর্ধন। হরিদাসের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি টুরে বেরুচ্ছ কবে ?"

"দেরি আছে এখনও।"

"কোন্ দিকে যাবে ?"

"কাটোয়া।"

"ডাঁটা পাও তো এনো।"

সহসা পাশের ঘরে যুগপৎ হারমোনিয়ম ও বেহালা বেজে উঠল। ভাঙা গলায় ধূর্জটি গান ধরলেন—"এইসো এইসো প্রিয়তমো হে-এ"

"এই লোকটাই তাড়াবে আমাকে এখান থেকে, বুঝলে অঘোর ?"

অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলে' উঠলেন গোবর্ধন।

"যাই বলুন, ভদ্রলোক সিনসিয়ার কিন্তু"—হরিদাস ফোড়ন দিলেন হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি তুলে'—"সঙ্গীতের প্রতি যাকে বলে অনুরাগ, তা আছে ভদ্রলোকের।"

অঘোর বললেন, "তা আছে বইকি। সেতার, এস্রাজ, ম্যাণ্ডোলিন, গীটার দমাদ্দম কিনেই চলেছে—সিনসিয়ার বটে।"

"সিনসিয়ার-ফিনসিয়ার নয়, উন্মাদ। হরিদাস, বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওকে কোনও ওস্তাদের আখড়ায় ভর্তি করে' দাও না তুমি। সেইখানে গিয়ে যত খুশী চীৎকার করুক। এখানে কানের পাশে এভাবে চেঁচালে তো টেকা যাবে না—আর ও চেঁচাবেই—যেরকম দেখছি—"

অঘোর বলে' উঠলেন, "কাল যে রাস্তায় একটা হ্যাণ্ডবিল পেলুম কোন্ এক গহনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী থেকে এসে এখানে এক সঙ্গীত-ভবন খুলেছেন, আনাড়িকেও সঙ্গীতজ্ঞ করে' তুলছেন, সেইখানে ভিড়িয়ে দিলে কেমন হয়? কোথায় রাখলাম হ্যাণ্ডবিলটা—"

জামার পকেট থেকে হ্যাণ্ডবিলটা খুঁজে বার করলেন তিনি।

"এই যে—"

হরিদাসকে দিলেন কাগজখানা।

"যা হোক একটা ব্যবস্থা কর ভাই"—মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে গোবর্ধন হরিদাসকে বললেন, "এখান থেকে যাবই বা কোথা? চট্ করে' বাড়ি তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ যে সাপের ছুঁচো-গেলা হয়েছে আমাদের।"

বাড়িটি ধূর্জটিবাবুরই। মফঃস্বলের জমিদার তিনি। সম্প্রতি পত্নীবিয়োগ হওয়াতে কোলকাতায় এসে সঙ্গীত নিয়ে নিজেকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছেন। সমস্ত বাড়িতে তিনি একাই ছিলেন এতদিন। হরিদাসবাবুর সঙ্গে ধূর্জটির বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরই অনুরোধে তিনি পাশের ঘর দু'খানা এঁদের মেস করবার জন্যে দিয়েছেন। নিজেও এঁদের মেসেই খাওয়া-দাওয়া করছেন আজকাল। সুতরাং ধূর্জটিকে এ বাড়ি থেকে তাড়ানো অসম্ভব।

চুনীলালের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনটা পড়ে' হরিদাসবাবু বললেন, "তা চেষ্টা করা যেতে পারে।"

"দোহাই তোমার, কিছু একটা কর ভাই"—গোবর্ধন বললেন।

"এত বাড়াবাড়ি করত না, কিন্তু ওকে ওস্‌কাচ্ছে ওই উমেশ" একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন অঘোর।

"উমেশ ওস্‌কাবে না কেন, তার দোকানের জিনিস বিক্রি হচ্ছে যে।"

পাশের ঘরে বেহালা হাতে করে' ধূর্জটি বসেছিলেন। তাঁর সমস্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হচ্ছে, গান-বাজনা কিছুই যে জমছে না তা নিজেই অনুভব করছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি জমিদার মানুষ। তাঁর শুধু যে অজস্র টাকা আছে তা নয়, বদ্ধমূল ধারণাও আছে যে টাকার জোরে সব হয়। তাঁর বন্ধু উমেশ দত্ত (বাদ্যযন্ত্রের দোকান খুলেছেন যিনি সম্প্রতি ধূর্জটির কাছ থেকে ক্যাপিটাল নিয়ে) তাঁর মনে আর একটা ধারণাও পাকা করে' দিয়েছেন। তাঁর গলায় নাকি দানা আছে! দিনকতক সাধনা করলেই তাঁর গলা আরও নাকি দানাদার হ'য়ে উঠবে এবং তখন রসিক সমাজ তার রসাস্বাদন করে' মুগ্ধ হ'য়ে যাবেন।

দিবস ঘরে ঢুকতেই ঝাপসা কণ্ঠে ধূর্জটি বললেন, "দিবু, দেখতো ঠাকুরকে গরম জল করতে বলেছি, সেটা হ'ল কিনা। গলাটায় একটু সেক্ দেওয়ার দরকার।"

"দেখি"—দিবস চলে' যেতে উদ্যত হ'ল।

"আর শোন, উমেশবাবু বলছেন ঘিয়ের সঙ্গে গোলমরিচ ফুটিয়ে খেতে। ঘি আনতে পারবে একটু চট্ করে'?"

"পারব।"

চট্ করে' নিয়ে এস তো বাবা। পয়সা নিয়ে যাও। গোলমরিচও এনে দিও। ঠাকুরকে বল ঘি-গোলমরিচটা আগেই ফুটিয়ে দেয় যেন।"

"আচ্ছা।"

দিবস চলে' যাচ্ছিল এমন সময়ে উমেশ বললেন, "একটু আদা দিলে আরও ভাল হয়।"

"দিবু, একটু আদাও এনো তাহ'লে। এক টাকায় কুলোবে কি? এই পাঁচ টাকার নোটটাই নিয়ে যাও না হয়। ভাল ঘি এনো, দালদা মেশানো যেন না হয়, দেখে নিও একটু।"

দিবস পাঁচ টাকার নোট নিয়ে চলে' গেল। যন্ত্রবৎ কাজ করে' যাচ্ছিল সে। তার মনিবদের কথাবার্তা, আচরণ প্রথমটা ঈষৎ অদ্ভুত মনে হচ্ছিল তার, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছিল এরাই স্বাভাবিক, আমিই অদ্ভুত। তারপর থেকে কাজের দিকেই সমস্ত মন লাগিয়ে রেখেছে সে। এদের দিকে মনোযোগ দেওয়া শুধু যে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে তা নয়, বিপজ্জনকও মনে হয়েছে। হঠাৎ যদি এদের কোনও কথার বা আচরণের প্রতিবাদ করে' ফেলে সে, তাহ'লে হয়তো চাকরিটি যাবে। চাকরি যোগাড় করা যে কি কঠিন ব্যাপার একদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তা সে বুঝেছে। তাই তার কেবলই মনে হচ্ছে এই অকূল সমুদ্রে যে ভেলাটা সে পেয়েছে সেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকাই উচিত। চোখ বুজে তাই সে সেটাকে আঁকড়ে ভেসে' চলেছিল। দিবসের আচরণ হরিদাসবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কিন্তু। যদিও মুখে তিনি কিছু বলেন নি কিন্তু মনে মনে তিনি এই নব নিযুক্ত মৌন কর্তব্যনিষ্ঠ চাকরটির আচরণে বিস্ময়বোধ করছিলেন।

দিবস চলে' যাবার পর ধূর্জটি নীরবে বসে' রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়ে' গেল তাঁর। উমেশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "বেহালাটার সুর ঠিক বেরুচ্ছে না তো!"

"কাঠটা ভাল নয় বোধ হয়। আজ দোকানে নিয়ে যাবেন, বদলে দেব।"

ধূর্জটি জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন। দূরে তেতলা বাড়ির চিলে-কোঠাটা পার হয়ে' তাঁর দৃষ্টি ঠেকল গিয়ে আকাশে। সমস্ত গুলিয়ে গেল যেন, কি রকম যেন মনে হ'তে লাগল।

যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাটা আশা-আশঙ্কায় টেনে' নিয়ে যাচ্ছিল তাকে বাসার দিকে, পথে চলতে চলতে দিবস হঠাৎ ঠিক করে' ফেললে কিছুতেই তাকে আমল দেবে না। দেওয়া উচিত নয়। সেই মেয়েটি টাকা ফেরত দিতে এসেছে কিনা এই খবরটাকে এখন প্রাধান্য দেওয়া মানেই নিজেকে নিজের কাছে অবনত করা, হঠাৎ মনে হ'ল তার। সে ঘুরে' কিরণের বাসার দিকে অগ্রসর হ'ল। কিছুদূর গিয়ে নজরে পড়ল একটা সিনেমার সামনে প্রচুর ভিড়। সেকেণ্ড শো শুরু হচ্ছে বোধ হয়। একবার লোভ হ'ল টিকিট কিনে ঢুকে পড়লে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হ'ল কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেতে পারে। হয়তো বাবার সঙ্গেই। অবসর পেলেই সূর্য চৌধুরী সেকেণ্ড শোয়ে সিনেমা দেখতে আসেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল দিবস খানিকক্ষণ। না, তাদের মোটরটা দেখা যাচ্ছে না তো। একটু এগিয়ে আবার ভাল করে' দেখল। না, নেই। তবু সে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। না, সিনেমায় যাবে না সে। এখন যার মাসিক আয় মাত্র কুড়ি টাকা, আপাতত সিনেমা দেখার লোভ সম্বরণ করতে হ'বে তাকে।

কিরণের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখতে পেলে কপাট যদিও বন্ধ কিন্তু কিরণ বাড়িতে আছে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। নিবিষ্টচিত্তে কি যেন লিখছে। কবিতা নিশ্চয়, দিবস ভাবলে। কবিতাই লিখছিল কিরণ। সকালে যে কবিতাটা আরম্ভ করেছিল সেইটেই নূতন ছন্দে লিখছিল আবার।

দিবস ডাকতেই উঠে কপাট খুলে' দিলে সে।

"কবিতা লিখছিস নাকি?"

"হ্যাঁ।"

খাতাটা মুড়ে একপাশে সরিয়ে রেখে' দিলে।

"কি লিখলি, পড় না শুনি।"

"শুনবি?"

দিবস পাশের বিছানায় বসল। কিরণ পড়তে লাগল—

দূর হ'তে শুনি তব বাঁশী, দূর হ'তে দেখি তব শোভা,
অয়ি মনোলোভা
সুদূর আকাশে তুমি মেঘে মেঘে বিচিত্র-বরণী
আমি নিম্নে স্বপ্নাতুর দরিদ্র ধরণী
দিবাযামী শুধু চেয়ে থাকি
তোমার মদিরবর্ণে পূর্ণ করি আঁখি।
তারপর ধীরে ধীরে
বর্ণ-জলধির তীরে
নামে অন্ধকার,
নামে শঙ্কা, জাগে ক্ষোভ মূঢ় ব্যর্থতার,
আকাশের লক্ষ তারা করে যেন লক্ষ উপহাস
রুদ্ধ হ'য়ে আসে যেন শ্বাস
আঁধার প্রান্তরে তুমি সহসা আবার শিখা জ্বালো
হে আলেয়া আলো।

কবিতাটা শুনতে শুনতে দিবসের মনে রঙ্গনার ছবিটা মূর্ত হ'য়ে উঠল। এই ছবিটাই যেন ভাব জোগাল তার মন্তব্যের।

"কবিতাটা চমৎকার হয়েছে, কিন্তু অন্ধকারের কাছে আমি হার মানতে রাজি নই। শঙ্কা, ক্ষোভ, ব্যর্থতার উর্ধ্বে উঠতে হ'বে আমাদের। দূর থেকে বাঁশী শুনে' কেবল মুগ্ধ হ'য়ে থাকলেই চলবে না, বাঁশীটা দখল করে' সেটা বাজাতে হ'বে নিজে।"

"বাজাবার চেষ্টা করতে হ'বে বল, সত্যি সত্যি বাজান যাবে কিনা কে জানে!"

"কিন্তু তোর কবিতার সুর শুনে' মনে হচ্ছে তুই যেন ধরে' নিয়েছিস তোর আকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ হ'বে না।"

"হয় কি কখনও?"

কিরণের ঠোঁটে ছোট্ট একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

"হয় বইকি"—দিবসের খেয়ালই রইল না যে, যে-কথাগুলো সে বলতে যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে তার কিছুদিন আগেকার একটা উক্তির মিল নেই এবং আগেকার সেই উক্তিটা কিরণের মনে থাকা সম্ভব—"খুব হয়, হরদম হচ্ছে। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'বেই এ বিশ্বাস নিয়ে যদি আমরা না অগ্রসর হই তাহ'লে কাজে উৎসাহ পাব কেন?"

কিরণের চোখে এক ঝলক আলো চকমক করে' উঠল।

"কিছুদিন আগে তুই যে 'মা ফলেষু'র বক্তৃতাটা করেছিলি, আজকের বক্তৃতাটার সঙ্গে সেটাকে খাপ খাওয়াচ্ছিস কি করে' তাহ'লে?"

রাস্তার মোড় ঘুরেই অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তা বন্ধ দেখলে, 'রোড ক্লোজ্ড্' লেখাগুলোর দিকে মোটর-ড্রাইভার যেমনভাবে চেয়ে 'গিয়ার' বদলে গাড়ি ব্যাক করতে থাকে, দিবসও অনেকটা তেমনি করলে।

"খাপ খাওয়াবার চেষ্টা আমি করছি না। 'মা ফলেষু'র মানে এ নয় যে ফল সম্বন্ধে তুমি উদাসীন থাকবে। ওর মানে ফল যা হ'বে তা তোমার আয়ত্তের বাইরে, কাজ করাটাই তোমার আয়ত্তাধীন. তাই কর্ত্তব্যেই তোমার অধিকার। কিন্তু প্রত্যেক কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকবে নিশ্চয় এবং সে উদ্দেশ্য সফল করতেই হ'বে, তা সফল হ'বেই, এরকম একটা বিশ্বাস থাকলেই যে গীতাকে অমান্য করা হ'বে তা আমি মনে করি না। তবে একটা কথা, চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য যদি

বিফল হয় তা'হলে মুষড়ে পড়া উচিত নয়, তাতে লজ্জারও কিছু নেই—"

কিরণ হাসিমুখে দিবসের দিকে চেয়ে রইল, কিছু বললে না। তার মুখভাব দেখে' মনে হ'ল দিবসের আবোলতাবোলের প্রতিবাদ করে' সময় নষ্ট করতে সে রাজি নয়। বাঁশী বাজাবার লোভ তারও যথেষ্ট আছে, মনে মনে বাঁশীটার দিকে হাতও বাড়াচ্ছে, সে বার বার, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে' সেটাকে ধরতে পারলে সে বাজাবেও, কিন্তু সেটা পারা যাবে কি না সেইটেই সমস্যা এবং সেই সমস্যার সংশয়ই তো কবিতার উৎস। কবিতার উৎস ? তাই বা কে বলতে পারে ? কবিতা দেখে' কি তার উৎসের খবর জানা সম্ভব ? ফুল দেখে' কি বোঝা যায় যে তার উৎস মাটির অন্ধকারে ? আকাশে নয়, তাই বা কে বললে—যে মন আমাদের মুখভাব পরিবর্তন করে, কিরণের সেই মন নানা জটিল চিন্তায় ব্যাপৃত হ'য়ে পড়াতে তার মুখের হাসিটা মুখোশের হাসির মতো দেখাতে লাগল।

"কি ভাবছিস তুই ?"

"কিছু না, তোর চাকরি কেমন লাগছে ?"

"খারাপ নয়। কেরানীগিরির চেয়ে ভাল, মাইনে কম যদিও—"

"রেস্‌পেক্‌টেব্‌লও নয়" কিরণ বললে মুচকি হেসে।

"ওই ঝুটো রেস্‌পেক্‌টেবেলিটিই তো দফা নিকেশ করেছে আমাদের। ওরই মোহে পড়ে' সমর্থ ছেলেরা রোজগার করছে না, মেয়েরা খুঁজে বেড়াচ্ছে রাজপুত্র, ফলে কারও বিয়ে হচ্ছে না, সমাজ উচ্ছন্ন যাচ্ছে।"

"মোহই বল আর যা-ই বল, উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি এবং সম্ভবত উন্নতিরও সোপান—"

"আহা উচ্চাকাঙ্ক্ষা খারাপ কে বলছে! কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা করলেই তো শুধু হ'বে না, তার যোগ্য হ'তে হ'বে। সেই যোগ্যতার প্রথম ধাপ আত্মসম্মান। আত্মসম্মানহীন রেস্‌পেক্‌টেবেলিটির নামই ঝুটো

রেস্‌পেক্‌টেবেলিটি, যা রক্ষা করবার জন্যে ধোপা, নাপিত, দর্জির সাহায্য নিতে হয়, ধার করে' গাড়ি বাড়ি করতে হয়, মুখস্থ করে' বুলি আওড়াতে হয়—"

কিরণ হেসে ফেললে দিবসের উত্তেজনা দেখে'। নিতান্ত ছেলে-মানুষ—মনে হ'ল তার।

"চল্ তোর বাসাটা দেখে' আসি। তর্ক থাক এখন।"

"জানিস আমি সরোদ কিনেছি"—আবার উৎসাহিত হ'য়ে উঠল দিবস—"এইবার চল একদিন গহনচাঁদবাবুর কাছে যাওয়া যাক।"

"তুই না এলে এখন সেখানেই আমি যেতাম। উর্মি ঠিকানাটা দিয়ে গেছে আমাকে।"

"ও, বেশ তো, সেখানেই চল না তাহ'লে। ভর্তি হ'য়ে আসা যাক।"

"বেশ। চা খাবি? স্টোভে তেল আছে, পারমিট পেয়েছি।"

"বেশ তো।"

কিরণ স্টোভ জ্বালতে বসল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটছিল আর একটি ঘটনা দিবসের কারফরমা লেনের বাসায়। বাসার বারান্দায় একটা ভিজে কাপড় শুকোচ্ছিল। সৌদামিনী এবং গিরিবালা এসে ঢুকল।

"এখনও তো আসে নি দেখছি"—লণ্ঠন তুলে' সৌদামিনী বললে।

"মেস থেকে ঠিক আটটার সময়ে বেরিয়েছে কিন্তু। এলে মনে করে' বোলো কথাটা। উকিলের ছেলে, কোনও একটা হদিস বাতলাতে পারে হয়তো। মুখপোড়ার চোখ রাঙানি আর সহ্য হয় না।"

"বলব। কাপড় কাচার ছিরি দেখ।"

দিবস নিজের কাপড়টা নিজেই কেচে শুকোতে দিয়ে গিয়েছিল।

কাপড়ের একজায়গায় দাগ লেগেছিল খানিকটা। সেইটে দেখিয়ে সৌদামিনী মন্তব্য করলে।

"পরশু দিন চা নিয়ে যেতে যেতে চা চল্‌কে পড়েছিল যে খানিকটা।" মুচকি হেসে গিরিবালা বললে।

"বড়লোকের ছেলে ওসব কাজ পারবে কেন ?"

"কাজ খুব চমৎকার করছে। মুখ বুজে করে' যায়, বাবুরা খুব খুশী।"

"তোর কাছে সাবান আছে ?"

"আছে।"

"দে দিকিন। থুবে কেচে দি ভাল করে'।"

কাপড়টা নিয়ে সৌদামিনী কলতলায় গেল। সাবানও দিয়ে গেল গিরিবালা। রাস্তার আলো এসে পড়েছে কলতলায়। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে হাঁসের জাল-দেওয়া খাঁচাটা। জালের ভিতর দিয়ে হাঁসটাকেও দেখা যাচ্ছে। কাপড় কাচতে কাচতে হাঁসটার দিকে নজর পড়ল সৌদামিনীর, পড়তেই একটা কথা মনে পড়ে' গেল সঙ্গে সঙ্গে।

"ওই যাঃ, ধানের কথাটা বলতে আবার ভুলে গেলাম আজ। নিজেই গিয়ে আনতে হ'বে কাল দেখছি।"

অন্ধকার গলিটার মুখে একটা টর্চের আলো জ্বলে উঠল দপ্‌ করে'। 'সেই মুখপোড়া আসছে নাকি আবার! জ্বালাতন করে' তুললে তো'—সৌদামিনীর স্বগতোক্তি বাধা পেল কিন্তু পরমুহূর্তেই। টর্চ জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে এল রঙ্গনা।

"আচ্ছা, দিবসবাবু বলে' কেউ কি থাকেন এখানে ?"

সৌদামিনী এগিয়ে এসে নিরীক্ষণ করতে লাগল রঙ্গনাকে। বিস্মিত হ'ল তার বেশবাস দেখে'।

"দিবসবাবুর কি এইটেই বাসা ?"

"হ্যাঁ। তিনি এখনও ফেরেন নি।"

"ও আচ্ছা, তিনি এলে বলে' দেবেন তাঁর সেই টাকাটা আমি দিতে এসেছিলাম। একটু কাগজ দিতে পারেন, একটা চিঠি লিখে রেখে' যেতাম তাহ'লে।"

দিবসের ব্যবহারে রঞ্জনা কম বিস্মিত হয় নি। তার বাসা দেখে' সে আরও বিস্মিত হ'য়ে গেল। এখানে লেখবার মতো কাগজ পাওয়া যাবে কিনা এ সন্দেহও তার হ'ল।

"ওর ঘরে যান—ওই যে, ওইটে ওর ঘর, কপাট খোলাই আছে, ওইখানে টেবিলের উপর সব আছে। লণ্ঠনটাও আছে দোরগোড়ায়।"

এইবার রঞ্জনা হঠাৎ হাঁসটা দেখতে পেলে।

"বাঃ, বেশ চমৎকার হাঁসটি তো! দিবসবাবুর?"

সৌদামিনী মাথা নাড়লে হাসিমুখে। তারপর কাপড়টা কাচতে লাগল আবার। রঞ্জনা একটু ঝুঁকে' টর্চ ফেলে ফেলে দেখতে লাগল হাঁসটাকে। সৌদামিনী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে আবার, একটা কৌতুকোজ্জ্বল হাসি জ্বলজ্বল করে' উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। অনুপস্থিত দিবসকে কেন্দ্র করে' দুটি অপরিচিত নারী-হৃদয় নিজেদের অজ্ঞাতসারেই যে কাব্য রচনা করছিল সে কাব্যের রূপও মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল তখনকার ওই আলো-আঁধারিতে, খাঁচায় বন্দী একক হংসের তন্দ্রাতুর দৃষ্টির সহসা-চকিত বিস্ময়ে। প্রদীপ্ত টর্চটার দিকে হাঁসটা যে-ভাবে চেয়েছিল, অনুপস্থিত দিবসের দিকে রঞ্জনাও মনে মনে চেয়েছিল অনেকটা সেইভাবে। দু'জনেই দেখছিল অপ্রত্যাশিত কিছু একটা। রঞ্জনা সোজা হ'য়ে দাঁড়াল অবশেষে।

"ওই ঘরটা?"

সৌদামিনী পুনরায় মাথা নাড়তেই এগিয়ে গেল সেই দিকে। কমানো লণ্ঠনটা তুলে' নিয়ে ঢুকল ঘরের ভিতর। লণ্ঠন তুলে' ঘুরে' ঘুরে' দেখলে ঘরখানা। টেবিল, চেয়ার, বিছানা, বইয়ের শেল্‌ফ,—ভদ্রলোক স্টুডেণ্ট বোধ হয়, মনে হ'ল রঞ্জনার। অবস্থা

খারাপ তাই এখানে এসে আছে। হঠাৎ খুব আনন্দ হ'ল তার, একটা দমকা হাওয়া যেন অজস্র ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গেল তার মনের ভিতর। দিবস চৌধুরী গরীব এই ধারণাটাকে ঘিরে তার মন স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে গেল সহসা। এগিয়ে গেল সে টেবিলের দিকে। টেবিলে এটা কি? কার ফটো? সূর্য চৌধুরীর ফটোর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর চিঠি লেখার প্যাডখানা দেখতে পেলে। প্যাডটা টেনে' নিয়ে লিখতে লাগল। ফাউন্টেন পেন তার সঙ্গেই ছিল।

দিবসবাবু,

আপনার টাকাটা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছি। আবার আসব কাল, বিকেল পাঁচটার পর, ছ'টার মধ্যেই। আশা করি বাড়িতে থাকবেন। তখন টাকা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়িতে আপনাকে বোধ হয় ধন্যবাদ দিতেই ভুলে গিয়েছিলাম। খেয়ালই হয় নি। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। নমস্কার। ইতি—

রঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌদামিনী এসে ঢুকল।

"কিছু বলবার থাকে তো আমাকে বলে' যেতে পারেন, এলে আমি বলে' দেব।"

"আমি লিখে রেখে' গেলাম। কাল আবার আসব।"

"ও, আচ্ছা। আপনার নামটি?"

"রঙ্গনা। রঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আচ্ছা।"

"আমি চললাম তাহ'লে।"

রঙ্গনা চলে' গেল। রঙ্গনার প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে সৌদামিনী দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গালে হাত দিয়ে ঘাড়টি কাৎ করলে। দিবসের পরিচয় সে শুনেছিল। তার সঙ্গে রঙ্গনার আবির্ভাব

জড়িয়ে তার মনে যে-সব ভাব জাগল তা অবর্ণনীয়। ফলে দিবসের প্রতি তার স্নেহ হঠাৎ যেন গাঢ়তর হ'য়ে গেল। স্বগতোক্তি করলে —কি দুষ্টু ছেলে বাবা, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কি কাণ্ডই করছে। লণ্ঠনটা তুলে' দিবসের বিছানাটা দেখলে, তারপর ঝেড়ে পরিষ্কার করে' দিলে আর একবার। একবার সন্ধ্যাবেলা করেছিল। আর একবার তার মনে হ'ল—মশারির কথা তো পই পই করে' বলে' দিয়েছি, কিন্তু আনে তবে তো—।

"সত্ন, ও সত্ন, কোথা গেলি তুই—"

গিরিবালার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আমি এখানে আছি।"

গিরিবালা এসেই বললে, "তুই ক্ষেপে যাবি নাকি তোর দিবুকে নিয়ে। ওদিকে ভাত ঠাণ্ডা হচ্ছে যে।"

"চল।"

চুনীলালের বাড়িতে গানের আসর জমে' উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রী অনেকগুলি জুটে' গেছে ইতিমধ্যে। সারি সারি বসে' আছে তারা। গহনচাঁদ সরোদে দরবারি কানাড়া বাজাচ্ছেন। সঙ্গত করছে সীতারাম আর রমজান। উর্মিও একপাশে বসে' আছে। দরবারি কানাড়া খুব জমে' উঠেছে। ছোট ঘরটার পরিধি অনেক বিস্তৃত হ'য়ে গেছে। ঘরটা সত্যিই কখন যেন রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে বিরাট এক রাজ দরবারে। অদৃশ্য সিংহাসনে অদৃশ্য সম্রাট বসে' আছেন যেন রাজকীয় মহিমায়, আর তাঁকে ঘিরে সুরের আরতি চলছে তালে, লয়ে, মানে, মীড়ের টানে টানে, সুরসপ্তকের উদাত্ত ঝংকারে ঝংকারে। অবর্ণনীয় পরিবেশ হয়েছে একটা। তন্ময় হ'য়ে চোখ বুজে বাজিয়ে চলেছেন গহনচাঁদ। দুটি ছাত্রী দরবারি কানাড়া শিখতে চেয়েছে তাঁর কাছে। দরবারি কানাড়ার রূপটা তাদের দেখাচ্ছেন তিনি। স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসেছে যেন

সুরময়ী অপ্সরীরা, তাদের নৃত্যনিক্কণে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে দরবারি কানাড়া। সকলেরই মনে হচ্ছে, চলুক, এ যেন না থামে। কিন্তু একটু পরে সরে এসে থেমে গেলেন গহনচাঁদ। নির্বাক নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলেন সবাই। কারও মুখ দিয়ে একটা কথা সরল না। রমজানের ঠোঁট ছুটো নড়ল শুধু, মনে হ'ল অস্ফুটকণ্ঠে সে যেন বললে—'ওয়া, ওয়া'। সীতারাম স্তব্ধ বিভোর হ'য়ে বসে' রইল, তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরুল না।

গহনচাঁদই প্রথমে কথা কইলেন।

"এই হ'ল দরবারি কানাড়ার রূপ। সবটা অবশ্য একেবারে তোমরা পারবে না, সাধতে হ'বে ক্রমশ। আজ একটা সোজা গতের স্বরলিপি লিখে দেব তোমাদের। রঙ্গনা আসুক, রঙ্গনার কাছে লেখা আছে গৎটা।"

"রঙ্গনা কোথা গেছে?" উর্মি জিগ্যেস করলে।

"সে বেরিয়েছে একটু, আসবে এখুনি।"

"আমাকে কবে থেকে নাচ শেখাবেন?"

"ও তুমি বুঝি কথ্থকি নাচ শিখতে চাও? ময়ূর নাচটা শেখ তবে। সকালে আসতে হ'বে তাহ'লে।"

"বেশ তো, কখন আসব বলুন?"

চুনীলাল বারান্দায় ওৎ পেতে বসে ছিল। সে ঘরের ভিতর মুখ বাড়িয়ে বললে, "ন'টার পর। তার আগে তো জামাইবাবুর পূজোই শেষ হ'বে না"—বলেই বারান্দা থেকে নেমে গেল বিড়ি ধরাবার জন্যে।

"হ্যাঁ, ন'টার পরই এস। কিছু আবীরও কিনে এনো।"

"আবীর? আবীর কি হ'বে?"

"মেঝের উপর আবীর ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর পাতলা চাদর পেতে দিতে হ'বে একটা, সেই চাদরের উপর নাচতে হ'বে। নাচটা যখন তোমার শেষ হ'য়ে যাবে তখন নাচের পর চাদরটা তুললে

দেখতে পাবে আবীরের উপর একটা ময়ুর আঁকা হ'য়ে গেছে। ময়ূরটা যেন পেখম তুলে' নাচছে।"

"তাই নাকি! বাঃ চমৎকার তো!"

উর্মির মনও সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরের মতো পেখম মেলে' নেচে উঠল যেন। গহনচাঁদ সস্নেহে চেয়ে রইলেন তার দিকে। রমজান এবং সীতারামের দৃষ্টিও স্নেহসিক্ত হ'য়ে উঠল। তারাও স্মিতমুখে চেয়ে রইল উর্মির দিকে।

"কতটা আবীর আনব?"

"কালই আবীর আনবার দরকার নেই। কাল বরং একটা খড়ি এনো। ময়ূরটা মেঝেতে এঁকে দাগে দাগে পা ফেলে ফেলে নাচটা অভ্যাস করে' নাও আগে। তারপর আবীর বিছিয়ে দেখলেই হ'বে একদিন, ঠিক হচ্ছে কিনা।"

"বেশ খড়িই আনব তাহ'লে। এই যে রঙ্গনাদি এসে গেছেন।"

রঙ্গনা এসে ঢুকল।

"কি হ'ল? দিয়ে এলি টাকাটা?"

"দেখা পেলাম না ভদ্রলোকের।"

ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ছি ছি, টাকাটা আজই দিয়ে আসা উচিত ছিল ভদ্রলোকের। দেখা পেলি না? ছি ছি!"

"বড়ী আপসোস কি বাত"—সীতারামও ক্ষোভ প্রকাশ করলে।

"কি করা যায় বল দেখি সীতারাম? উনি অতটা ভদ্রতা করলেন, আমাদেরও যেমন করে' হোক আজই টাকাটা দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তুমি আর রমজান না হয় টাকাটা নিয়ে যাও, বাড়ি যাবার সময় আর একবার চেষ্টা করে' দেখ যদি ধরতে পার ভদ্রলোককে।"

"আমি চিঠি লিখে রেখে' এসেছি। কাল গিয়ে দিয়ে আসব এখন।"

"আবার তুই যাবি কাল ?"

এমন সময় উর্মি রঙ্গনার কানে কানে কি একটা বলাতে কথাটা চাপা পড়ে' গেল। রঙ্গনা মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, "হ্যাঁ, সুর দেওয়া হ'য়ে গেছে আমার। তবে বাবাকে এখনও শোনাই নি।"

"কি ?"—উৎসুক হ'য়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"উর্মি আমাকে গান দিয়ে গিয়েছিল একটা, সুর বসিয়ে দেবার জন্যে।"

"তুই গানে সুর দিতে পারিস নাকি ? তাতো জানতাম না।"

বিস্ময়ে প্রশ্ন ফুটে উঠল রমজান এবং সীতারামের দৃষ্টিতে।

"শুনবে ?"—রঙ্গনা ফিরে চাইলে গহনচাঁদের দিকে।

"জরুর, জরুর"—উত্তর দিলে সীতারাম। গহনচাঁদ রাজি হ'লেন।

রঙ্গনা হার্মোনিয়ামটা টেনে' নিয়ে বাজাতে লাগল।

"গানটা মনে আছে আপনার ? আমার খাতায় টোকা আছে, দেব ?" একটা ছোট খাতা দেখিয়ে ফিসফিস করে' জিগ্যেস করলে উর্মি।

"আমার মুখস্থ হ'য়ে গেছে।"

মুচকি হেসে হার্মোনিয়াম বাজাতে লাগল রঙ্গনা। খানিকক্ষণ বাজিয়ে কিরণের লেখা গানটা ধরল সে।

আসিবে সে আসিবে সে আসিবে সে
জানি আমি, জানি আমি, জানি গো।
আঁধার রজনী শেষে
আলোক উজল বেশে
আসিবে সে আসিবে সে
আসিবে সে
জানি আমি, জানি আমি, জানি গো।

বলেছে রাতের পাখী
আসিবে সে আসিবে সে
পরাবে রঙীন রাখী
অরুণ আলোতে এসে
বলেছে জ্যোছনা ধারা
বলেছে ভোরের তারা
আসিবে সে আসিবে সে
আসিবে সে
জানি আমি, জানি আমি, জানি গো।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দিবস এবং কিরণ এসে ঢুকল। গানে যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল তা মূর্ত্ত হ'য়ে গেল যেন সহসা।

"এ কি! আপনি আমার ঠিকানা জানলেন কি করে'।" বলে' উঠল রঙ্গনা।

দিবস বিস্ময়ে নির্বাক্ হ'য়ে গিয়েছিল। দু'জনেই এক দোকান থেকে বাজনা কিনেছে এবং দু'জনেই আবার একই গুরুর কাছ থেকে পাঠ নিতেও এসেছে, এই বিস্ময়ের সঙ্গে তার অবচেতন লোকের স্বপ্ন মিলে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল তার মনে। অপ্রত্যাশিত এবং প্রত্যাশিত পাশাপাশি দাঁড়াল যেন সামনে এসে। এক হ'য়ে মিশে গেল যেন দেখতে দেখতে।

"আপনিও এখানে গান শিখতে এসেছেন? আশ্চর্য!"

"এইটেই তো আমার বাড়ি"—তারপর গহনচাঁদের দিকে ফিরে রঙ্গনা বললে—"বাবা, ইনিই দিবসবাবু, কাল আমাকে সেতার কেনবার জন্যে টাকা দিয়েছিলেন।"

ভদ্রতার আতিশয্যে গহনচাঁদ উত্তেজিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং সাগ্রহে দুই বাহু প্রসারিত করে' অভ্যর্থনা করলেন।

"আসুন, আসুন, আসুন। আপনার ভদ্রতার কথা শুনে'—"

একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল দিবস। এ ধরনের অভ্যর্থনা সে প্রত্যাশা করে নি।

"আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার শিষ্য হ'তে এসেছি।"

"শিষ্য, ও, নিশ্চয়ই! তার আর কথা কি! বেশ, বেশ, বেশ। ব'স ব'স ব'স।"

শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন গহনচাঁদ। সীতারাম এবং রমজান নীরবে উপভোগ করতে লাগলেন মিলনটা। গহনচাঁদের উদার চরিত্র তাদের অবিদিত নেই, এই নবাগত উদার যুবকটিকে তারা সকৌতূহলে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

কিরণকে দেখে' উর্মির মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল।

"কিরণদা, একটা কথা শুনুন!"

উর্মির পিছু পিছু কিরণ বাইরে চলে' গেল।

দিবস বসল।

রঙ্গনা বললে, "আমি এক্ষুনি আপনার বাড়ি থেকে ফিরে এলাম।"

"তাই নাকি!"

"এইমাত্র আসছি। বড় নোংরা বস্তিতে আপনার বাড়িটা। আপনার হাঁসটি কিন্তু সুন্দর!"

"হাঁসটিও দেখে' এসেছেন?"

"হ্যাঁ, চমৎকার হাঁসটি। এই নিন আপনার টাকাটা।"

একখানা দশ টাকার এবং আর একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে' তুলে' ধরলে সে দিবসের দিকে।

"টাকার জন্যে ব্যস্ত কি? থাক না,—তাছাড়া আমি—"

শশব্যস্ত গহনচাঁদ কিন্তু দিবসের কথা শেষ হ'তে দিলেন না।

"না, না, সে কি কথা, ওটা নিতে হ'বে বইকি—"

"আমি তো সরোদ শিখব বলে' আপনার স্কুলে ভর্তি হ'তেই

এসেছি। আমার বন্ধু কিরণও ভর্তি হ'বে। আমাদের দু'জনের মাইনেই তো কুড়ি টাকা লাগবে—”

“মাইনে ? অ্যাঁ, বল কি—”

গহনচাঁদ আকাশ থেকে পড়লেন। বারান্দায় উপবিষ্ট চুনীলালের মাথাতেও যেন বম্ পড়ল। ছোকরা দুটি কখন ফট্ করে' ঢুকে পড়েছে টের পায় নি তো সে মোটেই। নূতন ছাত্র-ছাত্রীদের ধরবার জন্যেই সে সর্বদা বসে' থাকে বারান্দায় ওৎ পেতে। রাস্তায় যেই বিড়িটি ধরাতে গেছে, অমনি সর্বনাশটি হ'য়ে গেছে। সাধে মুনি-ঋষিরা বলেছেন যে নেশা করা মহাপাপ ! যাক, পরে সামলে নিলেই হ'বে, এখন যা হবার তা হ'য়ে যাক। এই ধরনের স্বগতোক্তি করে' শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল চুনীলাল।

ঘরের ভিতর গহনচাঁদ তাঁর সাকরেদদের দিকে ফিরে বললেন, “রমজান, সীতারাম, শুনছ ? মাইনে, ছি ছি ছি !”

রমজান 'তোবা, তোবা' করে' উঠল।

সীতারাম ঘাড় নেড়ে' বলল, “বিচিত্র।”

দিবস একটু হেসে বললে, “না, না, এটা আপনারা সে-ভাবে নেবেন না, সামান্য প্রণামী—”

“না না, আগে থাকতে প্রণামীই বা নেব কেন আমি ? তোমাকে যদি উপযুক্ত পাত্র বলে' মনে করি তাহ'লেই আমি প্রসন্নমনে শেখাবো তোমাকে যতটুকু জানি, টাকার বদলে নয়। এর মধ্যে টাকাকড়ি প্রণামী দক্ষিণা এসবের কোন কথাই আসতে পারে না। তোমার প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেব আমার প্রদীপের শিখা থেকে। প্রদীপটাই দরকার, টাকাকড়ি নিয়ে কি হ'বে ? এইতেই তো গেছি আমরা !”

রমজান আনন্দে গর্বে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিল। সে ধীরে ধীরে গা দুলিয়ে দুলিয়ে মুগ্ধ গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল, “ওয়া ওয়া ওয়া।”

সীতারাম শুধু বিস্ফারিত নয়নে চেয়েছিল। চোখ দুটো জ্বলছিল

তার। যে ছাত্র-ছাত্রীগুলি বসেছিল তাদের সঙ্গে চুনীলালের একটা প্রাথমিক আলাপ হ'য়ে গিয়েছিল, সুতরাং তারা কেউ বিস্ময় প্রকাশ করছিল না। তাদের মধ্যে দু'একজন ঘাড় হেঁট করে' বা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল বরং। ঊর্মিও কিরণকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এই জন্যেই। বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে ঊর্মি কিরণকে বলছিল—"মাইনের কথা গহনচাঁদবাবুর কাছে পাড়বেন না যেন, চুনীলালবাবু মানা করে' দিয়েছেন। উনি সেকেলে ধরনের লোক, বিদ্যা বিক্রয় করতে চান না।"

ঘরের ভিতর থেকে গহনচাঁদের উচ্চ কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল —"না না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না, একটি কপর্দকও চাই না আমি। রঙ্গনার কাছে তোমার যে পরিচয় পেলাম কাল তাতে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। এই তো চাই—বাঃ!"—তারপর আরও উত্তেজিত কণ্ঠে—"তাছাড়া, ভদ্রলোক হবার অধিকার তোমারই একচেটে থাকবে, এই বা কেমন কথা—বাঃ!"

ঊর্মির চোখের হাসি চিকমিক করে' উঠল।

"শুনছেন? চমৎকার লোক সত্যি! এরকম লোক যে এযুগে থাকতে পারে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। হ্যাঁ, আর একটা কথা, রঙ্গনাদি আপনার গানে চমৎকার সুর দিয়েছেন। ওঁকে দিয়েই যদি রেকর্ড করানো হয় খুব ভাল হ'বে। তাই বলি, কি বলেন? আপনার বন্ধু দিবসবাবুর সঙ্গে রঙ্গনাদির আলাপ আছে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ আমারও তো মনে হচ্ছে। দিবস আমাকে কিন্তু বলে' নি কিছু।"

ঊর্মির চোখে আবার একটা হাসি চিকমিক করে' উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিবস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

"না, ভদ্রলোক কিছুতেই নেবেন না টাকা। চল যাওয়া যাক।" রঙ্গনাও বেরিয়ে এল।

"বাবা বলেছেন কাল থেকে আপনারা আসবেন নিশ্চয়।"

"আচ্ছা",—দিবস হাসিমুখে বললে—"আসতেই হ'বে, উপায় কি? আমরা এখন চলি তাহ'লে, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

ঊর্মি এগিয়ে এসে বললে, "রঙ্গনাদি এখনি আপনি যে গানটা গাইলেন সেটা এঁরই রচনা।"

কিরণের দিকে সগর্বে চেয়ে রইল সে হাসিমুখে। কিরণ যেন তারই কীর্তি। রঙ্গনা নমস্কার করল। কিরণও প্রতিনমস্কার করলে নীরবে। কিরণের দিকে চেয়ে আর এক ঝলক হেসে ফেললে ঊর্মি (তার এই হাসির টুকরাগুলিও যে রূপান্তরিত কান্না তা সে নিজেও বুঝতে পারছিল না)। তারপর রঙ্গনাকে বললে, "লোকটি ভারি লাজুক। ওঁর হ'য়ে কথাটা আমিই বলি তাহ'লে। ওঁর গানটা যদি আপনি রেকর্ডে দেন কেমন হয়? শুনেছি গ্রামোফোন কোম্পানিরা আপনার বাবাকে খুব খাতির করেন।"

"জানি না তো!"

"আচ্ছা, আমিই জিগ্যেস করছি ওঁকে।"

তারপর কিরণের দিকে ফিরে বললে, "আপনারা যান, আমি একটু পরে আসছি।"

পুনরায় আর একদফা নমস্কার বিনিময় করে' দিবস ও কিরণ রাস্তায় নেবে পড়ল। নেবেই দেখা হ'য়ে গেল চুনীলালের সঙ্গে। এদেরই অপেক্ষায় চুনীলাল দাঁড়িয়েছিল।

"নমস্কার। একটুর জন্যে আজ 'মিস্' করেছি আপনাদের। আমার নাম চুনীলাল। গহনচাঁদবাবু আমার ভগ্নিপতি। ওঁর লেকচারটা শুনলেন তো? এইবার আমার কথাটা শুনুন। উনি যা বলেন তা সত্যযুগের কথা, কিন্তু সত্যযুগ তো এখন নেই, তাই আমার কলিযুগের কথাটাও শুনতে হ'বে আপনাদের। আমার জামাইবাবুটি মস্তবড় গুণী একজন, কিন্তু একদম আত্মভোলা লোক।

সংসার করতে গেলে যে টাকার দরকার এবং সে টাকাটা যে রোজ-গার না করলে পাওয়া যাবে না, এই কথাগুলো রাগ-রাগিনী নয় বলেই বোধ হয় উনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। দিদি মারা যাওয়ার পর থেকে মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে' কাশীবাস করছিলেন এতদিন। সেখানে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ পেয়ে, সাকরেদদের কাছ থেকে কলাটা মূলোটা নিয়ে চলে' যাচ্ছিল ওঁর। কিন্তু মেয়েটি যে ক্রমশ বিয়ের যুগ্যি হ'য়ে উঠেছে সেদিকে ওঁর খেয়ালই নেই। মেয়ের বিয়ে দিতে হ'লেই টাকা চাই। সেইজন্যে ওঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এনে এই সঙ্গীত-ভবনটি খুলেছি মশাই", আসল উদ্দেশ্য কিছু টাকা রোজগার করা। সেইজন্যে ওঁকে গোঁপন করে' মাইনের টাকাটা আমিই নিচ্ছি। উনি জানতে পারলে খুনোখুনি করবেন, সেইজন্যে যাতে না জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বুঝতে পারছেন কথাটা?"

দিবস বললে, "তার মানে টাকাটা আপনাকেই দিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ এবং কথাটা ওঁর কাছে গোপন রাখবেন।"

"বেশ! তাই হ'বে। টাকাটা কি এখনই নেবেন?"

"না। আমার বাড়ির বাইরের দিকে যে ঘরটা আছে সেখানে সকালে রোজ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করি আমি। সেইখানেই আসবেন। টাকা নিয়ে রসিদ দিয়ে দেব। আমাকে চেনেন না শোনেন না, রাস্তায় আমার হাতে টাকা দেবেন কি! আমি জোচ্চরও তো হ'তে পারি?"

দন্ত বিকশিত করে' দু'জনের মুখের দিকে চাইলে চুনীলাল।

"আচ্ছা, তাই হ'বে তাহ'লে, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

নীরবে অগ্রসর হ'ল তারা কিছুদূর।

কিরণ সহসা বললে, গহনচাঁদবাবু যদি সোজাসুজি মাইনে না নেন তাহ'লে ওখানে ভর্তি হ'ব না আমি।"

"কেন ?"

"চুনীলালবাবু যা বললেন তা সত্যি কি মিথ্যে কি করে' জানব বল ? এ-ও হ'তে পারে চুনীলালবাবু নিজেই টাকাটা গাপ করছেন।"

"তাতো একটু খোঁজ করলেই বোঝা যাবে।"

"তা বোঝা গেলেও আমি স্বস্তি পাব না। গহনচাঁদবাবু জানতে পারছেন না, অথচ তাঁর মতের বিরুদ্ধে তাঁকে লুকিয়ে মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাচ্ছি, এরকম গোঁজামিলের মধ্যে আমি নেই। গুরু বলে' যাঁকে শ্রদ্ধা করব তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি চলে না।"

"বেশ তো, তুমি ইচ্ছে করলে তাঁকে মাইনে না দিতে পার। তিনি তো আসতেই বলেছেন আমাদের।"

"না, তাতেও আমার আত্মসম্মানে বাধবে। আমি বিনা বেতনে কাউকে খাটিয়ে নিতে চাই না।"

"ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে বিশ্বাস নেই তাহ'লে তোর বল ?"

"যে বর্ণাশ্রমধর্মের পটভূমিকায় ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল সেই বর্ণাশ্রমধর্মের যখন লোপ পেয়েছে, তখন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণত্বের আদর্শটাকে আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। আজ হঠাৎ যদি কেউ রোমান টোগা পরে' রাস্তায় বেরোয় তাহ'লে তা যেমন হাস্যকর এও তেমনি হাস্যকর।"

"যদিও তুই কবি তবু আমার মনে হয় রোমান টোগার সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের উপমাটা খুব লাগসই হ'ল না। রোমান টোগা একটা সাময়িক ব্যাপার। ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ কিন্তু সভ্য সমাজের চিরন্তন আদর্শ। যে দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম নেই সে দেশেও ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ আছে—"

হঠাৎ সাহেব প্রফেসারটির মুখ তার মনে পড়ে' গেল।

"ওদেশের যাঁরা বড় বড় অধ্যাপক তাঁরা সত্যিই ব্রাহ্মণ। এদেশেও ব্রাহ্মণ ছিল এবং আবার হ'বে। না হ'লে আমাদের মুক্তি নেই।"

"যখন হ'বে তখন ব্রাহ্মণত্বের আদর্শকে মানব। আজ আমি ব্রাহ্মণ ট্রাম-ড্রাইভারি করছি আর তুমি ব্রাহ্মণ একটা মেসে চাকর হ'য়ে আছ। আমাদের কোনও অধিকার নেই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের ছুতোয় কাউকে বিনা পয়সায় খাটিয়ে নেবার।"

"বেশ বেশ, নিও না। সব বিষয়ে তর্ক করা তোর কেমন একটা স্বভাব হ'য়ে গেছে দেখছি!"

আবার নীরবে পথ চলতে লাগল ছ'জনে। কিরণের কেমন যেন লজ্জা করছিল। তার যে আত্মসম্মান বোধটা নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতো তার ছুর্বলতার টুঁটি টিপে আছে সর্বদা অথচ যার স্বপক্ষে সে যুক্তিও আহরণ করে' চলেছে অহরহ সেটাকে এমনভাবে আস্ফালন করে নি সে কোনদিন। হঠাৎ উর্মিকে দেখেই বোধ হয় মানসিক সমতাটা নষ্ট হ'য়ে গেল। উর্মির সান্নিধ্যে এলেই তার আত্মসম্মান বোধটা কেমন যেন উগ্র হ'য়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ সে জিগ্যেস করলে, "গহনচাঁদবাবুর মেয়ে রঙ্গনার সঙ্গে তোর আলাপ আছে নাকি?"

"আজই হয়েছে। আমি যে দোকান থেকে সরোদ কিনছিলাম, উনিও সেখানে সেতার কিনছিলেন। ওঁর কয়েকটা টাকা কম পড়ে' গিয়েছিল, আমি সেটা দিয়ে দিলাম।"

দিবস হাসিমুখে চাইলে কিরণের দিকে। কিরণেরও মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বললে, "এবং, বলে' যা, থামলি কেন?"

"এবং-এর পর ড্যাশ, আধুনিক রীতিতে ফুটকি ফুটকিও বলতে পার।"

আবার সেকেণ্ড কয়েক নীরবে চলবার পর দিবস হঠাৎ বললে, "দেখ, গহনচাঁদবাবুর ওখানে তুই যদি যাস তাহ'লে আমার আসল পরিচয়টা যেন ফাঁস করে' দিস না ওদের কাছে। আমি ওদের কাছে নিজেকে মেসের চাকর বলেই পরিচয় দেব যদি দরকার হয়।"

"কেন ?"

"পরে বলব।"

কিরণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চাইলে দিবসের দিকে। দিবসের মুখে ফুটে উঠল মুচকি হাসি।

খানিকক্ষণ ঢুলে ঢুলে সৌদামিনী শেষে দিবসের ঘরের মেঝেতেই আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল। দিবসের ঘরের চাবি তার কাছেই আছে, ঘরটা খোলা রেখে' নিজের ঘরে যেতে পারে নি সে তাই।

দিবস এবং কিরণ যখন এল তখন দশটা বেজে গেছে। মোহন ঠাকুরের হোটেল থেকে খেয়ে এসেছিল সে। দিবসের সাড়া পেয়ে সৌদামিনী উঠে বসল।

"এত রাত অবধি ছিলে কোথায় ? সেই থেকে বসে' বসে' শেষে এইখানেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। ছিলে কোথা এতক্ষণ ? বাড়ি গিয়েছিলে নাকি ?"

"না।"

"তাহ'লে ?"

"এমনি একটু দরকার ছিল।"

"খাওয়া হয়েছে ?"

"হয়েছে।"

"কোথা খেলে ?"

"মোহন ঠাকুরের হোটেলে।"

কমানো লণ্ঠনটা উস্কে টেবিলের উপর রাখতেই রঞ্জনার চিঠিটা চোখে পড়ল সৌদামিনীর।

"সন্ধ্যেবেলা একটি মেয়ে :এসেছিল, এই চিঠি লিখে রেখে' গেছে। টাকা না কি দিতে এসেছিল বললে।"

চিঠিটা পড়তে পড়তে দিবস বললে, "দেখা হয়েছে এর সঙ্গে। এদের বাড়িতেই দেরি হ'য়ে গেল।"

"তোমার কেউ হয় নাকি ?"

"না।"

এইবার আসল কথাটা মনে পড়ল সৌদামিনীর।

"মশারি এনেছ ?"

"ওই যাঃ, আজও ভুলে গেছি।"

"রোজ রোজ মশার কামড়ে শুলে অসুক করবে যে !"

"কিছু হ'বে না।"

দিবস নিজের মোমবাতিটা জ্বেলে ফেললে। তারপর কিরণের দিকে চেয়ে বললে, "রম্যাঁ রলাঁর 'I will not rest' বইটা কিনেছি। এই দেখ—।"

সৌদামিনী কিরণের দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেল। কিরণ বইটার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করে' ঘরের চারদিকটা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"তুই কি এ ঘরে থাকতে পারবি ?"

"কেন পারব না ?"

"তার চেয়ে আমার বাসায় চল না !"

"আপত্তি ছিল না, কিন্তু তোর বাসায় থাকবার মতো অবস্থা নয় এখন আমার। তোর বাসায় থাকতে গেলে তোর বাসার অর্ধেক ভাড়া আমার দেওয়া উচিত, কিন্তু অত টাকা পাব কোথা, তাছাড়া এই বাসার তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে দিয়েছি।"

কিরণ চুপ করে' রইল। আত্মসম্মান বিষয়ে একটু আগেই বক্তৃতা দিয়েছে সে। সৌদামিনী এসে ঢুকল আবার। তার হাতে একটা মশারি।

"আমার একটা ছেঁড়া-খোঁড়া ছিল, এইটে টাঙিয়েই শোও আজ। সর, টাঙিয়ে দিই।"

কিরণ উঠে পড়ল।

"আমি এখন উঠি ভাই। কাল ভোরেই আমার আবার ডিউটি। যেতেও হ'বে অনেকটা দূর।"

"চল তোকে একটু এগিয়ে দি তাহ'লে।"

দিবসও উঠে দাঁড়াল।

সৌদামিনী দিবসকে বললে, "গল্প করতে করতে আবার বেশী দূরে চলে' যেও না যেন। তোমারও কাল সকালে ডিউটি।"

"আমি এখনই আসছি।"

দু'জনে বেরিয়ে গেল।

মশারি টাঙাতে গিয়ে সৌদামিনী দেখলে যে শুধু মশারি হ'লেই হ'বে না, পেরেক চাই, দড়ি চাই। অর্থাৎ গিরির সাহায্য নিতে হ'বে।

সৌদামিনীর কথা শুনে' রাস্তায় যেতে যেতে কিরণ বলছিল—"একে বেশ পেয়েছিস তো!"

"চমৎকার!" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দিবস উত্তর দিলে এবং কাল থেকে যে কথাটা তার মনে হচ্ছিল সেটা বলে' ফেললে, "যাদের আমরা ছোটলোক বলে' ঘৃণা করে' এসেছি এতকাল, এখন দেখছি তারা মোটেই ছোট নয়, তাদের মধ্যেই সনাতন ভারতবর্ষ বেঁচে আছে এখনও।"

গিরি এবং সৌদামিনী দু'জনে মিলেই টাঙাচ্ছিল মশারিটা। দিবস আবার বেরিয়ে যাওয়াতে বিরক্ত হয়েছিল সৌদামিনী।

"অত্যন্ত বারফটকা স্বভাব দেখছি। আবার বেরিয়ে গেল।"

"পটলির কথাটা বলেছিলি?"

"সময় পেলাম কই? সঙ্গে কে একজন ছিল, যার-তার সামনে কি ওকথা পাড়া যায়? বলব এখন সময় মতো।"

দিবস এসে ঢুকল এবং শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়ে গেল।

"কি বলবে? বাঃ, মশারি তো চমৎকার হয়েছে। আরে, গিরিবালাও যে, তুমিও ঘুমোও নি এখনও?"

"এইবার যাই।"

মাথায় আধঘোমটা টেনে' বেরিয়ে গেল গিরিবালা। সৌদামিনীর একবার ইচ্ছে হ'ল পটলির কথাটা এখনই বলে কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল—না আজ রাত হ'য়ে গেছে, কাল সকালে বললেই হ'বে।

"এইবার আলোটি নিবিয়ে তুমিও ঘুমোও।"

"শুচ্ছি, কিন্তু এখন ঘুম আসবে না। পড়ব।"

"কতক্ষণ পড়বে ?"

"যতক্ষণ না ঘুম আসে।"

"কি কাণ্ড!"

আবার ঘাড়টি কাৎ করে' গালে হাত দিলে সৌদামিনী। তারপর বেরিয়ে গেল।

টেবিলে মোমবাতিটা ঠিক করে' রাখতে গিয়ে রঙ্গনার চিঠিটা আবার চোখে পড়ল দিবসের। ভ্রূকুঞ্চিত করে' আবার পড়লে চিঠিটা। তারপর মুচকি হাসি ফুটে উঠল মুখে। আবার ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল।

কিরণ বাসায় ফিরে দেখল ঊর্মি একটা চিঠি নিয়ে বসে' আছে তার আশায়।

"গহনচাঁদবাবু বললেন গ্রামোফোন কোম্পানিদের কারও সঙ্গে তাঁর নিজের কোনও আলাপ নেই। মলঙ্গা লেনে এক ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর নাকি হাত আছে। গহনচাঁদবাবু চেনেন তাঁকে। তাঁর নামে একটা চিঠিও দিয়েছেন। আপনি এই চিঠিটা নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে কিরণ বললে, "না।"

"কেন, গেলে ক্ষতি কি ?"

"তা তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমি যাব না।"

"বেশ, আমিই যাব তাহ'লে।"

চিঠিখানা নিয়ে ঊর্মি চলে' গেল

"সময় মতো আমি নিজেই এসে দেখা করে' যাব" দিবসের এই আশ্বাসটুকুর উপর নির্ভর করে' সূর্য চৌধুরী দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল দিবস ঠিক আসবে, এবং সব ঠিকও হ'য়ে যাবে। তবু অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল একটা, বিশেষতঃ ব্রজর একটা তীক্ষ্ণ কথা মাঝে মাঝে আকুল করে' তুলছিল তাঁকে। কিন্তু এ ছাড়া আর একটা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি এবং এই দ্বন্দ্বটা তাঁর উকিল-মনকে এত ব্যাপৃত করে' রেখেছিল যে দিবসের চলে' যাওয়ার দুঃখটাও তত তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন না তিনি। দ্বৈরথটা চলছিল প্রিয়বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের সঙ্গে। সাণ্ডেল নানারকম উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অতি পাজি, অতি বখা, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দিবসের এই চলে' যাওয়াটাকেই একটা উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করছেন তিনি। সূর্য চৌধুরী—উকিল সূর্য চৌধুরী—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দাঁড়িয়েছেন আজকালকার ছেলেমেয়েদেরই পক্ষে এবং বদ্ধপরিকর হয়েছেন যে মামলাটা তিনি জিতবেন। মনে মনে তিনি আশা করে' আছেন দিবসের আচরণই তাঁকে জিতিয়ে দেবে। প্রমাণের জন্য উন্মুখ হ'য়ে আছেন তিনি।

মক্কেলদের কাজ শেষ করে' আহারান্তে তিনি ছাতে বসেছিলেন এবং কোনদিন যা করেন না আজ তাই করছিলেন। আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। কয়েকটা তারার আকম্পিত আলোর দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। ব্রজ আসতে মর্ত্যে নেবে এলেন আবার। ব্রজ গড়গড়াটা নাবিয়ে তার মাথায় কলকেটা বসিয়ে দিয়ে বললে, "কই দিবু আজও তো এল না।"

"আসবে, ব্যস্ত কি।"

"উঃ, বাপ যে এমন পাষাণ হ'তে পারে তা আমার ধারণা ছিল

না। আজ ওর মা থাকলে কি এমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারতে তুমি, না সে নিশ্চিন্ত থাকতে দিত তোমাকে।"

সূর্যকান্ত কোন জবাব দিলেন না। ব্রজ দাঁড়াল না। তাঁর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে নিচে নেবে গেল। সূর্যকান্ত পা দোলাতে দোলাতে গড়গড়ায় টান দিতে লাগলেন।

"সূর্যকান্ত, ঘুমিয়েছ নাকি হে?"

সাণ্ডেলের গলা। সূর্যকান্ত উঠে আলসে থেকে ঝুঁকে বললেন —"না। উপরে এস।"

"ও বাবা, ছাতে চড়ে' বসে' আছ!"

একটু পরে সাণ্ডেল এসে হাজির হলেন এবং চেয়ারে বসেই প্রশ্ন করলেন, "বাবাজীর কোনও খবর পেলে?"

"না, আর তো কিছুই পাই নি।"

"গতিক ভাল নয়। উঠে পড়ে' লেগে' খুঁজে বার কর।"

"ব্যস্ত হবার দরকার কি? শিক্ষিত ছেলে, নিতান্ত ছেলেমানুষও নয়, তাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ দেখি না।"

"তুমি দেখ না তার কারণ তুমি অন্ধ, স্নেহান্ধ।

গোঁফের ফাঁকে একটু মৃদু হেসে সূর্যকান্ত বললেন, "যদি বলি আমি আধুনিক—"

"দেখ, শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশা যায় না। ওই একঝুড়ি কাঁচা-পাকা গোঁফ নিয়ে আধুনিক হ'তে পারবে না, সে চেষ্টা করো না। ছেলেটিকে খুঁজে বের করে' গলায় গামছা দিয়ে হিড়হিড় করে' টেনে' নিয়ে এস, নিয়ে এসে অবিলম্বে একটি বিয়ে দিয়ে দাও। আমাদের যোগীনের ছেলেটাও গা-ঢাকা দিয়েছিল। কি করেছে জান সে?"

"কি?"

"এঁটো আঁটি চুষতে চুষতে বাড়ি ফিরেছে।"

"তার মানে!"

"গুণ্ডা-বিদ্ধস্ত এক মেয়েকে বিয়ে করে' এনেছে! কালে কালে কতই যে দেখব!"

"এতে অন্যায়টা হয়েছে কি? দুঃশাসন-বিদ্ধস্ত দ্রৌপদীকে পাণ্ডবরা যখন ত্যাগ করে নি তখন—"

সূর্য চৌধুরীকে কথা শেষ করতে দিলেন না সাণ্ডেলমশাই।

"নাঃ, তোমার মতিভ্রম হয়েছে দেখছি। দুঃশাসন-দ্রৌপদী করছ কর, কিন্তু এই বলে' দিলুম, গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগবে।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল উঠে দাঁড়ালেন।

"এর মধ্যেই উঠছ যে?"

"আজ আর বসব না। সমস্ত দিন একাদশীর উপোস গেছে, ঘুম পাচ্ছে। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দিবুর খবরটা একবার নিয়ে যাই। আধুনিকতার বারফট্টাই করতে চাও কর, কিন্তু ছেলেটিকে খুঁজে-পেতে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এস, তা না হ'লে পস্তাতে হ'বে এই বলে' দিলুম।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল চলে' গেলেন। সূর্য চৌধুরী পা দোলাতে দোলাতে তামাক খেতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়লেন। নিচে নেবে গিয়ে দেরাজটা খুলে' শালটা বার করলেন। দিবস যে শালটা পাঠিয়েছিল সেই শালটা। অনেকবার দেখেছেন তবু আর একবার দেখতে লাগলেন। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে' দেখতে লাগলেন। দেখে' রেখে' দিলেন সেটা। তারপর আর একটা টেবিলে গিয়ে কাগজপত্তর হাঁটকে কার্ডটা বার করলেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিট্যুট থেকে তাঁকেও নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়েছিল। কার্ডটার দিকে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে।

রঞ্জনা নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। চুনীলালের সঙ্গে তার কথা হয়েছে গোপনে। তার বাবার অন্তঃসারহীন মহত্ত্বের

পরিণাম যে কি তা চুনীলাল বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে। চুনীলালের কথার প্রতিবাদ করতে পারে নি সে। কিন্তু অন্তরের ভিতরটা হায় হায় করছে। কেবলই তার মনে হচ্ছে মামা কেন দিবসবাবুকে এসব কথা বলতে গেলেন! না হয় দু'একজন মাইনে না-ই দিত। বাইরের লোকের সামনে বাবাকে—তার অমন সরল বাবাকে—খেলো না করলেই কি চলছিল না?

সাত

দিবস হরিদাসবাবুর জুতো বুরুষ করছিল এবং দ্বন্দ্ব করছিল নিজের সঙ্গে। সে যে পেরেছে এই আনন্দে মনটা ভরপুর হ'য়ে উঠেছিল তার। জুতো বুরুষ শেষ করে' একটু পরেই সে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে গিয়ে বক্তৃতা দেবে। এই দুই আপাত-বিরোধী ব্যাপারের সে যে সমন্বয় করতে পেরেছে এরই আনন্দটা যাতে তার চোখে-মুখে উপছে পড়ে' আত্মশ্লাঘার ছোঁয়াচ লেগে' কুৎসিত বাহাদুরিতে পরিণত না হয় সেই দ্বন্দ্বই করছিল সে মনে মনে। সে যে খুব একটা বাহাদুরি করেছে এটা সে মনে মনে মানতে চাইছিল না। ভাবছিল মনে মনে মানলেই তার অজ্ঞাতসারে চোখে-মুখেও ফুটে উঠবে সেটা। ঘরের কোণে ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বালা থাকলেও তার অস্তিত্ব যেমন বন্ধদ্বারের সূক্ষ্ম ফাটল দিয়েও বোঝা যায় তেমনি বোঝা যাবে। না, ও প্রদীপ সে জ্বালবেই না। কিছুতেই না। এতে বাহাদুরি কি আছে? এই-ই তো করা উচিত। আদর্শকে অনুসরণ করার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই। কিন্তু তার মনের বালক-প্রকৃতি মাঝে মাঝে প্রদীপটা জ্বেলেও ফেলছিল দু'একবার। তখনই আবার নিবিয়ে দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি। সেদিন সৌদামিনীর মুখে গিরিবালার

আত্মীয়া পটলির কথা শুনে' সে যখন নিজের রিস্ট-ওয়াচটা বিক্রি করে' পঁচাত্তরটা টাকা এনে দিয়েছিল তখনও তার মনে এই ধরনের বাহাদুরির ভাব জেগেছিল একটা। সৌদামিনীকে যদিও সে জানায় নি যে রিস্ট-ওয়াচ বিক্রি করে' সে টাকা এনে দিয়েছে, (বলবার লোভ হচ্ছিল যদিও প্রচুর, সিনেমার নায়কের মতো সে যে তার শেষ সম্বলটুকুর বিনিময়ে জনৈকা বস্তিবাসিনী যুবতীকে পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পেরেছে, এর নাটকটা আস্ফালন করতে খুবই প্রলুব্ধ হয়েছিল সে) কিন্তু মনে মনে আত্মগৌরবের অহংকৃত মদিরাটা সে পান করেছিল বইকি। অন্যায় জেনেও পান করেছিল। ছেলেবেলায় ব্রজকে লুকিয়ে দুপুরবেলা আচার চুরি করে' খেত যেভাবে সেইভাবে সে এই আত্মশ্লাঘাটাকে উপভোগ করেছিল। হঠাৎ পটলির যৌবন-লিপ্সু ঝাঁকড়া-চুল-ওলা আরক্তচক্ষু লোকটার মুখচ্ছবি এবং কাহিনী তার মনে জেগে উঠল। পটলির স্বামী কাজ করত লোকটার বাড়িতে। তারপর পটলির স্বামী অসুখে পড়ে। সে অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখনও ভুগছে। অসুখের জন্য পটলি লোকটার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করে' এনেছিল। সেই ধার সুদে-আসলে এখন পঁচাত্তর টাকায় দাঁড়িয়েছে। ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটা বলছে নগদ টাকা সে চায় না, পটলি গতর খাটিয়ে সে টাকা শোধ করে' দিক। পটলিকে গতর খাটাতে হ'বে অবশ্য তার বাড়িতে গিয়েই। পটলির পরিবর্তে সৌদামিনী গিয়ে গতর খাটাতে সম্মত হয়েছিল কিন্তু ঝাঁকড়া-চুল-ওলা তাতে রাজি নয়। সে পটলিকেই চায়। অর্থ সুস্পষ্ট। গিরিবালা (পটলির দূর সম্পর্কের কাকী) সৌদামিনীর মারফত উকিল-পুত্র দিবসের উপদেশ প্রার্থনা করেছিল যে আইনতঃ এর কোন প্রতিকার হ'তে পারে কিনা। দিবস বলেছিল—"অত ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে টাকাটা দিয়ে লোকটাকে বিদেয় করে' দাও। তোমাদের যদি টাকা না থাকে আমি টাকা দিচ্ছি।" বাড়ি থেকে চলে' আসবার আগে সে তার

আড়াইশ' টাকা দামের রিস্ট-ওয়াচটা অয়েল করতে দিয়েছিল একটা দোকানে। সেই দোকানেই ঘড়িটা সে একশ' টাকায় বিক্রি করে' তার থেকে পঁচাত্তর টাকা সৌদামিনীকে দিয়েছে। একটা মস্ত সুবিধে হয়েছে কিরণ কিছুই জানতে পারে নি। জানতে পারলে ঠিক বাধা দিত। বলাবাহুল্য সেই ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে সুদসুদ্ধ টাকা নগদ পেয়ে মোটেই খুশী হয় নি, বরং অসংস্কৃত ভাষায় যা সব বলে' গেল তা একটুও শ্রুতিরোচক নয়। একটা জিনিস অবশ্য সংস্কৃত ছিল তার—দন্ত্য 'স'-এর উচ্চারণটা। এই চিন্তার সূত্র ধরেই রঙ্গনার কথাটাও মনে পড়ল তার। সূত্রটা অবশ্য ঈষৎ জটিল। সেই ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটা যা ইঙ্গিত করেছিল তার অর্থ—ও, টাকাটা দিয়ে পটলিকে তুমিই গ্রাস করতে চাও? বটে! তার এই ইঙ্গিতের উত্তরে মনে মনে হাসতে গিয়েই রঙ্গনার কথাটা মনে পড়ে' গেল তার। রঙ্গনাও কি আজকের সভায় যাবে? কে জানে!

জুতো বুরুষ করতে লাগল সে ত্বরিত-হস্তে। আর মিনিট দশেক পরেই বেরুতে হ'বে তাকে। হরিদাসবাবুও একটা কোন মিটিংয়ে যাবেন এখনই, জুতোটা তাঁর এখনই চাই। গোবর্ধনবাবুর 'টাইম-পীস'টার দিকে এক নজর চেয়ে তাড়াতাড়ি জুতো বুরুষ শেষ করে' সে নেমে গেল নিচে। মনিবদের কাছে সে আগেই ছুটি চেয়ে নিয়েছিল।

অসময়ে বৃষ্টি হ'য়ে গেল এক পশলা। চেৎলা অঞ্চলের একটা সরু গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে (এবং কিঞ্চিৎ ছুটে') আপাদমস্তক ভিজে গেলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। একটা গাড়িবারান্দার নিচে আশ্রয় পাবার পর প্রথমেই তিনি জুতো জোড়াটার দিকে তাকালেন। কাদায়-জলে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে। মাত্র দিন দুই আগে কিনেছেন। মর্মান্তিক রাগ হ'ল বস্তিনাথ মৈত্রর উপর। সাধে

লোকে বলে সতেরোটা গাধা মরে' একটা মাস্টার হয়। তুই যখন ঠিক জানিস না তখন একটা উড়ো খবর দিতে গেলি কোন্ আক্কেলে! একবারে ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে বলে' দিলি যে দিবু বলে' এক ছোকরা পান-বিড়ির দোকান খুলে' বসেছে! সাণ্ডেলমশাই গিয়ে দেখেন দিবু বলে' এক ছোকরা পান-বিড়ির দোকান খুলেছে বটে কিন্তু এ দিবু দিবস নয়, দিব্যেন্দু। দিবাকর হ'তেও বাধা ছিল না। সাণ্ডেল-মশাই এটা যে ভাবেন নি তা নয়। বিষ্টিনাথকে জেরাও তিনি করেছিলেন, কিন্তু সে ওই কালো শুঁটকো ছোকরার এমন বর্ণনা দিলে যে মনে হ'ল দিবসই হ'বে বোধ হয়। ওই রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ? না, ওই চেহারাকে দোহারা বলা চলে? এর পর আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'লেন সাণ্ডেলমশাই। তিনিই বা মরতে এলেন কেন এতদূর, কি দরকার ছিল তাঁর! উত্তরটাও তখনই মনে এল—না এসে উপায় কি! বন্ধুর দুর্দশাটা চোখের ওপর দেখা যায় কি? তিনি তো একেলে 'ফ্রেণ্ড' নন্ যে মৌখিক সহানুভূতির ফুলঝুরি কেটে' কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা হ'য়ে যাবেন। সামর্থ্যে যতটা কুলোয় ততটা তাঁকে করতে হ'বে। ছেলেকে ফিরে না পেলে ওর মুখের হাসি যে ফিরবে না তা তাঁর চেয়ে বেশী আর কে জানে! তাঁকেই চেষ্টা-চরিত্র করে' ফিরিয়ে আনতে হ'বে ছেলেটাকে। সূয্যি নিজে আর খুঁজবে না। ভাঙবে তবু মচকাবে না—চেনেন তো! ছেলের উপর অগাধ বিশ্বাস করে' আধুনিক সেজে বসে' আছে। এদিকে মনে মনে সে গুমরে মরছে তা আর কেউ না বুঝতে পারুক তিনি বোঝেন।—হঠাৎ আবিষ্কার করলেন মনি-ব্যাগটা পকেটে নেই। পকেট থেকে তুলে' নিলে নাকি কেউ? না, ছুটতে গিয়ে পড়ে' গেল? বৃষ্টি থেকে মাথাটা বাঁচাবার জন্যে রুমালখানা বার করেছিলেন একবার। সেই সময়ে পড়ে' গেল নাকি! মহা মুশকিল হ'ল তো। ট্রাম-বাসের পয়সা পর্যন্ত নেই যে! শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া তো অসম্ভব। ট্যাক্সি করতে হ'বে নাকি? পরিমিত পেন্সন থেকে অকারণে এত-

গুলো টাকা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু উপায়ই বা কি! ঘোড়ার গাড়িও কম নেবে না। কাছে-পিঠে ট্যাক্সিও তো দেখা যাচ্ছে না একটাও। কোঁচাটি বাঁ হাতে ধরে' আধুনিক ছেলেদের এবং মাস্টারদের মুণ্ডপাত করতে করতে মোড়ের দিকে অগ্রসর হ'লেন তিনি।

দিবস নিজেও ভাবে নি যে তার বক্তৃতাটা এমন জমে' উঠবে। শেষের দিকটা আরও বেশী জমে' উঠল যেন। বিস্মিত রঞ্জনা সামনেই বসেছিল। চিত্রার্পিতবৎ বসেছিল সে। মানে, তার দেহটাই বসেছিল। মনে মনে সে চলে' গিয়েছিল অনেক দূরে। দিবসের সব কথা সে শুনছিলও না। দু'একটা কথা মাঝে মাঝে যা কানে আসছিল তা না এলেও কিছু ক্ষতি হ'ত না। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যে আলোটা সে দেখতে পেয়েছিল সেই দিকেই চেয়েছিল সে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে।

আবেগভরে বলে' চলেছিল দিবস—"বন্ধুগণ, বাঙালীরা অলস, বাঙালীরা অপদার্থ, বাঙালীরা পরশ্রীকাতর, বাঙালীরা স্বপ্নবিলাসী বাবু, এ অপবাদ ঘোচাতে হ'বে আমাদের। সার্থক প্রতিবাদ করতে হ'বে এর। হাতে-কলমে প্রমাণ করে' দিতে হ'বে যে দরকার হ'লে আমরা সব করতে পারি, কোনও সৎকাজই ঘৃণ্য নয় আমাদের কাছে। কেবল গুটিকতক শৌখিন বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে আমরা অক্ষম, এ নিন্দা আমাদের যেন আর শুনতে না হয়। আমাদের মাথার উপর বজ্রগর্ভ কৃষ্ণমেঘ ঘনিয়ে এসেছে, বন্ধুগণ, আত্মরক্ষা করতে হ'বে আমাদের। ইমার্সনের সেই অমর বাণীকে সার্থক করতে হ'বে জীবনে—The best lightening rod for your protection is your own spine. একথা ভুললে চলবে না যে পৌরুষই মানুষের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র নির্ভর। কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ এই জাতকে কোমর সোজা করে' মাথা তুলে' দাঁড়াতে হ'বে আবার। বাঁচতে হ'বে, মানুষের মতো কাজ করতে হ'বে, আলস্য

পরিহার করে' যে-কোনও কাজ করবার সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করতে হ'বে, প্রমাণ করে' দিতে হ'বে যে, 'ডিগ্‌নিটি অব্‌ লেবার' কথাটা কেবলমাত্র আমাদের মুখের কথাই নয়। ছোট-বড় যাই হোক না কেন, সমাজ-হিতকর যে-কোনও কাজই যে সৎকাজ এই সত্যকে আঁকড়ে থাকবার মতো সাহস যেন আমরা সংগ্রহ করতে পারি, এই সত্যকে সার্থকভাবে ঘোষণা করবার যোগ্যতা যেন আমরা অর্জন করতে পারি। আলস্য নয়, লম্বা লম্বা বুলি নয়, কাজকেই করতে হ'বে আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। যে কুৎসিত মূঢ়তা, যে জঘন্য অহংকার শিক্ষিত সমাজকেও পঙ্গু, সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলছে দিন দিন, তার করাল কবর থেকে মুক্ত হ'তে হ'বে আমাদের। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, বন্ধুগণ, ভারতবর্ষের অমরগ্রন্থ গীতার কর্মযোগ স্বাধীন মন নিয়ে নূতন করে' পড়তে হ'বে আবার। উপলব্ধি করতে হ'বে শ্রীকৃষ্ণের এই পৌরুষপূর্ণ উক্তির মর্ম কি—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর
অসক্তোহ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

অনাসক্ত হ'য়ে কর্মের জন্যই কর্ম করতে হ'বে। অর্থলোভে নয়, বিলাস-লালসায় নয়, যশাকাঙ্ক্ষায় নয়, কর্তব্যের জন্য, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য, আনন্দের জন্য।

ভদ্রমহিলাগণ, আপনাদেরও প্রতি একটা বিশেষ অনুরোধ আছে আমার। আপনারাই আমাদের ঘরে ঘরে জননী, ভগ্নী ও বধূরূপে বিরাজ করছেন। আপনারা উদ্বুদ্ধ করুন এই হতভাগ্য জাতির পৌরুষকে। আপনারা শ্রদ্ধা করতে শিখুন ধনীকে নয় চরিত্রবানকে, ভীরুকে নয় বীরকে, অক্ষম পরগাছাকে নয় সক্ষম বৃক্ষকে, অলসকে নয় কর্মীকে, অভদ্রকে নয় ভদ্রকে। আপনারা জাগিয়ে তুলুন আমাদের মহত্ত্ব, বাঁচিয়ে তুলুন আমাদের মনুষ্যত্ব, উদ্বুদ্ধ করুন আমাদের আদর্শ। আপনাদের স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধাই তো আমাদের প্রেরণা।

আমাদের অতীতের দিকে চাইলে বুক ভরে' ওঠে, আমাদের ভবিষ্যৎও কি তেমনি মহিমোজ্জ্বল হ'বে না? নিশ্চয়ই হ'বে। আমার বিশ্বাস আছে নিশ্চয় হ'বে। জাগতেই হ'বে আমাদের, সাড়া দিতেই হ'বে আদর্শের আহ্বানে। মুমূর্ষু দেশ প্রতীক্ষা করে' আছে—

বাক্যেই নহে কার্যে প্রমাণ করিবে শক্তি তার
কই সে সতেজ সুস্থ সে যৌবন
মন্ত্র সাধনে সিদ্ধ হইবে যাহার পুরুষকার
তাহারই লাগিয়া করিবে জীবনপণ
বাধার পাহাড় যায় পদতলে গুঁড়াইয়া হ'বে ধূলি
আগাইয়া যাবে বজ্র-মুঠিতে বিজয়-পতাকা তুলি
স্কন্ধে বহিবে দায়িত্বভার—নহে ভিক্ষার ঝুলি
কই সে যুবক, কই সে জাতিস্মর
তারই আশাপথ চাহিয়া রয়েছি সকল দুঃখ ভুলি
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

যে দেশ কপিল, গোপাল, ধর্মপাল, চৈতন্য, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির মহিমায় সমুজ্জ্বল, আমার আশা আছে আবার সে দেশে দেখা দেবে নূতন যুগের নূতন কর্মবীর। নূতন সূর্যোদয় হ'বে আবার নব দিগন্তে।"

তুমুল করতালির মধ্যে দিবস অবতরণ করল মঞ্চ থেকে। দিবসের সহপাঠী এবং অনুরাগীবৃন্দ দিবসের বক্তৃতায় আনন্দিত হয়েছিল খুব কিন্তু বিস্মিত হয় নি। তারা এই রকমই প্রত্যাশা করেছিল কিছু একটা। বিস্মিত হয়েছিলেন সূর্যকান্ত। দিবস যে এমন বক্তৃতা করতে পারে তা তাঁর ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু যাঁর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে' গিয়েছিল, সত্যি-সত্যিই চমৎকৃত

হয়েছিলেন যিনি, তিনি হচ্ছেন হরিদাসবাবু, দিবসের মনিব। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এই মজলিসে। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে বরাবরই তিনি নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু চাকরির জন্য বাইরে থাকতে হয়েছে এতদিন, নবযুগের ছাত্র-ছাত্রীদের সভায় যোগদান করবার সুযোগ হয় নি। ঈষৎ অবজ্ঞা-মিশ্রিত কৌতূহল-ভরেই আজ এসেছিলেন তিনি এই সভায়। এই সভাতে আসবেন বলেই তিনি নব-নিযুক্ত চাকর দিবুকে জুতোটা পরিষ্কার করতে দিয়েছিলেন একটু আগে। সেই দিবুই দিবস চৌধুরী, আজকের সভার সভাপতি!—সত্যিই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। দিবুকে দেখে কেমন একটু সন্দেহ হয়েছিল তাঁর গোড়াতেই। সাধারণ লোক হ'লে তিনি হুড়মুড় করে' এগিয়ে গিয়ে দিবসকে আবেগভরে আলিঙ্গন করে' নাটকীয় কাণ্ড করে' বসতেন একটা। কিন্তু তিনি তা করলেন না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেবল। তাঁর মনে হ'ল তিনি যে দিবসের সত্য পরিচয়টা জানতে পেরেছেন এটা এখন সাড়ম্বরে ঘোষণা করা ঠিক হ'বে না। তার তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করা হ'বে তা করলে। ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দিবসও তার বর্তমান জীবনের কথা কাউকে বলল না। সে কেন কলেজে আসছে না দু'একজন বন্ধু এ প্রশ্ন তাকে যে না করেছিল তা নয়, (নিজেকে জাহির করবার যথেষ্ট সুযোগ সে পেয়েছিল) কিন্তু মুচকি হেসে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল সে। নবার্জিত কৃতিত্বের গৌরবটা মনে মনে যতই সে উপভোগ করছিল ততই তার ভয় হচ্ছিল খবরটা যেন তার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ না হ'য়ে পড়ে। নব-গর্ভিণী তার নবজাত ভ্রূণের বার্তাটা যে সঙ্কোচ সহকারে গোপন রাখতে চায়, সেই ধরনেরই একটা সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। তবু সে একবার উৎসুক-নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখলে চারদিকে রঞ্জনা কোথা গেল। ভিড়ের মধ্যে কোথায় আত্মগোপন করল সে সহসা? কেমন যেন

একটা সশঙ্ক প্রত্যাশা তার মনে জাগতে লাগল যে রঙ্গনা যদি এ নিয়ে আলোচনা করতে চায় তাহ'লে হয়তো সে আত্মসংবরণ করতে পারবে না, সব বলে' ফেলবে।

ফুটপাথে নেমে রঙ্গনার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল তার। রঙ্গনা কিন্তু কিছু বললে না। মুচকি হেসে আর একটি সঙ্গিনীর সঙ্গে গল্প করতে করতে চ'লে গেল।

তারপরই চোখে পড়ল মোটরটা, তাদের মোটরটা। ঘাড় ফিরিয়েই দেখতে পেল তার বাবা, সূর্য চৌধুরী, এগিয়ে আসছেন তার দিকে। সে-ও এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি এবং হেঁট হ'য়ে প্রণাম করল, যেন কিছুই হয় নি। সূর্য চৌধুরীও এমনভাবে চেয়ে রইলেন তার দিকে যেন কিছুই হয় নি। তারপরে মৃদু হেসে বললেন, "তোমার বক্তৃতাটা শুনলাম। বলেছ ভালই, তবে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলবার আছে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আলোচনা করতে পারি।"

শেষের কথাগুলো শুনে' দিবস চকিতে চাইল একবার তাঁর মুখের দিকে। তাঁর মুখের যেন 'কিছুই-হয়-নি' ভাবটা যে মেকি তা বুঝতে দেরি হ'ল না তার।

"না, আপত্তি কি?"—সংক্ষেপে উত্তর দিলে সে।

"তাহ'লে এস।"

মোটরে গিয়ে উঠলেন এবং একটু ইতস্তত করবার পর দিবসকেও গিয়ে উঠে বসতে হ'ল। মোটর ছেড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে।

সূর্য চৌধুরী বললেন, "তোমার বক্তৃতাটা শুনতে বেশ লাগল। কিন্তু তোমার বক্তৃতায় যুক্তির চেয়ে সেন্টিমেন্টই বেশী আছে।"

দিবস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিতার দিকে চাইল।

সূর্যকান্ত বললেন, "স্ট্রাগল্ ফর্ এগজিস্‌টেন্সে, আশা করি বিশ্বাস কর। বাঁচবার জন্যে প্রত্যেককে অহরহ যুদ্ধ করতে হচ্ছে আশা করি এ কথাটা মান তুমি?"

"হ্যাঁ, তা মানি বইকি !"

"তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে এটাও তোমাকে মানতে হ'বে যে, প্রত্যেক যোদ্ধার উচিত তার সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা, যে করে না সে বোকা।"

দিবস যদিও বুঝতে পারছিল যে তার বাবা কোন্ দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন, তবু তাকে বলতে হ'ল—"তা-ও মানি।"

"অপদার্থ বোকা লোকের পক্ষে পেশী সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র হ'তে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র পেশী নয়, বুদ্ধি। সুতরাং ওই বুদ্ধি চালনা করেই বাঁচবার চেষ্টা করা তার পক্ষে সঙ্গত হ'বে, পেশী চালনা করে' নয়। তুমি দু'একদিন শখ করে' রিক্শ টেনে' বা মোট বয়ে' দেখতে পার, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে ও-পথ তোমার নয়।"

এ যুক্তির সঙ্গে দিবসের বিরোধ থাকবার কথা নয়, বিরোধ ছিলও না। কিন্তু তর্কে পরাজিত হ'য়ে অপ্রতিভ হ'য়ে যাবার ছেলে সে নয়, তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"কিন্তু যুগ বদলেছে, একজন লোক বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে অসংখ্য লোককে এক্স্প্লয়েট্ করবে তা এযুগের নীতি নয়। সনাতন ভারতবর্ষের আদর্শও নয়।"

একটু হেসে সূর্য চৌধুরী বললেন, "দেখ, এক্স্প্লয়েট্ কথাটা তোমরা আজকাল এমনভাবে ব্যবহার করছ যেন ওটা একটা কোন লোক-বিশেষের বা শ্রেণী-বিশেষেরই একচেটে অস্ত্র। আসল কথা হচ্ছে প্রত্যেকেই এক্স্প্লয়টার, প্রত্যেকেই এক্স্প্লয়টেড। অপরকে শোষণ না করে' বাঁচা যায় না। কেউ বাঁচতে পারে না। বাঘ এক্স্প্লয়েট্ করে থাবার জোরে, মানুষ করে বুদ্ধির জোরে, আর ব্যাকটিরিয়ারা করে তাদের সূক্ষ্মতার জোরে, তাদের সংখ্যার জোরে। আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওই কুলিরা কি আমাদের এক্স্প্লয়েট করছে না? তাদের শক্তি পেশীতে। সেইটেরই পুরো সুযোগ নিচ্ছে তারা। সার্জনের ছুরি আর মজুরের কাটারি একই

জিনিসের দুই রূপ। কিন্তু প্রতিভাবান ডাক্তার কি কাটারি হাতে করে' কাঠ কেটে বেড়াবে, না, সেটা মানাবে তাকে? প্রতিভার কি কোনও কদরই থাকবে না এযুগে বলতে চাও?"

"নিশ্চয়ই থাকবে। সত্যিকার কদর তো প্রতিভারই থাকবে। কিন্তু এযুগের প্রতিভাবানেরা প্রতিভাকে বিক্রি করবে না সামান্য পণ্যের মতো। সমাজের হিতার্থে তা দান করবে এবং সেইজন্যে সত্যিকার মর্যাদা হ'বে তার।"

"কিন্তু সেই প্রতিভাবানটি বাঁচবেন কি করে'?"

"আর পাঁচজনের মতো সহজ সরল পরিশ্রম করে'। তাছাড়া সত্যিকার প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সমাজই উন্মুখ হ'য়ে থাকবে।"

"সে সমাজ আর নেই, অদূর ভবিষ্যতে গড়ে' উঠবার সম্ভাবনাও নেই। ওসব শুনতে বেশ ভাল কিন্তু কার্যকালে কাজে লাগে না। বহুযুগ আগে আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরাও আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেকে নি। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোও দেখেছিলেন অনেক স্বপ্ন, 'ইউটোপিয়া' পড়েছ আশা করি, কিন্তু ওসব স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। থেকে যাবেও চিরকাল।"

"হয়তো যাবে, কিন্তু চেষ্টা করতে হ'বে যাতে না যায়। স্বপ্নকে সফল করবার চেষ্টাই তো মনুষ্যত্ব। এযুগে আবার আমরা একস্‌পেরিমেণ্ট করে' দেখতে চাই যে স্বপ্নকে সফল করা যায় কি না। মানুষের অনেক স্বপ্ন সফল হয়েছে বইকি। মানুষ একদিন আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিল, আজ সে সত্যি সত্যি উড়ছে।"

মোটরটা যে বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে তা দিবসের খেয়াল ছিল না, বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে খেয়াল হ'ল। সূর্য চৌধুরী আর কোনও কথা না বলে' নেমে পড়লেন। বস্তুত কথা বলবার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। মোটরটা বাড়ির সামনে এসে থামতেই আশা-আশঙ্কার যে ধাক্কাটা যুগপৎ মনে

লাগল তার আভাস মুখভাবে যাতে প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন তিনি প্রাণপণে, দিবসের দিকে চাইতে সাহস হচ্ছিল না। মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

দিবসও গাড়ি থেকে নেমেছিল। সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল, "আমি এবার যাই তাহ'লে!"

নিদারুণ চেষ্টায় মুখে একটু হাসি টেনে' এনে সূর্যকান্ত বললেন, "তুমি ভেতরে আসবে না? তোমার একস্‌পেরিমেণ্ট তো এখানে থেকেও করতে পার?"

"না, তা করা যায় না। আমি যা করতে চাইছি তা প্রাসাদে বাস করে' করা সম্ভব নয়।"

দিবস চলে' গেল। তার প্রস্থান-পথের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন সূর্য চৌধুরী। তাঁর একবার মনে হ'ল ব্রজর কথাটা পাড়লে হ'ত, কিন্তু মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হ'ল তাঁর এবং ব্রজর কথা না-পাড়ার আপসোসটা আর রইল না। ব্রজর কথা শুনে' সে যদি আসত তাহ'লে অপমানিত বোধ করতেন তিনি। তাঁর চেয়ে ব্রজ দিবসের কাছে বড় হ'বে এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু হয়তো ব্রজই দিবসের কাছে বড়—কথাটা মনে হওয়া মাত্র ভ্রূকুঞ্চিত হ'য়ে গেল তাঁর। তিনি ফুটপাথ থেকে ঘুরে' কড়া নাড়তে গিয়ে দেখেন কপাট খোলাই রয়েছে। একটু বিস্মিত হ'য়ে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। ঢুকেই দেখা হ'য়ে গেল ব্রজর সঙ্গে।

"কপাটটা খুলে' রেখেছ যে? যা চুরি হচ্ছে—"

"তোমরা আসবে বলেই খুলেছি এক্ষুনি। চায়ের জলটা বসাতে গিয়েছিলুম। দিবু কই?"

কিছু না বলে' সূর্যকান্ত বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

"কলেজে ওদের সভায় যাও নি তুমি?"

"গিয়েছিলাম।"

"দিবু ছিল না?"

"ছিল। আমার সঙ্গে গাড়ি করে' এসেও ছিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে চাইল না, চলে' গেল।"

"আর তুমি অমনি যেতে দিলে! আমাকে ডাকলে না কেন?"

সূর্যকান্তের ভ্রূ আর একটু কুঞ্চিত হ'য়ে গেল। কিছু না বলে' উপরে উঠে গেলেন তিনি। দিবস বক্তৃতায় গীতার যে শ্লোকটা উদ্ধৃত করেছিল সেইটে মনে পড়ল একবার। ভাবলেন—নাঃ, আসক্তিটাই যত অনর্থের মূল। ওটা ত্যাগ করতে হ'বে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আরাম-কেদারায় যে-ভাবে তিনি শুয়ে পড়লেন তাতে মনে হ'ল না যে গীতার উক্ত শ্লোক থেকে তিনি শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছেন, বরং মনে হ'ল তাঁর মেরুদণ্ডটাই বুঝি ভেঙে গেছে এবং সেই যন্ত্রণাটা তিনি চাপতে চেষ্টা করছেন।

দিবসও আত্মবিশ্লেষণ করতে করতে পথ হাঁটছিল। আসক্তির কথা সে-ও ভাবছিল। বাবার ডাকে গেল না কেন সে? প্রাসাদে বাস করে' এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করা যাবে না এটা কি সত্য কথা? প্রাসাদটা তো বড় কথা নয়, প্রাসাদের আসক্তিটাই বড় কথা। গীতাতেই তো আছে সুখেষু বিগতস্পৃহ হ'তে পারলেই,—কিন্তু না, তখনই তার আবার মনে হ'ল, 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা' হওয়াটাই আগে দরকার; বিশেষতঃ আজকাল; তাছাড়া যে আদর্শ দেখাতে চায় সে, তা প্রাসাদে বসে' হ'বে না। স্বয়ং জনকও যদি এযুগে জন্মাতেন তাহ'লে তাঁর পক্ষেও খোলার ঘরে যাওয়া উচিত হ'ত। কিন্তু যে কথাটা সে ভাবছিল না, যা তার অজ্ঞাতসারেই তার মনে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রেরণা জোগাচ্ছিল তা গীতা নয়, রঞ্জনা।

রঞ্জনা মিটিং থেকে গিয়েছিল তার এক বান্ধবীর বাড়ি, গিরিডি যাওয়ার দিনটা কবে ঠিক হ'ল জানবার জন্যে। সেখান থেকে আবার গিয়েছিল হস্টেল। হস্টেল থেকে ফিরছিল সে আর একটি

বান্ধবীর সঙ্গে। এই বান্ধবীটিও দিবসের বক্তৃতা শুনেছিল এবং সেই আলোচনাই হচ্ছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ বান্ধবীটি বলে' উঠল, "অনেকদিন আগে রমঁ্যা রলাঁর 'I will not rest' বইটা পড়ে' যেরকম আনন্দ পেয়েছিলাম আজ দিবসবাবুর বক্তৃতাটা শুনে' সেইরকম আনন্দ পাওয়া গেল।"

চকিতে রঞ্জনার মনে পড়ে' গেল দিবসের খোলার ঘরের ছবিটা। শেলফে যে ক'খানা বই ছিল তার মধ্যে 'I will not rest' বইটাও সে দেখেছিল। বইটার সম্বন্ধে তখন তার কোনও কৌতূহল হয় নি, এখন হ'ল।"

" 'I will not rest' বইটা তুই পড়েছিস নাকি?"

"হ্যাঁ, অপূর্ব বই! না পড়ে' থাকিস তো পড়িস।"

হঠাৎ রঞ্জনা যেন অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়ে পড়ল দিবসের ঘরে যাওয়ার আর একটা অজুহাত পেয়ে। পরমুহূর্তেই কিন্তু আনন্দের সূর্যকে ঢেকে দিলে বিষাদের মেঘে। মনে পড়ল মামা তার বিয়ের সম্বন্ধ করছেন, তাদের কাশীর বাড়িটা নাকি বাঁধা দেওয়া হচ্ছে এজন্য। ব্যাধভীতা হরিণীর মতো দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে ছুটোছুটি করতে লাগল তার মন। ছুটোছুটি করতে লাগল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গও করতে লাগল নিজের এই 'ব্যাধভীতা হরিণী' ভাবটাকে। শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতার যে রূপ সে প্রত্যক্ষ করেছে, যার স্বাদ সে কল্পনাতে উপভোগ করেছে তারই প্রচ্ছন্ন শক্তি হঠাৎ প্রকট হ'য়ে উঠল তার মনে, সে ব্যঙ্গ করতে লাগল নিজেকেই। কোনও কথা না বলে' নীরবে হাঁটতে লাগল সে।

ঊর্মিকে ময়ূর-নৃত্য শেখাচ্ছিলেন গহনচাঁদ। সীতারাম তবলা বাজাচ্ছিলেন, রমজান সারেঙ্গী। গহনচাঁদ চেয়ে ছিলেন ঊর্মির পায়ের দিকে। তন্ময় হ'য়ে চেয়ে ছিলেন। তবলার তালে তালে নূপুর নিক্কণের ছন্দে ছন্দে মূর্ত হ'য়ে উঠছে নৃত্যপরা ময়ূরটি। একটা

বিস্মিত কৌতূহল মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। অরূপকে রূপ পরিগ্রহ করতে বহুবার দেখেছেন তিনি, কিন্তু প্রতিবারই নূতন বিস্ময় জেগেছে তাঁর মনে। এই ব্যক্তিই যে মেয়ের বিয়ের জন্য বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করছেন তা তাঁর মুখ দেখে মনে হওয়া অসম্ভব। প্রশান্ত মুখচ্ছবি। দৈন্য বা ক্লেশের ছায়ামাত্র নেই তাতে।

"না, না না ঠিক হ'ল না, খড়ির দাগে দাগে পা পড়ল না তো, ময়ূরের চোখ নষ্ট হ'য়ে গেল যে। মনে থাকে যেন আবীরের উপর নাচতে হ'বে, একটু এদিকে ওদিকে পা ফেললে ধেবড়ে যাবে সব। খুব হালকাভাবে ঠিক জায়গাটিতে পা ফেলতে হ'বে। হ্যাঁ—এইবার ঠিক হচ্ছে। করতে করতেই হ'বে। আবার গোড়া থেকে কর। সীতারাম ঠায়ে বাজাও একটু—"

আবার নাচ শুরু হ'ল। উর্মি খুব সাবধানে নাচতে লাগল এবার।

"এইবার ঠিক হচ্ছে—বাঃ—বাঃ—"

উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন গহনচাঁদ। নাচ শেষ হ'য়ে গেল একটু পরেই। গহনচাঁদ এত পুলকিত হ'লেন যে তাঁর মনে দার্শনিক ভাবের সঞ্চার হ'ল। উর্মিকে আর একবার উৎসাহিত করলেন।

"হ'বে, ঠিক পারবে তুমি"—তারপর সীতারামের দিকে ফিরে বললেন—"জীবনে এই তো আনন্দ, কি বল সীতারাম?"

"জী হাঁ।"

"দুদিন পরে আমরা কে কোথায় চলে' যাব, কিন্তু আবীরের উপর ওই ময়ূর চিরকাল পেখম তুলে' নাচতে থাকবে। ও অমর। আমাদের জীবন আর ক'দিনের?"

রমজান মাথা নেড়ে বয়েদ্ আওড়ালে একটা।

"কংকল্ চুন্ চুন্ মহল বানায়া
লোগ কহে ঘর মেরা জি

না ঘর তেরা না ঘর মেরা
চিঁড়িয়া রহে বশেরা জি।"

"বাঃ, উর্দ্দু বয়েদ্ বুঝি? চমৎকার!"—বলে' উঠলেন গহনচাঁদ—"সুর বসাও ওতে। সুর দিলে অন্য মানেই হ'য়ে যায়। বুঝলে সীতারাম, আমি ভেবেছি শিবের সব স্তোত্রগুলোতেই সুর বসিয়ে দেব।"

"আপ কি মর্জি হোনে সে তো সব কুছ হো সক্‌তা হ্যায়।"

গদগদকণ্ঠে উত্তর দিলে সীতারাম।

"বেশক্"—রমজানও স্মিতমুখে মাথা নেড়ে সমর্থন করলে।

একটা আনন্দিত ভাবঘন পরিবেশে নীরব হ'য়ে রইলেন সবাই খানিকক্ষণ। সহসা রঙ্গনার জন্যে মন কেমন করে উঠল গহনচাঁদের। তাঁর মনে হ'ল এখন রঙ্গনা থাকলে বেশ হ'ত।

"রঙ্গনা এখনও কলেজ থেকে ফিরল না কেন বুঝতে পারছি না। অন্যদিন তো বিকেলেই চলে' আসে।"

মিটিংয়ের কথা গহনচাঁদ জানতেন না।

"আয়েগী অভি।"

"এখন তো তোমরা বাসায় যাবে?"

"জী হাঁ।"

"আচ্ছা, এস তাহ'লে। আমি এবার পূজোয় বসি। তুমি অপেক্ষা করবে নাকি রঙ্গনার জন্যে?"

উর্মির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"না, আমিও যাই।"

সে যে নাচটা ঠিক মতো পেরেছে কিরণকে এই খবরটা দেবার জন্যে মনে মনে ছটফট করছিল সে।

সীতারাম, রমজান, উর্মি চলে' গেল। চুপ করে' বসে' রইলেন গহনচাঁদ খানিকক্ষণ। তারপর গুনগুন করে' গান ধরলেন—

"কস্তুরিকা চন্দন লেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়
সৎ কুন্তলায়ৈ ফণি কুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।"

গান কিন্তু শেষ হ'ল না, চুনীলাল এসে ঢুকল।

"এখন টাকাটা যোগাড় করতে পারলেই শুভকার্যটি হ'য়ে যায়। কাশীতে লিখেছেন আপনি ?"

"বিশ্বনাথ কথককে লিখেছি।"

"উত্তর আসবার সময় হয় নি এখনও বোধ হয় ?"

"না। এই সেদিনই তো লিখেছি।"

রঙ্গনা ঢুকল এসে। ঢুকে ভিতরে যাচ্ছিল এমন সময় চুনীলালের কথাগুলো তার কানে গেল।

"কাল যদি উত্তর না আসে তো আর একবার তাড়া দিতে হ'বে। বিয়ে যখন দিতেই হ'বে তখন এরকম পাত্র হাতছাড়া করা অনুচিত।"

"কার বিয়ে ?"—ঘাড় বেঁকিয়ে জিগ্যেস করলে রঙ্গনা।

"আবার কার, তোর"—হেসে গহনচাঁদ বললেন। রঙ্গনা চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সমস্ত চোখ-মুখ কেমন যেন জ্বালা করতে লাগল। তারপর বলে' ফেলল—

"যারা ওরকম পণ দাবি করে তাদের বাড়িতে বিয়ে করব না।"

বলেই গটগট করে' চলে' গেল সে বাড়ির ভিতরে।

"দেখ দেখ, পাগলির কাণ্ড দেখ একবার !"

চুনীলালের দিকে হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে এক নজর চেয়ে গহনচাঁদ তার অনুসরণ করলেন। চুনীলাল ভ্রূকুঞ্চিত করে' ভাবলো একটু। রঙ্গনার এই উক্তি সে প্রত্যাশা করে নি। তার ব্যবসায়ের মগ্ন তরীকে যে-সব রশিরশা বেঁধে সে টেনে' তোলবার চেষ্টা করছিল, তার ভাগ্নীর আচরণে যে সে-সব ছিঁড়ে যাবে এও তার কল্পনাতীত ছিল। তবু সে ভ্রূকুঞ্চিত করে' ভাবলে একটু। ঈশপের এক চক্ষু হরিণের গল্পটা তার মনে পড়ল একবার। সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত আর একটা কথাও মনে পড়ল, 'বিয়ের কথা হ'লেই আজকালকার মেয়েরা ওরকম বলেই থাকে, ওটা একটা ফ্যাশান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে —একথা মনে হওয়ামাত্র তার কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হ'য়ে গেল।

কর্মক্লান্ত কিরণ বাড়ি ফিরে আহারাদি শেষ করে' চুপ করে' বসেছিল। আর একটা কবিতা গুঞ্জন তুলেছিল তার মনে—

কার সুরে ওগো কার
তিমির রজনী শেষে
খুলিছে উষার দ্বার।

তার সত্যিই যেন মনে হচ্ছিল—কেন মনে হচ্ছিল তা সে বলতে পারত না যদিও—কিন্তু মনে হচ্ছিল যে তার তিমির রজনী এবার বোধ হয় শেষ হ'বে। দৈনন্দিন এই গ্লানির অবসান হ'য়ে দেখা দেবে আনন্দ। কল্পনা করতে ভাল লাগছিল—বাধ্য হ'য়ে এই যে কঠিন কর্মশৃঙ্খল তাকে পরতে হয়েছে, যার মধ্যে কোনও আনন্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, যা উদ্বুদ্ধ করে না, পরিপূর্ণ করে না, যা কেবল প্রাণহীন যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি মাত্র—সে শৃঙ্খল একদিন খসে' যাবে। স্বাধীন চিত্তে এমন একটা লোকে সে উত্তীর্ণ হ'বে যেখানে কর্ম ক্লেশদায়ক নয়, আনন্দদায়ক। কুসুমের বিকাশের মতো, আলোকের উন্মেষের মতো যা স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কল্পনানেত্রে এই অপরূপ সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে' সে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। একটু দূরে পথের বাঁকে সেই সম্ভাবনাটা যেন দাঁড়িয়ে আছে মনে হ'ল, আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখা হ'বে, চিনতে পারবে। এটা যে অলীক কল্পনা মাত্র একথাও সে যে অনুভব করছিল না তা নয়, কিন্তু তাকে নিরুৎসাহিত করছিল না। বরং তার মনে হচ্ছিল এই কল্পনাকে আশ্রয় করেই তো ভারতবর্ষের সভ্যতা দৈনন্দিন বাস্তবের ঘূর্ণাবর্তে ডুবে' যায় নি, ওই কল্পনার ভেলা অবলম্বন করেই বহু শতাব্দী ধরে' ভেসে' আছি আমরা। আত্মা, পরলোক, কর্মফল, সবই বহুবর্ণের বিচিত্র কল্পনা। সে কল্পনা সত্যেও রূপান্তরিত হয়েছে অনেকের উপলব্ধিতে। তারই বা হ'বে বা কেন? নিবিষ্টচিত্তে বসে' কবিতা লিখতে লাগল সে।

"কিরণদা, ঘুমিয়েছেন নাকি?"

দড়াম্ করে' কপাট খুলে' ঢুকল ঊর্মি।

"ঘুমোন নি? জানেন, আমার ময়ূর নাচটা প্রায় হ'য়ে এসেছে। সিনেমা ডিরেক্টারকেও দেখাব এই নাচটা একদিন, এটা যদি কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারেন তিনি—লিখছিলেন নাকি—আর একটা গান নাকি? হ্যাঁ, আমি সেই গ্রামোফোন কোম্পানির ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছি, তিনি গানটা নিয়েছেন, তবে রঙ্গনাকে দিয়ে গাওয়াবেন না বোধ হয়, তাঁর আবার কে একজন পেটোয়া গাইয়ে আছে, তাকে দেবেন। এ গানটাও দিন, রঙ্গনাকে দেব—নিই?"

এক ঝলক হাওয়ার মতো এসে ঊর্মি যেন সব এলোমেলো করে' দিলে নিমেষের মধ্যে। নির্জনে কিরণের মনের মেঘে যে ইন্দ্রধনু ফুটে উঠেছিল, মেঘসুদ্ধ তা উড়ে' গেল কোথায়। একটু হেসে কিরণ বললে—"নেবে? নাও।"

"আপনি বাঁশী শিখতে গেলেন না গহনচাঁদবাবুর কাছে?"

"সময় কই?"

দিবসের কাছে কিরণ যে কারণটা দেখিয়েছিল তা ঊর্মিকে বলতে পারলে না। তার মনে হ'তে লাগল ঊর্মির কাছে তা বলা যাবে না। আর একটা কারণও দেখালে সে—"ওখানে যা ভিড় হচ্ছে তাতে ওখানে আমার ভালও লাগবে না! তুমি ওই ভিড়ের মধ্যেই নাচছ কি করে'?"

"আমাকে উনি আলাদা শেখান, তাই তো এত রাত্রে ফিরছি। লোক খুব চমৎকার! আপনাকেও আলাদা শেখাবেন, গিয়েই দেখুন না।"

কিরণ চুপ করে' রইল।

আট

দক্ষিণী-বাহিনী নদী ক্রমে ক্রমে গতিপথ পরিবর্তন করতে করতে একদা যেমন উত্তর-বাহিনী হ'য়ে পড়ে, দিবসেরও তাই হ'ল। পাহাড় থেকে নদী যখন নামে তখন সে ঢালু পথই অনুসরণ করে। পথে কোন বাধা থাকলে সে বাধাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা অতিক্রম করে। দুরতিক্রম্য হ'লে সে পথ পরিবর্তন করে, ঘুরে অন্য পথে যায়। এইটেই সাধারণতঃ ঘটে। কিন্তু নদীর সম্মুখ গতিতে আর এক ধরনের বাধাও ঘটে মাঝে মাঝে সম্মুখে যদি গহ্বর থাকে। সমুদ্র-মুখিনী নদী হঠাৎ গর্তে পড়ে' যায় কিছু কালের জন্য এবং তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে কিছুকাল। এই দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা দিবসের জীবনে ঘটছিল তার অজ্ঞাতসারেই। স্বকীয় পৌরুষ বলে' প্রাচীন প্রথার পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে' সে বেরিয়েছিল নিজের আদর্শ অনুসরণ করে'। আদর্শ অনুসারেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করেছিল সে কর্মজগতে। একটা প্রাইভেট ট্যুশনি জুটে যাওয়াতে অবস্থাও একটু সচ্ছল হবার আশা হয়েছিল (সেদিন বক্তৃতা দিয়ে ফিরেই সে চিঠি পেয়েছিল একটি ছেলেকে অঙ্ক পড়াবার জন্যে, মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা করে' দিতে রাজি আছেন একজন); যে উত্তেজনার আবেগ নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তা মন্দীভূত হ'য়ে যেত হয়তো কালক্রমে, স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অর্থোপার্জন করার কৃতিত্বটা একঘেয়ে কর্মবন্ধনে পরিণত হ'য়ে গ্লানিকর হ'য়েও উঠত হয়তো, অবশেষে হয়তো সে অপেক্ষমান সূর্য চৌধুরীর ঔৎসুক্যকে ধূলিসাৎ এবং পিতৃস্নেহকে পরিতৃপ্ত করে' বাড়িতেই ফিরে যেত শেষ পর্যন্ত, যদি তার কল্পনা নূতন একটা উদ্দীপনা না পেত। রঞ্জনাকে ঘিরে তার মন স্বপ্নজাল রচনা করতে

লাগল, এইটুকু বললেই তার মনের অবস্থাটা অবশ্য ঠিক বলা হ'বে না। 'স্বপ্নজাল' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করলেই যা মনে হওয়া স্বাভাবিক তা এক্ষেত্রেও ছিল, কিন্তু তাছাড়া আরও কিছু ছিল। সাধারণ যুবক যে জাতীয় ঐশ্বর্য আস্ফালন করে' প্রণয়িনীর হৃদয় হরণ করতে চায়, সে জাতীয় ঐশ্বর্য দিবসের যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সেটাকে সে আস্ফালন করতে চাইছিল না। সে তার নবার্জিত ঐশ্বর্যে মুগ্ধ করতে চাইছিল রঙ্গনাকে। সে চাইছিল মেসের চাকর দিবস চৌধুরীর গলাতেই মাল্য দান করবার জন্যে রঙ্গনা উৎসুক হোক। তাই সে সেদিন কিরণকে অনুরোধ করেছিল তার আসল পরিচয়টা সে যেন গহনচাঁদবাবুর কাছে বা রঙ্গনার কাছে বলে' না দেয়। রঙ্গনাকে পাবার জন্যে ততটা নয়, রঙ্গনা তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল সে। যে আদর্শের জন্য সে নিজে বাড়ি ছেড়ে চলে' এসেছে, সেই আদর্শে বিশ্বাসী একজন সঙ্গিনীকে সে আবিষ্কার করতে চায় রঙ্গনার মধ্যে। তার বিজ্ঞানী রিসার্চ-পটু মন এই উত্তেজনায় যে বিচিত্র স্বপ্নজাল বয়নে প্রবৃত্ত হ'ল তা বিচিত্রতর হ'য়ে উঠতে লাগল পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায়। সে ভুলে গেল কিছুদিনের জন্য কি উদ্দেশ্য নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল প্রথম দিন এবং তার এই আত্মবিস্মৃতির খবরটা কিছুদিন পরে পল্লবিত হ'য়ে যে গোবিন্দ সাণ্ডেলের পক্ষকে শক্তি জোগাতে পারে, একথাও তার মনে হ'ল না একবারও। মনে হওয়ার কথা নয়, কারণ সূর্য চৌধুরী যে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে দ্বৈরথে নেমেছেন এ খবর অজ্ঞাত ছিল তার কাছে। গোবিন্দ সাণ্ডেল অবশ্য খবরটা পেয়েছিলেন কয়েকদিন পরে জগু সেনের মারফত। জগু সেন দিবস আর রঙ্গনাকে নাকি রাত বারোটার সময় সিনেমা থেকে রোমিও জুলিয়েট দেখে ফিরতে দেখেছিলেন এবং—যাক্, যথাসময়েই ঘটনাটা বলা যাবে।

দিবস কিন্তু যা করবার মনে মনেই করছিল। সরোদ শেখবার

ওজুহাতে সে অনায়াসেই গহনচাঁদবাবুর বাড়ি যেতে পারত, কিন্তু যায় নি। তার কেমন যেন ভয় করছিল, মনে হচ্ছিল তার তাসের সাজানো ঘরটা একটু ছুঁলেই বোধ হয় পড়ে' যাবে। দূরে থেকেই সে উপভোগ করছিল সেটা এবং আরও কিছুদিন হয়তো করত যদি রঙ্গনা নিজেই না এসে পড়ত তার বাসায়। আর একটা যোগাযোগও গেল। রঙ্গনা যখন এল তখন দিবস বাড়িতে ছিল না, কিন্তু সৌদামিনী ছিল। সৌদামিনীর মুখে দিবসের সব কথা শুনে' (এমন কি দিবস যে সেই ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটাকে টাকা দিয়ে পটলিকে উদ্ধার করেছে একথাও সাড়ম্বরে বলেছিল সৌদামিনী) রঙ্গনার মনে যা হয়েছিল তা অবর্ণনীয় নয়, অনেক কবিই তা বর্ণনা করেছেন সালংকারে। রঙ্গনার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। তার তৃষ্ণার্ত মন অপ্রত্যাশিতভাবে পরিষ্কার পাত্রে নির্মল জল দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল, এযুগে যে এরকম সম্ভব তা বিশ্বাস করতেই পারছিল না সে প্রথমে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে হ'ল।

রঙ্গনা যখন এসেছিল তখন কাউকেই দেখতে পায় নি সে। শুধু দেখলে দিবসের ঘরে তালাটা ঝুলছে। সোজা চলে' গেল উঠোনের দিকে এবং গিয়েই দেখতে পেলে হাঁসটাকে। হাঁসটাকে দেখবার জন্যেই সে উঠোনের দিকে গিয়েছিল, ওই রাজহংসটার সঙ্গে দিবসকে সে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল অদ্ভুতভাবে। হাঁসটা উঠোনেই চরছিল, রঙ্গনাকে দেখে সে কলরব করে' উঠল। রঙ্গনা তার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে একটু আদর করতে পারলে আনন্দিত হ'ত, কিন্তু হাঁসটা কেবল সরে' সরে' যেতে লাগল, দু'একবার গলা বাড়িয়ে কামড়াতেও এল তাকে। রঙ্গনাও ছাড়বার পাত্রী নয়, নানাভাবে কাছে যাবার চেষ্টা করতে লাগল সে। হাঁসের চিৎকার শুনেই সৌদামিনী পটলির ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পটলির রুগ্ন স্বামীর অসুখটা বেড়েছিল, তার কাছেই ছিল সে।

"ও, আপনি—।"

"দিবসবাবুর কাছে একটা বই নিতে এসেছিলাম। তাঁর ঘরে দেখলাম তালা বন্ধ।"

"সে এখনই আসবে, তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি, পটলির স্বামীর অসুখটা বেড়েছে আজ দুপুর থেকে—।"

"পটলি কে ?"

"চলুন সব বলছি। ঘরেই চলুন, চাবি আছে আমার কাছে।"

হরিদাসবাবু চুপ করে' ছিলেন। তিনি যে দিবসের আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছেন তা দিবসকে তো বলেনই নি, মেসের আর কাউকেও বলেন নি। কোনও গুপ্তস্থানে এক হাঁড়ি মোহর আবিষ্কার করে' সাধারণ লোকের যে মনোভাব হয়, তাঁরও তাই হচ্ছিল। গুপ্তস্থানটার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে' আশেপাশে তিনি ঘোরাফেরা করছিলেন মনে মনে। হাঁড়িটা ছুঁতেও সাহস হচ্ছিল না তাঁর। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ছোঁবার সুযোগও তিনি পাচ্ছিলেন না। দিবসকে একা পাওয়া যায় না। সে ঠিক নিয়মিত সময়ে আসে, নীরবে কাজকর্ম করে আবার নিয়মিত সময়ে কর্তব্য শেষ করে' চলে' যায়। যতই দেখছিলেন ততই মুগ্ধ হচ্ছিলেন। মুখবন্ধকরা হাঁড়ির ভিতর পোলাও যেমন ভিতরে ভিতরে গুমে সিদ্ধ হ'তে থাকে, তাঁরও অবস্থা তাই হয়েছিল অনেকটা। দিবসের সঙ্গে আলাপ করতে ঔৎসুক্য খুবই হচ্ছিল কিন্তু সাহস পাচ্ছিলেন না, সুযোগও ঘটছিল না। তাছাড়া তাঁর মনে হচ্ছিল আলাপ করলেই বোধ হয় সব নষ্ট হ'য়ে যাবে, গোপনতার অন্তরালে যে মহজ্জীবন গ'ড়ে উঠছে ধীরে ধীরে, প্রকাশ্যে তাকে নিয়ে টানাটানি করতে গেলেই তা খেলো হ'য়ে যাবে। আর একটা মুশকিলেও পড়েছিলেন হরিদাসবাবু। দিবসকে দিয়ে জুতো বুরুষ করানো প্রভৃতি নোংরা

কাজগুলো করাতে পারছিলেন না তিনি। এমন কি নিজের কাপড়টাও নিজের হাতে কেচে নিতে হচ্ছিল তাঁকে।

সেদিন বিকেলে হরিদাসবাবু বসে' দাড়ি কামাচ্ছিলেন, কাগজ পড়ছিলেন গোবর্ধনবাবু, অঘোরবাবু ফাটকা মার্কেট থেকে ফেরেন নি তখনও, ধূর্জটিবাবু বাড়ি ছিলেন না। তাঁকে কে যেন বলেছিল যে রাধাবাজারের একটা গলিতে ইটালিয়ান রজন পাওয়া যায়, সেই রজন ছড়ে লাগালে বেহালা থেকে চমৎকার আওয়াজ বের হয় নাকি। তারই সন্ধানে বেরিয়েছিলেন ভদ্রলোক। দিবস ঘরে ঢুকে দু'জনের পাশে দু'পেয়ালা চা রেখে' গেল। হরিদাসবাবু আড়চোখে দিবসের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার শুধু। দিবসের দিকে সোজা চাইতেও আজকাল একটু ইতস্তত করেন তিনি। দিবস চলে' গেলে মুখটি মুছে তিনি চা খেতে লাগলেন। হঠাৎ নজরে পড়ল গোবর্ধন চা খাচ্ছেন না, নিচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁটটাকে চেপে ভুরু কুঁচকে খবরের কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' বসে' আছেন।

"গোবর্ধনবাবু, চা-টুকু খেয়ে নিয়ে চিন্তা করুন। বল পাবেন। কি ভাবছেন কি ?"

"ভাবছি চিয়াংকাইশেক কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইছে কেন। পেছনে অত বড় খুঁটো ট্রুম্যান রয়েছে।"

দিবস আবার ঢুকল ছোট একখানা নূতন গামছা হাতে করে'।

"এই গামছাটা কিনেছি আপনার জন্যে।"

গামছাটা গোবর্ধনের হাতে দিলে সে।

"এঃ এটা যে বড্ড ছোট হ'ল হে !"

"একই দাম, এক টাকা বলছে।"

গোবর্ধন স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ দিবসের মুখের দিকে, তারপর হরিদাসের দিকে চেয়ে বোমার মতো ফেটে পড়লেন —"গোল্লায় যাবে সব। আজকের কাগজে আমাদের নেতাদের

গরম গরম বক্তৃতাগুলো পড়ে' দেখো। একটা গামছার দাম কমাবার মুরোদ নেই, দামোদর বাঁধতে যাচ্ছেন ওঁরা!" .

এমন সময় নিচে থেকে ঠাকুরের গলা শোনা গেল—"ও দিবু, তোমাকে বাইরে থেকে কে ডাকছে, নেমে এস একবার—"

দিবস নেমে গেল। একটু পরে যখন ফিরে এল তখন শুনলে হরিদাসবাবু গোবর্ধনবাবুকে বলছেন—"আপনার স্কীমগুলো লিখে পাঠিয়ে দিন না সকলকে। চা-টুকু খেয়ে নিন আগে।"

দিবস বলল, "আমি যে বাসায় থাকি সেখানে একটি অসুস্থ লোক আছে। তার অসুখটা বাড়াবাড়ি হওয়াতে ডাকতে এসেছে আমাকে। আমার ছুটি চাই একটু।"

"বেশ যাও, আমাকে এক প্যাকেট বিড়ি এনে দিয়ে যাও তাহ'লে।"—গোবর্ধন বললেন এবং বিড়ির পয়সা দিলেন।

দিবস চট্ করে' নিচে নেমে গেল আবার এবং বিড়ি নিয়ে এল এক প্যাকেট।

প্যাকেটটা হাতে করে' গোবর্ধন হরিদাসবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "প্রাণ খুলে' দুটো যে বিড়ি খাব তার পর্যন্ত উপায় নেই। ধরাবার আগেই বিড়িতে আগুন জ্বলছে। গোলাপ মার্কা এনেছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাহ'লে যাই এবার?"

"যাও।"

দিবস চলে' গেল। রাস্তায় নেমেই সে আগে গেল তার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে। একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেছিল। মেডিকেল স্কুল থেকে পাস করে' সে বছর দুই হ'ল ডাক্তার হ'য়ে বেরিয়েছে। তাকে গিয়ে সে বলল যে বিনা পয়সায় একটি রুগী দেখতে হ'বে এবং হয়তো বিনা পয়সায় ঔষুধও দিতে হ'বে। সৌরেন ডাক্তার লোক ভাল—তাছাড়া দিবস চৌধুরীর অনুরোধ—সে রাজি হ'য়ে গেল তৎক্ষণাৎ। তার গাড়ি চড়েই দিবস হাজির হ'ল নিজের বাসায়।

রঙ্গনাকে দেখবে সে প্রত্যাশা করে নি।

"আপনার 'I will not rest' বইখানা চাইতে এসেছি, যদি দু'চার দিনের জন্য পড়তে দেন তাহ'লে"—রঙ্গনা হেসে বললে।

"হ্যাঁ নিশ্চয় দেব। একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তারবাবু এসেছেন, এ ব্যাপারটা আগে সেরে ফেলি—"

সৌরেন ডাক্তার একটু বিস্মিত হয়েছিল। দিবসের সঙ্গে এ ধরনের বস্তির যোগাযোগ কি করে' যে সম্ভবপর হ'তে পারে তা সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু রঙ্গনা এবং সৌদামিনীর সামনে প্রশ্ন করাও সে সঙ্গত মনে করল না।

রঙ্গনাও সকলের সঙ্গে পটলির ঘরে গিয়ে হাজির হ'ল। অন্ধকার ঘর, একটিমাত্র জানলা। পটলির স্বামী জরাজীর্ণ বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে যেন। নিষ্প্রভ কোটরগত চক্ষু। একটা ক্ষীণ 'উঃ' 'উঃ' শব্দ করে' চলেছে ক্রমাগত। সৌরেন ডাক্তার পরীক্ষা করে' বললে যক্ষ্মা হয়েছে।

"এঁর বিছানাটা জানলার কাছে নিয়ে গেলে ভাল হয়। আলো আর হাওয়া দরকার। আমার সঙ্গে কেউ একজন চলুক, আমি ঔষুধ যা লাগে দিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলে' সৌরেন ডাক্তার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর দিবসের সঙ্গে কথা কইতে কইতে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

"তুমি এখানে কি করে' এলে বুঝতে পারছি না তো!"

"এক্স্‌পেরিমেন্ট করছি একটা।"

"টি-বি নিয়ে?"

"বলব সে-সব একদিন। আজ একটু ব্যস্ত আছি।"

"আচ্ছা।"

সৌরেন ডাক্তার পটলির ভাই বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে চলে' গেল। দিবস ফিরে আসতেই সৌদামিনী এবং গিরিবালা উৎসুক হ'য়ে উঠল ডাক্তার কি বলে' গেল শোনবার জন্য।

"যক্ষ্মা হয়েছে বললে!"

"তাহ'লে সঙীন ব্যাপার বল!"—সৌদামিনীর হাত গালে উঠল।

"তাতো বটেই। তবে ডাক্তারবাবু যথাসাধ্য করবেন বললেন।"

"ফি দিলে না?"

"ফি, ওষুধের দাম কিছুই নেবে না। আমার বন্ধু একজন। বিছানাটা জানলার দিকে সরিয়ে দি চল।"

"বসন্ত আসুক। খাট সরাতে অন্তত চারজন লাগবে তো। আমি আর গিরিবালা না হয় একদিকে ধরব, তুমি আর বসন্ত আর এক দিকে ধোরো।"

দিবস রঙ্গনার দিকে ফিরে বললে, 'এই তো আর একজন রয়েছে।'

"নিশ্চয়, চলুন আমি ধরছি।"

চারজন ধরাধরি করে' খাটটা সরিয়ে দিলে জানলার কাছে। ব্যাপারটা কিছু নয়, কিন্তু এরই ফল হ'ল সুদূর-প্রসারী। দিবস আর রঙ্গনাকে পাশাপাশি দেখে সৌদামিনীর অন্তরে যে কথাটি উদিত হ'ল এবং যা সে একটু পরে নিম্নকণ্ঠে গিরিবালাকে বলল, তা দৈবাৎ রঙ্গনারও কর্ণগোচর হওয়াতে সামান্য ঘটনাই অসামান্য হ'য়ে উঠল তার কাছে। যে মেঘটা বর্ণের অভাবে কালোই ছিল বরাবরই, হঠাৎ এক ঝলক রোদ লেগে' তার গায়ে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু ফুটে উঠল যেন। 'I will not rest' বইখানা নিয়ে রঙ্গনা দিবসকে বললে, "কই, আপনি বাবার কাছে সরোদ শিখতে গেলেন না তো? আপনার বন্ধুটিও তো আসেন নি?"

"কাল যাব। কাল নয় পরশু।"

"কেন, কাল কি করবেন?"

"কাল সেকেণ্ড শোয়ে 'রোমিও জুলিয়েট' দেখব মেট্রোতে।"

"ওমা, আমিও যে তাই ঠিক করেছি।"

"বেশ একসঙ্গে দেখা যাবে—থার্ডক্লাশে বসতে পারেন যদি।"

"তা পারব না। আপনার বক্তৃতাটা কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল সেদিন। ও সম্বন্ধে দু'একটা কথা আলোচনা করবার আছে। এখন বোধ হয় আপনার সময় নেই?"

"না। এখন চাকরি করতে যেতে হ'বে।"

রঞ্জনার মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠল। সৌদামিনীর কাছে দিবসের সমস্ত বিবরণ সে শুনেছিল।

"শখ করে' এ কৃচ্ছ্রসাধন কেন?"

"শখ করে' কে বললে আপনাকে?"

"সব শুনেছি আমি।"

বলেই সে হেসে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়েই তার কানে গেল সৌদামিনী গিরিবালাকে নিম্নকণ্ঠে বলছে, "দুটিতে বেশ মানায় কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়ালে।"

রঞ্জনা আর দাঁড়াল না, পিছু ফিরে চেয়েও দেখল না, সোজা বেরিয়ে চলে' গেল। রজ্জুমুক্ত বেলুনের মতো তার মনটা অসীম আকাশে পাড়ি দিয়েছিল, তারই পিছু-পিছু সে ছুটতে লাগল যেন। দিবসের সব কথা সে শুনেছিল সৌদামিনীর মুখে। বড়লোকের ছেলে হ'য়ে সে যে শখ করে' মেসে চাকরি করছে, পটলিকে রক্ষা করবার জন্যে সে যে পঁচাত্তর টাকা এনে দিয়েছে, সে যে অত্যন্ত অন্যমনস্ক, নিজের সম্বন্ধে তার যে কিছুমাত্র হুঁশ নেই, এ সবই সে শুনেছিল এবং এই সবের সঙ্গে তার কাল্পনিক-আকাঙ্ক্ষা-বাস্তব-হতাশা-সমন্বিত জীবনের ছবিটাও মিলিয়ে সে দেখেছিল মনে মনে। কিন্তু এর বেশী আর কিছু করবার সাহস হয় নি তার, এর পর তার মনে যে অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকাটুকু ছিল সৌদামিনীর নিম্ন-কণ্ঠোচ্চারিত উক্ত কথাগুলির প্রভাবে সেটুকু সরে' গেল এবং সে যেন সেতু দেখতে পেল একটা। ক্ষণপরেই তার রাগ হ'ল, ধিক্কার এল নিজের উপরই। মনে হ'ল সে যেন উপযাচিকার মতো দিবসের দ্বারস্থ

হয়েছে। মনে হওয়ামাত্র আত্মসম্মানের বর্মে নিজেকে আবৃত করে' 'I will not rest' বইখানাকে আরও জোরে চেপে ধরে' আরও দ্রুতগতিতে হাঁটতে লাগল সে। বাবাকে কিংবা মামাকে না জানিয়ে এভাবে দিবসের বাসায় আসাটা যে অন্যায় হয়েছে, একথাও মনে হ'ল তার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার মনে হ'ল —দিবস চৌধুরী? কলেজের স্টুডেন্টস্ গ্যাদারিংয়ে যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন নিশ্চয়ই ভাল ছেলে। সৌদামিনী বলছিল আইন পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছেন নাকি, খোঁজ করতে হ'বে তো। দিবসের কথাই ভাবতে ভাবতে (এবং মাঝে মাঝে সেজন্য লজ্জিত হ'য়ে) পথ চলতে লাগল সে। একটা রাস্তার মোড় ফিরতেই একজন সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা হ'ল তার।

"কোথা চলেছিস রঙ্গনা?"

"বাড়ি। তুই কোথা গিয়েছিলি?"

"রোমিও জুলিয়েট দেখে ফিরছি। দেখেছিস? চমৎকার হয়েছে।"

"না, আমি পরে যাব।"

"কি বই ওটা?"

"রমাঁ রলাঁ্যার 'I will not rest'"—বেশ একটু সগর্বেই উত্তর দিলে রঙ্গনা।

"দেখি।"

"আমার ভাই বাস এসে গেছে।"

রঙ্গনা বাসে উঠে পড়ল। আর হাঁটতে পারছিল না সে। মনে করেছিল হেঁটে যাবে হেঁটে আসবে, কিন্তু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। বাসটা বেশ ফাঁকা ছিল। একটি খালি সীটের এক ধারে বসে' বইটা খুললে সে। খুলতেই কাগজ বেরিয়ে পড়ল একটা। তারই চিঠিখানা। প্রথম দিন দিবসের বাসায় গিয়ে যে চিঠিখানা সে লিখে রেখে' এসেছিল সেইটেই পেজমার্ক করা ছিল। চিঠিখানার

দিকে চেয়ে রঞ্জনার শরীরের রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্যে থেমে দ্বিগুণবেগে বইতে লাগল পরমুহূর্তে। করেছেন কি ভদ্রলোক! রঞ্জনা, রঞ্জনা, রঞ্জনা—চিঠিখানার আষ্টেপৃষ্ঠে ছোট-বড় বাংলা ইংরেজি নানারকম অক্ষরে তার নামটা লিখেছেন। চিঠিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। তারপর উঠে পড়ল হঠাৎ। অকস্মাৎ তার মনে হ'ল বিলাসিতা করা উচিত নয়, হেঁটে যাবে সে। পরের স্টপেজেই বাস থেকে নেমে পড়ল সে। নেমে আবার হাঁটতে শুরু করে' দিলে, কিন্তু আবার একটু পরেই থামতে হ'ল তাকে। একটা ছবির দোকানের সামনে হংস ও দময়ন্তির ছবিটা তাকে থামিয়ে দিলে যেন। কেমন আবছাভাবে তার মনে হ'ল—দিবসের হাঁসের ছবিটা মনে পড়ল।

"কত দাম ছবিটার?"

"আড়াই টাকা।"

"দিন আমাকে।"

ছবিটা কিনে ফেলেই কিন্তু অনুতাপ হ'ল তার। এমনভাবে টাকা খরচ করাটা কি উচিত হচ্ছে? তারা যে গরীব এই কথা আবার প্রবলভাবে মনে পড়ল। মনে পড়ল তার বাবা তার বিয়ের পণ-সংগ্রহের জন্য কাশীর বাড়িটা বাঁধা দেবার আয়োজন করছেন। বিমর্ষ হ'য়ে গেল বেচারী। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে' উঠল। কেন এত দারিদ্র্য? কেন সে যেমন-ভাবে থাকতে চায় তেমনভাবে থাকতে পারে না? দিবসবাবু সেদিন যে বক্তৃতায় বললেন—কিন্তু তার চিন্তাধারা ব্যাহত হ'ল উর্মির ডাকে।

"রঞ্জনাদি, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম কিরণদার এই গানটা নিয়ে। সুর দিয়ে দেবেন এটাতে?"

"বেশ তো, চেষ্টা করব।"

গানটা নিয়ে দেখতে লাগল।

"আমি এখন তাহ'লে সিনেমা ডিরেক্টারের কাছে যাই। আমার ময়ূর নাচটা দেখাই তাঁকে। এটা যদি তিনি ঢুকিয়ে দিতে পারেন—ওফ্, তাহ'লে হিট্ পিকচার হ'য়ে যাবে একখানা। ওই আমার বাস এল, আমি চলি তাহ'লে। কাল যাব আপনার কাছে।"

ঊর্মি চলে' গেল। রঙ্গনা হাঁটতে লাগল আবার।

ব্রজ কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল না।

সে রোজই একবার দিবসকে খুঁজতে বেরুত দুপুরের দিকে। দিবসের যতগুলি বন্ধুর ঠিকানা তার জানা ছিল প্রত্যেকের বাড়ি সে গিয়েছিল। ল' কলেজের গেটেও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে দু'একদিন, যদি দৈবাৎ দেখা পেয়ে যায়। সূর্যকান্তর উপর আর তার আস্থা ছিল না, তাছাড়া সূর্যকান্তও যে কত গোঁয়ার তা তার চেয়ে বেশী কে জানে। ও ভাঙবে তবু মচকাবে না। গোবিন্দ সাণ্ডেলের উপরও হাড়ে চটা ছিল ব্রজ। তার ধারণা পিতাপুত্রের এই যে মনোমালিন্য ঘটেছে তার মূলে আছে ওই লোকটি। সকাল-বিকেল এসে আজকালকার ছেলেদের নামে কুট্স্ কুট্স্ করে' চিমটি কেটে' কেটে' কথা বলাই ওর কাজ। ব্রজর ধারণা সেকালকার ছেলেদের তুলনায় আজকালকার ছেলেরা রত্ন। ব্রজরও বয়স কম হয় নি, সেকাল একাল দু'কালই দেখেছে সে। না, গোবিন্দ সাণ্ডেলের উপরও ভরসা ছিল না তার। সে নিজেই খুঁজে বার করবে। তাকে একবার নাগালের মধ্যে পেলে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে এ ভরসা তার আছে।—এই জাতীয় চিন্তা দ্বারা চালিত হ'য়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল দিবসকে। একটিমাত্র সহকারী (সহকারিণী বললে আরও ব্যাকরণসম্মত হয়) সে পেয়েছিল। সে হচ্ছে বাড়ির ঝি নিস্তারিণী। নিস্তারিণীকে ব্রজ বলেছিল—"তুই তো রোজ রাস্তা দিয়ে আসিস যাস, চোখ-কান খোলা রাখিস একটু। রাস্তায় দেখা

যদি হ'য়ে যায় আধঘোমটা টেনে' সমীহ করে' সরে' দাঁড়াস নি যেন। ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডেকে নিয়ে আসিস। বুঝলি? বলিস ব্রজদা একবার শুধু তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়, যদি না আসতে চায় ঠিকানাটা জেনে নিবি, বুঝলি?"

"বুঝেছি, বুঝেছি, আমাকে আর অত বোঝাতে হ'বে না"—নিস্তারিণী ঝংকার দিয়ে উঠেছিল যদিও কিন্তু সত্যিই সে তার সাধ্য-মতো খোঁজ-খবর করছিল এবং সে-ই একদিন দিবসের খবরটা এনেও দিলে ব্রজকে।

"গিরিবালার সঙ্গে আজকে দেখা হ'ল পথে। কথায় কথায় সে বললে আমাদের অন্ন বোধ হয় উঠল এবার দিদি। লেখাপড়া জানা কলেজের ছেলেরা সব চাকর হ'য়ে বাসন মাজছে আজকাল। সে যে মেসে ঝি-গিরি করে সেই মেসে দিবু বলে' একটি ল' কলেজের ছেলে নাকি চাকর হ'য়ে বাহাল হয়েছে।"

"তাই নাকি! ঠিকানা কি সে মেসের?"

"ঐ যাঃ, ঠিকানাটা তো জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি।"

"গিরি কোথায় থাকে?"

"তাও তো ঠিক জানি না। আগে থাকত কলুটোলায়, না, না কলাবাগানের কাছে, কি যে ছাই নামটা—"

"আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস?"

"কি?"

"তোর গালে ঠাস করে' একটি চড় মারি।"

"মুখ সামলে কথা কও বলছি"—তর্জন করে' উঠল নিস্তারিণী—"চড় মারবেন, ইস্ ভারি মরদ হয়েছেন, যত বুড়ো হচ্ছেন তত ভীমরতি ধরছে—"

"ছি, ছি ছি ছি! দিবুর ঠিকানাটা তুই হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এলি!"

কলহ কিন্তু আর বেশী দূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না,

কারণ গোবিন্দ সাণ্ডেল এসে ঢুকলেন। নিস্তারিণী আধঘোমটা টেনে' সরে' গেল, ব্রজও থেমে গেল। ব্রজ শুধু থেমে গেল না, এমনভাবে চাইলে যেন কোনও শত্রু নিকটবর্তী হয়েছে।

"সূয্যি কোথা ?"

"ওপরে আছে।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল ওপরে চলে' গেলেন। ব্রজর কথা তিনি খানিকটা শুনতে পেয়েছিলেন। দিবসের ঠিকানা নিয়েই যে ওরা আলোচনা করছে এটাও বুঝতে পেরেছিলেন। অন্য কেউ হ'লে থেমে ব্যাপারটা পুরোপুরি জেনে নিতেন, কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেল সে জাতের লোক নন। চাকরদের সঙ্গে—তা সে যত পুরাতন ভৃত্যই হোক—একটা দূরত্ব রক্ষা করে' চলাটাই তিনি আভিজাত্য মনে করেন। সোজা উপরে চলে' গেলেন তিনি।

দিবস যে বাড়ির সামনে এসে চলে' গেল, তাঁর আহ্বান সত্ত্বেও বাড়ির ভিতরে এল না এর ধাক্কাটা সূর্য চৌধুরী সামলেছিলেন। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে দেখে তিনি বুঝলেন যে আর একটা ধাক্কা আসন্ন। এটাকে সামলাবার জন্যেও মনে মনে প্রস্তুত হ'য়ে নিলেন তিনি।

গোবিন্দ সাণ্ডেল এসেই পরিহাসের সুরে বললেন, "আমাকে কুড়িটি টাকা দাও দিকি।"

"কেন ?"

"দিবসকে খোঁজবার জন্যে চেৎলা দৌড়েছিলুম, মনিব্যাগটি হারিয়েছি, নূতন জুতোজোড়া কাদায়-জলে যাচ্ছেতাই হ'য়ে গেছে, ট্যাক্সি খরচা লেগেছে তার উপর—"

"হঠাৎ চেৎলা দৌড়তে গেলে যে ?"

"বদ্যিনাথের কথায়। ও যে অত বড় একটা উজবুক তা ধারণাই ছিল না আমার। কোথা থেকে উড়ো খবরটি দিয়ে চলে গেল।"

সবিস্তারে ঘটনাটির বর্ণনা করলেন।

"মিছে ছুটোছুটি করছ তুমি। দিবস তো এসেছিল।"

"এসেছিল? তার মানে? কোথা সে?"

তখন সূর্য চৌধুরী সবিস্তারে সব বললেন।

"তুমি ডাকলে, তবু এল না?"

"না। বললে সে যা করতে চায় তা এই প্রাসাদে বসে করা সম্ভব নয়।"

"কি করতে চায় সে?"

"আদর্শ শ্রমিক হ'তে চায়।"

"ও বাবা!"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হ'ল। কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কোথা আছে সে?"

"তা তো জানি না। ঠিকানাটা জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি।"

"ঠিকানাটা বোধ হয় ব্রজ জানে তোমার।"

"ব্রজ?"

"হ্যাঁ, এখনি ওপরে আসতে আসতে শুনলাম, ও আর তোমার ঝি-মাগি দিবসের ঠিকানা নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিল। আমাকে দেখেই থেমে গেল।"

"তাই নাকি! আমাকে তো কিছু বলে নি?"

ভিজে গামছা উটি একটি, নেংড়াও জল বেরিয়ে পড়বে।"

সূর্য চৌধুরী চুপ করে' রইলেন।

তারপর বললেন, "ঠিকানাটা জেনেই বা কি হ'বে বল? সে যদি না আসতে চায়, সে যদি তার নিজের পথেই চলতে চায়, আমি তো তাকে জোর করতে পারি না। করা উচিতও নয়।"

"উচিত নয় মানে? ছেলে যা-খুশী করবে আর তুমি বসে' বসে' দেখবে?"

"যা-খুশী বলে' তুমি যা বোঝাতে চাইছ সে ঠিক তাতো করছে

না। ভুল হোক ঠিক হোক, সে নিজের একটা আদর্শ খাড়া করছে এবং সেই অনুসারে চলতে চাইছে।—"

"আদর্শ না কচু!"

কথাগুলো অভ্যাস অনুযায়ী বেরিয়ে পড়ল গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখ থেকে যদিও, কিন্তু তিনিও মনে মনে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন একটু। এরকম করবার মানেটা কি! আদর্শ শ্রমিক? তাঁর অবশ্য ছেলে হয় নি, সবগুলোই মেয়ে, ছেলের মর্ম তিনি ঠিক বোঝেন না হয়তো, কিন্তু তাঁর বদ্ধ ধারণা ছেলেটিকে নাই দিয়ে দিয়ে সূর্যকান্ত এই কাণ্ডটি করেছেন। শাসন না করলে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ বশে থাকে না। এমন কি জামাইকে পর্যন্ত শাসন করতে হয়—তাঁর সেজ জামাইটি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করবেন বলে' মেতেছিলেন—ব্যবসা করবার মতো সংগতি আছে তা ঠিক, বাপের অঢেল পয়সা, কিন্তু চাকরির কাছে ব্যবসা! কড়া করে' একখানা চিঠি লেখাতে তবে ঠাণ্ডা হয়েছেন বাবাজি! বাপের পয়সা থাকলেই ছেলেগুলোর মাথা কেমন যেন বিগড়ে যায়। জামাইয়ের কথা ভাবতে গিয়েই এই শ্রমিক রহস্যটার সমাধান সহসা চোখে পড়ল তাঁর। সূর্য চৌধুরীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "ওসব হুজুক। আর হুজুকে মেতেছে কেন জান? ওর মনটি ঠাণ্ডা আছে।"

"বুঝলাম না।"

"এখন আদর্শ শ্রমিক সেজে বেড়াচ্ছে, বক্তৃতা করছে, কারণ ও জানে যে তুমি চক্ষু বুজলেই বিষয়টি ও পাবে।"

সূর্য চৌধুরী স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "অতটা খেলো ওকে মনে করতে পারি না আমি। এযুগের ভাল ছেলেদের তুমি চেন না, তাই ও-কথা ভাবতে পারছ।"

এ ধরনের কথা সূর্য চৌধুরীর মুখে ইদানিং অনেকবার শুনেছেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। প্রত্যুত্তর দেবার আর প্রবৃত্তি হ'ল না। শুধু

বললেন—"অত কথায় কাজ কি, ফলেন পরিচীয়তে। বিষয়টি থেকে ওকে বঞ্চিত করে' সেই খবরটি পাঠাও দিকি ওর কাছে, উঠি-পড়ি করতে করতে ছুটে আসবে।"

"কখনও আসবে না।"

"ঠিক আসবে। করেই দেখ।"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন।

রঙ্গনা চলে' যাবার পর দিবসও বেরিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে ঘুরল রাস্তায় রাস্তায়। তারপর কিরণের বাসায় হাজির হ'ল এসে।

"একেই বলে টেলিপ্যাথি"—কিরণ হেসে বলল—"আমি এক্ষুনি তোর কথা ভাবছিলাম। তারপর খবর কি?"

কোনও উত্তর না দিয়ে দিবস চেয়ারটা টেনে' বসল স্মিতমুখে।

"কিছু বলছিস না যে?"

"বলতে বাধছে।"

"কি রকম?"

দিবস হাসিমুখে চেয়ে রইল তবু। তারপর বললে—"আচ্ছা, তুই তো কবি মানুষ, একটা কথার জবাব দে দিকি। একটা বিশেষ লোককে হঠাৎ ভাল লেগে' যায় কেন?"

"কেন, কাউকে হঠাৎ ভাল লেগেছে নাকি?"

"লেগেছে।"

"কাকে?"

"রঙ্গনাকে।"

কিরণের মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে গেল সহসা। তার যে ব্যথাটাকে সে গোপন করতে চাইছে প্রাণপণে এই সংবাদটা যেন লোষ্ট্রাঘাতের মতো লাগল এসে তাতে। ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে ভুলে

থাকবার চেষ্টা করছিল সে, দিবসের কথায় মনে পড়ে' গেল সেটা। শুধু মনে পড়ে' গেল নয়, এর শোচনীয় পরিণামটাও যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তার চোখের সামনে। কিন্তু তার তৎক্ষণাৎ আবার মনে হ'ল যে দুর্বিসহ দারিদ্র্যের চাপ, যে ব্যর্থতার গ্লানি তার স্বপ্নকে সফল হ'তে দিচ্ছে না, যা তাকে ভদ্রসমাজ থেকে দূরে টেনে' এনেছে, খাকি কোট প্যাণ্ট পরিয়ে এক অদ্ভুত জীব বানিয়েছে, তাতো দিবসের পক্ষে সত্য নয়; দিবসের স্বপ্ন হয়তো সফল হ'বে। দিবস তো দরিদ্র নয়।

"কিরে অমন করে' চেয়ে রইলি কেন? কিছু বল"—সামলে নিলে কিরণ পরমুহূর্তে। হেসে বললে—"কিন্তু রঞ্জনা কি মেসের চাকর দিবস চৌধুরীকে আমল দেবে?"

"দেবে না? দিলে কিন্তু বেশ হয়, নয়?"—দিবসের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আগ্রহ ফুটে উঠল যা অভূতপূর্ব বলে' ঠেকল কিরণের কাছে। দিবস কিরণের মুখের দিকে চকিতে চেয়ে আবার শুরু করল—"দেবে না কেন? সে কেবল মেসের চাকরিটাই দেখবে, আমাকে দেখবে না? লেখাপড়া শিখছে, মানুষের বাইরেটা যে সব নয় একথা সে বুঝবে না?"

"বোঝা শক্ত।"

এইটুকু বলে' কিরণ চুপ করে' গেল। তারপর হঠাৎ একটু অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে' উঠল, "উচিতও নয়। সত্যিই যে মোহিনী সে কেন বরণ করতে যাবে অসমর্থ দরিদ্রকে?"

"অর্থটাই বড় তাহ'লে তোর মতে?"

"বড় কি ছোট সে প্রশ্ন অবান্তর। ওর আধ্যাত্মিক যত ব্যাখ্যাই আমরা করি না কেন, অর্থটা প্রয়োজন। দরিদ্রের কোনও অধিকারই নেই প্রেমে পড়বার। সে বিয়ে করুক, কিন্তু প্রেমে পড়লেই তার দুর্গতি অনিবার্য; যাকে ভালবাসি তাকে—"

হঠাৎ থেমে গেল কিরণ। তারপর কথাটা ঘুরিয়ে একটু হেসে

বললে, "তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না। সোজা হ'বে জিনিসটা। মানাবেও। শখ করে' এ কৃচ্ছ্রসাধনের মানেটা কি তাও তো আমার মাথায় আসছে না।"

"তোর মাথায় এসেছে ঠিকই কিন্তু তুই সেটা মানতে চাইছিস না। তুইও মানতে চাইছিস না, আশ্চর্য লাগছে সত্যি। তুইও বুঝতে পারছিস না যে কর্মবিমুখতাই আমাদের আসল গলদ!"

রঞ্জনার কথা চাপা পড়ে' গেল।

দিবস বলতে লাগল, "আজ আমাদের কি দুর্দশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছিস না? কোথাও আমাদের স্থান নাই, সম্মান নেই। সবাই বলছে বাঙালীরা কেবল লম্বা লম্বা বুলিই আওড়াতে পারে, কাজ করতে পারে না কিছু। হ'তে পারে কেবল আপিসের কেরানী। আমাদের এ অপবাদ ঘোচাতে চাই আমি"—দিবসের গলাটা কেঁপে গেল একটু—"আমি হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতে চাই বাঙালীর ছেলেরা ইচ্ছে করলে সব করতে পারে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্থানও দখল করতে পারে; আবার দরকার হ'লে বাসনও মাজতে পারে, জুতোও বুরুষ করতে পারে।"

কিরণ বললে, "তোমার কিন্তু দরকার হয় নি।"

"হয় নি বলেই আমি সহজে পারব, এবং সেইজন্যেই এ আদর্শ সৃষ্টি করবার দায়িত্ব আমারই বেশী। দরকারের চাপে বাধ্য হ'য়ে মেসের চাকর হ'তে হ'বে যাদের তারা আমাকে দেখে প্রেরণা পাবে, তাদের আর লজ্জা করবে না। এই দেখ না পাঞ্জাবি বা কামিজের উপর ওয়েষ্টকোট এদেশে আগে খানসামারাই পরত, কিন্তু যেদিন থেকে পণ্ডিত জহরলাল একটু বদলে ওটাকে পরলেন, সেদিন থেকে ওটা জাতে উঠে গেল। ও-পোশাক আজ হেয় নয়, গৌরবের। বড় বড় নেতারা যখন জেলে গেল, তখন জেলই তীর্থস্থান হ'য়ে উঠেছিল, মনে নেই তোর?"

কিরণ চুপ করে' রইল ক্ষণকাল।

তারপর বললে, "বেশ ধরেই নিলাম না হয় যে আদর্শের প্রেরণায় কৃচ্ছ্রসাধন করাটা তোমার কর্তব্য, কিন্তু রঙ্গনাকে তার মধ্যে টেনে' আনতে চাইছ কেন? প্রেমকে যদি মহিমান্বিত না করতে পার তাহ'লে দরকার কি সেরকম প্রেমের!"

"তুই তাহ'লে বলছিস যে অর্থ ছাড়া আর কোনও মহিমা নেই?"

"অর্থাতীত যে মহিমা তা অসাধারণ লোকের থাকে। সাধারণ লোকের কাছে অর্থই মহিমালাভের উপায়। শুধু মহিমালাভের উপায় নয়, অতি সাধারণ দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য লাভেরও উপায়।"

"স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে যদি রোজগার করে তাহ'লে দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হ'বে না?"

"কিন্তু সেই স্ত্রী যদি তোমার প্রিয়া হয় তাহ'লে তাকে দিয়ে চাকরানির কাজ করানোটা কি তোমার ভাল লাগবে? সে যখন একটা কাপড় বা গয়না চাইবে, কিংবা তোমার নিজেরই যখন ইচ্ছে হ'বে তাকে একখানা ভাল শাড়ি বা গয়না দিতে, তখন মুদির দোকানের বিল আর বাড়িভাড়ার অঙ্ক যোগ করে' যদি দেখ তোমার সামর্থ্যে কুলুচ্ছে না তখন কি রকম লাগবে সেটা?"

"তোর মতে তাহ'লে বিয়ে করাই উচিত নয়?"

"বিয়ে করাটা প্রয়োজন, শখ নয়। বিয়ে তুমি একটা চাকরানিকেও করতে পার, তার সঙ্গেই চাকরের গৃহস্থালী জমবে ভাল। কিন্তু রঙ্গনাকে যদি চাও, রঙ্গনার মতো মর্যাদা দিতে হ'বে তাকে, আই মীন, আর্থিক মর্যাদা। তোমার নোংরা উঠোনের কোণে পুঁই-মাচা মানাবে, কিন্তু পারিজাত-কুঞ্জ মানাবে না। তার জন্যে নন্দন-কানন চাই।"

"বিশ্বাস করলাম না। বিশ্বাস করলাম না যে অপরের তৈরী নন্দন-কাননে আমার পারিজাত মর্যাদা পাবে। আমি নিজের শক্তিবলে আমার নিজের উঠোনকেই নন্দন-কাননে পরিণত করতে

যদি পারি তবেই আমার পৌরুষ সার্থক হ'বে, আর সেই পৌরুষই মর্যাদা দেবে আমার প্রিয়াকে।"

"মেসের চাকর হ'য়ে কতদিনে তুমি তোমার উঠোনকে নন্দন-কাননে পরিণত করতে পারবে মনে কর?"

"আমি যে বরাবর মেসের চাকর হ'য়ে থাকব এ প্রতিজ্ঞা তো করি নি। আমি বলছি, যে-কোনও কাজ করবার সামর্থ্য আমাদের অর্জন করতে হ'বে। কেবল কেরানীগিরি বা শৌখিন পেশাগুলি ছাড়া আমরা আর কিছু করতে অপারগ, আমাদের এই কলঙ্ক ঘোচাতে হ'বে। আমি তো ইতিমধ্যে একটা প্রাইভেট ট্যুশনি পেয়ে গেছি। আরও ভাল যদি কোনও রোজগারের পন্থা আবিষ্কার করতে পারি, মেসের চাকর থাকব কেন? কিন্তু আমি বাসন মাজতে বা কাপড় কাচতে পারব না, রিক্‌শ টানতে পারব না, কুলি হ'তে পারব না—অক্ষমতার এই অপবাদ সহ্য করব কেন আমরা?"

"আমাদের শক্তিতেই কুলোবে না! আমার পক্ষে তো রিক্‌শ টানা অসম্ভব।"

"শক্তিটা মনে, পেশীতে নয়। তাছাড়া পেশীরও তো অভাব দেখি না। স্কুলে, কলেজে, ক্লাবে, জিম্‌ন্যাসিয়ামে বাঙালী ছেলেদের স্বাস্থ্য-চর্চার তো খুব ধূম দেখি। মাসিকপত্র খুললেই বুক-ফোলানো বাইসেপ্‌স্‌-ফোলানো ছবি তো প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে রিক্‌শ টানে যে লোকটা তার অমন সুদৃশ্য পেশী নেই। আমরা স্বাস্থ্য-চর্চাটাও একটা 'ফ্লারিশ' করবার বস্তু করে' তুলেছি। ভাল পেশী-ওলা ছেলে-মেয়েদের ছবি ছাপা হোক তাতে আমি আপত্তি করছি না, কিন্তু সে পেশী যদি শেষ পর্যন্ত কলম-পেষাতেই পরিণতি লাভ করে তাহ'লে দুঃখ হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথাগুলো কি কেবল কেতাবেই নিবদ্ধ থাকবে?"

কিরণ একটু চুপ করে' থেকে উত্তর দিলে, "প্রত্যেক জাতেরই

একটা বিশিষ্টতা থাকে, বাঙালীরও সেটা আছে। আমরা শিল্পীর জাত, শিল্পীর সমস্ত রকম দোষগুণ তাই আমাদের মধ্যে বর্তমান। রিক্‌শ টেনে' বেড়ালে শিল্প সৃষ্টি করা যায় না। শিল্প সৃষ্টি করবার জন্মে ছুটি চাই, অবসর চাই। তাই আমরা চাকরি-প্রিয়। দশটা-পাঁচটা আপিস করি, বাকি সময়টা অবসর পাই, সে সময় যা-খুশী করি। এই যা-খুশী করবার স্বাধীনতাই শিল্পের জন্মদাতা। যারা সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত গদিতে বসে' পয়সার চিন্তা করছে কিংবা ভাত-কাপড়ের জন্ম অহরহ খেটে মরছে, তারা বড় শিল্পী হয় নি। হ'তে পারবেও না।"

"কিন্তু সমস্ত জাতটা যদি অলস হ'য়ে কেবল শিল্পেরই ধ্যান করে তাহ'লে তার মৃত্যুও অনিবার্য।"

চুপ করে' রইল দু'জনে খানিকক্ষণ।

তারপর কিরণ হেসে বললে, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে রঙ্গনা তোমার ওই খোলার ঘরে এসে থাকতে চাইবে না।"

"চাইবে না?"

"মনে তো হয় না!"

"কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করে যে চাইবে।"

"চাওয়াটা উচিত নয়।"

"তুই কিন্তু ওদের কাছে যেন আমার আসল পরিচয়টা বলিস না।"

"আমি যাই-ই নি সেখানে। সময় পাচ্ছি না।"

"আমারও যাওয়া হয় নি এখনও।"

"এইবার যাও।"

কিরণ মুচকি হাসলে। হাসিটা তার ম্লান দেখাল। ঊর্মির মুখটা তার মনে ভেসে' বেড়াচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। ঊর্মির চোখের ভাষাহীন নিবেদনকে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত করে' দিচ্ছিল কালো একখানা মেঘ। দারিদ্র্যের মেঘ। এই অস্বস্তিকর

অসংগতির স্পর্শে ম্লান হ'য়ে যাচ্ছিল তার হাসি। নিজেকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না সে।

দময়ন্তীর ছবি বগলে করে' রঙ্গনা যখন বাড়ি পৌঁছল তখনও গহনচাঁদ এবং চুনীলাল ফেরেন নি। মামীমা বাপের বাড়ি চলে' গেছেন, বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। বুড়ি ঝিটা বসে' আছে শুধু, তারই মুখে রঙ্গনা খবর পেলে যে মামা বাবাকে নিয়ে বিকাশবাবুর দাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেছেন তারই বিয়ের সম্বন্ধে। মুচকি হেসে ঝি বার্তাটি নিবেদন করলে। তারপর বললে—"তোমার খাবার ঢেকে রেখে' দিয়েছি টেবিলের ওপর। ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়ে থাকে তো ঠাকুরকে একটু গরম করে' দিতে বোলো। আমি চললুম এবার।"

"আচ্ছা।"

ঝি চলে' গেল। রঙ্গনা কাপড় ছাড়তে লাগল। একটু পরেই ফিরে এল আবার ঝি :

"বাইরে ডাকবাক্সে চিঠি ছিল দু'খানা।"

চিঠি দিয়ে ঝি চলে' গেল। দু'খানাই পোস্টকার্ডের চিঠি। একটা গহনচাঁদের। বিশ্বনাথ কথক কাশী থেকে লিখেছেন। বাড়ি বাঁধা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে। দলিল-পত্র নিয়ে তিনি নিজেই আসছেন। লেখাপড়া হ'য়ে গেলেই টাকা পেতে দেরি হ'বে না। দ্বিতীয় চিঠিখানা চুনীলালের। সেটিও ভ্রূকুঞ্চিত করে' পড়লে রঙ্গনা। কোন এক হরলালবাবু লিখেছেন—"লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে আপনি আমার টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। সত্যই তাহা যদি করেন তাহা হইলে আমাকে আর অনর্থক মকদ্দমার হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। উকিলের পরামর্শ লইয়া বুঝিয়াছি মকদ্দমায় আমি জিতিবই। কিন্তু অকারণ

টাকা ব্যয় করিতে চাহি না, কারণ এই টাকাটাও তো শেষ পর্যন্ত আপনার ঘাড়েই চাপিবে। আমি আপনার জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করিব জানাইবেন।"

চিঠি দু'খানা টেবিলে রেখে' দিয়ে রঙ্গনা ঢাকা দেওয়া খাবারটা খেয়ে নিলে। তার সমস্ত মনটা কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। চতুর্দিকেই কেবল অভাব আর অভাব। আনন্দের কোনও সুরই যেন জমছে না কোথাও। বারংবার তাল কেটে' যাচ্ছে। মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে ফুটতে না ফুটতেই। আজকালকার ওই রঙীন রবারের বেলুনগুলোর মতো। স্ফীত হ'য়ে উঠেছে বটে, আবেগভরে কিন্তু চুপসে যাচ্ছে পরমুহূর্তে। কেন এমন হয়—। মেঘের পর মেঘ এসে জমতে লাগল রঙ্গনার মনে।

অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘ কেটেও গেল আবার। টুলের উপর চড়ে' দময়ন্তীর ছবিটি টাঙিয়ে যেই নামতে যাবে অমনি হাত লেগে' পাশে টাঙানো আয়নাটা মেঝেতে পড়ে' টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল। ছবিটা কিনেই সে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হ'য়ে পড়েছিল, সেই ছবি টাঙাতে গিয়ে আবার আয়নাটা ভেঙে গেল! অনুশোচনা করবার কিন্তু সে সময় পেল না। ঠিক সেই মুহূর্তে দিবস এসে হাজির হ'ল। কিরণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রঙ্গনার কথাই ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছিল দিবস। রঙ্গনা কেবল আমার মেসের চাকরিটাই দেখবে, আমাকে দেখবে না ?—এই কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল তার। তারপর মনে হ'ল তার স্বরূপ জানবার সুযোগ তো রঙ্গনাকে সে দেয় নি এখনও। রঙ্গনা নিজে দু'বার তার বাড়িতে এসে যতটুকু পরিচয় পেয়েছে তার মূল্য কতটুকু। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তার মনে হ'ল রঙ্গনার বাড়ি গেলে হয়, ভাল করে' আলাপই তো করা হয় নি তার সঙ্গে। তাছাড়া সরোদ যদি শিখতেই হয় নিজের এবং গহনচাঁদবাবুর সুবিধা অনুযায়ী একটা সময়ও ঠিক করতে হ'বে। এই অজুহাতটাকে অবলম্বন করেই সে এসে হাজির

হয়েছিল এত রাত্রে। কিন্তু এসে যে সে এই পরিস্থিতিতে পড়ে' যাবে তা কল্পনাও করে নি। বাইরের ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে চলে' যাবে কিনা ভাবছিল। পরমুহূর্তেই ঝনঝন শব্দটা কানে আসতেই পাশের দরজা দিয়ে উঁকি দিলে সে এবং উঁকি দিয়েই দেখতে পেলে রঙ্গনাকে।

"কি হ'ল!"

"আপনি!" পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে রঙ্গনা বললে—"আসুন, বাবা, মামা কেউ বাড়ি নেই। বাইরের ঘরে বসি চলুন।"

বাইরের ঘরে গিয়ে দিবস বললে, "অত বড় আয়নাখানা কি করে' ভাঙল?"

"ছবি টাঙাচ্ছিলাম একটা, হঠাৎ টুলটা কেমন যেন নড়ে' উঠল, টাল খেয়ে পড়ে' যাচ্ছিলাম। পাশেই ছিল আয়নাটা, যেই ধরতে গেছি আর অমনি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে' গেল। অমন শখের আয়নাটা, ছি ছি, এমন কষ্ট হচ্ছে।"

দিবস চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ। তারপর তার মনে হ'ল তার এই অসময়ে আসার হেতুটা বলা উচিত।

"আমি জানতে এসেছিলাম, কখন এলে সরোদ শেখবার সুবিধে হ'তে পারে। আমার ছুটি দুপুরে ঘণ্টা দুই—বারোটা থেকে দুটো। আর রাত্রিতে আটটার পর। ও, টিউশনিটা যদি নি তাহ'লে আটটার পরও তো ছুটি থাকবে না—কখন আসব তাহ'লে—"

রঙ্গনা আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না।

"আচ্ছা, আপনি মেসে চাকরের কাজ করেন শুনলাম? সত্যি?"

"কে বললে আপনাকে!"

"সৌদামিনী। আপনার সব খবর পেয়েছি"—মুচকি হেসে বললে রঙ্গনা।

"তাতো জানতাম না"—দিবস কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

"সত্যি আপনি মেসের চাকর হ'য়ে আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমার বক্তৃতা তো শুনেছেন।"

ওদের আলাপ কিন্তু আর বেশীদূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না। গহনচাঁদ এবং চুনীলাল ঢুকলেন এসে। দিবসকে দেখে মহা খুশী হ'য়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ও তুমি এসেছ, ব'স ব'স ব'স। ভাবছিলাম তোমার কথা।"

চুনীলাল তির্যক দৃষ্টিতে দিবসের দিকে চেয়ে ভিতরের দিকে যাচ্ছিল, রঙ্গনা বললে, "তোমার চিঠি এসেছে একটা। বাবা তোমারও চিঠি আছে। কথকমশাই আসছেন।"

"তাই নাকি, চমৎকার সুখবর তো! কই চিঠি?"

"এই যে আনি।"

রঙ্গনা চলে' গেল পাশের ঘরে।

"আমি কখন সরোদ শিখতে আসব জানতে এসেছিলাম। আমার দুপুরে ঘণ্টা দুই ছুটি আছে। আপনি কি দুপুরে ঘুমোন?"

"না। তোমার যখন খুশী এস।"

রঙ্গনা চিঠিটা এনে আবদারের সুরে বললে, "একটা খুব অন্যায় কাজ করে' ফেলেছি বাবা। বল তুমি রাগ করবে না?"

"কি করলি আবার!"

"রাগ করবে না বল?"

গহনচাঁদ হেসে ফেললেন।

"আরে শুনিই আগে ব্যাপারটা কি।"

"আমার আয়নাটা পড়ে' ভেঙে গেছে। দময়ন্তীর একটা ছবি

কিনে এনে টাঙাচ্ছিলাম, হঠাৎ টাল খেয়ে পড়ে' যাচ্ছিলাম, আয়নাটা পাশেই ছিল, হাত লেগে' পড়ে' গেল।"

"ভাগ্যে তুই পড়ে' যাস নি! দময়ন্তীর ছবি কিনেছিস নাকি, কই, কোথায়?"

শিশুর মতো কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ও-ঘরে টাঙিয়েছি, দেখবে চল না।"

"আমি এখন চলি তাহ'লে। পরে আসব আবার"—দিবস উঠে পড়ল এবং গহনচাঁদকে নমস্কার করে' বেরিয়ে গেল।

গহনচাঁদ দময়ন্তীর ছবি দেখে খুব খুশী হ'লেন। বললেন, "যে ঘরে তোর সম্বন্ধ করছি, বাবা বিশ্বেশ্বর যদি মুখ তুলে' চান, দেখবি সেখানে কি বড় বড় সব অয়েল-পেন্টিং। বৈঠকখানাতে রবি বর্মার 'গঙ্গাবতরণ'খানা টাঙানো রয়েছে দেখলাম, কি ছবি সে, সমস্ত ঘরখানাকে যেন আলো করে' রেখেছে।"

"যারা অত পণ দাবী করে সেখানে আমি বিয়ে করব না বাবা। কথকমশাইকে তুমি লিখে দাও বাড়ি বাঁধা দিতে হ'বে না।"

"আরে, ক্ষ্যাপা না পাগল, টাকা খরচ না করলে কি মেয়ের বিয়ে হয় নাকি? সব জায়গাতেই টাকা লাগবে, ওই রেওয়াজ যে।"

"আমি তাহ'লে বিয়ে করব না"—গটগট করে' ঘর থেকে বেরিয়ে চলে' গেল রঙ্গনা।

"ও চুনী শুনছ, তুমি তো এদিকে মেয়ে দেখবার ব্যবস্থা করে' এলে, রঙ্গনা কি বলছে শোন—"

মেয়ের পিছু-পিছু তিনিও বেরিয়ে এলেন।

চুনীলাল ছাদে গিয়ে নির্জনে হরলালের চিঠিটা পড়ছিল মনোনিবেশ সহকারে। আজ বিকেলে অন্নদাও এসেছিল টাকার তাগাদা দিতে। সেইজন্যেই বিশেষ করে' জামাইবাবুকে (গহনচাঁদকে) নিয়ে চুনীলাল বিকাশের জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল আজ। বিয়েটা হ'য়ে গেলে তবেই সে বিকাশের কাছে

দোকান কেনার কথাটা উত্থাপন করবে। তার আগে ও-কথা পাড়াটা ভাল দেখায় না। অন্নদাকে সে স্তোক দিয়ে বিদায় করেছে আপাতত কিন্তু হরলালকে কি বলবে? হরলাল লোকটা নালিশ ঠুকে দিয়েছে তা গোবিন্দবাবুর মারফত শুনেছে সে, এবং টাকা দিতে না পারলে যে বিপদে পড়তে হ'বে এ আভাসও গোবিন্দবাবু দিয়ে গেছেন। টাকা সে দিয়ে দেবেও, কিন্তু দোকানটা বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত তো দেবার উপায় নেই, আর বিয়ে হওয়ার আগে দোকানের কথা পাড়াও যায় না বিকাশবাবুর কাছে।

অনেক ভেবে-চিন্তে চুনীলাল শেষকালে চিঠির উত্তর না দেওয়াটাই স্থির করলে। বেশী ধরপাকড় করলে বলা যাবে চিঠি পাই নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হরলাল রেজিষ্টার্ড চিঠি লিখবে উইথ্ একনলেজ্মেণ্ট ডিউ, কিন্তু ততদিন তো সময় পাওয়া যাবে!

দিবস চলে' আসার পর কিরণ বসেই রইল চুপ করে' অনেকক্ষণ। মনস্তত্ত্বের যে বেড়াজালে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করেছিল সে, তার থেকে সে কিছুতেই বেরোতে পারছিল না। পৌরুষের অভিমান, দারিদ্র্যের বাধা, কল্পনার স্বপ্নলোক, উর্মির আকর্ষণ, কর্তব্যের তাগিদ এর কোনটাকেই সে উপেক্ষা করতে পারছিল না। অকস্মাৎ রামের বনবাসের সংবাদে লক্ষ্মণের মনে নানারকম বীর-ভাবের উদয় হয়েছিল—লক্ষ্মণ রামকে পিতৃ-আজ্ঞা অমান্য করতে প্ররোচিত করেছিল, প্রজাদের রাজদ্রোহী করে' তোলবার সংকল্প ব্যক্ত করেছিল, দশরথকে বধ করবার জন্যেও প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রামের সঙ্গে বনেই গেল। কিরণের জীবনেও উর্মির আবির্ভাবে নানাবিধ ভাব উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল তেমনি। কিন্তু সে ঠিক করে' উঠতে পারছিল না কি করবে। অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে' থেকে সে শেষকালে আর একটা কবিতা লিখে ফেললে—

তুমি ধরার ধূলিতে এসে ফোট না।
ওগো, নন্দন-কাননের ফুল,
ওগো নন্দন-কাননের ফুল
ওগো অনিন্দ্য গন্ধ-আকুল
ছাড়িয়া মন্দাকিনী কূল
তুমি ধরার ধূলিতে এসে ফোট না।
শোন মর্ত্যের বনে শাখে শাখে
ডাকিছে বকুল যূথী চম্পা।
মুগ্ধ কবির হিয়া ডাকে
ওগো, কর কর কর অনুকম্পা।
ওগো নন্দন-কাননের ফুল
ওগো আকাশ-কুসুম-সমতুল
ডাকিছে তোমারে অলিকুল
তুমি ধরার ধূলিতে এসে ফোট না।

কবিতাটা লিখে সে খানিকটা তৃপ্তি পেলে যেন। একটু আগে সে নিজেই দিবসের সঙ্গে তর্ক করছিল যে নোংরা বাড়ির উঠোনে পারিজাতকুঞ্জ মানাবে না কিন্তু কবিতার মাধ্যমে সে নন্দন-কাননের ফুলকে ধরার ধূলিতে এসে ফোটবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে অবর্ণনীয় আনন্দ লাভ করলে। পরমুহূর্তেই তার মনে হ'ল কাল উর্মি এসে এটাও হয়তো ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, রঞ্জনাকে দেবে সুর বসাতে, তারপর চেষ্টা করবে যাতে এটাও গ্রমোফোন কোম্পানিরা নেয়। তার আয় বাড়াবার জন্যে উর্মির চেষ্টার অন্ত নেই। উর্মির মুখটা মনে পড়ল, জীবন্ত মুখে সজীব চোখ দুটো যেন নাচছে, আর তার সঙ্গে নাচছে তার কানের দু'পাশের অলকগুচ্ছ।

নয়

যদিও দু'জনে একই সময়ে একই হাউসে রোমিও জুলিয়েট দেখতে গিয়েছিল, তবু দিবসের সঙ্গে রঞ্জনার দেখা হয় নি। দেখা হ'ল সিনেমা ভাঙবার পর রাস্তায়। রঞ্জনাই প্রথমে কথা কইল।

"ও, আপনিও এসেছিলেন! ভারি চমৎকার, না?"

"সুন্দর! কি সুন্দর অভিনয় দেখেছেন ওদের, নিখুঁত একেবারে।"

মিনিটখানেক নীরবে হাঁটার পর রঞ্জনা প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, করুণ বিয়োগান্ত নাটক দেখে আমরা আনন্দ পাই কেন বলুন তো?"

"সত্য বলে'। শোক, দুঃখ, বিরহ, ব্যথা এ সবই সত্য। যা সত্য তাতেই আনন্দ পাই আমরা।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটল।

"আপনি হেঁটে যাবেন নাকি? আপনার বাসা তো অনেক দূর এখান থেকে"—রঞ্জনাই প্রশ্ন করলে।

"কম রোজগার করি, হেঁটেই যেতে হ'বে। তুমি কি বাসে উঠবে? তুমি বলে' ফেললুম, মাপ করবেন।"

"তাতে কি হয়েছে, আপনি বয়সে, শুধু বয়সে কেন, সব বিষয়েই আমার চেয়ে বড়। এখন থেকে 'তুমি'ই বলবেন।"

"বেশ। বাসে যদি যেতে চাও, চল তোমাকে উঠিয়ে দিই। ওই দিকে চল তাহ'লে।"

"না, চলুন আমিও হেঁটে যাই।"

"সেই ভাল। গল্প করতে করতে চলে' যাওয়া যাবে।"

তারা যখন হাঁটছিল তখন একটা ধাবমান ট্যাক্সি থেকে গোবিন্দ সাণ্ডেলের বন্ধু জগমোহন সেন যে এদের দেখে চলে' গেলেন তা এরা টের পেল না। জগমোহন দিবসকে চিনতেন, কিন্তু দিবস যে বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করেছে এ খবর জানতেন না। জানলে ট্যাক্সি থামাতেন হয়তো তিনি। কয়েকদিন পরে গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখে

খবরটা শুনে' অবাক্ হ'য়ে গেলেন এবং বললেন যে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন দিবসকে একটি মেয়ের সঙ্গে— ।

কিছুক্ষণ হেঁটে একটু হেসে রঙ্গনা বলল, "আপনি একটা মেসের চাকর একথা কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করে না।"

"কেন ?"

"কেমন যেন বাধে।"

"কেন বাধে বল তো"—পরমুহূর্তেই আবেগ সঞ্চারিত হ'ল দিবসের কণ্ঠস্বরে—"এযুগের ছেলেমেয়ে আমরা, বাইরের তুচ্ছ ঐশ্বর্যকে আমারও যদি বড় করে' দেখি—"

"ঐশ্বর্যকে খুব বড় করে' দেখা অন্যায়, কিন্তু দারিদ্র্যও কি ভাল ?"

"অপরের উপার্জিত অর্থে আস্ফালন করা কি তার চেয়েও খারাপ নয় ?"

"অপরের মানে ?"

"নিজের বাবারও যদি হয় তা-ও আস্ফালন করার মধ্যে গ্লানি নেই কি ?"

"তা বলে' ভদ্রলোকের ছেলে মেসের চাকর হ'বে ?"

"আপিসের চাকর হওয়ার বেলায় তো এ আপত্তি ওঠে না ?"

"ওঠে না, কারণ সমাজে ওঠা চলে' গেছে।"

"এটাও চালিয়ে দিলে চলে' যাবে। মহাত্মাজি থার্ড ক্লাসে চড়ার পর থেকে থার্ড ক্লাসের অসম্মান ঘুচে গেছে যেমন।"

এর উত্তরে রঙ্গনা যা বললে তা যুক্তিযুক্ত নয় মোটেই, সে নিজেও যে সেটা না বুঝল তা নয়, কিন্তু তবু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "এসব কথা কিন্তু মেসের চাকরের মুখে বড্ড বেমানান ঠেকছে যাই বলুন।"

"যদি মোটা মাইনের বড় দরের চাকর হ'তাম তাহ'লে ঠেকত না, নয় ?"—হেসে জবাব দিলে দিবস।

"আপনি একটা আদর্শ সৃষ্টি করবার জন্যে এ কাজ করছেন তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু সবাই কি আপনার আদর্শ নেবে মনে করছেন? আমাদের দেশে তো আদর্শের অভাব নেই, মহাপুরুষেরও অভাব নেই, কিন্তু ক'টা লোক মানছে সে-সব? আপনার মাঝ থেকে শুধু কষ্ট করাই সার হ'বে।"

"তুমি 'গীতা' পড়েছ কখনও?"

"না।"

"পড়লে বুঝতে পারতে কেন আমি এ কাজ করছি।"

"কেন বলুন তো?"

"আমরা যদিও মনে করি যে 'আমি এটা করছি', 'আমি ওটা করছি' আসলে কিন্তু আমি কিছু করছি না, করবার ক্ষমতা নেই আমার, আমার ভিতর থেকে কে যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। সেই 'কে'টা পরমাত্মা, না বিবেক, না ভগবান, না শিক্ষা তা জানি না। তার নির্দেশ অনুসরণ করা ছাড়া কিন্তু গতি নেই। সেই 'কে'টাই আসল মালিক। সুতরাং—"

মুচকি হেসে রঞ্জনা বললে, "আমি জানি সে 'কে'।"

"কে বল তো?"

"বললে রাগ করবেন না তো?"

"না, রাগ করব কেন!"

"আপনার অহংকার।"

অপ্রত্যাশিত কথাটা শুনে' দিবস মনে মনে একটু থমকে গেলেও হেসেই জবাব দিলে, "তাই যদি হয়, তবু সেই অহংকারের নির্দেশই মানতে হ'বে আমাকে।"

"সেটা কি ভাল?"—রঞ্জনার চোখে হাসি চিকমিক করে' উঠল। ওই হাস্যদীপ্ত দৃষ্টির আলোকে আসল রঞ্জনার খানিকটা যেন চকিতে দেখা গেল। ক্ষণিকের জন্য দিবস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ল। রঞ্জনার বিচার যে ঠিক একথা তার নিজেরও মনে হ'ল

এবং মনে হওয়ামাত্র আদর্শের হিমালয়টা হঠাৎ বল্মীকস্তূপে পরিণত হ'য়ে গেল তার চোখের সামনে। তবু কিন্তু জবাব দিতে ছাড়ল না সে। অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবেই সে বললে, "ভাল মনে করি বলেই তো করছি।"

"মেসের চাকর থেকে আপনি সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন?"

"না পারার কোনও হেতু দেখছি না।"

"একটা কথা জিগ্যেস করছি, মাপ করবেন। বিয়ে হয়েছে কি আপনার?"

"না।"

"ও তাই"—হেসে ফেললে রঞ্জনা।

"আমি যদিও বিয়ে করি নি, কিন্তু মেসের চাকররা তো হরদম বিয়ে করছে এবং বেশ সুখেই আছে।"

"দরকার নেই আমার অমন সুখে"—বলে' ফেলেই রঞ্জনা বুঝতে পারলে যে বেঁফাস হয়েছে কথাটা। কানের পাশটা গরম হ'য়ে উঠল তার এবং যদিও সে ঠিক করেছিল যে দিবসের সঙ্গে হেঁটেই যাবে বরাবর কিন্তু মত বদলে ফেললে হঠাৎ।

"আর হাঁটতে পারছি না, একটা ট্যাক্সি ডাকুন।"

কথাটা বলেই কিন্তু অনুতপ্ত হ'ল রঞ্জনা। ট্যাক্সি করে' গেলে এখনই অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে আবার। সংগীত-ভবন খুলে' যে ক'টা টাকা চুনীলাল পেয়েছে তা রঞ্জনার কাছেই আছে। তার থেকেই সে ছবি কিনেছে। আয়নাও কিনতে হ'বে একটা, আবার ট্যাক্সি করে' গেলে—।

"ট্যাক্সি?"

"থাক না হয়, চলুন।"

"কাছে পিঠে ট্যাক্সি তো দেখতেও পাচ্ছি না।"

কিছুদূর গিয়েই কিন্তু ট্যাক্সি দেখা গেল একটা এবং দিবস হাত তুলতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা।

"থামালেন কেন, হেঁটেই যাই চলুন।"

"না, তোমার কষ্ট হচ্ছে যখন, দরকার কি।"

ট্যাক্সিটা কাছে আসতে কিন্তু দেখা গেল যে ড্রাইভারের পাশে ওড়না-পরা একটি তরুণী বসে' রয়েছে। শুধু তাই নয়, তরুণীটি অপ্রত্যাশিতভাবে দিবসকে সেলামও করলে। দিবস প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু আর একটু কাছে গিয়ে চিনতে পারলে। দিন কয়েক আগে যে বেদের মেয়েটি কিরণের বাড়ির কাছে নাচছিল, যাকে একটা টাকা দিয়েছিল সে, এ সেই। চোখে সুর্মা আর গায়ে ওড়না দিয়ে নূতন শ্রী খুলেছে। মেয়েটিকে সেলাম করতে দেখে' রঙ্গনারও বিস্ময় কম হয় নি।

"মেয়েটি আপনাকে চেনে দেখছি।"

দিবস রঙ্গনার কথার জবাব না দিয়ে সেই মেয়েটিকেই বললে, "ও চিনতে পেরেছি তোমাকে, তুমিই সেদিন রাস্তায় নাচছিলে না?"

"জী হাঁ। মগর অব ম্যয় নহী নাচতী হুঁ"—মেয়েটি হেসে জবাব দিলে এবং ড্রাইভারকে দেখিয়ে বললে—"ড্রাইভার সাব নে মুঝকো আপনী বিবি বানা লিয়া"—তারপর গ্রীবাভঙ্গি করে' ড্রাইভারের দিকে চেয়ে হাসলে।

"বাঃ"—বেশ খুশী হ'য়ে উঠল দিবস। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বলল, "আমি একটা ট্যাক্সি ভেবে তোমাদের দাঁড় করিয়েছিলাম। আচ্ছা, তোমরা যাও, খুব খুশী হ'লাম। এদিকে ট্যাক্সিও তো দেখছি না।"

"চলিয়ে ম্যয় আপকো পৌঁছা দুঁ। কিতনী দূর যাইয়ে গা?"

"শ্যামবাজার।"

"আ যাইয়ে।"

সারাটা রাস্তা রঙ্গনা আর একটি কথা বলল না। দিবসও না। পাশাপাশি নীরবেই বসে' রইল দু'জনে। দু'জনের মনে কিন্তু একই কথা জাগছিল। দু'জনেই ভাবছিল—'হেরে গেলাম'।

দিবসের সম্বন্ধে ব্রজ যে খবরটা পেয়েছিল তা সূর্য চৌধুরীরও অজ্ঞাত রইল না। দিবস একটা মেসে সামান্য চাকর হ'য়ে আছে এ খবরে চৌধুরীমশায় বেশ বিচলিত হ'লেন একটু। বিচলিত হ'লেও বাইরে কিন্তু তা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। ব্রজ এবং গোবিন্দ সাণ্ডেল দু'জনের কাছেই তিনি 'ও-নিয়ে-আমি-মাথা-ঘামাতে-চাই না-মোটেই' গোছের যে ভড়ংটা করেছিলেন তা ত্যাগ করে' ছেলের জন্য দাপাদাপি করে' বেড়াতে তাঁর লজ্জা করছিল। দ্বিতীয়ত দাপাদাপি করাটা নিরর্থকও মনে হচ্ছিল তাঁর। ঠিকানা না পেলে কোথায় তিনি ছুটোছুটি করবেন। তৃতীয়ত তাঁর বিশ্বাস ছিল দিবস কখনই এমন কিছু করবে না যা লজ্জাকর। সত্যিই মনে মনে তিনি প্রত্যাশা করছিলেন যে দিবসের ভবিষ্যৎ আচরণ তাঁর মুখরক্ষা করবে। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে জোর গলায় তিনি বলতে পারবেন—"দেখলে ? আজকালকার ছেলেদের তুমি যা মনে কর তা নয় তারা।"

তবু তিনি বার কয়েক ট্রাম-ডিপোয় গিয়ে কিরণকে ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ধরতে পারলেন না।

নিস্তারিণীও গিরিবালার দেখা পেলে না, তার ঠিকানাও মনে করতে পারলে না। তবে সে বলেছে গিরিবালার ঠিকানা সে থাকোর কাছ থেকে যোগাড় করতে পারবে। থাকোর সঙ্গে গিরিবালার খুব ভাব। থাকোর ঠিকানা নিস্তারিণী জানে, সেখানে গিয়েওছিল, কিন্তু থাকো তার মাসীর বাড়ি গেছে। বর্ধমান জেলার কোন এক গ্রামে তার মাসী থাকে। দিন পনের পরে সেখান থেকে ফিরবে থাকো। তখন গিরিবালার ঠিকানা পাওয়া যাবে।

সুতরাং নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করা ছাড়া ব্রজর আর গত্যন্তর রইল না।

গভীর রাত্রে নিজের নির্জন ঘরটিতে একা জেগেছিল রঞ্জনা।

ঊর্মি যে গানটা তাকে দিয়ে গিয়েছিল তাতেই সুর দিচ্ছিল সে গুন-গুন করে'। নিজের অন্তরের যে আকুলতাকে কিরণ দিয়েছিল ভাষা, রঙ্গনার অন্তরের আকুলতা সুর দিচ্ছিল তাতে। গভীর নিশীথের অন্তরালে তার অন্তর যেন ধরতে চাইছিল সেই অধরাকে, যে স্বপ্নে দেখা দেয় কিন্তু বাস্তবে ফোটে না। ফোটে না সে জানে, তবু গাইছিল—

শোন মর্ত্ত্যের বনে শাখে শাখে
ডাকিছে বকুল যূথি চম্পা।
মুগ্ধ কবির হিয়া ডাকে
ওগো, কর কর কর অনুকম্পা।

দশ

সে যে অহংকারবশেই এত কাণ্ড করেছে রঙ্গনার কাছে একথাটা শুনে' এবং স্বীকার করে' দিবস যে দমে' যায় নি তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার আত্ম-জিজ্ঞাসাও জেগেছিল একটা। সভায় দাঁড়িয়ে যে আদর্শ সেদিন সে প্রচার করেছিল সে আদর্শকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও একথা তার মনে হচ্ছিল যে রিসার্চ করবার সুযোগ পেলে এ নিয়ে সে এত হৈ চৈ করত না। শুধু তাই নয়, তার বাবা যদি তাকে কলেজে যাবার জন্যে সেদিন অমন করে' না বকতেন, তাহ'লেও হয়তো করত না। দু'দিন পরে হয়তো সে কলেজে যেতও। সত্যিই যেন এক টুকরো খড়-কুটোর মতো ভেসে' চলেছি আমরা অদৃশ্য এক স্রোতে, কোথা থেকে এক একটা ঢেউ আসছে আর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের নব নব দেশে—এই ধরনের দার্শনিক কথাই মনে

হচ্ছিল তার। রঙ্গনার সঙ্গে আকস্মিক দেখা এবং ক্রমশ মাখামাখি হওয়াটাকেও সে যদিও আর একটা অদৃশ্য তরঙ্গাঘাতের ফল স্বরূপই মনে করছিল, তবু কিন্তু নিজের সঙ্গে বিচিত্র বোঝাপড়াও চলছিল তার অহরহ। রঙ্গনাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে কল্পনা করে' তার মানস-নয়ন যেমন স্বপ্নাতুর হ'য়ে উঠেছিল তেমনি জাগ্রত হ'য়ে উঠেছিল তার অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী মনও। সে যেন স্বপ্নটাকেই যাচিয়ে দেখবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল। গোপনে গোপনে যে আদর্শের ধ্বজাবাহকরূপে সে রঙ্গনার সামনে নিজেকে প্রকট করে-ছিল, রঙ্গনা যদি সেই ধ্বজাটাকে দেখে' বিগলিত হ'য়ে পড়ত তাহ'লে হয়তো রঙ্গনার প্রতি তার আকর্ষণটা কমেই যেত। রঙ্গনা তার আদর্শটা মানুক এ অবশ্য সে চাইছিল, আদর্শটা সে সত্যি সত্যি মানবে কি না তা নির্ধারণ করবার জন্যে তার সঙ্গে আরও তর্ক করতেও প্রস্তুত ছিল সে, কিন্তু প্রতিবাদ করাতে সে চমৎকৃত হ'য়ে গিয়েছিল। সাধারণ মেয়ে হ'লে 'বাহবা' দিত তাকে। সে তার আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল বলেই দিবসের অন্তরতম সত্তা যেন তাকে চুপি চুপি বলছিল—তোমার আদর্শের বিরুদ্ধবাদিনী হ'য়েও ও তোমাকে যদি চায়—। এর পর আর ভাবতে পারছিল না সে, আশা করতে পারছিল না। আদর্শটাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' থাকবে সে ঠিক করে' ফেললে, অন্য কোনও কারণে নয়, আদর্শের বিরোধ সত্ত্বেও রঙ্গনা তাকে চায় কি না এইটে দেখবার জন্যে। তার এক্‌স্‌পেরিমেন্টলোলুপ মন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠল।

যে ছাত্রটি অঙ্ক পড়তে চেয়েছিল দিবস তার সঙ্গে দেখা করে' দুপুরে পড়াবার ব্যবস্থা করে' ফেললে তার পরদিনই। ছেলেটি বা তার গার্জেনরা আপত্তি করলে না এতে। সুতরাং মেসের কাজ-কর্ম সেরে' সন্ধ্যা আটটার পর গহনচাঁদের বাড়িতে সরোদ শিখতে আসার আর কোন বাধা রইল না।

সন্ধ্যার পর গহনচাঁদের বাড়িতে গানের আসর খুব জমে' উঠেছিল সেদিন। নবাগতা ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে যে ইমনের গৎটা গহনচাঁদের কাছে পেয়েছিল সেইটেই একযোগে বাজাচ্ছিল সেতার আর এস্রাজে। চমৎকার লাগছিল। গহনচাঁদ চোখ বুজে বসে' শুনছিলেন। রমজান আর সীতারাম আনন্দে বিভোর হ'য়ে বাজিয়ে চলেছিল। চুনীলাল বারান্দায় ওৎ পেতে বসেছিল পূর্ববৎ, যদি কোনও নূতন ছাত্র বা ছাত্রী আসে এই আশায়। তার মনেও ইমন সাড়া তুলেছিল, নিজের অজ্ঞাতসারেই তার পায়ের আঙুল-গুলো গতের সঙ্গে তাল রাখছিল। খানিকক্ষণ বেজে গৎ থেমে গেল। চুনীলালেরও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা। কই, আজ আর নূতন কেউ এল না তো!

"আমার নাচটা দেখবেন আজ আর একবার?"

"বেশ তো।"

সবাই সরে' বসল। মেজের উপর খড়ি দিয়ে আঁকা হ'ল ময়ুর। ঊর্মি নাচতে লাগল। গহনচাঁদ মুখে নাচের বোলগুলো বলতে লাগলেন। রমজান সীতারাম বাজাতে শুরু করল আবার। দেখতে দেখতে জমে' উঠল। সত্যিই চমৎকার নাচছিল ঊর্মি। বারান্দায় উপবিষ্ট চুনীলালও পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে সে কথা স্বীকার করলে মনে মনে।

ঊর্মির নাচ শেষ হ'তে গহনচাঁদ বললেন, "হয়েছে অনেকটা, এইবার আবীর নিয়ে এস একদিন। দেখা যাক আবীরের উপর ময়ুর ফোটাতে পার কিনা।"

"রঙ্গনাদিকে আজ দেখছি না"—ঊর্মিই জিগ্যেস করলে প্রথমে।

"পড়াশোনা করছে বোধ হয় ভিতরে। চুনী, রঙ্গনা কোথায়?"

চুনীলাল জানে রঙ্গনা কেন ভিতরে বসে' আছে। সীতারাম রমজানও জানে। রঙ্গনা প্রসঙ্গ ওঠাতে তাদের চোখে চোখে একটা কথা হ'য়ে গেল। চুনীলাল রঙ্গনাকে যখন বকছিল তখন তারা

বারান্দায় বসে' তা শুনেছিল। গহনচাঁদ তখন বাড়ির ভিতরে আহ্নিক করতে ব্যাপৃত ছিলেন বলে' শুনতে পান নি। চুনীলালের ব্যবহারে সীতারাম রমজান দু'জনেই মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। না হয় একটা আয়না অসাবধানে ভেঙেই ফেলেছে তার জন্যে অত বকুনি কেন!

চুনীলাল ভিতরে আসতেই গহনচাঁদ আবার প্রশ্ন করলেন—"রঙ্গনাকে আজ দেখছি না? পড়াশুনা করছে নাকি?"

"না, তার রাগ হয়েছে। আয়না ভাঙার কথা বলেছিলাম বলে'। এমন বিশেষ কিছুই বলি নি—এই এঁরা তো ছিলেন—"

সীতারাম এবং রমজান কিন্তু উভয়েই আড়চোখে চুনীলালের দিকে চেয়ে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাতে চুনীলালকে থেমে যেতে হ'ল।

"আরে, একটা আয়না ভেঙেছে তো কি হয়েছে, ডেকে নিয়ে এস ওকে, বুঝলে?"—গহনচাঁদ বললেন হেসে—"ডাক—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ যাই।"

চুনীলাল চলে' গেল। অকারণে কিংবা কেবল যে আয়না ভাঙার জন্যে চুনীলাল রঙ্গনাকে বকেছিল তা নয়। সংগীত-ভবনের টাকা খরচ করে' রঙ্গনা ছবি কিনেছে, সিনেমা দেখেছে, ট্যাক্সি চড়ে' এসেছে, গিরিডি যাবে বলে' বায়না ধরেছে। যাবেও, ছাড়বে না। আয়নাটা দু'দিন পরে কিনলেও তো চলে। চুনীলাল নিজের হাড় বা মাংসের কথা আর চিন্তাই করছিল না, সে-সব তো বহুদিন আগেই গেছে, অবশিষ্ট আছে শুধু চামড়াখানা, সেইটেকেই প্রাণপণে বাঁচাবার চেষ্টা করছে চুনীলাল। কিন্তু তা-ও বাঁচান যাবে না, ওই চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে তবে এরা ছাড়বে। এই ধরনের চিন্তা করতে করতে চুনীলাল বাড়ির ভিতর গেল। গিয়ে দেখলে রঙ্গনা নিজের পড়ার ঘরে খিল দিয়ে বসে' আছে। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইল চুনীলাল। চোখ দুটো চকচক করতে লাগল।

"রঙ্গনা, জামাইবাবু ডাকছে তোকে।"

ভিতর থেকে কোনও সাড়া এল না।

"বেশ তো, কাল আয়না কিনেই আনিস। আমি কি কিনতে মানা করেছি তোকে—এই রঙ্গনা, শুনছিস ?"

"তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

চুনীলাল ভ্রূকুঞ্চিত করে' আরও ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন দরজাটার দিকে। তারপর ছাদে চলে' গেলেন নির্জনে বিড়িটি ধরিয়ে চিন্তা করবার জন্যে।

একটু পরে রঙ্গনা যখন বাইরে এল তখন তার মুখ দেখে মনে হ'ল না যে একটু আগে তার মনে তুফান বইছিল। সপ্রতিভ মুখে মৃদু হেসে সে বললে, "আমাকে ডাকছিলে বাবা ?"

"কি করছিলি ভিতরে ?"

"পড়ছিলাম।"

"ঊর্মি খুঁজছে তোকে।"

"সেই গানটার কথা জিগ্যেস করছিলাম। কালকেরটা নয়, সেই সেদিন যেটা দিয়েছিলাম—"

"ও, সেটার সুর বসিয়েছি একটা। বাবাকে এখনও শোনানো হয় নি।"

"শোনা তাহ'লে।"

রমজান এবং সীতারাম রঙ্গনাকে দেখেই অকারণ পুলকে পুলকিত হয়েছিল মনে মনে। তাদের উদ্ভাসিত মুখে সে ভাবটা ফুটে উঠলেও কিন্তু নীরব ছিল তারা। গানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়াতে সীতারাম আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না।

"হাঁ হাঁ গাইয়ে গাইয়ে, শুনা যায়।"

"জরুর"—রমজানও সায় দিলে সোৎসাহে।

রঙ্গনা বসল। গহনচাঁদ স্নেহভরে চেয়ে রইলেন তার দিকে। আশ্চর্য, এর মধ্যেই গানে সুর দিতে শিখেছে! সেদিনকার সে

গানটাতে বেশ চমৎকার সুর দিয়েছিল। রঙ্গনা হার্মোনিয়মটা টেনে' নিয়ে বাজাতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাজিয়ে গহনচাঁদের দিকে চেয়ে বলল, "আমার লজ্জা করছে এত লোকের সামনে গাইতে।"

"লজ্জা কি! সবাই তো ঘরের লোক। সেদিন কনফারেন্সে অত লোকের সামনে গাইলি—"

"ভাল হয় নি সুরটা।"

"শুনিই না।"

রঙ্গনার সত্যিই গান গাইতে ইচ্ছে করছিল না। মনের ভিতর কি যেন একটা তোলপাড় করছে—যা অযৌক্তিক কিন্তু অনিবার্য, যা সে বলতে পারছে না কিন্তু অনুভব করছে। কয়েকদিন থেকেই মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য জাল যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে, তাকে ধরা পড়তেই হ'বে, তার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা চিন্তা কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় যূপকাষ্ঠে বাড়িয়ে দিতেই হ'বে গলাটা। নারীর স্বাধীনতা নেই—বাল্যে পিতামাতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন হ'য়ে থাকাটাই তার জীবনের চরম সার্থকতা। এদেশের সবাই একথা মেনেছে, তাকেও মানতে হ'বে। প্রতিটি পয়সার জন্য তাকে হাত পাততে হ'বে অপরের কাছে—।

ঘাড় হেঁট করে' অনেকক্ষণ ধরে' হার্মোনিয়ম বাজিয়ে তার পরে গানটা ধরলে সে। গানটা ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তার মনের রং বদলে গেল। কিরণের কবি-মন যে আশার রঙে আলোকিত হ'য়ে উঠেছিল, যে রঙ সে তার গানের প্রতিটি কথায় মাখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, সেই রঙ রঙ্গনার মনেও সঞ্চারিত হ'ল। কিরণের গানের কথাগুলো তারই মনের কথা হ'য়ে উঠল যেন। আবেগভরে প্রাণ দিয়ে সে গাইতে লাগল—মিথ্যা জেনেও স্বপ্নটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইল।

কার ডাকে ওগো কার
তিমির রজনী শেষে
খুলিছে উষার দ্বার।
সুর জাগে মনে মনে
রঙ লাগে বনে বনে
কার কর-পরশনে
কাঁপিছে বীণার তার।
কমল কলির দলে
জাগে সুরভির আশা
আঁধারের বুকে জ্বলে
কোন্ সে আলোর ভাষা
বিজন পথের বাঁকে
এলো কে চিনি না তাকে
সহসা কাহার ডাকে
ঘুম ভাঙে তমসার।

"চমৎকার হয়েছে! বাঃ—"

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে' উঠলেন গহনচাঁদ। সীতারাম ও রমজানও প্রায় সমস্বরে বলে' উঠল—"সাবাস!"

ঠিক এই সময় দিবসও এসে হাজির হ'ল দ্বারপ্রান্তে। তার হাতে সরোদ। বাইরে কার দিকে চেয়ে যেন সে বললে—"ওটা বাইরেই থাক। দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে' দাও। এই নাও তোমার ভাড়া।"

একটি কুলি-জাতীয় লোককে পয়সা দিয়ে দিবস ঘরে এসে ঢুকল।

"ও, তুমি, এস এস। আর একটু আগে এলে রঞ্জনার সুর দেওয়া চমৎকার গান একটা শুনতে পেতে। এস, ব'স।"

গহনচাঁদের আহ্বানে দিবস হাসিমুখে এসে বসল সপ্রতিভ-ভাবে। কিন্তু মনে মনে তখনও সে উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। কারণ যে এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা সে করতে যাচ্ছিল তার ফলাফলটা কি হ'বে তা তখনও অনিশ্চিত ছিল তার কাছে।

দিবস আসাতে অন্যান্য ছাত্রীরা ভাবল এইবার বোধ হয় সরোদের ক্লাস আরম্ভ হ'বে। তাছাড়া তাদের সকলের যাওয়ার সময়ও হয়েছিল, একে একে চলে' গেল সবাই। উর্মিও রঙ্গনাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে' কি বললে (খুব সম্ভবত এই গানটাও যাতে রেকর্ড হয় সেই সম্বন্ধে কিছু একটা) তারপর চলে' গেল। উর্মি চলে' যাবার পর বারান্দার দেওয়ালে ঠেসানো প্রকাণ্ড আয়নাটা রঙ্গনার চোখে পড়ল।

"আয়নাটা কার? আপনি এনেছেন নাকি?"—ঘরে ঢুকে দিবসের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে রঙ্গনা।

"হ্যাঁ।"

তারপর গহনচাঁদের দিকে ফিরে বললে, "আপনাকে কিন্তু অনুমতি দিতে হ'বে।"

"কিসের?"

গহনচাঁদের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

"সেদিন দেখে' গেলাম রঙ্গনা তার আয়নাটা ভেঙে ফেলেছে, আমি তাকে একটা আয়না কিনে দিচ্ছি, এতে আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।"

"না না, আপনি কেন—এ অন্যায় কিন্তু—"

এই পর্যন্ত বলেই রঙ্গনা থেমে' গেল।

গহনচাঁদ হাসিমুখে চুপ করে' রইলেন ক্ষণকাল, তারপর বললেন —"তুমি দিতে চাইছে দাও, আপত্তি করব না। কিন্তু তুমি যদি মনে কর যে এইভাবে বাঁকা পথে আমাকে প্রণামী দেওয়া হ'ল, তাহ'লে ভুল করবে। সত্যিই যদি আমার শিষ্য হ'তে চাও

তাহ'লে একটা কথা জেনে রেখ, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক প্রাণের। ওতে কোনরকম ভেজাল চলবে না।"

"সে তো ঠিকই। আমি সেভাবে আনি নি। আমি—"

গহনচাঁদের পরবর্তী প্রশ্নে আয়না-প্রসঙ্গ চাপাই পড়ে' গেল।

"তুমি সরোদ কি বাজিয়েছ আগে?"

"মাস ছয়েক সেধেছি।"

"শোনাও দেখি একটু।"

দিবস সরোদটা বাঁধতে লাগল। এই আয়নার ব্যাপারে একটা ঘটনা কিন্তু ঘটে' গেল যা সকলের চোখ এড়িয়ে গেলেও সামান্য নয় খুব। রমজান এবং সীতারাম উভয়েই দিবসের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব সশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়ল। তারা মুখে যদিও কিছু বলল না, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল সে ভাষা। তারা দিবসের সম্বন্ধে কিছু না জেনেও কৃতনিশ্চয় হ'ল যে ছেলেটি 'রইস্' অর্থাৎ অভিজাত-বংশীয়। তাদের শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় আরও বেড়ে গেল একটু পরে দিবস যখন সরোদে বসন্ত আলাপ শুরু করলে। দিবস যে এমন চমৎকার সরোদ বাজাতে পারবে তা গহনচাঁদও প্রত্যাশা করেন নি। খুব খুশী হ'য়ে উঠলেন তিনি। রঙ্গনারও নিশ্চয় ভাল লাগত, কিন্তু সে উঠে গিয়েছিল। দিবসের সামনে বসে' থাকতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল সে। উঠে গিয়ে সে ঘরে খিল দিয়েছিল আবার। আর একটি ঘটনাও ঘটল নেপথ্যে। বিড়িটি শেষ করে' ছাদ থেকে নেমে এসে চুনীলালও আয়নাটি দেখতে পেলে বারান্দায়। 'ও, এর মধ্যেই কেনা হ'য়ে গেছে' এই ভাষা ফুটে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। বাইরের ঘরে বসন্তের গৎ খুব জমে' উঠেছে তখন। চুনীলাল একবার উঁকি মেরে দেখলে কে বাজাচ্ছে। দিবসকে দেখে' মনটা আরও অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠল তার। ও, সেই ধূর্ত ছোকরা এসেছে দেখছি, ওকে দিয়েই রঙ্গনা আয়নাটা আনিয়েছে ঠিক। একটি পয়সা খরচ না করে' ওস্তাদ হ'তে চায়

ছোকরা—এই ভাবটা মনের ভিতর খেলে' যেতেই বসন্তের সমস্ত মাধুর্য ব্যর্থ হ'য়ে গেল তার কাছে। সক্রোধে আর একটা বিড়ি বার করে' দেশলায়ের উপর সেটা ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেল সে রাস্তায়।

বসন্তের গৎ শেষ হ'তেই গহনচাঁদ সীতারাম এবং রমজান তিনজনেই সমস্বরে বাহবা দিয়ে উঠলেন। গহনচাঁদ সোৎসাহে বললেন, "ছ'মাসের মধ্যে বেশ তো দখল হয়েছে তোমার। হ'বে, চেষ্টা করলে ভাল হাত হ'বে তোমার। দরবারি কানাড়া জান?"

"না।"

"ওই গৎটা তাহ'লে শেখ। রঙ্গনার খাতায় টোকা আছে। রঙ্গনা কোথা গেলি। রঙ্গনা, ও রঙ্গনা—"

"যাই—"

নেপথ্যে রঙ্গনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

রঙ্গনার খাতা থেকে গৎটা টুকে নাও, তারপর আমি বাজিয়ে দেখিয়েও দেব।

রঙ্গনা এসে হাজির হ'ল।

"তোর খাতায় দরবারি কানাড়ার যে গৎটা টোকা আছে সেটা এঁকে দে তো।"

দিবস বললে, "আমি সঙ্গে কোনও খাতা তো আনি নি, কাল এসে টুকে নিয়ে যাব।"

"কাল যে আমি গিরিডি যাচ্ছি।"

"ও, কালই গিরিডি যাবি নাকি তোরা?"—গহনচাঁদ প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ"—তারপর দিবসের দিকে চেয়ে রঙ্গনা বললে, "খাতাটা আপনি না হয় নিয়ে যান।"

"সেই ভাল। টুকে দিয়ে যাব।"

রঙ্গনা খাতা আনতে ভিতরে চলে' গেল আবার।

"তুমি কি কর?"—হেসে প্রশ্ন করলেন গহনচাঁদ।

"চাকরি।"

"ও।"

এর বেশী আর কিছু জানবার কৌতূহল হ'ল না তাঁর। দিবস সুরজ্ঞ এবং ভদ্রলোক, এর বেশী আর কোনও পরিচয়ের প্রয়োজনই ছিল না তাঁর। রঙ্গনা ফিরে এল একটু পরে।

"এই নিন"—খাতাটা দিয়েই চলে' গেল সে।

খাতাটা নিয়ে দিবস গহনচাঁদকে বললে, "আজ তবে উঠি?"

"এস।"

দিবস বেরিয়ে যেতে রঙ্গনাও ভিতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল আর একটা দ্বার দিয়ে।

"আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

তড়িৎস্পৃষ্টবৎ ফিরে দাঁড়াল দিবস।

"কি কথা?"

"আপনি বড় লোকের ছেলে, ইচ্ছে করলেই একটা আয়না কিনতে পারেন তা মানছি। কিন্তু সে ইচ্ছেটা আপনি এমনভাবে আস্ফালন করবেন তা প্রত্যাশা করি নি। আয়নাটা ফিরিয়ে দিয়ে আমি আপনাকে অপমান করতে চাই না। শুধু একটা অনুরোধ করছি, উপহার দেবার ছুতোয় আমাদের দারিদ্র্যকে এমনভাবে আর উপহাস করবেন না।"

কথাগুলো বলেই চলে' গেল রঙ্গনা।

স্মিতমুখে দিবস খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। একটা অবর্ণনীয় আনন্দে তার সমস্ত মন যেন পাখা মেলে উড়ছিল। তার এক্স্‌পেরিমেণ্ট সফল হয়েছে! না, রঙ্গনা আজকালকার মেয়েদের মতো হ্যাংলা নয়, তার আত্মসম্মানবোধ আছে। আয়নাটা পেয়ে সে খুশী হয় নি, ক্ষুব্ধ হয়েছে এই আনন্দে মশগুল হ'য়েই সে সমস্ত রাস্তাটা হয়তো চলে' যেত। কিন্তু পরের

মোড়েই দেখা হ'য়ে গেল চুনীলালের সঙ্গে। দিবসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই চুনীলাল দাঁড়িয়ে ছিল ওৎ পেতে।

"শিখলেন সরোদ ?" হাসিমুখেই এগিয়ে এল চুনীলাল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নিমেষের মধ্যে দিবসের মনে পড়ে' গেল আগের দিনের ঘটনাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত পুরে সে মনিব্যাগটা বার করে' ফেললে।

"আপনার আপিসে এসে মাইনে জমা করা হ'য়ে উঠবে না। এখনই টাকাটা নিয়ে নিন। রসিদটা পরে না হয় নিয়ে নেব আপনার কাছ থেকে। দশ টাকা করে' মাইনে তো ? অ্যাডমিশন ফীও লাগে নাকি কিছু ?"

চুনীলাল এটা প্রত্যাশা করে নি। একটু থতমত খেয়ে' গেল। এত দ্রুতবেগে একটা লোকের সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তন করতে সে চায়ও না, অভ্যস্তও নয়।

"দাঁড়ান"—ভ্রূকুঞ্চিত করে' চকিতে সে একবার দিবসের মুখের দিকে চাইলে, তারপর একটু হেসে বললে—"দাঁড়ান, দাঁড়ান। হয়তো আপনিই আমার কাছে পাবেন কিছু। আয়নাটা তো আপনি এনেছেন, কত দাম নিলে ?"

"ওর দাম দিতে হ'বে না। ওটা আমি রঞ্জনাকে দিলুম।"

"দিলেন ? মানে ?"

চুনীলালের দুই ভ্রূর মাঝখানে চার-পাঁচটা গভীর রেখাপাত হ'য়ে গেল। ছোকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে মাইনে দিতে চাইছে, আয়নার দাম নিতে চাইছে না, সেদিন রঞ্জনার সেতারের দামটাও দিয়েছিল নাকি।—যে সন্দেহটা এক্ষেত্রে অভিভাবক-শ্রেণীর লোকেদের স্বভাবতই হওয়া উচিত তা যে চুনীলালের হ'ল না তা নয়, কিন্তু বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সেটাকে খুব বেশী আমল দেওয়াও সংগত মনে হ'ল না তার। চুপ করে' চেয়ে রইল সে।

দিবস হেসে বললে, "মানে-টানে কিছু নেই। আমার সামনেই আয়নাটা ভেঙে গেল সেদিন, এমনি দিলাম তাই—"

"ভালই হ'ল"—চুনীলালও হেসে জবাব দিলে—"সামনেই ওর বিয়ে তো, কাজে লেগে' যাবে!"

"বিয়ে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

চুনীলাল আর একবার চাইলে দিবসের মুখের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে'। কিন্তু এমন কিছুই দেখতে পেলে না যা সন্দেহজনক।

"দশ টাকা দেব? না আরও কিছু লাগবে?"

"না, দশ টাকাই।"

টাকাটা দিয়ে নমস্কার করে' দিবস চলে' গেল। নোটটা হাতে করে' তার প্রস্থান-পথের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুনীলাল। তার হঠাৎ কেমন যেন আশা হ'ল, মনে হ'ল মেঘ কেটে' যাচ্ছে বোধ হয়, এইবার সুরাহা মিলবে একটা।

দিবসের ঠিকানাটা পাওয়া গেলে কি ভাবে অগ্রসর হ'বেন তা মনে মনে এঁচে রেখেছিলেন সূর্য চৌধুরী। ব্রজ বা নিস্তারিণীর উপর তিনি নির্ভর করছিলেন না ঠিক—যদিও সেদিক থেকেও ঠিকানাটা পাবার সম্ভাবনা ছিল—তিনি আশা করছিলেন কিরণ এসে তাঁকে ঠিকানাটা দিয়ে যাবে। কিরণের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ একদিন রাস্তায় অপ্রত্যাশিতভাবেই দেখা হয়েছিল। কিরণের কাছ থেকে যে উত্তরটা তিনি পেয়েছিলেন তা-ও অপ্রত্যাশিত। তবু তিনি প্রত্যাশা করছিলেন। কিরণকে যখন তিনি জিগ্যেস করলেন—"দিবস কোথায় থাকে জানো?"

কিরণ উত্তর দিলে—"হ্যাঁ জানি।"

"ঠিকানাটা দাও তো।"

ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে কিরণ একটু হেসে বললে, "মাপ করবেন আমাকে। তার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তার ঠিকানা আপনাকে জানাব না। তার সঙ্গে দেখা হ'লে ফের তাকে জিগ্যেস করব, সে যদি আপত্তি না করে তাহ'লে ঠিকানাটা জানিয়ে আসব আপনাকে।"

"বেশ!"

আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে' এর বেশী আর কিছু বলা চলে না। একটু হেসে উকিল সূর্য চৌধুরী একটি টোপ শুধু ফেলে এসেছিলেন।

"তাকে বোলো যে তার যাতে মন্দ হয় এমন কিছু কখনও করি নি, এখনও করবার ইচ্ছে নেই। তবে তোমাদের চেয়ে আমাদের বয়স বেশী, অভিজ্ঞতাও বেশী। আমাদের অভিজ্ঞতা যদি তোমরা মূল্যহীন বলে' মনে কর, নিও না। কিন্তু তার জন্যে ঘর-ছাড়া হবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। নূতন যুগের নূতন আদর্শ সত্যিই যদি যুগান্তকারী হয় তা মেনে নিতে আমার অন্তত কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্যে এমন একটা বেয়াড়া কাণ্ড করবার দরকার কি? আমি তার বাবা এটা সে ভুলে যাচ্ছে কেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। আমি বুঝিয়ে বলব তাকে।"

কিরণ যখন চলে' গেল তখন তার উপর গভীর একটা শ্রদ্ধা হ'ল সূর্য চৌধুরীর। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে কিরণ নিশ্চয়ই দিবসকে বুঝিয়ে বলবে এবং ঠিকানাটা দিয়ে যাবে। অবশ্য একটা ভয় তাঁর ছিল। কিরণের কাছে যে যুক্তিটা তিনি দিয়েছিলেন সেটা এত দুর্বল যে তা বলতে নিজেরই বাধছিল তাঁর, দিবসের কাছে ও-যুক্তি কি টিকবে? অত বড় ঐতিহাসিক সব উদাহরণ রয়েছে—বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, তাঁরা আদর্শের জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, একথা দিবসের মনে পড়ে' যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া দিবস যে কেন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে তা কি তিনি জানেন না? ঝরণা যে কারণে পাহাড়

ফেটে বেরোয় দিবসও সেই কারণে বেরিয়ে গেছে—প্রিয়বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলকে আসল কারণটা প্রথম দিনই তিনি বলেছিলেন। ও যে এখন কি করবে, কোথায় যাবে, কোন্ রাস্তা নেবে তা নিজেই বোধ হয় ও জানে না। বেগটাই ওর প্রধান সম্বল এবং সেটা দুর্বার। এ সবই তিনি জানেন। তবু সেদিন ওই দুর্বল যুক্তিটা তিনি কিরণের কাছে পেশ করেছিলেন, ইচ্ছে করেই পেশ করেছিলেন, তার কারণ ওকালতি করতে করতে এ অভিজ্ঞতাটা তাঁর হয়েছে যে অতিশয় দুর্বল যুক্তিও অনেক সময় বড় বড় জাঁদরেল হাকিমের মন টলিয়ে দেয় যদি তা আঁতে ঘা দিতে পারে। এই কথাগুলো হয়তো দিবসের আঁতে ঘা দিতে পারবে। এ শুনে' দিবস হয়তো ফিরেও আসতে পারে। ফিরে যদি না আসে ঠিকানাটা জানাতে অন্তত তার আপত্তি হ'বে না। আর একটা বিচিত্র ব্যাপারও ঘটছিল তাঁর মনে। সূর্য চৌধুরীর মনের একটা অংশ যদিও সাগ্রহে কামনা করছিল যে দিবস ফিরে আসুক, আর একটা অংশ কিন্তু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল যে বিদ্রোহী দিবস এমন একটা কিছু করে' ফেলুক যাতে গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখটি চুন হ'য়ে যায়। সেই 'এমন একটা কিছু' যে ঠিক কি জাতীয় জিনিস হ'বে তা সূর্য চৌধুরীর কল্পনাতীত ছিল, কিন্তু তা যাই হোক মহিমাময় যেন হয় এই তিনি আকাঙ্ক্ষা করছিলেন সর্বান্তঃকরণে। তাকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে চ্যুত করবার ভয় দেখালেই সে সুট সুট করে' ফিরে আসবে গোবিন্দ সাণ্ডেলের এই ধারণাকে ভূশায়ী করে' দেবার মতো একটা জোরালো প্রমাণ তিনি আশা করছিলেন দিবসের আচরণ থেকেই। দিবস তাঁর এ আশা কি পূর্ণ করবে? যদি না-ও করে—(তাঁর উকিল-মন অন্যান্য সম্ভাবনাগুলোর সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না)—তাহ'লে ঠিকানা পাওয়ার পর কি করবেন তা তিনি মোটামুটি ভেবে রেখেছিলেন। ব্রজ তাঁকে যতটা নিশ্চিন্ত ভাবছিল ততটা নিশ্চিন্ত তিনি ছিলেন না। দিবস মেসে যে একটা

সামান্য চাকর হ'য়ে আছে এ খবর বিশ্বাসই করছিলেন না তিনি, খবরটা নিতান্তই বাজে উড়ো-খবর মনে হচ্ছিল তাঁর। দিবস অনায়াসেই একটা টিউশনি জুটিয়ে নিতে পারবে, আর কিছু না পারুক, সে মেসের চাকর হ'তে যাবে কেন? কিন্তু দিবসের বক্তৃতার কথাগুলো মনে পড়ে' মাঝে মাঝে আবার সন্দেহও হচ্ছিল। কি জানি কিছুই বলা যায় না—! ঠিক খবর না পাওয়া পর্যন্ত এ সংশয়ের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। ঠিকানা না পেলে ঠিক খবরও পাওয়া যাবে না। তিনি ভেবে রেখেছিলেন ঠিকানা পেলে তিনটি উপায়ের একটি অবলম্বন করবেন। প্রথম চিঠি লেখা যেতে পারে। কিন্তু এই চিঠি লেখা ব্যাপারটায় খুব বেশী উৎসাহ পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর উকিল-বিবেকের সঙ্গে আত্মসম্মানবোধ মিলে গোপনে গোপনে নিরুৎসাহিত করছিল তাঁকে। লিখিত কিছু করাটা উচিত হ'বে কি না দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে ভাবছিলেন তিনি। আবেগের মুখে বা অনবধানতাবশত এমন কিছু হয়তো লিখে ফেলতে পারেন যার জন্যে পরে অনুতাপ করতে হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, সেখানে যাওয়া যেতে পারে, নিজেই যেতে পারেন তিনি। কিন্তু এইখানেও একটা ভয় ছিল তাঁর, যদিও এই ভয়টার বিরুদ্ধে নিজের সঙ্গেই তর্ক করছিলেন তিনি—(দিবসের মতো ছেলে তাঁকে কি অপমান করতে পারে, এ কি সম্ভব !)—তবু ভয়টা ছিল এবং তার মূলে ছিল ওই আত্মসম্মান-বোধ। তৃতীয়ত, নিজে না গিয়ে অপর কাউকে পাঠানো যেতে পারে। কাকে পাঠাবেন তা-ও নির্বাচন করে' রেখেছিলেন মনে মনে। ব্রজ কিংবা গোবিন্দ সাণ্ডেলকে নয়। কারণ প্রথমত এ দু'টি লোকের কাছে দিবসের সম্বন্ধে যে আপাত-ঔদাসীন্য তিনি বহাল রেখেছেন তা ক্ষুণ্ণ হ'বে, দ্বিতীয়ত এদের মধ্যে যে-কোনও একজন গেলে উদ্দেশ্যটিও ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। দিবস যদিও বা আসত এদের জন্যেই আসবে না। প্যাচপেচে ভাবোচ্ছ্বাস দিবস সহ্য করতে পারে না একেবারে। ব্রজ হয়তো গিয়ে বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে' এমন

কাঁদতে শুরু করে' দেবে যে দিবসকে সরে' পড়তে হ'বে বাধ্য হ'য়ে। ঠিকানাই বদলে ফেলবে হয়তো আবার। আর গোবিন্দ সাণ্ডেলকে দেখলে তো বদলে ফেলবেই। সুতরাং এই দু'টি লোক যদিও হিতৈষী এবং সহজলভ্য, তবু এদের দিবসের কাছে পাঠাবার কথা চিন্তাও করলেন না তিনি। তিনি তাঁর ভাগ্নে ঘণ্টুর কথা ভেবে রেখেছিলেন। ঘণ্টু আজকালকার ছেলে, দিবসের প্রায় সমবয়সীও। তাকে পাঠালে বরং কাজ হ'তে পারে। ঘণ্টুকে চিঠি লিখলেই সে আসবে। কিন্তু তাঁর নিজেরও যেতে ইচ্ছে করছিল মাঝে মাঝে। এ বিষয়ে এখনও মতিস্থির করতে পারেন নি বলেই ঘণ্টুকে চিঠি লেখেন নি।

সূর্য চৌধুরীর মানসিক পরিস্থিত যখন এই ধরনের অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান তখন গোবিন্দ সাণ্ডেল যে খবরটি আনলেন তাতে দোলাটা থেমে' গেল হঠাৎ।

"শুনেছ হে, যা ভেবেছিলাম আমি ঠিক তাই!"—এই গৌরচন্দ্রিকা করে' গোবিন্দ সাণ্ডেল ঢুকলেন এসে।

"কি?"

"যা বলেছিলাম তাই। একটি আধুনিক মেয়েকে নিয়ে তোমার আধুনিক ছেলে রাতদুপুরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়।"

"কে বললে তোমাকে?"

"জগু সেন। স্বচক্ষে দেখেছে।"

"ভুল দেখেছে।"

"জগু সেন ভুল দেখবার লোক নয়। সে স্পষ্ট দেখেছে দিবস একটি মেয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করতে করতে চলেছে ফুটপাথের উপর দিয়ে।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল সবিস্তারে এবং সালঙ্কারে বর্ণনা করলেন ঘটনাটির। শুনে' অনেকক্ষণ চুপ করে' রইলেন সূর্য চৌধুরী। তারপর মৃদু হেসে পা দুলিয়ে বললেন, "বিশ্বাস করলুম না।"

"দেখ, জেগে যে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙানো শক্ত। জগু সেনের কথা অবিশ্বাস করবার মানে? তাকে তুমি মিথ্যেবাদী বলতে চাও?"

"না, জগু সেন হয়তো ঠিকই দেখেছে। ঘটনাটা হয়তো ওই, কিন্তু তুমি ওতে রঙ চড়িয়ে যেটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ সেটা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।"

"তা না করবারই বা হেতু কি?"

"যথেষ্ট প্রমাণ নেই। তাছাড়া দিবসকে আমি চিনি।"

"তাহ'লে আমার আর বলবার কিছু নেই। আমি উঠলুম।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল বাড়ি গেলেন না। তিনি গেলেন বেলেঘাটার একটা মেসে। তাঁর এক দূর সম্পর্কের শালা তাঁকে বলেছিল যে বেলেঘাটার ঐ মেসটা নাকি যত ফেপারি লোকের আড্ডা। যদি দিবসকে সেখানে পাওয়া যায় এই আশায় গেলেন তিনি সেখানে। কিন্তু সেখানে যে যাচ্ছেন তা সূর্য চৌধুরীকে বলে' গেলেন না। গোবিন্দ সাণ্ডেলও বন্ধুর প্রতি কর্তব্যবোধে দিবসকে খুঁজছেন রোজই। কিন্তু গোপনে গোপনে। তাঁরও কেমন একটা রোক চড়ে' গিয়েছিল ভিতরে ভিতরে। ছেলেটাকে খুঁজে বার করতেই হ'বে।

গোবিন্দ সাণ্ডেল চলে' গেলে সূর্য চৌধুরী ঘণ্টুকে আসবার জন্যে চিঠি লিখলেন।

গভীর রাত্রি। দ্বিতলের একটা ঘরে গহনচাঁদ একা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। আলো জ্বেলে রঞ্জনা সন্তর্পণে এসে ঢুকল। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ঘুমন্ত পিতার মুখের দিকে। শান্ত প্রসন্ন মূর্তি।

"বাবা!"

"কে, ও রঞ্জনা, কি?"

"তোমার কাছে কিছু টাকা আছে কি?"

"কেন, ক'টাকা চাই, টাকার কি দরকার এত রাত্রে ?"

"এখন দরকার নেই। কাল সকালে তো আমি গিরিডি যাব—তাই—"

"ও। চুনী বলেছিল টাকা দিয়ে দেবে সে।"

"মামার কাছ থেকে টাকা নেব না আমি।"

"কেন, কি হ'ল, ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?"

রঙ্গনা হাঁটু গেড়ে বিছানার পাশে বসে' বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

"এই দেখ, এই দেখ, কি হয়েছে বল্ না ?"

রঙ্গনা কিন্তু কিছুই বলল না, নিজের কাছে সে নিজেই অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিল। গিরিডি যাওয়াটা এমন বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয় যার জন্যে এত হাঙ্গামা করতে হ'বে। কলেজের মেয়েরা আমোদ ক'রে যাচ্ছে, সে-ও যাবে বলেছে। মামা আরবার বোলপুর যেতে আপত্তি করেন নি তো। এখন দোকানটা ফেল পড়ার পর থেকে কেমন যেন হ'য়ে গেছেন। মামীমা রাগ করে' চলে' গেছেন বাপের বাড়ি। মামা এবারও টাকা দিতে চাইছেন কিন্তু সে নেবে না। আয়নার কথা অমনভাবে বলছেন কেন তিনি ? সে কি দিবসবাবুকে আয়না আনতে বলেছিল ? খানিকক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে থেকে রঙ্গনা অবশেষে উঠে দাঁড়াল।

"কি হয়েছে ব্যাপারটা ?"

"থাক আর টাকা চাই না। গিরিডি যাব না।"

"ক'টা টাকা চাই তোর ?"

গহনচাঁদ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

"আর টাকার দরকার নেই। গিরিডি নাই গেলাম। কথা রাখতে পারলাম না বলে' মেয়েরা একটু ঠাট্টা করবে, তা করুক।"

"টাকা দিচ্ছি তোকে। ক'টা টাকা চাই বল্ না। আবার চুপ করে' আছে ! কত চাই ?"

"গোটা পনের হ'লেই হ'বে।"

"আমার কাছে দু'খানা দশ টাকার নোট আছে, তাই নিয়ে যা।"

"নাই গেলাম।"

"না না, যা। সবাই মিলে আমোদ করে' ঠিক করেছিস যখন, যা। কাল সকালেই গাড়ি নাকি?

"হ্যাঁ।"

সহসা রঙ্গনা গহনচাঁদের গলা জড়িয়ে ধরে' তাঁর কোলে বসে' কাঁধে মাথা রাখলে। গহনচাঁদ দু'হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে' বলে' উঠলেন, "দেখ, দেখ পাগলীর কাণ্ড দেখ। তুই কি আর ছোট আছিস যে কোলে নেব?"

একটু পরে রঙ্গনা নেমে গেল। নিচের ঘরে, দিবসের দেওয়া আয়নাটায় নিজের প্রতিফলিত মূর্তির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নিজের চেহারা দেখছিল না, দিবস তাকে কি চক্ষে দেখছে তাই কল্পনা করছিল সে। দিবসের চক্ষে সে কি কেবল এই দেহটা? না, আর কিছু? তার অসংখ্য সংগত-অসংগত দাবির ফর্দ কি দিবস কল্পনা করেছে কোনও দিন? দুঃসময়ে তাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য আছে কি তার? পরমুহূর্তেই তার মনে হ'ল এ ধরনের চিন্তা কেন আসছে মনে! দিবস তো এমন কিছুই প্রকাশ করে নি যা—ছি, ছি, ভারি অন্যায়। লজ্জিত হ'য়ে ছুটে' চলে' গেল সে পাশের ঘরে।

দিবস এবং রঙ্গনার আলাপ যে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, উর্মির মুখে এই সংবাদ পেয়ে কিরণ খুব গম্ভীর হ'য়ে গেল। রঙ্গনাকে আয়না কিনে দিয়েছে একটা? যে আদর্শের ধ্বজা বহন করে' সে গৃহত্যাগ করে' এসেছে, (একমাত্র পুত্র হ'য়েও পিতার মনে অত বড় আঘাত হানতে ইতস্তত করে নি) সে আদর্শের সঙ্গে এ ঘটনাটা ঠিক

খাপ খাচ্ছে না তো। কৃচ্ছ্রসাধনের আগুনে কর্মযজ্ঞ করবার এই কি নমুনা? কিরণের গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মুচকি হেসে ঊর্মি বললে—"কেমন লোক দেখুন তো দিবসবাবু, যে-ই রঙ্গনাদিকে ভাল লেগেছে, অমনি একটি আয়না কিনে দিলেন। আর আপনার জন্যে আমি এত করে' মরছি আপনি তো সামান্য মাথার কাঁটাও কিনে দেন নি আমাকে একটা।"

ঊর্মির এই উক্তির অন্তরালে যে মিনতি প্রচ্ছন্ন ছিল তা কিরণের কাছে প্রচ্ছন্ন রইল না। একটু হেসে সে চেষ্টা করলে সেটাকে আরও প্রচ্ছন্ন করে' দিতে।

"অতএব বোঝা যাচ্ছে তোমাকে আমার ভাল লাগে নি।"

"মিথ্যুক কোথাকার।"

হাসি উপচে পড়ল ঊর্মির চোখ থেকে। সে হাসির প্রত্যুত্তরে কিরণকেও একটু হাসতে হ'ল। পরমুহূর্তেই কিন্তু সে গম্ভীর হ'য়ে গেল আবার। দীনতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এই গাম্ভীর্যটাই তার স্বাভাবিক মুখভাব হ'য়ে গেছে। শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্য ক্ষেত্রে যেমন নানারকম কৌশল অবলম্বন করা হয় কিরণ তেমনি খাড়া করেছিল এই বিষণ্ণ গাম্ভীর্যটা। পরাজয়ের গ্লানিটা সে বুঝতে দেবে না কাউকে। অন্তরের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিরুদ্ধ করে' ক্ষুরধার সংকীর্ণ পথে আত্মোপলব্ধির দিকেই হয়তো অগ্রসর হচ্ছে সে, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক আনন্দ সে পাচ্ছে না কিছুতেই। আধিভৌতিক অভাবের তাড়নায়, অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অনলে সব পুড়ে যাচ্ছে। সে জীবনকে স্থূলভাবেই উপভোগ করতে চায় (বৈদান্তিক বুলি সে মাঝে মাঝে আওড়ায় বটে, কিন্তু তা তার অন্তরের নিগূঢ় সত্তার আকূতি হয় নি এখনও), ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যেই প্রাণপণ করছে সে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে পশুর মতো তা সংগ্রহ করতে তার বাধছে। স্বল্প শিক্ষার আলো-আঁধারিতে আত্মসম্মানটাকেই সে লাঠির মতো আঁকড়ে ধরে' আছে। যখন-তখন

আস্ফালনও করছে সেটা। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে' এ বাজারে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করা যে অসম্ভব এ-ও সে বুঝছে এবং যতই বুঝছে ততই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারিদিকে, ততই সে আস্ফালন করছে ওই আত্মসম্মানের যষ্টিটা। মানসলোকের এই অন্ধকারেই বাস তার। এই অন্ধকারেই সে কল্পনায় স্বপ্নময় কাব্যলোকও সৃষ্টি করেছে। উর্মিকে সে পেতে চায় এই কাব্যলোকের মানস-বিহারেই। উর্মি নিজে যদিও বাস্তব জগতে তার পাশে এসে দাঁড়াতে রাজি আছে কিন্তু তার এ অধঃপতন কিরণ কল্পনা করতে চায় না। সে জানে বাস্তবের উর্মিকে পরিপূর্ণভাবে পাবার ক্ষমতা তার নেই। উর্মি কাছে এলে সে তাই বিব্রত হ'য়ে পড়ে। তার মুখের দিকে ভাল করে' চাইতেও ভয় হয় তার। উর্মি যে নিজেকে অবনত করে' ধূলিতে নেমে আসতে চাইছে এর ইঙ্গিতও সে উর্মির আচরণে দেখতে চায় না; অথচ দেখতে লোভও হয়। আর একবার আড়চোখে চাইলে সে উর্মির দিকে, দেখলে উর্মির হাসিমাখা চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তখনও। কিরণ কেমন যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল একটু। তার মনে হ'ল কিছু একটা বলা উচিত।

"আমি গরীব মানুষ, তোমাকে দেবার মতো জিনিস কোথায় পাব বল?"

"বাজে কথা বলবেন না। দেবার মতো জিনিস কেবল বাজারেই পাওয়া যায় বুঝি?"

কিরণ উর্মির মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হ'য়ে গেল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখের হাসিতে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে যেন।

"আমি চললুম।"

পরমুহূর্তেই চলে' গেল উর্মি। কিরণ বসে' রইল চুপ করে'। আত্মসম্মানের লাঠিটা সবলে চেপে ধরে' অনেকক্ষণ বসে' রইল সে। তারপর দিবসের কথা মনে পড়ল। প্রাণের প্রাচুর্যে দিগ্বিদিক-

জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কি কাণ্ডটাই ও করছে! রঙ্গনার সঙ্গে আলাপ হ'তে না হ'তেই তার প্রেমে পড়ে' গেল, আবার প্রেমে পড়তে না পড়তেই উপহার নিয়ে ছুটোছুটি করছে। না,—মনে মনে মাথা নাড়লে কিরণ—এ ধরনের আচরণ তার কাছে প্রত্যাশা করে নি সে, এ আচরণ প্রশংসনীয়ও নয়। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল সূর্য চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা। শুধু তাই নয়, দিবসের ঠিকানাটা এবং দিবসের এই সব আচরণ তাঁকে জানানো বন্ধু হিসেবে তার কর্তব্য কিনা এ-ও সে চিন্তা করতে লাগল। তার এ চিন্তার উৎস নিছক বন্ধু-প্রীতি বা অবচেতন মনের ঈর্ষা যাই হোক, চিন্তাকে বেশীক্ষণ কিন্তু আমল দিলে না সে। ঠিক করে' ফেললে দিবসের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সে কিছু করবে না। তাকে না জানিয়ে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করাটা অনুচিত হ'বে। তাছাড়া এ বিষয়ে তার বক্তব্যটা শোনা উচিত রইকি। চেয়ার থেকে উঠে সে ক্যাম্প-চেয়ারটায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে শুয়ে রইল চুপ করে'। তার মানস-নয়নের সম্মুখে রঙ্গনা আর দিবসের ছবিটা ফুটে উঠল পাশাপাশি। দিবস যেন আবেগভরে কি বলে' চলেছে, অবনতমুখী রঙ্গনা শুনছে যেন বসে', তার মুখে সরমস্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল উর্মি যেন আড়ি পেতে শুনছে সব, তার চোখে-মুখেও একটা দুষ্টু হাসি ঝলমল করছে। উর্মির সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চোখাচোখি হ'য়ে গেল। চোখাচোখি হ'তেই উর্মির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে, চোখের কোণে টলমল করতে লাগল অশ্রু।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে শুয়েই রইল সে।

এগারো

উপর্যুপরি কয়েকদিন সৌদামিনীর সঙ্গে দিবসের দেখাই হয় নি। দিবস ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত্রি দশটা-এগারোটার পর, অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে না সৌদামিনী। পটলির স্বামীর অসুখ কিন্তু বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ, সৌরেন ডাক্তার আরও দু'একবার এসে দেখে' গেছেন, ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছেন, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। সৌদামিনী দিবসকে ধরবে বলে' জেগে বসেছিল সেদিন। মোহন ঠাকুরের হোটেলে খবর নিয়ে জেনেছিল যে দিবস সন্ধ্যার সময়ই খেয়ে গেছে, কখন ফিরবে কে জানে। দিবসের ঘরের সামনেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল সৌদামিনী তাই।

দিবস ফিরল যখন তখন প্রায় এগারোটা হ'বে। গহনচাঁদের বাড়িতে গানের আসরটা খুব জমেছিল সেদিন। দরবারি কানাড়ার গৎটা ওইখানে বসেই সাধছিল সে।

"কত রাত করলে বলতো!" সৌদামিনী উঠে বসল।

"একি, এখানে শুয়ে কেন?"

"তোমার অপেক্ষায়। আজকাল অত ভোরে উঠে কোথায় বেরিয়ে যাও, দু'দিন এসে তোমাকে পাই নি।"

"আর একটা টিউশনি নিয়েছি। গিরিবালা ক'দিন থেকে কাজে যাচ্ছে না কেন বলতো? রোজই ভাবি খোঁজ করব কিন্তু ভুলে যাই।"

"তারও জ্বর হয়েছে। আর হরুর অসুখও তো কমবার কোনও লক্ষণ নেই। সেই সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করব বলে' বসে' আছি।"

"হরু কে?"

"পটলির স্বামী। কাশির সঙ্গে থোকো থোকো রক্ত উঠছে তার।"

"তাই নাকি! সৌরেন এসেছিল?"

"তিনি বলছেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে।"

"ও, তাই নাকি! সে নিজেই নাকি হাসপাতাল করেছে একটা শুনছি।"

"হ্যাঁ, সেই হাসপাতালেই নিয়ে যেতে চাইছেন। কি যে করা যায়, মহা মুশকিলে পড়া গেছে। পটলি তো কেঁদেকেটে অনর্থ করছে।"

দিবস ঘরে ঢুকল। সৌদামিনীও ঢুকল পিছু-পিছু।

সরোদটা রেখে' দিবস সৌদামিনীর দিকে চেয়ে বললে, "আমি এখনই তাহ'লে সৌরেনের কাছে যাই একবার। দিনের বেলা তো আমার সময় নেই মোটে, আর দিনে তার দেখা পাওয়াও মুশকিল। তুমি ঘরের ভেতরই শোও ততক্ষণ তাহ'লে।"

"এখনই যাবে, এত রাত্রে?"

"তাতে কি হয়েছে?"

"এত রাত্রে নাই বা গেলে?"

দিবস হাসিমুখে চাইলে একবার সৌদামিনীর দিকে। কোনও কথা বললে না। কথা বলে' অনর্থক সময় নষ্ট করে' কি হ'বে এই ভাবটা বরং যেন ফুটে উঠল তার হাসি-মাখা দৃষ্টিতে। 'অপর কেউ হ'লে সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর অত রাত্রে নিতান্ত অনাত্মীয়ের জন্যে ডাক্তারের বাড়ি ছুটত না'—এই ধারণাটাই যেন দিবসকে যেতে উৎসাহিত করলে আরও। এর মধ্যে বাহাদুরি দেখানোর ভাব একটু ছিল, তাছাড়া ছিল অপ্রত্যাশিত দুরূহ সমস্যার দুর্জয়তাকে অতিক্রম করবার জেদ। কাজটা শক্ত মনে হওয়ামাত্রই সেটা করবার জন্যে লোলুপ হ'য়ে ওঠাটাই তার স্বভাব। এই স্বভাবই তাকে ঘর-ছাড়া করেছে।

"অনেক রাত হ'য়ে গেছে আজ আর থাক।"

একথা সৌদামিনী আর একবার বললে যদিও কিন্তু মনে মনে

সে জানত (প্রত্যাশাই করছিল) যে দিবস যাবেই, কোনও কথা শুনবে না। আর একটু হেসে দিবস পরমুহূর্তেই বেরিয়েও গেল। সৌদামিনী গালে হাত দিয়ে বললে, "কি দস্যি ছেলে বাবা।" তারপরে তার নিজের উপরই রাগ হ'ল—এত রাত্রে অসুখের কথা না বললেই হ'ত। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মনে হ'ল, না বললেই বা উপায় কি? শেষটা রাগ হ'ল গিরিবালার উপর, পটলির উপর এবং সর্বশেষে নিজেদের দুরদৃষ্টের উপর। মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় দিবসের ঘরে একা দাঁড়িয়ে হঠাৎ সৌদামিনীর মনে হ'ল দিবস ছাড়া তাদের নির্ভরযোগ্য আপনার লোক কেউ নেই। তারপর মনে হ'ল দিবস পরের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে, খেয়ালের মাথায় শখ করে' খোলার ঘরে দু'দিনের জন্য এসেছে, দু'দিন পরে চলে' যাবে। মনে হওয়ামাত্র সে কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগল। বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল যেন।

সৌরেন ডাক্তারও আদর্শবাদী লোক। কোন্ শিক্ষিত বাঙালী নয়? ভাবের জগতে বাঙালীর যে প্রতিভা, কর্মের জগতে তার শতাংশের একাংশও সম্বল যদি তার থাকত, তাহ'লে সে বিশ্বজয় করতে পারত। যে সংহতি, যে একতা থাকলে কর্মজগতে উন্নতি হয় তা বাঙালীর নেই। সে যা করছে তা একাই করছে। অখ্যাত সৌরেন ডাক্তারও তাই করছিল। গরীব বলে' সে মেডিকেল কলেজে পড়বার সুযোগ পায় নি। স্কুল থেকে তাকে পাস করতে হয়েছিল। পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে হ'ল তার। বিয়ে করেছিল সে একটি বিধবার মেয়েকে। অতসী রূপসী ছিল যদিও কিন্তু ঠিক রূপের জন্যে তাকে বিয়ে করে নি সৌরেন। সে তাকে বিয়ে করেছিল টাকার জন্যেই। তার শাশুড়ীই তাকে ছোটখাটো ডিসপেন্সারিটি করে' দেন, শাশুড়ীর টাকাতেই মোটরটিও কিনেছিল সৌরেন। গঙ্গার ধারে দোতলা বাড়িটিও সৌরেনেরই হ'বে

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর, কারণ অতসী তাঁর একমাত্র মেয়ে,—এইসব ভেবেই পিতৃমাতৃহীন স্বল্পবিত্ত সৌরেন বিশেষ খোঁজ-খবর না করেই (খোঁজ-খবর নেবার মতো অভিভাবকও তার ছিল না বিশেষ) অতসীকে বিয়ে করেই ফেলেছিল। বিয়ে করবার আগে একটু বিস্মিত সে যে হয় নি তা নয়—এমন সুন্দর মেয়ে, টাকাকড়ি আছে অথচ পাত্র জুটছে না কেন—কিন্তু বিস্ময়টাকে আমল দেবার মতো সচ্ছলতা তার নিজের ছিল না। বিবাহের প্রস্তাবটাকে সৌভাগ্য ভেবে বিবেচনা না করেই সে বিয়ে করে' ফেলেছিল। বিয়ে হ'য়ে যাবার অল্পদিন পরেই সে লক্ষ্য করলে যে অতসীর রোজ সন্ধ্যার সময় জ্বর হয়, শুধু অতসীর নয়, অতসীর মায়েরও। তারপর সে খবরটা পেলে শ্বশুরবাড়িরই দূর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয়ের মুখে। অতসীর ঠাকুরদা, বাবা দু'জনেই যক্ষ্মায় মারা গেছেন। অতসী এবং অতসীর মা-ও মারা গেল তার বিয়ের কিছুদিন পরে।

ডাক্তার হিসেবে এই যক্ষ্মারোগের সমস্যাটাকে এতদিন নৈর্ব্যক্তিক ঔদাসীন্য সহকারে আলোচনা করছিল সে। অতসী এবং অতসীর মায়ের মৃত্যুর পর ডাক্তার সৌরেনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল হঠাৎ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে যে করাল ব্যাধি ছায়াপাত করছে, নিদারুণ দারিদ্র্য যে ব্যাধির মূল কারণ, শুধু আর্থিক দারিদ্র্য নয়, নৈতিক দারিদ্র্য, মানসিক দারিদ্র্যও, যে ব্যাধির আধুনিক চিকিৎসা বিপুল ব্যয়সাধ্য, সেই ব্যাধির বিরুদ্ধে সহায়-সম্বলহীন আদর্শবাদী এই ছোকরা ডাক্তার যুদ্ধ ঘোষণা করে' বসল একদিন। ঠিক করে' ফেললে গরীব যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা বিনা পয়সায় করবে সে। গঙ্গার ধারের সে বাড়িটাকে রূপান্তরিত করে' ফেললে অতসী ক্লিনিকে। একজন সহৃদয় রেডিওলজিস্ট এবং একজন সহৃদয় যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করে', তাদের খোশামোদ করে', (প্রায় হাতে-পায়ে ধরে') ঠিক করে' ফেললে যে কেবল খরচটুকু মাত্র নিয়ে তাঁরা অতসী ক্লিনিকের রোগী-

রোগিণীদের সাহায্য করবেন। অতসী ক্লিনিকে দশটি রোগীর থাকবার ব্যবস্থা করেছে সে। রোগীদের বাড়িভাড়া লাগে না, ডাক্তারের ফী লাগে না। ওষুধ রোগীরা নিজেদের পয়সায় কিনে আনে, খাবার খরচও তাদের নিজেদের। ছুটি নিতান্ত গরীব রোগীর খাবার এবং ওষুধের খরচ সৌরেন নিজে দেয়। এসব ছাড়া প্রত্যেক রোগীকে প্রতিদিন একটাকা করে' দিতে হয় চাকর মেথর আলো প্রভৃতির জন্য। যারা দিতে পারে না তাদের ব্যয়ভার সৌরেন নিজেই বহন করে। এই ব্যাপারেই জীবন উৎসর্গ করবে ঠিক করেছে সে। সকালে বিকালে সে ডিসপেন্সারিতে বসে এই ক্লিনিকের জন্যই অর্থোপার্জন করবে বলে'। বাকি সময়টা এই ক্লিনিকেই থাকে সে। একাধারে সে-ই ডাক্তার এবং নার্স। একটি মেথরকে তালিম দিয়ে সে নিজের সহকারী করে' নিয়েছে। তার অবর্তমানে সেই মেথরই রোগীদের দেখাশোনা করে। অতি দীনভাবে ক্লিনিকটা আরম্ভ করেছে সে। এটাকে সত্যিকার সেবা-সদন করে' তুলতে হ'বে এই তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

দিবস ডিসপেন্সারিতে গিয়ে সৌরেনের দেখা পেল না। কম্পাউণ্ডারটি বললে, "তিনি তো তাঁর ক্লিনিকে আছেন। রাত্রে তো ফিরবেন না!"

"সেখানে ফোন নেই ?"

"নেবার চেষ্টা করছেন, এখনও পান নি। আপনার খুব বেশী যদি দরকার থাকে চলে' যান সেখানেই।"

ঠিকানাটা নিয়ে দিবস বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত শুনে' সৌরেন ডাক্তার বললে, "আমার বিছানা খালি আছে একটা। হরুকে এইখানেই পাঠিয়ে দাও। এক্স-রে করে' তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। ওখানে থেকে চিকিৎসা হ'বে না ভাল।"

"তুমি এইখানেই থাক নাকি ?"

"না থেকে উপায় কি, এতগুলি রোগী রয়েছে। একটা ভাল নার্স পাচ্ছি না ভাই কিছুতে। পঁচাত্তর টাকা মাইনে দিতে রাজি আছি। কিন্তু টি. বি. শুনে' কেউ আসছে না। আমাদের দেশে দলে দলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে শুনছি, কিন্তু কই এদিকে তো এগোচ্ছে না একজনও। চল, তোমার হরুকে দেখেই আসি।"

"এত রাত্রে যাবে আবার ?"

"চল, আমার তো এই কাজ, তোমাকে পৌঁছেও দিয়ে আসি, তেল পেয়েছি আজ।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তৈরি হ'য়ে বেরিয়ে এল সৌরেন ডাক্তার।

হরিদাসবাবু আর আত্মসংবরণ করে' থাকতে পারলেন না। মোহরের ঘড়াটা খুলে' দেখবার খুবই লোভ হ'ল তাঁর। সুযোগও ঘটল।

সেদিন টুরে বেরুবেন তিনি।

দিবসকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত চল না, আমাকে তুলে' দিয়ে আসবে। জিনিসপত্র সামলে টিকিট করে' ভিড় ঠেলে একা ট্রেনে চড়াই দায় আজকাল।"

"বেশ তো, যাক না তোমাকে তুলে' দিয়ে আসুক"—গোবর্ধনবাবুও সমর্থন করলেন কথাটা।

হরিদাসবাবুর স্যুটকেস আর কুঁজোটা নিয়ে দিবস বেরিয়ে পড়ল তাঁর সঙ্গে। ফুটপাথে হরিদাসবাবু আগে আগে চলছিলেন দিবস পিছু-পিছু যাচ্ছিল। হরিদাসবাবু মুশকিলে পড়েছিলেন। কথাটা কি করে' পাড়া যায়। একটা ধাবমান খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে সেটাকে থামালেন তিনি, তাঁর মনে হ'ল সমস্যাটার সমাধান হ'ল

এতে। দিবসকে দিয়ে মালপত্র বইয়ে নিয়ে যেতে বাধছিল তাঁর, কিছু বলতেও পারছিলেন না, ট্যাক্সিটা পাওয়াতে সুবিধা হ'ল। আর একটা সুবিধাও হ'ল ট্যাক্সিতে দিবসকে ঘনিষ্ঠতরভাবে পাওয়া যাবে। ট্যাক্সিটা থামতে মালপত্র তুলে' দিয়ে দিবস যথারীতি ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল, হরিদাসবাবু বলে' উঠলেন, "আপনি আমার পাশে এসেই বসুন।"

দিবস সবিস্ময়ে হরিদাসবাবুর দিকে চাইতেই হরিদাসবাবুর দৃষ্টি হাস্যোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

"আসুন। এইখানেই বসুন।"

ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে পড়তে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাবে মনে যে ভাব হয় সেইরকম ভাব নিয়ে দিবস গিয়ে বসল হরিদাসবাবুর পাশে। বিশেষ কোনও ভূমিকা না করে' হরিদাসবাবু হেসে দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "সেদিন ছাত্র-সভায় আপনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম"—তারপর ড্রাইভারকে বললেন—"হাওড়া চল।"

দিবস যে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

হরিদাসবাবুই আবার কথা বললেন, "তারপর থেকে আমি বরাবর আপনাকে লক্ষ্য করে' যাচ্ছি এবং এখন আর বলতে বাধা নেই সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেছি আমি। এখন আপনার আসল পরিচয়টা জানবার ভারি আগ্রহ হচ্ছে আমার। আপনার বাড়ি কি এখানেই? হঠাৎ এ খেয়ালই বা হ'ল কেন আপনার?"

দিবস কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে বললে, "আপনাকে সব খুলে' বলছি, কিন্তু একটি প্রতিশ্রুতি চাই, একথা মেসের আর কাউকে বলবেন না, কিংবা আমার বাড়িতেও খবর দেবেন না।"

"বেশ দিলাম।"

দিবস তখন সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে' বললে—"আপনাদের মেসে চাকরি করে' এবং দুটো টিউশনি করে' মাসে

আমি আজকাল আশি টাকা রোজগার করছি। এতে আমার খরচটা চলে' যাচ্ছে। আরও কিছু বেশী রোজগারের উপায় যদি হয় তাহ'লে সে টাকাটা আমি জমাব, জমিয়ে আসছে বছর আবার ওই রিসার্চ লাইনেই ঢুকব ইচ্ছে আছে, যদি অবশ্য সুযোগ পাই।"

সমস্ত শুনে' হরিদাসবাবু চুপ করে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর একটু কেসে' গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "দেখুন, যে কথাটা আমি বলতে যাচ্ছি তা শুনেই যেন চটে' যাবেন না। আপনি নিজের পৌরুষের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে যাচ্ছেন তাতে বাধা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, নিজের মহত্ত্ব আস্ফালনও আমি করতে যাচ্ছি না। আমি শুধু এইটুকু বলে' রাখছি যে দরকার হ'লে কিছু টাকা আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি আপনার রিসার্চের জন্যে।"

"এখন তো টাকার দরকার নেই। এ বছর তো ঢোকা যাবে না। আসছে বছর টাকার দরকার হ'বে, ততদিনে আমি জমিয়ে ফেলতে পারব কিছু।"

"তা যদি পারেন ভালই। আর না যদি পারেন আমার কথাটা মনে রাখবেন। আমি হাজার পাঁচেক পর্যন্ত আপনাকে দিতে পারব। শোধ যদি না-ও করেন—"

হরিদাসবাবুর কথা শেষ করতে দিলে না দিবস।

"বাঃ, শোধ করব বইকি যদি নি।"

হরিদাসবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দিবসের দিকে। তাঁর লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটার হয়তো একটা সদ্গতি হ'বে ভেবে পুলকিত হ'য়ে উঠলেন তিনি।

ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনে এসে থামল।

"কুলি ডাকুন, আপনি আর ঘাড়ে করবেন না স্যুটকেসটা"—হেসে বললেন হরিদাসবাবু।

"আপনি যদি এরকম করেন তাহ'লে তো মেসের চাকরিটি

ছাড়তে হ'বে আমাকে। আপনার মতো লোকের অন্তরে সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয় এসবে—"

"আচ্ছা, বেশ যা-খুশী করুন তবে। আমি টিকিটটা করি গিয়ে।"

হরিদাসবাবু গেট দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছিলেন। দিবস কাঁধে স্যুটকেস এবং একহাতে কুঁজো নিয়ে ভিড়ে পিছিয়ে পড়েছিল। সে তার প্ল্যাটফর্ম-টিকিটটা আর কুঁজোটা একহাতে সামলাতে ব্যস্ত ছিল বলেই যে স্যুটকেসটার দিকে তেমন মন দিতে পারছিল না তা নয়, হরিদাসবাবুর নূতন পরিচয় পেয়ে তার মন আকাশে আকাশে উড়ে' বেড়াচ্ছিল। হরিদাসবাবু তাকে টাকা দেবেন বলে' নয়, হরিদাস-বাবুকে সে মুগ্ধ করতে পেরেছে বলে'। তার অসমসাহসিক প্রকৃতি দমকা হাওয়ার মতো তার জীবনতরণীর পালে লেগে' তাকে যে পথে নিয়ে গেছে সে পথের মোহ তার নিজেরই কেটে' আসছিল ক্রমশ —ওই মেসের চাকরি আর টিউশনি তার ভাল লাগছিল না মোটেই। কিন্তু জেদের বশে তবু সে ফেরে নি, ফিরবেও না। নিজের পায়ে ভালভাবে দাঁড়িয়ে তবে সে ফিরবে। কিন্তু মনে মনে তার দুঃখ ছিল যে তার এই কৃচ্ছ্রসাধনের প্রশংসা কেউ করল না। হরিদাস-বাবুর প্রশংসাটা তাই উপভোগ করছিল সে। না, কেউ তার প্রশংসা করে নি। বাবা, কিরণ, সৌদামিনী, কেউ নয়। এমন কি রঙ্গনা পর্যন্ত—স্যুটকেসটা কার মাথায় যেন লেগে' গেল।

"এই কুলি দেখতে পাও না চোখে, ধাক্কা দিয়ে চলে' যাচ্ছ!"

চমকে ফিরে দাঁড়াল দিবস। রঙ্গনাও অবাক্ হ'য়ে গেল।

"একি, তুমি এখানে কোথা থেকে?"

"আমি গিরিডি থেকে ফিরছি। আপনি স্যুটকেস ঘাড়ে করে' কোথায় চলেছেন?"

"আমার মনিবকে উঠিয়ে দিতে যাচ্ছি ট্রেনে। আসছি এখনই।"

দিবস চলে' গেল। রঙ্গনার সঙ্গিনীরা এগিয়ে বাসে ট্যাক্সিতে

উঠল। রঙ্গনা দিবসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট পাঁচেক পরেই ফিরে এল দিবস।

"সত্যি আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন যাই বলুন, কুলিগিরি করবেন তা বলে'?"

"স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই কুলিগিরি করেছিলেন তা জান? আমরা তো নগণ্য লোক!"

কথাটা দিবসের নিজেরই কানে লাগল। মনে হ'ল 'চাল' দেওয়ার মতো শোনালো। এরকম কথা সে যদি আর কারও মুখে শুনত তাহ'লে নির্জলা চালিয়াৎ ভাবত তাকে। মনে হওয়ামাত্রই লজ্জা হ'ল তার। অপরের কাছে বাহাদুরি দেখানোর লোভটা সে কিছুতেই সামলাতে পাচ্ছে না কেন? হরিদাসবাবুর সঙ্গে এখনই যে-সব কথা হ'ল, তার মধ্যেও এই ধরনের একটা সুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন যেন উপচে পড়ছিল হাবভাবে।

রঙ্গনা হেসে বললে, "আসল বিদ্যাসাগর বড় হ'তে পারেন কিন্তু নকল বিদ্যাসাগর হাস্যকর! আপনাকে মানাবে আপনার অরিজি—মানে স্বকীয়তায়"—তারপর হেসে বললে—"কেমন চমৎকার শুদ্ধ বাংলা বলছি দেখেছেন? জানেন, আমরা ক'জন বন্ধু মিলে আবার আজ প্রতিজ্ঞা করেছি যে পারতপক্ষে ইংরেজি কথা বলব না"—কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে রঙ্গনা। কিন্তু কৃতকার্য হ'ল না।

"আমার স্বকীয়তাটাও তো বরদাস্ত করতে পারলে না সেদিন"—দিবস বললে।

"কোন্‌টা?"

"আয়না কিনে দেওয়াটা। ও অবস্থায় অন্য কেউ হ'লে দিত না, মানে দিতে সাহস করত না, আমি বলেই দিয়েছিলাম, ওইটেই আমার স্বকীয়তা। কিন্তু তুমি সেদিন যা বললে তাতে মনে হয় তোমার কাছে স্বকীয়তারও কোন দাম নেই।"

চলতে চলতে রঞ্জনা ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'বুঝতে পারলাম না ঠিক। একটা আয়না কিনে দেওয়ার মধ্যে বিশেষত্বটা কি থাকতে পারে তাতো বুঝতে পারছি না!"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে অবশ্য মনে মনে বলছিল—"বুঝেছি, কিন্তু বলব না সেটা!"

দিবস বললে, "একটা উদাহরণ দিচ্ছি"—বলেই আবার চুপ করে' গেল। উপমার সাহায্যে নিজের চরিত্রের যে বিশ্লেষণটা সে করেছিল তা অকপটে বলা উচিত কিনা, খটকা লাগল তার। উপমাটাও হাস্যকর।

"কি উদাহরণ?"

দিবস তবু চুপ করে' রইল।

"চুপ করে' আছেন কেন, বলুন না কি উদাহরণ?"

দিবস অবশেষে বলাই ঠিক করে' ফেললে। অর্থাৎ না বলে' পারলে না। 'এর কাছে যদি অকপটে না বলতে পারি তাহ'লে কার কাছে আর বলব' এ কথাগুলো যদিও স্পষ্টভাবে তার মনে জাগল না, কিন্তু তার মনে হ'ল এর কাছে বললে আর ক্ষতি কি!

"উদাহরণটা হচ্ছে, সব প্রাণীই দরকার হ'লে লাফায়, কিন্তু লাফানোটা ফড়িংয়েরই একটা বিশেষত্ব বলতে পার। অতি সামান্য কারণে তড়াক্ করে' সে লাফিয়ে ওঠে। আমার সেই দশা। সেদিন তুমি যখন আয়নাটা ভেঙে ফেললে তখন তোমার মুখটা দেখে' ভারি কষ্ট হয়েছিল আমার। আয়না কিনে দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারলাম না কিছুতে তাই। কিন্তু তুমি সেদিন ওটার যে ব্যাখ্যা করলে তাতে অপমানিত বোধ করেছিলাম, সত্যি বলছি। একটা কথা বিশ্বাস কর তুমি, আস্ফালন করবার মতো বিশেষ কিছু নেই আমার, সামান্য যেটুকু আছে সেটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ফলাও করে' দেখবার মতো সময়ও নেই। কিন্তু তবু আমি বেখাপ্পা রকম

কাণ্ড করে' ফেলি মাঝে মাঝে, তার কারণ মনের ভিতর ফড়িং আছে একটা। কারণে অকারণে লাফিয়ে ওঠে সেটা—।"

রঙ্গনা চুপ করে' রইল, কিন্তু মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল তার। সে হাসি অর্থহীন নয়, কিন্তু কি যে তার অর্থ তা-ও বলা শক্ত।

দিবস বললে, "আর একটা কথা—না থাক, সেটা আর বলব না তোমার কাছে—।"

রঙ্গনার হাসিটা আর একটু ফুটে উঠল।

"কেন, কি এমন কথা সেটা?"

"বললে আত্মপ্রশংসার মতো শোনাবে। এমনিই তো তুমি আমার চরিত্রে অনেকগুলো খুঁত বের করে' ফেলেছ, সে তালিকা দীর্ঘ করে' লাভ কি?"

"আমার কাছে নিজেকে নিখুঁত প্রমাণ করেই বা লাভ কি?"—রঙ্গনার চোখের হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে যে আলোটা চকমক করে' উঠল তা ঠিক শানিত ছুরির মতোই। দিবসের মনের ভিতরটা চিরে দেখতে চাইছে যেন। ছুরিটা ভোঁতা হ'য়ে গেল কিন্তু দিবসের সপ্রতিভ হাসিতে।

"কিসে আমার লাভ লোকসান তা আমি নিজেই জানি না, তোমাকে কি করে' বলব বল? এইটুকু শুধু বলতে পারি এখন, তোমার চোখে নিজেকে খেলো করাটা লোকসান বলেই মনে হচ্ছে, কেন জানি না। দু'দিন পরে হয়তো হ'বে না।"

"কি যে যা-তা বলছেন, আমি আপনাকে খেলো মনে করেছি কি করে' জানলেন?"

"ও, মনে কর নি তাহ'লে, যাক বাঁচা গেল!"

"বাজে কথা ছেড়ে কি বলছিলেন বলুন।"

"কি বলছিলাম বল তো?" দিবস সত্যিই ভুলে গিয়েছিল প্রসঙ্গটা।

"ওই যে কি বলতে বলতে থেমে গেলেন।"

"ও হ্যাঁ। না-ই শুনলে সেটা?"

"শুনিই না। সত্যি, ভারি দুষ্টু আপনি।"

"শোন তবে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা ভারি দুর্বলতা আছে। কোনও বিপন্ন মেয়েকে সাহায্য করবার জন্যে আমি সব করতে পারি। না করতে পারলে আমার পৌরুষ যেন তৃপ্তি পায় না।"

হঠাৎ পটলি আর তার স্বামীর ছবিটা ভেসে' উঠল রঞ্জনার চোখের উপর। সৌদামিনীর মুখে যা সে শুনেছিল তা-ও মনে পড়ল।

"সেদিন তোমাকে যে আয়নাটা কিনে দিলুম তার কারণও ওই। যা ভেবেছ তা মোটেই নয়। ওকি, তোমার এক কানে দুল কেন?"

রঞ্জনা তাড়াতাড়ি কানে হাত দিয়ে দেখল সত্যিই তো একটা দুল নেই।

"ওই গেটের কাছেই পড়ে' গেছে তাহ'লে। যা ধাক্কা আপনি দিয়েছিলেন স্যুটকেস দিয়ে!"

আবার গেটের কাছে ফিরে গেল তারা। সৌভাগ্যক্রমে একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল দুলটা।

"চলুন এবার যাওয়া যাক"—দুলটা পরতে পরতে বললে রঞ্জনা।

"চল। তুমি কিসে যাবে?"

"ট্যাক্সিতে যাই চলুন, আমার কাছে টাকা আছে।"

"আমি বাসে যাব। ভবানীপুরে যেতে হ'বে একবার।"

"কিছুদূর যাই চলুন একসঙ্গে। পথে নামিয়ে দেব আপনাকে।"

"এখানে খালি বাস পাব, এখান থেকে ওঠাই তো ভাল?"

"যান তাহ'লে।"

নীরবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দু'জনে। দিবসের মনে হ'তে লাগল রঞ্জনা আবার যদি অনুরোধ করে তাহ'লে তাকে ট্যাক্সিতেই যেতে হ'বে। রঞ্জনা কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা। সে ভাবছিল দিবস

নিশ্চয়ই তাকে বিলাসী ভাবছে। তার নিজের বিবেকও দংশন করেছিল, মনে হচ্ছিল তার বাসে যাওয়াই উচিত, ট্যাক্সি চড়ে' এমনভাবে টাকাগুলো খরচ করা উচিত নয়। কিন্তু—।

স্টেশনের বাইরে এসে পড়েছিল তারা।

"আচ্ছা আমি চলি তাহ'লে এখন। সন্ধ্যার পর দেখা হ'বে আবার।"

দিবস বাসের আড্ডার দিকে চলে' গেল। রঙ্গনা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। দূরে তিন-চারখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দিবস একটি খালি বাসের এক কোণে বসেছিল চুপ করে'। রঙ্গনার কথাই ভাবছিল। একটা নৌকা তীর ছেড়ে ক্রমে ক্রমে দূরে চলে' যাচ্ছে—এই ধরনের একটা ভাব তার মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কিরণের কথাই ঠিক। যে আদর্শকে সে বরণ করেছে সে আদর্শ রঙ্গনাকে মুগ্ধ করবে না। রঙীন শাড়ি গয়না পরে' ট্যাক্সি চড়তেই চায় ওরা। রঙীন শাড়ি গয়না পরে' ট্যাক্সি চড়াটা যে পাপ, দিবসও তা মনে করে না। ওর লোভে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দেওয়াটাই অন্যায় তার মতে। রঙ্গনা হয়তো মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিচ্ছে না, সংগতি আছে হয়তো গহনচাঁদবাবুর—। তাছাড়া চুনীলালের কথাটাও মনে পড়ল।

"চলুন, আপনার সঙ্গে যাই।"

রঙ্গনা হাসিমুখে এসে উঠল বাসে।

"কেন ট্যাক্সির কি হ'ল ?"

"পেলাম না তেমন সুবিধা মতো।"

দিবসের পাশে বসে' সে দুলটা আবার পরবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার মনের ভিতর যে দ্বন্দ্বটা চলছিল তার আভাস তার চোখে-মুখে প্রতিভাত হচ্ছিল না একটুও। মুখ দেখে' মনে হচ্ছিল দুলটাকে নিয়েই যেন সে ব্যস্ত আছে, দুলটাকে ঠিকমতো পরতে পারছে না বলেই যেন তার ভুরুতে জেগেছে বিরক্তির কুঞ্চন,

অধরে ফুটেছে অপ্রস্তুত হাসি। কিন্তু মনে মনে সে লজ্জায় মরে' যেতে চাইছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে সে দিবসের বাসে এসে উঠল কেন? তার মনের একটা অংশ তর্জনী আস্ফালন করে' তারস্বরে প্রশ্ন করছিল কেন, কেন, কেন—আর একটা অংশ অসহায়ভাবে অপ্রস্তুত মুখে বসেছিল নতমস্তকে। আত্মসম্মানের সঙ্গে আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্বে সে ব্যস্ত ছিল বলেই দুলটা পরতে দেরি হচ্ছিল তার আরও। অস্বাভাবিক রকম দেরি হচ্ছে এ সম্বন্ধে নিজেই সে সচেতন হ'ল পরমুহূর্তে।

"দুলটা মাড়িয়ে দিয়েছে বোধ হয় কেউ, আঁকড়াটা বেঁকে গেছে।"

"কই দেখি?"

দিবস দুলটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে' দেখলে, তারপর ফিরিয়ে দিলে। এবার বেশ সহজে পরা গেল।

"আপনি ভবানীপুরে কোথায় যাবেন?"

"হরিশ মুখার্জি রোড।"

"সেখানে এখন যাচ্ছেন যে? মেসে আপনার চাকরি নেই এখন?"

"এখন তো প্রায় এগারোটা বাজে। মেসে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত আমার ছুটি, আমি যাচ্ছি এখন একটি ছেলেকে পড়াতে।"

"কি পড়ান আপনি?"—নিজের এই অকারণ কৌতূহলে লজ্জিত হ'ল সে একটু মনে মনে।

"অঙ্ক।"

"ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে?"—আবার জিগ্যেস করে' ফেললে সে।

"না, বি-এস-সি পড়ে। অঙ্কে অনার্স আছে ছেলেটির।"

কথাটা শুনে' ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে পড়ল রঞ্জনা। যে দিবসকে মেসের চাকর মনে করে' সে ব্যঙ্গ করেছিল, সেই দিবসই

যে বি-এস-সি অনার্সের অঙ্ক পড়াতে পারে এই সংবাদে দিবসের সম্বন্ধে তার ধারণাটা বদলে গেল যেন হঠাৎ। দিবস যে ভাল ছেলে তা সে তার বক্তৃতা শুনেই বুঝেছিল, সে যে ধনীর সন্তান এ-ও সে শুনেছিল সৌদামিনীর কাছে, সে ভাল সরোদ বাজাতে পারে তা-ও সে জানে, কিন্তু সে যে অঙ্কেও এত বড় পণ্ডিত একথা শুনে' তাক লেগে' গেল তার, কারণ নিজে সে অঙ্কে ভয়ানক কাঁচা। কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে আড়চোখে চাইল সে একবার দিবসের দিকে। দিবস পথের দিকে চেয়ে বসেছিল চুপ করে'।

"আপনার সঙ্গে আরও কিছুদিন আগে আলাপ হ'লে আমি আই-এ না পড়ে' আই-এস-সি পড়তাম। অঙ্কের ভয়ে আই-এস-সি নিতে পারি নি।"

"যা ভাল লাগে, যেটা তোমার পক্ষে সহজ, তাই পড়াই তো ভাল। আই-এস-সি পড়ে' লাভটাই বা কি হ'ত?"

"ডাক্তারি বা ওই ধরনের কোনও একটা রোজগারের রাস্তায় ঢুকতে পারতাম। আই-এ, বি-এ, এম-এ পাস করে' এক মাস্টারি ছাড়া আর কোন গতি নেই।"

"আমাদের দেশে ডাক্তার মাস্টার দুই-ই দরকার এখন প্রচুর। দেশের দেহ-মন কোনটাই সুস্থ নয়।"

"আমি দেশের কথা ভাবছি না, নিজের কথা ভাবছি। ডাক্তারিতে বেশী পয়সা রোজগার করা যায়। আমাদের যা অবস্থা তাতে আমার ডাক্তার হওয়াই উচিত, কিন্তু কি করব বলুন, অঙ্কটা কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।"

তার হাসির অন্তরালে একটা অপ্রস্তুতভাব থাকাতে হাসিটা মলিন দেখাতে লাগল। তাদের অবস্থা যে খারাপ এই খবরটা দিবসকে দিয়ে ফেলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল সে।

দিবস বললে, "নাই বা ঢুকল। দিনকতক পরেই তো বিয়ে হ'য়ে যাবে। তখন—"

দিবসের মুখের হাসিটাও নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছিল। চুনীলালের মুখে যে কথাটা সেদিন সে শুনেছিল তার তাৎপর্যটা যেন এখন এতক্ষণ পরে অতিশয় রূঢ়ভাবে এসে আঘাত করল তাকে। রঞ্জনাকে আয়না কিনে দিয়ে তার মন পরীক্ষা করবার যে এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা করেছিল সে (এখনই একটু আগেই রঞ্জনাকে আয়না কেনার যে ব্যাখাটা সে দিয়েছিল সেটাও মিথ্যা নয়), রঞ্জনা তার আদর্শকে স্বীকার করেও তাকে চাইবে কি চাইবে না এই অনিশ্চয়তাকে ঘিরে স্বপ্ন-সৃজন—সমস্তই যেন ব্যর্থ হ'য়ে গেল—রঙীন মেঘের মতো মিলিয়ে গেল সব।

"দিনকতক পরে বিয়ে হ'য়ে যাবে কে বললে আপনাকে?"

"চুনীলালবাবু।"

"মামার সঙ্গে কবে কথা হয় আপনার?"

"যেদিন তোমাকে আয়না কিনে দিয়ে গেলাম সেই দিনই।"

রঞ্জনা চুপ করে' রইল। 'বাস'টা এতক্ষণ খালি ছিল, কয়েকজন যাত্রী এসে উঠল। একটু পরেই আবার নেমে গেল তারা।

রঞ্জনা দিবসের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, "আমি এখন বিয়ে করব না। ওখানে তো নয়ই।"

"কেন?"

"ওরা পাঁচ হাজার টাকা পণ চায়। বাবাকে বাড়ি বাঁধা দিতে হচ্ছে।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ।"

পাশাপাশি বসে' রইল দু'জনে। কারও মুখে কথা নেই।

হঠাৎ রঞ্জনা বলে' উঠল—"আচ্ছা, হঠাৎ যদি আমি কোনও দিন বিপদে পড়ে' আপনার সাহায্য চাই দেবেন তো?"

একটু আগেই দিবস যে কথাগুলো বলেছিল—'কোনও বিপন্ন মেয়েকে সাহায্য করবার জন্যে আমি সব করতে পারি। না করতে

পারলে আমার পৌরুষ যেন তৃপ্তি পায় না'—সেই কথাগুলোকে রঞ্জনার মন যে আঁকড়ে বসেছিল তা নিজেও সে টের পায় নি এতক্ষণ। এই খাপছাড়া প্রশ্নটা তার নিজের কানেই বেসুরো ঠেকল তাই। চকিতে দিবসের দিকে চেয়ে দিবসের চোখে কিন্তু যা দেখলে সে, তাতে তার মনের কুণ্ঠিত ভাবটা কেটে' গেল।

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে' দিবস বললে, "নিশ্চয়।"

এর পর আর একদল যাত্রী উঠল বাসে। বেশ ভিড় হ'ল। কথাবার্তার সুযোগ আর পেলে না তারা। পাশাপাশি বসে' রইল কেবল।

ভাল-মন্দ যা-ই হোক নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেউ যখন সুনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে, নিজের পৌরুষ দিয়ে সে ভবিষ্যৎকে বদলাবার আশাও যখন আর থাকে না, তখনই লোকে সাধারণতঃ পর-চর্চায় মন দেয়। ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকার হয় তাহ'লে পরের সম্বন্ধে চিন্তাটা আরও বেশী পেয়ে বসে। কিরণের তাই হয়েছিল। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোনও আলো সে দেখতে পাচ্ছিল না। যেটুকু আলো ছিল, নিজের আকাঙ্ক্ষার কাল্পনিক আলোর কাছে তা এতই ম্লান যে সেটাকে আলো বলেই মনে হচ্ছিল না তার। উর্মিকে ঘিরে কল্পনায় যে অলকাপুরী সে সৃষ্টি করে' রেখেছিল তা বাস্তবে কোনওদিন রূপ পরিগ্রহ করবে না তা সে জানত। যে ট্রাম-ড্রাইভারি সে নিয়েছে (যেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তরও নেই) তাতে কোনক্রমে একটা খোলার ঘরে মাথা গুঁজে পশু-জীবন যাপন করা চলে, আর কিছু হয় না। বাস্তব উর্মির চিন্তাটাকেও দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে সে কর্দমাক্ত বাস্তবলোক থেকে। অন্ধকারলোকে বসে' দিবসের চিন্তাই করছে সে আজকাল। তার ক্রমাগতই মনে হচ্ছে দিবস ভুল করছে।

এ-ও অবশ্য তার মনে হচ্ছে অনুরূপ অবস্থায় পড়লে সে-ও কি ভুল করত না? নিজের মধ্যে নিতান্ত জৈবিক যে ক্ষুধাটা সে অনুভব করে মাঝে-মাঝে তা দিবসও নিশ্চয় করে, এ-ও তার মনে হচ্ছিল। এইসব অনুভব করার ফলে দিবসের ভ্রান্তিটাকে যদিও সে ক্ষমার চক্ষেই দেখছিল, কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছিল না। বার বার তার মনে হচ্ছিল দিবসের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলেই তার প্রতি কর্তব্যও আছে একটা। ভ্রান্তির কবল থেকে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা যদি সে না করে তাহ'লে সে কর্তব্যে ত্রুটি হ'বে। এ বিষয়ে দিবসের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। আলোচনা করে' দিবসকে যদি সে ফেরাতে পারে ভালই, যদি না পারে তাহ'লে তার বাবাকেই খবর দিতে হ'বে। দিবসকে জানিয়েই খবর দেবে। এটা কর্তব্য তার। পরক্ষণেই তার কল্পনানেত্রে ফুটে উঠেছিল অপরূপ একটা ছবি। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল জলে অসংখ্য তরঙ্গের শিহরণ। তাতে একটিমাত্র নৌকো ভেসে' চলেছে। সোনার তরী। জ্যোৎস্না-শুভ্র পালে লেগেছে হাওয়া। আকাশের মেঘমালায় বিচিত্র বর্ণসম্ভার। নৌকোর একধারে বসে' আছে দিবস আর একধারে রঙ্গনা। রঙ্গনা যেন মৃদুকণ্ঠে গান গাইছে—গানের কথাগুলোও মূর্ত হ'য়ে উঠল তার মনে।

স্বপন মাখা চোখে চলেছি মেঘ-লোকে
মাটির মায়া ছেড়ে চলেছি আকাশেতে
সূর্য শশী তারা যে দেশে দিশাহারা
রূপের শতধারা উঠেছে যেথা মেতে।

এমন সুন্দর ছবিকে নষ্ট করে' দেওয়া উচিত কি? কিন্তু বন্ধু হিসাবে—ভ্রূকুঞ্চিত করে' বসে' রইল কিরণ। তারপর মনে হ'ল দিবসের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। কিন্তু দিবসের সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না যে। তিনবার তার বাড়ি গিয়ে ফিরে এসেছে সে।

খবরের কাগজটা তুলে' পড়বার চেষ্টা করলে। আরও মন খারাপ হ'য়ে গেল। আগাগোড়া কেবল দুঃসংবাদ। শুধু দুঃসংবাদ নয়, মিথ্যা সংবাদ। বানিয়ে বানিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে এমনভাবে লিখেছে যে সংবাদের স্বরূপটাই গেছে বদলে। চামড়া বাঁচাচ্ছে নিজেদের।

"মা পাঠিয়ে দিলেন।"

পাশের বাড়ির ছেলেটি একটা বাটি হাতে করে' দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে। 'আঃ' কিরণ বলে' উঠল মনে মনে। পাশের বাড়ির লোকটি ধনী হয়েছেন সম্প্রতি কালোবাজারের কৃপায়। তা হোন, কিরণের আপত্তি থাকলেও কিছু করবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাঁর প্রৌঢ়া গৃহিণীর বদান্যতার জ্বালায় অস্থির হয়েছে সে। তিনি অনুকম্পাভরে প্রায়ই এটা-সেটা পাঠিয়ে দেন তাকে। এই অনুকম্পা পাগল করে' তুলেছে যেন, এটাও যেন ওদের ঐশ্বর্য-আস্ফালনের আর একটা উপায়। মোটরের হর্ন, রেডিওর গাঁক গাঁক চীৎকারই তো যথেষ্ট, বাড়িতে খাবার পাঠিয়েও কি জানান দরকার যে আমাদের যথেষ্ট খাবার আছে, আহা তুমি খেতে পাও না, নাও খাও, তোমাকেও একটু দিচ্ছি!

"কি ওটা—"

"মাংস।"

"আজ রবিবার, আমি মাংস খাই না"—মিছে কথাই বললে সে।

"ফিরিয়ে নিয়ে যাই তাহ'লে?"

"যাও।"

মাংস নিয়ে চলে' গেল ছেলেটি। কিরণের খিদে পেয়েছিল খুব! কিরণ উঠে দাঁড়াল, ঘরের ভিতর অন্যমনস্কভাবে ঘুরে' বেড়াল খানিকক্ষণ। তারপর জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাস্তাতেই মুক্তি। জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা যায়—।

সৌদামিনী আর গিরিবালা ফিরছিল সৌরেন ডাক্তারের অতসী ক্লিনিক থেকে। পটলি আর তার স্বামীকে সেইখানেই রেখে' এল তারা। সৌরেন ডাক্তারের ভদ্রতা দেখে' মুগ্ধ হয়েছে দু'জনেই। আর সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছে সৌরেনের উপর দিবসের প্রভাব দেখে'। দিবস ওদের সঙ্গে যেতে পারে নি। চিঠি দিয়েছিল একটা। সেই চিঠি দেখে' কি খাতিরটা করলেন ডাক্তারবাবু। দিবসের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল সৌদামিনী। দিবসের সম্বন্ধে এমনভাবে কথা কইতে কইতে আসছিল সে যেন দিবস তার নিজের সম্পত্তি।

বারো

দিবসের ঠিকানা পাওয়ার আগেই ঘণ্টু এসে হাজির হ'ল। এমনি চিঠি লিখলেই সে হয়তো এসে পড়ত, কারণ বাংলাদেশের অসংখ্য যুবক যে সম্প্রদায়ভুক্ত, ঘণ্টুও তাদের একজন। সে বেকার। বি-এ পাস করে' বাড়িতে বসে' রাজনীতি, সাহিত্য, নূতন নূতন ব্যবসার প্ল্যান প্রভৃতি নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল সে। সূর্য চৌধুরী তাকে আসতে লিখলেই সে চলে' আসত। কিন্তু সূর্য চৌধুরী পত্রে যে কারণটা দেখিয়েছিলেন তাতে আরও তাড়াতাড়ি চলে' আসতে হ'ল তাকে। সূর্য চৌধুরী লিখেছিলেন যে তাঁর শরীরটা ভাল নয়, সে যেন অবিলম্বে চলে' আসে। উকিল মানুষ তিনি, ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক চেহারা দেবার জন্যে চিঠি লেখার পর থেকেই অসুখের ভান করতে লাগলেন। একটু-আধটু ব্লাড-প্রেসার তাঁর ছিলই, ব্লাড-প্রেসারের লক্ষণও জানা ছিল কিছু-কিছু, সুতরাং রোগী সাজতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না তাঁকে। চিঠি লেখার পরই

তিনি ব্রজকে বললেন—"ব্লাড-প্রেসারটা বেড়েছে বোধ হয়, মাথাটা টলছে।" পরের দিন থেকে কাছারি যাওয়া বন্ধ করে' দিলেন। ব্রজ ব্যস্ত হ'য়ে উঠল ডাক্তার ডাকবার জন্য। একজন ডাক্তার এসে দেখেও গেল। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী সূর্যকান্ত চলতেও লাগলেন। পটভূমিকাটি চমৎকার তৈরী হ'য়ে রইল। দিবসের জন্য ব্রজর আকুলতাটা একটু বাড়ল বটে কিন্তু তাতে সূর্য চৌধুরীর খুব বেশী অসুবিধা হ'ল না। ব্রজর অর্ধস্বগত আক্ষেপোক্তি, প্রকাশ্য তর্জন, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস—এসবে অভ্যস্ত তিনি। এত আগে থাকতে সূর্য চৌধুরী এত আয়োজন করেছিলেন শুধু ঘণ্টুর বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যেই নয়। তিনি ঘণ্টুর মারফত দিবসের কাছে নিজের অসুখের সংবাদটাই পাঠাবেন এঁচে রেখেছিলেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁর অসুখের খবর পেলে দিবস নিশ্চয়ই আসবে। তাছাড়া আর একদিক থেকেও বাঁচবেন তিনি। ব্রজ এবং গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে দিবসের সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্যটা তিনি জাহির করে' রেখেছিলেন, (যা করার কোনও প্রয়োজনই ছিল না) এতে সেটা জাহিরই থেকে যাবে। যেন অসুখের জন্যেই বাধ্য হ'য়ে তাঁকে খবর পাঠাতে হচ্ছে ছেলেকে, এইটেই বড় হ'য়ে উঠবে, তিনি যে ছেলের জন্য আকুল হ'য়ে উঠেছেন এই সত্যটা চাপা পড়ে' যাবে। ঠিকানা পাওয়ার পর ঘণ্টু এলেই ভাল হ'ত, কারণ তাহ'লে ঘণ্টু পরে যা করল সময়াভাবে তা করবার সুযোগই পেত না হয়তো। প্রথমত গোবিন্দ সাণ্ডেলের সঙ্গে সূর্যকান্তের কথোপকথনের খানিকটা আড়াল থেকে শুনে' আকাশ-কুসুম রচনা করবার সময় পেত না এবং দ্বিতীয়ত জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যা সে ভেবেছিল—তাও ভাবত না। কিন্তু ঠিকানা পাওয়ার আগেই সে এসে পড়ল এবং ব্রজর মুখে সমস্ত শুনে' থ' হ'য়ে গেল। যা তার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে ছিল তা প্রথমে তার কল্পনাধীন হ'ল ব্রজরই শ্লেষোক্তিতে। সে যেদিন এল তার পরদিন তাকে

জলখাবার দিতে দিতে ব্রজ বললে, "তোরই তো পোয়া-বারো হ'ল এবার। রামের তো বনবাস হ'য়ে গেছে, এইবার তুই রাজত্ব কর।"

"আমি রাজত্ব করব মানে ?"

"সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে শুনছি। তোমার মামা আর গোবিন্দবাবু মিলে দিবুকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে পরামর্শ আঁটছে। ওরা মনে করছে আমি কিছু জানি না, কিন্তু আমি সব জানি, সব দিকে কান থাকে আমার।"

সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে উৎক্ষিপ্ত-ভ্রূ ঘণ্টু বললে, "তার মানে ?"

"মানে তোমারই পোয়া-বারো। দিবু যদি বিষয় না পায়, তুমি পাবে। দিবুর পর তোমারই তো ক্লেম।"

ব্রজ মাঝে মাঝে দু'একটা ইংরেজি কথাও বলে। ব্রজ বেশীক্ষণ আর দাঁড়াল না, (বেশীক্ষণ সে কোথাও দাঁড়ায় না, কাজে, অকাজে, বিনাকাজে চরকির মতো ঘুরে' বেড়াচ্ছে সর্বদা) কিন্তু যে বীজটি সে ঘণ্টুর মনে বপন করে' গেল তা ঘণ্টুর মনোজগতে বিপর্যয় ঘটাতে লাগল ক্রমশ। যে ঘণ্টু হালে পানি পাওয়া দূরে থাক নৌকোই জোটাতে পারে নি একটা, তার হাতে যেন আলাদিনের প্রদীপ দিয়ে গেল ব্রজ একটা। দিবুদা যদি না আসে তাহ'লে মামার এত সম্পত্তির সে-ই উত্তরাধিকারী হ'বে। ভাবা যায় না। কিন্তু আইনত হওয়া তো উচিত ! দিবুদা আসছে না কেন ? না আসবার কারণটা কি ? সামান্য একটু বকেছে বলে' এতদিন নিখোঁজ হ'য়ে থাকবে ? নিশ্চয়ই গুরুতর ব্যাপার আছে কিছু একটা ভিতরে। ব্রজর কথাটা শোনার পর থেকে ঘণ্টুর মনে এই ধরনের নানা ঢেউ উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে এ-ও তার মনে হ'তে লাগল যে শেষ পর্যন্ত দিবুদা ঠিক এসে পড়বে, এত বড় সম্পত্তি ছেড়ে বিবাগী হ'য়ে যাবে একথা ভাবা যায় না এযুগে (কথায় কথায় 'একথা ভাবা যায় না' বলাটা ঘণ্টুর একটা মুদ্রাদোষ), তাছাড়া দিবুদা যদি না-ও আসে, মামা যে সম্পত্তি তাকেই দেবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি ?—ঘণ্টুর চিত্তের

যখন এইরকম দোলায়মান অবস্থা তখন একদিন দোতলার জানালা দিয়ে যেতে যেতে সে মামার এবং গোবিন্দ সাণ্ডেলের কথোপকথনের খানিকটা শুনতে পেয়ে গেল হঠাৎ। শোনামাত্র শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এল তার ক্ষণিকের জন্য, শিহরণ বয়ে' গেল সর্বাঙ্গে।

গোবিন্দ সাণ্ডেল বলছিলেন—"আমি বলছি সে আসবে। ঘণ্টুর নামে বিষয়টি উইল করে' দিয়ে সেই খবরটি তাকে পাঠাও। ছুটতে ছুটতে আসবে।"

সূর্যকান্ত বললেন—"সে যদি নিতান্তই না আসে ঘণ্টুই তো বিষয় পাবে, আমার আর কে আছে বল ?"

ঘণ্টু আর শুনতে পারল না, তাড়াতাড়ি দালানটা পেরিয়ে ছাদে উঠে গেল সে। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল। এবার তার বিশ্বাস হ'ল, সত্যিই মামার বিষয়টা পেয়ে যাবে সে দিবুদা না এলে। শৈশবেই সে পিতৃমাতৃহীন হয়েছে। মামাই তার পড়ার খরচ জুগিয়েছেন। সে-ও তো মামার ছেলেরই মতো। 'সে যদি না আসে তা'হলে ঘণ্টুই তো বিষয় পাবে, আমার আর কে আছে বল'—সূর্যকান্তের এই কথাগুলো আবার বেজে উঠল কানে। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। প্রকাণ্ড বাড়িটার ছবি মানসপটে ফুটে উঠল, ওই প্রকাণ্ড বুইক গাড়িখানা—এ সবই তার হ'বে ? ভাবা যায় না!

তার পরদিন রাস্তায় দেখা হ'য়ে গেল জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে। জটিল গাঙ্গুলী তার আধুনিকতম বন্ধু। ঘণ্টুর ব্যবসার প্ল্যান যেমন বদলায়, বন্ধুও তেমনি বদলায়। বইয়ের দোকান করবার মতলব মাথায় খেলছিল যখন তখন বন্ধু ছিল উদীয়মান কবি গোপেন সাহা। গোপেন সাহাই বুদ্ধিটি দিয়েছিল তাকে। বইয়ের দোকান কিন্তু খোলা হ'ল না সুশীল গুহর চক্রান্তে। সুশীল গুহ তাকে বলেছিল, "আরে, বই ক'টা লোক পড়ে ? ওতে ক'পয়সা পাবে তুমি ? তার চেয়ে চাল ডাল তেল নুনের দোকান কর, হু-হু করে' চলবে।"

সুশীল গুহর সঙ্গে দিনকতক খুব মাখামাখি হ'ল ওই সূত্রে। জটিল গাঙ্গুলী আসতে কিন্তু সুশীল গুহকে রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল। জটিল গাঙ্গুলীর মস্ত বড় 'কোয়ালিফিকেশন' সে বম্বেতে অনেকদিন কাটিয়েছে। সে এসে বললে—"আরে ছোঃ, চাল-ডালের ব্যবসা কি একটা ব্যবসা নাকি? ওর স্কোপ কত লিমিটেড! ওর ফিউচার কি! এখন ফিউচার আছে প্ল্যাস্‌টিকের। কিছু ক্যাপিটাল যদি ছাড়তে পার দু'দিনেই লাল হ'য়ে যাবে!"

লাল-স্বপ্ন-জনক এই জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাওয়াতে মনের নিরুদ্ধ ভাব চেপে রাখা অসম্ভব হ'ল ঘণ্টুর পক্ষে। একটি পার্কে বসে' সমস্ত কথা সে বললে তাকে। জটিল স্বল্পভাষী লোক। ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকিয়ে সিগারেট টানতে টানতে ঘণ্টুর সমস্ত কথা শুনেও চুপ করে' রইল সে। কারণ ঘণ্টু যা বললে তাতে সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠার মতো কোনও মাল-মশলা আছে বলে' তার মনে হ'ল না।

"মামার বিষয়টা যদি পেয়ে যাই তাহ'লে ক্যাপিটালের ভাবনা কি? মামার হার্ড-ক্যাশই নাকি এক লাখ টাকা আছে শুনেছি। তবে দিবুদা যদি এসে পড়ে তাহ'লে অবশ্য—"

এইবার জটিল গাঙ্গুলী বোম্বাই ফোড়নটি ছাড়লেন।

"তোমার মামার টাকার উপর সত্যিই যদি নির্ভর করতে চাও, তাহ'লে তোমার দিবুদা যাতে না ফেরেন সেই চেষ্টাই করা উচিত তোমার।"

"তা কি করে' সম্ভব! দিবুদা কোথায় আছে তাই জানা নেই প্রথমত। দ্বিতীয়ত—"

"যদি সম্ভব হয় তাহ'লেই বলছি। না যদি সম্ভব হয় তাহ'লে আর কি করে' করবে? আচ্ছা উঠি এবার।"

"হ্যাঁ চল, মামার জন্যে ওষুধ আনতে যেতে হ'বে আমাকে।"

জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপের পর ঘণ্টুর চিন্তাধারা জটিলতর

হ'য়ে গেল। তার এবং তার ভবিষ্যতের মাঝখানে নিরুদ্দিষ্ট দিবসের ছায়ামূর্তিটা প্রেতের মতো সঞ্চরণ করে' বেড়াতে লাগল।

গহনচাঁদ নিজের ঘরে বসে' তানপুরো বাজিয়ে নূতন যে শিব-স্তোত্রটিতে সুর দিয়েছিলেন সেইটে গাইছিলেন তন্ময় হ'য়ে।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো
ভূতেশ ভীত-ভয়-সূদন মামনাথং
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।

মহাদেবের মহিমায় ততটা নয়, তিনি যে স্তোত্রটাতে সুর বসাতে পেরেছেন এরই আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠেছিল তাঁর মন। তাঁর বন্ধু বিশ্বনাথ কথক একটু পরেই আসবেন, চুনীলাল তাঁকে আনতে গেছে স্টেশনে। একাই গেছে। চুনীলাল আর একটা মতলব করেছিল ইতিমধ্যে। সে ভেবেছিল বাড়িটা বাঁধা দিয়ে যদি বেশী কিছু টাকা পাওয়া সম্ভব হয়, তাহ'লে সেই বাড়তি টাকাটা নিয়ে হরলাল সিংহির ধারটা সে শোধ করে' ফেলতে পারবে। কিন্তু বেশী টাকা পাওয়া সম্ভব কি না, বিশ্বনাথ কথক টাকা পাবার কোথায় কি বন্দোবস্ত করেছেন, এই সবেরই একটা হদিস পাওয়ার জন্যে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে স্টেশনে গিয়েছিল বিশ্বনাথ কথককে আনতে। গহনচাঁদও সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গহনচাঁদকে কৌশল করে' নিবৃত্ত করেছিল সে। কারণ গহনচাঁদের সামনে ওসব টাকাকড়ির আলোচনা উত্থাপনই করা যাবে না। স্টেশনে যেতে না পেরে গহনচাঁদ শঙ্করাচার্যের স্তোত্রটাকে নিয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বনাথকে তাক্ লাগিয়ে দেবেন তিনি। সীতারাম এখনও এসে পৌঁছায় নি, এই চিন্তাটা মাঝে মাঝে অধীর করছিল তাঁকে, এইজন্যে মাঝে মাঝে

একটু অন্যমনস্কও হ'য়ে পড়ছিলেন, তথাপি তিনি মশগুল হ'য়েই ছিলেন। সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে সুর মিলে অদ্ভুত পরিবেশ হয়েছিল একটা।

পাশের ঘরে ছিল উর্মি আর রঞ্জনা। উর্মির সঙ্গে রঞ্জনার বন্ধুত্ব বেশ জমে' উঠেছিল এই ক'দিনের মধ্যেই। বয়স যখন কম থাকে তখন বন্ধুত্বটা খুব তাড়াতাড়ি জমে' যায়। তাছাড়া উর্মির অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। আলাপ না করে' সে ছাড়ে না। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির লোকেরা খবর পেলে নিশ্চয় তাকে দালাল নিযুক্ত করতে চাইত এবং করে' লাভবানও হ'ত। রঞ্জনার গানের প্রশংসা করে' মলঙ্গা লেনের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কিরণের গান রেকর্ড করবার ব্যবস্থা প্রায় সে করে' ফেলেছে। জীবনের আরম্ভে ভাগ্য-দেবতা যদিও প্রতিকূল স্রোতের মুখে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে কিন্তু সাঁতরে ঠিক পার হ'য়ে যাচ্ছে। কিছুতেই দমবে না। উর্মি না হ'য়ে আর কেউ হ'লে রঞ্জনার সঙ্গে এত সহজে আলাপ জমাতে পারত না। রঞ্জনা লোক খারাপ নয়, কিন্তু মনে সুখ নেই তার, কিরণের মতোই তার মনের অবস্থা, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মিল হচ্ছে না কিছুতেই এবং তার ফলে মনের ভিতর এতরকম প্যাঁচের সৃষ্টি হয়েছে যে ইচ্ছে থাকলেও কারও কাছে সে মন খুলতে পারে না সহজে। অনেকগুলো প্যাঁচ কিন্তু সহসা শিথিল হ'য়ে গেছে দিবসের সংস্পর্শে এসে। তার স্বপ্নটা যেন বাস্তবে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। যাবজ্জীবন-কারাবাস-দণ্ডিত বন্দী হঠাৎ যেন আভাস পেয়েছে সে মুক্তি পাবে, কোথায় কি ভাবে তা যদিও সে জানে না, কিন্তু মুক্তির আভাস যেন হাওয়ায় ভাসছে। দিবসের সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল তাদের। রঞ্জনার মন দিবসের সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাইছিল কারও সঙ্গে, উর্মির মতো সহৃদয় সহানুভূতিশীল সঙ্গী পেয়ে বেঁচে গেছে যেন সে।

বিশ্বনাথ কথক, চুনীলাল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রমজান সীতারাম

এসে পড়াতে গহনচাঁদের সংগীত-চর্চা এবং রঙ্গনার কল্পনাবিলাস ব্যাহত হ'ল। সবাই বাইরের ঘরে এসে হাজির হ'লেন।

"আরে, এর মধ্যেই ট্রেন এসে গেল নাকি। ব'স ব'স ব'স। ট্রেনে কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই, যা ভিড় আজকাল। ব'স ব'স।"

গহনচাঁদ এমন নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিশ্বনাথকে যে বসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

"ছাড় ছাড়, এমন জড়িয়ে ধরলে বসব কি করে' ?"

সীতারাম রমজানের অভিবাদনের উত্তরে কথকমশাই হেসে বললেন, "তোমরাও বেশ জমে' গেছ দেখছি যেএখানে—অ্যাঁ !"

রঙ্গনাও এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

"আরে, এটা যে লাউডগার মতো তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে দেখছি !"

সবাই উপবেশন করলে পর কথকমশাই গহনচাঁদের দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বললেন, "টাকার যোগাড় করে' এনেছি, এবার মা-জননীর বিয়েটা লাগিয়ে দাও। পাত্রটি তো বেশ ভাল পেয়েছ চুনীর মুখে শুনলাম।"

রঙ্গনা অপ্রত্যাশিতভাবে বলে' উঠল, "আমি বিয়ে করব না ওখানে। আমার বিয়ের জন্যে বাড়ি বাঁধা দিয়ে পণ সংগ্রহ করতে হ'বে না।"

বলেই সে উঠে চলে' গেল। উর্মিও অনুসরণ করল তাকে।

কথকমশাই হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন গহনচাঁদ। কথকমশাই বললেন, "বিয়ের কথা উঠলে আগে তো ছেলেরাই বলত বিয়ে করব না। আজকাল মেয়েরাও. বলছে নাকি ?"

গহনচাঁদ অপ্রস্তুতমুখে বললেন, "বাড়ি বাঁধা দিয়ে পণের টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে কিনা, সেইজন্যেই ওর রাগ। লেখাপড়া শিখেছে তো !"

"বাড়ি বাঁধা না দিলে পণের টাকা পাবে কোথায় তুমি? আর পণ না হ'লে বিয়েই বা হ'বে কি করে'?"

"সে তো আমি বুঝছি। বুঝিয়ে বলেওছি ওকে।"

মুচকি হেসে কথক বললেন, "ঘাবড়িও না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। এক কাজ করা যাক, সাবিত্রী-সত্যবানের কথকতাটা ওকে শুনিয়ে দেওয়া যাক। শুনলে বুঝবে যে আমাদের কিছুই হাত নেই, সবই বিধির নির্বন্ধ। ধর্মগ্রন্থ তো পড়ে না আজকালকার ছেলেমেয়েরা।"

এ শুনে' গহনচাঁদ উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন।

"বেশ তো কালই লাগাও। তৈরী আছে তোমার তো?"

"হ্যাঁ, আমি সব সময়ই তৈরী। তুমি এখানে একটা গানের স্কুল খুলেছ নাকি শুনলাম।"

"হ্যাঁ, জুটে গেছে কিছু ছাত্র-ছাত্রী এখানেও। আমি আর একটা কাজ নিয়ে মেতে আছি। শিব-স্তোত্রগুলোতে নূতন নূতন সুর বসাবার চেষ্টা করছি। শোনাব তোমাকে।"

"বেশ তো, চুনী কোথায় গেল, আমার তোরঙ্গটা নামিয়েছে কি না।"

"সব নামিয়েছে"—নেপথ্যে থেকে উত্তর দিলে চুনীলাল। বেচারা দমে' গিয়েছিল। বাড়ি বাঁধা দিয়ে সাত হাজার টাকার বেশী পাওয়া যায় নি। ও টাকাটা তো বিয়েতেই খরচ হ'য়ে যাবে, কিছুই বাঁচবে না।

"চল চল, ভিতরে চল। সীতারাম, রমজান ব'স তোমরা।"

বিশ্বনাথ কথককে নিয়ে গহনচাঁদ শশব্যস্ত হ'য়ে বাড়ির ভিতরে চলে' গেলেন।

সীতারাম এবং রমজান দু'জনেই কিন্তু বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। গুরুজির কাশীর বাড়ি বাঁধা দিয়ে পণের টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে। সে কি! এর একটা বিহিত করতে হ'বে তো। রঙ্গনার

মতো মেয়েকে বিয়ে করতে পাওয়াটাই তো ভাগ্যের কথা, তার জন্যে আবার পণ লাগবে অত টাকা, বাড়ি বাঁধা দিতে হ'বে? নিম্নকণ্ঠে পরামর্শ করে' ঠিক করে' ফেললে তারা যে, দিবসবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে 'সল্লা' করতে হ'বে। গুরুজির বাড়িটা মহাজনের হাতে যেতে দেওয়া হ'বে না। দিবসবাবু লোকটিকে যতই দেখছে তারা, ততই তার উপর শ্রদ্ধা বাড়ছে। তিনি হয়তো ব্যবস্থা করতে পারবেন কিছু। ব্যবস্থা করতেই হ'বে! জরুর!

দিবসের মনের নেপথ্যলোকে পরিবর্তনের যে আভাসটা জাগছিল, ধীরে ধীরে তা আর আভাসমাত্র রইল না। ক্রমশ সে উপলব্ধি করল যে, এই সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কল্পনা-উল্লাস-বর্জিত কর্মজীবনে আনন্দ সে আর পাচ্ছে না। এই 'রুটিন'-চিহ্নিত জীবন তার কাছে কারাগারের মতো ঠেকছিল, তার কারণ এতে কল্পনার খোরাক নেই, আত্মানুসন্ধান নেই, অজানার উদ্দেশ্যে অভিযানের আয়োজন নেই, আছে কেবল শুষ্ক কাজ, যা প্রেরণাহীন, উদ্দীপনাহীন। একই জিনিসের বিরামহীন পুনরাবৃত্তি।

যে বি-এস-সি ছেলেটিকে সে দুপুরে পড়ায় তার সান্নিধ্যে এলেই সে চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে খানিকক্ষণের জন্য। একদিন ছেলেটির অসুখ করেছিল, সেদিন সে সোজা চলে' গেল কলেজে। প্রফেসারদের সঙ্গে কথা বললে, দু'একজন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হ'ল, ল্যাবরেটরিতে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াল খানিকক্ষণ, এটা-সেটা নাড়লে, তারপর চলে' এল। একজন প্রফেসার প্রশ্ন করেছিলেন, "কি করছ তুমি আজকাল? শুনেছিলাম ল' কলেজে ঢুকেছ?"

"তেমন বিশেষ কিছুই করছি না। ল' কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।"

"আমরা আশা করেছিলাম তুমি রিসার্চ লাইনেই থাকবে।"

"দেখি আর বছর চেষ্টা করব।"

নিজের বর্তমান জীবনের কথা কাউকেই কিছু বললে না সে। কলেজের চারিদিকে ঘুরে' সে যেন ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়ল। নিজের প্রিয়া অপরের গলায় মাল্যদান করছে দেখলে প্রথম উত্তেজনার পর যে অবসাদ আসে, সেই ধরনের একটা বিষাদ তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে' ফেললে। কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা গলিতে ঢুকে সোজা হাঁটতে লাগল। সদর রাস্তা দিয়ে পারতপক্ষে সে হাঁটতে চায় না, কারণ হাঁটতে হাঁটতে সে চিন্তা করে, অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে।

রঞ্জনাকে ঘিরে তার চিত্ত যে বর্ণলোক সৃজন করেছিল তার দ্যুতিও ম্লান হ'য়ে এসেছে। গিরি-নির্ঝরিণী যে গহ্বরে পড়ে' কিছুক্ষণের জন্য প্রপাতের আনন্দে পথ-হারা হয়েছিল, সে গহ্বর পূর্ণ হ'য়ে গেছে, জল উপচে পড়ছে, নির্ঝরিণী নূতন পথ খুঁজছে আবার। রঞ্জনাকে তার যে আর ভাল লাগছিল না তা নয়, ভাল খুবই লাগছিল, কিন্তু উন্মাদনাটা আর ছিল না। নেশাটা হঠাৎ কেটে' গেছে যেন। সেদিন স্টেশনে 'বাস'-ট্যাক্সির আলোচনার জন্যই হোক বা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক, তার অন্তর্যামী-মন যেন জানতে পেরেছে যে তার দারিদ্র্যের আদর্শকে মেনে নিয়ে শুধু তার গৌরবের গৌরবান্বিত হবার প্রবণতা বা চারিত্রিক বল রঞ্জনার নেই। আর পাঁচটা মেয়ের মধ্যে রঞ্জনা সুখে-স্বচ্ছন্দে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করতে চায়। আদর্শের দুরূহ পথে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে' মরু-পর্বত উত্তীর্ণ হবার বাসনা তার নেই। সামর্থ্যও নেই বোধ হয়। তার নিজেরই কি আছে? একটা আদর্শকে রূপ দেবার জন্যেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, এরই মধ্যে অবসন্ন হ'য়ে পড়ছে কেন? কি তার কাম্য? গবেষণার কল্পলোকে একদিন তাকে পৌঁছতেই হ'বে, কিন্তু তার আগেই সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে কেন? সহসা তার মনে হ'ল গীতা উপনিষদ্ সে কিছু কিছু পড়েছে বটে, নিষ্কাম কর্মের তত্ত্বতা আওড়াতেও পারে, কিন্তু তা তার অন্তরে সঞ্চারিত হয় নি, চরিত্র গঠন করে নি, তাই তার এই বিষাদ। পরমুহূর্তেই তার আবার মনে

হ'ল, যা তার নেই তা নিয়ে আক্ষেপ করে' লাভ নেই, যা তার আছে সেইটে সম্বল করেই তাকে অগ্রসর হ'তে হ'বে। কি সেটা?

কিছুক্ষণ পরে তার মনে হ'ল অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষাই তার একমাত্র সম্পদ্। অসংখ্য মুনি-ঋষি বিজ্ঞানী আবিষ্কারক যে প্রেরণায় বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, সেই প্রেরণাই তারও সম্বল। সেই অজানাই হয়তো ভগবান। এই কথাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তো বলেছেন—

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিসু ।

আমিই পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন এবং তপস্বিগণের তপোবল। তার নিউক্লিয়ার এনার্জির গবেষণাও তাহ'লে ভগবদারাধনাই। সে জিজ্ঞাসু। তাহ'লে সে এত অবসন্ন হ'য়ে পড়ছে কেন? এই একটা বছর কষ্ট করে' সে যদি কিছু টাকা জমাতে পারে তাহ'লে আবার সে নিজের অভীষ্টপথে চলতে পারবে। তার মনের ভিতর কে যেন বলে' উঠল—'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়'। হঠাৎ সে যেন আত্মস্থ হ'ল এবং আত্মস্থ হ'য়েই আনন্দিত হ'ল। তার মনে হ'ল গীতার নিষ্কাম বৈরাগ্য হয়তো সে লাভ করতে পারে নি, (পারে নি বলে' খুব যে একটা দুঃখ আছে তাও নয়) কিন্তু গীতার কর্ম-প্রেরণা সে লাভ করেছে, এই কর্ম-প্রেরণাই হয়তো একদিন তাকে নিষ্কামলোকে উত্তীর্ণ করে' দেবে। যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু গীতা উপনিষদের প্রতি তার একটা শ্রদ্ধা আছে, হয়তো বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই শ্রদ্ধাটা আরও গভীর। যে সত্য সন্ধানে বিজ্ঞান ব্যাপৃত, তার মনে হয়েছে সেই সত্যের আভাস, সন্ধান এবং উপলব্ধির সংবাদ ওই গ্রন্থগুলিতেই আছে, সুতরাং গীতার বাণীর সঙ্গে তার আচরণের খানিকটা মিলও যে আছে এটা আবিষ্কার করে' সে খুশী হ'ল। আপন মনেই শিস্ দিলে

খানিকক্ষণ। শিস্ দিতে দিতেই চলেছিল। হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল কিরণের সঙ্গে।

"তিনবার তোর বাসায় গিয়ে ফিরে এসেছি। তুই বাড়িতে থাকিস কখন আজকাল?"

"রাত এগারোটার পর।"

"দুপুরে কি করিস?"

"দুপুরে একটা টিউশনি নিয়েছি।"

"সন্ধ্যের পর?"

"সরোদ শিখতে যাই। তুই যাস না কেন?"

"সময় হয় না ভাই।"

নীরবে কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটবার পর কিরণ বললে, "তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একদিন রাস্তায়।"

"তাই নাকি?"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল দিবস।

"তারপর?"

"তোর ঠিকানাটা জানতে চাইলেন।"

"দিয়েছিস নাকি?"

তার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে'উঠল, আশঙ্কায় নয়, আশায়।

কাল রাত্রেই সে ভাবছিল বাবা যদি হঠাৎ এসে পড়েন—তারপর যে কি হ'বে তা সে কল্পনা করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছিল, ফিরে যে যাবে না তা ঠিক, কিন্তু বাবা যদি আসেন, তাহ'লে—

"না। তুই মানা করেছিলি, তোকে না জিগ্যেস করে' ঠিকানা দিতে পারি কখনও?"

দিবস বললে বটে—"ঠিক করেছিস" কিন্তু ভিতরে একটু হতাশ হ'ল সে। আরও কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটার পর কিরণ মুচকি হেসে বললে—"আমি আশা করেছিলাম যে এর মধ্যে একদিনও অন্তত তুই আমার বাসায় যাবি, অন্তত রবিবারটায়।"

"সময়ই পাচ্ছি না।"

"সময় না পাবার যে কারণগুলো তুই বললি তাছাড়া আর একটা কারণেরও খবর পেয়েছি ঊর্মির কাছে।"

"কি ?"

"রঙ্গনা।"

"আরে ধ্যুৎ, পাগল নাকি! কি বলেছে তোকে, ঊর্মি ?"

কিরণের ভয় হ'ল দিবস হয়তো ঊর্মির সম্বন্ধে এখনই একটা খারাপ ধারণা করে' বসবে—ভাববে সাধারণ মেয়েদের মতো ঊর্মিও হয়তো পরনিন্দা-পরচর্চা পরায়ণা।

"না, না, এমন বিশেষ কিছু বলে নি সে। তুই যেদিন রঙ্গনার জন্যে আয়নাটা কিনে নিয়ে গিয়েছিলি সেদিন ঊর্মি সেখানে ছিল কিনা, সেই আয়নার খবরটাই আমাকে বলছিল। আর কিছুই বলে নি। মানে তুই যা—"

কথার পারম্পর্য আর ঠিক রাখতে পারলে না সে, কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে গেল সব। রঙ্গনার সম্বন্ধে দিবসকে যতটা কড়া ভাষায় সাবধান করে' দেবে ভেবেছিল, ঊর্মির প্রসঙ্গ উঠে পড়াতে ততটা কড়া হবার সামর্থ্যই আর তার রইল না।

"একটা আয়না কিনে দিয়েছি বটে, তার কারণ আমার চোখের সামনেই ওর আয়নাটা ভেঙে গেল কিনা, হঠাৎ কেমন একটা শিভলরি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মনের ভিতর, বুঝলি ?"—মুচকি হেসে চাইলে সে কিরণের দিকে—"তাছাড়া আর একটা কথাও মনে হয়েছিল, সত্যি এত বিচিত্র আমাদের মন—"

"কি কথা ?"

"মনে হ'ল আয়নাটা কিনে দিয়ে দেখিই না ও কি করে। রিঅ্যাকশন্‌টা কি রকম হয়।"

"কি রকম হ'ল ?"

"ভালই হ'ল। অর্থাৎ চটে' উঠল সে। সাধারণ মেয়ে হ'লে খুশী হ'ত।"

"তাহ'লে রঙ্গনা যে অসাধারণ মেয়ে এ ধারণাটা তোর হয়েছে অন্তত ?"

"হয়েছিল কিন্তু টিকল না। তোর কথাই ঠিক, খোলার ঘরে ও আসবে না, এলেও স্বস্তি পাবে না। থাক, ওকথা নিয়ে আমি আর মাথাই ঘামাচ্ছি না। সেই যে তুই একটা কবিতা লিখেছিলি, মনে আছে? 'হয়তো স্বপন হয়তো ভুল, ফুটিল এবং ঝরিল ফুল, এখন আমার মনের অনেকটা সেইরকম অবস্থা"—অকৃত্রিম হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল দিবসের মুখ।

"মানে রঙ্গনার সম্বন্ধে মোহটা তোর কেটে' গেছে বলছিস ?"

"একেবারে।"

"সত্যি ?"

"সত্যি বলছি।"

দিবসের কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুনিশ্চিত দৃঢ়তার সুর বাজল যে কিরণ নিঃসংশয় হ'ল। নিঃসংশয় হ'য়ে সে শুধু অবাকই হ'ল না, একটু ক্ষুব্ধও হ'ল, কেমন যেন একটু হিংসাও হ'ল তার। মনে হ'ল, আহা সেও যদি ঊর্মির মোহটা এমনিভাবে কাটিয়ে উঠতে পারত। কথাটা বলে' দিবসও কেমন যেন একটু বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছিল। রঙ্গনাকে সে ভালবাসতে পারল না, এই সত্যটা যেন তাকে পীড়িত করতে লাগল। তার মনে হ'তে লাগল, একটা গোটা মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শের মাপে মাপতে গিয়ে যদি কিছু ঘাটতিই পড়ে' থাকে তাই বলে' তাকে ভালবাসা যাবে না কেন? সহসা একটা সত্যের সম্মুখীন হ'ল সে। তার মনে হ'ল ওটা ছুতো। যে নিগূঢ় কারণে প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়, সেই নিগূঢ় কারণটারই অভাব আছে এক্ষেত্রে। দোকানে টাঙানো নূতন ধরনের ছিট যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রঙ্গনাও তেমনি তার দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছিল, তার প্রেমে সে পড়ে নি। পড়লে আদর্শের কথা ভাববারই অবসর হ'ত না তার। আবার মনে হ'ল সত্যিই কি হ'ত না? এতই দুর্বল সে? তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হ'ল কিরণের প্রশ্নে।

"সত্যিই তুই বাড়ি ফিরবি নাকি?"

"নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপর ফিরব। তার আগে নয়।"

"তোর বাবা বলেছিলেন, বাড়ি ফিরে গিয়েও তুই তোর নিজের আদর্শ অনুসারে যদি চলতে চাস তাহ'লে বাধা দেবেন না তিনি।"

"তিনি হয়তো বাধা দেবেন না, কিন্তু ওই বাড়িতে থাকাটাই একটা বাধা যে, এটা তুই বুঝতে পারছিস না। আমি নিজেকে যাচিয়ে দেখতে চাই যে নিজের শক্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কি না, তার জন্যে সব রকম কষ্ট সহ্য করতে পারি কি না। বাড়িতে থেকে তা হ'বে কি করে'?"

"তোর ঠিকানাটা তাহ'লে তোর বাবাকে জানাব না?"

"সেটা তোমার ইচ্ছে। তুমি তো আমার চাকর নও যে তোমাকে আমি হুকুম করতে পারি।"

কথাটা এর বেশী অগ্রসর হবার আর সময় পেল না। একটা দোতলার জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে সীতারাম সহসা কলরব করে' উঠল—"ওয়া ওয়া ওয়া—দিবসবাবু যা রহে হেঁ। দিবসবাবু এক মিনিট ঠহর যাইয়ে।"

দিবস উর্ধ্বমুখ হ'য়ে থেমে' গেল।

কিরণ বললে, "আমি চললুম। সময় করে' আসিস মাঝে মাঝে আমার বাসায়। এ সপ্তাহটা সন্ধ্যের পর আমি রোজই বাসায় থাকব। ন'টা নাগাদ যদি আসিস দেখা হ'বে।"

"আচ্ছা, চেষ্টা করব।"

কিরণ চলে' গেল। তার বিশ্বাস হ'ল যে রঞ্জনার মোহ দিবস সত্যিই কাটিয়েছে, ও নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই আর।

সূর্য চৌধুরীকে দিবসের ঠিকানাটা না জানানোই ঠিক করে' ফেললে সে। দিবসের যখন সেটা আন্তরিক ইচ্ছে নয় তখন দরকার কি।

সীতারাম তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এল।

"ওফ্, তফাক সে আপকো দর্শন মিল গ্যয়া। আপ হি কো বাত হম দোনো স্মরণ কর রহে থে।"

দিবসকে টেনে' সে উপরে নিয়ে গেল এবং রঙ্গনার বিয়েতে গহনচাঁদের যথাসর্বস্ব বাড়িটি যে সুদখোর মহাজনের হাতে চলে' যাচ্ছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করে' দিবসকে এর উপায় নির্ধারণ করতে বললে। দিবস কি যে বলবে তা ভেবেই পেল না। খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে সে বললে, "আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।"

বিকাশবাবু মনের আনন্দেই ছিলেন। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি রঙ্গনাকে পাওয়ার স্বপ্নেই বিভোর হ'য়ে ছিলেন সর্বদা। তিনি তাঁর বেহালা, ক্লাব, টেনিস, মোটর, সমরেশ-জাতীয় বন্ধুর খোসামোদ প্রভৃতি উপাদানে গড়া তাঁর নিজস্ব জগতে নিজেকে নিয়েই কাল কাটাচ্ছিলেন যথারীতি। যে মেয়েটিকে হঠাৎ দেখে' পছন্দ হয়েছিল সেই মেয়েটিই বধূরূপে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর গলায় মাল্যদান করবে, এই ধারণাটা তাঁর আকাশকে কিছুটা রঙীন করে' তুলেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তা নিয়ে মনে মনেও তিনি খুব একটা মাতামাতি করছিলেন না। আলতোভাবে উপভোগ করছিলেন পরিস্থিতিটা। জ্যাঠামশাই মত না দিলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ত, তিনি মত দেওয়াতে তাও হয় নি। কুষ্ঠি নিয়ে একটা গোলমালের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চুনীলালবাবু বুদ্ধিমান লোক, মাস্টার 'কি'র (key) মতো এমন এক মাস্টার কুষ্ঠি এনে দিয়েছিলেন যে, সে কুষ্ঠির সঙ্গে যে-কোনও কুষ্ঠির মিল হ'তে বাধ্য। রঙ্গনার কুষ্ঠিটা দেখে'

জ্যাঠামশাই খুব পুলকিত হয়েছেন নাকি। কুষ্ঠি ব্যাপারে বিকাশ-বাবুর নিজের তেমন আস্থা নেই। তাঁর মতে জীবনে যখন প্রতি মুহূর্তে কত অজানাকে মেনে নিতে হ'বে তখন ভাবী-পত্নীর অদৃষ্ট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'লেই যে জীবনযাত্রা নিষ্কণ্টক হ'য়ে যাবে এ বিশ্বাস মূঢ়তারই নামান্তর।

বিকাশবাবুকে দেখলে আধুনিক মনে হওয়ারই কথা। তিনি আধুনিক সময়ে জন্মেছেন, আধুনিক শিক্ষা পেয়েছেন, আধুনিক চাল-চলনে চলেন, কিন্তু সত্যিকারের আধুনিকতা, যা প্রাচীন কুসংস্কারকে ভেঙে নূতন পথ সৃষ্টি করে, তা তাঁর নেই। তিনি একালে জন্মেছেন বলেই ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে পাইপ টানেন, সেকালে জন্মালে শাল গায়ে দিয়ে গড়গড়া টানতেন। নির্বিবাদী লোক তিনি, গতানুগতিক ধারায় ঝড়ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতেই তিনি অভ্যস্ত। তাই চুনীলালের অনুরোধটা রাখতে পারলেন না। চুনীলাল এসে অনুরোধ করেছিল বিকাশবাবু যদি তাঁর জ্যাঠামশাইকে একটু বলেন, পণের টাকাটা হয়তো কম করে' দেবেন তিনি।

বিকাশবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"দেখুন, পণের টাকার প্রতি 'পারসোনালি' আমার কোনও লাভ নেই, কিন্তু জ্যাঠামশাইকে পণের টাকা কামাবার কথা আমি বলতে পারব না। কারণ ওটা ওঁর এলাকা, পরের এলাকায় ঢুকে ঝামেলা সৃষ্টি আমি করতে পারব না, আমাকে মাপ করুন।"

চুনীলালকে মাপ করতে হয়েছিল। বিকাশবাবুর কাছে একটা প্রতিশ্রুতি অবশ্য সে আদায় করে' নিয়েছিল। বিয়েটা হ'য়ে গেলেই তিনি তাঁর নূতন বাড়ির জন্য অন্নদা বিশ্বাসের ইলেকট্রিক দোকানের মালপত্রগুলো কিনে নেবেন। চুনীলাল দোকানটাকে অন্নদা বিশ্বাসের দোকান বলেই চালিয়েছিল বিকাশবাবুর কাছে। তার মনে হয়েছিল তাহ'লেই বিকাশবাবুর কাছে 'আপীল' করারও

সুবিধা হ'বে, দামের সম্বন্ধেও কোনও গোলযোগ হ'বে না। মামা-শ্বশুরের দোকান জানতে পারলেই ছোকরা 'গয়ং গচ্ছ' করবে, আর দাম যদি কম করতে বলে, 'না' করা যাবে না।

বিশ্বনাথ কথক আসার পরদিনই চুনীলাল বিকাশকে জানিয়ে গেল যে প্রকাশবাবু রঞ্জনাকে দেখার দিন স্থির করে' ফেলেছেন। মেয়ে পছন্দ হ'লে সাতদিনের মধ্যেই বিয়ে হ'য়ে যাবে। মেয়ে যে পছন্দ হবেই এ সম্বন্ধে বিকাশের অন্তত কোনও সন্দেহ ছিল না।

তেরো

সেদিন স্টেশনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে দিবসের বাসে উঠে রঞ্জনা মনে মনে লজ্জায় মরে' গিয়েছিল, তার বার বার মনে হয়েছিল যেচে গিয়ে অমন করে' গায়ে পড়ে' আলাপ করার কোনও অর্থ হয় না। মনে হয়েছিল বটে, যাবার লোভ কিন্তু সে সংবরণ করতে পারে নি। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে এর স্বপক্ষে একটা যুক্তিও সে খাড়া করেছিল অবশেষে। যাকে ভাল লাগে তার কাছে যাবেই না বা কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল সে। আত্মসম্মানহানিকর কোনও আচরণ না করলেই হ'ল।

দ্বিতীয় দিন কলেজ-ফেরত দিবসের বাসার উদ্দেশ্যে সে যখন চলেছিল তখন যে ক্ষোভ তার চিত্তকে মথিত করছিল তা আত্ম-গ্লানিজনক নয়। তার ভয় হচ্ছিল দেরি হ'য়ে গেছে, দিবসকে হয়তো বাসায় পাওয়া যাবে না। মালাগুলো কিনতেই দেরি হ'য়ে গেল তার। আজ সন্ধ্যার পরই কথকতা করবেন বিশ্বনাথ কথক। গহনচাঁদ তাই তাকে কলেজ-ফেরত কিছু ফুলের মালা কিনে আনবার ফরমাশ দিয়েছিলেন। বিশ্বনাথ কথক আসবার পর দিবস

আর যায় নি একদিনও। তাকে যেতে হচ্ছিল অতসী ক্লিনিকে। 'দিবস কেন যায় নি' এই কৌতূহলটাকে কিছুতেই দমন করতে না পেরে' শেষে ছুটো ওজুহাত খাড়া করেছিল রঙ্গনা। দিবসের 'আই উইল্ নট্ রেস্ট' বইটা তার কাছে রয়েছে, এইবার সেটা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তাদের বাড়িতে কথকতা হচ্ছে এ খবরটাও তাকে দেওয়া উচিত। দ্বিবিধ ঔচিত্যবোধের তাগিদে সে যেন একটা কর্তব্য সম্পাদন করতে চলেছিল। সেদিন 'বাসে' মনের যে অংশটা কুণ্ঠিত হয়েছিল সে-ই এখন ধমকাচ্ছিল অতি-বিশ্লেষণকারী অংশটাকে। এই অতি-বিশ্লেষণকারী অংশটা কিন্তু ছিল, তার প্রতিবাদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছিল যদিও, তবু সে বলে' যাচ্ছিল এ ঠিক হচ্ছে না, যতই ব্যাখ্যা কর, কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, আত্মসম্মানে ঘা লাগছে।

রঙ্গনা গিয়ে দেখলে দিবসের ঘরে তালা বন্ধ। সোজা চলে' গেল উঠোনে। হাঁসটা বসেছিল একধারে গুটিসুটি হ'য়ে। তার কাছে গিয়ে রঙ্গনাও বসল। রঙ্গনাকে বসতে দেখে' প্রতিবাদ করে' উঠল হাঁসটা।

"আঃ, আঃ চু-চু"—মালার ঠোঙা দেখিয়ে ডাকলে সে হাঁসটাকে। হাঁসটা সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল একবার। খাবার-টাবার দেবে নাকি সত্যি?

এমন সময় সৌদামিনী এল।

"ও, আপনি।"

"দিবসবাবু বেরিয়ে গেছেন বুঝি? তাঁর ঘর বন্ধ দেখলাম।"

"সে গেছে হাসপাতালে বোধ হয়।"

"কেন?"

"পটলির স্বামীকে দেখতে। তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে কিনা।"

"ও, খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুঝি

"খুব।' কয়েকটা ইন্‌জেকশন পড়াতে এখন একটু ভালর দিকে।"

সৌদামিনীর সঙ্গেই দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল রঙ্গনা।

সাড়ম্বরে কথকতা শুরু করেছিলেন বিশ্বনাথ কথক।

আবেগভরে কিন্তু যে সুর ধরেছিলেন তিনি—(সেই চিরন্তন সুর যা যুগে যুগে নিত্যনব বেশে ফিরে ফিরে আসছে বার বার)—সেই সুর যে তাঁদের উদ্দেশ্যটাকেই পণ্ড করে' দিচ্ছে এ খেয়াল ছিল না তাঁর। 'বিধির নির্বন্ধ' কথাটা প্রথম প্রথম দু'একবার উচ্চারণ করেছিলেন তিনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগে তিনি যে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিলেন তা কোনও রকম নির্বন্ধ দিয়েই সীমাবদ্ধ নয়।

"প্রেম এমনই জিনিস"—বলে' চলেছিলেন তিনি—"কুসুমের মতো কোমল অথচ বজ্রের মতো কঠিন, আকাশের মতো সীমাহীন অথচ রত্নের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ, সৌরভের মতো সূক্ষ্ম অথচ পর্বতের মতো দৃঢ়। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যার জন্যে প্রতি জীবের অন্তরে ভিখারী সেজে বসে' আছেন, সেই প্রেমই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্ন, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য। মানবের সমস্ত কাব্য, সমস্ত পুরাণ তাই প্রেমের মহিমাতেই সমুদ্ভাসিত। বস্তুতঃ এই আমাদের তপস্যা, এই তীর্থেই আমরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে উত্তীর্ণ হ'তে চাচ্ছি। প্রেমই ভগবান, প্রেমই শক্তি। এই শক্তিতেই জনক-দুহিতা সীতা তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন ত্রিভুবনজয়ী রাবণের ঐশ্বর্যকে, বৃষভানুনন্দিনী রাধা সহ্য করতে পেরেছিলেন সমাজের সহস্র অত্যাচার। প্রেম এমনিই জিনিস। তা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করায়। প্রেম ঐশ্বর্যের কাঙাল নয়, প্রেম মোহ নয়, প্রেম দিব্যদৃষ্টি। শ্রীরাধিকা মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন নি, ভালবেসেছিলেন রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণকে। সীতার প্রেম গাঢ়তর হয়েছিল বন-

গমনোন্মুখ চীরধারী নিঃস্ব রামচন্দ্রকে ঘিরে। রাজকন্যা দময়ন্তীর প্রেম উজ্জ্বলতর হয়েছিল ভাগ্যহত নলের দীনতার অন্ধকারে। এই প্রেমই পথ দেখিয়েছিল সাবিত্রীকে। দরিদ্র বনবাসী স্বল্পায়ু সত্যবানকে বরণ করতেও দ্বিধা করেন নি তিনি। পিতামাতার আদেশ অমান্য করেও বনবাসী সত্যবানের পর্ণকুটিরে গিয়ে বনবাসিনী হয়েছিলেন রাজনন্দিনী সাবিত্রী। প্রেমই তাঁকে সে শক্তি দিয়েছিল।”

গান গেয়ে উঠলেন বিশ্বনাথ কথক—

ওগো প্রেম, বিশ্বমাঝে
তুমিই গতি পরাৎপর
তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু,
তুমিই ভোলা মহেশ্বর,
ভুবন-ভরা তোমার আলো
দেয় ঘুচিয়ে সকল কালো
মহাকালের মন ভুলালো
তোমার লীলা কি মনোহর।

তোমার রূপ যে পুষ্পে ফোটে
আকাশ-ভরা তারায় জ্বলে
স্বর্গে ওঠে ধরায় লোটে
তরঙ্গিনীর ধারায় চলে।

তোমার জোরে সাগর মাঝে
শঙ্কাহীনা বেহুলা যে
শিবের সতী অমৃতা যে
অরুন্ধতী অনশ্বর।

শুনতে শুনতে রঙ্গনার জন্মান্তর ঘটে' গেল যেন। যেটুকু শঙ্কা সঙ্কোচ দ্বিধা সন্দেহ ছিল তা অবলুপ্ত হ'য়ে গেল একেবারে। কল্পনায় অদ্ভুত এক স্বপ্নলোক সৃজন করতে লাগল সে। দিবসের খোলার ঘরে গিয়ে সে যেন তার ঘরণী হয়েছে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সঙ্গে যেন সংগ্রাম করছে অহরহ। দিবসের শরীর যেন ভেঙে পড়েছে। রোগে সে যেন শয্যাশায়ী। সহসা দ্বারপ্রান্তে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল। সেই ছায়ামূর্তিকে রঙ্গনা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে—'তুমি কে?' ছায়ামূর্তি যেন উত্তর দিলে—'আমি দারিদ্র্য, আমি ওর যম, ওকে গ্রাস করব। রঙ্গনা বললে—'তা পারবে না। সাবিত্রী যেমন যমের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন সত্যবানকে, তোমার হাত থেকে তেমনি আমি উদ্ধার করব আমার স্বামীকে।'

বিশ্বনাথ কথকের গান শেষ হ'য়ে গেল। তিনি আবার আরম্ভ করতে যাবেন এমন সময় বারান্দা থেকে চুনীলাল উঁকি দিয়ে হেসে বললে, "প্রকাশবাবু খবর পাঠিয়েছেন পরশু দিন রঙ্গনাকে দেখতে আসবেন তাঁরা।"

"তাই নাকি?"

গহনচাঁদ উঠে বাইরে গেলেন।

দিবস ফিরল সেদিন অনেক রাত্রে।

পটলির স্বামীর কাশিটা একটু কমেছে, জ্বরটাও কমের দিকে। দিবসের গল্প জমে' উঠেছিল সৌরেন ডাক্তারের সঙ্গে। সৌরেন তার সহপাঠী ছিল বটে, কিন্তু তার জীবন-কাহিনী সে কিছুই জানত না। ডাক্তারি পাস করে' আর পাঁচজনের মতো ডিসপেন্সারি খুলে' সে ব্যবসা আরম্ভ করেছে এইটুকুই শুধু জানা ছিল তার। এখন সব কথা শুনে' সে অবাক্ হ'য়ে গেল। শুধু অবাক্ নয়, মুগ্ধ হ'ল। যে যক্ষ্মা ব্যাধিতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে,

তার বিরুদ্ধে ও একা দাঁড়িয়েছে, এর বীরত্বটাই শ্রদ্ধান্বিত করে' তুললে তাকে। সাধারণ লোক হ'লে ও গভর্নমেণ্টের ঔদাসীন্যের উপর সমস্ত দোষারোপ করে' যথারীতি টাকা রোজগারে মন দিত। সৌরেন কিন্তু তা করে নি। সে যথাসাধ্য একাই চেষ্টা করছে কারও মুখাপেক্ষী না হ'য়ে। সৌরেনের সংস্পর্শে এসে তার মন আরও যেন উতলা হ'য়ে উঠল। মনে হ'তে লাগল তার, কর্তব্য থেকে দূরেই সরে' রয়েছে এখনও সে। কবে তার টাকা জমবে, তারপর সে রিসার্চ লাইনে যাবে, সে তো এখনও বহুদূর। বাবার কাছে ফিরে যাবে আবার? কিরণকে তিনি বলেছেন যে, তার আদর্শ অনুসারে তাকে চলতে দেবেন। দেবেন কি সত্যি? কিন্তু না, লক্ষ্যভ্রষ্ট সে হ'বে না। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজের মেরুদণ্ডের জোরেই উন্নতি করতে হ'বে। বড় মুখ করে' সকলকে যে কথাটা বলেছে তার মান রাখতেই হ'বে তাকে।

বাড়ি ফিরে দেখলে সৌদামিনী তার ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দিবসের সাড়া পেয়ে উঠে বসল।

"বড় দেরি হ'ল আজ যে?"

"সৌরেনের সঙ্গে গল্প করছিলাম।"

"ওই আড্ডা দেওয়া স্বভাবটা ছাড়। যা দিনকাল পড়েছে, বাড়ি ফিরতে দেরি হ'লে ভাবনা হয়।"

টেবিলের উপর ঢাকা দেওয়া বাটিটা দেখিয়ে দিবস জিগ্যেস করলে, "এটা কি?"

সৌদামিনী কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল একটু।

"পেঁয়াজ-বড়া ভেজেছিলাম আজ সন্ধ্যেবেলা। ভাবলাম তুমি যদি এসে পড় গরম গরম খাবে ছুটো। কিন্তু যা দেরি করলে, এখন কি আর ভাল লাগবে?"

দিবস বাটি খুলে' একটা বড়া মুখে পুরে চিবোতে লাগল।

"বাঃ, চমৎকার হয়েছে!"

"আসল খবরটি বল এখন। কি বললেন ডাক্তারবাবু?"

"বললেন গয়না বেচে টাকা যোগাড় করবার দরকার নেই। গিরি রোজগার করে' যতটুকু পারে দেয় যেন কিছু-কিছু। ওষুধের দাম-টামগুলো দিয়ে দেয় যেন আস্তে আস্তে। তোমাদের পীড়ন করে' ও কিছু নিতে চায় না।"

"খুব ভাল লোক তো!"

"দেবতা।"

সৌদামিনী সস্নেহে চেয়ে রইল দিবসের দিকে। মনে মনে বলতে লাগল তুমি বা কি কম। তারপর তার মনে হ'ল আজ-কালকার ছেলেরা সবাই ভাল। মেয়েরাও। হঠাৎ মনে পড়ল রঞ্জনার কথা।

"হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, সেই মেয়েটি এসেছিল আজ বিকেলে। তোমার বইটা দিয়ে গেছে। তাদের বাড়িতে কথকতা হচ্ছে আজ সন্ধ্যাবেলা, সে নেমন্তন্ন করে' গেছে। তুমি যা রাত করে' ফিরলে, সকাল-সকাল এলে যেতে পারতে।"

"রঙ্গনা এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"মেয়েটির মাথায় ছিট আছে একটু, না?"

"কেন বলতো?"

"তোমার ওই রাজহাঁসকে নিয়ে কি কাণ্ডই যে করছিল! যাবার সময় শেষে হাঁসের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে গেছে একটা।"

"মালা? মালা এনেছিল নাকি?"

"অনেকগুলো। বাড়িতে কথকতা হ'বে কিনা, তাই বোধ হয় কিনে নিয়ে যাচ্ছিল।"

"হাঁসের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ গো, আর তোমার হাঁসও কি তেমনি, মালাটি কেমন পরলে। খানিকক্ষণ পরেই অবশ্য ছিঁড়ে ফেলেছে।"

দিবস ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল।

কথকতা শেষ করেই বিশ্বনাথ কথককে চলে' যেতে হ'ল। গোয়াবাগানে তাঁর এক বড়লোক আত্মীয় ছিলেন, তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সীতারাম রমজানও চলে' গেল। তারা আশা করেছিল যে দিবস কথকতা শুনতে নিশ্চয় আসবে, তখন তার সঙ্গে বাড়ি বাঁধা দেওয়ার সম্বন্ধে আর এক প্রস্থ আলোচনা করা যাবে। দিবস না আসাতে তারা হতাশ হয়েছিল একটু। ঊর্মি যায় নি। সে গহনচাঁদকে ময়ূর নাচটা আর একবার দেখাবে বলে' আবীর নিয়ে বসেছিল। সিনেমার ডিরেক্টার কালই তার নাচটা দেখতে চান, যদি পছন্দ হয় ছবিতে কোথাও ঢুকিয়ে দেবেন বলেছেন। নাচটা যদি 'হিট্' করে—ওফ্, তাহ'লে—আর ভাবতে পারছিল না ঊর্মি। অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করছিল কথকতাটা কখন শেষ হ'বে। ঊর্মি ভাবছিল রঙ্গনাকে দিয়েই কথাটা পাড়বে সে। কিন্তু কথকতা শেষ হ'তেই রঙ্গনা উঠে ভিতরে চলে' গেল। ঊর্মি সঙ্কোচ পরিহার করে' নিজেই শেষে বললে, "আমি আবীর এনেছি, ময়ূর নাচটা আর একবার আপনাকে দেখাব আজ, কাল একজন সিনেমা ডিরেক্টার নাচটা দেখতে চেয়েছেন।"

"বেশ তো! আর একটু আগে বললে সীতারাম রমজানকেও আটকে রাখতাম। আবীর ছড়িয়ে আর দরকার নেই, এমনিই নাচো, যদি ভুল হয় আমি বুঝতে পারব। রঙ্গনা কোথা গেল? সেতারটা বাজাক না। চুনীলাল রঙ্গনাকে ডাক তো।"

চুনীলাল ভিতরের দিকে চলে' গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে, "রঙ্গনা ঘরে খিল দিয়েছে, ডাকাডাকি করলাম, কোনও সাড়া দিলে না। আশ্চর্য মেয়ে!"

"সে কি!"—প্রথমে বিস্মিত এবং পরমুহূর্তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন

গহনচাঁদ। নিজে গেলেন। রঞ্জনা কিন্তু কপাট খুললে না। জানালার ফাঁক দিয়ে গহনচাঁদ দেখতে পেলেন কাঁদছে। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে। ক্রন্দনাবেগে সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আরও দু'চারবার ডাকলেন, অনুনয় করলেন, কিন্তু রঞ্জনা উঠল না। কেমন যেন দিশেহারা হ'য়ে পড়লেন তিনি। বাইরে এসে উর্মিকে বললেন, "তুমি একবার দেখ দিকি, ওর কি হ'ল হঠাৎ।"

উর্মি ভিতরে চলে' গেল। চুনীলাল জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। গহনচাঁদ চুনীলালের দিকে ফিরে বললেন, "বুঝলে চুনী, আমার মনে হচ্ছে ওকে দেখতে আসবে এই খবরটা পেয়েই ও—"

কি বলে' যে শেষ করবেন তা ঠিক করতে না পেরে' থেমে' গেলেন।

"এ খবরে কাঁদবার কি আছে ?"

ঈশান কোণে মেঘ দেখলে জীর্ণ তরীর মাঝি যেভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে, চুনীলাল সেইভাবেই চেয়ে রইল খোলা জানলাটার দিকে। সত্যি সত্যি সে যেন আকাশের মেঘটাই দেখতে পাচ্ছিল।

"গোড়াগুড়িই এ বিয়েতে ও আপত্তি করছে কিনা।"

চুনীলাল এবার ভ্রূকুঞ্চিত করে' গহনচাঁদের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললে, "আপত্তি করবারই বা কি আছে। এর চেয়ে ভাল পাত্র কি জুটবে এ বাজারে ?"

"পাত্রের সম্বন্ধে ওর আপত্তি নেই। ও আপত্তি করছে পণের ব্যাপারে।"

"পণ না হ'লে কি বিয়ে হয় ? আপনি ক্ষেপলেন নাকি ?"

"না, না আমি ক্ষেপব কেন। ও যা বলছে তাই বললাম তোমাকে।"

"ওরকম পাত্রের আজকাল বাজার-দর কত জানেন? টোয়েন্টি থাউজাণ্ড! আমাদের কাছে তো কিছুই নিচ্ছে না ওরা।"

গহনচাঁদ কি বলবেন ভেবে পেলেন না। অপ্রস্তুত মুখে নীরবে থুতনিতে হাত বুলাতে লাগলেন। রঙ্গনা যা বলছে তা যে যুক্তিযুক্ত, কোন ভদ্রলোকেরই যে এমনভাবে পণ দাবী করা উচিত নয়, তা তিনি বুঝছিলেন। কিন্তু সমাজের যা অবস্থা তাতে চুনীলাল যা বলছে তাও ঠিক। দু' তরফেই তার মন সায় দিচ্ছে। আসলে তাঁর মনে হচ্ছে কোনও রকমে এখন এই গোলকধাঁধা থেকে বেরুতে পারলে তিনি বেঁচে যান। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রটাতে সুর বসাবার জন্য মন ছটফট করছে তাঁর। বাজে ঝামেলাটা যে কোন-প্রকারে মিটে গেলেই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যেন। মিটিয়ে ফেলবার জন্যই তিনি বাড়িটা বাঁধা দিতে ইতস্তত করেন নি। এ আবার কি এক বখেড়া এসে উপস্থিত হ'ল! রঙ্গনা সত্যি সত্যি যদি এ বিয়ে না করতে চায়, জোরজবরদস্তি করবারই বা কি দরকার। এ সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে আবার খোঁজা যাক না। আবার যখন পাত্র পাওয়া যাবে এবং সে-ও যদি পণ চায় (চাইবেই গহনচাঁদের ধারণা) তখন পণের ব্যাপারটা রঙ্গনার কাছে চেপে গেলেই হ'বে। এটা যখন জানাজানি হ'য়ে গেছে তখন—আড়-চোখে তিনি চাইলেন একবার চুনীলালের দিকে। চুনীলাল বাইরের অন্ধকারের দিকেই চেয়েছিল নির্নিমেষে। হঠাৎ তার মনে হ'ল একটি বিড়ি খাওয়া দরকার। বাইরে বেরিয়ে গেল সে। একা একা গহনচাঁদ কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। ভাবছিলেন উঠে আবার রঙ্গনার কাছে যাবেন কি না। উর্মি যখন ফিরে এল না তখন রঙ্গনা নিশ্চয়ই কপাট খুলেছে। উঠতে যাবেন এমন সময় তাঁর এক ছাত্রী এসে হাজির হ'ল।

"ও, আপনি বাইরেই আছেন? দরবারি কানাড়ার গৎটার এক জায়গায় কেমন যেন গোলমাল হচ্ছে। এ দিক দিয়ে

যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনাকে জিগ্যেস করে' যাই। অসুবিধা হ'বে কি এখন ?"

গহনচাঁদ বেঁচে গেলেন।

"না না, কিছুমাত্র না। এস এস, ব'স। কোথায় গোলমাল হচ্ছে ?"

সেতারটা তুলে' তিনি মেয়েটিকে দিলেন।

"বাজাও তো দেখি।"

দরবারি কানাড়া শুরু হ'য়ে গেল। তাতেই বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে' গেল গহনচাঁদের। এ সময়টুকু এভাবে কাটাবার সুযোগ না পেলে তিনি ঠিক গিয়ে হাজির হ'তেন রঙ্গনার ঘরে এবং ঊর্মি-রঙ্গনার আলাপে বাধা সৃষ্টি করে' ব্যাপারটাকে জটিলতর করে' তুলতেন। রঙ্গনার ঠিক মনোভাবটা জানবার সুযোগ ঊর্মিও হয়তো পেত না তখন।

ছাত্রীটি চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঊর্মি এসে ঢুকল।

"কি বললে রঙ্গনা ? ঘরে খিল দিয়েছিল কেন ?"

"ওর কোথায় আপনারা বিয়ের সম্বন্ধ করছেন, তাতেই ও ক্ষেপে উঠেছে।"

"বিয়ে দিতে হ'লে বিয়ের সম্বন্ধ করতেই হ'বে, তাতে আপত্তি করলে চলবে কেন ? আর পণপ্রথাটা এখনও যখন চালু রয়েছে তখন সেটাকেও মানতে হ'বে।"

"ও সেটা মানতে চায় না।"

"তাহ'লে বিয়ে হ'বে না। ও কি বিয়েই করতে চায় না ?"

ঊর্মি খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বললে, "একটি ছেলের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ করেন তাহ'লে ও রাজি হ'বে।"

"কে ?"

"দিবসবাবু। যিনি আপনার কাছে সরোদ শেখেন—"

"ও, সে তো চমৎকার ছেলে! ওরা কি ব্রাহ্মণ ?"

"হ্যাঁ।"

"সে তো চমৎকার হয়! কোথায় যেন চাকরি করে' বলছিল। ওদের বাড়িটা কোথায়?"

"ঠিকানাটা আমি ঠিক জানি না, তবে যোগাড় করে' দিতে পারি। আপনি আগে দিবসবাবুর কাছে কথাটা পেড়ে দেখুন, তিনি যদি রাজি হন আর আর সব খবর আমি যোগাড় করে' দেব।"

দিবসের খবর উর্মি অস্পষ্টভাবে জানত, কিন্তু এখন এর বেশী আর বলা সে সংগত মনে করলে না। দিবস যে খেয়ালের ঝোঁকে বাড়ি থেকে চলে' এসে যা-তা কি যেন করে' বেড়াচ্ছে, (কিরণের কাছে আবছা-আবছা শুনেছিল সে, কিন্তু নিজের ব্যাপার নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে যে, পরের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অবসরই নেই তার) এ খবর শুনলে গহনচাঁদবাবু হয়তো ভড়কে যাবেন, তাই সে সম্বন্ধে সে কোন উচ্চবাচ্যই করলে না। চুপ করে' রইল।

"বেশ তো, সে এলেই কথাটা আমি পাড়ব তার কছে। চুনী, ও—"

চুনীলালের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন তিনি।

মেসে গোবর্ধনবাবুও ব্যগ্র হ'য়ে হরিদাসবাবুর পথ চাইছিলেন রোজ। হরিদাসবাবু 'টুর' থেকে ফেরেন নি। এদিকে উমেশ কর্তৃক উৎসাহিত হ'য়ে ধূর্জটিবাবুর সংগীত-চর্চা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণ-ধৈর্য-বিশিষ্ট গোবর্ধন বেশ কাবু হ'য়ে পড়েছেন। অথচ ধূর্জটিকে কিছু বলা যায় না। তিনি নিজের বাড়িতে বসে' পত্নীশোক ভোলবার জন্য বেহালা এস্রাজ না বাজিয়ে যদি ক্যানেস্তারাও পিটতেন তাহ'লেও কারও কিছু বলবার থাকত

না। গোবর্ধন আফিস থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে সরে' পড়েন আজকাল খবরের কাগজটি বগলে করে'। পার্কে বসে' পড়েন সেটি। অঘোর অধিকাংশ সময়ই মেসে থাকে না, নিজের ধান্দায় ঘুরে' বেড়ায়, সুতরাং সে ততটা ঘায়েল হয় নি। রাত্রি দশটার পর সে যখন ফিরে আসে তখন ধূর্জটিও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন। এই ভাবেই চলছিল। চলতও হয়তো আরও কিছুদিন। কিন্তু একদিন বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। বৃদ্ধ গোবর্ধন (গোবর্ধনের বয়স প্রায় ষাট, যদিও আফিসের খাতায় তিপ্পান্ন লেখান আছে) পার্কে ভিজে গেলেন আপাদমস্তক। কাশ্মীর সমস্যায় এমনই তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি যে আকাশের ঘনঘটা তাঁর নজরে পড়ে নি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে' গেল তাঁর। পরের দিন আফিসে গেলেন বটে কিন্তু পার্কে যেতে পারলেন না। ধূর্জটির কণ্ঠ-সংগীত এবং যন্ত্র-সংগীতের প্রবল বর্ষণ সহ্য করতে হ'ল তাঁকে ঘরে বসে' বসে'। দৈবাৎ আঘোরও সেদিন বাসায় ছিলেন।

গোবর্ধন বললেন, "ওহে অঘোর, তুমি সেদিন সেই কোন্ এক ওস্তাদের খবর এনেছিলে, সেইখানেই নিয়ে যাও না ওকে। আর তো পারা যায় না। ভেবেছিলুম হরিদাস এলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে, কিন্তু এ যে পাগল করে' তুলেছে!"

"বলে' দেখতে পারি, কিন্তু ও যাবে কি, সেই কাগজটা কোথায় ফেললুম।"

সৌভাগ্যক্রমে কাগজটা পাওয়া গেল। চুনীলালের ছাপানো সেই হ্যাণ্ডবিলটা।

"ও, এই যে রয়েছে।"

"যাও যাও, বলে' দেখ একটু"—গোবর্ধনের কণ্ঠস্বরে সত্যিকারের আগ্রহ ফুটে উঠল—"তোমার তো লোক পটাবার ক্ষমতা আছে, ইন্‌সিওরেন্সের দালালি কর যখন—যাও, কাগজটা নিয়েই যাও।"

"দেখি। হরিদাস বললে আরও ভাল হ'ত ."

"তুমি দেখই না চেষ্টা করে'। যদি রাজি হয়, কাল রবিবার আছে, তুমি সঙ্গে করে' নিয়ে যেতেও পারবে।"

অঘোর কাগজটা নিয়ে চলে' গেলেন।

ধূর্জটিও বেশ দিশেহারা হয়েছিলেন। সেতার এস্রাজ ম্যাণ্ডোলিন বেহালা এই চারটে যন্ত্রের কবলে পড়ে' তিনি যে যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন তা বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া তাঁর জেদ চড়ে' গিয়েছিল বলে' বাইরের লোকেরা ঠিক উল্টোটাই ভাবছিল। ভাবছিল ওই চারটে যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর বাগযন্ত্র মিলিয়ে এক নাগাড়ে বেসুরো চীৎকার করে' আনন্দই পাচ্ছেন বুঝি তিনি। আনন্দ তিনি পাচ্ছিলেন না। এ কসরৎ তিনি যদি পরিত্যাগ করতেন তাহ'লে অন্যায় কিছু হ'ত না। কিন্তু তা তিনি করেন নি, কারণ এই পথেই আনন্দ পাবেন বলে' তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এযুগের অনেকেরই মতো তাঁরও ধারণা ছিল যে চেষ্টা করলে সবাই সবকিছু করতে পারে, বিশেষতঃ টাকার জোর থাকে যদি। বারংবার ব্যর্থকাম হ'য়ে একজন ওস্তাদের কথা তিনিও ভাবছিলেন। অঘোরবাবু তাঁর ঘরে যখন ঢুকলেন তখন এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন তিনি। অঘোর স্মিতমুখে এমন ভাব করে' দাঁড়িয়ে রইলেন যেন মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন।

"কি, দেখছেন কি ?" বাজনা থামিয়ে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন ধূর্জটি।

"ভাবছি আপনার যেরকম পার্টস্ আছে, আপনি যদি গহনচাঁদ-বাবুর কাছে কিছুদিন শেখেন দিগ্বিজয় করতে পারবেন।"

"গহনচাঁদবাবুটি কে ?"

"কাশী থেকে একজন বিখ্যাত ওস্তাদ এসেছেন। অনেককে শেখাচ্ছেন। নিতান্ত আনাড়িও নাকি মানুষ হ'য়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে। আপনার মতো শিষ্য পেলে তো বর্তে যাবেন তিনি।"

"বেশ তো, নিয়ে চলুন না আমাকে। কোথায় তিনি ?"

"ঠিকানাটা আছে আমার কাছে। দাঁড়ান আনি।"

যদিও ঠিকানাটা তাঁর পকেটেই ছিল তবু তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তখনই তখনই পকেট থেকে কাগজটা বার করলে ধূর্জটির হয়তো সন্দেহ হ'ত পারে এই আশঙ্কা হ'ল তাঁর। একটু পরে ঘুরে' এসে কাগজটা তিনি ধূর্জটির হাতে দিলেন এবং বললেন, "গোবর্ধনবাবুও বলছেন খুব ভাল ওস্তাদ উনি, নাম আছে"

"আলাপ আছে নাকি আপনাদের সঙ্গে?"

"না। আলাপ কি করে' হ'বে বলুন, আমরা তো ও-পথের পথিক নই, তবে নাম-ডাক শুনছি খুব।"

ধূর্জটি ভ্রূকুঞ্চিত করে' বিজ্ঞাপনটি পড়লেন।

"বেশ চলুন। আপনাদেরও যেতে হ'বে সঙ্গে কিন্তু।"

"তাতে আর আপত্তি কি? কাল রবিবার আছে। গোবর্ধনবাবুর ছুটি, আমারও তেমন কোনও কাজ নেই, কালই যাওয়া যাক তাহ'লে।"

"বেশ।"

অঘোর এসে গোবর্ধনকে সুখবরটি দিলেন।

গোবর্ধন বললেন, "আমাকে আবার টানছ কেন? তুমি একাই নিয়ে যাও না।"

"চলুনই না, তাতে হয়েছে কি? আপনি একজন বিজ্ঞ লোক, আপনি সঙ্গে থাকলে ভরসা পাবেন ধূর্জটিবাবু।"

অঘোর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাস্য গোপন করলেন।

"দেখ, তোমরা, আজকালকার ছেলে-ছোকরারা বড্ড বেশী ডেঁপো হ'য়ে পড়েছ, আর সেইজন্যেই ফেল মারছ সব কাজে।"

"ফেল মারছি মানে? গত মাসে নগদ একশ' পঁচিশ টাকা কামিয়েছি তা জানেন?"

"জানি জানি। হাড়ে হাড়ে চিনি তোমাদের।"

স্রোতস্বিনী দিক পরিবর্তন করেছিল আবার। দিবসের যে মন মাত্র কয়েক দিন আগে রঙ্গনাকে ঘিরে স্বপ্ন রচনা করছিল, সে মন এখনও স্বপ্ন রচনা করছে, কিন্তু এখন আর রঙ্গনাকে ঘিরে নয়। নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির নব নব সম্ভাবনার স্বপ্নে আবার মেতে উঠেছে সে। যে অজানাকে জানবার আগ্রহ মানব-সমাজকে চিরকাল দুর্গম পথে টেনে' নিয়ে গেছে, সেই অজানার রহস্যময় আহ্বান আবার উতলা করে' তুলেছে তাকে। বস্তুতঃ অজানাকে জানবার কৌতূহলই তার জীবনের মূল সুর। সে নিজেও কথাটা ভাল করে' জানে না হয়তো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি তার আছে কি না, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হ'তে হ'লে যে কষ্ট স্বীকার অনিবার্য তার সম্মুখীন হ'তে সে পারে কি না, এই কৌতূহলই তাকে মেসের চাকরে পরিণত করেছিল। রঙ্গনার চরিত্র যতক্ষণ অজানা ছিল ততক্ষণই তা মুগ্ধ করেছিল তাকে। যেই তার মনে হ'ল রঙ্গনা-চরিত্রে রহস্যময় আর কিছুই নেই—সে-ও শাড়ি-ব্লাউজ-বিলাসিনী আর পাঁচজন মেয়ের মতো—তখনই তার মোহ কেটে' গেল, তার সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনও কৌতূহল রইল না। বাবাকে ছেড়ে এসে তার যে ধরনের দুঃখ হয়েছিল, রঙ্গনার সম্বন্ধে মোহমুক্ত হ'য়েও তার সেই ধরনের একটা দুঃখ হচ্ছিল অবশ্য। রঙ্গনাকে তার যে আর ভাল লাগছিল না তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে অতি-প্রত্যাশিত সেই পুরাতনীকে আবিষ্কার করে' সে একটু হতাশ হ'য়ে পড়েছিল। সে রঙ্গনার মধ্যে প্রত্যাশা করেছিল অপ্রত্যাশিত এমন একটা কিছু, যার বিস্ময় পুলকিত করে' তুলবে তার অন্তরতম সত্তাকে। কিন্তু তা হ'ল না।

মনের মোড় ফিরে গিয়েছিল তার। সে ঠিক করে' ফেলেছিল নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি নিয়েই পড়াশোনা শুরু করবে আবার। মনে হচ্ছিল রোজ সন্ধ্যাবেলা সরোদ নিয়ে অত সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না। গহনচাঁদবাবুর কাছে সপ্তাহে একদিন গেলেই যথেষ্ট।

নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি বিষয়ক বইও সে যোগাড় করে' এনেছিল দু'একখানা। আনতেও দিয়েছে একটা দোকানে। বইগুলো শেল্‌ফে রাখতে গিয়ে রঙ্গনার গতের খাতাটা চোখে পড়ল তার। সেই খাতাটা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে। রঙ্গনার কথাই ভাবছিল। রঙ্গনার বিয়ে দিতে গহনচাঁদবাবুর যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাচ্ছে, সীতারাম-রমজানের মুখে এই সংবাদ শুনে' লজ্জায় যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল তার সেদিন। কন্যার বিবাহে বহু পিতা সর্বস্বান্ত হচ্ছে এদেশে, কিন্তু কন্যাদের তরফ থেকে তেমন জোরালো কোন প্রতিবাদ তো শোনা যাচ্ছে না। বাপকে পথে বসিয়ে তারা তো বেশ হাসিমুখে বিয়ে করে' যাচ্ছে! সেই বহুকাল আগে স্নেহলতা পুড়ে মরেছিল, আরও হয়তো মরেছে কেউ কেউ—সহসা কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগল সে। সৌরেন ডাক্তারের অতসী ক্লিনিকের ছবিটা ফুটে উঠল চোখের সামনে। তারপর ফুটে উঠল দেশজোড়া একটা শ্মশানের ছবি—।

গহনচাঁদের বাড়িতে সে যখন পৌঁছল তার ঠিক একটু আগেই চুনীলাল 'তবে যা-খুশী করুন' বলে' রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দিবসের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করা হোক, এতে চুনীলাল এত আপত্তি করছে কেন তা গহনচাঁদের মাথায় ঢুকছিল না। তিনি ভাবছিলেন মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে লোকে পাঁচ জায়গায় তো সম্বন্ধ করেই থাকে। বিকাশবাবুদের পাকা কথাও দেওয়া হয় নি তেমন কিছু। তাঁরা মেয়ে দেখতে আসছেন, আসুন না। দিবসের কাছেও কথাটা পাড়া যাক। দিবস যদি রাজি হয়, খোঁজ-খবর নিয়ে ঠিক করা যাবে কে ভাল পাত্র। চুনীর এতে আপত্তি কেন? গহনচাঁদ ইলেকট্রিক গুডস্‌, অন্নদা বিশ্বাস এবং হরলাল সিংহির খবর জানতেন না।

দিবস যে সম্ভাব্য পাত্র হইতে পারে এ সংবাদে রমজান সীতারাম উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিল খুব। তাদের মনে হচ্ছিল দিবসই এ

সমস্যার সমাধান করে' দেবে। দিবস যখন এল তখন অবশ্য তারা ছিল না কেউ। বাড়িতে তখন এক গহনচাঁদ ছাড়া আর কেউ ছিল না। রঙ্গনাও না। গতরাত্রের ঘটনার পর থেকে রঙ্গনা বাড়ির সবাইকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে; সকালে উঠেই পড়ার ছুতো করে' এক সহপাঠিনীর বাড়ি গিয়ে বসে ছিল। তুপুরে খেতে এসেছিল। একটি কথা বলে নি কারও সঙ্গে। খেয়ে উঠেই বেরিয়ে যাবার আর একটা ছুতো পেয়ে গেল। বিশ্বনাথ কথক তাঁর আত্মীয়ের মোটরে তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে বেরিয়েছিলেন। তিনি যাবার মুখে খোঁজ করতে এসেছিলেন রঙ্গনা যাবে কিনা। রঙ্গনা এ সুযোগ ত্যাগ করে নি। সম্ভব হ'লে সে নিজের কাছ থেকেও পালিয়ে যেত।

দিবস আসতেই গহনচাঁদ হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। "ও, তুমি এসেছ, এস, এস। কাল থেকেই তোমার কথা ভাবছি। এস ব'স, হাতে ওটা কি?"

"রঙ্গনার সেই গতের খাতাটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি।"

"ও, আচ্ছা। রঙ্গনা চিড়িয়াখানা দেখতে বেরিয়েছে, দাও, আমিই রেখে' দিই।"

খাতাটা নিয়ে টেবিলের উপর রেখে' দিলেন।

"ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।"

দিবস বসতে গহনচাঁদও বেশ বাগিয়ে বসলেন এবং বার তুই গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "আচ্ছা তোমরা ব্রাহ্মণ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"গোত্র কি তোমাদের?"

"ভরদ্বাজ। আমাদের আসল উপাধি মুখোপাধ্যায়।"

গহনচাঁদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

"মুখোপাধ্যায়! আরে তাহ'লে তো আমাদের পালটি ঘরই!"

এর বেশী অগ্রসর হবার কিন্তু আর সুযোগ পেলেন না তিনি।

কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই দ্বারপ্রান্তে ধূর্জটি, গোবর্ধন আর অঘোর এসে দাঁড়ালেন। ধূর্জটির এক হাতে বেহালা, আর এক হাতে ম্যাণ্ডোলিন। গোবর্ধনের হাতে সেতার, আঘোরের হাতে এস্রাজ। দিবস উঠে দাঁড়াল। এঁদের এখানে আবির্ভাব সে প্রত্যাশাই করে নি।

"আরে, তুমি এখানে যে! গহনচাঁদবাবুর বাড়ি কি এইটেই?" —ধূর্জটি প্রশ্ন করলেন।

"ইনিই গহনচাঁদবাবু।"

দেখিয়ে দিয়ে দিবস বাইরে চলে' গেল। কেমন যেন অস্বস্তি হ'তে লাগল তার।

"নমস্কার, নমস্কার।"

নমস্কার বিনিময়ান্তে উপবেশন করলেন তিনজনই।

"দিবু এখানেও চাকরি করে নাকি?"—গোবর্ধন প্রশ্ন করলেন।

"না, ও এখানে সরোদ শিখতে আসে।"

"সরোদ শিখতে আসে! বলেন কি!"

"এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?"—একটু বিস্মিত হ'য়ে জিগ্যেস করলেন গহনচাঁদ।

"আশ্চর্য হবার নেই? ও যে আমাদের মেসের চাকর মশাই।"

"চাকর? মানে? কি করে?"

"ঘর ঝাড়ু দেয়, জুতো বুরুষ করে, ফাই-ফরমাশ খাটে।"

"বলেন কি! দিবস—"

দিবস বারান্দা থেকে নেমে চলে' যাচ্ছিল, গহনচাঁদের ডাক শুনে' ফিরে এল আবার।

"আমাকে কিছু বলছেন?"

"তুমি এঁদের মেসের চাকর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাতো জানতাম না।"

বিস্ময়ে নির্বাক্ হ'য়ে গেলেন গহনচাঁদ। দিবস মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল আবার।

"আপনার ছোঁয়াচ লেগে' এইটি হয়েছে"—ধূর্জটির দিকে চেয়ে গোবর্ধন মন্তব্য করলেন।

"খুব সম্ভব"—হেসে সমর্থন করলেন অঘোর।

"আপনারা কি প্রয়োজনে এসেছেন জানতে পারি কি?"—গহনচাঁদ প্রশ্ন করলেন। হঠাৎ এ কি উৎপাত—মনে হচ্ছিল তাঁর।

"ইনি আপনার কাছে গান-বাজনা শিখতে চান"—ধূর্জটিকে দেখিয়ে গোবর্ধনই পাড়লেন কথাটা।

গহনচাঁদ কেমন যেন বিরূপ হ'য়ে উঠেছিলেন এদের উপর।

"মাপ করবেন, আমার সময় নেই।"

"একটু সময় আপনাকে করতেই হ'বে"—কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করলেন গোবর্ধন।

"উনি কি শিখতে চান? গান, না বাজনা?"

"দুই-ই।"

"এইসব বাজনা ওঁর?"

"সব।"

"সবগুলো উনি বাজাতে পারেন?"

"চেষ্টা করেন। তবে সবগুলো সড়গড় হয় নি এখনও।"

একবার গোবর্ধন, একবার অঘোর গহনচাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

"গানও করেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ধরা-গলায় ধূর্জটি উত্তর দিলেন এইবার।

"শুনিয়ে দিন না একটু"—গোবর্ধন বললেন।

ধূর্জটি বেহালার বাক্স খুলে' বেহালা বার করতে লাগলেন। গহনচাঁদ আর মানা করতে পারলেন না। ভদ্রতায় বাধল। গান

ধরবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন তিনি এবং মিনিট খানেক পরেই বলতে বাধ্য হ'লেন—থামুন থামুন, যথেষ্ট হয়েছে।"

তিনজনেই চাইলেন গহনচাঁদের দিকে।

গহনচাঁদ ধূর্জটির দিকে চেয়ে ভদ্রভাবেই বললেন, "গান-বাজনা আপনার দ্বারা হ'বে না। এ-পথ আপনার নয়। এ আপনি ছেড়ে দিন।"

গোবর্ধন বিজ্ঞ লোক। তাঁর মনে হ'ল গহনচাঁদবাবু বোধ হয় নিজের দর বাড়াচ্ছেন। কিছু না বলে' তিনি চুপ করে' রইলেন।

অঘোর মুচকি হেসে বললেন, "ছাড়তে উনি পারবেন না, অত্যন্ত আগ্রহ ওঁর।"

"আগ্রহ থাকলেই সব জিনিস কি সকলে শিখতে পারে?"

"আপনি শিখিয়ে দিন না, না হয় বেশী কিছু দেব আপনাকে" —ধূর্জটি বললেন একথা শুনে'।

'এইবার ওষুধ পড়েছে'—মনে মনে বললেন গোবর্ধন—'এইবার ওস্তাদ ভিজবে। কিন্তু এত চট্ করে' বেশী টাকার কথাটা পাড়া ঠিক হয় নি। সুতরাং ধূর্জটির ভুলটা সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হ'লেন তিনি।

"দরকার হ'লে বেশী টাকা আপনাকে উনি দেবেন। আপনাকে হোল টাইম রেখে' দেবার সামর্থ্যও ওঁর আছে। তবে প্রথমটা দেখুন না চেষ্টা করে' এমনিতেই যদি হয়—"

যে বিরূপতাটা গহনচাঁদ ভদ্রতার আবরণে ঢাকছিলেন এতক্ষণ, সেটা সরে' গেল এবার। বেশ রাগত কণ্ঠেই তিনি বললেন, "আপনার কি ধারণা টাকা খরচ করলে গর্দভও বুলবুল হ'য়ে যেতে পারে?"—তারপর অর্ধ-স্বগতোক্তি করলেন—"যত সব গাড়োল জোটে এসে!"

গোবর্ধনের মাথায় ডাণ্ডস্ মারলে কেউ যেন। তিনি অনেক-দিন ধরে' আফিসের বড়বাবুগিরি করছেন, সবাই সমীহ করে' কথা

ব'লে তাঁর সঙ্গে, গহনচাঁদের কথায় ক্ষেপে গেলেন তিনি। উঠে পড়লেন এবং ধূর্জটির দিকে চেয়ে বললেন, "উঠুন মশাই। টাকা ফেললে কোলকাতা শহরে ওস্তাদ ঢের পাওয়া যাবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। এঁরা বোধ হয় ওই চাকর-ক্লাসকেই শেখাতে পারেন, ভদ্রলোকের জায়গা এ নয়। উঠুন।"

ধূর্জটিও যথেষ্ট অপমানিত বোধ করছিলেন। তিনজনেই উঠে পড়লেন। অঘোর যাবার পূর্বে বক্রোক্তি করে' গেলেন—"কথাটা পাড়বার আগেই আমাদের ভাবা উচিত ছিল উনি দিবুর মাস্টার।"

সবাই চলে' গেলে গহনচাঁদ নির্বাক্ হ'য়ে বসে' রইলেন। মুহূর্তের মধ্যে একটা ভূমিকম্প হ'য়ে গেল যেন। তিনি যেন সর্বস্বান্ত হ'য়ে গেলেন। প্রত্যেক রসিককেই অনিবার্যভাবে কতকগুলো বেরসিকের সংস্পর্শে আসতে হয়, সুতরাং ধূর্জটির দল তাঁকে তেমন বিচলিত করে নি। অর্থের আস্ফালনটাও এযুগে গা-সওয়া হ'য়ে গেছে তাঁর। দিবসের খবরটা শুনেই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। দুটো কারণ ছিল। প্রথমত তিনি আশা করেছিলেন যে হয়তো দিবসের সঙ্গে রঙ্গনার বিয়েটা হ'য়ে যাবে এবং তা হ'য়ে গেলে তাঁর জীবনের মস্ত বড় সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে একটা। রঙ্গনারই শুধু নয়, তাঁরও দিবসকে খুবই ভাল লেগেছিল। চমৎকার ছেলে! কিন্তু একটা মেসের চাকরের সঙ্গে কি করে' মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়? দ্বিতীয় কারণটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল তা এই যে, দিবসের মতো একজন সংগীত-রসিককে পেটের দায়ে ওই বেরসিকগুলোর দাসত্ব করতে হচ্ছে। এইটেই বেশী মর্মান্তিক হয়েছিল তাঁর পক্ষে। ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়ে জুতো বুরুষ করায় ওরা! এর থেকে দিবসকে কি করে' উদ্ধার করা যায় এই ভাবনায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন তিনি। রঙ্গনার বিয়ের চেয়েও এটা বেশী প্রয়োজনীয় বলে' মনে হ'তে লাগল তাঁর কাছে। দিবস যখন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে তখন সে তো তাঁর পুত্র-স্থানীয়। তার এমন

সঙ্কটের কথা শুনে' চুপ করে' বসে' থাকা উচিত নয়। খুব সঙ্কটেই সে পড়েছে, তা না হ'লে ওরকম চাকরি নেয়? পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হ'ল রঞ্জনাকে সেতার কেনবার সময় ও টাকা দিয়েছিল, তাঁকে মাইনে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল, সেদিন অত দাম দিয়ে একটা আয়না কিনে এনেছে, অর্থসঙ্কট থাকলে এসব কি করে' করা সম্ভব! প্রশ্নটা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও জাগল। দিলদরিয়া লোকের পক্ষে সবই সম্ভব। এইসব ব্যাপারে টাকা খরচ করতে গিয়েই হয়তো আরও নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছে, বাধ্য হ'য়ে ওই জঘন্য চাকরি নিতে হয়েছে। নিমি, হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ প্রভৃতি কয়েকটা নাম পর পর জেগে উঠল মনে। তারপর সহসা তাঁর মনে হ'ল দিবস হয়তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

"দিবস—"

কোন সাড়া এল না। গহনচাঁদ উঠে বেরিয়ে দেখলেন দিবস চলে' গেছে।

সূর্যকান্ত ভিতরে ভিতরে খুবই সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে' চিকিৎসক যেমন ভিতরে ভিতরে ভীত হ'য়ে পড়েন, অথচ সে ভাবটা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেন না, সূর্য চৌধুরীর অবস্থা সেইরকম হয়েছিল অনেকটা। তার চেয়েও খারাপ হয়েছিল, কারণ চিকিৎসকের নৈর্ব্যক্তিক ভাবটা তাঁর ছিল না। দিবসের ঠিকানাটা এখনও পান নি তিনি। কিরণ আসে নি, কিরণকে ধরতেও পারেন নি আর। সেদিন নানা কথাবার্তায় আর একটা মস্ত ভুলও হ'য়ে গিয়েছিল। কিরণের বাসার ঠিকানাটা জেনে নেওয়া হয় নি। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা আগেও যেমন অথৈ জলে ছিল, এখনও তেমনি আছে। গোবিন্দ সাণ্ডেল তাঁর এক আত্মীয়ের বিয়েতে বাইরে গেছেন কয়েকদিনের

জন্য। সুতরাং দিবসের আলোচনাও চাপা পড়ে' গেছে। ব্রজও কেমন যেন গম্ভীর হ'য়ে গেছে। আজকাল বকেও না। সমস্ত বাড়িটা কেমন যেন থমথম করছে। অসুখের ভান করে' পড়ে' আছেন তিনি। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলে' গেছে। সুতরাং ঘণ্টু নিচে থেকেই মক্কেলদের বিদায় করে' দিচ্ছে। ঘণ্টু প্রাণপণে সেবাও করছে তাঁর। তার মনে যে আশার অঙ্কুর গজিয়েছিল তা বাড়ছিল ক্রমশঃ। শুধু তাই নয়, দিবসের প্রতি শ্রদ্ধাও কমে' আসছিল তার। দিবসের মতো ছেলের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াই উচিত, এই ধরনের একটা ন্যায়সঙ্গত যুক্তিও মনে মনে খাড়া করেছিল সে। খাড়া করে' অদ্ভুত ধরনের সুখও পাচ্ছিল।

ঘণ্টু ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে। একা চুপ করে' শুয়ে আছেন সূর্য চৌধুরী। দিবসের মায়ের কথাটা বার বার মনে পড়ছে। সেই কচি মুখখানা বার বার ভেসে' উঠছে মানসপটে। তিনি কি দিবসকে বকে' অন্যায় করেছেন ? ছেলেকে শাসন করা কি অন্যায় ? দিবসের মতো বুদ্ধিমান ছেলে ওকালতি পাস করে' এসে তাঁর জায়গায় বসুক, এ ব্যবস্থাটা কি খুব খারাপ ব্যবস্থা হয়েছিল ? তিনি তাকে আই-এস-সি পড়তে দিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজে বা ইনজিনিয়ারিং লাইনে ঢোকাবেন বলে'। কিন্তু দিবস এত ভাল করে' পাস করল যে আর মেডিকেল কলেজে ঢুকতে চাইল না। তার কোন্ এক সাহেব প্রফেসার ওকে বুদ্ধি দিলেন যে তুমি এখন কোনও লাইনে যেও না, এম-এস-সি পর্যন্ত পড়ে' যাও। তিনি বাধা দেন নি। হঠাৎ সূর্যকান্তের চিন্তাধারা বিঘ্নিত হ'ল। নিচে ব্রজ আর নিস্তারিণী তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছে। কান পেতে শুনলেন সূর্যকান্ত। কোন্ এক গিরিবালার কাছে যাবার জন্য ব্রজ নিস্তারিণীকে নাকি রিক্‌শাভাড়া দিয়েছিল। কিন্তু নিস্তারিণী সে রিক্‌শাভাড়াটি খরচ করে ফেলেছে। ব্রজ নিস্তারিণীকে রিক্‌শাভাড়া কেন দিয়েছিল তা সূর্যকান্ত জানেন। তাঁর একবার ইচ্ছে হ'ল ব্রজকে ডেকে বলেন যে, নিস্তারিণী যদি

পয়সাটা খরচ করে' ফেলে থাকে আবার পয়সা দাও না ওকে, কিংবা না হয় মোটরটা নিয়েই যাক না। কিন্তু পারলেন না। ব্রজর কাছে খেলো হ'তে পারবেন না তিনি কিছুতে। পাশ ফিরে শুলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা। ব্রজও তাহ'লে দিবুর ঠিকানা যোগাড় করতে পারে নি!

দিবসের যে ফ্যাকড়াটি গহনচাঁদ তুলেছিলেন তা ফেঁসে যাওয়াতে চুনীলাল নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এইসব আর্টিস্ট-জাতীয় লোকেদের নিয়ে সবাই কেন যে এমন উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে তা চুনীলাল বুঝতে পারে না। তার তো ধারণা এরকম অকেজো দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংসারিক বুদ্ধিবিবর্জিত লোকেদের পাগলা গারদে ডবল তালা মেরে রেখে' দিলে সংসারের কিচ্ছু ক্ষতি হ'ত না, লাভই হ'ত বরং। আর একটু হ'লে সব পণ্ড করে' দিয়েছিল! উফ্! খবরটা শুনে' অবধি রঞ্জনা খুব গম্ভীর হ'য়ে গেছে যদিও—তা যাক। দামী গয়না কাপড় পরে' বিকাশবাবুর মোটরে বার দুই চক্কোর মারলেই মুখে হাসি ফুটবে এখন। লভ-টভ সব তখন তলিয়ে যাবে। কি হয়েছে আজ-কালকার মেয়েরা। ছ্যা ছ্যা! একটা সুন্দর চেহারা দেখলেই অমনি ব্যস—! আর ওই দিবস ছোকরাই বা কি রকম! তুই মেসের সামান্য চাকর একটা, তুই ভদ্রলোকের মেয়ের উপর নজর দিস! এবার বাড়িতে এলে কান ধরে' দূর করে' দিতে হ'বে। সোহাগ করে' আয়না কিনে দেওয়া হয়েছে! রাসকেল কোথাকার! সমাজের অবস্থা দিন দিন হ'য়ে দাঁড়াল কি! তুই মেসের চাকর, তুই শিখবি সরোদ! উফ্।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চুনীলাল রুমাল ঘোরাতে ঘোরাতে নিজেকে হাওয়া করছিল আর চিন্তা করছিল। কালকের ঘটনার পর থেকে বাড়িতে সে বড় একটা থাকছে না। রঞ্জনার সঙ্গে

মুখোমুখি হ'তে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হচ্ছে। রঙ্গনা শুধু গম্ভীরই হয় নি, একটা বিষাদের ছায়াও পড়েছে তার মুখে। কি আশ্চর্য! আবার বনবন করে' রুমাল ঘোরাতে লাগল চুনীলাল। এ সময় পদ্মমুখী থাকলে সুবিধা হ'ত। পদ্মমুখীকে সে পাঠিয়েছিল মাণিকলালের কাছে, তার কাছে থেকে যদি কিছু টাকা বাগাতে পারে। পারবে কি না সন্দেহ, কারণ মাণিকলালও ঘুঘু একটি। পিসিমাকে এখনো টাকা পাঠানো হয় নি এ মাসে। ছিরু (তার মামাতো ভাইয়ের ছেলে) দেশে অসুখে পড়েছে, ছিরুর মা টাকা পাঠাতে লিখেছে কিছু। চুনীলালের নিজের যদিও ছেলেপিলে হয় নি, কিন্তু এই ধরনের খুচখাচ খরচ তার লেগেই আছে। রঙ্গনার সমস্ত খরচ সেই তো চালিয়েছে এতকাল। কর্পোরেশনের ট্যাক্সও বাকি পড়ে' গেছে। ভাগ্যে বাবা বাড়িটা করে' গিয়েছিলেন তা না হ'লে কি দুর্দশাই যে হ'ত! ছিরুর মাকে টাকাটা আজ পাঠাতেই হ'বে। টাকা আছে কিছু, জামাইবাবুর ছাত্র-ছাত্রীদের মাইনে বাবদ কিছু টাকা জমেছে, (মুদির বিলও জমেছে ওদিকে বেশ!) কিন্তু সে টাকাটা আছে রঙ্গনার কাছে। আজকে রঙ্গনার মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব। আবার বনবন করে' রুমাল ঘোরাতে লাগল চুনীলাল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সামনের গলি থেকে অন্নদা বিশ্বাস বেরুল। তার সাদা শুষ্ক মুখ শুষ্কতর হয়েছে মনে হ'ল, গোঁফ যেন আরও ঝুলে পড়েছে।

"এই যে ভাই, তোমার কাছে যাচ্ছিলাম। সর্বনাশ হ'য়ে গেছে—"

"তোমার সর্বনাশের কথা পরে শুনব। আগে আমার একটা কথার জবাব দাও। গোটা দশেক টাকা দিতে পার এক্ষুনি?"

বিস্ময়ে অন্নদা বিশ্বাসের ঠোঁট দুটো ফাঁক হ'য়ে গেল। জিব দিয়ে শুষ্ক ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ সরস করে' নিয়ে সে বললে, "টাকা! টাকা তো নেই। আমার যথাসর্বস্ব তো তোমার কাছে আছে ভাই!"

"কালই দিয়ে দেব। আমার এক ভাইপো দেশে অসুখে পড়ে' গেছে, আজই তাকে টাকাটা পাঠান দরকার। বাড়িতে টাকা আছে কিন্তু বার করবার উপায় নেই।"

"কেন?"

অসঙ্কোচে মিথ্যে কথা বললে চুনীলাল।

"পরিবার চাবি নিয়ে বাপের বাড়ি চলে' গেছে। কাল ফিরবে। অথচ টাকাটা আজই পাঠাতে পারলে ভাল হয়। অসুখের ব্যাপার তো—"

অন্নদা বিশ্বাস চুপ করে' রইল।

"এইবার তোমার সর্বনাশের ব্যাপারটা কি শুনি?"

"আমি যে পোস্টাফিস থেকে টাকা বার করে' ব্যবসাতে ঢেলেছি তা পরিবার টের পেয়ে গেছে ভাই। আমার ছোট শালাকে কথাটা প্রাইভেটলি বলেছিলুম, সে ফাঁস করে' দিয়েছে সব।"

"তাতে আর কি হয়েছে? দিন পনরো-কুড়ির মধ্যে তোমার সব টাকা সুদসুদ্ধ দিয়ে দেব। বিকাশবাবু দোকানের মালপত্র সব কিনে নেবেন কথা দিয়েছেন। বিয়েটা হ'য়ে গেলেই—"

"বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে নাকি?"

"সেদিন তোমাকে বললাম যে।"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলে বটে। সেই রঞ্জনার সঙ্গেই? তুমিই ঘটকালি করলে নাকি?"

চুনীলাল ঘাড় নেড়ে স্মিতমুখে চেয়ে রইল কেবল, কোনও কথা বললে না। রঞ্জনা যে তার নিজেরই ভাগ্নি একথা অন্নদার কাছে প্রকাশই করেনি সে।

"বাহাদুরি আছে বটে তোমার"—অন্নদার শুষ্কমুখে হাসি ফুটল একটু।

"দিন পনরো পরেই টাকাটা পাব ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"দেখো ভাই। শুনে' অবধি পরিবার তো কাক-চিল বসতে দিচ্ছে না বাড়িতে। এমন মাথা খুঁড়েছে যে কপালের মাঝখানটা আবের মতো ফুলে উঠেছে।"

"একটা বাজে বোধ হয়? টাকাটা আজকে পাঠাতে পারলে বড় ভাল হ'ত।"

"কালই দিয়ে দেবে তো ঠিক? আমাদের আপিসের চাটুজ্যে মশাই মশারির কাপড় কিনবার জন্তে গোটা পঁচিশেক টাকা দিয়েছেন। তার থেকেই দশটা টাকা নাও, মশারির কাপড় পরশু কিনব না হয়।"

"দাও। এগারোটা টাকাই দাও। মনিঅর্ডার করতে তো কিছু লাগবে? চল, সঙ্গে সঙ্গে মনিঅর্ডার করেই দিই।"

"বেশ চল।"

দু'জনে পোস্টাফিস অভিমুখে রওনা হ'লেন। কিছুদূর গিয়েই মোড়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন অন্নদা বিশ্বাস।

"একটা সোডা দাও তো হে।"

"শুধু শুধু সোডা খাচ্ছ কেন?"—ভ্রূকুঞ্চিত করে' প্রশ্ন করলেন চুনীলাল।

"শুধু শুধু নয়, পেটটা কেমন ঠোস মেরে আছে। আজকালকার তেল তো আর তেল নয়, বিষ।"

আসলে মাঝে মাঝে সোডা খাওয়া অন্নদা বিশ্বাসের একটি বিলাস। এই একটিমাত্র বিলাসই আছে তাঁর। কিন্তু সেটা যে বিলাস তা স্বীকার করতে লজ্জিত হন ভদ্রলোক। এমন কি নিজের কাছেও।

ফেনায়িত সোডার বোতলটা মুখে তুলে' অন্নদা বিশ্বাস এমন একটা মুখভাব করলেন যেন তিনি ওষুধ খাচ্ছেন, বাধ্য হ'য়ে যেন খেতে হচ্ছে। চুনীলাল ভ্রূকুঞ্চিত করে' তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দিবস নিজেকে রঞ্জনার কাছে মেসের চাকর হিসেবেই পরিচিত করেছিল, প্রয়োজন হ'লে গহনচাঁদের কাছেও সে পরিচয় দিতে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু সে পরিচয় যখন দিতে হ'ল তখন গ্লানিতে তার সমস্ত মন যেন ক্লেদাক্ত হ'য়ে উঠল। এই গ্লানিটার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না, নিজের এই দুর্বলতায় নিজের কাছেই অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল সে। তার বাহবা-লোলুপ মনোবৃত্তির গালে বিধাতা যেন একটা চপেটাঘাত করে' বলে' দিলেন—তুই বড়লোকের ছেলে, তুই এম-এস-সি পাস, তা সত্ত্বেও তুই আদর্শের জন্যে সামান্য একটা চাকর হ'য়ে আছিস—এই সম্পূর্ণ খবরটা রঞ্জনা জানতে পেরেছিল বলেই তুই তার কাছে বক্তৃতার পেখম মেলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলি। তোর ইচ্ছেটা ছিল গহনচাঁদ-বাবুও সমস্ত খবরটা জেনে বাহবা দিয়ে উঠুন। কিন্তু তা হ'ল না। তিনি ওর কুৎসিত অংশটুকু জানতে পারলেন শুধু। এর জন্যে তোর যদি গ্লানি হ'য়ে থাকে বাড়ি ফিরে যা। লোককে তাক্ লাগিয়ে দেবার অনেক উপকরণ আছে সেখানে। আর একটা ঘটনাও হয়তো ঘটতে পারে, এখনই অত দমে' যাচ্ছিস কেন? রঞ্জনার মুখে গহনচাঁদবাবু হয়তো তোর উজ্জ্বল অংশটারও খবর পাবেন।

এই ধরনের আত্ম-বিশ্লেষণের পর এবং গহনচাঁদের "আরে তুমি তো তাহ'লে আমাদের পালটি ঘর" এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে' দিবস ঠিক করে' ফেললে গহনচাঁদের বাড়িতে আর সে যাবে না। আরও ঠিক করলে দ্বিগুণ উৎসাহে মেসের চাকরিটাকেই আঁকড়ে থাকতে হ'বে তাকে এখন কিছুদিন। নিছক মেসের চাকর হিসাবে লোকসমাজে নিজের পরিচয় দিতে যতদিন না সে গৌরব বোধ করছে ততদিন থাকতে হ'বে। যে গ্লানি সে কিছুক্ষণ আগে অনুভব করেছে, সে গ্লানির মূলোৎপাটন করে' তবে ছাড়বে। ছাত্রজীবনে এই ধরনের গোঁ তাকে ভর করত মাঝে মাঝে। এক-

একটা শক্ত অঙ্ক নিয়ে সমস্ত রাত কেটেছে তার। অঙ্কটা যত বেশী জটিল মনে হ'ত, জেদও ততই বাড়ত। মেসের কারও কাছে সে নিজের সত্য পরিচয় দেবে না তা-ও ঠিক করে' ফেললে। হরিদাস-বাবু যদি ফিরে থাকেন তাহ'লে তাঁকে মানা করে' দিতে হ'বে।

তার পরদিন সকালে মেসে গিয়ে সে প্রথমেই নিশ্চিন্ত হ'ল হরিদাসবাবু ফেরেন নি দেখে'। পটলির স্বামীর অসুখের জন্য গিরি কয়েকদিন থেকে আসছে না (গিরির নিজেরও জ্বর হচ্ছে মাঝে মাঝে), গিরির কাজগুলো প্রথমেই সে করে' ফেললে। খানকয়েক বাসন মাজতে কতক্ষণই বা লাগে। সেদিন মনের বেগটা প্রবল ছিল বলে' আরও কম সময় লাগল। বাসনগুলো মেজে উনুনে আগুন দিয়ে দিলে সে। তারপর ঝাঁটাটা নিয়ে উপরে উঠল। উঠেই দেখা হ'য়ে গেল গোবর্ধনের সঙ্গে।

"আসুন, আসুন, ওস্তাদবাবু আসুন। সরোদ শেখা হ'ল কাল? না, আমরা যাওয়াতে রসভঙ্গ হ'য়ে গেল?"

দিবস কিছু না বলে' ঘর ঝাড়ু দিতে লাগল মৃদু হেসে। উপহাসটা গায়ে মাখলে না।

"সত্যিই তুমি সরোদ বাজাও নাকি হে?"—প্রশ্ন করলেন অঘোর।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাজাই।"

"কালে-কালে কতই যে দেখব!"

গোবর্ধনবাবু পাঁজি দেখছিলেন, পাঁজিরই পাতা ওলটাতে লাগলেন। দিবস মুখে মৃদু হাসিটুকু ফুটিয়ে রেখে' ঘর ঝাড়ুই দিয়ে যেতে লাগল। মুখের এই হাসিটুকু ফুটিয়ে রাখতে (তার অর্থ, যেন কিছুই হয় নি) যে কি পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হচ্ছিল তাঁদের ওই চাকরটিকে, তা যদি গোবর্ধনবাবু বুঝতে পারতেন! গোবর্ধন তাঁর মুখের হাসিটা লক্ষ্যও করছিলেন না তেমন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যাপারে নিমগ্ন ছিলেন।

"এই দেখ অলাবু ভক্ষণ নিষেধ, বললুম আমি, এই দেখ"—অঘোরের সামনে পাঁজিটি তুলে' ধরলেন তিনি—"তুমি তো এক দিগ্‌গজ লাউ কিনে আনলে।"

"কাল খাওয়া যাবে।"

"তাহ'লে তুমি বাজারে যেও। মাছের মাথা কিংবা চিংড়ি মাছ নিজে দেখে' কিনে এনো, লাউ অমনি খাওয়া যায় না।"

"বেশ তাই যাব। এখন ধূর্জটিবাবুকে নিয়ে কি করা যায় বলুন তো? বড়ই দমে' গেছেন ভদ্রলোক।"

"হরিদাস আসুক। ব্যবস্থা একটা করতেই হ'বে। আজই হরিদাসের আসবার কথা।"

"মিত্তিরমশাই আছেন নাকি?"—নিচে থেকে হাঁক শোনা গেল একটা।

"সিংহির গলা না? দেখ তো।"

অঘোর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন এবং উঁকি মেরে দেখলেন।

"হ্যাঁ। মিত্তিরমশাই আছেন, আসুন ওপরে।"

হরলাল সিংহি এসে যখন ঢুকলেন তখন দিবস তক্তাপোশের নিচে শরীরের খানিকটা ঢুকিয়ে দিয়ে কোণের দিকের ময়লাগুলো টেনে' বার করছিল।

"এস এস"—অভ্যর্থনা করলেন গোবর্ধন—"শ্রীরামপুর থেকে আসছ?"

"হ্যাঁ।"

"খবর সব ভাল তো?"

"হ্যাঁ, এদিকে ভালই। কিন্তু সেই চুনীলালের খপ্পর থেকে এখনও উদ্ধার পাই নি ভাই।"

"কি হ'ল?"

"শুনেছিলাম টাকাটা সে দিয়ে দিতে চায়। চিঠি লিখলাম, কোনও উত্তর নেই। তাই আমাদের উকিল সূয্যিবাবুর কাছে

যাচ্ছি আর একবার। তিনি কয়েকটা সাক্ষী যোগাড় করতে বলেছিলেন—"

দিবস চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে এল। হরলাল সিংহি আকাশ থেকে পড়লেন।

"আরে, দিবুবাবু যে! আপনি এখানে! এ কি!"

কোনও উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল দিবস। এ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। এ-ও সে নিমেষে বুঝতে পারলে যে মেসের চাকরিটিও ছাড়তে হ'বে, কারণ একটু পরেই বাবা এসে হাজির হবেন এখানে।

গোবর্ধন বিস্মিত হয়েছিলেন হরলালের ব্যবহারে।

"একে চেন নাকি তুমি?"

"চিনি বইকি। সূয্যিবাবু উকিলের ছেলে।"

"বল কি! আমাদের মেসে চাকর হ'য়ে আছে ক'দিন থেকে।"

"সে কি! চাকর হ'য়ে আছে?"

হরলাল বিস্ময়ে নির্বাক্ হ'য়ে রইলেন।

অঘোর মন্তব্য করলেন, "আজকাল ভদ্দরলোকের ছেলেদের এই দুর্দশাই তো হ'বে। পড়াশোনার দিকে মন নেই তো কারও। আমার ছেলেটা তিন বছর ধরে' ফোর্থ ক্লাসেই ডিগবাজি খাচ্ছে।"

"না না, দিবুবাবু সেরকম ছেলে নন। এম-এস-সি পাস করে' ল' পড়ছিলেন। বাপের সঙ্গে তাহ'লে হয়েছে নিশ্চয় কিছু একটা। খবর নিতে হচ্ছে।"

গোবর্ধনের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হ'ল। তিনি কিছু বলবার আগেই হরলাল সিংহি দিবসের সঙ্গে কথা কইবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার আগেই কিন্তু দিবস বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। দিবসকে দেখতে না পেয়ে হরলাল ঘরে ঢুকলেন আবার।

"এম-এস-সি পাস করে' ল' পড়ছিল!"—গোবর্ধনের মুখে কথা সরল এতক্ষণে।

"হ্যাঁ, হীরের টুকরো ছেলে।"

গোবর্ধন এবং অঘোর দৃষ্টি বিনিময় করলেন। হরলাল সিংহি যদি সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকান্তকে খবর দিতে পারতেন তাহ'লে হয়তো দিবসের নাগাল পাওয়া সম্ভব হ'ত। কিন্তু তিনি ক্লান্ত ছিলেন। তিনি ভাবলেন একটু পরে যখন সূর্য চৌধুরীর ওখানে যাবেন তখনই ঘটনাটা বলবেন তাঁকে। তাছাড়া তিনি আশা করছিলেন যে, দিবস যখন এইখানেই আছে তার মুখে ব্যাপারটা শোনা যাক প্রথমে। দিবস যে মেসে আর ফিরবে না, ধারণা করতে পারেন নি তিনি।

দিবস রাস্তা ধরে' সোজা হাঁটতে লাগল। কয়েকদিন আগে রঙ্গনার যেমন মনে হয়েছিল তারও তেমনি মনে হ'তে লাগল একটা বেড়াজাল সহসা মূর্ত হ'য়ে উঠেছে তার চারদিকে। যে দু'টি মুক্তির ক্ষেত্রে সে নিজেকে বিস্তার করছিল তা পর পর রুদ্ধ হ'য়ে গেল হঠাৎ। গহনচাঁদের বাড়িতে আর যাওয়া যাবে না, ও মেসেও আর চাকরি করা যাবে না। হরলালবাবুর মুখে খবর পেয়ে বাবা দলবল নিয়ে এসে পড়বেন এইবার। সৌদামিনীর সংস্রবও হয়তো ত্যাগ করতে হ'বে। রঙ্গনা তার বাসার ঠিকানা জানে। বাবা যদি মেস থেকে গহনচাঁদবাবুর বাড়ি যান (যাবেনই), তাহ'লে সেখান থেকে তার বাসায় অনায়াসে আসতে পারবেন। তারপর শুরু হ'বে সেই মামুলি তর্কাতর্কি, সেই কথা-কাটাকাটি, ব্রজ হয়তো কাঁদবে, বাবা গুম্ হ'য়ে যাবেন, চিমটি কেটে' কেটে' কথা বলবেন গোবিন্দ সাণ্ডেল—এইসবের আবর্তে আবর্তিত হ'তে হ'তে শেষকালে আবার গিয়ে হয়তো ঠেকতে হ'বে তাকে ল' কলেজে। তার স্বপ্ন স্বপ্নই

থেকে যাবে। মনে পড়ল একটা বইয়ের দোকানে সে নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির একটা বই কিনতে দিয়েছিল। বইটা দোকানে ছিল না। দোকানদার দিবসের চেনা, (এর দোকান থেকেই দিবস বই কেনে বরাবর) বইটা খুঁজে আনিয়ে রাখবেন বলেছিলেন। হয়তো বইটা এসে গেছে। সোজা দোকানের উদ্দেশেই চলতে লাগল সে। একটি কথাই বার বার মনে হ'তে লাগল—আত্মরক্ষা করতে হ'বে। যেমন করে' হোক দৈবের এই প্রতিকূলতাকে জয় করতে হ'বে। পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়াতে তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠেছিল যেন, একটা অভিনব আনন্দও। শক্তি পরীক্ষা করবার আর একটা সুযোগ পেয়ে তার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে। না, কিছুতেই সে দমবে না, কিছুতেই না। নিজে যেচে না গিয়েও অকস্মাৎ বাবার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনাতে সে প্রথমটা খুশী হ'য়ে উঠেছিল একটু, কিন্তু এই দেখা হওয়ার পরিণামটা ভাবতে গিয়েই তার মন বিদ্রোহ করে' উঠল। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল এই দুর্বলতার ভাঙন কোথায় গিয়ে থামবে। "না, দুর্বলতাকে কিছুতে প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে না"—এই কথা ভাবা সত্ত্বেও বাবার মুখটা কিন্তু মাঝে মাঝে ফুটে উঠতে লাগল মনে। বিশেষ করে' সেই ফটোর মুখটা, চোখের সেই প্রসন্ন দৃষ্টি, যার মধ্যে কোন নীচতা নেই। রঞ্জনার মুখটাও। একবার একথাও তার মনে হ'ল যে, রঞ্জনার চোখের দৃষ্টিতে দু'একবার চকিতে সে এমন আলো দেখেছে যার সঙ্গে তার আচরণের মিল নেই। তার বাইরের আচরণটা কি তবে আবরণ শুধু? তার আসল সত্তাটার পরিচয়ই সে পায় নি হয়তো। ক্ষণিকের জন্য এই কথাটা মনে হ'ল তার, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। দোকানে পৌঁছে সে সব ভুলে গেল। দোকানী বললেন, "বইটা আনতে একটি লোককে পাঠিয়েছি। এখনই সে এসে পড়বে। আপনি একটু অপেক্ষা করে' যান।" দিবস দোকানের ভিতর ঢুকে এ বই, সে বই উলটে উলটে দেখতে

লাগল এবং ক্রমশ তন্ময় হ'য়ে গেল। হঠাৎ এক সময়ে সে ঠিক করে' ফেলল অন্তত কিছুদিনের জন্য তাকে কোলকাতার বাইরে চলে' যেতে হ'বে। আজই। তা না হ'লে বাবা ঠিক ধরে' ফেলবেন তাকে। কোলকাতার বাইরেই কোথাও গিয়ে সে রোজগার করে' টাকা জমাবে। আজই, এখনই চলে' যেতে হ'বে। টাকাকড়ি তার সঙ্গেই ছিল। দু'খানা কাপড় আর জামা দুটো বাসা থেকে নিয়ে আসতে পারলে ভাল হ'ত। তখনই মনে হ'ল বাবা যদি ইতিমধ্যে এসে থাকেন সেখানে! তাছাড়া আর একটা কথাও মনে হ'ল, যে ছেলেটিকে সে অঙ্ক পড়ায় তারও ব্যবস্থা করে' যেতে হ'বে একটা। অন্ততপক্ষে খবরটা দিতে হ'বে তাকে। এমন সময় তার বইটা এসে পড়ল। সাগ্রহে বইটার পাতা ওলটাতে লাগল সে। আবার তন্ময় হ'য়ে গেল। তারপর খেয়াল হ'ল সেই ছেলেটিকে খবর দিতে হ'বে। নেমে পড়ল রাস্তায়। ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে দেখল এগারোটা বেজেছে। তারপর রাস্তার দিকে চেয়ে সে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেলে সৌদামিনীকে। সৌদামিনী একটা রিকৃশ করে' চলেছে।

"দিদি কোথা চলেছ?"

একমুখ হেসে সৌদামিনী বললে, "কালীঘাটে পূজো দিতে গিয়েছিলাম, পটলি মানত করেছিল কিনা। সরে' এস এদিকে।"

সরে' যেতেই পূজোর ফুল বেলপাতা দিবসের মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে সৌদামিনী বললে, "পেসাদ বাড়ি গিয়েই খেও। মনে করে' খেও যেন।"

"আমি এখন বাড়ি ফিরব না। আমাকে বাইরে যেতে হ'বে আজ"—হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল দিবসের—"তুমি একটি উপকার করতে পারবে দিদি?"

"কি?"

"আমার কাপড় দুটো, গেঞ্জিটা আর জামাটা আমার সেই ক্যাম্বিসের থলিতে পুরে এই বইয়ের দোকানে যদি পাঠিয়ে দিতে

পার কারও হাত দিয়ে তাহ'লে আর আমাকে বাসায় যেতে হয় না।"

"তা না হয় দিতে পারি, কিন্তু যাওয়া হচ্ছে কোথা ?"

"বর্ধমানে"—হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল দিবসের।

"হঠাৎ বর্ধমান ?"

"দরকার আছে একটু।"

"ফিরবে কবে ?"

"তার ঠিক নেই।"

"তোমার মেসের কাজ কে করবে তাহ'লে ?"

"মেসের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তুমি কাপড়-জামা পাঠিয়ে দিও তাহ'লে—। এদের বলে' দি।"

সৌদামিনীর কাছের বেশীক্ষণ দাঁড়াতে সাহস হচ্ছিল না দিবসের। তাড়াতাড়ি সে তাই বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল আবার।

"একজন আমার একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ এখানে দিয়ে যাবে, রেখে' দেবেন, আমি একটু পরে এসে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা।"

দোকান থেকে নেমে সৌদামিনীর দিকে চেয়ে দিবস বললে—"আচ্ছা, চলি তাহ'লে।"

"শোন। পেসাদটুকু খেয়ে যাও।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আধখানা প্যাঁড়া এবং একটা বাতাসা দিবসকে খেতে হ'ল।

রঞ্জনা বাড়িতে একা ছিল। নিজের সেই কোণের ঘরটিতে বসে' ছিল সে। একাগ্র হ'য়ে প্রতীক্ষা করছিল গহনচাঁদবাবু কি খবর নিয়ে আসেন। গহনচাঁদবাবু চুনীলালকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। রঞ্জনাকে বলে' গিয়েছিলেন বিকাশবাবুর জ্যাঠার কাছে বলতে

যাচ্ছেন যে তাঁরা এখন মেয়ে দেখতে যেন না আসেন। চুনীলাল অন্য দিকে চেয়েছিল, কিছুই বলে নি। 'মৌন সম্মতির লক্ষণ'—এই প্রবাদ বাক্যানুসারে চুনীলালের তাতে সায় ছিল, একথা যদি কেউ মনে করেন তাহ'লে তাঁরা চুনীলালদের চেনেন না। সে কোনও রকমে বিনা ঝামেলায় রঙ্গনার সান্নিধ্যটা এড়াতে চাইছিল। রাস্তায় বেরিয়েই সে গহনচাঁদকে বললে, "আপনি কি সত্যিই ওদের মানা করতে যাচ্ছেন নাকি?"

"রঙ্গনা যখন অত আপত্তি করছে তখন তা করা ছাড়া উপায় কি?"

"রঙ্গনার বিয়ে দিতেই হ'বে একদিন। এমন সৎপাত্র হাতছাড়া হ'য়ে গেলে কিন্তু পরে পস্তাতে হবে।"

"কি করতে বল তুমি আমাকে তাহ'লে—"

গহনচাঁদ অসহায়ভাবে চাইলেন চুনীলালের দিকে।

"ওরা যেমন মেয়ে দেখতে আসছে, আসুক। বরং ব্যাপারটা ওরা যাতে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলে সেই কথাই বলি গে চলুন ওদের। তারপর রঙ্গনাকে বোঝান যাবে। আজ টেলিগ্রাফ ক'রে' দিচ্ছি—পদ্ম চলে' আসুক। মামীকে খুব ভালবাসে রঙ্গনা। পদ্ম বুঝিয়ে বললে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষই বোঝাতে পারে, ও আপনার আমার কর্ম নয়।"

কথাটা গহনচাঁদের যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল।

রঙ্গনা কিন্তু কোণের ঘরটিতে বসে' প্রতীক্ষা করছিল। শুধু গহনচাঁদ কি খবর আনেন তার জন্যেই নয়, দিবসেরও একটা খবর সে প্রত্যাশা করছিল। দিবসের প্রকৃত পরিচয় সে গহনচাঁদকে বলে নি। তার মনের খবরটা ভাবে-ভঙ্গিতে ঊর্মির কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়াতেই লজ্জায় মাথা কাটা গেছে তার। ঊর্মি কথাটা বাবার কাছে প্রকাশ করে' দিয়েছে, বাবা দিবসবাবুর কাছে বিয়ের প্রস্তাবও করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওই মেসের ভদ্রলোকেরা এসে

পড়াতে সব গোলমাল হ'য়ে গেল, এ সমস্ত খবরই সে তার বাবার কাছ থেকে শুনেছে। দিবস যে মেসের সামান্য একটা চাকর মাত্র, এই বিস্ময়কর খবরটাও গহনচাঁদ সাড়ম্বরে বলেছেন রঙ্গনাকে। তবু রঙ্গনা চুপ করে' ছিল, দিবসের প্রকৃত পরিচয় দেয় নি। দিবসের প্রকৃত পরিচয়টা উদ্ঘাটন করে' তার হ'য়ে ওকালতি করতে শুধু যে তার লজ্জা করছিল তা নয়, আত্মপ্রশংসা করতে যে ধরনের একটা সঙ্কোচ হয় সেইরকম একটা সঙ্কোচও হচ্ছিল। সত্যবান্ রাজার ছেলে—এইটেকে বড় করে' তোলার মধ্যে কেমন যেন একটা ইতরামি আছে একথাও মনে হচ্ছিল তার। তাই সে চুপ করে' ছিল। দিবসের বিষয়ে একটি কথাও বলে নি কাউকে। কিন্তু সে প্রতীক্ষা করছিল। কিরণের লেখা গানের লাইনগুলো স্বপ্ন সৃজন করছিল তার মনে—

আঁধার রজনী শেষে
আলোক উজল বেশে
আসিবে সে আসিবে সে
আসিবে সে
জানি আমি জানি আমি জানি গো।

হঠাৎ বাড়ির সামনে মোটর এসে দাঁড়াল একটা। জানালাটা ঈষৎ ফাঁক করে' সূর্য চৌধুরীকেই দেখতে পেল সে প্রথমে। দেখেই চিনতে পারল। তাঁর ফটোটা সে দিবসের বাসায় দেখেছিল। সহসা কেমন যেন শঙ্কিত হ'য়ে পড়ল সে। নিমেষের মধ্যে সে বুঝতে পেরে' গেল দিবসের সন্ধানেই এসেছেন উনি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল দিবসকে উনি যদি ধরে' নিয়ে যান, তাহ'লে দিবস হয়তো চিরদিনের জন্য তার নাগালের বাইরে চলে' যাবে। খোলার-ঘর-বাসী দিবস তার কাছে সুলভ, কিন্তু প্রাসাদ-বাসী সূর্য চৌধুরীর একমাত্র পুত্র দিবস আকাশের চাঁদের চেয়েও দুর্লভ তার কাছে।

সূর্য চৌধুরীর ঠিকানাও জানা নেই রঞ্জনার। দিবস যদি বাবার কাছে ফিরে যায় তাহ'লে—।

সূর্য চৌধুরী ছাড়া মোটরে অঘোর এবং হরলাল ছিলেন।

হরলাল নেমে এসে দুয়ারের কড়া নাড়তে লাগলেন। রঞ্জনা বেরিয়ে এল।

"কাকে খুঁজছেন?"

"দিবসবাবু এখানে সরোদ শিখতে আসেন?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কোথায় থাকেন বলতে পারেন?

"তাতো জানি না।"

"গহনচাঁদবাবু কোথা?"

"তিনি বেরিয়েছেন একটু। তিনিও দিবসবাবুর ঠিকানা জানেন না।"

"ও।"

"দিবসবাবু কখন আসেন সাধারণতঃ?"

"তার ঠিক নেই।"

"এলে বলে' দেবেন যে তাঁর বাবা তাঁকে নিতে এসেছিলেন। তিনি যেন আজই দেখা করেন তাঁর সঙ্গে।"

"আচ্ছা, আসেন তো বলে' দেব।"

সূর্য চৌধুরীর মোটর চলে' গেল। নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জনা। হঠাৎ যেন তার মনে হ'ল দিবস আর আসবে না। কেন মনে হ'ল তা যদিও সে বলতে পারত না, কিন্তু তার মনে হ'ল। দিবস যে ক'দিন থেকে তার সম্বন্ধে একটু উদাসীন হ'য়ে পড়েছে একথা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল, কিন্তু মানতে চাইছিল না। সেই অনুভূতিটা এখন যেন কানে কানে তাকে বলে' গেল— দিবস আর আসবে না।

দিবসের কিন্তু বর্ধমান যাওয়া হ'ল না। বইয়ের দোকানে সৌদামিনী যে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা বসন্তর মারফত পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেটা যদি সে আগে খুলে' দেখত তাহ'লে হাওড়া পর্যন্ত যাবারও দরকার হ'ত না। বর্ধমানের নামটা যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তখন বর্ধমানে যাওয়া স্থির করেছিল সে। স্টেশনে গিয়ে সে খোঁজ করল বর্ধমানের গাড়ি কখন। দেরি আছে শুনে' স্টেশনে ঘোরাফেরা করল খানিকক্ষণ। হুইলারের দোকানে বই ওল্‌টাল মিনিট পনের ধরে'। এই সময়ে তার সঙ্গে দেখা হ'লে গেল মহেন্দ্র কুণ্ডুর।

"আরে, আপনি এখানে! আমি যে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কোথায় চলেছেন আপনি?"

"বর্ধমান যাব।"

"হাঁসটা ভাল আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওটাকে এসে নিয়ে যাব এবার একদিন। বাসা পেয়েছি একটা।"

"বেশ তো।"

"আসুন।"

সিগারেটের বাক্সটা দিবসের সামনে খুলে' ধরলেন কুণ্ডুমশায়।

"আমি তো সিগারেট খাই না।"

"ও।"

কুণ্ডুমশায়ের মুখটা ছুঁচলো হ'ল একটু। তারপর নিজেই একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন সেটি। ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা, চলি তবে। এসে হাঁসটা নিয়ে যাব এক-দিন। আপনি কখন বাড়িতে থাকেন?"

"আমি? প্রায়ই থাকি না। আমি না থাকলেও নিয়ে যাবেন, আপনারই তো হাঁস।"

"বেশ বেশ।"

মহেন্দ্র কুণ্ডু চলে' গেলেন।

হুইলারের দোকানে মনোমত কোন বই না পেয়ে দিবস ঠিক করলে এখনই যে বইটা কিনেছে সেইটেই ওল্‌টান যাক ওয়েটিং রুমে বসে' বসে'। বইটা সে ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল। ওয়েটিং রুমে গিয়ে ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে বইটা বার করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল খামের একখানা চিঠি। চিঠিটা সকালের ডাকে তার বাসায় এসেছিল। সোদামিনী সেটা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কার চিঠি? চেনা হাতের লেখা। লণ্ডনের ছাপ রয়েছে। চিঠিখানা খুলে' দিবস অবাক্ হ'য়ে গেল। তার জীবনের গতিটাই বদলে গেল যেন হঠাৎ। কল্পনায় যে রঙে সে নিজের ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছিল, তার চেয়ে শত সহস্রগুণ উজ্জ্বল বর্ণে মহিমান্বিত হ'য়ে উঠল যেন সে ছবি।

দিবসের চিঠির উত্তরে তার সেই সাহেব প্রফেসার যা লিখেছেন তার বাংলা অনুবাদ এই—

প্রিয় চৌধুরী,

তোমার চিঠি পেয়ে যুগপৎ আনন্দিত ও দুঃখিত হ'লাম। আমাকে এখনও মনে রেখেছ জেনে আনন্দ পেলাম, কিন্তু তুমি তোমার বাঞ্ছিত পথে চলতে পাও নি শুনে' দুঃখ হচ্ছে। তুমি যে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে চাইছ তা অভিনব বটে। তবে তার সাফল্য বা অসাফল্য সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না এখন। আমি এখানে একটা ল্যাবরেটরির সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছি, তুমি যদি কোন-ক্রমে এখানে এসে পড়তে পার, তাহ'লে তোমাকে তোমার গবেষণার পথে চলতে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারব। এখানে থাকার এবং খাওয়ার খরচ অবশ্য তোমাকে নিজেকে উপার্জন করতে হ'বে। উপার্জনের পথে বাধা বিস্তর, কিন্তু তোমার কাজ করবার শক্তি ও ইচ্ছা যদি প্রবল এবং খাঁটি হয় তাহ'লে জুটে যাবেই কিছু একটা।

উত্তমশীল মানুষকে কোন বাধাই নিরস্ত করতে পারে না। তুমি যদি এখানে আসতে চাও বেশী দেরি কোরো না, কারণ যে সুযোগ তোমাকে দিতে পারব ভাবছি, দেরি করে' ফেললে তা হয়তো পারব না।

আশা করি কুশল সব। আমার স্নেহ গ্রহণ কর। ইতি—

চিঠিটা পড়বার পরমুহূর্তেই তার মনে হ'ল হরিদাসবাবুর কথা। তিনি প্রয়োজন হ'লে অর্থ সাহায্য করবেন বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বেরিয়ে পড়ল সে।

নিজের বাসার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার ভয় হ'তে লাগল, গিয়ে যদি দেখে' বাবা বসে' আছেন! বসন্তকে দেখতে পেলে হঠাৎ। বসন্তও তাকে দেখে' এগিয়ে এল।

"আপনি বর্ধমান যান নি?"

"না। আমাকে খুঁজতে এসেছিল কেউ?"

"না তো!"

"দিদি কোথায়?"

"বাসাতেই আছে।"

"গিরি এ-বেলা কাজে গেছে কি?"

"যায় নি, কিন্তু যাবে বলছিল, ওই যে আসছে।"

গিরিও বেরিয়ে এল।

"তুমি মেসে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। আজ যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আপনি চলে' গেছেন শুনে' যাচ্ছিলাম। কেউ না গেলে বাবুদের যে কষ্ট হ'বে। ঠাকুরটি যা শ্রীমন্ত!"

"চল, আমিও যাই।"

"আপনি বর্ধমান যান নি?"

"না। শোন, একটা কাজ করতে হ'বে তোমাকে।"

"কি ?"

"আমি আর মেসে ঢুকব না। আমার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছেন সবাই। তবে হরিদাসবাবু যদি ফিরে থাকেন তাঁকে আড়ালে ডেকে একটু বল যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই একবার বিশেষ দরকারে। আমি মেসের পাশের গলিটাতে অপেক্ষা করব তাঁর জন্যে। গোপনে ডেকে বোলো কিন্তু, জানাজানি না হ'য়ে যায় যেন।"

"আচ্ছা।"

মেসের কাছাকাছি এসে সৌভাগ্যক্রমে হরিদাসবাবুর সঙ্গেই দেখা হ'য়ে গেল। তিনি খানিকক্ষণ আগে টুর থেকে ফিরে স্নানাহার সেরে আপিসের দিকেই যাচ্ছিলেন।

গিরি মেসে ঢুকে পড়ল।

হরিদাসবাবু দিবসের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "সব জানাজানি হ'য়ে গেছে দেখছি। এখন কি করবেন ?"

"আপনি যদি সাহায্য করেন একটু লম্বা পাড়ি দেব।"

"কি রকম ?"

সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে' প্রফেসারের চিঠিটা হরিদাসবাবুকে দিবস দেখালে। তারপর বললে—"আপনি যদি টাকা দেন তাহ'লে—"

দিবসের কথা শেষ করতে না দিয়ে হরিদাসবাবু বললেন, "চলুন, এখনই দিচ্ছি। ক'টা বেজেছে ?"

"একটা বোধ হয়।"

"চলুন তাহ'লে সোজা পোস্টাফিসের দিকেই যাওয়া যাক।

চৌদ্দ

সেদিন সন্ধ্যার পর দিবস গড়ের মাঠে ঘুরে' বেড়াচ্ছিল একা। সে আনন্দে যেন বুঁদ হ'য়ে গিয়েছিল। আনন্দের নেশায় ঘুরে' ঘুরে' বেড়াচ্ছিল মাতালের মতো। কোন এক অদৃশ্য বিধাতার কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তার অস্পষ্টভাবে। মনে হচ্ছিল তাঁর হাতে বোধ হয় ইলেক্‌ট্রিক সুইচের মতো কিছু একটা আছে। ইচ্ছা মতো আলো বা অন্ধকার করে' দিতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে। আলোর রঙও বদলে দিতে পারেন খুশী মতো। খানিকক্ষণ আগেই হতাশার অন্ধকার নেমে এসেছিল চারিদিকে, এখন আবার কি চমৎকার হ'য়ে গেল। হরিদাসবাবু সমস্ত টাকাটাই দিয়ে দিয়েছেন তাকে। একটা রসিদ পর্যন্ত নিতে চাচ্ছিলেন না। দিবস জোর করে' একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছে। কি অদ্ভুত ভদ্রলোক! টাকার প্রতি কোন মমতাই নেই। অথচ তা নিয়ে কোন আস্ফালনও নেই। অনাড়ম্বর আবরণের তলায় কত মহত্ত্বই যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে তা আমরা দেখতে পাই না। পরমাণুর মধ্যে যে এত সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাই বা কে জানত এতদিন? সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে রইল সে। তার মনে হ'ল প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেই যেমন বিরাট শক্তি নিহিত আছে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও তেমনি হয়তো নিহিত আছে বিরাট মহত্ত্ব। আমরা প্রত্যেকেই হয়তো হরিদাসবাবু। একটা বিশেষ প্রেরণার সংঘাতে হরিদাসবাবুর মহত্ত্ব প্রকট হয়েছে, অন্যরকম প্রেরণার সংঘাতে আর একজনের মহত্ত্ব হয়তো তেমনি উদ্‌ঘাটিত হ'বে। নুন জলের সংস্পর্শে গলে, সোনা গলে অ্যাকোয়া রিজিয়াতে, কিংবা আগুনের তাপে সোহাগার স্পর্শে। সব জিনিসই গলে,

সব জিনিসই বাষ্প হয়। সব মানুষও তেমনি হয়তো মহত্ত্বে বিকশিত হ'তে পারে—হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল। বিলেত চলে' যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে' গেলে কেমন হয়? কিন্তু যদি তিনি বাধা দেন। অসম্ভব নয়। গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখটা মনে পড়ল। মনে পড়ল ব্রজকে। এরা বাধা দেবেই। তাছাড়া সে তো নিজের পায়ে দাঁড়ায় নি এখনও। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে সে ফিরবে না বাড়িতে। নিজের পৌরুষের অমর্যাদা সে করবে না। জোর গলায় যে কথাটা সে প্রচার করেছে তা রাখতেই হ'বে। বিলেতে পৌঁছে বাবাকে একটা খবর দিলেই হ'বে। আবার সে ঘুরে' বেড়াতে লাগল। আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গিটা ইন্দ্রপুরীর মতো মনে হ'তে লাগল দূর থেকে। মনে হ'ল মাটির পৃথিবীতে অন্ধকার রাত্রে এই ইন্দ্রপুরী সম্ভব হয়েছে মানুষের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে। নির্নিমেষে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে। মনে হ'ল মানব-মনীষার জয়যাত্রার মিছিলে সেও চলেছে।

ইচ্ছে করেই বেশী রাত্রে বাড়ি ফিরল। বাবা যদি ইতিমধ্যে খোঁজ নিতে এসে থাকেন, রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বসে' থাকবেন না নিশ্চয়। ঘরের সামনে এসেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। ঘরের কপাট খোলা কেন? সৌদামিনীর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, সেই শুয়েছে নাকি এসে? বাবা অপেক্ষা করছেন নাকি! নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ক্ষণকাল। তারপর ঘরে ঢুকল। ঢুকে যা দেখল তা সে প্রত্যাশা করে নি, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হ'ল প্রত্যাশা করেছিল, অতি সংগোপনে অন্তরের অন্তস্তলে! খাটের উপর রঞ্জনা বসে' আছে।

"একি, তুমি হঠাৎ এ সময়ে?"

"অনেকক্ষণ থেকে বসে' আছি। চারটে থেকে।"

"কেন?"

"পালিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে। আমাকে দেখতে এসেছিল

আজ একদল লোক। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে' আমার বিয়ে দেবে মনে করেছে ওরা। চলে' এসেছি তাই।"

আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল দিবসের সর্বাঙ্গ।

"বেশ করেছ। চারটে থেকে বসে' আছ? খেয়েছ কিছু?"

"না। খিদে নেই।"

দিবসের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

"খাবার আছে আমার। মোহন ঠাকুর দিয়ে যায় নি বুঝি এখনও? দেখি—"

"দিয়ে গেছে, ওই যে কোণে রেখে' দিয়েছি ঢাকা দিয়ে।"

"ওইটেই দু'জনে ভাগ করে' খাওয়া যাবে। ব্যাপারটা সব খুলে' বল দিকি। আমার কাছে এলে যে হঠাৎ? আমি কি করতে পারি?"

রঙ্গনা মুচকি হেসে বললে, "তা আপনি জানেন। বিপন্ন নারীকে উদ্ধার করতে আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন বলেছিলেন একদিন। সেই ভরসাতেই এসেছি।"

"বলেছিলাম নাকি?"

"বলেন নি? সেই যে হাওড়া স্টেশনে!"

দিবসের মনে পড়ল। কিন্তু সে একটু বিব্রত হ'ল। সত্যিই তো, কি করতে পারে সে এ অবস্থায়!

"আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে চাই না তা বলে'। আমাকে আশ্রয় দিতে বা সাহায্য করতে যদি না পারেন এখনই আমি চলে' যাচ্ছি।"

'না না, চলে' যাবে কেন? কি করে' তোমায় সাহায্য করতে পারি তাই ভাবছি। আচ্ছা, এস আগে খেয়ে তো নেওয়া যাক।"

"সত্যি খেতে ইচ্ছে নেই আমার একটুও। তার চেয়ে বরং শোওয়ার ব্যবস্থা করুন একটা। সৌদামিনীর ঘরে জায়গা হ'বে না একটু?"

"সৌদামিনীর ঘরে কেন ? এইখানেই শোও না। তুমি খাটে শোও, আমি মেঝেতে সতরঞ্চিটা পেতে শুচ্ছি। চেষ্টা করলে একটা খাটিয়া পাওয়া যাবে হয়তো। তার দরকার নেই।"

"এক ঘরে শোব বলছেন ? সেটা কি ভাল দেখাবে ?"

"তুমি যে এমনভাবে পালিয়ে এসেছ সেটাই কি ভাল দেখাচ্ছে ? কুসংস্কার যখন ভাঙবে ঠিক করেছ তখন ওসব নিয়ে আবার খুঁতখুঁত করছ কেন ? একসঙ্গে ঘরে শুলে সত্যিই তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায় না। আমাদের কারও মনে যখন কোনও পাপ নেই তখন লোকে কি বলবে এই ভেবে—"

"বেশ, বেশ তাই শোব, আপনাকে আর বক্তৃতা করতে হ'বে না।"

ছদ্ম কোপের ঝলকে অপরূপ হ'য়ে উঠল তার চোখ দুটি।

"সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

"হয়েছিল। সে-ই তো চাবি খুলে' দিয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে বললে। সৌদামিনী কিন্তু হাসপাতালে গেছে পটলিকে কালীঘাটের প্রসাদ দিতে। বলে' গেল আজ হয়তো ফিরবে না।"

"গিরি এসেছিল ?"

"না। সে-ও সেখানে যাবে।"

"ও, আচ্ছা বেশ। এস খাওয়া যাক তাহ'লে।"

"সত্যি বলছি খিদে নেই।"

"আমার আরও নেই। আমি একটা চায়ের দোকানে পেট ভরে' খেয়েছি একটু আগে। তুমিই বরং সবটা খাও।"

"কি যে এক জিদি লোক আপনি। বলছি খিদে নেই—"

খুব ভোরে রুদ্ধদ্বারে টোকা পড়ল।

দিবস ঘরের একপ্রান্তে মেঝেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, তার ঘুম ভাঙল না। রঞ্জনা কিন্তু উঠে বসল ধড়মড় করে'। সে দিবসের খাটেই শুয়েছিল। আর একবার টোকা পড়তেই সে উঠে গিয়ে কপাট

খুলে' দিলে। তাকে দেখেই কিরণ সবিস্ময়ে পিছিয়ে গেল একটু। রঙ্গনা বারান্দায় বেরিয়ে এল।

"আপনি এখানে ?"

সহসা এ প্রশ্নের উত্তরে রঙ্গনা কিছু বলতে পারল না। তার কানের পাশটা লাল হ'য়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল অপ্রতিভ হাসি।

"দিবস কোথা ?"

"ঘুমুচ্ছেন। ডেকে দেব কি ?"

"না থাক! পরে আসব এখন।"

কিরণ আর দাঁড়াল না, চলে' গেল। সে অপমানিত বোধ করছিল। তার মনে হচ্ছিল দিবস তাকে প্রতারণা করেছে। সমস্ত নারীজাতির প্রতি সে কেমন যেন বিরূপ হ'য়ে উঠল সহসা। সোজা চলে' গেল সূর্য চৌধুরার বাড়িতে। সূর্য চৌধুরীকে অবশ্য রঙ্গনার কথা বললে না কিছু। দিবসের ঠিকানাটা দিয়ে চলে' এল কেবল। হাঁটতে হাঁটতে কেবলি তার মনে হ'তে লাগল, ঠিকানাটা আরও আগে দিয়ে আসা উচিত ছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন সর্বস্বান্ত হ'য়ে গেছে। দিবসের চরিত্রে অবিশ্বাস করতে হ'বে একথা তো সে স্বপ্নেও ভাবে নি। দিবসের সঙ্গে কয়েকদিন দেখা হয় নি, তাকে ধরবে বলে' তাই খুব ভোরেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। কিন্তু এসে একি দেখলে সে! একসঙ্গে বাস করছে! কই উর্মি তো কিছু বলে নি। হঠাৎ মনে পড়ল উর্মি কাল তাকে সন্ধ্যার পর বাসায় থাকতে অনুরোধ করেছে। সেই ডিরেক্টারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে নাকি।

ঘাড় হেঁট করে' ভাবতে ভাবতে গলির পর গলি পার হ'তে লাগল কিরণ। দিবসের উপর বিশ্বাস হারিয়ে কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগল সে। নিজের অজ্ঞাতসারে দিবসের বলিষ্ঠ চরিত্রের উপর সে যেন অনেকখানি নির্ভর করেছিল। তার মনে হয়েছিল যে হতাশার অন্ধকারে সে পথ দেখতে পাচ্ছে না, দিবসের প্রাণবন্ত

চরিত্র টর্চের মতো সে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে' পথ আবিষ্কার করতে পারবে হয়তো। কিন্তু দিবস—।

কিরণ যখন দিবসের ঠিকানাটা সূর্য চৌধুরীকে দিয়ে গেল, তখন নিচের ঘরে তিনি একাই ছিলেন। ঠিকানাটা দিয়েই কিরণ চলে' গেল। সূর্য চৌধুরী চুপ করে' বসে' রইলেন খানিকক্ষণ। অন্য লোক হ'লে হৈ-চৈ করত কিন্তু তিনি নিঃশব্দে বসে' রইলেন। অকারণ হৈ-চৈ করা স্বভাব নয় তাঁর। ঘণ্টু উঠুক, তখন তাকে পাঠালেই হ'বে অসুখের খবরটা দিয়ে। ব্রজ বা গোবিন্দ সাণ্ডেল কাউকে কিছু বলবেন না ঠিক করলেন। উঠতে যাবেন এমন সময় হরলাল প্রবেশ করলেন এসে।

"দিবুবাবুর খবর পেলেন?"

"পেয়েছি।"

"যাক বাঁচা গেল।"

এর বেশী কিছু বলতে হরলাল আর সহসা করলেন না।

তারপর নিজের কথা পাড়লেন।

"আমি কি করব তাহ'লে বলুন। চুনীবাবু চিঠির যখন কোনও উত্তর দেন নি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলে কি লাভ হ'বে কিছু? আপনি যে সাক্ষী যোগাড় করতে বলেছিলেন তা আমি করেছি, কেসটা ফাইলই করে' দেবেন নাকি তাহ'লে?"

গোবিন্দ সাণ্ডেলও ঢুকলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

"আবার কোর্টে বেরুচ্ছ নাকি তুমি?"

"না। তুমি একটি কাজ কর দিকি ভাই। চুনীবাবু তো তোমার পরিচিত লোক বলছিলে। এঁর সঙ্গেই তাঁর মকদ্দমা হবার উপক্রম হয়েছে। এখনও টাকাটা দেন নি তিনি! ভদ্রলোক সত্যি যদি টাকাটা দিয়ে দিতে চান তাহ'লে আর মকদ্দমার হাঙ্গামা করতে হয়

না। তুমি একবার বলে' দেখ না তাঁকে। হরলালবাবুকে সঙ্গে নিয়েই যাও তুমি।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল-জাতীয় বেকার লোকদের স্বকীয় কোন কাজ থাকে না। তাঁরা ক্রমাগত বনের মোষ খুঁজে বেড়ান তাড়িয়ে সময়-ক্ষেপ করবার জন্য। দিবসের পুরাতন প্রসঙ্গটা নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন বলেই তিনি এসেছিলেন। এই নূতন ব্যাপারটিতে সংশ্লিষ্ট হ'তে পেরে' তিনি খুশী হ'লেন। হরলালবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "বেশ, চলুন তাহ'লে। আমার ধারণা চুনী আপনার টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখনও দেয় নি?"

"আজ্ঞে না। আমি চিঠি লিখেছিলাম, তার উত্তর পর্যন্ত দেয় নি।"

"কালটি যে কলি, সেটি খেয়াল আছে!"—চোখ নাচিয়ে হরলালের দিকে চাইলেন তিনি—"চলুন, দেরি করলে আবার সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে হয়তো।"

"চলুন।"

দু'জনে চলে' যাওয়াতে সূর্য চৌধুরী মনে মনে আরাম বোধ করলেন।

দিবসের সন্ধান পাওয়া গেছে শুনে' ঘণ্টু আনন্দিত হ'ল না। সে একটু বিস্মিত হ'ল, দমেও গেল। ইতিমধ্যে তার আকাশ-কুসুমে অনেক রঙ, অনেক সুষমা বিস্তার করেছিল। জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে তার দেখাও হয়েছিল আরও বার কয়েক। দিবস আর আসবে না এইটে ধরে' নিয়েই মনে মনে সে প্ল্যাসটিকের প্রকাণ্ড কারবার-কাব্য ফেঁদে বসেছিল। দিবসের সন্ধান পাওয়া গেছে এই খবরটাতে তার কাব্যে বেশ ছন্দ-পতন হ'ল। জটিল গাঙ্গুলীর উপদেশ মনে পড়ল তার। মামার টাকার উপরই যদি তাকে নির্ভর করতে হয়, তাহ'লে তার চেষ্টা করা উচিত দিবস যাতে আর না আসে। কিন্তু সে চেষ্টা যে কি করে' করবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। যাই হোক,

মামার আদেশে দুর্গা-নাম স্মরণ করে' সে বেরিয়ে পড়ল দিবসের উদ্দেশে। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবতে লাগল, দিবুদাকে এমন কি বলা যেতে পারে যাতে সে আসবে না। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল একটা।

দিবস আর রঙ্গনা চা খাচ্ছিল গরম সিঙাড়া-সহযোগে।

দিবস বলছিল—"তুমি যে পালিয়ে এসেছ, পালিয়ে আসতে পেরেছ, এতে আমি যে কত খুশী হয়েছি তা তোমাকে বলে' বোঝাতে পারব না। এই তো চাই। নাকে কাঁদলে পণ-প্রথা উঠবে না, কোনও কুপ্রথাই উঠবে না। তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হ'বে।"

"দাঁড়িয়েছি তো। এইবার কি করব বলুন?"

"কাজ কর। নিজের পায়ে দাঁড়াও এইবার।"

"থাকব কোথায়?"

"কেন, এইখানে।"

"আপনার সঙ্গে?"

"তাতে ক্ষতি কি! মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে অশুচি ধারণা আছে তা দূর করবার দায়িত্ব তো তোমাদেরই। সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও যে, যে-কোনও অবস্থায় আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার ক্ষমতা তোমাদের আছে।"

"তারপর?"

"একটা কাজ যোগাড় করে' রোজগার করতে লেগে' যাও।"

"কি কাজ?"

"যে-কোনও কাজ। সৌদামিনী একটা ঝি-গিরি যোগাড় করে' দিতে পারবে।"

"ও কাজ আমি পারব না।"

"পারবে না কেন ? সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ঘরে-ঘরে মেয়েরা ঝি-গিরিই তো করছে। তোমার যদি গরীবের ঘরে বিয়ে হয়, ঝি-গিরিই তো করতে হ'বে তোমাকেও। পারবে না কেন ?"

"না, আমি পারব না। অন্য কিছু ভাবুন একটা।"

মেয়েদের পক্ষে কি কি কাজ করা সম্ভব ভাবতে গিয়ে সৌরেন ডাক্তারের কথা মনে পড়ে' গেল দিবসের।

"হয়েছে"—সোৎসাহে বলে' উঠল দিবস।

"কি ?"

ঠিক এই সময়ে ঘণ্টু এসে হাজির হ'ল দ্বারপ্রান্তে।

"দিবুদা আছেন ?"

"আরে, ঘণ্টু যে, কি খবর ?"

ঘণ্টু আড়চোখে রঙ্গনার দিকে চেয়ে একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল। মনে মনে বলল—ও বাবা, এ কি কাণ্ড ! সারাটা পথ সে যে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এসেছিল, সেটা এখানে প্রকাশ করা সংগত হ'বে কিনা দ্বিধা জাগল তার মনে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হ'ল, 'না, এই তো ঠিক হয়েছে, এইখানেই ও সুর জমবে ভাল। দিবসের প্রতি তার শ্রদ্ধাটা হঠাৎ যেন হু-হু করে' কমে' গেল। মিথ্যা কথা বলে' দিবসকে ঠকাতে এসেছে এটাও আর তত অন্যায় বলে' মনে হ'ল না।

মৃদু হেসে ঘণ্টু বললে, "আপনাকে ডাকতে এসেছি।"

দিবস রঙ্গনা দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে গেল।

"কে ডাকছে ?"

"মামাবাবু।"

"কেন, কিছু বলেছেন ?"

ঘণ্টু কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে বলল, "আপনার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে এক জায়গায়"—বলেই আবার হাসলে সে।

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। মোটা পণ দেবে তারা। মেয়েটি কিন্তু ঘোর কালো।"

রঙ্গনার দিকে আড়চোখে চাইলে সে একবার। রঙ্গনার মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। দিবস চুপ করে' রইল। অপমানে তার মাথা নুয়ে পড়ছিল। তার বাবা—আর ভাবতে পারছিল না সে।

"বাবাকে বলে' দাও গিয়ে যে আমি যাব না।"

ঘণ্টু আবার একটু হেসে বললে,"তা আমি জানতাম। যাওয়া উচিতও নয়। তাহ'লে আপনি এক কলম লিখে দিন। না হ'লে মামাবাবু হয়তো ভাববেন যে আমি খবর দিই নি আপনাকে। বেশী কিছু নয়— ঘণ্টুর মুখে সব শুনলাম, আমি যাব না, আমাকে ক্ষমা করবেন। ব্যস।"

দিবস উঠে গিয়ে খস্ খস্ করে' ঐ কথাগুলোই লিখে দিলে একটা কাগজে। কাগজটা নিয়ে ঘণ্টু বেরিয়ে গেল। ঘণ্টু চলে' যাবার পর একটা নিবিড় নীরবতা ঘনিয়ে এল ঘরটার মধ্যে। চুপ করে' বসে' রইল দু'জনে।

"আমাদের কিন্তু এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, আপনার বাবা হয়তো এসে পড়বেন এখনই"—রঙ্গনাই কথা কইলে প্রথমে।

"পড়লেনই বা। আমরা এমন কোনও অন্যায় কাজ করি নি যার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হ'বে।"

"তিনি এসে যদি জোর করে' ধরে' নিয়ে যান?"

"তা তিনি পারবেন না।"

রঙ্গনা চুপ করে' রইল।

"আমি এখন কি করি বলুন তো? কি যে একটা বলছিলেন—"

"নার্স হ'তে পারবে? তাহ'লে সৌরেনের ক্লিনিকে ঢুকিয়ে দিতে পারি তোমাকে। যক্ষ্মা রুগীর সেবা করতে হ'বে।"

"আমার বড্ড ভয় করে ওসব রোগকে।"

"বাসন মাজতে পারবে না, নার্স হ'তে পারবে না, কি পারবে তাহ'লে!"

ধমক খেয়ে অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল রঙ্গনা। তার অপ্রতিভ মুখ অসহায় চোখের দৃষ্টি নীরব আর্ত ভাষায় যেন বলে' উঠল—বোকো না, অমন করে' বোকো না, সত্যিই বড় দুর্বল, বড় অসহায় আমি। রঙ্গনার মুখের দিকে চেয়ে দিবসের কেমন যেন কষ্ট হ'তে লাগল। অবর্ণনীয় একটা কষ্ট। তার মনে হ'তে লাগল, ক্ষতবিক্ষত বাণবিদ্ধ একটা পাখিকে ধমক দিয়ে সে যেন আকাশের মহিমা বোঝাতে চাইছে। আকাশের মহিমা ও জানে, কিন্তু ওর পক্ষ যে অবশ। ও উড়তে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

"কোনও স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হ'তে পারি। আপনার জানাশোনা যদি কেউ থাকে—"

"মনে তো পড়ছে না। আচ্ছা দেখি ভেবে। সৌরেনের ক্লিনিকে কিন্তু ঢুকলে পারতে। সে লোক খুব ভাল। পঁচাত্তর টাকা করে' মাইনেও দেবে। যক্ষ্মাকে এত ভয় কেন? যক্ষ্মার বীজাণু তো সকলেরই ভিতর আছে ডাক্তাররা বলে।"

"তাই নাকি?"

"বলে তো। না-ও যদি থাকত তাহ'লেই বা ভয় কি? মরতে তো হ'বেই একদিন। আর্তের সেবা করতে গিয়ে যদি মরেই যাও, তাতেই বা কি। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম শুনেছ? নফর কুণ্ডুর? তুমি যে ওদের দলে যেতে ভয় পাবে এ আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

রঙ্গনা হেসে বললে, "আপনাদের কল্পনা কল্পনা-বিলাস। যা কল্পনা করে' সুখ পান তাই কল্পনা করেন। আমাদের সুখ-দুঃখের কথা সত্যি যদি ভাবতেন, ওরকম উদ্ভট কল্পনা করতেন না।"

অপ্রত্যাশিত আঘাতটা পেয়ে দিবস একটু বিস্মিত হ'ল। রঙ্গনার যে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তার পরিচয় আগেও পেয়েছিল সে। আহত হ'য়েই তার সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছিল তার। এখন রঙ্গনার কথাটা শুনে' তার মনে হ'ল তাই

কি? নিজের কল্পনাকে পুলকিত করবার জন্যেই কি সে তাকে মারাত্মক যক্ষ্মারোগের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে? ওর শুভাশুভের চেয়ে নিজের আত্মবিনোদনটাই কি বড় হ'য়ে উঠেছে নাকি! রঙ্গনা একটা মহৎ আদর্শের জন্যে যদি নিজেকে বলি দেয় তাতে সত্যিই তার আত্মবিনোদন হ'বে নাকি? হ'বে। কেন হ'বে ভাবতে গিয়েই কিন্তু সব গোলমাল হ'য়ে গেল এবং গোলমাল হ'য়ে গেল বলেই এর পর যা সে বলল তা এলোমেলো-গোছের শোনাল।

"আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে তোমার সুখ-দুঃখটা কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তাই নিজে আমি যা করে' সুখ পেতাম, তোমার জন্যেও তাই ব্যবস্থা করছি। হয়তো সেটা ভুল—"

যে কথাটা জানবার জন্যে রঙ্গনার অন্তরাত্মা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ছিল, তার আভাস পেয়ে রঙ্গনার মুখের চেহারা বদলে গেল।

"বেশ বেশ, তাই হ'বে। সৌরেনবাবুর কাছেই চলুন। তিনি যদি নার্সের চাকরিটা দেন তাই করব।"

অপূর্ব হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তার মুখ।

"উঠুন। বসে' আছেন যে!"

"সত্যি যেতে চাও, না রাগ করে' বলছ?"

"সত্যিই যেতে চাই। কি মনে করেন আপনি আমাকে? ঠাট্টা করে' একটা কথা বললুম আর অমনি সেটা সত্যি বলে' ধরে' নিলেন! চলুন, যাওয়া যাক।"

"চল। আমাকে বাজারেও ঘুরতে হ'বে একটু। কাপড়-চোপড় কিনতে হ'বে কিছু।"

"এখন কাপড়-চোপড় কিনবেন?"

"হ্যাঁ। ও, একটা কথা তোমাকে বলি নি এখন। দু'একদিনের মধ্যেই আমি লম্বা পাড়ি দিচ্ছি।"

"কোথায়?"

"লণ্ডন।"

রঞ্জনার মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে গেল আবার।

"লণ্ডন? মানে?"

"চল, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। প্রায় আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো।"

দু'জনে বেরিয়ে পড়ল।

সূর্য চৌধুরীর মুখটা ঠিক পাথরের মুখের মতো মনে হচ্ছিল। দিবসের চিঠিটার দিকে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ঘণ্টু। চিঠি থেকে চোখ তুলে' ঘণ্টুর দিকে চাইলেন তিনি আবার।

"আমার অসুখের কথা বলেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আবার চিঠির দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"ঘরে যে মেয়েটি বসেছিল কত বয়স হ'বে তার?"

"আঠার-উনিশ।"

ঘণ্টু স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আবার একটু বললে, "মনে হ'ল একসঙ্গে বাস করছে ওরা।"

"আচ্ছা, তুমি যাও।"

ঘণ্টু চলে' গেল। নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলেন সূর্য চৌধুরী। দিবু না আসতে পারে—কিন্তু ওই মেয়েটি কে? হয়তো পাড়ার কেউ। আজকালকার মেয়েরা তো—। সোরগোল করতে করতে গোবিন্দ সাণ্ডেল এসে ঢুকলেন।

"ওহে শুনছ, চুনীর মুখে যা শুনলাম তাতো ভয়ানক!"

"কি?"

"চুনীর ভাগ্নীটিকে নিয়ে দিবস নাকি সরেছে।"

"কি রকম?"

"চুনীর ভগ্নীপতির কাছে দিবস সরোদ শিখতে যেত—"

সমস্ত ঘটনাটা সাড়ম্বরে বর্ণনা করতে লাগলেন সাণ্ডেলমশাই।

সূর্য চৌধুরী নিস্তব্ধ হ'য়ে শুনে' গেলেন সব। গোবিন্দ সাণ্ডেলের সমস্ত শ্লেষ সহ্য করলেন নীরবে। একটি কথাও বললেন না। বক্তব্য শেষ করে' নানারকম উপদেশ দিয়ে, গীতার বচন আউড়ে সাণ্ডেল-মশাই চলে' গেলেন অবশেষে। সূর্যকান্ত ধীরে ধীরে উঠে বাইরে এলেন। ড্রাইভারকে বললেন মোটরটা বার করতে। নিজের চোখে না দেখলে এ অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাস করবেন না তিনি।— দিবসের বাসায় এসে কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। দিবস তখনও বাজার থেকে ফেরে নি! খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে' সূর্য চৌধুরী আবার বাড়ি ফিরে এলেন।

ঊর্মির আগ্রহে মেট্রোতে আসতে হয়েছিল কিরণকে। সেই-খানেই সিনেমা ডিরেক্টারের সঙ্গে কিরণের আলাপ হ'ল। সিনেমাও দেখতে হ'ল।

সিনেমার পর ঊর্মি বললে, "চলুন, মাঠে গিয়ে বসা যাক একটু।"

কিরণ যন্ত্রচালিতবৎ ঊর্মির অনুসরণ করছিল। ঊর্মির মুখে রঞ্জনার অন্তর্ধানের কথা শুনে' (এবং সকালে রঞ্জনাকে দিবসের বাসায় দেখে') তার সমস্ত সত্তা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল। ঊর্মির সংসর্গে নিজের অনুরূপ অধঃপতনের আশঙ্কায় তার অন্তরাত্মা সজাগ হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু কিছুতেই সে নিজেকে ঊর্মির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না।

একটু নির্জন স্থান দেখে' ঊর্মি বললে, "আসুন, এইখানে বসা যাক।"

"বাড়ি ফিরলে হ'ত না?"

"বসুনই না একটু!"

কিরণ বসে' পড়ল।

উর্মি বললে, "সেই যে সেদিন আপনাকে বলছিলাম হাতীবাগানে ছোট্ট বাসার সন্ধান পেয়েছি একটা, কাল চলুন সেটা দেখে' আসা যাক, আশি টাকা ভাড়া চাইছে, তা আমাদের দু'জনের আয় মিলিয়ে দিতে পারব না? এই ছবিটা যতদিন চলবে ততদিন আমি একাই চালাতে পারব সমস্ত, আপনার মাইনেটা জমিয়ে রাখা যাবে, কি বলেন? চমৎকার বাসাটি, দক্ষিণ দিক খোলা, সদর রাস্তা থেকে দূরেও আছে, বেশী গোলমাল নেই, আপনার কবিতা লেখার সুবিধে হবে"—উর্মি থামতে চাইছিল না কিছুতে, তার ভয় হচ্ছিল থামলেই কিরণ প্রতিবাদ করবে, তা কিছুতেই হ'তে দেবে না উর্মি, কিরণকে তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সে, ওই এঁদো গলিতে খোলার ঘরে কিছুতেই সে থাকতে দেবে না কিরণকে —"আপনার যদি পছন্দ না'হয়, আর একটা বাড়িও দেখে' রেখেছি আমি বেহালা অঞ্চলে, বড্ড দূর হ'বে সেটা কিন্তু, নয়?"

কিরণ চুপ করে' বসেছিল।

"কথা বলছেন না যে?"

"একটা কবিতা ভাবছি।"

"কবিতা পরে ভাববেন, আগে আমার কথার উত্তর দিন। কাল সকালে হাতীবাগানের বাসাটা দেখবেন তো?"

"কবিতাটা শোন আগে"

"বলুন।"

"যে ফুল ফোটে নি কভু স্বপ্নে তারে চাও
যে গান গাহে নি কেহ স্বপ্নে তাহা গাও
কল্পনার কুঙ্কুমে
বাস্তবের ধূলি ধূমে
কেন সখি বৃথাই লুটাও

আকাশ-কুসুম দল
আকাশেই সমুজ্জ্বল
আকাশ-মর্যাদা তারে দাও।"

"এর মানে কি—"

"আমি উঠলুম।"

হঠাৎ আত্মস্থ হ'য়ে কিরণ উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পেল সে।

"হাতীবাগানের বাসাটা দেখবেন না কাল?"

"না।"

"কবে দেখবেন?"

"আমার দেখবার দরকার কি? তুমি থাকবে, তুমিই দেখ।"

"একসঙ্গেই থাকি চলুন না দু'জনে।"

"তা হয় না। সবাই দিবস নয়। আমি চলি।"

কিরণ চলতে শুরু করল। এর পর ঊর্মির চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে' যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হাস্যোদীপ্ত হয়ে' উঠল।

"কিরণদা, একটা কথা শুনে' যান।"

কিরণ ফিরে দেখলে একটা অদ্ভুত হাসিতে ঊর্মির সমস্ত মুখ ঝলমল করছে।

"আপনি দিবস নন তা জানি বলেই আপনার সঙ্গে থাকতে চাচ্ছি। অন্যরকম মনে করলে চাইতাম না। আপনি আমাকে এত খেলো মনে করলেন কেন বলুন তো?"

কিরণ ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ঘুরে' চলতে শুরু করে' দিলে। ঊর্মি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কিরণ চলে' যাচ্ছে। ক্রমশ ভিড়ে মিলিয়ে গেল সে। আর তাকে দেখা গেল না।

পনের

যদিও সূর্যকান্ত কিছু বলেন নি, তবু ব্রজ টের পেয়ে গেল যে দিবসের ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। ঘন্টুই বলেছিল তাকে। ঘন্টুর উদ্দেশ্য ছিল ব্রজর কাছে দিবসের কুকীর্তি ঘোষণা করে' ব্রজকে নিজের দলে টানা। কিন্তু হ'য়ে গেল অন্যরকম। ব্রজর মনে হ'ল দিবসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে একটা। সূর্যকান্তর সঙ্গে এ সম্বন্ধে হেস্তনেস্ত করবার জন্যে হনহন করে' দোতালায় উঠে গেল সে। কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। ঘরের ভিতরে গোবিন্দ সাণ্ডেল এবং সূর্যকান্ত দিবসের বিষয়েই কি বলছে যেন। ব্রজ আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

গোবিন্দ সাণ্ডেল বলছিলেন—"আমি যা বলছি তাই করে' দেখ না। ওকে খবর দাও যে অবিলম্বে না ফিরে এলে বিষয়-সম্পত্তি সব ঘন্টুকে দিয়ে দেব।"

"উইল করেছি আমি একটা।"

"ওই খবরটি এবার পাঠাও তার কাছে।"

"বেশ, ঘন্টুকে আবার পাঠাই তাহ'লে!"

ব্রজ ঘরে ঢুকল নাটকীয়ভাবে।

"এবার ঘন্টু যাবে না, আমি যাব।"

ব্রজ গিয়ে পৌঁছবার আগেই রঞ্জনা চলে' গিয়েছিল অতসী ক্লিনিকে। দিবস একটা সুটকেসে জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল।

"দিবু, দিবু, ও দিবু, দিবু"—ডাক শুনে' দিবস চমকে উঠল।

"কে, ব্রজদা!"

ব্রজ এসেই দিবসকে জাপটে ধরে' কাঁদতে শুরু করে' দিলে। কান্নার বেগ একটু থামতে বললে, "ছি, ছি, ছি, এ কোথায় আছিস তুই! তুই মানুষ না পাষাণ! অসুখে পড়ে' তোর বাপ তোকে ডাকতে পাঠালে, তুই কোন্ আক্কেলে গেলি না? এই তুই লেখা-পড়া শিখেছিস?"

"বাবার অসুখ নাকি! কিছু জানি না তো?"

"ঘণ্টু আসে নি?"

"এসেছিল। কিন্তু সে অসুখের কথা কিছু বলে নি তো। সে বরং বললে তোমরা নাকি পণের লোভে এক কুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছ!"

"আজই ঝাঁটা-পেটা করে' বিদেয় করব ছোঁড়াকে। কালসাপ একটা। গোড়াতেই বুঝেছিলাম।"

দিবস বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইল।

"বাজে কথা নাকি সব? মিথ্যা কথা বানিয়ে বললে এসে?"

"তোর নামেও অনেক মিথ্যা কথা বানিয়ে বলেছে। তুই নাকি একটা মেয়ের সঙ্গে বাস করছিস?"

"বাস করছি!"

"এইসব বলেছে গিয়ে। বিষয়টি হাতাবার চেষ্টায় আছে। আর একমুহূর্ত দেরি করলে চলবে না, এখুনি যেতে হ'বে। চল্, দাঁড়িয়ে রইলি যে!"

দিবস স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল।

তারপর বললে—"আচ্ছা চল।"

একটা ট্যাক্সি করেই এল তারা।

নেমেই দেখা হ'ল নিস্তারিণীর সঙ্গে।

"ঘণ্টু কোথা?" ব্রজ জিগ্যেস করলে।

"বেরিয়ে গেলেন একটু আগে।"

দিবস ট্যাক্সিটাকে অপেক্ষা করতে বলে' উপরে উঠে গেল।

গোবিন্দ সাণ্ডেল তখনও বসেছিলেন। দিবস বাবাকে প্রণাম করে' গোবিন্দ সাণ্ডেলকেও প্রণাম করলে।

"আপনার অসুখের কথা ঘন্টু আমাকে বলে নি কাল। কি হয়েছে আপনার ?"

"ব্লাড-প্রেসারটা বেড়েছে একটু। তেমন কিছু নয়—"

একটু থেমে' গোবিন্দ সাণ্ডেলের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে সূর্য চৌধুরী তারপর বললেন, "একটা কথা জিগ্যেস করবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। সেদিন তোমার সঙ্গে আলোচনা করে' যা বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে আমার বিষয়-সম্পত্তি তুমি চাও না। তুমি নিজের পায়েই দাঁড়াতে চাও। বেশ ভাল কথা। কিন্তু আমাকে আমার বিষয়-সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে' যেতে হ'বে। কখন কি হয় বলা তো যায় না। আমি ঠিক করেছি ঘন্টুকেই সব দিয়ে যাব। সেইরকম উইলও করেছি একটা। আমার ইচ্ছে তুমি তাতে সাক্ষী হও। সই করে' দাও এতে।"

পাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে উইলটা বার করে' কোন্ জায়গায় সই করতে হ'বে দেখিয়ে দিলেন। দিবসের পকেটে ফাউণ্টেন পেন ছিল, বিনা দ্বিধায় সে সই করে' দিলে।

সূর্যকান্তের সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। গোবিন্দ সাণ্ডেলের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি।

সই করা হ'য়ে গেলে সূর্য চৌধুরী প্রশ্ন করলেন—"আর একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই তোমাকে। তুমি কি বিয়ে করেছ কাউকে ?"

"না।"

"ঘন্টু বললে সে তোমার ঘরে একটি মেয়েকে দেখে' এসেছে।"

"হ্যাঁ, তখন একটি মেয়ে ছিল বটে। আমি যে ওস্তাদের কাছে সরোদ শিখি তাঁরই মেয়ে। ওঁরা মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক জায়গায় বিয়ের ঠিক করছিলেন, পাত্রপক্ষরা দেখতে এসেছিল, সেই সময় মেয়েটি আমার বাসায় পালিয়ে এসেছিল খানিকক্ষণের জন্য।"

"ও।"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের দিকে আর একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সূর্য চৌধুরী। দিবসের একবার মনে হ'ল বিলেত যাওয়ার খবরটা দেবে কি না। কিন্তু তখনই ঠিক করে' ফেললে, দেবে না। কি হ'বে দিয়ে? উইলটায় সই করবার পর সে নিজেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন মনে করছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করছিল যেন নাটকীয় কিছু করে' না ফেলে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে সূক্ষ্ম অভিমানটাকে সে কিছুতে দাবাতে পারছিল না সেটা যেন প্রকাশ না হ'য়ে পড়ে।

"আচ্ছা, আমি চললুম তাহ'লে!"

প্রণাম করে' সে নেমে এল এবং ট্যাক্সিতে চড়ে' বসল।

ব্রজ নেমেই চলে' গিয়েছিল খাবারের দোকানে। দিবসের প্রিয় খাবারগুলি নিয়ে এসে নিস্তারিণীকে এক ধমক দিলে সে—"আরে, তোকে বলে' গেলাম যে কাচের প্লেটগুলো বার করতে। কি করছিস এতক্ষণ ধরে'?"

"দিবুবাবু তো চলে' গেলেন, কার লেগে' বার করব!"

"চলে গেলেন!"

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল ব্রজ। খাবারের ঝুড়িটা মেঝেতে নামিয়ে দোতলায় যখন সে গেল তখন সূর্য চৌধুরী উইলটা কুচি কুচি করে' ছিঁড়ছেন এবং আনতচক্ষু সাণ্ডেলের দিকে চেয়ে বলছেন—"দেখলে তো? তোমাকে আগেই বলেছিলাম আজকালকার ভাল ছেলেদের তুমি চেন না—"

"দিবু চলে' গেল?"—ব্রজ এসেই প্রশ্ন করলে রুক্ষকণ্ঠে!

"হ্যাঁ।"

"ধরে' রাখতে পারলে না তাকে?"

"না থাকলে কি করব বল!"

"আমি ফের যাচ্ছি সেখানে।"

ব্রজ যে ফের আসতে পারে এ আশঙ্কা দিবসেরও হয়েছিল। সে

তাই বাসায় এসে তার জিনিসপত্র সব ট্যাক্সিতে তুলে' সোজা চলে' গেল অতসী ক্লিনিকে। সৌদামিনী, গিরি, রঞ্জনা সকলেই সেখানে আছে। সেইখান থেকেই সে প্লেন ধরবে ঠিক করলে।

ষোল

পরদিন হরিদাসবাবুর মনে হ'ল যাত্রার প্রাক্কালে দিবসকে একটা ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল দিবসের ঠিকানাটা তো তিনি জানেন না। দিবস তাকে যে হ্যাণ্ডনোটটা লিখে দিয়েছিল, সেটা খুলে' দেখলেন, তাতে তার বাড়ির ঠিকানাটা দেওয়া রয়েছে। কেয়ার অফ সূর্যকান্ত চৌধুরী যখন লেখা আছে তখন ওটা বাড়ির ঠিকানাই। ও ঠিকানায় কি দিবস আছে? থাকবার কথা নয়, তবু একবার চেষ্টা করা উচিত।

সূর্য চৌধুরী নিচের ঘরেই বসেছিলেন। হরিদাসবাবু এসে প্রবেশ করলেন।

"দিবসবাবুর কি এই বাড়ি?"

"হ্যাঁ। দিবস কিন্তু বাড়িতে নেই। কি দরকার আপনার?"

"আজকের প্লেনে তাঁর বম্বে যাবার কথা, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বম্বে থেকে তিনি বিলেত যাবেন।"

ইচ্ছে করেই খবরটা দিলেন হরিদাসবাবু। তাঁর মনে হ'ল খবরটা পেলে অকারণ দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবেন ভদ্রলোক। সূর্য চৌধুরী যে দিবসের বাবা তা চেহারা থেকেই অনুমান করেছিলেন তিনি।

"বিলেত যাবে? আজকের প্লেনে বম্বে যাচ্ছে?"

আকাশ থেকে পড়লেন সূর্য চৌধুরী।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ঠিক জানেন আপনি?"

"ঠিক জানি।"

ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে সূর্যকান্ত বললেন, "ক'টায় প্লেন ছাড়বে জানেন?"

"তা ঠিক জানি না। এরোড্রোমে গিয়ে সে খবরটা নিতে হয়।"

"চলুন, তাই যাওয়া যাক।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হ'লেন গোবিন্দ সাণ্ডেল গহনচাঁদকে সঙ্গে দিয়ে।

সাণ্ডেলমশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ইনিই দিবসের ওস্তাদ। এঁর কাছেই দিবস সরোদ শিখত। সব কথা ওঁকে বলেছি আমি।"

"দিবু এই প্লেনেই বিলেত যাচ্ছে নাকি। চল তার সঙ্গে দেখাটা করে' আসি। ক'টায় ছাড়ছে তাও তো জানি না। আচ্ছা চল তো, কোথাও থেকে ফোন করে' জেনে নিলেই হ'বে। আমার ফোনটা খারাপ হ'য়ে গেছে, তা না হ'লে এখান থেকেই ফোন করা যেত।"

দেখা কিন্তু হ'ল না।

অনেক ঘোরাঘুরির পর সূর্যকান্তর মোটর যখন এরোড্রোমে পৌঁছল ঠিক তার একটু আগেই দিবসের প্লেনটা উড়েছে। অপস্রিয়মান প্লেনটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আবার পুত্রগর্বে তাঁর বুকটা ভরে' উঠল।

স্থাবর

বনফুল

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলি ১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯
তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা—১৩

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাত টাকা

উৎসর্গ

অধ্যাপক শ্রী[illegible] বসু

বন্ধুবরেষু,—

ভাগলপুর,

১৯-৪-৫১

ভূমিকা

মানবজাতির যে কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হইয়া আছে, তাহার সম্পূর্ণ রূপ এখনও অজ্ঞাত। যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহারই প্রাথমিক পর্ব লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইল। স্থান কাল পাত্রের যে সীমাবদ্ধতা সাধারণ উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করে, এক্ষেত্রে তাহা নাই। কারণ যিনি এই উপন্যাসের বক্তা, বিশেষ কোন স্থান, কাল বা পাত্রে তিনি আবদ্ধ নহেন। যুগ যুগান্তরে বহু খণ্ডজীবনের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন। তাঁহারই স্মৃতি-কথা এই উপন্যাস।

এ আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু ইতিহাসে এ কল্পনার সমর্থন আছে। সন্ধানী পাঠক-পাঠিকারা বর্তমানের অতি-আধুনিক প্রগতিশীল সভ্যসমাজেও হয়তো এ কল্পনার বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করিবেন। বক্তাও মাঝে মাঝে সে ইঙ্গিত দিয়াছেন।

মানবজাতির ইতিহাস বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় বহু বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। সেই সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সময়ই আমার এই ধরণের একটি আখ্যায়িকা লিখিবার ইচ্ছা হয়। সেই সব পুস্তক হইতেই আমি আমার কল্পনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। কোথা হইতে কোন উপকরণ পাইয়াছি তাহা এখন ঠিক মনে নাই। সমগ্রভাবে তাহাদের ঋণ স্বীকার করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু মহাশয়গণ এ বিষয়ে বহু পুস্তক সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

লেখক

১

সুদূর অতীতের নিবিড় অন্ধকার হইতে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতেছি। আমি অমর আত্মা, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আকাশে-বাতাসে, সমুদ্রে-নদীতে, অরণ্যে-পর্বতে, মরুভূমির ঊষরতায়, শস্যক্ষেত্রের শ্যাম-শোভায় অহরহ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছি। আমি মরি নাই। তোমাদের ধর্মে-কর্মে সংস্কৃতিতে, কাব্যে শাস্ত্রে পুরাণে, চিন্তা-ধারার বৈচিত্র্যে, রক্তধারার অণু-পরমাণুতে আজও আমি স্পন্দিত হইতেছি। কবরভূমি খনন করিয়া আমাকে অনুসন্ধান করিও না, আত্মানুসন্ধান কর, তোমার মধ্যেই আমাকে পাইবে। তোমার মধ্যেই আজও আমি ওতপ্রোত হইয়া আছি। তাহাই আমার বৈশিষ্ট্য এবং সেইখানেই আমার জয়। আমি মরিয়াও মরি নাই। আমার আদিতম রূপ কি ছিল তাহা আমি জানি না। আমি ছিলাম, আছি এবং থাকিব—এইটুকুই শুধু নিঃসংশয়ে জানি। কিন্তু কাহিনী বলিতে হইলে একটা আরম্ভ থাকা চাই। সুতরাং একস্থান হইতে আরম্ভ করি।...

প্রভাত হইয়াছে। অদূরে পর্বতশিখরে, নবোদিত সূর্যের কিরণজালে, অসংখ্য বন্য-কুসুমে, সদ্যজাগ্রত বিহঙ্গকুলের কাকলীতে যে অপরূপ মহিমার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহা আমার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। সেদিন আমি অতিশয় বিষণ্ণচিত্তে সু-উচ্চ একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আছি। দলপতি তাড়াইয়া দিয়াছে; পলায়ন করিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছি। ধরিতে পারিলে মারিয়া ফেলিত। লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি। বসিয়া বসিয়া তাহার মূর্তিটাই ভাবিতেছিলাম। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া ভ্রূ, ছোট ছোট চক্ষু দুইটি যেন জলন্ত অঙ্গারখণ্ড, হিংস্রতায় জ্বলিতেছে। মুখ বুক কালো কর্কশ লোমে পরিপূর্ণ। আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহু। চলিবার সময় সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া চলে। আমিও নদীর জলে ঝুঁকিয়া একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, আমার চেহারাও ঠিক উহার মতো। নীচের চোয়ালটা ঠিক তেমনি সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, বিরাট থ্যাবড়া নাকটায় ঠিক তেমনি দুইটা বিরাট গর্ত। বেশ মনে পড়িতেছে ক্ষুব্ধ হই নাই, মুগ্ধও হই নাই, বিস্মিত হইয়াছিলাম। প্রথমে মনে হইয়াছিল জলের তলায় একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝি বসিয়া আছে। মনে হইবামাত্র রাগ হইয়াছিল, মুখ ভ্যাংচাইয়াছিলাম। সে-ও ঠিক তেমনিভাবে মুখ ভ্যাংচাইল। ক্রোধে অন্ধ

হইয়া জলে লাফাইয়া পড়িলাম...প্রতিচ্ছবি কোথায় মিলাইয়া গেল। ভুল ভাঙিল আমার সঙ্গিনীর সহায়তায়। যে সঙ্গিনীর জন্য আমার এত লাঞ্ছনা, সেই সঙ্গিনীকে লইয়া একদিন নদীতীরে গিয়াছিলাম। সহসা তাহার প্রতিচ্ছবিও নদীতরঙ্গে প্রতিফলিত দেখিলাম। উভয়ে নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া সেদিন উপলব্ধি করিয়াছিলাম আমাদেরই কায়ার ছায়া নদীর জলে পড়িয়াছে। সবিস্ময়ে সেদিন দুজনে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। তখন আমরা কিশোর-কিশোরী।

...ওই সঙ্গিনীই শেষে আমার কাল হইল। আমাদের উভয়েরই বয়স ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। শরীরের শিরা-উপশিরায় যৌবনের উন্মাদনা জাগিল। আজও তোমরা যে লুব্ধ-দৃষ্টিতে যুবতী নারীর প্রস্ফুটিত যৌবনের দিকে চাহিয়া থাক, সেই লুব্ধ-দৃষ্টিতে আমিও তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তখন দেহের বা মনের কোন আবরণ ছিল না। নগ্ন দেহের প্রতি রোমকূপে নগ্ন কামনা উদগ্র হইয়া থাকিত। সহসা সকলের সমক্ষেই একদিন তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ন প্রস্তরফলক আসিয়া পৃষ্ঠে বিঁধিল এবং পরমুহূর্তেই দলপতি আসিয়া আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আঁচড়াইয়া খামচাইয়া কামড়াইয়া হয়তো আমাকে মারিয়াই ফেলিত, যদি না আমি রণে ভঙ্গ দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতাম। রণে ভঙ্গ দিয়াও নিরাপদ হই নাই, অজস্র পাথর ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বহু দূর পর্যন্ত সে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। প্রাণপণে ছুটিয়া তাহার এলাকা পার হইয়া এই গভীর অরণ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। তিন্তিড়ী বৃক্ষের উচ্চ ডালে আরোহণ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই। একপাল হায়েনা কাছে দূরে ক্রমাগত চীৎকার করিয়াছে। একটা অস্ফুট আর্তনাদও যেন সমস্ত বনে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছে। সর্বাঙ্গে নিদারুণ বেদনা। পৃষ্ঠের ক্ষতটা টন-টন করিতেছে। প্রভাতের মহিমায় মুগ্ধ হইতে পারিতেছি না। যে পরিবেশের মধ্যে এতকাল ছিলাম, সেখানে আর ফিরিবার উপায় নাই। ওই দলপতিই আমার পিতা কি না, তাহা জানি না। যে রমণীটিকে মা বলিয়া জানিতাম, বাল্যকালেই তাঁহাকে চোখের সম্মুখে নিহত হইতে দেখিয়াছি একটা দুর্দান্ত বন্য-বরাহের তীক্ষ্ন দন্তাঘাতে। নিমেষের মধ্যে পেটটা চিরিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নাড়ীভুঁড়িগুলা বাহির হইয়া পড়িল। সে বীভৎস দৃশ্য অনেকদিন আমার রাত্রির নিদ্রা হরণ করিয়াছে। বস্তুত সেই আমার জীবনে প্রথম বিভীষিকা। সেদিন হইতে বন্যবরাহকে সামান্য জন্তু বলিয়া ভাবিতে পারি না, মনে হয় স্বয়ং মৃত্যু। সামান্য পশুর কি এত শক্তি থাকিতে পারে? আর একটা ছবিও মনে আঁকা আছে।...অন্ধকার রাত্রি, আগুনের চারিধারে আমরা সকলে বসিয়া আছি। আগুনটা নিবিয়া আসিয়াছে। ঘুম ধরিতেছিল, চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলাম। একটা প্রচন্ড গর্জনে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম...যে যেখানে পারিল পলাইল, আমিও ছুটিয়া

একটা ঝোপের ভিতর লুকাইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ সেখানে লুকাইয়া রহিলাম। তাহার পর একটা হাওয়া উঠিল, খুব জোর হাওয়া, নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিকুন্ডটা জ্বলিয়া উঠিল। তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, শূন্যে যেন দুইটি গোল অঙ্গারখন্ড ধক-ধক করিয়া জ্বলিতেছে। প্রকান্ড একটা কালো মুন্ডে ভয়ঙ্কর দুইটা চোখ! জ্বলন্ত অগ্নিশিখাটার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইয়া আছে। পরমুহূর্তেই আবার ঘাড় ফিরাইয়া লইল, হাড়-ভাঙার কড়মড় শব্দ শোনা গেল। সামনের দুই থাবায় চাপিয়া কি যেন খাইতেছে। মুখটা আর একবার তুলিয়া হিংস্র দৃষ্টিতে আগুনের শিখাটার দিকে চাহিয়া সমস্ত দন্তগুলি বাহির করিল...কান দুইটা পিছনের দিকে চলিয়া গেল...খ্যা খ্যা জাতীয় একটা চাপা রুষ্ট গর্জন করিয়া আবার আহারে মন দিল। বাঘ একটা। তাহার জ্বলন্ত চক্ষু, লেলিহান জিহ্বা, রক্তাক্ত দংষ্ট্রা সেই স্বল্পালোকে মুহূর্তের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর চিত্র আমার অন্তরতম চেতনায় আঁকিয়া দিল, তাহার মূল রূপটি আজও অপরিবর্তিত আছে। সে চিত্র বাঘের নয়। তাহা হিংস্র দেবতার নিষ্ঠুর পিশাচের, নিরপরাধ নিরীহ জীবকে যে অতর্কিতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, তাহার। যুগে যুগে সে রূপ বদলাইয়াছে সত্য, কিন্তু লুপ্ত হয় নাই। তাহার নবতম মূর্তি তোমাদের অ্যাটম বম। পরদিন দেখা গেল, আমাদের দলের একজন নাই। তাহার জন্য কেহ শোক করিল না। শুধু তাই নয়, তাহার কয়েকদিন পরে আমাদের দলপতি আর একটি ছেলেকে দলছাড়া করিল। তাহার কোন অপরাধ ছিল না। একমাত্র অপরাধ সে প্রাপ্তবয়স্ক, দলপতির সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাই তখন নিয়ম ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর নিজে চরিয়া খাইতে হইবে, নিজের শক্তিতে নিজের বিচরণভূমি আবিষ্কার করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হইবে, নিজের সঙ্গিনী সন্ধান করিয়া নিজের সংসার পাতিতে হইবে।

...অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া বসিয়া আছি, প্রভাতের মহিমায় মুগ্ধ হইতে পারিতেছি না। কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে। লাল পিঁপড়েরাও জ্বালাতন করিতে-ছিল। গাছটায় অসংখ্য লাল পিঁপড়ে। কয়েকটা খাইয়া দেখিলাম—টক টক মন্দ নয়। কিন্তু ইহাতে পেট ভরিবে না, ইহাদের নিঃশেষও করা যাইবে না। সুতরাং গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম। ঝোপের আড়ালে আড়ালে সাবধানে উঁকি-ঝুঁকি দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে যুগে মানুষ নির্ভয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারিত না। অনেক শত্রু ছিল। বাঘ, সিংহ, গন্ডার, বন্যমহিষ, বন্যবরাহ কখন কে কোন্ দিক হইতে অতর্কিতে আসিয়া পড়িবে, সেই ভয়ে সর্বদা সাবধানে থাকিতে হইত। মানুষ তখনও নিজের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা করিতে পারে নাই, তখনও তাহাকে লুকাইয়া লুকাইয়া কোন-ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। বাঘ সিংহ গন্ডারেরাই তখন রাজত্ব করিতেছিল। অনেক সময় তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াই দিন কাটাইতে

হইত। একবার মনে আছে, ভীষণ একটা গর্জন শুনিয়া সকলে নিকটবর্তী গাছে চড়িয়া পড়িলাম। তখন গাছই আমাদের আশ্রয় ছিল। দলপতি গাছের ডাল ফাঁক করিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল, আমরাও তাহাই করিতে লাগিলাম। গর্জনটা কিসের এবং আমরা নিরাপদ কি না, তাহা না জানা পর্যন্ত কাহারও স্বস্তি নাই। সহসা বুঝিলাম আনন্দজনক কিছু একটা ঘটিতেছে। আমরাও অনুরূপ শব্দ করিয়া দলপতিকে সমর্থন করিলাম। পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে শুধু গর্জন নয়, তুমুল একটা আলোড়নও একবার চাহিল। যে মেয়েটি তাহার মাথার উকুন বাছিতেছিল, সেও সচকিত একবার চাহিল। যে মেয়েটি তাহার মাথায় উকুন বাছিতেছিল, সেও সচকিত হইল—কিম্বা হইবার ভান করিল—দলের মধ্যে সে-ই দলপতির প্রিয়তমা। দলপতি সন্তর্পণে গাছ হইতে নামিল। আমরাও নামিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু দলপতি দাঁত খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসিতে আমরা নিরস্ত হইলাম। সে একাই নামিয়া গেল। একটু পরে যখন ফিরিয়া আসিয়া বসিল, তখন তাহার মুখ গম্ভীর। চতুর্দিকে অন্ধকার...পরিস্থিতি অনিশ্চিত...আমরা আর টুঁ শব্দটি করিলাম না। সমস্ত রাত্রি দলপতি কেমন যেন উস-খুস করিতে লাগিল। রাত্রিতে কিন্তু সে আর গাছ হইতে নামিবার সাহস করিল না। পরদিন সকালে উঠিয়াই নামিয়া গেল এবং বনের ভিতর হইতে অর্ধ-ভুক্ত মহিষ টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। সম্ভবত কোনও বাঘ কিংবা সিংহ মহিষটাকে বধ করিয়াছিল, সবটা খইয়া শেষ করিতে পারে নাই। দলপতি সেটাকে টানিয়া আনিয়া বহুদূরে লইয়া গেল, আমরাও তাহার অনুসরণ করিলাম। একটা নিরাপদ স্থানে গিয়া যতটা পারা গেল, তখনই সকলে মিলিয়া খাওয়া গেল। অবশিষ্ট যেটুকু রহিল, সেটুকু দলপতি একটি খাদের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া আসিল। মহিষের পচা মাংস খাইয়া আমাদের বেশ কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছিল মনে পড়িতেছে।

...এদিক ওদিক ঘুরিয়া একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম, যেখানে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা জুজুমের এলাকা। জুজুমকে বহুদিন পূর্বে বহুদূর হইতে দেখিয়াছিলাম। ভীষণ-দর্শন। সে যুগে কেহই মহাত্মা ছিল না, সুতরাং প্রকৃতিও যে তাহার হিংস্র, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। একবার যদি নাগালের মধ্যে পায় আস্ত রাখিবে না। তখন সদ্ভাব দূরে থাক প্রতিবেশী বলিয়াই কিছু ছিল না। একজন দলপতির সহিত আর একজনের ক্বচিৎ দেখা হইত। প্রত্যেকে নিজের নিজের এলাকায় নিজের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী লইয়া বিচরণ করিত এবং সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না। এদিক ওদিক চাহিয়া আর একটি বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। অবিলম্বে সহজলভ্য কিছু খাদ্যের সন্ধান করিতে হইবে। মাটি খুঁড়িয়া কেঁচো কিম্বা কন্দ সংগ্রহ করিবার উৎসাহ ছিল না। বিনা পরিশ্রমে কিম্বা অল্প পরিশ্রমে যদি খানিকটা মাংস বা ফল পাওয়া যায় বড় ভাল হয়।

গাছে উঠিয়া কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবার পর দেখিতে পাইলাম, অদূরে একটা গাছের ডালে প্রকান্ড একটা মৌচাক রহিয়াছে। কিছুদূরে একটা নদীও বহিয়া গিয়াছে। তাহার নীরে অথবা তীরে কিছু খাদ্য পাওয়া অসম্ভব নয়। ডান দিকে প্রকান্ড একটা জলাভূমিও দেখা যাইতেছে, সেখানে আর কিছু না থাক, শামুক গুগলি নিশ্চয়ই আছে। সম্মুখে প্রকান্ড একটা ঝোপ থাকাতে সবটা দেখা যাইতেছে না, হয়তো আরও কিছু আছে। মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিতে হইলে আগুন দরকার। ধোঁয়া না দিলে মৌমাছি-গুলা পলাইবে না। চকমকি পাথর খুঁজিয়া শুষ্ক ডাল-পাতা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইতে বেশ কিছু সময় লাগিবে। নদীর তীরেই আপাতত কিছু খোঁজ করা যাক।

গাছ হইতে নামিলাম। ঝোপের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইতেছি, দেখি একটা হরিণ তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। কাছেই একটা বেশ বড় পাথর পড়িয়াছিল, ত্বরিৎহস্তে সেটা তুলিয়া লইলাম। যদি কপালের মাঝ-খানে কিম্বা পায়ে মারিতে পারি, নির্ঘাত পড়িয়া যাইবে এবং তাহা হইলে কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। পাথরটা তুলিয়া মারিতে গিয়া কিন্তু মারা হইল না, ত্রস্ত হইয়া ঝোপের ভিতর আত্মগোপন করিতে হইল। স্বয়ং জুজুম হরিণটার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে! ক্ষণপরেই হরিণটা আমার পাশ দিয়া সবেগে চলিয়া গেল, দেখিলাম তাহার পিঠে একটা পাথরের তীর গাঁথা। আমার মাথার উপর দিয়া কয়েকটা প্রস্তরফলক সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়া গেল। তাহার পরমুহূর্তেই কেবল জুজুম নয় আরও দুইজন গেল বুঝিতে পারিলাম। আমি একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া ছিলাম। সন্তর্পণে ডালপালা ফাঁক করিয়া দেখিলাম—যাহা দেখিলাম, তাহা আজও ভুলি নাই।

...হরিণটা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। জুজুম তাহার পেটের উপর বসিয়া তীক্ষ্ন প্রস্তর-ছুরিকা দিয়া তাহার হৃৎপিন্ডটা বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। তাহার ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া আছে দুইটি স্ত্রীলোক, একজন প্রৌঢ়া আর একজন যুবতী। সম্ভবত মা আর মেয়ে। জুজুম হরিণের বুক হইতে ছুরিটা খুলিয়া লইতেই ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি হরিণটার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার ক্ষতস্থান চুষিয়া রক্ত পান করিতে লাগিল। জুজুম অবশ্য তাহাকে বেশিক্ষণ এ সুযোগ দিল না; এক ঝটকায় সরাইয়া দিয়া নিজেই পান করিতে লাগিল। মেয়েটা ভ্রূভঙ্গী সহকারে ক্ষণ-কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত দন্তপাতি বিকশিত করিয়া মায়ের দিকে একবার চাহিল। তাহার সে মূর্তি আজও ভুলি নাই। প্রভাতের স্বর্ণকিরণে শ্যামল প্রকৃতি উদ্ভাসিত, অদূরে শৈলশিখরে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা, এই পটভূমিকায় সেদিন নগ্না কৃষ্ণাঙ্গী ইহাকে দেখিয়াছিলাম—পীনোন্নত-পয়োধারা, নিবিড়

নিতম্বিনী, বিস্রস্ত কুন্তলা—তীক্ষ্ম দন্তে পুষ্ট অধরে উষ্ণ মৃগরক্ত লাগিয়া আছে।

...একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তখন কাহারও কোন নাম ছিল না। তোমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য তোমাদের কল্পনা অনুযায়ী নামকরণ করিতেছি। তখন আমরা সকলেই ছিলাম নাম-গোত্রহীন। নামের বা গোত্রের প্রয়োজন ছিল না। ইহাকে দেখিয়া যে ক্ষুধা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাই তখন জীবনের প্রধান প্রেরণা ছিল, তাহারই তাড়নায় যাহা করিতাম, তাহাই ছিল তখনকার দিনে প্রধান প্রয়োজন, অন্য কিছু চিন্তা করারও প্রয়োজন অনুভব করিতাম না। আমি তাহাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম, সে-ও আমাকে দেখিলে চিনিবে। ডাকিবার প্রয়োজন ছিল না। ডাকিলে তো আসিবে না, সবলে অধিকার করিতে হইবে। যে ভাষায় এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহাও তোমাদের ভাষা। কারণ এ ভাষায় না বলিলে তোমরা বুঝিবে না। সেকালে আমাদের যে ভাষা ছিল, তাহা ইঙ্গিতের চাহনির ভঙ্গীর—তাহা লিপিবদ্ধ করা যায় না।

...অনেকক্ষণ ইকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। যাহাকে বাহুপাশে বাঁধিতে গিয়া কিছুক্ষণ পূর্বে বিতাড়িত হইয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি আমার উন্মুখ বাসনাকে ম্লান করিল না। তাহার মধ্যে যাহার অনবদ্য প্রকাশ আমাকে আকুল করিয়াছিল, ইকার মধ্যেও তাহাই দেখিতেছিলাম। মানুষ নয়, দেহ নয়, যৌবন।

জুজুম হরিণটাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। ইকা এবং সেই প্রৌঢ়াও তাহার পিছু পিছু চলিল। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম, কখনও বুকে হাঁটিয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও ঝোপের আড়ালে। একটু আগেই খাদ্যের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। উগ্রতর ক্ষুধার তাড়নায় সে কথা ভুলিয়া গেলাম। ইকা কোথায় থাকে, তাহা আবিষ্কার করাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম বলিয়া মনে হইল। কণ্টকে কঙ্করে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সরীসৃপের মতো ইকার অনুসরণ করিতেছিলাম। একটু পরেই কলরব শোনা গেল। হর্ষধ্বনি। জুজুমের পরিবারবর্গ—নানা বয়সের কতকগুলি নারী এবং শিশু ছুটিয়া আসিয়া জুজুমকে সম্বর্ধনা করিল। ঝোপের আড়াল হইতে সন্তর্পণে ঘাড়টা তুলিয়া জুজুমের আস্তানা দেখিলাম। তখন আমরা কুড়েঘরও প্রস্তুত করিতে শিখি নাই। ডালপালা ঘেরিয়া একটা স্থান চিহ্নিত করা থাকিত একটা বড় গাছ, তাহাতেই বিপদের সময় আশ্রয় লইতে হইত। মানুষের গৃহের কোনও প্রয়োজনও ছিল না তখন। তাহার নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু প্রায় প্রত্যহই আহরণ করিতে হইত। সঞ্চয় করিবার মতো উদ্বৃত্ত প্রায়ই থাকিত না। একটি জিনিস কেবল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইত—পাথরের নুড়ি। পাথরের নুড়ি একস্থানে স্তূপীকৃত থাকিলেই বোঝা যাইত যে কাছেপিঠে

মানুষ আছে। গৃহের আর একটা প্রয়োজন অন্তরাল সৃষ্টি করা। তখন সে প্রয়োজনও মানুষের ছিল না। তখন আমরা উলঙ্গ ছিলাম। যাহা করিবার তাহা প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত আকাশের নীচেই করিতাম। লজ্জা বলিয়া কিছু ছিল না, শ্লীলতার জটিলতা কল্পনাই করিতে পারিতাম না। প্রত্যেক দলে একটিমাত্র সমর্থ পুরুষ থাকিত। বালক যৌবনে পদার্পণ করিলেই নিহত কিম্বা বিতাড়িত হইত। আমি যেমন হইয়াছিলাম।

...জুজুম শিকার লইয়া বেড়ার অন্তরালে অদৃশ্য হইল। আমি উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিলাম। ইকাকে আর দেখা গেল না। আহারের সন্ধানে ধীরে ধীরে জলাটার দিকেই অবশেষে অগ্রসর হইলাম। জঠরের তাড়নায় বেশিক্ষণ উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। সদ্য-নিহত হরিণের রক্তাক্ত স্মৃতিটা রসনাকে লালায়িত করিতেছিল, কিন্তু নিরুপায় হইয়া লোভ সম্বরণ করিতে হইল।

জলাশয়ের ধারে কিছু খাদ্য জুটিল। প্রচুর ব্যাং ছিল। শামুকও ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা মাছও পাইয়া গেলাম। মাছটা আকাশ হইতে পড়িল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম, প্রকান্ড একটা মাছরাঙ্গা পাখী এবং উৎক্রোশ দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত। সম্ভবত মাছরাঙ্গাটার মুখ হইতেই মাছটা খসিয়া পড়িয়াছে। তীরবর্তী গাছের ডালে ডালে নানা জাতীয় মৎস্যভুক পাখীর সমাবেশ দেখিয়া অনুমান করিলাম, জলাশয়ে প্রচুর মাছ আছে। বড় আনন্দ হইল, আহারের বেশ সংস্থান আছে। পরক্ষণেই কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল। ইহা যে জুজুমের এলাকা। যে কয়দিন এখানে থাকিতে হইবে, চুরি করিয়া লুকাইয়া থাকিতে হইবে। ধরা পড়িলে জীবনসংশয়। কিন্তু উপায় নাই, থাকিতেই হইবে। সুতরাং যথাসম্ভব সাবধানে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছু শুষ্ক ডালপালা এবং কয়েকটা ভাল পাথর সংগ্রহ করিতে হইবে। যে মৌচাকটা দেখিয়াছি, তাহার নীচে আগুন জ্বালাইয়া মধু ও মৌমাছির বাচ্চাগুলি অবিলম্বে সংগ্রহ করা দরকার। ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাথর সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। সে যুগে পাথরই ছিল আমাদের অস্ত্র। শুধু অস্ত্র নয়, জীবন ধারণের প্রধান সহায়। পাথর ছুঁড়িয়া শিকার করিতাম, পাথরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতাম, পাথরের মধ্যেই আমরা অগ্নিকে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। নানা শত্রুপরিবেষ্টিত সেই যুগে অসহায় মানুষের পাথরই ছিল পরম সহায়। পরবর্তী যুগে পাথরই তাই আমাদের দেবতা হইয়াছিল। সমস্ত দিন ঘুরিয়া অনেক পাথর সংগ্রহ করিলাম। ছোট বড় মাঝারি, গোল লম্বা নানা আকারের। সেই সময়ই লক্ষ্য করিলাম কোথায় কোন্ কন্দ আছে, কোন্ কোন্ গাছের ডালে, পাতায় বা ফাটলে গুটিপোকা পাওয়া যায়, কোন্ গর্তটি মুষিকের, কোন্‌টি শশকের, কোন্‌টি সজারুর। একটা গাছে দেখিলাম, অজস্র কুল ধরিয়া আছে। কতদিন এখানে থাকিতে হইবে ঠিক নাই, খাদ্যের যত সন্ধান জানা থাকে, ততই ভাল। অস্ত্র কিছু

সংগ্রহ হইয়াছে, খাদ্যেরও সন্ধান কিছু পাওয়া গেল, এইবার একটা আশ্রয় চাই। অর্থাৎ একটা বৃক্ষ নির্বাচন করিতে হইবে। সে যুগে গাছই আমাদের গৃহ ছিল, দুর্গ ছিল। গাছ আমাদের ফল দিত, ছায়া দিত। পাথরের মতো ইহারও মধ্যে তাই আমরা দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

গাছের অভাব ছিল না। প্রকাণ্ড একটা গাছ বাছিয়া ঠিক করিলাম। উঠিয়া দেখিলাম বেশ মনোমত—শাখাপত্রবহুল। উপরের দিকে কাণ্ডের ভিতর একটা গর্তও ছিল। পাথরের নুড়িগুলি তুলিয়া তুলিয়া সেখানে রাখিলাম। পাশাপাশি দুই-তিনটা ডাল বাহির হইয়াছে, আরও কয়েকটি ডাল ভাঙিয়া সেখানে সাজাইয়া দিলাম, বেশ একটি মাচার মতো হইল। গাছের মূল কাণ্ডে ঠেস দিয়া বেশ ঘুমানো যাইবে। আহার এবং নিদ্রার ব্যবস্থা হইল, এইবার একটি সঙ্গিনী চাই। সঙ্গিনী পাইলেই মনোমত একটা স্থান বাছিয়া নিজের গৃহস্থালি স্থাপন করিতে পারিব। ওই দূরে পাহাড়ের ওপারে নিশ্চয়ই অনেক অনধিকৃত স্থান পড়িয়া আছে। দূর পর্বতশ্রেণীর দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইকার মূর্তিটা মনশ্চক্ষে বারম্বার মূর্ত হইয়া উঠিতেছিল। ইকাকে কি উপায়ে পাওয়া যায় আকুল অন্তঃকরণে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে এটুকু নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলাম যে, নিছক বলপ্রয়োগ করিয়া কাজ হইবে না। জুজুম স্বেচ্ছায় আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না। শুধু জুজুম কেন কেহই করিবে না। সে যুগে এ জাতীয় কল্পনাও কেহ করিত না। আমার কল্পনাতেও তাহা আসে নাই। আমি কেবল ইকাকে সমস্ত অন্তর দিয়া কামনা করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম কি উপায়ে তাহাকে পাওয়া যায়। পাইতেই হইবে। পাইবই...একটা অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট আত্ম-বিশ্বাস যেন অলক্ষিতে আমাকে আশ্বাস দিতেছিল। বলে আমি পারিব না, ছল অথবা কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ ছল এবং কি কৌশল? কখন কিরূপে কার্যকরী হইবে? কল্পনা করিতে না পারিলেও মনের অন্ধ প্রেরণা আমাকে উপদেশ দিল—কোন না কোন উপায় হইবেই একটা। আপাতত আত্মগোপন করিয়া ইকার গতিবিধি লক্ষ্য করাই প্রথম কর্তব্য, তাহাই ভাল করিয়া কর।

সূর্য অস্ত গিয়াছে, অন্ধকার নামিতে লাগিল। অন্ধকার কিন্তু গাঢ় হইল না। পূর্ব দিগন্তে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। নিবিড় অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী নিস্তব্ধতা নিশাচর পতঙ্গদের গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিল। আমি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মাচার উপর উপবেশন করিলাম। ঠেস দিয়া বসিয়া আরামে চক্ষু মুদিলাম। মুদিত নয়নের সম্মুখে ইকার মূর্তি ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত উপত্যকা অদ্ভুত নিবিড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চতুর্দিকে অশ্রান্ত ঝিল্লীরব। অরণ্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি। মধ্যে মধ্যে শুষ্ক পত্র-

পল্লবের খড়-খড় শব্দ। সরীসৃপ শ্বাপদের দল বাহির হইয়াছে। মট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, শুষ্ক ডাল ভাঙ্গার শব্দ। শব্দ শুনিয়া মনে হইল ডালটা নেহাত পাতলা নয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে জন্তুর পদ-ভরে ইহা ভাঙ্গিল সে জন্তুটিও নিশ্চয় হালকা নয়। উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ কোন শব্দ নাই। নিশ্চয় নিঃশব্দ সঞ্চরণে অগ্রসর হইতেছে। পরমুহূর্তেই গন্ধ পাইলাম এবং তাহার পরই সেই ভয়ানক পরিচিত ঘরর ঘরর শব্দ। মুদিতনেত্রে রুদ্ধশ্বাসে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। আর একটু দূরে মট করিয়া আবার শব্দ হইল। বাঘটা দূরে চলিয়া গেল।

...কতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিলাম মনে নাই, হঠাৎ কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন ইকা আমার হইয়াছে, যেন পিছন দিক হইতে আমার কাঁধের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া সাগ্রহে আমার মাথার উকুন বাছিতেছে। একটা বাহু যেন আমার গলায় জড়ানো। নিটোল বাহুর নিবিড় বন্ধন...মনে হইল তাহা ক্রমশ নিবিড়তর হইতেছে...জোরে, জোরে, আরও জোরে চাপিয়া ধরিতেছে...শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল—ইকা এ কি করিতেছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুহূর্ত-মধ্যে শিহরিয়া উপলব্ধি করিলাম ইকার বাহু নয় একটা ময়াল সাপ আমার গলায় পাক লাগাইয়াছে। প্রবল শক্তিতে পাকটা একটু আলগা করিয়া সাপের দেহের সেই অংশটুকু মুখের কাছে আনিয়া প্রাণপণে কামড়াইয়া ধরিলাম। আমার শাণিত শ্বাদন্ত কর্ কর্ করিয়া তাহার মাংসে বসিয়া গেল। খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া তুলিয়া লইলাম। আবার কামড়াইলাম। এইবার অনুভব করিলাম গলার ফাঁস কিছুটা আলগা হইয়াছে, মাংসপেশী ক্রমশ শিথিল হইতেছে। চকিতে ফাঁসটা গলা হইতে খুলিয়া অন্য ডালে সরিয়া গেলাম। তাহার পর একটা বড় পাথর বৃক্ষকোটর হইতে বাহির করিয়া সাপের মাথাটা খুঁজিতে লাগিলাম। সাপটা বুঝিয়াছিল যে, আততায়ী নিরীহ প্রাণী নয়, মানুষ। পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, মাথাটা নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। আমি কিন্তু ছাড়িলাম না। সবলে তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বহুবার ব্যর্থ-মনোরথ হইবার পর অবশেষে গাছের কাণ্ডের উপর মাথাটা রাখিয়া প্রস্তরাঘাতে তাহা বিচূর্ণিত করিলাম। তাহার পর দূরের একটা মোটা ডালে সেটাকে জড়াইয়া রাখিয়া দিলাম। সকালে কাজে লাগিবে। আবার অপ্রত্যাশিতভাবে খানিকটা মাংস জুটিয়া গেল। সে যুগে এরূপ অপ্রত্যাশিত আহার প্রায়ই জুটিত। তখনই হয়তো আহারটা শেষ করিতাম কিন্তু ক্ষুধা ছিল না। আবার নিজের মাচাটির উপর গিয়া কাণ্ডে ঠেস দিয়া বসিলাম। বিঘ্নিত নিদ্রাটা যেন পাশের ডালেই অপেক্ষা করিতেছিল, চক্ষু বুজিবামাত্র চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল।

...কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না, হঠাৎ একটা চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে, চতুর্দিকে আলো। আবার

চীৎকার হইল—তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকার—মনে হইল বায়ুস্তর যেন চিরিয়া গেল। দেখি সাপটা ডালে নাই। ঝুঁকিয়া দেখিলাম একদল ময়ূর সেটাকে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া ছেঁড়া ছেঁড়ি করিয়া খাইতেছে। সাপটা সম্পূর্ণ মরে নাই, তখনও তাহার দেহের পেশীতে পেশীতে কুঞ্চন-প্রসারণের তরঙ্গ উঠিতেছে। একদল ময়ূর তীক্ষ্ণ নখচঞ্চুঘাতে তাহার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে, তবু মরে নাই। শুধু ময়ূর নয় একদল কাকও ঝাঁক বাঁধিয়া অদূরে বসিয়াছিল, কিন্তু ময়ূরের প্রতাপে কাছে ঘেঁষিতে পারিতেছিল না। অগ্রসর হইবার সামান্য চেষ্টা করিলেই তীক্ষ্ণ কেকাকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতেছিল। সেই প্রভাত আলোকে সেই আরণ্য পটভূমিকায় সেই বিচিত্রপক্ষ হিংস্র ময়ূরগণের তেজোদৃপ্ত গ্রীবাভঙ্গী দেখিয়া একবারও মনে হইতেছিল না যে আর সকলের মতো বুভুক্ষার তাড়নায় ইহারা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—কি যে, মনে হইতেছিল তাহাও বর্ণনা করিতে পারিব না। এইটুকু শুধু মনে আছে স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়াছিলাম। সহসা চোখে পড়িল পাশের একটা ঝোপে একটা শৃগালও মুখ বাড়াইয়া ধৈর্যভরে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে—সে-ও কাছে আসিতে সাহস করিতেছে না। মুহূর্তমধ্যে কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইল, নিজের সম্পত্তি-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম। বৃক্ষ-কোটরে প্রস্তর সংগ্রহ করাই ছিল, শাখার অন্তরাল হইতে তাহাই ক্রমাগত ছুঁড়িতে লাগিলাম। ময়ূর, কাক, শৃগাল সকলকেই অবশেষে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। বৃক্ষ হইতে নামিয়া ভুক্তাবশিষ্ট সাপটাকে টানিয়া জঙ্গলের ভিতরে লইয়া গেলাম এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া খাইতে শুরু করিয়া দিলাম। সাপটা খুব বড় ছিল না, দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। ময়ূরের দল অনেকটা মাংস খাইয়া ফেলিয়াছিল, আমার জন্য খুব বেশি অব-শিষ্ট ছিল না। ক্ষুধা মিটিল না বরং আরও উগ্র হইয়া উঠিল। মনে পড়িল আগের দিন একটা মৌচাক দেখিয়াছিলাম, সেটাকে আত্মসাৎ করিলে মন্দ হয় না। প্রকাণ্ড একটা গাছের উঁচু ডালে মৌচাকটা আছে। ভাবিলাম প্রথমে দেখিয়া আসা যাক, তাহার পর শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিয়া পাথরে পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইব, ধোঁয়া না দিলে মৌমাছিরা পালায় না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হইল ধোঁয়া করিলে তো জুজুম জানিতে পারিবে। কথাটা মনে হইবামাত্র আপাদ-মস্তক একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। জুজুম জানিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, আমাকে তাড়াইয়া তবে সে ছাড়িবে। ইকার মূর্তিটা আবার মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, শরীরে সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিল, শিরা-উপশিরায় উন্মাদ রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র দিয়া যাহা বহিতে লাগিল তাহা নিঃশ্বাস নয়, আগুনের হলকা। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ বাহুযুগল আকাশের দিকে তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যাইব না, যেমন করিয়া পারি ইকাকে অধিকার করিব। সেই নির্জন বনে উত্তোলিত-

বাহ্য অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম বলিতে পারি না, একটা বন্যপাখীর তীব্র চীৎকারে চমক ভাঙিগল। আত্মস্থ হইলাম। ধীরে ধীরে আবার সেই মৌচাকটার ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। জিহ্বা লালায়িত হইল। বিপদ আছে জানিয়াও আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। বনের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটা দুর্নিবার ক্ষুধা যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। একটু পরে সেই বৃক্ষ-তলে উপস্থিত হইলাম। লোলুপ দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা কিন্তু হতাশাজনক। মানবদস্যুকে ফাঁকি দিয়া মৌমাছিরা মধু খাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। পড়িয়া আছে শুধু শূন্য চাকটা।...ক্ষুব্ধ-চিত্তে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সহসা এক ঝাঁক মৌমাছির ভনভন শব্দ শুনিতে পাইলাম, ছুটিয়া একটা ঘন ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলাম। বাল্যকালে একবার মৌমাছির কামড় খাইয়াছিলাম, সে নিদারুণ যন্ত্রণার কথা আজও ভুলি নাই। ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করিলাম বটে, কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলাম না। মৌমাছিদের এই অতর্কিত আবির্ভাবের কারণ নির্ণয় না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। প্রতিটি জিনিসের কারণ নির্ণয় না করা পর্যন্ত আজও তাহার শান্তি নাই। ঐ মৌচাকটার মৌমাছিগুলাই কি মধুপান করিয়া আনন্দে মাতিয়া বেড়াইতেছে, না এ আর একটা দল? এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কারণটা হঠাৎ চোখে পড়িল। কাছেই একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ, তাহার উচ্চডালে উঠিয়া একটা প্রকাণ্ড ভালুক আর একটা মৌচাক আক্রমণ করিয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গে সহস্র মৌমাছি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু লোমশ ভালুকের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। নির্বিকারচিত্তে দস্যুটা লুণ্ঠন করিতেছে।...স্থানটা নিরাপদ মনে হইল না। হামাগুড়ি দিয়া ঝোপ হইতে বাহির হইয়া গেলাম। সেই জলাটার দিকেই গেলাম, কিছু খাদ্য সেখানে পাইবই। জলাশয়ের তীরবর্তী হইতে বেশ একটু সময় লাগিল, পথ-ঘাট তখনও অপরিচিত। তাছাড়া ঝোপের ভিতর গা-ঢাকা দিয়া চলিতে হইতেছিল, ফাঁকা জায়গায় বাহির হইবার সাহস ছিল না। জুজুম যদি দেখিয়া ফেলে! অসংখ্য বন্য-শত্রুরও অভাব নাই। অনাবৃত স্থানে আত্মপ্রকাশ করা নিরাপদ ছিল না সেকালে। মাঝে মাঝে হাঁসের ডাক শুনিতে পাইতেছিলাম, তাহাই অনুসরণ করিয়া অবশেষে জলার ধারে গিয়া পৌঁছিলাম। ঝোপের ভিতর হইতে সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম কাছে-পিঠে কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। সে রকম কিছু চোখে পড়িল না, দেখিলাম অজস্র পদ্ম ফুটিয়া আছে, অসংখ্য হাঁস ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া কয়েকটা শামুক সংগ্রহ করিয়া হাতের কাছে যে পদ্মগুলি ছিল তুলিয়া ফেলিলাম। পদ্মের ভিতরের চাকগুলি অতিশয় সুখাদ্য। মোটামুটি ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। জলাটার ধারে ধারেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছু কাছিমের ডিমও পাইয়া গেলাম

একস্থানে। এক জায়গায় কিছু কন্দও চোখে পড়িল। কিন্তু তখন আর খাইবার প্রবৃত্তি ছিল না, স্থানটা চিহ্নিত করিয়া রাখিলাম ভবিষ্যতের জন্য। তাহার পর পাথর সংগ্রহে মন দিলাম। নানা আকৃতির কয়েকটি পাথর কুড়াইবার পর মনে হইল শুধু পাথর সংগ্রহ করিলেই তো চলিবে না, ওগুলিকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে পরিণত করিতে হইবে, অর্থাৎ পাথর ঘষিবার একটা স্থানও চাই। কয়েকটা তীক্ষ্ণ তীর যদি করিতে পারি, তাহা হইলে আর ভাবনা কি। সম্মুখ-যুদ্ধে জুজুমকে আহ্বান করিবার সহস যদি না-ও হয় গাছের আড়াল হইতে তার শির লক্ষ্য করিয়া একটা তীর নিশ্চয়ই ছুঁড়িতে পারিব এবং তীরটা যদি ঠিক লক্ষ্যভেদ করে জুজুমকে আর উঠিতে হইবে না। একবার পড়িয়া গেলে ছুটিয়া গিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িব, কামড়াইয়া ধরিব। উত্তেজনায় শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিল। সংগৃহীত পাথরগুলিকে একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম...পাথর ঘষিবার স্থান একটা অবিষ্কার করিতেই হইবে। স্থানটা নিরাপদ এবং নির্জন হওয়া চাই, জুজুম যেন না জানিতে পারে। দূরে আকাশের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল, সহসা মনে হইল ওইখানেই আছে। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই পাইব। অবিলম্বে পর্বত-শীর্ষ লক্ষ্য করিয়া গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। কখনও হাঁটিয়া কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও গাছে চড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কতক্ষণ কাটিয়াছিল বলিতে পারি না, বিকট একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে সচকিত হইয়া উঠিলাম। শুধু চীৎকার নয়, সমস্ত বন যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। আমি মাটিতে ছিলাম, তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে শরীরের রক্তস্রোত ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল। একদল হাতী ; পর্বতাকার একটা দাঁতল হাতী মদমত্ত হইয়া জনৈকা হস্তিনীকে প্রণয় নিবেদন করিতেছে। তাই এই আলোড়ন। গাছের উচ্চ-ডালে আরোহণ করিয়া দেখিলাম বৃহৎ, নাতি-বৃহৎ, ক্ষুদ্র অনেকগুলি হাতী রহিয়াছে। অধিকাংশই হস্তিনী। কাছাকাছি থাকা আর নিরাপদ মনে হইল না। গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম, হাতীর দলকে দক্ষিণে রাখিয়া অন্য পথে পুনরায় অগ্রসর হইলাম। যত শীঘ্র সম্ভব এ অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইবে। মত্ত-মাতঙ্গ বড় ভয়ানক জিনিস। হাতীর দলের সহিত দূরত্ব রক্ষা করিতে গিয়া কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুবিধা হইয়া গেল। বনের যে অংশে আসিয়া পড়িলাম তাহা কম জটিল, একটা পথের আভাসও যেন পাওয়া গেল। কেন জানি না হস্তীযূথের প্রতি মনটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। উহাদের দর্শনের ফলেই যেন অরণ্যের জটিলতা কমিয়া গেল এই ধরণের একটা ধারণা অজ্ঞাতসারে, মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিল। দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলাম। অরণ্য শেষ হইয়া গেল, একটা প্রান্তরে আসিয়া পেঁৗছিলাম। দেখিলাম প্রান্তরের ঠিক ওপারেই পাহাড়ের শ্রেণী। বন হইতে বাহির হইয়াই

প্রথমে অবশ্য যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা প্রান্তরও নয়, পাহাড়ও নয়, একদল শকুনি। আর একটু আগাইয়া দেখিলাম একটা মৃত-জন্তুকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। দেখিয়া খুশি হইলাম। কাছাকাছি তাহা হইলে কোনও মানুষ নাই, থাকিলে ওই মৃত-জন্তুটা শকুনিদের ভোগে লাগিত না, মানুষই সেটাকে টানিয়া লইয়া খাইত। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলাম, চারিদিকে অনেক পাথর পড়িয়া আছে। অবিলম্বে কয়েকটা পাথর তুলিয়া শকুনিদের তাড়া করিলাম। তাহারা একেবারে উড়িয়া গেল না, লাফাইয়া লাফাইয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল-মাত্র। কাছে গিয়া দেখিলাম একটা মৃত শৃগাল। শৃগালটাকে টানিয়া লইয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। শকুনির দলও লাফাইয়া লাফাইয়া কিছুদূর পর্যন্ত আমার অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিল, আমিও পাথর ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া তাহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত তাহারা পারিল না, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। আমি শৃগালটাকে টানিয়া লইয়া অবশেষে পর্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হস্তী-দর্শনের ফল সত্যই শুভ হইয়াছিল। কাছেই একটা ঝরণা দেখিতে পাইলাম। পাহাড় হইতে স্বচ্ছ জলের ধারা নামিয়া একটি ছোট নদী সৃষ্টি করিয়াছে। দুই তীরে অসংখ্য পাথরের নুড়ি। ইতস্তত নিরীক্ষণ করিবার পর পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখিতে পাইলাম। ভয় হইল। গুহামাত্রেই তখন ভীতিপ্রদ ছিল। গুহার অন্তরালে সে যুগে স্বয়ং মৃত্যু লুকাইয়া থাকিত। সিংহ ব্যাঘ্র হায়েনা আরও কত কি। এই মৃত শৃগালটা হয়তো কোনও বাঘেরই মুখের গ্রাস। গুহাটাকে পশ্চাতে রাখিয়া নদীর ধারে ধারে যতদূর পারিলাম চলিয়া গেলাম। কিছুদূর যাইবার পর পাহাড়ের গায়ে তাকের মতো একটা স্থান হঠাৎ চোখে পড়িল। মাটি হইতে বেশ একটু উঁচুতে। উঠিয়া বসিতে পারিলে বেশ নিরাপদ স্থান। যখন পাহাড়ের গায়ে রহিয়াছে তখন নিশ্চয়ই প্রস্তরময়। পাথর ঘষিবারও সুবিধা হইবে। কি করিয়া ওঠা যায়। সহসা কোনও বুদ্ধি মাথায় আসিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে আহারেই মন দিলাম, নদীতীরে বসিয়া শৃগালমাংস ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিলাম। স্থানটা বেশ নির্জন বলিয়া মনে হইল। অন্য কোন মানুষের এলাকাভুক্ত হয় নাই সম্ভবত। অন্তত তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না ; ইকাকে যদি পাই এইখানেই আসিয়া থাকিব। ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের একটা ছবি অস্পষ্টরূপে মানসপটে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সে ছবিতে কোনও নূতনত্ব নাই, তাহা আমার পুরাতন জীবনেরই পুনরাবৃত্তি। যে দলপতি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, যে জুজুমের কবল হইতে ইকাকে অপহরণ করিতে চাই ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেকে তাহাদেরই অনুরূপ কল্পনা করিয়া শৃগালের হাড় চুষিতে চুষিতে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার প্রয়াস পাইলাম।

কোথায় বাসা বাঁধিব? পাহাড়ের উপর? তাহার পূর্বে পাহাড়ের উপরটা

ঘুরিয়া দেখিতে হইবে নিরাপদ কি না। দূরে ওই গাছটা আছে.. সহসা তড়িৎ-স্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। একটা প্রেরণার বিদ্যুৎ মস্তিষ্ককে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, চেষ্টা করিয়া দেখিব বই কি। এক লম্ফে নির্ঝরিণী পার হইয়া সেই গাছটার কাছে গিয়া হাজির হইলাম। মোটা একটা ডাল ভাঙা শক্ত কাজ, কিন্তু শক্ত বলিয়া নিরস্ত হইলে চলিবে না। একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম, খুব জোরে ঝাঁকানি দিলাম, বিশেষ কিছু হইল না। তখন গাছের উপর উঠিয়া পড়িলাম, একটা উঁচু ডাল দুই হাতে ধরিয়া পায়ে করিয়া সজোরে নীচের ডালে চাপ দিতে শুরু করিলাম। মড় মড় করিয়া ডালটা ভাঙিয়া পড়িল। ডালটা খুব বেশি মোটা নয়, কিন্তু আমার কাজের পক্ষে যথেষ্ট। ডালটা টানিয়া আনিয়া পাহাড়ের গায়ে লাগাইলাম—বাঃ, ঠিক তাক পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। ডাল বাহিয়া তাকে উঠিয়া বসিলাম। চমৎকার প্রশস্ত জায়গা, নীচে হইতে বুঝিতে পারি নাই যে, এত প্রশস্ত হইবে। ডালের পত্রপল্লব দিয়া বেশ একটু আড়ালও হইয়াছিল। নীচে নামিয়া গিয়া কয়েকটা পাথর কুড়াইয়া আনিয়া ঘষিতে শুরু করিয়া দিলাম। ভাল ভাল তীর কয়েকটা করিতেই হইবে। যেমন করিয়া হোক ইকাকে চাই।

দিন কাটিতে লাগিল। ঠিক কয়দিন কাটিল তাহার হিসাব রাখিবার তখন প্রয়োজনও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। কয়েকটি প্রভাত আসিল ও চলিয়া গেল। আহার সংগ্রহ করিতে প্রতিদিন খানিকটা সময় যাইত, তাহার পর পাথর ঘষিতাম। নিবিষ্টচিত্তে যে পাথর ঘষিতাম তাহাও নয়, পাথর ঘষিতে ঘষিতে মাঝে মাঝে উঠিয়া পড়িতাম, অস্থির চিত্তে অথচ সাবধানে। চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম যদি হঠাৎ কোথাও একা ইকার সন্ধান পাইয়া যাই।

...একদিন দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলাম। একা ছিল না। জুজুম ছাড়া আর সকলেই তাহার আশে পাশে ছিল। বনের ধারে সকলে মিলিয়া শুষ্ক ডাল পালা সংগ্রহ করিতেছিল। আমাকে তাহারা দেখিতে পাইল না, আমি লুকাইয়া ইকাকে দেখিতে লাগিলাম। একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করিলাম, ইকা মাথায় একটা লাল ফুল গুঁজিয়াছে। তাহার অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশপাশে সেই টকটকে লাল ফুলটা যেন নীরব ভাষায় আমাকে আশ্বাস দিল। অস্পষ্টভাবে যেন অনুভব করিলাম কঠিন প্রস্তর খণ্ডকে ধৈর্য ভরে ঘষিয়া তীক্ষ্ম মুখ তীরে পরিণত করাই যে ইকাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় তাহা নয়, ইকার মাথার ওই লাল ফুলটা নীরবে আর একটা পথের ইঙ্গিত দিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া অতৃপ্তনয়নে দেখিতেছিলাম—হঠাৎ একটা গর্জন শোনা গেল—জুজুমের গর্জন—সকলে নিমেষমধ্যে বনান্তরালে অন্তর্ধান করিল।

...আর একদিন ইকার দেখা পাইলাম। সেদিন সে কুল পাড়িতেছিল। সেদিনও একা ছিল না, কাছেই জুজুম পরিবারের সকলেই কুল কুড়াইতে ব্যস্ত ছিল। ইকা লাঠি দিয়া গাছের ডালে ঝাঁকানি দিতেছিল, বাকী সকলে কুল কুড়াইতেছিল। আমি ঝোপের আড়াল হইতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম।

সহসা একটা কাণ্ড হইয়া গেল। আমার কণ্ঠ দিয়া আমার অজ্ঞাতসারে একটা শব্দ নিঃসৃত হইল। নিরুদ্ধ আকুলতা সহসা শব্দায়িত হইয়া পড়িল যেন। ইকা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, আমিও আমার মুণ্ডটা ঝোপের ভিতরে টানিয়া লইতে ভুলিয়া গেলাম। ইকা আমাকে দেখিল, ক্ষণকালের জন্য ঘাড় ফিরাইয়া রহিল, তাহার পর আবার কুল-পাড়ায় মন দিল, যেন কিছুই হয় নাই। চীৎকার করিল না, পলাইয়াও গেল না। তাহার এই আচরণ আমার মনে যে অর্থ বহন করিয়া আনিল তাহাতে বিস্ময়ে আনন্দে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই হয়তো আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া অসমসাহসিক কিছু একটা করিয়া ফেলিতাম, কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে সচকিত হইয়া পাশের গাছটার উপর উঠিয়া পড়িলাম। চীৎকারটা আহত জন্তুর। গাছের উপর হইতে দেখিলাম একটু দূরে ফাঁকা মাঠে জুজুম একটা শূকর শাবককে পাথরে আছড়াইয়া মারিতেছে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম—যাহা এতদিন করি নাই, কাছে একটা ফাঁদ পাতা রহিয়াছে। মাটিতে প্রকাণ্ড একটা গর্ত, সেই গর্তের উপর ডাল-পালা সাজানো। শূকর শাবকটা ওই গর্তের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল। শব্দ অনুসরণ করিয়া সকলে জুজুমের নিকট ছুটিয়া গেল। ইকাও। রক্তাক্ত শূকর শিশুটাকে ঘিরিয়া তাহাদের আনন্দ-কলরব জমিয়া উঠিল। আমি লুব্ধচিত্তে ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে বসিয়া বসিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, সেদিন আর সে গাছ হইতে নামিলাম না। ভয়ের জন্য নয়, একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন আমাকে টানিয়া রাখিল, কিছুতেই নামিতে দিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারটা অজুহাত স্বরূপ হইয়া আমাকে সেই নানা অসুবিধাপূর্ণ গাছটার উপরে বসাইয়া রাখিল। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু সেই জলাশয়ে গিয়া আর শামুক সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। একস্থানে খানিকটা কন্দ দেখিয়াছিলাম, তাহার সন্ধানে যাইতেও ইচ্ছা করিল না। সেই গাছের ডালেই আমি নানা অসুবিধা সহ্য করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা মৃদু শব্দ হইল। পক্ষ বিধূননের শব্দ; ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঠিক পাশের ডালেই একটা কোটর রহিয়াছে। কোটরে হাত ঢুকাইয়া দিতেই আঙুলে কি একটা কামড়াইয়া ধরিল। অসহ্য যন্ত্রণায় হাতটা বাহির করিয়া লাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুই পাখী উড়িয়া গেল। জনক-জননী উড়িয়া গেল, নিশ্চয়ই ডিম কিম্বা ছানা আছে। পুনরায় হাত ঢুকাইলাম। গোটা দুই ছানা ছিল। সেই দুটিকে গলাধঃকরণ করিয়া কোনক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। সমস্ত রাত ভাল ঘুম হইল না। ভোরের দিকে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। চোখ খুলিয়া দেখিলাম ভোর হইতেছে। পর মুহূর্তেই আনন্দে উত্তেজনায় সমস্ত দেহটা কাঁপিয়া উঠিল। ভোরের আলো দেখিয়া নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই যেন মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে। ইকা আসিতেছে—একা! আমি আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলাম না, গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। সচকিত ইকা

ছুটিয়া বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অন্তর্হিত হইবার পূর্বে কিন্তু একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া গেল। মনে হইল তাহার চকিত চোখের দৃষ্টিতে, বিকশিত দন্তরুচিতে, কম্পমান স্তনযুগলে সে যাহা প্রকাশ করিয়া গেল, তাহা প্রত্যাখ্যান নয়, নিমন্ত্রণ। ঊর্ধ্বশ্বাসে অনুসরণ করিলাম, কিন্তু ধরিতে পারিলাম না। সে নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া ফাঁদটা পর্যবেক্ষণ করিলাম—ফাঁদে কিছু পড়ে নাই। মনে হইল ফাঁদটা দেখিবার জন্য ইকা বোধ হয় আসিয়াছিল এবং রোজই সম্ভবত আসে। কিন্তু আজ যাহা ঘটিল তাহার পরও আসিবে কি? অনেকক্ষণ ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ইকা জুজুমকে ডাকিয়া আনিতে পারে, জুজুম নিজেই হয়তো আসিয়া পড়িতে পারে—এ সব সম্ভাবনার কথা যে মনে হইতেছিল না তাহা নয়, কিন্তু কিছুতেই ওই স্থানটা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল জুজুম যদি আসে আসুক, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তাহার সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইব, কিন্তু এ স্থান ত্যাগ করিব না। একটা অদৃশ্য রজ্জু যেন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। একবার মনে হইল, ফিরিয়া যাই। পাহাড়ে একটা পাথর ঘষিয়া ঘষিয়া অনেকটা সূচালো করিয়া ফেলিয়াছি, আজ সমস্ত দিন ঘষিলে তাহা একটা উৎকৃষ্ট অস্ত্রে পরিণত করিতে পারিব। কিন্তু কিছুতেই ওই স্থানটি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। উহারই আশে-পাশে আনাচে-কানাচে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলাম। সেই কন্দটা খুঁড়িয়া খাইয়া ফেলিলাম, একটা সজারুর গর্ত হইতে একটা সজারুকে টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। একটা ঝোপে গোটা দুই পাখীর ডিম পাওয়া গেল, জলাশয়ের ধারে গিয়া কয়েকটা শামুকও পাইলাম। ইকার কুলগাছটায় অনেক কুল ছিল। কুল পাড়িতে গিয়া হঠাৎ চোখে পড়িল বনের মধ্যে একটা গাছ অসংখ্য লাল ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে। ওই ফুলই তো ইকা মাথায় পরিয়াছিল; চকিতের মধ্যে একটা মতলব মাথায় খেলিয়া গেল। ডাঁসা ডাঁসা নড় নড় কুলসুদ্ধ একটা ছোট কুলের ডাল ভাঙিয়া লাইলাম, তাহার পর সেই গাছটা হইতে ডাল-সুদ্ধ এক গোছা ফুলও পাড়িলাম। সন্ধ্যায় গাছে উঠিবার আগে সেই ডাল দুইটাকে একত্র বাঁধিয়া ইকার পথে রাখিয়া দিলাম। ইকা ওই পথ দিয়া আজ আসিয়াছিল, কালও আসিবে। দেখিতে আসিবে ফাঁদে শিকার পড়িয়াছে কি না। সে যখন জুজুমকে ডাকিয়া আনে নাই তখন নিশ্চয় আসিবে।

...সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে বসিয়া রহিলাম। কিছুতেই ঘুম আসিল না। রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অরণ্যের বিচিত্র শব্দে অন্ধকার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্বাপদ গর্জন করিল, ঝিল্লী ঝনৎকার তুলিল। সরীসৃপ সঞ্চরণের সর-সর, পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন অন্ধকারে শিহরণ জাগাইল। আকাশে তারা উঠিল, চাঁদ হাসিল। আমি নিষ্পন্দ হইয়া একাগ্র-দৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়া রহিলাম। কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। সহসা

দেখিলাম অন্ধকার স্বচ্ছ হইতেছে। ঈষৎ আলোর রূপালী পটভূমিকায় নিকষ কৃষ্ণাঙ্গিনী যৌবন-কঠিন ইকার মূর্তি অনিবার্য নিয়তির মতো যেন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

...আমি জানিতাম, ইকা আসিবে। ইকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল ইকাও যেন জানে আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। অকম্পিত চরণে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূরে আসিয়া পথের উপর কুল ও ফুলের গোছা দেখিতে পাইল। দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এ-দিক ও-দিক চাহিল একবার, তাহার পর হাসিয়া উঠিল। সভ্য তরুণীর মুচকি হাসি নয়। মনে হইল একটা ক্ষুধিত হায়েনা যেন ডাকিতেছে। পর মুহূর্তেই সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। মাথায় ফুল গুঁজিয়া ফলে মনোনিবেশ করিল। সে যখন তন্ময় হইয়া কুল খাইতেছিল, তখন আমি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্তী হইলাম। তাহার পর অতর্কিতে বিপরীত দিক হইতে আক্রমণ করিলাম, যাহাতে সে জুজুমের আস্তানার দিকে না যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া ছুট দিল, আমিও পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। কণ্টকে কঙ্করে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, বন জঙ্গল ভেদ করিয়া উন্মত্তের মতো ছুটিতে লাগিলাম। জঙ্গল পার হইয়া সেই জলাশয়ের তীরে আসিয়া পড়িলাম। ইকা ছুটিয়া গিয়া জলাশয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আমিও পড়িলাম। হাঁসের দল সচকিত হইয়া উড়িতে লাগিল, তাহাদের ডাকে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় এক কান্ড ঘটিল। নিদারুণ আর্তনাদ করিয়া ইকা হঠাৎ ডুবিয়া গেল। বুঝিলাম কুমীর। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ডুব দিলাম এবং তীরবেগে ডুব সাঁতার কাটিয়া গিয়া কুমীরটার পিঠের উপর চাড়িয়া বসিলাম। কুমীরকে কি করিয়া জব্দ করিতে হয় জানা ছিল। সজোরে তাহার দুই চোখে আমার তীক্ষ্ম-নখসমন্বিত আঙুল দুইটা ঢুকাইয়া দিলাম। কুমীর তৎক্ষণাৎ ইকাকে ছাড়িয়া আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ধরিতে পারিল না। আমি সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে সরিয়া গিয়াছিলাম। কিছু-ক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া দেখি, ইকা তীরে উঠিয়াছে। দ্রুতবেগে সাঁতার কাটিয়া আমিও তীরে উঠিয়া পড়িলাম। আমাকে দেখিয়া ইকা আবার ছুটিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কুমীর তাহার ডান পাটা চিবাইয়া দিয়াছিল। আমি ছুটিয়া গিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তাহার রক্তাক্ত চরণের যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম না, উন্মত্ত আগ্রহে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলাম। ইকা আমার বাহুমূলে কামড়াইয়া ধরিল, তীক্ষ্ম নখরে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না।

ইকা চলিতে পারিতেছিল না। তাহাকে কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়াছিলাম। তাহার পদনিঃসৃত রক্তধারায় আমার সর্বাঙ্গ রঞ্জিত, তাহার দন্ত ও নখরাঘাতে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কাঁধের উপর বসিয়াও রাক্ষসীটা প্রাণপণে আমার মাথার চুল ধরিয়া টানিতেছিল। আমি দুই হাত দিয়া মাংসল তাহার উরু-যুগলকে প্রাণপণে কাঁধের উপর চাপিয়া ধরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছিলাম। সেই পাহাড়ের উদ্দেশে!

পাহাড়ে পৌঁছিয়া এক ঝটকায় কাঁধ হইতে তাহাকে ভূপাতিত করিলাম। উঃ, মাথার চুলগুলো বোধ হয় উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল। কাছেই একটা গাছ ছিল, তাহার একটা ডাল ভাঙিলাম। আপাদমস্তক না চাবকাইলে পোষ মানিবে না। –ডাল হাতে করিয়া ফিরিয়া দেখি ইকা হাসিতেছে। অপরূপ মোহিনী মূর্তি। ডালটা ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরিলাম। আমার গৃহস্থালি স্থাপিত হইল।

২

তাহার পর কত কাল কাটিয়া গিয়াছে। আমি কিন্তু মরি নাই। কত ইকা আসিল এবং চলিয়া গেল, কত সন্তান জন্মিল মরিল, কত বন্য জন্তু, আরণ্য বৃক্ষলতা, পর্বত-নির্ঝরিণী জীবনের পটভূমিকায় কখনও আনন্দ, কখনও বিস্ময়, কখনও আশঙ্কার ছবি আঁকিয়া বিলীন হইয়া গেল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, পাশবিক উল্লাস, দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় ফুল-ফল লতা-পাতা কন্দ-কাণ্ড-মূল কীট-সরীসৃপ-পশু-পক্ষীর নিরবচ্ছিন্ন সন্ধান, নারীমাংসকে কেন্দ্র করিয়া সদাজাগ্রত হিংস্র আকাঙ্ক্ষা—এই সমস্তর উপর দিয়া কালের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। স্তরের উপর স্তর পড়িয়াছে, ধীরে ধীরে পরিবর্তনের বীজ উপ্ত হইয়াছে, যুগের পর যুগান্তর আসিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

প্রথমটা তত গ্রাহ্য করি নাই, কিন্তু শেষে একদিন করিতেই হইল। সহসা একদিন উপলব্ধি করিলাম খুব বেশি শীত ছে। নিদারুণ শীত। বর্ষাকালে নদীর জল ক্রমশ যেমন বাড়ে শীতটাও তেমনি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। পশুচর্মে আর যেন শীত ভাঙে না, পূর্বে একটা পশুচর্ম হইলেই যথেষ্ট হইত। পশুচর্মও বেশি নাই। কিছুদিন হইতে বনে বৃহদাকার পশুরও অভাব ঘটিয়াছে। বহুকাল বড় পশু শিকার করি নাই। হায়েনার ডাকও আজকাল তেমন শোনা যায় না। বন্য মহিষও দেখিতে পাই না। সুতরাং পশুচর্ম বেশি নাই। যে কয়খানা ছিল সেগুলি আমি আর আমার সঙ্গিনীরা দখল করিয়াছি, শিশুগুলো শীতে কাঁপিতেছে। কয়েকটা শিশু তাহাদের মায়ের কোল ঘেঁষিয়া বসিয়াছে, তবু কাঁপিতেছে। নিদারুণ শীত। আগুন জ্বালাইয়াছি, আগুনের চতুর্দিকেই সকলে বসিয়া আছি। তবু কিন্তু শরীর গরম হইতেছে না। তাহা ছাড়া আর একটা জিনিসও ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছি। আগুনের ইন্ধন ফুরাইয়াছে। নিকটেই যে কাঠের বোঝা ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। গত কয়েকদিন হইতে আগুনের নিকট হইতে কেহ ওঠে নাই, উঠিতে পারে নাই। অরণ্যের একধারে গাছের ডালপালা দিয়া ঘিরিয়া নিজেদের যে আশ্রয়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, নিদারুণ শীতে যদিও তাহা অকিঞ্চিৎকর তবু তাহা ত্যাগ করিয়া কেহ কোথাও যাইতে চাহিতেছি না। অগ্নিকুণ্ডটাকে ঘিরিয়া সকলে নিঝুম হইয়া বসিয়া আছি। শীতে মাঝে মাঝে সর্বাঙ্গে শিহরণ

জাগিতেছে, যে অরণ্যের আড়ালে আশ্রয় লইয়া এতকাল কাটাইয়াছি সে অরণ্যের ভিতর শীত-তীক্ষ্ন বায়ু গর্জন করিয়া ফিরিতেছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া শুনিতেছি। কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। তখনও মাটির নীচে বা গুহার অন্তরালে বাস করিবার কল্পনাও আমাদের মনে জাগে নাই। গাছের ডালপালা লতা দিয়া বড় বড় দুই তিনটা আগড়ের মতো বানাইয়া তাহারই সাহায্যে কুটির প্রস্তুত করিয়া বাস করিতাম। ঝড় বৃষ্টিতে কখনও কখনও তাহা ভাঙিগয়া পড়িত, আবার প্রস্তুত করিয়া লইতাম। এমন শীতের অভিজ্ঞতা পূর্বে আর কখনও হয় নাই।

সমস্ত কাঠ একদিন নিঃশেষ হইয়া গেল। বনের ভিতর শীতের তীক্ষ্ন হাওয়া তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, দূর প্রান্তরে শুষ্ক পাতার রাশি বায়ুবেগে উড়িয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছে শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য উহারা যেন পলায়ন করিতেছে। ওই পলাতক পাতাগুলাকে কুড়াইয়া আনিয়া অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করিলে খানিকক্ষণ আরাম পাইতাম। শুষ্ক পাতা কুড়াইয়া আনিয়াই এতকাল আগুন জ্বালাইয়াছি, পাতার রাশি গাছের তলায় স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকিত, এখন সব ছুটিয়া চলিয়াছে। ছুটিয়া উহাদের ধরিতে পারিব কি? কয়েকদিন ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই, খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাহিরেই যাইতে পারি নাই। দুর্বল বোধ করিতেছিলাম, শীতে কাঁপিতে-ছিলাম, তবু উঠিয়া পড়িতে হইল। যেমন করিয়া হোক কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেই হইবে।

বাহিরে আসিয়া আশে পাশে চাহিয়া দেখিলাম অরণ্যও ভয়াকুল। সমস্ত পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, শুষ্ক শীর্ণ শাখা-প্রশাখা শীতের প্রখর বাতাসে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমিও কাঁপিতে লাগিলাম। বায়ুবেগে হঠাৎ আমার গাত্রাবরণ শুষ্ক চর্মখানা উড়িয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া সেটাকে কুড়াইয়া আনিয়া নগ্নদেহকে আবৃত করিলাম। ওই শুষ্ক চর্মই তখন আমাদের একমাত্র দেহাবরণ ছিল। ছুটিয়া শরীরে উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। শুষ্ক চর্মটাকে এক হাতে বুকের উপর চাপিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহে মন দিলাম। আগুনের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য। একটু আগাইয়া বুঝিলাম শুষ্ক ডালপালার অভাব নাই, সমস্ত বনই শুকাইয়া আসিতেছে, শীতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনাই কষ্টসাধ্য। কিছু দূর গিয়াই দেখিলাম একটা ছোট গাছ মরিয়া গিয়াছে। তাহার ডালপালাগুলি তাড়াতাড়ি ভাঙিগয়া যতটা পারিলাম বহিয়া আনিলাম। আমার সঙিগনীরাও বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহারাও দেখিলাম কিছু কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। একজন একটা মৃত জন্তুর কঙ্কাল টানিয়া আনিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। পশু কঙ্কাল অতি চমৎকার ইন্ধন। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম দুইটা শিশু মরিয়া গিয়াছে। কুঁকড়াইয়া একধারে পড়িয়া আছে, নিশ্বাস পড়িতেছে না। অগ্নিকুণ্ডও নির্বাপিত প্রায়। শীত আরও যেন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি সকলে

মিলিয়া ফুঁ দিয়া আগুন জ্বালাইয়া ফেলিলাম, তাড়াতাড়ি সকলে মিলিয়া অগ্নিস্তূপের নিকট ঘেঁষিয়া বসিলাম। মৃত শিশু দুইটাকেও আগুনের মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া হইল। তখন আমরা কোন কিছুই নষ্ট হইতে দিতাম না। শোক? নিজের সুবিধার জন্য মাথার চুল কিম্বা হাতের নখ কাটিয়া ফেলিয়া তোমরা কি শোক কর? আজও যেমন সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মাপকাঠি দিয়াই শোকের বিচার হয়, তখনও তাহাই হইত। একটা শিশু অপেক্ষা একটা পাথরের অস্ত্র আমাদের নিকট বেশি প্রিয় ছিল। একটা পাথরের অস্ত্র হারাইয়া গেলে আমরা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িতাম। তা ছাড়া, শিশু তখন আনন্দ-জনক ছিল না, খাদ্যের এবং রমণীর অংশীদাররূপে বিরক্তিই উৎপাদন করিত।

...শীত উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। অরণ্যের পত্র-পল্লব শুকাইয়া আসিল। ইন্ধনের অভাব হইল না, হু হু করিয়া আগুন জ্বালাইয়া তাহার মধ্যে আমরা বসিয়া রহিলাম। কিন্তু পেটেও অগ্নি জ্বলিতেছিল। সে অগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল ক্রমশ। যে অরণ্য আমাদের খাদ্য সরবরাহ করিত তাহা মরিয়া যাইতেছিল। একটা প্রাণহীন অরণ্য-কারাগারে আমরা ধীরে ধীরে যেন বন্দী হইয়া পড়িতেছিলাম। বনের পশুপক্ষীরও আর সাড়া পাওয়া যায় না। তীক্ষ্ম তীব্র শীতের বাতাস একটা হিংস্র পশুর মতো মৃতপ্রায় অরণ্যভূমিতে গর্জন করিয়া ফিরিতেছে শুধু, আর কিছু নাই। পাখীর ডাক নাই, পতঙ্গের গুঞ্জন নাই, শ্বাপদের সঞ্চরণ শব্দ নাই। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হিমশীতল কবলে সমস্ত চরাচর যেন নির্জীব হইয়া আসিতেছিল।

...একে একে সমস্ত শিশুগুলি গেল। কয়েকটি আপনিই মরিল, কয়েকটিকে মারিয়া ফেলিতে হইল। পলায়নক্ষম কিশোর-কিশোরীরা বিপদ আসন্ন বুঝিয়া একে একে অন্তর্ধান করিল।

...আহারের চেষ্টায় একদিন বাহির হইয়া দেখি নদী, জলাশয় সমস্ত শাদা। সব জমিয়া গিয়াছে। তাহার পূর্বে তুষার কখনও দেখি নাই, আতঙ্কিত বিস্ময়ে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ বিপরীত দিকে ফিরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইল। একস্থানে বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া লক্ষ্য কবিলাম আশে পাশে পেঁজা তুলোর মতো কি যেন ছড়ানো রহিয়াছে। সাহস সঞ্চয় করিয়া হাত দিলাম। হাত দিয়াই চমকাইয়া উঠিতে হইল, মনে হইল হাতে যেন কামড়াইয়া দিল। মনে হইল জিনিসটা যেন জীবন্ত। জীবন্ত অথচ শীতল, চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে। হঠাৎ নজরে পড়িল আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। একটা অজানা আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া আবার উঠিয়া ছুটিতে শুরু করিলাম। খানিকক্ষণ ছুটিয়া আবার বসিয়া পড়িতে হইল। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। উপর্যুপরি দুই দিন কিছু খাই নাই। ক্ষুধায় পেটের নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছে। খাদ্যের কোনও আশা নাই। অরণ্যের শ্যামশোভা অবলুপ্ত হইয়াছে, জীবনের কোনও লক্ষণ কোথাও নাই। একটা

শ্বেত বিভীষিকা প্রেতের মতো সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ছুটিয়া শরীরে খানিকটা উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল, কিছুক্ষণ বসিবার পর শীত করিতে লাগিল। আবার উঠিলাম। সহসা মনে হইল আগুনটা যদি নিবিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে শীতেই মরিতে হইবে। দ্রুতপদে আস্তানার দিকে ফিরিতে লাগিলাম। প্রখর বাতাসটা হঠাৎ থামিয়া গেল। পেঁজা তুলোর মতো তুষার চতুর্দিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, বিরাম নাই। চারিদিক কেমন যেন আবছা হইয়া আসিয়াছে। কিছুদূর আসিয়া চোখে পড়িল একটা গাছের মোটা ডাল ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেটাকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। আগুন জ্বালাইতে হইবে। আস্তানায় ফিরিয়া দেখিলাম একজন ছাড়া আর সকলেই পলাইয়াছে। তিনটি নারী শেষ পর্যন্ত ছিল, এখন ফিরিয়া দেখিলাম দুইজন চলিয়া গিয়াছে, একজন আছে। যে আছে সে যে আমার প্রতি মায়াবশত আছে তাহা নয়। তাহার যাইবার সামর্থ নাই। চোখে দেখিতে পায় না। একটা বন-বিড়াল একবার উহার মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই নখরাঘাতে চক্ষু দুইটি গিয়াছে। মুখময় কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন।

...আগুনটা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল, অনেক কষ্টে পুনরায় তাহা জ্বালাইয়া তুলিলাম। পত্রপল্লববহুল মোটা ডালটা অবশেষে ধরিয়া উঠিল। শীত কমিল, কিন্তু ক্ষুধা বাড়িল। চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়া আসিলাম, খাদ্যের কোনও সম্ভাবনা কোথাও নাই। এ অরণ্য মরিয়া গিয়াছে, এখানে থাকিলে আমারও মৃত্যু অনিবার্য—এই চিন্তা আমাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। ফাঁদে পতিত মৃত্যু-ভীত পশুর ন্যায় আমি সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মনে হইল এখন কেবল একটিমাত্র উপায় আছে। অন্ধ সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। এতদিন উহার দেহটা নানাভাবে ভোগ করিয়াছি, এইবার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিব। পাথরের মুগুরটা তুলিয়া সজোরে মাথার উপর মারিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আক্ষিপ্ত দেহের অসহায় বিক্ষোভ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। একটু পরে সব শান্ত হইয়া গেল। তাহার পর সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটা জ্বলন্ত শাখার উপর রাখিয়া সেটা টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যেমন করিয়া হোক আমাকে বাঁচিতেই হইবে।

...দ্রুতপদে চলিতেছিলাম। একটা হিম-শীতল কুয়াশায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই, পথও দেখিতে পাইতেছিলাম না। একটা ঝড়ের মতো বহিতেছিল। সেই ঝড়ে অসংখ্য তুষারকণা ছুটিয়া আসিয়া সূচের মতো সর্বাঙ্গে বিঁধিতেছিল। আমি চোখ বুজিয়া অন্ধের মতো ছুটিতেছিলাম, কোন্ দিকে যাইতেছিলাম জ্ঞান ছিল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম কেবল। জ্বলন্ত শাখাটা কিন্তু ছাড়ি নাই। দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম সেটাকে। উহাতে অগ্নি আছে, ওটা ছাড়িলে যে চলিবে না এ জ্ঞানটুকু ছিল। ছুটিতে ছুটিতে যে

কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম খেয়াল ছিল না, হঠাৎ পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল, হুড়মুড় করিয়া একটা বিরাট গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। গর্তের মধ্যে পড়িয়া একটু যেন আরাম অনুভব করিলাম, আর যাই হোক তীক্ষ্ম বাতাসের দংশন হইতে বাঁচিয়াছি। ভিতরে বাহিরের মতো অত ঠাণ্ডাও নয়! চোখ খুলিয়া দেখিলাম বেশ প্রশস্ত বড় গর্ত। গাছের পাতলা ডাল দিয়া গর্তটা ঢাকা ছিল। তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত গাছের ডাল এবং আমার সঙ্গিনীর মৃতদেহটা গর্তের মধ্যে টানিয়া লইলাম। আগুন প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল, প্রাণপণে ফুঁ দিয়া তাহা আবার জ্বালাইয়া তুলিলাম। হঠাৎ খড় খড় করিয়া একটা শব্দ হইল, ঘাড় ফিরাইয়া দেখি গর্তের এক প্রান্তে কি একটা যেন জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। আগাইয়া গিয়া দেখিলাম একটা হরিণ শাবক। বুঝিলাম এটা তাহা হইলে ফাঁদ একটা। আরও খানিকটা খাদ্য হাতের কাছে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, যে লোকটা ফাঁদ পাতিয়াছে সে কাছে-পিঠে কোথাও নাই তো! একটু পরে আসিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিবে না তো! মনে হইল আমার পাথরের অস্ত্রগুলা তো আনি নাই। আত্মরক্ষা করিব কি করিয়া? অস্ত্রগুলা আনিতে হইবে। হরিণটাকে এখন মারিব না, ওটা থাক, পরে কাজে লাগিবে। নিমেষের মধ্যে এই সব চিন্তা মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে যাহা অনুভব করিতেছিলাম, তাহা ক্ষুধা। ভীষণ ক্ষুধা। আগুনে ঝলসাইয়া সঙ্গিনীর মৃতদেহের খানিকটা খাইয়া ফেলিলাম। ভারী তৃপ্তি হইল। শ্রান্ত দেহে যেন খানিকটা শক্তি ফিরিয়া পাইলাম। প্রাণে আশাও সঞ্চারিত হইল। আগুনে গর্তটা বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। শীতের প্রকোপ হইতে বাঁচিবার মতো একটা আশ্রয় যখন জুটিয়াছে, তখন বোধ হয় বাঁচিয়া গেলাম। এইবার আমার অস্ত্র-শস্ত্রগুলি এবং গায়ে দিবার চামড়া কয়খানা আনা দরকার।

আবার গর্ত হইতে বাহির হইলাম। আবার সেই হিমশীতল বাতাসের সম্মুখীন হইতে হইল। আর একটা মুশকিলেও পড়িলাম। কোন্ দিকে যাইব? দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি, আমার পুরাতন আস্তানা যে কোন্ দিকে তাহা কি করিয়া ঠিক করিব? চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম। কেবল শাদা আর শাদা। বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিবারও উপায় ছিল না। শীতে সমস্ত শরীর জমিয়া আসিতেছিল। অসহায়ভাবে ছুটোছুটি করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা কালো জিনিস চোখে পড়িল, ছুটিয়া সেই দিকে গেলাম। দেখিলাম যে পোড়া ডালটা টানিয়া টানিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই একটা অংশ। আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ওই যে দূরে আর একটা কালো,—ি আর একটা। বুঝিলাম, অজ্ঞাতসারে নিজেই পথ চিহ্নিত করিয়া । চিহ্ন অনুসরণ করিয়া ছুটিতে লাগিলাম, অনেকক্ষণ ছুটিবার পর পুরাতন আস্তানায় গিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম সব ঠিক আছে। কোথাও জন-প্রাণী কেহ নাই।

আমার আশে-পাশে বিশেষ কেহ ছিলও না। তখনও গ্রাম বা সমাজ গড়িয়া ওঠে নাই। বিচ্ছিন্ন এক একটি পরিবার দূরে দূরেই থাকিত। সেই নির্জন অরণ্যে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইলাম। সমস্ত বন যেন হাহাকার করিতেছে! কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। ডালপালা সমেত একটা ছোট গাছ কাটিয়া তাড়াতাড়ি চামড়া কয়খানা তাহার উপর সাজাইয়া দিলাম। চামড়ার উপর পাথরের অস্ত্রগুলি রাখিয়া ডালটাকে টানিয়া টানিয়া আবার গর্তের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিলাম। গতি কিন্তু ক্রমশ মন্থর হইয়া পড়িল। যদিও আমার গায়ে একখানা চামড়া জড়ানো ছিল, তবু শীতে কাবু হইয়া পড়িতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া মনে হইল আর চলিতে পারিতেছি না, পা দুইটা অসাড় হইয়া জমিয়া যাইতেছে। তখন সেই চামড়া আর পাথরগুলোকে ফেলিয়া রাখিয়া কিছু দূর ছুটিয়া আসিলাম, তাহাতে শরীর যেন একটু গরম হইল। আবার ফিরিয়া আসিয়া সেগুলোকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। চোখ বুজিয়া চলিতে-ছিলাম, চোখ খুলিয়া রাখিবার উপায় ছিল না। চলিতে চলিতে যেই মনে হইতেছিল শরীর জমিয়া আসিতেছে, অমনি খানিকটা ছুটিয়া আসিতেছিলাম। এইভাবে টানিতে টানিতে কতক্ষণ যে চলিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। হঠাৎ এক জায়গায় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবার মতো হইলাম। চোখ খুলিয়া দেখিলাম একটা মেয়েমানুষ চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। অসাড় নিঃস্পন্দ বলিয়া মনে হইল। পরিপুষ্ট পীবর স্তনযুগল তুষারাচ্ছাদিত, মুখে চুলে আঁখিপল্লবে তুষারকণা জমিয়া আছে। চোখে পড়িল পাশে একটা সদ্যোজাত শিশুও রহিয়াছে। দুই জনকেই টানিয়া চামড়ার উপর তুলিলাম। মাংসের সংস্থান যত থাকে ততই ভাল। কাচিন তখন যদি আমার মনের কথা টের পাইত, তাহা হইলে অসাড় শরীরেও সাড়া জাগিত বোধ হয়। চলচ্ছক্তি-হীন দেহটাকে কোনক্রমে টানিয়া তুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পাথরের স্তূপের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। হিমতীক্ষ্ণ বাতাসের বেগ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল, চতুর্দিক বরফে ঢাকা, চোখ খুলিলেই চোখে তুষারকণা ঢুকিয়া পড়িবার সম্ভাবনা, তবু আমি বিস্ফারিতনয়নে ক্ষণকাল কাচিনের পরিপুষ্ট যৌবনশ্রীর দিকে চাহিয়া রহিলাম, তুষারচর্চিত হইয়া তাহা যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। পরমুহূর্তেই চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিতে হইল, বাতাসের বেগটা সহসা বাড়িয়া উঠিল, চোখ বুজিয়া আবার টানিতে শুরু করিলাম। বোঝা বেশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যত ভারীই হউক, গর্তে গিয়া পৌঁছিবই। যেমন করিয়া হোক বাঁচিতেই হইবে। আমি মরিয়া যাইব?

ইহা যে কল্পনা করিতে পারি না। দন্তে দন্ত চাপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাতাসও যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল, তুষারের একটা ঘূর্ণাবর্ত আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্য শুরু করিল। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল আর পারিতেছি না, এইবার শুইয়া পড়ি, আমারও তুষার-সমাধি

হইয়া যাক। কিন্তু তখনই অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—না, তাহা অসম্ভব, তোমাকে বাঁচিতেই হইবে। চল, আর বেশি দূর নাই। চলিতে লাগিলাম। বাতাসের বেগটা আরও বাড়িল, মনে হইল ঝড় উঠিয়াছে, বালির মতো তুষারকণা উড়িতেছে...আমি চলিয়াছি। সমস্ত শরীর অসাড়, পা বরফে পুঁতিয়া যাইতেছে, পিছনের বোঝাটা ক্রমশ বেশি ভারী হইয়া উঠিয়াছে...তবু চলিয়াছি। মাঝে মাঝে কেবল চাহিয়া দেখিতেছি পথের চিহ্নগুলা ঠিক আছে কি না। যদিও কিছু কিছু বরফে ঢাকিয়া গিয়াছিল তবু একেবারে অবলুপ্ত হয় নাই, অর্ধদগ্ধ কালো শাখার টুকরাগুলা বরফে পুঁতিয়া গিয়া সুবিধাই হইয়াছিল, তাহা না হইলে বোধ হয় বাতাসে উড়িয়া যাইত। কালো অঙ্গুলি তুলিয়া তাহারা আমাকে পথনির্দেশ করিতেছিল। কৃষ্ণবর্ণকে এতকাল ভয় করিয়া আসিয়াছি। যে মেঘ বজ্র হানে তাহা কালো, যে রাত্রি ভয়ংকর শ্বাপদ সরীসৃপকে লুকাইয়া রাখে তাহা কালো, বক্রদন্ত যে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এতকাল জীবন ধারণ করিয়াছি তাহার দেহেও কালো রাং, সেদিন কিন্তু শ্বেত বিভীষিকার মধ্যে ওই কালোকেই একমাত্র বন্ধু বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহারই নির্দেশে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে চলিতেছিলাম। অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ ঠিক জানি না, চোখ খুলিয়া দেখি কালো চিহ্ন আর দেখা যাইতেছে না, চারি-দিকে কেবল শাদা আর শাদা। সব ঢাকিয়া গেল নাকি! বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। পথ হারাইয়া গেলে মৃত্যু অনিবার্য। আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে গেলাম, চাহিতে পারিলাম না, অসংখ্য তুষারকণা আসিয়া দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া দিল। সোজা মাথা তুলিয়া চাহিবার উপায় নাই। তখন জানু পাতিয়া বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া চোখ চাহিবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম চাওয়া যায়, কিন্তু বেশি দূর দেখা যায় না। তখন হামাগুড়ি দিয়া খুঁজিতে লাগিলাম কয়লার টুকরা কোথাও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে কিনা। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। হামাগুড়ি দিয়া ব্যাকুলভাবে চতুর্দিকে হাতড়াইতে লাগিলাম, হামাগুড়ি দিয়াই অগ্রসর হইলাম কিছুদূর। মনে হইতেছিল আর উপায় নাই, এইবার সব শেষ। কিন্তু মনে হইবামাত্র অমন অসহায় অবস্থাতেও অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন সাহস দিতেছিল, কে যেন ক্রমাগত বলিতেছিল —না, না, শেষ নয়, শেষ হইতে পারে না, দেখ, খোঁজ, চেষ্টা কর, উপায় একটা মিলিবেই। পরমুহূর্তেই চোখে পড়িল কাছেই একটা ফাটল হইতে সরু রেখায় ধোঁয়া বাহির হইতেছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া সেখানে গেলাম। এই তো সেই গর্তের মুখ, বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। ফাটলের নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই পাতলা বরফের আচ্ছাদন আমার দেহের ভারে ভাঙিয়া গেল, আমি আবার সেই গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। গর্তে পড়িয়াই আবার আরাম অনুভব করিলাম। ভিতরে আগুন জ্বলিতেছিল। আর বাহির হইতে ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু বাহিরে যাহা রাখিয়া আসিয়াছিলাম তাহার প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয়। নিতান্তই প্রয়োজনীয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই আবার বাহির

হইতে হইল। ছুটিয়া গিয়া সব গর্তের মুখের নিকট টানিয়া আনিলাম। ক্যাচিন তখনও অজ্ঞান অচৈতন্য। তাহাকেই প্রথমে গর্তের ভিতর নামাইয়া দিলাম, তাহার পর আমার পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং চামড়া কয়খানা। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম সেই সদ্যোজাত শিশুটা নাই, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে হয়তো। এই দুর্দিনে অতখানি ভালো মাংস হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতে ক্ষুব্ধ হইলাম, সামর্থ্য থাকিলে তখনই হয়তো তাহার সন্ধানে আবার বাহির হইয়া পড়িতাম, কিন্তু আর সামর্থ্য ছিল না। সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসিয়াছিল। চোখ দিয়া ক্রমাগত জল পড়িতেছিল। কান দুইটা জ্বালা করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি আসিয়া আগুনের কাছে বসিলাম, আমার অন্ধ সঙ্গিনীর ভুক্তাবশিষ্ট দেহের খানিকটা একেবারে পুড়িয়া গিয়াছিল, বাকী অংশটুকু টানিয়া লইয়া আবার আহার শুরু করিয়া দিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম গর্তের এক কোণে দেওয়ালের দিক ঘেঁষিয়া হরিণ শাবকটা চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। আমি তাহার দিকে চাহিতেই সে চোখ চাহিল, যেন নীরব ভাষায় তাহার কানে কানে কেহ কি বলিয়া দিল, চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া ক্যাচিনের দিকে চাহিলাম, তখনও অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। বাহিরের বাতাসের বেগটা বাড়িল বলিয়া মনে হইল। মনে হইল যেন একটা অশান্ত অদৃশ্য দানব তীক্ষ্নকণ্ঠে তর্জন করিতেছে। গর্তের ভিতর দিয়া খানিকটা শীতল বাতাস এবং বরফ ভিতরে ঢুকিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ইতিপূর্বে আরও ঢুকিয়াছে। গর্তের ঠিক নীচের অংশটা আর্দ্র। হয়তো তুষারাচ্ছন্নই ছিল, আগুনের তাপে বরফ গলিয়া গিয়াছে। ভয় হইল। গর্তের ভিতরটাও যদি ক্রমশ বরফে ভরিয়া যায়! তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা চামড়া দিয়া গর্তের মুখটা ঢাকিয়া দিলাম। বেশ ভালভাবে ঢাকিয়া দিলাম। বাহিরের আলো যেটুকু আসিতেছিল তাহার পথ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু অন্ধকার হইল না। আগুন ছিল। আগুন যে কেবল উত্তাপ দেয় না আলোও দেয়, এ সত্য যদিও বহু-কাল পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তবু তাহা পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হইলাম। জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপের রক্তিম আলোকে অন্ধকার গহ্বরটা অপরূপ হইয়া উঠিল। আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। প্রদীপ্ত অঙ্গারস্তূপের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। অনুভব করিলাম, ঠিক কি যে অনুভব করিলাম তাহা ভাষায় বলিতে পারিব না। আতঙ্ক বিস্ময় কৃতজ্ঞতা ভক্তি এবং এসব ছাড়াও অবর্ণনীয় আর একটা কি যেন সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিল, যন্ত্রচালিতবৎ জানু পাতিয়া প্রত্যক্ষ অগ্নি-দেবতাকে প্রণাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু ধোঁয়ায় সমস্ত গর্তটা ভরিয়া উঠিল, শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল, দেখিলাম অগ্নির দীপ্তিও ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছে, তাড়াতাড়ি গর্তের মুখ হইতে চামড়াটা সরাইয়া দিলাম। ধোঁয়া বাহির হইয়া গেল, গর্তের বাতাস অনেকটা স্বচ্ছ হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

গর্জন করিয়া উঠিল বাহিরের দানবটা। এক ঝলক হিম-শীতল বাতাস আবার গর্তের মুখ দিয়া প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা বরফ। অদ্ভূতভাবে যেন অনুভব করিতে লাগিলাম, বাহিরের ওই শ্বেত দানবটা অসীম শক্তিশালী শত্রু, কোথা হইতে আসিয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়াছে, আমাকেও গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ইহাই তাহার লক্ষ্য। উহার নির্মম কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য। ভাবিতে লাগিলাম, গর্তের মুখটা কি করিয়া বন্ধ করা যায়! আগুনের ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবে অথচ বাহিরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিবে না—কি উপায়ে তাহা করা সম্ভব। আজ যেমন তোমরা নানাবিধ রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে সমস্ত বুদ্ধি নিয়োগ করিয়াও দিশাহারা হইয়া পড়িতেছ, আমিও সেদিন তেমনি ওই সামান্য ছিদ্র-টুকু বন্ধ করিবার সমস্যায় সমস্ত বুদ্ধি নিয়োগ করিয়াও দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। সেদিন উহাই আমার জীবন-মরণ সমস্যা ছিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া শেষে ঠিক করিলাম, গর্তের মুখটা সম্পূর্ণ বন্ধ না করিয়া অংশত বন্ধ করা যাইতে পারে। তাহাই করিলাম। তাহাতে বেশ খানিকটা ফলও হইল। আনন্দিত হইয়া পাথরগুলা গুছাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছি হঠাৎ বাহিরের বাতাসটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল, শুষ্ক চামড়াটা উড়িয়া চলিয়া গেল, আবরণহীন গর্তের মুখে শ্বেত দানবটা উঁকি দিয়া যেন হা-হা-রবে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। একটা বাঘ কিম্বা ভালুক গর্তের মুখে উঁকি দিলে যাহা করিতাম, কয়েকটা বড় বড় প্রস্তরফলক সজোরে সেদিকে ছুঁড়িয়া দিলাম। আশ্চর্য কান্ড, ঝড়টা হঠাৎ যেন থামিয়া গেল। গর্তের মুখ দিয়া তাড়া-তাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম, চামড়াটা এবং পাথরগুলা কুড়াইয়া আনিতে হইবে। বাহির হইয়া দেখি চামড়াটা বেশ কিছুদূরে উড়িয়া গিয়াছে, নির্মেঘ আকাশে সূর্য উঠিয়াছে। শুভ্র তুষারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন, তাহার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়াছে, বরফের উপর যেন আগুন লাগিয়াছে। মনে হইল, একটা নীরব দীপ্তির নিষ্ঠুর ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে, একটা নিঃশব্দ ভয়ঙ্কর হাসি যেন। তাড়াতাড়ি গর্তের মধ্যে ঢুকিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার চোখ খুলিতে হইল। ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সূর্য মেঘে ঢাকিয়াছে। রৌদ্রের প্রখরতা আর নাই। আবার বাহির হইলাম। ছুটিয়া গিয়া চামড়া-খানা এবং পাথরগুলা কুড়াইয়া লইলাম। কুড়াইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরিতেছি, হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম। গর্তের আশে পাশে কয়েকটা বড় বড় পাথর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল আগেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এখন সেইগুলাই বরফে ঢাকা পড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছে। তাহারই একটাতে হোঁচট খাইলাম। তীব্র আঘাত দিয়া পাথরটা আমাকে যেন একটা সত্যের সম্মুখীন করিয়া দিল। বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হইল বড় পাথর ওড়ে না। একটা বড় পাথর দিয়া যদি এই চামড়াখানাকে গর্তের

মুখে চাপা দিতে পারি তাহা হইলে হাওয়াতে চামড়াটা উড়িয়া যাইবে না। তৎক্ষণাৎ প্রস্তরফলক দিয়া বরফ খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। চিত্তে যেন নবীন প্রেরণা, নবীন উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ খুঁড়িয়া পাথরটাকে বাহির করিয়া ফেলিলাম, তাহার পর ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেটাকে গর্তের মুখে লইয়া আসিলাম, তাহার পর গর্তের মুখে চামড়াটা বসাইয়া তাহার এক ধারে পাথরটাকে চাপা দিলাম। ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য ফাঁক রাখিতে গিয়া বুঝিলাম যে, শুধু ধোঁয়ার জন্য নয়, আমার নিজের ঢুকিবার এবং বাহির হইবার জন্যও ফাঁক রাখা প্রয়োজন। আবার মেঘ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল, আবার সেই হাসিটা ফুটিয়া উঠিতেছে, ফাঁক দিয়া গর্তের ভিতর লাফাইয়া পড়িলাম। লাফাইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চীৎকার শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, কাচিন উঠিয়া বসিয়াছে এবং নিজের স্তনযুগলকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তার-স্বরে চীৎকার করিতেছে। তাহার চোখে আতঙ্ক। স্ফীত পয়োধর হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে। বরফের ভিতর হইতে তাহার অসাড় দেহটাকে যখন কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম তখন ভাবি নাই যে সে বাঁচিয়া উঠিতে পারে। দুর্দিনের খাদ্য হিসাবে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, করুণাবশত নহে। তখনকার জীবনে করুণার কোন স্থান ছিল না। যাহা করিতাম প্রয়োজনের তাগিদেই করিতাম। কাচিনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম, মনে হইতে লাগিল দেহটা প্রাণহীন হইলে এখনই আমার কাজে লাগিত। আমার অন্ধ সঙ্গিনীর দেহের খানিকটা যদিও এখনও অবশিষ্ট আছে—ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম—নাই! কয়েকখনা হাড় পড়িয়া আছে মাত্র, আর কিছুই নাই। কাচিনের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম—হ্যাঁ, ওই যে মুখে রক্তের দাগ লাগিয়া আছে, ওই-ই তাহা হইলে বাকীটা খাইয়াছে। রাক্ষসী! হঠাৎ ভয়ঙ্কর রাগ হইল, তাহাকে তাড়া করিলাম।

কাচিনও বোধ হয় ইহাই আশঙ্কা করিতেছিল, সে এক লম্ফে গর্ত হইতে বাহির হইয়া ছুট দিল; আমিও পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। একটু আগে নিদারুণ বরফের মধ্যে যে কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহা আর মনে রহিল না, একটা হিংস্র প্রবৃত্তি আমাকে আবার সেই বরফের মধ্যে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।...

কাচিন হরিণীর মতো ছুটিতেছিল। আমিও ছুটিতে লাগিলাম। দূরে প্রকাণ্ড একটা আকাশচুম্বী গাছ দাঁড়াইয়াছিল। গাছ নয়, গাছের কঙ্কাল। একটি পাতা নাই, শুষ্ক শীর্ণ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া একটা মূর্ত বিভীষিকা যেন। কাচিন আমার দিকে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া ঊর্ধ্ব-শ্বাসে সেই গাছটার দিকে ছুটিতে লাগিল। কাছে-পিঠে লুকাইবার মতো কোনও আবরণ ছিল না, চতুর্দিকে কেবল শাদা আর শাদা, কাচিন ছুটিয়া গিয়া সেই গাছটাতে উঠিতে লাগিল। একটু পরে আমিও সেই বৃক্ষতলে উপনীত হইলাম, কাচিন তখন অনেকদূর উঠিয়া গিয়াছে, আমিও উঠিতে

লাগিলাম। গাছের কাণ্ড বরফে পিছল হইয়া গিয়াছিল, বারবার পিছলাইয়া যাইতেছিলাম, তবু কিন্তু নিরস্ত হইলাম না, সেই কনকনে ঠাণ্ডা পিছল কাণ্ডটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, প্রাণপণ শক্তিতে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। একটা হিংস্র প্রতিহিংসা যেন চুলের মুঠি ধরিয়া আমাকে উপরে টানিয়া তুলিতেছিল। বিশাল গাছ, উঠিতে অনেকক্ষণ লাগিল। উঠিয়া দেখি কাচিন বন্য বিড়ালীর মতো শাখা হইতে শাখান্তরে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। একটু আগে এই ব্যক্তিই যে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কে বলিবে! জীবন যখন বিপন্ন হয় তখন আত্মরক্ষাকল্পে জীবনীশক্তি যে বহুগুণ বাড়িয়া যায় ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আহত হরিণ ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটিয়া যায়, চূর্ণিত মস্তক সর্প মরিয়াও যেন মরে না। কাচিনও যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছে সহজে ধরা দিবে না। আমাকে দেখিয়া কাচিন উপরের একটা ডালে উঠিয়া বসিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি নিষ্ঠুর নয়, হিংস্র নয়, তাহাতে ভয়ও নাই। সকৌতুক মিনতির সহিত সগর্ব স্পর্ধা মিশিয়া সে দৃষ্টি যেন অদ্ভুত একটা ভাব প্রকাশ করিতেছিল। উঁচু ডালে বসিয়া সে আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমি তাড়া করিয়া যাইতে লঘুগতিতে আরও একটু উপরে উঠিয়া গেল। আমি অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুদূর উঠিয়া গিয়াছি, হঠাৎ সে আর একটা ডাল ধরিয়া নামিয়া পড়িল! আমি ঘুরিয়া দ্রুতগতিতে সবেগে তাহাকে যেই ধরিতে গেলাম আমার পায়ের নীচের ডালটা সহসা ভাঙিগয়া গেল। বহু ঊর্ধ্ব হইতে, একেবারে নীচে পড়িয়া গেলাম। তাহার অব্যবহিত পরে কি ঘটিয়াছে আমার মনে নাই।

যখন চোখ খুলিলাম তখন দেখি অন্ধকার। শীত করিতেছে না, চারিদিকে বেশ গরম। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বুঝিতে পারিলাম একটা আরক্তিম আভা অন্ধকারকে একটু স্বচ্ছ করিয়াছে,- কাছে কোথাও আগুন আছে। তালু শুষ্ক, পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। উঠিতে যাইব সহসা অনুভব করিলাম মুখের উপর টপ টপ করিয়া জলের মতো কি যেন পড়িল, জিব দিয়া চাটিয়া দেখিলাম মিষ্ট। মাথার ঠিক পাশেই যে অন্ধকার স্তূপটা ছিল তাহা যেন একটু নড়িয়া উঠিল! হঠাৎ দেখিতে পাইলাম— কাচিন। দুই হাত দিয়া তাহার স্ফীত স্তন হইতে দুধ নিঙড়াইয়া ফেলিতেছে, আমি যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছি তাহা সে প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, আমি যে বাঁচিয়া আছি তাহাই বোধ হয় তাহার ধারণার অতীত ছিল। সে আমাকে বোধ হয় টানিয়া আনিয়াছিল আহার করিবে বলিয়া, আমি তাহাকে যেমন আনিয়াছিলাম। দুধ-ভারে স্ফীত স্তনযুগল তাহার পক্ষে বোধ হয় পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে দুধটা নিঙড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তাহা যে উৎসধারায় আমার মুখে আসিয়া পড়িতেছে ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। কি অপরূপ মিষ্ট। সহসা আমার দেহে যেন অসুরের

বল সঞ্চারিত হইল। নিমেষের মধ্যে উঠিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিলাম।

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। তুষারপাতের জন্য জীবনে যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার দুঃসহতাও যেন আর নাই। নূতন পারিপার্শ্বিকে নূতন অবস্থার মধ্যে যে ভীতি যে অনিশ্চয়তা মনকে প্রতিমুহূর্তে আকুল করিয়া তুলিতেছিল তাহা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। গর্তের বাহিরে যে শ্বেত-দানবটা কখনও নিঃশব্দে কখনও সগর্জনে চরাচরকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছিল, গর্তের ভিতর যে তাহার প্রতাপ ততটা নাই এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হওয়াতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। গর্তের মুখটার চতুর্দিকে বড় বড় পাথর বসাইয়া নাতিউচ্চ একটি দেওয়াল প্রস্তুত করিয়াছি, পাথরের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফাঁক আপনিই থাকিয়া গিয়াছে, সেই পাথরের দেওয়ালের উপর মহিষের চামড়া বসাইয়া পাথর দিয়া চাপা দিয়াছি। ঝড়ে তাহা আর উড়িয়া যাইতেছে না। গর্তের ভিতর হইতে ধূম নির্গমনেরও আর বাধা নাই। ইহাতে প্রথমে একটা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, ধূম নির্গমনের নিরাপদ উপায় আবিষ্কার করিয়া নিজেদের গমনাগমনের পথ অনেকটা রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। পাথরের দেওয়ালে একটা বাতায়নের মতো রাখিতে হইয়াছিল। বেশি ঝড় বহিলে সেটাকে দ্বিতীয় একটা চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইত। তখন বাঁধিবার কৌশল শিখি নাই, আমি আর কাচিন চামড়ার দুই প্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কাচিনকে আর হত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই, খাদ্যের জন্য তাহাকে হত্যা করিবার প্রয়োজনও আর ছিল না, তাহার বুকেই প্রচুর খাদ্য ছিল। তাহা দিতে তাহার আপত্তিও ছিল না। দুধের ভারে ফুলিয়া তাহা টনটন করিত, আমি পান করিলে সে আরামই অনুভব করিত যেন। শিশুর জন্য যে খাদ্য এতকাল মাতৃবক্ষে সতত উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি, তাহা যে বয়স্ক ব্যক্তিরও কাজে লাগিতে পারে তাহা ইতিপূর্বে ধারণার অতীত ছিল। এই নূতন আবিষ্কারটা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে কত অধ্যায়ই না রচনা করিয়াছে! এই আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে কত যে শিশুহত্যা করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কত জননী যে দলে দলে শিশু লইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহার ইতিহাসও বহুবিস্তৃত। রমণীকে কাছে রাখিবার জন্যই অবশেষে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লইয়া পিতার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলাম। এই সমস্তর মূলে ছিল সেদিনের সেই আকস্মিক আবিষ্কার।

না, কাচিনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। কাচিনের হিংস্র ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছিল। আমাকে হত্যা করিয়া আমার মাংস খাইবার প্রবৃত্তি তাহারও আর ছিল না। তাহাকে প্রথমে একটা হিংস্র বন্যবিড়ালীরূপেই কল্পনা করিয়াছিলাম, এই রূপেই তখন সকলের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু

পরে দেখিলাম কাচিন একটু অস্বাভাবিক; আমার প্রতি তাহার একটা বাৎসল্যভাব জাগিয়াছে। শুধু সে যে আমাকে স্তন্যপান করাইত তাহা নয়, আমার জন্য অন্য খাদ্যও সংগ্রহ করিয়া আনিত। আমরা উভয়েই অস্পষ্টভাবে যেন বুঝিয়াছিলাম যে, নিদারুণ এই দুর্যোগে আমরা পরস্পরের সহায়, ওই শ্বেত দানবটা আমাদের উভয়েরই শত্রু, উহার বিরুদ্ধে সমবেতভাবেই দাঁড়াইতে হইবে। ঠিক স্পষ্টভাবে এমন করিয়া হয়তো সেদিন বিশ্লেষণ করি নাই কিন্তু অস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলাম যে, দেওয়ালের ওই ফাঁকে চামড়াটা ঠিকমতো ধরিয়া যদি বাহিরের ওই ঝড়ের হিম-তীক্ষ্ণ দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে চামড়াটা দুইজনে মিলিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। একজনের দ্বারা হইবে না। কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে এইভাবে দাঁড়াইয়া কাটিয়া গিয়াছে!

হঠাৎ কাচিনই একদিন অন্য আর একটা পন্থা আবিষ্কার করিল। মৃগ-শাবকটাকে হত্যা করিয়া কয়েকদিন বেশ কাটিয়াছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার খাদ্যসমস্যা দেখা দিল। দুইজনকেই আবার গর্ত হইতে বাহির হইয়া খাদ্য সন্ধানে লিপ্ত হইতে হইল। চারিদিকে অনিশ্চিতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বায়ুর বেগ কমিলেই বাহির হইয়া পড়িতাম। খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মৃত অরণ্যের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতাম। যে সব গাছের ফল আমাদের খাদ্য ছিল সেই সব গাছের তলায় গিয়া খুঁড়িয়া দেখিতাম, বরফের তলায় ফল পাওয়া যায় কি না। কখনও মিলিত, কখনও মিলিত না। খুঁড়িতে খুঁড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে দুই একটা মৃত পশু পক্ষীও পাওয়া যাইত। কাচিনের এ বিষয়ে স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল একটা। সে গন্ধ পাইত, না, অন্য উপায়ে আবিষ্কার করিত, জানি না ঠিক, কিন্তু কাছে-পিঠে কোথাও কোনও মৃত পশু বা পক্ষী থাকিলে সে ঠিক গিয়া খুঁড়িয়া বাহির করিত। দিগন্ত-বিস্তৃত তুষার-প্রান্তরের মধ্যে সমস্তই নিশ্চিহ্ন, জলাশয় পর্যন্ত তুষারাচ্ছন্ন, তাহার মধ্যে কাচিন কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারিত, কোথায় মৃত জন্তু ঢাকা আছে। যখন কোনও কিছুই মিলিত না, গাছের শিকড় খুঁড়িয়া আনিতাম। কন্দও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এ সব ছাড়াও আর একটা প্রধান কাজ ছিল কাঠ সংগ্রহ করা। খাদ্যের অপেক্ষাও অগ্নি ছিল তখন বেশি প্রয়োজনীয়। দুই-একদিন অনাহারে কাটানো বরং সম্ভব ছিল, কিন্তু অগ্নির অভাবে একদিনও চলিত না। পরবর্তী যুগের সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মতো অতিশয় সযত্নে আমরা অগ্নি রক্ষা করিতাম। গর্তে ফিরিয়া প্রথমেই দেখিতাম অগ্নিকুণ্ডে প্রদীপ্ত অঙ্গার আছে কি-না। না থাকিলে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িতাম। পাথরে পাথর ঠুকিয়া অগ্নি না জ্বালানো পর্যন্ত স্বস্তি ছিল না সেকালে। অরণ্য মরিয়া গিয়াছিল, সুতরাং কাঠের অভাব ছিল না। কিন্তু শুকনো কাঠ পাওয়া যাইত না। সমস্তই বরফের জলে আর্দ্র। গর্তের মধ্যে আগুনের তাপে কিছু কাঠ সেইজন্য সর্বদা

শুকাইয়া রাখিতে হইত। মৃত জন্তুর হাড়, বিশেষ করিয়া পাখীর পালকও ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিতাম। কয়েকদিন হইতে ক্রমাগত বরফ পড়িতেছিল। উপর্যুপরি তিন দিন গর্ত হইতে বাহির হইতে পারি নাই। কাচিন যে মৃত শূকরটা খুঁড়িয়া আনিয়াছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাচিনের বুকেও আর দুধ নাই, শুকাইয়া গিয়াছে। অবিলম্বে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কাচিন গর্তের মধ্যে উসখুস করিতেছিল, আমার দিকে মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া দূরে সরিয়া বসিতেছিল। তাহার চোখে মুখে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল ক্রমশ। সে যেন বুঝিতে পারিতেছিল যে তুষারপাত যদি বন্ধ না হয় তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। হঠাৎ সে আগাইয়া আসিয়া দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, স্তনটা আমার মুখে তুলিয়া দিল। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তাহাকে ঠেলিয়া দিলাম। বিমর্ষ হইয়া সে আবার সরিয়া বসিল। বাহিরে অবিরাম তুষার পড়িতেছে, হাওয়া নাই, সূর্যালোক নাই। হঠাৎ গর্তের একধারে খুট করিয়া শব্দ হইতেই কাচিন সেইদিকে ছুটিয়া গেল। উপুড় হইয়া কি দেখিল, ফোঁস ফোঁস করিয়া মাটি শুঁকিতে লাগিল, তাহার পর একটা প্রস্তর-ফলক লইয়া সেই জায়গাটা খুঁড়িতে শুরু করিয়া দিল। আমিও ঔৎসুক্যভরে আগাইয়া গেলাম। কাচিন আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত। পরমুহূর্তেই সে গর্ত হইতে একটা ইঁদুর টানিয়া বাহির করিল। নিমেষের মধ্যে আমিও সক্রিয় হইয়া উঠিলাম এবং কাচিনকে সরাইয়া নিজেই খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। অনেক ইঁদুর পাওয়া গেল, গোটা-কয়েক বড় বড় এবং অনেকগুলি বাচ্ছা। শুধু যে খাদ্যসমস্যারই সমাধান হইয়া গেল তাহা নয়, আর একটা জিনিসও আবিষ্কার করিলাম। ইঁদুরেরা গর্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে আমাদের গর্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, আসিবা-মাত্র তাহারা কাচিনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আরও ইঁদুর পাইবার আশায় আমরা তাহাদের গর্তটা অনুসরণ করিয়া খুঁড়িয়া চলিলাম। খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটির নীচে অনেকদূর চলিয়া গেলাম। আঁকাবাঁকা প্রকাণ্ড একটা গর্ত বাহির হইয়া পড়িল। আরও কিছুদূর গিয়া বাহিরের আলো দেখিতে পাওয়া গেল। গর্তের বহির্মুখটা। সেই মুখটা খুঁড়িয়া বড় করিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম আমাদের গর্তের মুখ হইতে সেটা অনেক দূরে। আমাদের গর্ত-প্রবেশের দুইটা মুখ হইল। বাহিরে ঝড় উঠিলে এতদিন আমাদের গর্তের দেওয়ালে আমাদের যাতায়াত করিবার জন্য যে ফাঁক ছিল তাহাতে চামড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সে প্রয়োজন আর রহিল না। পাথর দিয়া সে ফাঁকটাকে বন্ধ করিয়া দিলাম। মূষিক-বিবরটাকেই দুইজনে মিলিয়া খুঁড়িয়া বিস্তৃততর করিয়া লইলাম, ইহাই আমাদের বাহিরে যাইবার পথ হইল।

এইভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল। যাহাকে আকস্মিক উৎপাত বলিয়া

মনে হইয়াছিল তাহাই ক্রমশ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মাটির তলায় কাচিনকে লইয়া নূতন সংসার পাতিলাম। কত সংসারই যে পাতিয়াছি! সকলের সব কথা মনে নাই। আমার এই কাহিনীতে হয়তো পৌর্বাপর্যও রাখিতে পারিব না। অতীতকে কিন্তু ভুলিতে পারি নাই। কাচিনকে লইয়া নূতন সংসার পাতিলাম, কিন্তু অতীত অবলুপ্ত হইল না। বিচিত্র পশুপক্ষীপূর্ণ সেই জটিল অরণ্যটা স্বপ্নে মাঝে মাঝে দেখা দিত। জাগিয়া উঠিয়া ভাবিতাম বাঘ-ভালুক-সজারু-শূকর-সমন্বিত বহুবিধ পতঙ্গ-পক্ষী কলরব মুখরিত লতা-পুষ্প-অলংকৃত সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি কোথায় গেল। মাঝে মাঝে মনে পড়িত আমার পূর্ব পরিবারকে, ক্ষুধার জ্বালায় যাহাদের একে একে হত্যা করিয়াছিলাম কিম্বা আমার ভয়ে যাহারা পলাইয়া গিয়াছিল তাহাদের। মনে পড়িত, কিন্তু অনুতাপ হইত না। অন্যায় করিয়াছি ইহা অনুভব করিবার মতো মনোবৃত্তি তখনও হয় নাই। ন্যায়-অন্যায় বলিয়া কোনও বোধ তখন ছিল না। যাহা করিতাম প্রয়োজনের তাড়নায় অনিবার্য বলিয়া করিতাম। অতীতকে কিন্তু মনে পড়িত। সে যে আছে তাহা বিশ্বাস করিতাম। অন্ধকার মাটির তলায় শীত-তীক্ষ্ন তুষার পরিবেষ্টনীর মধ্যে আলোকোজ্জ্বল ঈষদুষ্ণ শ্যামল দিনগুলির স্বপ্নে সুন্দর অতীত সুন্দরতর হইয়া উঠিত। তাহাকে অস্বীকার করিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু যে বর্তমান সেই অতীতকে নিধন করিয়াছে তাহাকেও যে খারাপ লাগিত তাহা নয়। তাহাকেও ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যাকিরণে, ঊষাকালে, মেঘাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরে, এমন কি ঝটিকা-মত্ত দুর্যোগেও তুষারের যে নব নব রূপ দেখিতে শিখিয়াছিলাম তাহা ভয়ংকর নয়, মনোহর। কাচিনের নূতন একটা রূপের আভাস অতি ক্ষীণভাবে মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে যে কেবল আমার দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার যন্ত্রমাত্র, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপরই তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে, এ বোধও ক্রমশ অপসারিত হইতেছিল। সেই বর্বর-জীবনে আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে কাচিন না থাকিলে আমি বাঁচিতে পারি না। প্রাচুর্যের মধ্যে স্বকীয় বলিষ্ঠতাকে সম্বল করিয়া হয়তো একা বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, কিন্তু বিপদের সময় দুঃখের দিনে সঙ্গী না থাকিলে চলে না। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন খুব বেশি ছিল না, কিন্তু যতটুকু ছিল তাহাও একা মিটাইবার সাধ্য আমার ছিল না। খাদ্যের সন্ধানে বাহির হইলে সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, দুইজনে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া বহু স্থান খনন করিয়া তবে হয়তো কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতাম। একা থাকিলে হয়তো অনাহারেই মৃত্যু হইত। সব দিন বাহির হইতেও পারিতাম না। ঝড় উঠিলে গর্তে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। অনেক সময় দিনের পর দিন ঝড় চলিত। এ অবস্থায় কাচিন আমার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। ঝড় থামিলে দুইজনে বাহির

হইতাম। দিগন্ত-বিস্তৃত তুষার-প্রান্তরের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতাম। ইহার মধ্যে খাদ্য কোথায়। কাচিনের একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল, সে ইহারই মধ্যে খাদ্যের ঠিক সন্ধান পাইত। সে হরিণীর মতো দ্রুতপদে এদিকে-ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইত, এখানে ওখানে শুঁকিত, তাহার পর একটা জায়গা খুঁড়িতে আরম্ভ করিত, খুঁড়িয়া একটা মৃতজন্তু বাহির করিয়া ফেলিত। সমাধিস্থ মৃতজন্তু অনেক ছিল কিন্তু তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করাই ছিল সমস্যা। কাচিন এ বিষয়ে পটু ছিল। ইহা ছাড়া কাচিনের আর একটা রূপও আমাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। সে মাঝে মাঝে অকারণ আবেগে কেন যে আমার গলা জড়াইয়া ধরিত, কেন যে বিহ্বল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত বুঝিতে পারিতাম না। বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু মুগ্ধ হইতাম।

...দিনের পর দিন এইভাবে অনেক দিনই কাটিয়া গেল। ক্রমে কাচিন আমার সন্তানের জননী হইল। একটি, আর একটি, আরও একটি...পরিবার বাড়িতে লাগিল।

দিনের পর দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন একটা ভয়ংকর কান্ড ঘটিল। গভীর রাত্রে একদিন গর্তের ছাদটা আমাদের মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িল। আমরা ঘুমাইতেছিলাম, আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। অন্ধকারে প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আমি লাফাইয়া গর্তের এক কোণে সরিয়া গেলাম এবং আতঙ্কে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কি হইল! ক্ষণপরেই ভাঙা ছাতের ভিতর দিয়া এক ঝলক চাঁদের আলো গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন বুঝিতে পারিলাম হাতীর মতো বিরাট একটা জন্তু গর্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার পা চারিটা গর্তের মধ্যে, মুখটা বাহিরে, গলার ভিতর হইতে বিকট একটা শব্দ বাহির হইতেছে। চীৎকার, ঘড়ঘড় এবং ফোঁস-ফোঁসের এক ভয়াবহ সমন্বয়। যদিও আমার প্রাণসংশয় তবু বহুকাল পরে পুরাতন বন্ধু হাতীকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে তাহার একটা পায়ের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলাম। স্পর্শ করিয়াই কিন্তু শিহরিয়া উঠিতে হইল। বড় বড় লোম! এ কি! পেটের তলার দিকে হাত বাড়াইয়া দেখিলাম সেখান হইতেও বড় বড় লোম ঝুলিতেছে। লোমশ হাতী তো কখনও দেখি নাই! এ কি অদ্ভুত জন্তু! হাতী তো নয়। ইহা লইয়া বেশিক্ষণ মাথা ঘামাইবার অবসর কিন্তু মিলিল না, পরক্ষণেই বাহিরে একটা কলরব উঠিল। বহুলোকের কলরব, মানুষের কণ্ঠস্বর, ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে! হঠাৎ জন্তুটা আবার নিদারুণ আর্ত-নাদ করিয়া উঠিল। মনে হইল একটা বিশাল গাছ যেন মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। সিংহের গর্জন শুনিয়াছি, ব্যাঘ্রের হুংকার শুনিয়াছি,

কিন্তু এমন চীৎকার কখনও শুনি নাই। ভয়ে সমস্ত শরীর হিম হইয়া গেল। বাহিরে কলরব বাড়িতে লাগিল, ভিতরে জন্তুটা আছাড়ি-পিছাড়ি করিতেছে, মাঝে মাঝে ঘৎঘৎ জাতীয় শব্দ শুনিয়া মনে হইতে লাগিল জানোয়ারটার গায়ে বর্শার মতো কিছু একটা বিঁধিতেছে, প্রত্যেক শব্দের পর জানোয়ারটা আরও অস্থির হইয়া উঠিতেছে, আরও চীৎকার করিতেছে। গর্তের বাহিরে একটা তাণ্ডব চলিতে লাগিল। গর্তের ভিতর হইতেও সহসা আর্ত চীৎকার উঠিল। কাচিন এবং তাহার সন্তানবর্গের চীৎকার। আমি সহসা জানোয়ারটার পায়ে কামড়াইয়া ধরিলাম। লোমে সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল, কিন্তু তবু আমার দাঁত তাহার চামড়া পর্যন্ত পঁহুছিতে পারিল না। তখন দুই হাত দিয়া তাহার লোম ছিঁড়িতে লাগিলাম। যদিও ছেঁড়া কঠিন তবু খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া পায়ের খানিকটা অংশ দংশনযোগ্য করিয়া লইয়া আবার দাঁত বসাইলাম। দাঁত খানিকটা বসিল, কিন্তু ভাল করিয়া বসিল না। আবার কামড়াইলাম, আবার, আবার...। ইহা ছাড়া তখন আর কিছু করিবার ছিল না। যেমন করিয়া হোক এই আততায়ীর কবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। উন্মাদের মতো কেবল কামড়াইতে লাগিলাম। জানোয়ারটা মরীয়া হইয়া অবশেষে হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরের কলরবটা নিকট-বর্তী হইতেছিল। গর্তের ভিতরে কিন্তু আর কোন শব্দ ছিল না। চাঁদের আলোয় গর্ত ভরিয়া গিয়াছিল, সেই আলোয় দেখিলাম, মৃত্যু—নিষ্ঠুর ভয়ংকর মৃত্যু—সকলকে নীরব করিয়া দিয়াছে। হিংস্র হিমানীর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া মাটির তলায় যে সংসার পাতিয়াছিলাম নিমেষের মধ্যে তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। কেহ নাই...। আমিই কেবল বাঁচিয়া আছি। কাচিনের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার মাথাটা থেঁতলাইয়া চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তবু মনে হইল চোখ দুইটা যেন আমার দিকেই চাহিয়া আছে। একলম্ফে গর্ত হইতে বাহির হইয়া গেলাম। পলাইয়া গিয়াও নিস্তার পাই নাই। কাচিনের সেই চক্ষুর দৃষ্টি বহুদিন আমার রাত্রির নিদ্রা হরণ করিয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। আকাশের নক্ষত্রে, হরিণের চাহনিতে, বহু বিচিত্র ইঙ্গিতে কাচিনের সে দৃষ্টি বহুকাল আমাকে অনুসরণ করিয়াছে।

...বাহিরে আসিয়া দেখিলাম বহু লোক। একটা জনতা। এত লোকের একত্র সমাবেশ আর কখনও দেখি নাই। অভূতপূর্ব একটা ব্যাপার। খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র তুষার, যতদূর দৃষ্টি যায় উদ্ভাসিত রজত-কান্তি চতুর্দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু দাঁড়াইয়া উপভোগ করিবার উপায় নাই, নিদারুণ ঠাণ্ডা। তবু খানিক-ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়েই বোধ হয় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। মানুষ তাহা হইলে নিঃশেষ হয় নাই! শ্বেত দানবটার সমস্ত প্রতাপকে তুচ্ছ করিয়া সে এখনও বাঁচিয়া আছে। শুধু তাহাই নয়, শত্রু নিপাত করিতেছে।

যে হিংস্র জন্তুটা এখনই আমার সমস্ত সংসারটাকে পদদলিত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল সকলে মিলিয়া সেই লোমশ পর্বতাকার জন্তুটাকে ঘিরিয়াই বড় বড় বল্লম ছুঁড়িতেছে। সহসা যেন উপলব্ধি করিলাম একক মানুষের দিন ফুরাইয়াছে। বাঁচিতে হইলে মানুষকে দল বাঁধিয়া বাঁচিতে হইবে। দৃশ্য-অদৃশ্য বিবিধ শত্রু চতুর্দিকে। একা সে বাঁচিতে পারে না। কে ইহারা? কবে ইহারা দল বাঁধিল? মনে হইল, ইহারা যে-ই হউক, যেভাবেই ইহারা দল বাঁধিবার প্রেরণা পাইয়া থাকুক, ইহারাই সংকটত্রাতা। যদিও শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিলাম তবু কেমন যেন অননুভূতপূর্ব একটা শক্তি অন্তরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। মনে হইল এখন আমি আর একা নই, যে কোনও শত্রুর বিরুদ্ধে এখন দাঁড়াইতে পারিব। সম্মুখে একটা বল্লম পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেলাম। আবার নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

সত্যই নূতন জীবন। একেবারে অভিনব। এতকাল যে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি তাহাতে দলের প্রভুত্ব ছিল না। আমিই আমার সংসারের রাজা ছিলাম। পারতপক্ষে দ্বিতীয় কোন সমর্থ পুরুষের কর্তৃত্ব, এমন কি, সান্নিধ্য পর্যন্ত আমি সহ্য করি নাই। বাহিরের কোনও লোককে কাছেই ঘেঁষিতে দিতাম না, নিজের পরিবারের মধ্যেও বালক সাবালক হইলে তাহাকে দূর করিয়া দিতাম। ইহাই নিয়ম ছিল। কেহ কাহারও সান্নিধ্য পছন্দও করিত না। অরণ্যে পর্বতে ব্যাঘ্র, সিংহ, সর্প, গণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়া শীতাতপ সহ্য করিয়া একাই এতদিন আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী যখন বরফে ঢাকিয়া গেল, পুরাতন অরণ্য, পুরাতন পশুপক্ষী, পুরাতন পারিপার্শ্বিক সহসা যখন পরিবর্তিত হইয়া গেল তখন একার শক্তিতে আর কুলাইল না। যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহাদের উপলব্ধি করিতেই হইল যে এই ভয়ানক শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে মিলিত হইতে হইবে। দল বাঁধিতে হইবে। সমর্থ মানুষ মাত্রকেই আর শত্রু মনে করিলে চলিবে না। তাহার সাহায্য লইতে হইবে। সমাজের পত্তন হইল। আমি সহসা সেই সমাজভুক্ত হইয়া গেলাম।

...সেদিন রাত্রেই সেই বিরাট ম্যামথটাকে সকলে মিলিয়া হত্যা করিলাম। সেই দিনই লক্ষ্য করিলাম মানুষ পাথর দিয়া কি সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। আমি একটা পাথরের বল্লম কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। পরে দেখিলাম শুধু বল্লম নয়, পাথরের কুঠারও অনেকের হাতে আছে। ম্যামথটা বল্লমবিদ্ধ হইয়া যখন পড়িয়া গেল তখন কয়েকজন তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর কুঠার চালাইতে লাগিল, তোমরা এখন যেমন বৃক্ষকাণ্ডে কুঠার চালাইয়া থাকো অনেকটা সেই রকম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই

তাহার দেহ হইতে পদচতুষ্টয় বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার পর প্রত্যেকটি পা টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হইল এবং আমরা প্রায় প্রত্যেকেই একটা করিয়া টুকরা পাইলাম। পাইবামাত্র সকলে খাইতে শুরু করিয়া দিলাম। ম্যামথের মাংস পূর্বে কখনও খাই নাই। বড় ভাল লাগিল। কয়েকজনে মিলিয়া শুঁড়টা কাটিয়া লইল এবং টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিল। এইরূপে ম্যামথের বিরাট দেহটা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যে যতটা পারিলাম আহার করিতে লাগিলাম।

...প্রভাত হইল। দেখিলাম মাংসল অংশগুলি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অস্থি, চর্ম এবং প্রকাণ্ড বক্র দাঁত দুইটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু বাকি নাই। দিনের আলোকে দলটাকে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলাম। শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকও অনেক আছে। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিলাম। প্রত্যেকেরই গায়ে একটা আবরণ রহিয়াছে। লোমশ চামড়ার আবরণ। ম্যামথের চামড়া। ভুক্তাবশিষ্ট ম্যামথটাকে সকলে মিলিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। আমিও একপ্রান্ত ধরিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলাম। কেহ আপত্তি করিল না। কাল রাত্রে যখন বল্লম কুড়াইয়া লইয়া ইহাদের দলে যোগ দিয়াছিলাম তখনও কেহ আপত্তি করে নাই। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। একজন সমর্থ পুরুষ আর একজনকে এত নিকটে পাইয়াও কিছু বলিতেছে না, ইহা প্রথমটা বিশ্বাস করিতেই বাধিতেছিল, নিজেরই হিংস্রপ্রবৃত্তি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। সুযোগ ও সুবিধা থাকিলে আমিই হয়তো আমার পার্শ্ববর্তী লোকটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। কিন্তু পারিলাম না, সহসা হইল না। যদিও সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছিলাম না তবু অস্পষ্টভাবে বুঝিতেছিলাম ইহারা শত্রু নয়, বন্ধু। ম্যামথের দেহটা টানিয়া সকলের সঙ্গে চলিতেছিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পারিলাম না, সামর্থ্যে কুলাইল না। শীতে সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ বরফের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল জানি না।

অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হইল তখন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না আমি কোথায় আছি। একটা অন্ধকার ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল গহ্বর ছাড়া আর কিছুই ঠাহর হইল না। চতুর্দিকে সাপের মতো কুণ্ডলীকৃত কি যেন আমাকে জড়াইয়া আছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম একটা ফাঁক দিয়া আলো আসিতেছে। চাঁদের আলো। হামাগুড়ি দিয়া সেই ফাঁকটার কাছে আসিলাম, হাত দিয়া ঠেলিতেই সেটা আরও ফাঁক হইয়া গেল, আমি বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম এতক্ষণ আমি ওই মৃত ম্যামথটার উদর-গহ্বরে ছিলাম। যাহারা ম্যামথটাকে টানিয়া আনিয়াছে তাহারা বোধ হয় হত-চেতন আমাকেও উহার পেটের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোথায় গেল তাহারা। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই। চতুর্দিকে বরফ। অদূরে একটা পাহাড়ের মতো দেখা যাইতেছে। একটু আগাইয়া

দেখিলাম পাহাড়ের শ্রেণী। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। হঠাৎ ভয় হইল। পুরাতন সংস্কারটা যেন সাবধান করিয়া দিল—উহারা তোমাকে আহার করিবার জন্যই বহন করিয়া আনিয়াছে, তুমি যেমন কাচিনকে বহন করিয়া আনিয়াছিলে। বাঁচিতে চাও তো পালাও। ছুটিতে শুরু করিলাম। সেই পাহাড়টার দিকেই ছুটিতে লাগিলাম, আবার বরফে পা অবশ হইয়া যাইতে লাগিল। তবু কিন্তু থামিলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়াই নজরে পড়িল কাছেই কয়েকটা বড় বড় গাছ রহিয়াছে। ঠিক গাছ নয়, গাছের কঙ্কাল। একটি পাতা নাই। অসংখ্য ডালপালা বিস্তার করিয়া তবু দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের পাদমূলে একটা গুহাও রহিয়াছে। শীতে সর্বাঙ্গ জমিয়া যাইবার মতো হইয়াছিল, আশ্রয়ের আশায় তাড়াতাড়ি গুহার দিকে ছুটিলাম। গুহায় ঢুকিতে গিয়া কিন্তু বাধা পাইলাম। অতিশয় তীব্র একটা দুর্গন্ধ আমাকে যেন থামাইয়া দিল। কিন্তু বাহিরে এত শীত যে দাঁড়াইয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। সাহসে ভর করিয়া অবশেষে গুহাতে ঢুকিলাম। বেশ বড় গুহা। কিছু দূর প্রবেশ করিবার পরই কিন্তু একটা চাপা তর্জন শুনিতে পাইলাম। গর র্ র্ র্ । পরমুহূর্তেই ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইল এবং আমার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিল বিরাট একটা শ্বেত-ভল্লুক। প্রাণের দায়ে মানুষ অসাধ্য সাধন করে। যে আমি শীতে প্রায় চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম সেই আমি শুধু যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে পারিলাম তাহা নয়, একটা বৃক্ষেও আরোহণ করিতে পারিলাম। একটি পত্রহীন বৃক্ষের সু-উচ্চ ডালে উঠিয়া আমি তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম। চারিদিকে শাদা বরফ, অদূরে বিরাট একটা পাহাড়, রজতকান্তি জ্যোৎস্নায় প্রেতিনীর মতো নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, গাছের তলায় ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া আছে শ্বেত-ভল্লুকটা। এই অদ্ভুত পরিবেষ্টনী আমার চীৎকারে যেন শিহরিয়া উঠিল। চীৎকার করিতে করিতে সভয়ে লক্ষ্য করিলাম ভল্লুকটা গাছে উঠিবার উপক্রম করিতেছে। সত্যই যদি উপরে উঠিয়া আসে গাছ হইতে লাফাইয়া পড়া ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু কিছুদূর উঠিয়াই ভল্লুকটা লাফাইয়া নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠের চীৎকারও শুনিতে পাইলাম। দেখি সেই নূতন মানুষের দল বড় বড় বর্শা হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ভল্লুকটা ছুটিতে ছুটিতে শ্বেত-প্রান্তরের মধ্যে যেন মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল। কয়েকজন তবু তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে ছাড়িল না। যাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহারা বৃক্ষতলে আসিয়া সমবেত হইল এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী ও চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু ভাবে বোধ হইতেছিল তাহারা আমাকে নামিয়া আসিতে বলিতেছে। আমারও আর গত্যন্তর ছিল না, অতিশয় ভয়ে ভয়ে নামিয়া পড়িলাম। উহাদের ভাবগতিক যদি মন্দ বুঝি

তখন আবার ছুটিতে আরম্ভ করিব। ভাবগতিক কিন্তু মন্দ মনে হইল না। নামিবামাত্র তাহাদের একজন ইঙ্গিতে আমাকে অনুসরণ করিতে বলিল। আমি নীরবে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অনুসরণ করিবার পর দেখিলাম পুনরায় সেই নিহত ম্যামথটার সমীপবর্তী হইয়াছি। পূর্বাকাশ ঊষার রক্তিম স্বর্ণাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই দেখিলাম ম্যামথটাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। আমিও বসিলাম। যাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল তাহারাও বসিয়া গেল এবং এক-একটি প্রস্তরনির্মিত অস্ত্র বাহির করিয়া ম্যামথের চামড়া ছাড়াইতে শুরু করিল। আমার কোন অস্ত্র ছিল না, আমি নখ দিয়া, দাঁত দিয়া এবং হাত দিয়া টানাটানি করিতে লাগিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম দলে দলে আরও অনেক আসিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা ... দলে দলে ... পিপীলিকার সারির মতো ...। দানবটার মৃত্যু-সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার দেহের যে যতটুকু পারে লইয়া যাইবে। সকলে কিন্তু ম্যামথটার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল না। যাহাদের হাতে অস্ত্র আছে তাহারাই কেবল আসিয়া চামড়া ছাড়াইতে লাগিল। বাকী সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে তুমুল চীৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। শত্রু-নিধন-পুলকিত সম্মিলিত মানবের জয়ধ্বনিতে বারম্বার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। এ জাতীয় অনুভূতি আমার জীবনে এই প্রথম।

...কলকণ্ঠের হাস্যধ্বনিতে সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখিলাম অদ্ভুতভাবে সজ্জিতা ও রঞ্জিতা একটি যুবতী আমাকে দেখাইয়া তাহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। জুমনি। তাহার গলায় ঝিনুকের মালা, মুখে কপালে লাল ও হলুদ রঙ মাখানো, পরিধানে চামড়ার ঘাগরা। তাহার সঙ্গিনীদেরও কেহ কেহ রঙ মাখিয়াছে দেখিলাম। একজনের নাকের মধ্যে অদ্ভুত একটা অলঙ্কারও রহিয়াছে। পরবর্তী যুগে যে স্থানে তোমাদের স্ত্রীলোকেরা নোলক দুলাইবে সেই স্থানে আঙ্গুলের মতো মোটা একটা হাড় গোঁজা আছে। ইহারা সকলেই একটা অদ্ভুত ভাষায় পরস্পরের সহিত কথা বলিতে-ছিল, আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আভাসে শুধু এইটুকু বুঝিতেছিলাম যে কিসের যেন একটা আয়োজন চলিতেছে। ম্যামথের দাঁত দুইটা কাটিয়া আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে, খানিকটা মাংসও পৃথকভাবে রাখা আছে দেখিলাম। তাহার পর সহসা জুমনি উচ্চকণ্ঠে কি একটা আদেশ দিল। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমিও দাঁড়াইলাম। ম্যামথের দাঁত দুইটা ও আলাদা করিয়া রাখা সেই মাংস লইয়া তিনজন আগাইয়া গেল। জুমনি, তাহার সঙ্গিনীগণ এবং বাকি সকলে তাহাদের অনুসরণ করিল। আমিও করিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, বিরাট একটা গর্ত খোঁড়া রহিয়াছে। একটু দূরেই সেই পাহাড়টা এবং পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা গুহা দেখা যাইতেছে। আমরা গর্তটার কাছে সমবেত হইবামাত্র গুহার ভিতর হইতে কয়েকজন একটা

মৃতদেহকে বহন করিয়া লইয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, শবের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। মাথাটা নিষ্পিষ্ট, চোখ, মুখ, নাক, কান কিছুই বোঝা যায় না, একটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড কেবল। সেই মৃতদেহটিকে ধরাধরি করিয়া সকলে গর্তের ভিতর নামাইয়া দিল। দেখিলাম, গর্তের ভিতর তাহার জন্য একটি প্রস্তর-শয্যাও প্রস্তুত করা আছে। তাহার মাথাটা একটা পাথরের বালিশের উপর রাখা হইল। তাহার পর সেই গর্তের ভিতর সেই ম্যামথের দাঁত, ম্যামথের মাংস, কিছু কন্দ এবং কয়েকটা অস্ত্রশস্ত্র সাজাইয়া দেওয়া হইল। জুর্মানি নিজের হাতেই সেগুলি সাজাইয়া দিল। সাজাইয়া দিবার পর সকলে মিলিয়া সেই সমাধি-গহ্বরকে ঘিরিয়া শুরু করিল নৃত্য। শুধু নৃত্য নয়, সশব্দ নৃত্য। আকাশের দিকে মুখ ও হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে তাহারা বিকট একটা শব্দ করিতে লাগিল। তাহা গান নয়, ক্রন্দন নয়, আর্তনাদও নয়। তাহা যেন আক্রোশে আস্ফালন, অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে তাহা যেন তর্জন। নাচিতে নাচিতে তাহারা প্রত্যেকেই খানিকটা করিয়া মাটি ফেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। গর্ত ক্রমশ ভরিয়া গেল। যদিও আমি উহাদের প্রতিটি কার্যকলাপ অনুসরণ করিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করিতে আর কখনও দেখি নাই। আমি মৃত ব্যক্তিকে আহার করিয়াছি, তাহাকে এভাবে মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলার কোনও অর্থ আমার বুদ্ধিতে আসিতেছিল না। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল যে, ভবিষ্যতের জন্য বোধ হয় ওটাকে রাখিয়া দেওয়া হইল। অন্য কোনও জন্তু যাহাতে না খাইয়া যায়, তাই বোধ হয় মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিতেছে। একটু পরে লক্ষ্য করিলাম, নাচিতে নাচিতে সকলে আবার ফিরিয়া যাইতেছে। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। ম্যামথটার কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম, বৃহদাকার কয়েকটা শকুনিজাতীয় পাখী ম্যামথটাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে-ছিল, আমাদের দেখিতে পাইয়া উড়িয়া গেল।

আবার সকলে আসিয়া ম্যামথটাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলাম। জুর্মানি ও তাহার সঙ্গিনীরা পাহাড়ের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। আমরা বসিয়া ম্যামথের চামড়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। আমি নখ ও দাঁতের সাহায্যেই করিতে ছিলাম। ইহাদের ভাষা আমার বোধগম্য না হইলেও একটা জিনিস ক্রমশ আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। যাহারা চামড়া ছাড়াইতেছে, তাহারা ভৃত্যজাতীয় এবং যাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা মনিব সম্প্রদায়। পরে আবিষ্কার করিয়াছিলাম, এই নূতন মানবসমাজে সবলরা দুর্বলদের মারিয়া ফেলে না, তাড়াইয়াও দেয় না, কাজে লাগায়। এক একজন সবল লোকের আশ্রয়ে বহু দুর্বল লোক বাস করে এবং পরিবর্তে তাহারা কাজ করিয়া দেয়। কাজ করিতে পারিলে আশ্রয়ের অভাব হয় না।

বেলা বাড়িতে লাগিল। রৌদ্র উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, এ অঞ্চলটা বরফে ঢাকা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঢাকা নয়। আশেপাশে শ্যামলতার

আভাস একটু-আধটু আছে। একরকম বেঁটে বেঁটে ছোট ঝাউয়ের মতো গাছও মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে। দূরে দূরে পাহাড়। আরও দূরে একটা নদীর মতো কি যেন রহিয়াছে, শীতে জমিয়া গিয়াছে। দূর হইতে বিরাট একটা শ্বেত সর্পের মতো দেখাইতেছে। দাঁত দিয়া ও নখ দিয়া টানাটানি করিয়া আমি কেবল পরিশ্রান্তই হইয়া পড়িতেছিলাম, ম্যামথের চামড়া বিশেষ ছাড়াইতে পারি নাই। ভীষণ কর্কশ চামড়া, তাহার উপর লোমে পরিপূর্ণ। আশেপাশে চাহিয়া দেখিলাম, সকলেই অখন্ড মনোযোগসহকারে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত। আমার দিকে দু-একজন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে বটে, কিন্তু কেহই আমাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে না, এই অভিনব অনুভূতিটাই সবিস্ময়ে বারম্বার উপভোগ করিতেছিলাম। যাহারা আমাকে গাছ হইতে নামাইয়া আনিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? তাহারা কে? ইহারাই কি তাহারা? নানা প্রশ্ন মনে জাগিতেছিল। কিন্তু প্রশ্নের সমাধান করিব কি প্রকারে? অসহায়ভাবে বসিয়া মৃত ম্যামথটার ছিন্ন চর্মপ্রান্ত লইয়া টানাটানি করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ গোটা দুই পাথরের অস্ত্র আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। একটা চামড়া ছাড়াইবার ছুরি এবং আর একটা পাথরের কুঠার। পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম, কোমরে দুই হাত দিয়া গ্রীবাভঙ্গীসহকারে জুমনি দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল ছুটিয়াছে, স্কন্ধবিলম্বিত চর্মাবরণ খুলিয়া পড়িয়াছে, দ্রুত নিশ্বাসে পীবর স্তনযুগল আন্দোলিত হইতেছে। আদেশের ভঙ্গীতে ম্যামথটার বক্ষোদেশ দেখাইয়া সে কি যে বলিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন ঝুঁকিয়া ম্যামথটার বক্ষোদেশ দেখাইয়া সে অঙ্গুলি দিয়া যাহা নির্দেশ করিল, তাহাতে বুঝিলাম সে বলিতেছে—এমনি করিয়া এখানটা কাট। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, অনেকেই সেখানে ছোরা বসাইতে চেষ্টা করিয়াছে, আঁচড়ের দাগ অনেক রহিয়াছে, কিন্তু কেহই সেখানকার চর্ম বিদীর্ণ করিতে পারে নাই। আমিও পারিলাম না। ছোরাটা দিয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, দাগ পর্যন্ত বসিল না। তখন কুঠারটা তুলিয়া সজোরে আঘাত করিলাম, মনে হইল প্রস্তরখণ্ডে আহত হইয়া তাহা যেন ফিরিয়া আসিল। আর একবার আরও জোরে আঘাত করিলাম। তাহাতেও কিছু হইল না। ম্যামথের বক্ষ বিদীর্ণ করা সহজ নয়। সহজ নয় বলিয়াই বোধ হয় ওই জায়গাটায় কেহ ভিড়ে নাই। আমার কেমন যেন রোখ চড়িয়া গেল। উন্মাদের মতো আঘাতের পর আঘাত করিয়া যাইতে লাগিলাম। অনুভব করিতে লাগিলাম জুমনি আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কণ্ঠনিঃসৃত নানারূপ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছিলাম, আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে আমার দিকে নয়, ওই ম্যামথটার বুকের দিকে। অনেকক্ষণ কুঠার চালাইবার পর ম্যামথের বক্ষঃস্থল অবশেষে ফাটিয়া গেল। তখন জুমনি আঙুল দিয়া ইঙ্গিতে আমাকে জানাইল—উহার হৃৎপিন্ডটা টানিয়া বাহির কর। কুঠার এবং ছুরির সাহায্যে অনেক কষ্টে হৃৎপিন্ডটা

বাহির করিলাম। বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে জুমনি তাহা আমার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইল এবং সেখানে দাঁড়াইয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। সমবেত জনতা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। পরে পারিয়াছি। নিজেও পরে ম্যামথের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া খাইয়াছি। সেইদিনই ভোরে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, যেখানে আমার ভাষাভাষী লোকেরা সমবেত হইয়া গ্রাম বাঁধিয়াছিল, সেইখানে জুমনির কাহিনীটা শুনিয়াছিলাম। যে ম্যামথটাকে শিকার করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমরা ছিন্নভিন্ন করিতেছিলাম, সেই ম্যামথটা দুইদিন পূর্বে জুমনির স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল, সেই স্বামীর মৃতদেহই আমরা একটু আগে কবরস্থ করিলাম। এই সমস্ত দলটারই অধিপতি ছিল জুমনির স্বামী।

রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা চুষিতে চুষিতে জুমনি দ্রুতপদক্ষেপে ভীড়ের মধ্যে অন্তর্ধান করিল। সমস্ত দিন তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত দিন ধরিয়া সেই মৃত ম্যামথটাকে লইয়া সকলে মিলিয়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিলাম। যে যতটা পারিল সেইখানে বসিয়া বসিয়া খাইল, বহিয়াও লইয়া গেল অনেকে। মাংস, হাড়, চামড়া, চর্বি যে যতটা পারিল লইয়া গেল। হাতে অস্ত্র পাইয়া আমিও কম সংগ্রহ করি নাই। পেটে আর স্থান ছিল না। উদ্বৃত্তটা কোথায় রাখিব, তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল ক্রমশ। দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া গেল। রাত্রির জন্য একটা আশ্রয় চাই। সমস্ত দিন ম্যামথের কাছে বসিয়া কাটিয়াছে জায়গাটা ঘুরিয়া দেখা হয় নাই যে আশ্রয় পাওয়া যাইবে কি না। চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম কি করা যায়। সেই শ্বেত ভল্লুকটার কথা মনে পড়িল। ভীড় ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। সকলেই দেখিলাম পাহাড়টার দিকে চলিয়াছে। ওখানেই বোধ হয় আশ্রয় আছে। অনেকগুলি গুহা দেখিয়াছিলাম।

হঠাৎ চোখে পড়িল জুমনি আসিতেছে। আমার দিকেই আসিতেছে। তাহার হাতে দুইটা চর্মাবরণ। আমার কাছে আসিয়া চর্মাবরণ দুইটা সে আমাকেই দিল এবং উদ্ভাসিত চক্ষে অঙ্গভঙ্গীসহকারে কি যে বলিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম না। এইটুকু শুধু আভাসে হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, আমার কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপই বোধ হয় এই চর্মাবরণ দুইখানা সে আমাকে দিতেছে। তাহার চোখমুখের ভঙ্গী দেখিয়া তাহাই মনে হইল। এতদিন যে জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে এসব ছিল না। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে চামড়া দুইখানা লাভ করিয়া হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হইল তাহাও অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে কৃতজ্ঞতা নামক সুকুমার মহৎ ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই, সেদিন হইল। সমস্ত অন্তর যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কণ্ঠের কাছে কেমন যেন ঈষৎ বেদনার মতো অনুভব করিতে লাগিলাম। একটু ভয়ও যে না হইল, তাহা নয়! মনে হইতে লাগিল ইহা নূতন ধরণের ফাঁদ নয় তো!

চামড়া দুইখানা দিয়া জুমনি নাচের ভংগীতে দুই হাত তুলিয়া কি যেন বলিল, একটু হাসিল, তাহার পর চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবামাত্র আমার চমক ভাঙিল, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হইলাম। তাড়াতাড়ি চামড়ার উপর মাংসের টুকরা ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্রগুলি চাপাইয়া দিয়া তাহা টানিতে টানিতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, জুমনিও পাহাড়ের দিকেই চলিয়াছে। সহসা সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল আমি তাহার অনুসরণ করিতেছি, দেখিতে পাইবামাত্র সে ছুটিতে লাগিল। আমিও যথাসম্ভব গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম। দেখিতে পাইলাম, ছুটিতে ছুটিতে সে একটা পাহাড়ের গুহামুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে আমি যখন সেখানে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। আশেপাশে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ভয়াবহ নীরবতায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। যে বিরাট জনতা এতক্ষণ ভীড় করিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল? আকাশচুম্বী পাহাড়টা যেন একটা ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো। নিষ্ঠুর এবং কঠিন, নীরবে ওৎ পাতিয়া আছে। যে গুহামুখে জুমনিকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়াছিলাম, আশা হইল হয়তো উহার ভিতরই আশ্রয় মিলিবে। ধীরে ধীরে সেই গুহাটার সম্মুখীন হইলাম। গুহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু যে-ই ঢুকিবার চেষ্টা করিয়াছি, অমনি একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম! হিংস্র-জন্তুর তর্জনের মতো একটা শব্দ—গ্র গ্র গ্র—গররর—গ্র গ্র গ্র—গররর—গররর। তাহার পর দেখিতে পাইলাম। শমশ্রু-গুম্ফ-কেশসমাচ্ছন্ন প্রকান্ড একটা মুখ, মহিষের চোখের মতো একজোড়া লাল চোখ, থ্যাবড়া নাক, কালো পুরু ঠোঁট। আমি সম্মুখের অংশটাই কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম—রোমশ হাত দুইটা সম্মুখের দিকে প্রসারিত। ঠিক যেন একটা শমশ্রুগুম্ফ-মন্ডিত মহিষের মূর্তি। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র কিন্তু যে চীৎকারটা সে করিয়া উঠিল, তাহা সিংহ-গর্জনের অনুরূপ। আমি ভয়ে পিছাইয়া গেলাম। এ কে! জুমনি কোথায় গেল? পরক্ষণেই একটা খিল খিল হাসি শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, জুমনি ওই মনুষ্যরূপী মহিষটার কক্ষের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। পরে শুনিয়াছি, ওই মনুষ্যরূপী মহিষটির নাম দাহু। জুমনির স্বামীর মৃত্যুর পর ওই নাকি স্বামীর পদে বাহাল হইয়াছে। একটু পরেই দাহুর যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে পরিচয় তখন জানা থাকিলে অতটা ভয় পাইতাম না। জুমনি বাহির হইয়া কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি একটা বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। চামড়া দুইখানা এবং স্তূপীকৃত ম্যামথের মাংস সামনেই পড়িয়াছিল। জুমনি সেগুলির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর আবার চারিদিকে চাহিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে সে হয়তো আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিত, কিন্তু তাহার অবসর সে পাইল না। আর একটা গর্জন করিয়া দৈত্যাকৃতি দাহু বাহির হইয়া আসিল এবং জুমনিকে শিশুর

মতো দুই বাহুতে উত্তোলন করিয়া গুহার অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, কোথাও একটা আশ্রয় জোগাড় করিতে হইবে। চামড়া দুইখানা টানিতে টানিতে আমি পাহাড়ের সানুদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ সন্ধানের পর অবশেষে একটা আশ্রয় মিলিল। ঠিক গুহা নয়, তবে মাথার উপর একটা আবরণ পাওয়া গেল। একস্থানে পাহাড়ের খানিকটা দাহুর নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, নাকের সম্মুখ অংশটা নাই বলিয়া মনে ঘুমাইতে পারিলাম না। শীত তো ছিলই, নিরাপদও মনে হইতেছিল না। শ্বেত ভল্লুকটার কথা মনে হইতেছিল। দাহুর মুখটাও মনে পড়িতেছিল। একটু পরে হাওয়া উঠিল। চামড়া দুইটা টানিয়া গায়ে দিলাম। বিশেষ কোন ফল হইল না। আগুন না হইলে এ শীত ভাঙিবে না। কিন্তু আগুন কোথায় পাইব? চামড়া দুইটাই ভাল করিয়া জড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। হুড়মুড় করিয়া একটা পাথর পাহাড়ের উপর হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে মনে হইল। পরক্ষণেই দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ শোনা গেল, মনে হইল কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে, আমারই দিকে আসিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলাম বৃহদাকৃতি কি যেন একটা ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার পিছনে আর একজন। যে পিছনে ছিল সে চীৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল একটা শব্দের শূল যেন আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। বৃহদাকৃতি লোকটার গতিবেগ আরও বাড়িয়া গেল। উপর্যুপরি কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড আমার নিকটে আসিয়া পড়িল। যে পিছনে আসিতেছিল, দেখিতে পাইলাম সে-ই পাথর ছুঁড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িল। চিনিতে পারিলাম। দাহু ও জুর্মনি। দৈত্যাকার দাহুকে জুর্মনি তাড়া করিয়াছে, ভীত দাহু ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছে। উভয়েই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আরও কাছে আসিতে দেখিতে পাইলাম, দাহুর নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, নাকের সম্মুখ অংশটা নাই বলিয়া মনে হইল। দাহু আর্তনাদ করিতেছে। জুর্মনির মুখ রক্তাক্ত। হঠাৎ জুর্মনিও চীৎকার করিয়া উঠিল। ইয়া—ইয়া—ইয়া—ইয়াও—ইয়াও—হে হো-হু-উ-উ-উ। জুর্মনির এই চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে এই চীৎকারের প্রতিধ্বনি উঠিল। বহু লোক যেন সাড়া দিল। চতুর্দিক হইতে পিল পিল করিয়া বহুলোক বাহির হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের গা বাহিয়া যেন পিপীলিকার সারি নামিতেছে। দৈত্যাকার দাহু আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া আবার অসহায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু কেহ কর্ণপাত করিল না। একটা পাথর সজোরে আসিয়া তাহার মাথায় লাগিল,

সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। ইয়া—ইয়া—ইয়া—ইয়াও—ইয়াও...হো...হো...হু...উ...ও--সকলের মুখেই এই চীৎকার। এই চীৎকারে দাহুর আর্তনাদ ডুবিয়া গেল। সকলে তাহাকে টানিতে টানিতে পাহাড়ের উপর লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিল, আমিও শিহরিয়া উঠিলাম। হঠাৎ নজরে পড়িল সেই শ্বেত ভল্লুকটা একটা হিমানস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আছে। সে-ও যেন অবাক হইয়া গিয়াছে।

আমি হঠাৎ বাহির হইয়া বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিলাম। জুমনির দেওয়া চামড়া, ম্যামথের মাংস সমস্ত পড়িয়া রহিল। আমি যে দিকে দু'চক্ষু যায় প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, দাহুকে শেষ করিয়া জুমনি এবার আমাকে ধরিবে। ছুটিতে লাগিলাম। ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে বাধ্য হইয়া গতিবেগ কমাইয়া দিতে হইল। তবু কিন্তু থামিতে পারিলাম না, হাঁটিতে লাগিলাম। একটা অজ্ঞাত ভয় যেন আমাকে পিছনে তাড়া করিয়া আসিতেছিল। সহসা কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল জুমনি রাক্ষসী, নরমাংস ভক্ষণ করাই উহার স্বভাব, নানা ছলে বিদেশী পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের আয়ত্তের মধ্যে লইয়া যায়, তাহার পর খাইয়া ফেলে। নিজের অনাবৃত যৌবন আমার চোখের সামনে ধরিয়া আমাকে চামড়া উপহার দিয়া আমাকেও আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দাহুকে শেষ করিয়া আমাকে ধরিবে। এইরূপ নিশাচরী রাক্ষসীর কল্পনা কি করিয়া মাথায় আসিয়াছিল তাহা জানি না। কিন্তু আসিয়াছিল এবং আসিবামাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিলাম, বিচার বিতর্ক করি নাই। বিচার করিবার মতো বুদ্ধি আমাদের তখন ছিল না। হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে কাহার যেন ইঙ্গিত পাইতাম এবং তাহাই অনুসরণ করিতাম। এই ইঙ্গিত অনুসারে চলিয়া চিরকালই লাভবান হইয়াছি। এই ইঙ্গিতই অসহায়ের সহায়, বিপদের প্রাক্কালে নিগূঢ়ভাবে মানুষকে সতর্ক করিয়া দেয়। যুক্তির কোলাহলে ইহার মৃদু বাণী অনেক সময় শোনা যায় না, কিন্তু ভাল করিয়া শুনিও ইহা এখনও তোমাদের অন্তরে আছে, এখনও বিপদের পূর্বে তোমাদের সতর্ক করে।

...হাঁটিতেছিলাম। চাঁদের আলো ছিল, কিন্তু চাঁদের আলোয় আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস ছিল না। আড়ালে আড়ালে হাঁটিতেছিলাম। যেখানে যতটুকু আড়াল বা অন্ধকার পাইতেছিলাম, ততটুকুই ব্যবহার করিতেছিলাম। বড় বড় পাথরের আড়াল ছিল, দুই-একটা বড় বড় গাছের আড়ালও ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ ছিল চন্দ্রালোকিত বড় বড় প্রান্তর। সেগুলি ছুটিয়া পার হইতেছিলাম। ছুটিবার আর একটা কারণও ছিল, বরফ পড়িতেছিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর সম্মুখে খুব বড় একটা প্রান্তর পাইলাম। কিছুতেই সেটা আর শেষ হয় না। হঠাৎ দেখিলাম প্রান্তরের মাঝখানে

একটা পাহাড় রহিয়াছে। আর চলিতে পারিতেছিলাম না, ইচ্ছা হইল ওই পাহাড়টার নীচে খুঁজিয়া দেখি রাত্রির মতো যদি একটা আশ্রয় পাওয়া যায় প্রায় ছুটিয়া পাহাড়টার নিকটবর্তী হইলাম। নিকটবর্তী হইয়াই কিন্তু অরও দ্রুতবেগে পলাইতে হইল। পাহাড় নয়, ম্যামথ একটা। আর একটু কাছাকাছি গেলেই ওই রোমশ জন্তুটার কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত। আমাকে দেখিয়াই ম্যামথটা বিকট গর্জন করিয়া উঠিল। ছুটিতে ছুটিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, আমারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বিরাটকায় বলিয়া আমার মতো দ্রুতগতি নয়, তবু কিন্তু আসিতেছে।

...কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ মেঘে চাঁদটা ঢাকিয়া গেল। চতুর্দিকে অন্ধকার। কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, তবু ছুটিতেছি। না ছুটিয়া যে উপায় নাই! সহসা একটা বরফের স্তূপের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, আর উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। যদিও প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করিতেছিলাম এইবার ম্যামথটা আসিয়া পড়িবে, তাহার দন্তাঘাতে ছিন্নভিন্ন বা পদতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইব, তবু কিন্তু একবারও ভাবিতে পারি নাই এইবার মৃত্যু আসন্ন, এইবার সব শেষ হইয়া যাইবে বরং ইহাই মনে হইতেছিল বিপদে পড়িয়া গিয়াছি বটে, তবু আমি বাঁচিয়া যাইব, নিশ্চয়ই বাঁচিব, আমি কি মরিতে পারি?

...হঠাৎ একটা শব্দ হইল। কি যেন একটা ফাটিয়া গেল। ম্যামথটার চীৎকার শুনিতে পাইলাম। আমি মুখ তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। চতুর্দিকে অন্ধকার। বসিয়াই রহিলাম, কারণ উঠিবার শক্তি আর ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মেঘটা সরিয়া গেল দেখিলাম আমি একটা বরফের প্রান্তরে বসিয়া আছি, আর ম্যামথটা সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে একটা গর্তের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ঠিক কি হইয়াছে তখনও ভালো বুঝিতে পারি নাই। একটু পরেই কিন্তু মনে হইল আমি ধীরে ধীরে ম্যামথটার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। আবার চাঁদ মেঘে ঢাকিয়া গেল। মনে হইল একটা জন্তু যেন আমার দিকে ছুটিয়া আসিল, আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

...কিছুক্ষণ পরে প্রভাত হইল। তখন দেখিলাম যে বিরাট বরফের প্রান্তরে আমি বসিয়াছিলাম তাহা খর-বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। বুঝিলাম একটা প্রকান্ড নদীর উপরের কিছু অংশ জমিয়া গিয়াছিল, এই নদী আমি দিনের আলোকে দূর হইতে দেখিয়াছিলাম, ম্যামথের পদভরে তাহার খানিকটা ভাঙিয়া গিয়াছে এবং সমস্তটা অবশেষে ফাটিয়া গিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারে যে জন্তুটা আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল দিনের আলোকে সেটা আবার দেখিতে পাইলাম। একটা হরিণ! আমার খাদ্য বহুদিন হরিণ দেখি নাই। বরফপাত শুরু হওয়ার পর ইহারা কোথায় যে

অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন কোথা হইতে আসিল!

সহসা মনে হইল আমাকে এভাবে রক্ষা করিতেছে কে? বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। এই রহস্যের আভাসে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারেই এই বিশ্বাস মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল যে অদৃশ্যলোকে কে যেন একজন আছেন যিনি আমার রক্ষক।

কয়েকদিন ভাসিবার পর যে স্থানে আসিয়া ঠেকিলাম সেখানেও দেখিলাম মানুষ আছে—যাহারা আমার ভাষা বোঝে—যাহারা এই বরফকে মানিয়া লইয়াই নূতন ধরণের সমাজ পত্তন করিয়াছে।

৩

সত্যই নূতন ধরণের সমাজ। বরফ বা খাদ্য সংগ্রহ এ সমাজের সমস্যা নহে, মানুষের প্রতি মানুষের বিভিন্ন আচরণই ইহাদের জীবনের প্রধান প্রেরণা। পুঠা, লুং, হুংজুরা বরফের ভয়ে ভীত নহে, খাদ্যাভাবে কাতর নহে, তাহাদের সমস্যা অন্য জাতীয়।

ইহাদের মধ্যে আসিয়া নূতন বেশ পরিধান করিয়াছি। নূতন বেশ পরিয়া নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছি।

...চর্মাবরণে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাষ্ঠপাদুকা পরিয়া নির্নিমেষে দিগন্তের দিকে চাহিয়াছিলাম। পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল পুঠা। প্রৌঢ়া পুঠা। পুঠাই আমার আশ্রয়দাত্রী। আশ্রয় দিবার হেতু আমার কপালের কালো জড়ুলটা। পুঠার শেষ যে পুত্রটি কিছুদিন পূর্বে অর্ধগলিত বরফের তলায় তলাইয়া গিয়াছিল তাহারও কপালে না কি এইরূপ একটি জড়ুল ছিল। আমার কপালের ওই কালো চিহ্নটি আমার আগন্তুকত্ব-দোষ নষ্ট করিয়া ওই নবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। পুঠা যদিও দুর্ভাগিনী, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কাহারও সাহস ছিল না। সে যখন আমাকে আশ্রয় দিয়াছিল তখন আমার চিন্তার কারণ ছিল না।

পুঠা সত্যই দুর্ভাগিনী। অনেকগুলি পুত্র-কন্যার জননী হইয়াও সে নিঃসন্তান। ম্যামথের কবলে, রোমশ গণ্ডারের খড়্গাঘাতে, নিদারুণ শীতে, পারিবারিক যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহার সমস্ত সন্তান পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছিল। একটিও বাঁচিয়া ছিল না। কোনও পুরুষ না কি আর পুঠার সংশ্রবে আসিতে চাহিত না। সকলে তাহাকে ভয় করিত। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, স্বল্পভাষণ সকলের নিকট হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার নিশীথ অভিযান, গভীর রাত্রিতে তাহার একক চীৎকার, সত্যই তাহাকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ নাকি তাহাকে কাঁদিতে বা হাসিতে দেখে নাই। রাত্রে সে একা যক্ষিণীর মতো ঘুরিয়া বেড়াইত। নিস্তব্ধ তুষার-প্রান্তর কখনও তাহার আর্তনাদে কখনও তাহার অট্টহাস্যে প্রকম্পিত হইত। চন্দ্রালোকিত এক রাত্রেই পুঠার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। নূতন স্থানে সমস্তদিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই, গভীর রাত্রে ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়াছিলাম। সহসা দূরে দেখি পুঠা দাঁড়াইয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ভয়ে আমি বসিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই। সে আমার কাছে ছুটিয়া আসিল

এবং হেঁট হইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমিও তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলাম। পুঠার নয়ন সহসা বিস্ফারিত হইয়া গেল। সে ঝুঁকিয়া আমার জড়ুলটার উপর হাত বুলাইয়া দেখিল, তাহার পর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। ইহার পর সে আমাকে টানিতে টানিতে তাহার বরফগুহার ভিতর লইয়া গিয়াছিল।

...পুঠাকে অনুসরণ করিয়াই গভীর নিশীথে বাহির হইয়াছিলাম। তাহারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম বলগা হরিণের সারি চলিয়াছে। একটা দুইটা নয়, শত শত। পুঠা আমার হাতে একটা বর্শা তুলিয়া দিয়া সঙ্কেত করিল। শিকারীরা কুকুর লেলাইয়া দিবার সময় যেমন শব্দ করে তেমনি শব্দও করিল একটা। আমি বর্শা হাতে ছুটিয়া গেলাম। পুঠা প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

...ছুটিতে ছুটিতে আমি যখন বল্গা হরিণ-শ্রেণীর নিকটবর্তী হইলাম তখন সমস্ত দলটা অনেকদূরে আগাইয়া গিয়াছে। তবু আমি দলের শেষাংশ লক্ষ করিয়া বর্শাটা ছুঁড়িলাম। একটা হরিণ পড়িল। পুঠা আমাকে প্রস্তর-নির্মিত একটা ছোরাও দিয়াছিল। ছুটিয়া গিয়া ছোরাটা হরিণের বুকে বসাইয়া দিলাম। প্রকাণ্ড হরিণ। তাহার বক্ষের ক্ষতস্থানে মুখ লাগাইয়া খানিকটা উষ্ণ রক্ত তখনই পান করিয়া ফেলিলাম। সমস্ত শরীরে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। মুখটা মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং চতুর্দিকে চাহিয়া চাহিয়া নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলাম হরিণের দল কোন্ দিকে যাইতেছে। দেখিলাম দূরে, অনেক দূরে, সুবিস্তৃত তুষার প্রান্তরের পরপারে ঘননিবদ্ধ অরণ্যের মতো কি যেন একটা রহিয়াছে। ঘন-কৃষ্ণ ভ্রূর মতো দেখাইতেছে। চন্দ্রালোকে বরফের পটভূমিকায় তাহা যেন রহস্যময় ও ভয়াবহ। একদিকে একটা জলের ধারাও দেখা গেল। হরিণের দল সেইদিকেই চলিয়াছে।

...হরিণটাকে টানিতে টানিতে লইয়া যখন পুঠার কাছে গেলাম তখন দেখি সে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া আছে। নিহত হরিণটা দেখিয়া তাহার প্রস্তরবৎ মুখে ক্ষীণ আনন্দাভাস ছড়াইয়া পড়িল। পরমুহূর্তে কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার নাকে নাক ঘসিয়া আদর করিল। আমি অভিভূত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পুঠা ইঙ্গিতে তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিল। অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর আমরা একটা প্রকাণ্ড গর্তের সমীপবর্তী হইলাম।

পুঠা বলিল, "এই গর্তটার ভিতর হরিণটাকে বরফ চাপা দিয়া এখন লুকাইয়া রাখ। কাল যথাসময়ে ইহাকে বাহির করিতে হইবে। কাল রূঠার জীবনের শুভতম দিন আসিবে, কাল সে নবজীবন লাভ করিবে। তখন ইহা কাজে লাগিবে। হরিণের সন্ধানে রূঠার সন্তানেরাও প্রত্যহ বাহির হয়, কিন্তু পায় না। আজ তাহারা হরিণ পাইয়াছে কি না কে জানে! তাহারা না পাক আমরা তো পাইয়াছি। এটা এখন এইখানে লুকান থাকুক।"

রুঠাকে দেখিয়াছি। পলিতকেশা বৃদ্ধা। পুঠারই জ্যেষ্ঠা ভগিনী। রুঠার সন্তান-সন্ততি লইয়াই এই সমাজ। সেকালে জননীই ছিল সন্তানের পরিচয়। পিতার খবর কেহ রাখিত না। পুত্রের পরিচয় জননীর নামে হইত। পৌত্র বলিয়া তখন কিছু ছিল না। দৌহিত্র ছিল। রুঠার শুধু পুত্র কন্যা দৌহিত্র নয়, দৌহিত্রের দৌহিত্রও আছে। পুঠা যদিও সন্তানহীনা কিন্তু রুঠার সন্তানসন্ততি প্রায় শতাধিক। লুংয়ের মুখে পরে শুনিয়াছি রুঠার সন্তানসন্ততিদের বিবাহ লইয়া দূর কোন পল্লীর টিট্টিভ সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বিবাদ। তাহারা নাকি রুঠার কয়েকটি পুত্র দৌহিত্রকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের দলভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের মেয়েরা না কি মায়াবিনী। গভীর নিশীথে টিট্টিভ পক্ষীর ডাক ডাকিয়া তাহারা নাকি পুরুষদের ভুলাইয়া লইয়া যায়। তাহারা নাকি একপ্রকার লোমশ বন্য কুক্কুর পুষিয়া তাহাদের দিয়া কাষ্ঠনির্মিত গাড়ি টানায়। লুংয়ের মুখে এরূপ অনেক অদ্ভুত কথাই শুনিয়াছিলাম এবং যদিও এ ধরণের সংবাদ আমার অভিজ্ঞতার অতীত ছিল, তবু তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু এখন পুঠার কাছে যাহা শুনিলাম তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।

"নবজীবন-লাভ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

পুঠা আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "তুমি যে দেশ হইতে আসিয়াছ সেখানে বুঝি এ সব নাই?"

"না। কি করিয়া নবজীবন-লাভ ঘটে?"

"দেখিলেই বুঝিবে। রুঠা কাল জল-ভল্লুক হইয়া যাইবে।"

"জল-ভল্লুক কি?"

"জল-ভল্লুক দেখ নাই?"

"না।"

"আচ্ছা, আজই দেখাইয়া দিব।"

শিশুর অজ্ঞতায় জননী যেমন হৃষ্ট হয়, আমার অজ্ঞতায় পুঠাও তেমনি হৃষ্ট হইতেছিল।

...প্রকাণ্ড হরিণটাকে বরফ সমাধি দিতে বেশ খানিকটা সময় গেল। বরফ দিয়া গর্তের মুখটা যখন ভালভাবে ঢাকিয়া দিলাম তখন পুঠা বলিল, "ওই পাথরটা আনিয়া উহার মুখে চাপা দাও, তাহা হইলে আর কেহ উহার উপর দাবী করিবে না।"

পাথর আনিয়া চাপা দিলাম।

"এইবার চল তোমাকে জল-ভল্লুক দেখাই। এখনই দেখিতে পাওয়া যাইবে কি না ঠিক নাই, তবু চল চেষ্টা করা যাক।"

পুঠার অনুসরণ করিতেছিলাম। একটি কথাই বারবার মনে হইতেছিল, ভাগ্যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার কোনও অমিল নাই। থাকিলে

কি পুঠা আমাকে আশ্রয় দিত? কি করিয়া যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার মিল হইল তাহাই চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, হয়তো কোনও কালে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল। হয়তো আমার পূর্বপুরুষ এবং ইহাদের পূর্বপুরুষ একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় ছিলাম আমরা? অতীতের দিকে চাহিতে গিয়া কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল, একটা কুয়াশার মধ্যে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কথাই কেবল মনে হইতে লাগিল, ইহারা আমার ভাষা বোঝে, ইহারা আমার আত্মীয় এবং ইহারা জয়ী হইয়াছে। এই করাল বরফকে ইহারা জয় করিয়াছে। বরফেরই গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেছে। এই সব চিন্তা করিতে করিতেই নীরবে পুঠার অনুসরণ করিতেছিলাম। পুঠা একটি কথাও বলে নাই। পুঠা স্বল্পভাষিণী। সহসা সে একটা ভয়ার্ত শব্দ করিয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িল। আমিও পড়িলাম। যন্ত্রচালিতবৎ শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ক্ষণকাল শুইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম ব্যাপারটা কি, পুঠা এমন করিল কেন। দেখিলাম পুঠা বরফ দিয়া তাড়াতাড়ি নিজের সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। ফিসফিস করিয়া আমাকেও সে তাহাই করিতে বলিল। আমিও তাহাই করিতে লাগি-লাম। আপাদমস্তক চর্মাবরণে ঢাকা ছিল, পায়ে ছিল চামড়া দিয়া বাঁধা কাঠের জুতা, সুতরাং বরফ চাপা দিয়া খুব যে বেশি কষ্ট হইতে লাগিল তাহা নয়। কেবল নাকটি বাহির করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিলাম। বেশি-ক্ষণ অবশ্য থাকিতে হইল না, একটু পরে পুঠাই ডাকিল।

"এইবার ওঠ।"

ডাক শুনিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

পুঠা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল— "ওই দেখ—"

দেখিলাম দূরে দীর্ঘাকৃতি কালো মানুষের মতো কি একটা যেন চলিয়া যাইতেছে। তাহার মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হাত দুইটা আজানুলম্বিত তো বটেই, বোধ হয় আরও লম্বা। মাথাটাও প্রকাণ্ড। পিছনের দিকটাই বেশী বড় বলিয়া মনে হইল। মনে হইল পিছনের দিকেই বুঝি নাক চোখও আছে। কিন্তু তাহা যে নাই তাহা তাহার গতি দেখিলেই বোঝা যায়। দূর হইতে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না কিন্তু মনে হইতে-ছিল সর্বাঙ্গে বড় বড় লোমও বোধ হয় আছে। কেমন যেন একটা ভল্লুক-ভল্লুক ভাব।

"কি ও?"—পুঠাকে প্রশ্ন করিলাম।

পুঠা বলিল—"হুংজু। রাক্ষস। ওই দূর বনে থাকে। আমার টিন্‌টাকে ওই খাইয়াছে।"

টিন্‌টা বোধ হয় পুঠার কোনও মৃত পুত্র বা কন্যা হইবে।

"রাক্ষস?"

"হাঁ। আমাদের মাথা মড়মড় করিয়া চিবাইয়া খাইতে পারে। গায়ে ভয়ানক শক্তি। ওই বনে অনেক হুংজু ছিল। রুঠার ছেলেরা কয়েকটাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এইটাই এখনও বাঁচিয়া আছে, আরও দুই-একটা আছে হয় তো—"

আমি তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িলাম। আমার ভয় হইল যদি ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের দেখিতে পায়। পুঠাকেও সে কথা বলিলাম।

পুঠা বলিল, "সে ভয় থাকিলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইতাম না। হুংজু ঘাড় ফিরাইতে পারে না, তাহার সে শক্তি নাই। যেদিকে চলে সেইদিকেই চলিতে থাকে, সহজে ফেরে না। হাওয়া এখন উলটা দিকে বহিতেছে। আমাদের গন্ধ পাইবে না, কথাও শুনিতে পাইবে না। চল আমরা আস্তে আস্তে উহার পিছুপিছু যাই। হুংজু নিশ্চয়ই জল-ভল্লুকের খোঁজেই বাহির হইয়াছে। জল-ভল্লুকের মাংস উহার বড় প্রিয় এবং সেইজন্যই রুঠার ছেলেদের ও পরম শত্রু।"

আমি সবিস্ময়ে হুংজুর দিকে চাহিয়া রহিলাম। ওই হুংজুই যে আমাদের পূর্বপুরুষ, বহু শতাব্দী পূর্বে আমিও যে উহারই মতো ছিলাম, এ কথা একবারও মনে হইল না। উহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জীব মনে করিয়া সভয় বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"চল—"

পুঠার আহ্বানে চমক ভাঙিগল। সন্তর্পণে দূরে দূরে হংজুর অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কখনও থামিতেছি, কখনও গুঁড়ি মারিয়া চলিতেছি, কখনও বরফস্তূপের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি...এইভাবে অনেক দূর গেলাম। সহসা একটা করুণ শব্দ শোনা গেল, অনেকটা যেন গানের মতো, কান্নার মতো।

পুঠা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "জল-ভল্লুক! ছুটিয়া চল, ওই বরফের ঢিপিটার আড়ালে যাই। হুংজু নিশ্চয়ই একটাকে ধরিয়াছে।"

ছুটিয়া গেলাম, গিয়া দেখিলাম পুঠার অনুমানই সত্য। হুংজু মাছের মতো কি যেন একটা বগলের নীচে চাপিয়া ধরিয়া তাহার গলার কাছে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। হুংজুর কবলে সেটা ছটফট করিতেছে। তাহার পরই নজরে পড়িল আরও কয়েকটা ছুটিয়া পলাইতেছে। তখন বুঝিলাম উহারা মাছ নয়, যদিও প্রথমে ঠিক মাছের মতোই মনে হইয়াছিল। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম উহাদের গায়ে লোম আছে, উহাদের পা আছে, ভালুকের কানের মতো দুইটা কানও আছে। মুখটাও অনেকটা ভালুকেরই মুখের মতো। তোমরা আজকাল যাহাকে 'সীল' বল, পুঠা তাহাকেই জল-ভল্লুক বলিতেছিল। যেটা সর্বাপেক্ষা বড়, সেট প্রকান্ড। সেটা হুড়মুড় করিয়া জলে নামিয়া

পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটাও জলে নামিল। হুংজু দেখিলাম ছুটিতেছে, ছুটিয়া গিয়া সে একটিকে পা দিয়া চাপিয়া ধরিল। ঠিক এইসময় একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমার হাতে যে বর্শাটা ছিল হুংজুকে লক্ষ্য করিয়া আমি হঠাৎ সেটাকে ছুঁড়িয়া দিলাম। চকিতের মধ্যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল এবং আমি যে কি বিপজ্জনক কাজ করিয়া ফেলিয়াছি তাহাও চকিতে উপলব্ধি করিয়া পরমুহূর্তে শুইয়া পড়িলাম। হুংজু যদি এখনই ছুটিয়া আসে! পুঠাও সঙ্গে সঙ্গে শুইয়া পড়িয়াছিল। সে-ও নিশ্চয়ই একই বিপদের আশঙ্কা করিতেছিল—হুংজু এইবার তাড়া করিয়া আসিবে এবং আমাদের ধরিয়া মাথাটা মড়মড় করিয়া চিবাইবে। হুংজু কিন্তু আসিল না। কোনও শব্দ পর্যন্ত হইল না। কবলিত জল-ভল্লুক দুইটির ক্রন্দনও ক্রমশ থামিয়া গেল। আমি ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দেখিলাম কোথাও কেহ নাই, বর্শাটা শুধু বরফে গাঁথা রহিয়াছে। তাহার পর আর একটু উঠিয়া দেখিলাম জল-ভল্লুকের শাবক দুইটি বগলদাবা করিয়া হুংজু দূরে পলাইতেছে। তাহার পলায়মান চেহারাটার দিকে চাহিয়া আমার ভীতভাবটাই শুধু যে অপনোদিত হইল তাহা নয়, সাহসও পাইলাম। ছুটিয়া গিয়া বর্শাটা তুলিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, পুঠা আমাকে বাধা না দিলে হয়তো অনুসরণও করিতাম।

পুঠার দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। এখন দেখিলাম। আমার অবিমৃষ্যকারিতায় সে বিরক্ত হয় নাই, আনন্দে উৎসাহে গর্বে তাহার ভাবলেশহীন চক্ষুযুগল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "এখন থাক, পরে হইবে। এখন বাড়ি চল। ভোর হইয়া আসিতেছে। আজ রুঠার নব-জীবন হইবে। অনেক কাজ আছে। দেখি উহারা হরিণ আনিতে পারিয়াছে কি না—"

আমরা বাড়ির দিকে ফিরিলাম। চলিতে চলিতে আমি প্রশ্ন করিলাম —"নবজীবন লাভ ব্যাপারটা কি বুঝাইয়া বল তো।"

"সত্যই তুমি জান না?"

"না।"

পুঠা তখন চুপি চুপি আমাকে বলিল, "একথা যেন কাহাকেও বলিও না। তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তুমি কি—তুমি বলিও তুমিও একজন জল-ভল্লুক। বিশেষত রুঠার মেয়েগুলা যেন কিছুতেই না জানিতে পারে যে, তোমার কুলের কোনও চিহ্ন নাই।"

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া পুঠা বলিল, "তবে শোন, সব কথা খুলিয়া বলি। বহুদিন পূর্বে রুঠা, ডিংঘা আর আমি তিনজনে এখানে তিনটি বংশ স্থাপন করিয়াছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম রোমশ গণ্ডারকে, রুঠা স্বপ্ন দেখিয়াছিল জল-ভল্লুকের এবং ডিংঘা স্বপ্ন দেখিয়াছিল টিট্টিভ

পাখীকে। আমার মা ঠিক করিলেন ওই তিনটি জন্তু দিয়াই আমাদের বংশ চিহ্নিত করিতে হইবে। উহারাই হইবে আমাদের কুলদেবতা। আমরা যখন সন্তানধারণক্ষম হইলাম তখন আমাদের প্রত্যেককে স্বপ্নদৃষ্ট সেই জন্তুগুলি আহার করিতে হইল। আমি রোমশ গণ্ডারের মাংস আহার করিলাম, রূঠা জল-ভল্লুকের এবং ডিংঘা টিট্টিভের মাংস আহার করিল। আমাদের প্রত্যেককেই সমস্ত জন্তুটাই আহার করিতে হইল। সাতদিন ধরিয়া আমি এক রোমশ গণ্ডারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিলাম। তাহার কিছুই ফেলিয়া দিবার উপায় ছিল না, নখ, দাঁত লোম পর্যন্ত আমাকে গ্রাস করিতে হইয়াছিল। রূঠা এবং ডিংঘাও এইভাবে জল-ভল্লুক এবং টিট্টিভকে আত্মসাৎ করিয়াছিল। এইরূপে আমি হইলাম রোমশ গণ্ডার, রূঠা হইল জল-ভল্লুক এবং ডিংঘা হইল টিট্টিভ। আমার পুত্রকন্যারা হইল রোমশ গণ্ডার, রূঠার পুত্রকন্যারা জল-ভল্লুক এবং ডিংঘার পুত্র-কন্যারা টিট্টিভ। আমার পুত্র-কন্যারা কেহ বাঁচিয়া নাই। রূঠার পুত্রকন্যা দৌহিত্র দৌহিত্রীরা আছে। ডিংঘা আমাদের ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।”

“কোথায় ?”

“একদিন একটা অদ্ভুত দুর্ধর্ষ লোক কুকুরের গাড়ি হাঁকাইয়া আসিল এবং ডিংঘাকে পিঠের উপর চড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। ডিংঘা আর ফিরিয়া আসে নাই। বহু দূরে গিয়া সে টিট্টিভ বংশ স্থাপন করিয়াছে। উহাদের সহিত আমাদের কলহ। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। আমরা উহাদের অনেককে মারিয়াছি, আমার এবং রূঠার পুত্রকন্যাদের উহারাও মারিয়াছে। অনেকে বলে হুংজু নাকি উহাদের স্বপক্ষে। সেইজন্য হুংজু আমাদের কাহাকেও নাগালের মধ্যে পাইলে ছাড়ে না, মারিয়া ফেলে। তা ছাড়া উহাদের কুকুরের গাড়ি আছে, আমরা উহাদের সহিত পারিয়া উঠি না—”

চলিতে চলিতে আমরা কথা বলিতেছিলাম। পুঠা কেমন যেন একটানা একঘেয়ে স্বরে মন্ত্রপাঠ করার মতো বলিয়া চলিয়াছিল।

“কুকুরের গাড়ি কি জিনিস ?”—আমি প্রশ্ন করিলাম।

পুঠা বলিল, “গাছের ডাল পাশাপাশি বাঁধিয়া উহারা একটা আগড়ের মতো জিনিস তৈয়ারি করে। তাহার একধারে চামড়ার দড়ি দিয়া উহারা একদল ক্ষুধার্ত কুকুর বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর আগড়ের উপর দাঁড়াইয়া উহারা মাংসের টুকরা ছুঁড়িতে থাকে, আর কুকুরগুলা সেই মাংসের লোভে আগড়টাকে টানিতে টানিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। আগড়ের উপর কুকুরের গলার দড়ি ধরিয়া যে দাঁড়াইয়া থাকে সে-ও দ্রুতগতিতে অনেকটা পথ পার হইয়া যায়।”

“কুকুর কামড়ায় না ?”

“না, কুকুরকে উহারা পোষ মানাইয়াছে।”

কল্পনায় চিত্রটা দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। এতগুলা কথা একসঙ্গে

বলিয়া পুঁঠাও নীরব হইয়া গেল। সে-ও বোধ হয় কল্পনানেত্রে দেখিতেছিল। সে কিন্তু কুকুরের গাড়ি দেখিতেছিল না। কারণ কিছুক্ষণ পরে সে যাহা বলিল তাহা অন্য প্রসঙ্গ। সহসা অস্ফুটকণ্ঠে সে বলিল, "রুঠা আজ নবদেহ পাইবে। আজ বল্‌গা হরিণের দল আসিয়াছে"—মনে হইল যেন সে স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া পথ চলিতেছে, যেন স্বপ্নলোক হইতে কথাগুলি বলিল।

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছিল। পুঁঠা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আবার চলিতে শুরু করিল। চলিতে চলিতে বলিল, "সে নব-দেহই পাইবে। কিন্তু সে দেহ আমরা দেখিতে পাইব না। রুঠার আর সন্তান প্রসব করিবার ক্ষমতা নাই, এইবার তাহার দেহ সন্তানদের দেহের সহিত মিশিয়া যাইবে। কেমন করিয়া যাইবে তাহা স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে! প্রথম যে দিন সে জল-ভল্লুক হইয়াছিল সেদিনও বল্‌গা-হরিণের দল আসিয়াছিল। আজ আবার সেই বল্‌গা হরিণের দল আসিয়াছে। রুঠাকে ডাকিতে আসিয়াছে, রুঠা আজ চলিয়া যাইবে—"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার কাছে সমস্তটাই একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মতো মনে হইতেছিল। একটা কথা সহসা মনে হইল। রুঠার যখন নব-জীবন লাভ হইতেছে, পুঁঠারও নিশ্চয় হইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম।

"তোমার নব-দেহ কবে হইবে?"

পুঁঠা কথাটা শুনিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া এমনভাবে চাহিল যেন কথাটা সে শুনিতে পায় নাই। আবার প্রশ্ন করিলাম। তখন সে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখিলাম তাহার সমস্ত চোখে মুখে একটা আর্ত বেদনা স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। একটা গভীর দুঃখ সে যেন চাপিতে চেষ্টা করিতেছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে উত্তর দিল।

"আমার নব-দেহ হইবে না। কারণ, আমার গর্ভের একটি সন্তানও বাঁচিয়া নাই। কাহার মধ্যে আমি নিজেকে নবীন করিব? যদি কোনও দিন রোমশ-গণ্ডার দেখিতে পাই, তাহার মুখেই আত্মসমর্পণ করিব। কিন্তু সে ভাগ্যও বোধ হয় আমার হইবে না, কারণ রোমশ গণ্ডারও আজকাল দেখিতে পাই না। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও চলিয়া গিয়াছে। বহুকাল রোমশ-গণ্ডার দেখি নাই। আমাকে বোধ হয় পশুর মতো মরিতে হইবে। রুঠার ছেলেরা আমাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া দিবে।"

তাহার এই নিদারুণ দুর্ভাগ্যের কথাটা অতি সহজভাবেই পুঁঠা সেদিন বলিয়াছিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মনের বেদনা মুখে ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু কোনও হতাশাব্যঞ্জক কথা সে বলে নাই। অবশ্য যে ভাষাতে আমি পুঁঠার কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতেছি সে ভাষা পুঁঠার ভাষা নয়,

তোমাদের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া এইভাবে লিখিতেছি। সে যুগে আমাদের ভাষার অন্যপ্রকার রূপ ছিল। শুধু রসনা দিয়া নয়, সর্বাঙ্গ দিয়া আমরা কথা বলিতাম। পুঠার চোখের দিকে চাহিয়া তাহার নিদারুণ বেদনাটা টের পাইলাম। কিন্তু কেন যে এ বেদনা, তাহার সম্যক তাৎপর্যটা তখনও আমার কাছে পরিস্ফুট হইল না। কি অপমানে লজ্জায় তাহার ভিতরটা যে পুড়িয়া যাইতেছে যাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলিতেও তাহার আত্মসম্ভ্রম আহত হইতেছে—তাহা আমি তখন ঠিক বুঝিতে পারি নাই। নীরবে অনেকক্ষণ দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিলাম।

...সহসা মাথার উপর শব্দ হইল—কাঁক, কাঁক, কাঁক—! পুঠার অন্তরের বেদনা যেন আকাশে বাঙময় হইয়া উঠিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম এক ঝাঁক হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। পুঠারও সহসা রূপান্তর ঘটিল। তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চক্ষু দিয়া সহসা যেন বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বক্ষের উপর মুষ্টিবদ্ধ দুই হস্ত চাপিয়া উদ্ভাসিত নয়নে সে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু মুখে অনেকক্ষণ কিছু বলিল না।

আমিই পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "ওই হাঁসের দল কোথা হইতে আসিল? উহারা কোথায় থাকে?" আমার কথায় পুঠার যেন চমক ভাঙিল। আমার দিকে ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তা জানি না। শুধু জানি আমি যেদিন রোমশ-গণ্ডার হইয়াছিলাম, সেইদিন এই হাঁসের দল এমনিভাবে ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া আসিয়াছিল। কোথা হইতে আসিয়াছিল জানি না। তবে কি রোমশ-গণ্ডারও আজ আসিবে..."

পুঠা এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। আমিও চাহিতে লাগিলাম। দিগন্ত বিস্তৃত বরফ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পুঠা চক্রবাল রেখার দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আসিবে, নিশ্চয় আসিবে। হাঁসের দল আসিয়াছে, সে-ও আসিবে। আবার সব হইবে। তুমি আসিয়াছ—"

সহসা সে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পুঠা জড়াইয়া ধরাতে চমকাইয়া উঠিলাম। পুঠার আলিঙ্গন-পাশ হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাহা অসম্ভব। বলিষ্ঠ-পুঠার দৃঢ় বাহুদ্বয় অজগরের মতো আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। আমার চোখেমুখে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল অদৃশ্য অগ্নিশিখার মতো তাহার তপ্ত নিশ্বাস। একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাহার চোখের দৃষ্টিতে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

"চল, চল"—আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া সে বলিল। অনুনয় এবং আদেশের এমন সমন্বয় আর কখনও শুনি নাই।

সে আমাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। আমিও আর বাধা দিলাম না, তাহার নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলাম। মনে হইল একটা

উত্তাল তরঙ্গময়ী খরস্রোতা নদীর স্রোতে যেন ভাসিয়া চলিয়াছি। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম, কোন্ দিকে চলিয়াছিলাম তাহা আমার খেয়াল ছিল না। সহসা লক্ষ্য করিলাম যে গর্তটায় কিছু আগে মৃত বল্‌গা হরিণটাকে রাখিয়া গিয়াছিলাম সেই গর্তটার সমীপবর্তী হইয়াছি।

পুঠা আমাকে ছাড়িয়া দিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া গর্তের মুখে আমি যে বরফ চাপা দিয়া গিয়াছিলাম হস্তপদসহযোগে তাড়াতাড়ি সে তাহা সরাইয়া ফেলিতে লাগিল। মনে পড়িল বহুকাল পূর্বে একটা বন্য ভল্লুককে ওইভাবে মাটি খুঁড়িতে দেখিয়াছিলাম। পুঠাকেও মানুষ বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল একটা ভল্লুকী বুঝি আদিম ক্ষুধার তাড়নায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তাহার পর আমিও আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমিও তাহার সহিত যোগ দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্তের মুখটা বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। পুঠা ভিতরে ঢুকিল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার অনুসরণ করিলাম। প্রকাণ্ড মৃত হরিণটা গর্তের একধারে পড়িয়াছিল। সম্ভবত তাহার শরীরের তাপেই গর্তের ভিতরটা একটু গরম হইয়াছিল।

...কিছুক্ষণ পরে মৃত হরিণটাকে টানিতে টানিতে যখন গুহা হইতে আমরা দুইজনে বাহির হইলাম তখন চারিদিক ঊষালোক-রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত সে দৃশ্য। এক ভয়াবহ রক্তবর্ণ দ্যুতি চতুর্দিকের বরফকে যেন রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। চক্রবালসংলগ্ন পর্বতমালা মনে হইতেছে যেন মাংসের স্তূপ। দূর হইতে জল-ভল্লুকের করুণ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট হত্যাকাণ্ডের পর কে যেন বুকফাটা কান্না কাঁদিতেছে!

আমি অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। পুঠা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "উহারা রূঠাকে ডাকিতেছে। রোজই ডাকে। এতদিন বলগা হরিণ পাওয়া যায় নাই বলিয়া রূঠা অপেক্ষা করিয়াছে। আজ তুমি বল্‌গা হরিণ শিকার করিয়াছ, আজ রূঠার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। চল, তাড়াতাড়ি আমরা যাই।"

আমিই হরিণ পাইয়াছিলাম, রূঠার পুত্রেরা হরিণ জোগাড় করিতে পারে নাই। হরিণটাকে ঘিরিয়া সকলে মহা-উৎসব শুরু করিয়া দিল। সকলে মিলিয়া আনন্দে উদ্বাহু হইয়া নাচিতে লাগিল। স্থবিরা রূঠাও। মনে হইল তাহার আনন্দই সর্বাধিক। ন্যুব্জ দেহটাকে মহা উৎসাহে টানিয়া তুলিয়া সে তাহার সন্তান-সন্ততির সহিত নাচিতে লাগিল—নাচিতে নাচিতে বারবার সে সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "বল্‌গা হরিণ, চল আমরা দুইজনে এবার একসঙ্গে থাকিব। আমরা পুত্র-কন্যা দৌহিত্র-দৌহিত্রীর দেহ-অরণ্যে এইবার আমরা পাশাপাশি বাস করিব। জল-ভল্লুক এবং বল্‌গা হরিণ এবার পাশা-পাশি থাকিবে। আর তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইবে না। অনেক দিন ছাড়াছাড়ি

হইয়াছিল আর হইবে না। আর আমাকে রোগে ভুগিয়া মরিতে হইবে না। মাটির কৃমিকীটেরা আর আমার দেহ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে না। আমার ছেলেমেয়েদের দেহে, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের নবীন অঙ্গে অঙ্গে আমি এবার চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব। ওরে পুঠা, তুই বড় ভাল, তোর মানুষ আজ বলগা হরিণকে ডাকিয়া আনিয়াছে! তুই বড় ভাল। তোর হাঁসও এইবার আসিবে, গণ্ডারও আসিবে। আমি তোর গণ্ডারকে পাঠাইয়া দিব। আর দেরি নয়, আমাকে তোরা এইবার মুক্তি দে, আমি চলিয়া যাই, আমি তোদের নবীন জীবনে চলিয়া যাই, বলগা হরিণের সঙ্গে চলিয়া যাই—"

এইসব বলিতে বলিতে বৃদ্ধা রুঠা হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্রমাগত নাচিতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক একটি অল্পবয়স্কা কুমারী রুঠাকে আসিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, "যাইবার আগে বলিয়া যাও, আমি কি হইব। আমি তো স্বপ্নে কাহাকেও দেখি নাই।"

রুঠা কাহাকেও মাছ, কাহাকেও শ্বেতভল্লুক, কাহাকেও হংস, কাহাকেও আর কোনও জন্তু হইতে বলিল। যাহারা স্বপ্নে বিশেষ কোনও জন্তুকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহারাও সে কথা আসিয়া রুঠার কানে কানে বলিল।

রুঠা আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিতে নাচিতে প্রত্যেকের কাছে গিয়া প্রশ্নও করিতে লাগিল, "আমি তোমার ভিতরে গিয়া এবার বাস করিব। আমি আর ওই বলগা হরিণ। আমাদের ভালভাবে থাকিতে দিবে তো? যত্ন করিবে তো?"

প্রত্যেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় দিব।" যত বার রুঠা এই সমর্থন পাইল তত বার যেন তাহার উত্তেজনা বাড়িতে লাগিল। তাহার নৃত্য ক্রমশ উদ্দাম হইতে উদ্দামতর হইয়া উঠিল। সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল— আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও। ক্রমশ তাহার চীৎকারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরাও নাচিতেছিলাম। রুঠার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে রুঠার পুত্রকন্যারাও অট্টনাদ করিতেছিল।

মধ্যে পড়িয়া ছিল বল্লমবিদ্ধ বিরাট বলগা হরিণটা। তাহার শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বিশাল শৃঙ্গ, তাহার বক্ষের রক্তাক্ত-ক্ষত, তাহার আকাশ-মুখী নিষ্পলক দৃষ্টি, রৌদ্রালোকিত তুষার-প্রান্তরে নৃত্যপরা অসভ্য মানব-মানবী পরিবৃত তাহার সেই সৌম্য শবদেহ সেদিন যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল তাহা আজ তোমরা বোধ হয় কল্পনাও করিতে পারিবে না। ছবিটা হয়তো কল্পনা করিতে পারিবে, কিন্তু সেই উন্মাদনাটা অসভ্য মানবের পর-লোক প্রবণতার সেই আদিম উৎসবটার পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আমিও নাচিতেছিলাম, রুঠাও নাচিতেছিল। নাচ কতক্ষণ চলিয়াছিল তাহা মনে নাই, হঠাৎ রুঠা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইতেই নাচটা থামিয়া গেল। পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রুঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দিক্ষু একটা মুগুর লইয়া ছুটিয়া আসিল এবং সজোরে রুঠার মাথায় আঘাত করিল। রুঠা মরিয়া গেল। মরিয়া

যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িল এবং তাহার গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। সকলকে সরাইয়া দিক্ষু অবশেষে রুঠার দেহটা বাহিরে টানিয়া আনিল এবং পাথরের একটা বড় ছোরা দিয়া সেটাকে টুকরা করিতে লাগিল। বল্‌গা হরিণটাকেও কুচি কুচি করা হইল। রুঠার মাংস ও বল্‌গা হরিণের মাংস একসঙ্গে মিশাইয়া সেই মিশ্রিত মাংস একটু একটু করিয়া প্রত্যেকে খাইল। অবশ্য পুঠা ছাড়া। দিক্ষু আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, "তুমি লইবে কি? তুমি কি?"

পুঠার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, "লইব বই কি, আমিও যে জল-ভল্লুক।"

সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। করিল না কেবল লুং, রুঠার এক দৌহিত্রী। সে-ই কেবল চোখ বড় বড় করিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রথম যেদিন ইহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল সেই দিনই লুংয়ের চোখে এই দৃষ্টি দেখিয়াছিলাম। সে আশা করিয়াছিল যে, আমি বোধ হয় জল-ভল্লুক নই। আমাকে লইয়া সে হয়তো নূতন সংসার পাতিতে পারিবে। সে আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর পুঠার দিকে চাহিল। পুঠা সাড়ম্বরে দিক্ষুর নিকট বর্ণনা করিতেছিল আমি কিরূপ দক্ষতার সহিত বলগা হরিণটা শিকার করিয়াছিলাম। বলগা হরিণ না পাইলে সেদিন এ উৎসব হইত না, কারণ রুঠার ছেলেরা বল্‌গা হরিণ পায় নাই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমিই সেদিনকার উৎসবের নায়ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেছিল। কেবল লুংয়ের দৃষ্টিতে যাহা ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা প্রশংসা নয়—ঈর্ষা। লোভ ও ঈর্ষার একটা হিংস্র সমন্বয়। ইহাতে কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম না, গোপনে গোপনে আনন্দই অনুভব করিতেছিলাম। তন্বী লুংয়ের নবোদ্ভিন্ন যৌবনের দিকে চাহিয়া আমিও প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম। লোভ মানুষকে চিরকাল বিপথে লইয়া গিয়াছে। এই লোভ আমারও সর্বনাশ করিল।

পুঠার সহিতই বাস করিতে লাগিলাম। বাঘিনী যেমন তাহার শাবককে আগলায়, পুঠাও আমাকে তেমনি আগলাইয়া বেড়াইত, একদণ্ড চোখের আড়াল কবিত না। উপর্যুপরি নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর আহার পাইয়া আমার শরীরে আবার অসুরের শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হইয়াছিলাম বলিয়াই হোক অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক আমার শরীর আয়তনে ইহাদের শরীর অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ইহাদের কেহই আমার সমকক্ষ ছিল না।

...কিছুদিন পরে আমি আবার একটা বল্‌গা হরিণ শিকার করিলাম। তুষার-প্রান্তরের শেষ সীমায় দিগন্তবিস্তৃত যে প্রকাণ্ড জলরাশি ছিল, সেখান হইতে

প্রায়ই আমি নানারকম মৎস্যও শিকার করিয়া আনিতাম। আমার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। নিজের কর্মনিপুণতায় আমি ক্রমশ ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিলাম এবং একদিন ইহাদের দলপতি হইয়া পড়িলাম। দিক্ষুই এতদিন দলপতি ছিল। কিন্তু যেদিন দিক্ষু শ্বেত ভল্লুকের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, যেদিন আমি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ভল্লুকটাকে মারিয়া তাহাকে বাঁচাইলাম, সেদিন হইতেই সকলে আমাকে দলপতিরূপে স্বীকার করিয়া লইল। এমন কি, দিক্ষু নিজেও। সে-যুগেও শক্তিই ছিল প্রভুত্বের নিয়ামক। দিক্ষু অনুভব করিয়াছিল, আমার নিকট নতি স্বীকার না করিলে আমি যে কোনও মুহূর্তে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি। সমস্ত দলটাই আমার স্বপক্ষে। নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া আমি যে দিক্ষুকে বাঁচাইয়াছিলাম, তাহা মহত্ত্বের প্রেরণায় নহে, সমস্ত দলের চক্ষে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করিবার জন্য। সেই অসভ্য যুগেও মহত্ত্বের সম্মান ছিল, তাই মহৎ না হইয়াও আমি মহৎ সাজিতে চাহিয়াছিলাম। দিক্ষুকে বাঁচাইবার পর হইতে আমাকে সকলে বিশেষ একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখিতে লাগিল। আমি যে তাহাদের মধ্যে আসিয়াছি, ইহাতে তাহারা গর্ব অনুভব করিত। বিশেষ করিয়া পুঠার গর্বের অন্ত ছিল না। যে আমি তাহার আবিষ্কার, যে আমি বিশেষ করিয়া তাহারই সম্পত্তি, সেই আমি যে নিত্য নূতন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া শৌর্যের পরিচয় দিতেছিলাম, ইহা সে যেন নিজেরই গৌরব বলিয়া মনে করিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে আমি একটি প্রকাণ্ড জলচর জীবকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা ছুঁড়িয়াছিলাম। বর্শাটা লইয়া জানোয়ারটা জলের তলায় অন্তর্ধান করিয়াছিল। তাহারই সন্ধানে আমরা সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় শ্বেত ভল্লুকটা আসিয়া দিক্ষুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে।

সকলেই ভয় পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া গেল, আমিও গিয়াছিলাম, কিন্তু পুঠার ইঙ্গিতে আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। লুংও ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিতেছিল, আমি কেমন যেন আত্মহারা হইয়া গেলাম, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল। প্রস্তর-ছুরিকাটা দৃঢ় হস্তে চাপিয়া ভল্লুকটার দিকে ছুটিয়া গেলাম এবং তাহার পিঠের উপর লাফাইয়া পড়িলাম। ভল্লুকটা দিক্ষুর উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, আর একটু দেরি হইলে তাহাকে শেষ করিয়া দিত, কিন্তু আমি তাহার পিঠের উপর ছুরি বসাইয়া দিতে সে ঘুরিয়া আমাকে তাড়া করিল। আমার দিকে ফিরিতেই আমি ত্বরিতহস্তে তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিলাম। তবু সে নিরস্ত হয় নাই। তাহার সহিত রীতিমত মল্ল-যুদ্ধ করিয়া তবে তাহাকে পরাস্ত করিতে হইয়াছিল।

তাহার দন্ত ও নখরাঘাতে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, পরে কয়েকদিন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু রণে ক্ষান্ত দেই নাই। তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। রক্তাক্ত দেহে সেদিন যখন মৃত ভল্লুকটাকে টানিতে টানিতে

লইয়া সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম, সেই দিনই সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আমার ললাটে অদৃশ্য তিলক পরাইয়া দিল। সেইদিন হইতেই আমি দলপতি হইয়া গেলাম।

এইভাবেই দিন কাটিয়া যাইতেছিল। আরও হয়তো কিছুকাল কাটিত, কিন্তু পুঠার প্ররোচনায় প্রথমেই যে মিথ্যাচার করিয়াছিলাম, তাহাই আমার কাল হইল। পুঠার কথায় নিজেকে জল-ভল্লুকরূপে পরিচিত করিয়া যে গোষ্ঠীতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা রূঠার গোষ্ঠী। সে গোষ্ঠীতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জল-ভল্লুক। সে গোষ্ঠীর আইন অনুসারে কোনও স্ত্রী-জল-ভল্লুক কোনও পুরুষ জল-ভল্লুকের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না। যদি কেহ করে, প্রাণদণ্ড তাহার শাস্তি। ধরা পড়িলে দলের অন্য সকলে মিলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে। রূঠা, পুঠা এবং ডিংঘার মা নাকি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, হুংজুরা হুংজু হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ তাহাদের সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হয়। তাহার পর একদিন হঠাৎ তিনি কেমন যেন ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন। প্রথমে অজ্ঞান হইয়া খানিকক্ষণ পড়িয়াছিলেন। তাহার পর যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন। চোখ বড় বড় করিয়া মাথার চুল টানিতে টানিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলেরা আমার মেয়েদের নিকট হইতে তফাৎ যাও, আমার মেয়েরা ছেলেদের নিকট হইতে তফাতে থাক"—ক্রমাগত এই একই কথা বলিতে বলিতে আবার তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অজ্ঞান অবস্থাতেও এই একই কথা বলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রূঠা, পুঠা, ডিংঘার অনেকগুলি ভাই ছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল দিঘড়া। মাতৃবাক্য অবহেলা করিয়া এই দিঘড়া নাকি জোর করিয়া ডিংঘার সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। ফলে দুই দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সকলে এত ভয় পাইল যে, বাকি ভাইগুলি রূঠা-পুঠা-ডিংঘার সংস্রব ত্যাগ করিয়া যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল। রূঠা-পুঠা-ডিংঘাও তখন তাহাদের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সোজা পূর্বমুখে চলিতে শুরু করিল। তাহাদের মা নাকি বলিয়াছিলেন যে, যেদিক হইতে সূর্য উঠিয়া আমাদের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, বিপদে পড়িলে সেইদিকেই যাইতে হয়। রূঠা-পুঠা-ডিংঘা তিন দিন তিন রাত্রি পূর্বমুখে চলিয়া অবশেষে জিম্ভন পরিবারের সাক্ষাৎ পায়। এই পরিবারের স্থাপয়িত্রী জিম্ভনের নাম অনুসারেই যদিও এই বংশের নামকরণ হইয়াছিল, কিন্তু আসলে উহারা ছিল মৎস্য। জিম্ভন মৎস্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। এক যাদুকর তখন তাহাকে মৎস্য বংশ স্থাপন করিতে নির্দেশ দেয়। রূঠা-পুঠা-ডিংঘাও এই পরিবারে আশ্রয় লইয়া জিম্ভনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ বংশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু বেশিদিন তাহারা জিম্ভন পরিবারে থাকিতে পায় নাই। জিম্ভন পরিবারের লাফুর সহিত রূঠার

ঘনিষ্ঠতা যখন বেশি রকম প্রকট হইয়া পড়িল, জিম্ভনের পুত্র শিকাং যখন সর্বসমক্ষেই একদিন পুঠাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল, ডিংঘার জন্য যখন জিম্ভন যুবকদের মধ্যে প্রায়ই কলহ আরম্ভ হইল, তখন জিম্ভন রুঠা-পুঠা-ডিংঘাকে আর নিজ পরিবারে আশ্রয় দিতে পারিল না। লাফু ও শিকাংকে লইয়া রুঠা-পুঠা ডিংঘা একদিন সরিয়া পড়িল। ডিংঘাকে লইয়াও পরে রুঠা-পুঠার মুশকিল হইয়াছিল, কারণ ডিংঘার স্বভাব নাকি খুব উগ্র ছিল, সে প্রকাশ্যভাবেই রুঠা-পুঠার নিকট হইতে লাফু-শিকাংকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিত। তাহার পর লালহংস দলের সহিত ইহাদের পরিচয় ঘটিল একদিন শিকার করিতে গিয়া। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল। হংস গোষ্ঠীর লোকেরা রুঠা-পুঠা ও ডিংঘার সহিত মিলিবার জন্য প্রায়ই আসিত। কিন্তু সহসা একদিন ডিংঘাকে লইয়া হংস দলের একটি যুবক পলায়ন করিল। তাহার পর এই হংস দলের সহায়তায় ডিংঘা টিট্টিভ বংশ স্থাপন করিয়াছে। এখন এই টিট্টিভ গোষ্ঠীর সহিত জল-ভল্লুক এবং রোমশ গন্ডারদের নিত্য কলহ। রুঠা-পুঠার অনেক সন্তান টিট্টিভদের কবলে পড়িয়া নিহত হইয়াছে। রুঠার দলের অনেক পুরুষকে টিট্টিভ যুবতীরা ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমি এই ইতিহাস শুনিয়াছিলাম লুংয়ের মুখে। শুনিবার ইতিহাসটিও অদ্ভুত। একটা গোটা মাছ তাড়াতাড়ি গিলিতে গিয়া পুঠার গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়াছিল। সেদিন তাই সে-নিশীথ-অভিযানে বাহির হইতে পারে নাই। আমি একাই বাহির হইয়াছিলাম। অতিশয় সন্তর্পণে পা টিপিয়া ঘুমন্ত পুঠাকে ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম লোভের বশবর্তী হইয়া। সকলের অগোচরে একদিন একটি জল-ভল্লুককে খাইয়াছিলাম। সে মাংস আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু আমি নিজেকে জল-ভল্লুক বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলাম, সেই হেতু আমার প্রকাশ্যে জল-ভল্লুকের মাংস খাইবার উপায় ছিল না। পুঠাও আমাকে প্রকাশ্যে খাইতে বারংবার মানা করিয়াছিল। পুঠার সহিত নিশীথ-অভিযানে যখন বাহির হইতাম, তখন একদিন পুঠার সম্মতি লইয়াই একটি জল-ভল্লুকের শাবককে গলাধঃকরণ করি। পুঠা সম্মতি দিয়াছিল, তার কারণ, সে জানিত যে আমি সত্য-সত্যই জল-ভল্লুক নহি, ভাণ করিয়াছি মাত্র। যাহারা প্রকৃত জল-ভল্লুক তাহারাই জল-ভল্লুকের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য। পুঠা রোমশ গন্ডার, তাহারও জল-ভল্লুকের মাংস খাইতে বারণ নাই, কিন্তু সে-ও কখনও প্রকাশ্যে জল-ভল্লুকের মাংস আহার করিত না। আমাকেও আহার করিতে দিত না। যে বন্য উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা এতদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছি, এই বিধি-নিষেধবদ্ধ সমাজে আশ্রয় পাইয়া তাহা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতেছিল সত্য, কিন্তু সমাজকে না মানিয়া উপায় ছিল না। অতীতের উদ্দাম বন্ধনহীন জীবনের জন্য মাঝে মাঝে আকুলতা জাগিলেও একথা স্বীকার করিতেছি যে, বিধি-নিষেধ অমান্য করার মধ্যেও একটা নূতন ধরণের আনন্দ ছিল, তাহাও ক্রমশ

আবিষ্কার করিতেছিলাম। ঘুমন্ত পুঠাকে ফেলিয়া যখন বাহির হইয়া আসিলাম, একটা নূতন ধরণের উন্মাদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষামিশ্রিত নূতন একটা অনুভূতি সমস্ত সত্তাকে যেন উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধকার রাত্রি। চাঁদ তখনও ওঠে নাই, আকাশে অগণ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছে। মনে আছে, আকাশ-ভরা নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া সেই দিনই বোধ হয় প্রথম বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, অসংখ্য-চক্ষু ওই বিরাট দৈত্যটা হুমড়ি খাইয়া কি দেখিতেছে! আকাশকে একটা দৈত্যরূপেই কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাও তৎক্ষণাৎ মনে হইয়াছিল যে, দৈত্য হইলেও শত্রু নয়, বন্ধু। শত্রু হইলে আমাদের এতদিন অনায়াসে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারিত। মাঝে মাঝে যখন চটিয়া যায়, তখন বজ্র নিক্ষেপ করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই প্রসন্ন থাকে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কেহ কোথাও নাই। চন্দ্রোদয় আসন্ন। তুষার-প্রান্তরের শুভ্রতা অন্ধকার ভেদ করিয়া আবছাভাবে দেখা যাইতেছে। নক্ষত্রালোক অপূর্ব রহস্যলোক সৃজন করিয়াছে। সহসা মৃদু ক্রন্দন-ধ্বনি ভাসিয়া আসিল, সেই পরিচিত ধ্বনি, জল-ভল্লুকের শাবকের আহ্বান...। শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। বেশি দূর যাইতে হইল না। অল্পদূর গিয়া দেখিতে পাইলাম, একটি বৃহৎ জল-ভল্লুক (যাহাকে তোমরা আজকাল সীল বল) কয়েকটি শাবক লইয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ পাইয়া হুড়মুড় করিয়া সব কয়টিই জলে নামিয়া গেল। নিতান্ত শিশুটি পারিল না, তাহাকে আমি ধরিয়া ফেলিলাম এবং অবিলম্বে আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। সে-যুগে রহিয়া-সহিয়া কিছু করিবার উপায় ছিল না। বিলম্ব করিলেই বিপদ ঘটিত।

...তবু বিপদ ঘটিয়া গেল। তখনও আমার খাওয়া শেষ হয় নাই, মুন্ডটা তখনও অভক্ষিত রহিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ আমার পিছন দিক হইতে কে যেন আমাকে জাপটাইয়া ধরিল। চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলাম না, সে আমার গলা ধরিয়া আমার পিঠের দিকে ঝুলিয়াই রহিল এবং পরমুহূর্তেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল। আবার লাফাইয়া উঠিলাম এবং এক ঝটকায় তাহাকে ভূপাতিত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কান্ডও ঘটিল। একঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল। পূর্বদিগন্তে চাঁদ উঠিতেছিল। জ্বলন্ত-নয়না লুংকে চিনিতে পারিলাম। দেখিলাম লুয়ের প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ কৌতুকও আভাসিত হইয়াছে। সে নিষ্পলক নেত্রে খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "তুমি না জল-ভল্লুক? তবে জল-ভল্লুক খাইতেছ যে?" আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। 'আমি যদি এখন গিয়া সকলকে বলিয়া দি'—লুংয়ের চোখের দৃষ্টি কৌতুকে নাচিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে আমার মনে যে বাসনা জাগিয়া উঠিল, তাহা ভয়ানক।

ইচ্ছা হইল, লুংকে হত্যা করিয়া জলে ফেলিয়া দিই। সহসা তাহার গলাটা চাপিয়া ধরিতে গেলাম, কিন্তু ফসকাইয়া গেল। কলহাস্যে তুষার-প্রান্তরকে সচকিত করিয়া লুং ছুটিতে লাগিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করিলাম। শুধু অনুসরণ নয়, অনুনয়ও করিতে লাগিলাম।

"লুং, শুনিয়া যাও। তোমাকে সত্য কথা খুলিয়া বলিব। কোনও ভয় নাই, ফিরিয়া এস। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতেছি, চলিয়া যাইও না, ফিরিয়া এস।"

লুং কিন্তু ফিরিল না। ঘাড় ফিরাইয়া দুই-একবার সে আমার দিকে চাহিল বটে, কিন্তু ফিরিল না। দেখিতে দেখিতে সে একটা প্রকাণ্ড তুষার-স্তূপের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আর তাহার অনুসরণ করা বৃথা ভাবিয়া আমি নিরস্ত হইলাম। আর একটা বরফ স্তূপের উপর গিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, এখন কি করা উচিত। লুং গিয়া যদি সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার প্রাণসংশয়। ইহাদের নিয়ম অনুসারে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা গুরুতর পাপ এবং সে প্যাপের শাস্তি প্রাণদণ্ড। দিক্ষু যদিও ভয়ে ভয়ে আমার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু মনে মনে সে আমার উপর প্রসন্ন নয়। দলের সকলে আমাকে মানিতেছে বলিয়া সে আমাকে মানিতেছে। কিন্তু আমি জল-ভল্লুক হইয়া লুকাইয়া জল-ভল্লুক হত্যা করিয়া আহার করিয়াছি—এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িলে কেহই আমাকে মানিবে না। সকলেই আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। তখন পুঠাও আমাকে আর বাঁচাইতে পারিবে না। এখন একটিমাত্র পথ খোলা আছে—পলায়ন। কিন্তু কোথায় পলাইব? এই তুষার-প্রান্তরের তিন দিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি। আর একদিকে বহুদূরে একটা অরণ্য আছে শুনিয়াছি, যে-অরণ্যে হুংজু থাকে, যে-অরণ্যের অভিমুখে সেদিন বলগা হরিণের দলকে যাইতে দেখিয়াছি। জলরাশি অতিক্রম করিয়া যাওয়া অসম্ভব। ওই অরণ্যের দিকেই যাইতে হইবে। হুংজুর ঝুঁকিয়া-পড়া বিকট চেহারাটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল, বলগা হরিণদের ছবিটাও ফুটিয়া উঠিল। পুঠা বলিয়াছিল, হুংজু যদি ধরিতে পারে, মাথাটা কড়মড় করিয়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহাকে ধরা দিব কেন? তাহার নাগালের মধ্যে আসিব কেন? দূর হইতে বর্শা ছুঁড়িয়া আমিই তাহাকে হত্যা করিব, আমিই তাহার মাথাটা চিবাইয়া খাইব। বর্শা দেখিয়া সেদিন হুংজু ভয় পাইয়াছিল—তাহার পলায়মান মূর্তিটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—মনে হইল সে যত বলবানই হোক না কেন, তাহাকে আমি পরাজিত করিবই। বলগা হরিণের দলও আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছিল! ঠিক করিলাম, অরণ্যের দিকেই যাইব। পুঠা আমাকে যে বর্শা, ছোরা, বর্মাবরণ এবং কাষ্ঠপাদুকা দিয়াছিল, তাহা তো সঙ্গেই আছে, তবে আর কালবিলম্বে প্রয়োজন কি? দেরি করিলেই বরং বিপদ, লুং এতক্ষণ হয়তো সব কথা সকলকে বলিয়া দিয়াছে। উঠিতে যাইব এমন সময় বরফ

স্তূপের অপর পার্শ্বে চাপা হাসি শুনিতে পাইলাম। তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ছুটিয়া অপর পার্শ্বে গিয়া দেখিলাম, লুং দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করিল—

"তুমি আমাকে ডাকিতেছিলে কেন? সত্যই কি সত্য কথা খুলিয়া বলিবে? বল না।"

"বলিতে পারি যদি তুমি কাহাকেও না বল।"

"পুঠাকেও না?"

লুংয়ের চোখের দৃষ্টি পুনরায় কৌতুকে নাচিতে লাগিল। আমার দিকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। চতুর্দিকে তুষারধবল নির্জনতা, জ্যোৎস্না তাহার তন্বী দেহকে ঘিরিয়া যে মোহিনী মায়া সৃজন করিতেছিল, আমি নির্বাক হইয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। সহসা আমার মুখ দিয়া কোন কথাই সরিল না। লুংয়ের কণ্ঠস্বরে পুনরায় আত্মস্থ হইলাম।

"পুঠাকেও বলিব না?"—আবার সে প্রশ্ন করিল।

"পুঠাকে বলিবার প্রয়োজন নাই। সে সব কথা জানে।"

"বেশ। কাহাকেও তাহা হইলে বলিব না। কিন্তু ইহার জন্য আমাকে কি দিবে?"

"কি চাও বল।"

"হাঁটু গাড়িয়া এমনি করিয়া বস।"

কেমন করিয়া বসিতে হইবে, তাহা সে দেখাইয়া দিল। তেমনি করিয়াই বসিলাম।

"এইবার হাত জোড় করিয়া প্রতিজ্ঞা কর—আমি শপথ করিতেছি, এখন হইতে লুংয়ের পদানত থাকিব। সে যখন যাহা বলিবে, তাহাই করিব।"

শপথও করিলাম। আমার শপথ শেষ হইতে না হইতে লুং আসিয়া আমার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সেইদিনই লুং আমাকে তাহাদের সব ইতিহাস খুলিয়া বলিল। সেদিন সেই জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন তুষার প্রান্তরে নামহীন সমুদ্রতটে বসিয়া সবিস্ময়ে এক অজ্ঞাতপূর্ব সমাজের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই আমার জীবন দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। একটি ধারা লুংকে লইয়া গোপনে, আর একটি ধারা পুঠার সহিত প্রকাশ্যে।

আমাকে লইয়া পুঠার গর্বের অন্ত ছিল না, যদিও সে স্বল্পভাষিনী ছিল, বাক্যের সহায়তায় যদিও সে আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিত না, কিন্তু তাহার চোখ-মুখের ভঙ্গীতে, বিস্ময়োৎক্ষিপ্ত ভ্রূ-যুগলে, উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে যাহা প্রকাশিত হইত, তাহাই যথেষ্ট ছিল। শৌর্যে বীর্যে পরাক্রমে দলের মধ্যে আমিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি যে পুঠারই বিশেষ সম্পত্তি, পুঠাকে সামান্যতম তাচ্ছিল্য করিলে যে আমি অবিলম্বে তাহার প্রতিশোধ লইব, তাহা পুঠা আকারে-ইঙ্গিতে সকলকেই সর্বদা বুঝাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে

কেহ সন্তুষ্ট হইত না। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষগণ বিশেষ করিয়া এইজন্যই গোপনে গোপনে আমার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। দিক্ষুই ছিল সেই ষড়যন্ত্রের নেতা। দিক্ষুর রাগের আর একটা কারণ ছিল; কুক্কুরবংশীয়া যে যুবতীটিকে দিক্ষু কিছুকাল পূর্বে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, জল-ভল্লুক সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে প্রত্যেক পুরুষ জল-ভল্লুকেরই তাহার উপর দাম্পত্য অধিকার ছিল। নাংরা কিন্তু আমাকে ছাড়া বিশেষ কাহাকেও প্রশ্রয় দিত না। এমন কি, দিক্ষুকেও না। সামাজিকভাবে নাংরার সহিত আমার মেলামেশা করিবার অধিকার থাকিলেও প্রকাশ্যে আমি তাহা করিতে পারিতাম না পুঠার ভয়ে। পুঠা আমাকে আগলাইয়া বেড়াইত। অন্য কোনও রমণীর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিলে তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া কাঁপিতে থাকিত, চোখের দৃষ্টিতে ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রিনীর উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিত, গর্ র গর্ র করিয়া একটা চাপা আওয়াজও গলার ভিতর হইতে বাহির হইত। মুখে কিন্তু সে কিছু বলিত না। কারণ সামাজিকভাবে আমাকে মানা করিবার তাহার কোনও অধিকার ছিল না। লুংয়ের সম্বন্ধে ছিল, কিন্তু নাংরার সম্বন্ধে ছিল না। কুক্কুরবংশের প্রতিষ্ঠাত্রী নাংরা সমস্ত জল-ভল্লুক-সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। যদিও আমি প্রকাশ্যভাবে নাংরার সাহচর্য করিতে পারিতাম না, কিন্তু নাংরা যে আমার সঙ্গ লাভের জন্য উন্মুখ, একথা দিক্ষুর অবিদিত ছিল না। সে সন্দেহ করিত যে, গভীর রাত্রে আমি বোধ হয় নাংরার সহিত সাক্ষাৎ করি। এ সন্দেহ মিথ্যা নয়। পুঠাকে লুকাইয়া আমি প্রায় প্রত্যহই গভীর রাত্রে বাহির হইয়া পড়িতাম, একথা সত্য। লুংয়ের সহিতই অধিকাংশ দিন সাক্ষাৎ হইত। নাংরার সহিতও মাঝে মাঝে হইত। লুং প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন তুষার স্তূপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিত। নাংরার সহিত আমার যে মাঝে মাঝে সংস্রব ঘটিয়া থাকে, তাহা লুং জানিত, কিন্তু আপত্তি করিত না। আপত্তি করিবার উপায় ছিল না। নিজের স্বার্থের জন্যই সে নাংরাকে সহ্য করিত।

এইভাবেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু অন্যায় বেশি দিন গোপন থাকে না। পুঠা ক্রমশ আমাকে সন্দেহ করিতে লাগিল। একদিন আমি ও লুং এক তুষার-গহ্বরে বসিয়া তাহার দিগন্ত-বিদারী আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। তাহা আর্তনাদ অথবা অট্টহাস্য তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। আর্তনাদই হউক অথবা অট্টহাস্যই হউক, সে-চীৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছিল; দিগন্তবিস্তৃত তুষার প্রান্তর যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আমরা উভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। বলিষ্ঠকায়া পুঠাকে সকলেই ভয় করিত। তাহার গায়ে অসুরের শক্তি। টিট্টিভ সম্প্রদায়ের সহিত এক যুদ্ধে সে বর্শাচালনা করিয়া একাই নাকি বহু শত্রু নিপাত করিয়াছিল। লুং আমার কানে কানে বলিল,—"পুঠা যদি আমাকে তোমার সহিত দেখিতে পায়, এখনই আমাকে হত্যা করিবে। তাহার তীক্ষ্ণ দাঁত আমার গলায় বসিয়া গেলে

আমি আর বাঁচিব না। শিকাংয়ের জন্য পুঠা ইতিপূর্বে বহু কিশোরীকে, বহু যুবতীকে হত্যা করিয়া তাহাদের রক্ত পান করিয়াছে। পুঠার অত্যাচারেই ডিংঘা পলাইয়া গিয়া টিট্টিভ দল সৃষ্টি করিয়া এখন আমাদের শত্রুতাসাধন করিতেছে। পুঠা যেন আমাকে তোমার সঙ্গে না দেখে, তুমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাও।"

আমিও বুঝিতেছিলাম যে, পুঠা আমাকেই খুঁজিতেছে। আমার সহিত দেখা হইলেই সে থামিয়া যাইবে। গুঁড়ি মারিয়া গহ্বর হইতে বাহির হইলাম এবং গিরগিটির মতো বুকে হাঁটিয়া হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পুঠা যে কোন্ দিকে আছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমি কেন পুঠাকে একা ফেলিয়া রোজ রাত্রে বাহির হইয়া যাই, তাহা পুঠা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। উত্তরে আমি তাহাকে একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম—"আমি হুংজুর খোঁজে বাহির হই। হুংজুকে একাকী বধ করিব, ইহাই আমার উচ্চাশা। কাহারও সাহায্য আমি লইতে চাই না, এমন কি, তোমারও না। সেইজন্য আমি একা বাহির হইয়া যাই।"

ইহাতে পুঠা গর্ববোধ করিয়াছিল। পরদিন সে দলের সকলকে ডাকিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াও দিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল সকলকে তাক লাগাইয়া দেওয়া। তাহার পর আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "সত্যিই যদি তুমি এই হুংজুকে হত্যা করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে তুমি শুধু আমাদের দলের নয়, এই প্রদেশের সমস্ত দলের অধিপতি বলিয়া গণ্য হইবে। টিট্টিভরাও হয়তো তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে। কারণ এই হুংজুটা সকলেরই শত্রু। সকলেই ইহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই পারে নাই। এ যেমন ধূর্ত তেমনি বলশালী। কিন্তু ইহার জন্য রাত্রে তোমার একা বাহির হইবার প্রয়োজন নাই। আমার সাহায্য যদি না লইতে চাও, আমি সাহায্য করিব না, দূরে দাঁড়াইয়া থাকিব। কিন্তু একেবারে একা বাহির হওয়া নিরাপদ নয়।" ...তবু আমি একা বাহির হইয়াছিলাম।

পুঠার আর্তনাদ ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছিল। অট্টহাস্য নয়, আর্তনাদই। মনে হইতেছিল পুঠার আর্ত-হৃদয় যেন একটা শব্দের শূল হইয়া স্তব্ধতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। আমি গিরগিটির মত বুকে ভর দিয়া চলিতে লাগিলাম। সহসা পুঠার আর্তনাদ থামিয়া গেল। সে আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পুঠা প্রস্তর-মূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, আগাইয়া আসিল না। আমিই তাহার নিকট গেলাম।

রুক্ষকণ্ঠে পুঠা প্রশ্ন করিল, "তুমি আবার একা বাহির হইয়াছ কেন?"

আমি দূরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলাম। যাহা দেখাইলাম, তাহা যে একটা গাছ মাত্র ইহা আমি জানিতাম। কিন্তু আমি ভাণ করিলাম

যেন ওটাকেই হুংজু মনে করিয়া আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। পুঠা এত সহজে ভুলিবার পাত্রী নয়।

"ওটা যে একটা গাছ তাহা আমিও জানি তুমিও জান—"

"ওটা নয়, ওই যে আরও দূরে। এখন আর দেখা যাইতেছে না। চলিয়া গেল—"

পুঠার দৃষ্টি এড়াইয়া দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পুঠা বলিল, "শোন, এভাবে রাত্রে একা বাহির হইয়া অনিশ্চিত ছায়ার পিছনে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইলে হুংজুকে মারা যাইবে না। এরূপভাবে বাহির হওয়ার অন্য বিপদও আছে। লুং বা নাংরার পাল্লায় যদি পড়িয়া যাও সে রাক্ষসীরা তোমাকে শেষ করিয়া ফেলিবে।"

পুঠার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল। সমস্ত নাকটাই কাঁপিতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"এখন ঘরে ফিরিয়া চল।"

নীরবে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পুঠা ফিরিয়া বলিল, "শোন, হুংজুকে মারিতে হইবে। তুমি একাই পারিবে। কালই তুমি ওই বনের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়। আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাইব।"

আমি কাতরকণ্ঠে বলিলাম, "কিন্তু আমি একাই হুংজুকে মারিতে চাই। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও সে গৌরব হইতে আমি বঞ্চিত হইব।"

"বেশ একাই যাইও। আমি কিছুদূর পর্যন্ত তোমাকে আগাইয়া দিব। কিন্তু একা তুমি হুংজুকে কি করিয়া মারিবে তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

"ঠিক করিয়াছি একটা গাছের উপর বর্শা হাতে লুকাইয়া থাকিব। হুংজুকে দেখিতে পাইলেই বর্শা ছুঁড়িব। আমার লক্ষ্য যে কি রকম অব্যর্থ তাহা সকলেই জানে।"

পুঠার চোখের দৃষ্টি গর্বোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "অরণ্যে বেশ ভাল একটা গাছ আছে। দেখাইয়া দিব।"

পরদিন সকালে জানা গেল নাংরার শিশু-পুত্রটিকে হুংজু লইয়া গিয়াছে। নাংরা পুত্রটিকে লইয়া গতরাত্রে নাকি বাহির হইয়াছিল। মাছের সন্ধানে জলের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে হুংজুকে দেখিতে পাইয়া ছুটিতে থাকে। শিশুপুত্রটি তাহার পিঠে বাঁধা ছিল। ছুটিতে ছুটিতে পিঠের বাঁধন আলগা হইয়া শিশুটি মাটিতে পড়িয়া যায়। নাংরা তাহাকে আর তুলিয়া লইবার অবকাশ পায় নাই। তুলিতে গেলে সে নিজেই হুংজুর কবলে পড়িত। জাজা নামে আর একটি মেয়েও অন্তর্ধান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে হুংজু লইয়া যায় নাই। আমরা জানিতাম সে হ্রদ-সর্প-সম্প্রদায়ের একটি যুবকের সহিত কিছুদিন হইতে মাখামাখি করিতেছিল। সম্ভবত তাহার

সহিতই সে চলিয়া গিয়াছে। জল-ভল্লুক-কন্যারা বড় হইলে হয় এইভাবে চলিয়া যাইত, কিম্বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের ছেলেকে ভুলাইয়া আনিত। বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যারা অন্তর্ধান করিলে সুতরাং কেহ বেশি বিচলিত হইত না। সকলে বলিত, "সে মানুষ খুঁজিতে গিয়াছে। খুঁজিয়া পাইলে আবার ফিরিয়া আসিবে।" মনের মানুষকে লইয়া স্ব-সমাজে ফিরিয়া আসাটাই গৌরবের ছিল। কেহ না আসিলে সকলে তাহাকে শক্তিহীনা সমাজত্যাগিনী বলিয়া গালাগালি দিত। সুতরাং জাজার অন্তর্ধানে আমরা খুব বেশি চিন্তিত হইলাম না। নাংরার চীৎকার কিন্তু আমাদের বিচলিত করিয়া তুলিল। বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, কাঁদিয়া, চীৎকার করিয়া নাংরা সকলের কাছে গিয়া বলিতে লাগিল, "আমার ছেলে আনিয়া দাও, আমার ছেলে আনিয়া দাও।" আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া আমাকে বারবার শোকাবেগে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—"তুমি শক্তিমান, তুমি দলপতি, তুমি আমাকে ছেলে আনিয়া দাও, আমার প্রথম পুত্র, প্রথম জল-ভল্লুক, হুংজুর কবলে গেল, তুমি ইহার প্রতিকার কর।"

পুঠা ওষ্ঠাধর নিবদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া ছিল। সে এইবার কথা বলিলঃ

"ইহার প্রতিকার হইবে। ও কাল হুংজুকে মারিয়া আনিবে। আমি আজ রাত্রে উহাকে লইয়া গিয়া অরণ্যের প্রান্তে পেঁছাইয়া দিব। ও একাই যাইবে, তোমরা কেহ উহার সঙ্গে যাইও না। কাল হুংজু মরিবে।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া এই অদ্ভুত ঘোষণা শুনিল।

সেদিন গভীর রাত্রে আমি এবং পুঠা অরণ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। পুঠার মুখে একটিও কথা ছিল না, আমিও নীরবে অনুসরণ করিতেছিলাম। আমাদের দুজনেরই সর্বাঙ্গ শ্বেত-ভল্লুকের চর্মে আবৃত, দুজনেরই হস্তে প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্মিত বর্শা। ইহা ছাড়া আমার কটিদেশে প্রস্তর-কুঠার এবং প্রস্তর-ছুরিকাও বিলম্বিত ছিল। আশা-আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হইয়া আমি চলিতেছিলাম। কাঁচপোকা আরশুলাকে যে ভাবে টানিয়া লইয়া যায়, পুঠার অদৃশ্য শক্তি ঠিক তেমনি ভাবে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। সেই বিশাল তুষার-প্রান্তরে তৃতীয় কোন ব্যক্তির চিহ্ন ছিল না। মেঘাবৃত চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রকৃতি থম থম করিতেছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতেছিলাম, সহসা সেই নৈশ-নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ উঠিল—কাঁক, কাঁক, কাঁক। পুঠা থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই শ্বেত হংসদল আবার উড়িয়া চলিয়াছে। আমরা উভয়ে ঊর্ধ্বমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর পুঠা ধীরে ধীরে অঙ্গুলি তুলিয়া আকাশের দিকে নির্দেশ করিল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম যে মেঘটা চন্দ্রকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে ঠিক রোমশ গণ্ডারের মতো। নাকের সম্মুখে ঠিক তেমনি খড়্গ, সর্বাঙ্গে তেমনি রোম। পুঠা বর্শাটা ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি একাই যাও, আমি আর যাইব না।

অরণ্যে ঢুকিয়া প্রথম যে বড় গাছটা দেখিবে, তাহাতেই উঠিয়া পড়িবে। আমরা শিকার করিতে গেলে উহাতেই প্রথমে উঠি। কিছুদূর উঠিয়া গাছের কাণ্ডে একটি গর্ত পাইবে। সেই গর্তে বসিবার স্থান আছে। যাও, আর বিলম্ব করিও না।"

অরণ্য বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম পুঠা নতজানু হইয়া করজোড়ে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

অরণ্যে প্রবেশ করিয়াই বড় গাছটি দেখিতে পাইয়াছিলাম। গাছ নয় মহীরূহ। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া বিশাল একটি বৃক্ষরূপী দুর্গ যেন ওৎ পাতিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বৃক্ষের নিম্নে সূচীভেদ্য অন্ধকার। সূচী-ভেদ্য কিন্তু নীরব নয়, ঝিল্লীরবে মুখরিত। আমি অন্ধকারে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া বৃক্ষের কাণ্ডটা কোথায় খুঁজিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ খুঁজিবার পর পাওয়া গেল। বৃক্ষারোহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কোনও শব্দ না করিয়া অতিশয় সন্তর্পণে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলাম। কাণ্ডটি পরিধিতে বেশ বড়, দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরা যায় না। কিন্তু গাছের কাণ্ডে হাত বুলাইতে বুলাইতে কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করিলাম যে, মাঝে মাঝে খাঁজ কাটা আছে। তখন পুঠার কথা মনে পড়িল। পুঠা বলিয়াছিল, "আমরা শিকার করিতে গেলে উহাতেই প্রথমে উঠি।" মনে হইল উহারাই তাহা হইলে খাঁজ কাটিয়া রাখিয়াছে।

খাঁজে পা রাখিয়া সেই বিশাল বৃক্ষের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়াই অভিভূত হইয়া পড়িলাম, কে যেন আমাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। লুং। সে অনেক আগেই আসিয়া গাছে উঠিয়া বসিয়াছিল।

লুং আমার কানে কানে বলিল, "চীৎকার করিও না। হুংজু বাহির হইয়াছে, আশে পাশে ঘুরিতেছে।" রুদ্ধশ্বাসে পাশাপাশি দুজনে বসিয়া রহিলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে নাই। শকুনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখি প্রভাত হইতেছে। লুং আমার কোলের উপর বসিয়া আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই উপরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃদয়স্পন্দন থামিয়া গেল। দিক্ষু তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের লইয়া উপরের ডালে বসিয়া আমাদের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র তাহার মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। সর্পের মতো তর্জন করিয়া চাপা কণ্ঠে সে বলিল, "ঘৃণ্য আগন্তুক, এইবার তোকে হাতে নাতে ধরিয়াছি। বিশ্বাসঘাতককে কি করিয়া শিক্ষা দিতে হয় এইবার তোকে দেখাইব।"

সে বর্শা তুলিতেই আমি লাফাইয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লুং গাছের নীচে পড়িয়া গেল। আমিও মাটিতে লাফাইয়া পড়িলাম। কিন্তু লুং-এর দিকে

ফিরিয়া চাহিবার আমার অবসর ছিল না। আমি দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছিলাম। কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ ছুটিবার পরই দিক পরিবর্তন করিতে হইল। একটা খোলা জায়গায় আসিয়া দেখি একটা রোমশ গণ্ডার দাঁড়াইয়া আছে। সে আমাকে দেখিয়া তাড়া করিল না, সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিলাম। ছুটিতে ছুটিতে একটা ঘন ঝোপের নীচে আশ্রয় লইলাম; সেখানে কিছু আহারও জুটিয়া গেল। বিচিত্র-পক্ষ একটি বন্য হংসী একটি প্রকাণ্ড নীড়ে বসিয়া ডিমে তা দিতেছিল। হংসীটিকে ধরিতে পারিলাম না, কিন্তু ডিমগুলি উদরসাৎ করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একটা হৈ হৈ চীৎকার উঠিল। দিক্ষুর দল চীৎকার করিতেছে। কেন করিতেছে বুঝিতে পারিলাম না। হয়তো তাহারা রোমশ গণ্ডারটাকে দেখিয়াছে, কিম্বা হয়তো আমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমি ঝোপের ভিতর দিয়া কখনও গুঁড়ি মারিয়া কখনও গিরগিটির মতো বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে দিক হইতে চীৎকারটা আসিতেছিল সেদিক হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কিছুক্ষণ পরে চীৎকারটা আর শুনিতে পাইলাম না। ঝোপের মধ্যেই চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। দুই হাতের আঙুলগুলি ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছিল। তাহাই চাটিয়া চাটিয়া খাইতে লাগিলাম। অনেক-ক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিয়াও যখন দিক্ষুদলের কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না তখন ঝোপ হইতে সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম সম্মুখেই একটা খোলা প্রান্তর রহিয়াছে। তাহার পর আবার অরণ্য। ছুটিয়া প্রান্তরটা পার হইয়া পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু দূরে গিয়াই দেখি বিস্তীর্ণ জলরাশি। নামহীন এক সমুদ্রতটে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সমুদ্রতটে বসিয়াই কি লুংয়ের মুখে রুঠা-পুঠা-ডিংঘাদের কাহিনী শুনিয়াছিলাম? অন্যমনস্ক হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরক্ষণেই মট মট করিয়া একটা শব্দ হইল। ভারী ওজনের কোনও জন্তু নিশ্চয় এই-দিকেই আসিতেছে। জলের ধারেই একটি ছোট গাছ ছিল। তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার উপর উঠিয়া পড়িলাম। এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে সহসা দেখিতে পাইলাম, হুংজু আসিতেছে। তাহার স্কন্ধে লুংয়ের মৃতদেহ। হুংজু তাহার একটা পা চিবাইতেছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম এবং প্রাণ-পণে সাঁতরাইতে লাগিলাম। বরফ-শীতল জলে সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া যাইতেছিল, তবু নিরস্ত হইলাম না। অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে দুর্বার দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিতে লাগিলাম।

৪

তাহার পর বহু শতাব্দী কাটিয়াছে। আমি কিন্তু মরি নাই। বহু উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া মৃত্যুহীন জীবনের অনন্ত প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমি বিবর্তিত হইয়াছি, কিন্তু মরি নাই। কোন্ ঘাটে কতক্ষণ ছিলাম তাহার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অস্পষ্টতার কুয়াসা ভেদ করিয়া যে ছবিটি মনে জাগিতেছে তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

...বরফের বিভীষিকা আর নাই। চারিদিকে আবার শ্যামশোভা দেখা যাইতেছে। বরফ গলিয়া বহু নদনদীর সৃষ্টি হইয়াছে। নবীন অরণ্য নবীন শ্যামলতায় নবযুগের বলগা হরিণের দলকে আকৃষ্ট করিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে বেশি শীত পড়ে, তখন বলগা হরিণের দল সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বলগা হরিণই তখন আমাদের জীবন ধারণের প্রধান উপায়। তাহাদের অনুসরণ করিয়া আমরাও চলি।

...সেদিন আমি এক উপল-বহুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া একটি কুটির অভিমুখে চলিয়াছিলাম। আমার আকৃতি ও বেশ দুই-ই পরিবর্তিত হইয়াছিল। আকৃতির ঠিক বর্ণনা দিতে পারিব না। তবে নদীর জলে নিজের যে ছায়া প্রতিফলিত দেখিতাম তাহা ঠিক ভীত চকিত বন্য জন্তুর ছবি নহে। আত্ম-বিশ্বাসের নিগূঢ় শক্তি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম। আত্মপ্রতিষ্ঠার মর্যাদা-বোধ আমার মুখভাবে গতিভঙ্গীতে আসন্ন আভাস। আমি আর হিংস্রজন্তু-তাড়িত প্রকৃতি-বিপর্যস্ত পশুমাত্র ছিলাম না। নিজের শক্তিবলে নিজের নিরাপত্তা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং সে বার্তা আমার নিজের অজ্ঞাতসারে আমার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আমার দক্ষিণ স্কন্ধে বিলম্বিত ছিল একটি শ্বেত ভল্লুকের চর্ম, বামস্কন্ধে ধনুক। কটিদেশে ছিল বলগা-হরিণ-চর্ম-নির্মিত প্রশস্ত কটিবন্ধন। কটিবন্ধনের একধারে ঝুলিতেছিল একটি প্রস্তর কৃপাণ, আর একধারে কয়েকটা তীর গোঁজা ছিল। আমার দীর্ঘ কেশ আর অবিন্যস্ত ছিল না, লতা দিয়া ঝুঁটি বাঁধিয়াছিলাম।

...প্রভাতের অরুণাভায় যে মেঘমালা অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল একটা প্রখর বাতাসে সহসা সেগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। মনে হইল অগ্নিশিখা আকাশ ব্যাপিয়া উড়িতেছে। থানকুর কথা মনে পড়িল, বৃদ্ধা থানকুর কাছে অনেক গল্প শুনিয়াছি। থানকু বলে আদিম পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। মানুষের মধ্যে ক্রমশ পাপ প্রবেশ করিল। সেই পাপের ফলেই পাপী মানুষেরা জন্তু-জানোয়ার-প্রস্তর-বৃক্ষে রূপান্তরিত হইয়া গেল। যাহার যেমন স্বভাব সে

তাহাই হইয়াছে। হিংসুক বিশ্বাসঘাতক সর্প হইয়াছে, বীর্যশালী পাপীরা বাঘ সিংহ গণ্ডার হইয়াছে। ওই অগ্নিবর্ণ মেঘেরাও কি মানুষ ছিল একদিন? কে জানে। কিছুক্ষণ ছিন্নভিন্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রক্তমেঘগুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রখর বাতাসে আমার রুক্ষ শ্মশ্রু উড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার আমি চলিতে লাগিলাম। আমি চলিয়াছিলাম পাত্রীর সন্ধানে। এই স্থানেই ঘর বাঁধা যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নারী চাই। বুহার কন্যা জোলমাকে দেখিয়াছিলাম। তাহারই উদ্দেশে এই অভিযান। তাহাকে কৌশলে চুরি করিবার জন্য যাইতেছিলাম না, বলপূর্বক হরণ করিবার জন্যও নহে, যাইতেছিলাম তাহার পিতার নিকট প্রার্থিরূপে। বিনিময়ে বুহাকে যাহা দিব স্থির করিয়াছিলাম, তাহার লোভ বুহা সম্বরণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হইতেছিল না। এই অপরিচিত অঞ্চলে বুহার মতো একজন লোককে যদি আত্মীয়রূপে পাইতে পারি, আমার অনেক সুবিধা হইবে।

একদল বল্‌গা হরিণের পিছু পিছু এই অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। একা আসি নাই, আমাদের সমস্ত দলটাই আসিয়াছিল। খাদ্যের অনুসরণ করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানোই তখন আমাদের কাজ ছিল। বন্য ঘোড়া, বন্য মহিষ, বাইসন, হরিণ, শূকর ইহারাই ছিল আমাদের জীবনের প্রেরণা। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা যেখানে যায়, আমরাও সেখানে যাই। আমাদের দলের কয়েকজন লোক সর্বদা ইহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে। কয়েকজন শিকার করে। কেহ কেহ ফাঁদ পাতে। ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই এইভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বল্‌গা হরিণকে অনুসরণ করিয়া তুষারের দেশ ছাড়িয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। সেই জীবনধারাই অনুসরণ করিতেছি।

...আমি দল হইতে সহসা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কয়েকদিন পূর্বে একটা ম্যামথের সন্ধান পাইয়া আমাদের দলের সকলে নদীর ওপারে গিয়া গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিল। ম্যামথ তখন দুষ্প্রাপ্য, এবং সেইজন্য লোভনীয়। ম্যামথ শিকার করার আর একটা প্রবলতর কারণও ছিল। ম্যামথেরা বল্‌গা হরিণের দলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিত। কোনও বনে ম্যামথ আসিলে বল্‌গা হরিণরা সে-বন ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। নিজেদের স্বার্থের জন্যই ম্যামথটাকে শিকার করিয়া বল্‌গা হরিণের রক্ষণাবেক্ষণও আমাদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। আমাদের যেদিন নদীর ওপারে চলিয়া যাইবার কথা, ঠিক সেইদিন ভোরে আমি একা উঠিয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। হঠাৎ একটা বল্‌গা হরিণ দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। কিছুদূর গিয়া তাহাকে মারিলাম বটে, কিন্তু একটা গর্তে পড়িয়া গিয়া পায়ে গুরুতর আঘাতও পাইলাম। অনেকক্ষণ উঠিতে পারিলাম না। তাহার পর কোনক্রমে মৃত হরিণটাকে টানিতে টানিতে নিকটবর্তী একটা বৃক্ষকোটরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। আমার সঙ্গীরা ভাবিয়াছিল, আমি বোধ হয় সঙ্গেই আছি। আমাদের দলে শতাধিক লোক

ছিল, আমি যে তাহাদের মধ্যে নাই, ইহা সহসা আবিষ্কার করা তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না।

পায়ের ব্যথা সারিতে বেশ বিলম্ব হইয়া গেল। ভাগ্যে বল্গা হরিণটাকে মারিতে পারিয়াছিলাম, তাহা না হইলে অনাহারেই হয়তো কাটাইতে হইত। এই কয়দিন বৃক্ষ-কোটর-বাস কিন্তু নিষ্ফল হয় নাই। এই সময়ই জোলমাকে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। জোলমার চোখের তারা নীল। এমন তো আর কখনও দেখি নাই।

ভাবিয়াছিলাম পায়ের ব্যথা কমিলে নদী পার হইয়া দলে গিয়া যোগদান করিব। কিন্তু পায়ের ব্যথা কমিবার পর নদীতীরে গিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কয়েকদিন পূর্বে যে-নদী শীর্ণকায়া ছিল, সহসা তাহা দুকূলপ্লাবিনী হইয়াছে। এত খরস্রোতা যে হাঁটিয়া পার হওয়া অসম্ভব। সাঁতার দিয়া হয়তো পার হইতে পারিতাম, কিন্তু নদী তরঙ্গে এক অদ্ভুত ভাষা শুনিলাম। একটা তীব্র বায়ু হু-হু করিয়া বহিতেছিল। নদীর তরঙ্গদল নাচিতেছিল, আর বলিতেছিল—না, না, না।

বহুদূরে চক্রবালনিবদ্ধ পর্বতশ্রেণীর দিকে চাহিলাম। এই নদী উহারই বুকের ভাষা, উহারই বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে যেন ওই পর্বত-দেবতারই আদেশ শুনিলাম। শান্ত শীর্ণ নদীকে সহসা তটবিপ্লাবিনী উন্মাদিনী করিয়া দেবতা কিসের ইঙ্গিত করিয়াছেন? পাহাড়টার দিকে সভয়ে বহুক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়াছিলাম। মনে হইল পর্বত-দেবতার অমোঘ বিধান নীরব ভাষায় যেন আমার অন্তরে সঞ্চারিত হইল, 'যে দল তোমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহারা তোমার আত্মীয় নয়! তুমি এই পারেই আত্মীয় পাইবে। নূতন জীবন আরম্ভ কর, পুরাতন জীবনে আর ফিরিয়া যাইও না।'

জোলমার কথা মনে পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—আর ফিরিয়া যাইব না? পিকী, বনটু, বোহিলা, ঘুনু, জামাইকিনা, দোস্কী প্রভৃতি বহু রমণীকে লইয়া যে সংসার পাতিয়াছিলাম, সেখানে আর ফিরিব না? সহসা মনে হইল, পিকী, বনটু, বোহিলা জামাইকিনা, দোস্কীরা আমার একার নয়। বহু পুরুষের সঙ্গে তাহাদের সংস্রব। জোলমার সঙ্গে তো কোনও পুরুষকে দেখিলাম না। এ অঞ্চলে পুরুষই বেশি দেখিতেছি না। তবে কি জোলমা আমার একারই হইবে? যদিও এ-চিন্তা সে যুগে কল্পনাতীত ছিল, তবু ক্ষণিকের জন্যও এই সম্ভাবনাটা চিত্তকে পুলকিত করিয়া তুলিল। বিমূঢ় স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে শুনিতে লাগিলাম—না, না, না, না। দেবতারও কি ইহাই অভিপ্রায়? অন্তরের বিচিত্র বাসনা যেন বাঙ্ময় হইয়া আমার কানে কানে বলিতে লাগিল—নিশ্চয় তাই। তাহা না হইলে আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে এই দুরতিক্রম্য বাধা কে সৃজন করিল? কেন সৃজন করিল? মনে পড়িল ইক্ঘার স্বপ্ন-বিধান

অগ্রাহ্য করিয়া গোপনে মাতৃকুলজাত নিন্‌কির প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলাম, তাহার গর্ভে একটি সন্তানও হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পরিণাম যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অতি ভয়ানক। ঝড়ে গাছ পড়িয়া আমার দশটি সন্তান নিহত হইল, নিন্‌কিকে বাঘে খাইল, আমি নিজেও ভয়াবহ পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। নিদারুণ মারী-গুটিকায় সর্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। বহুকাল শয্যাগত থাকিয়া ওই ইক্‌ঘার উদ্দেশে বহু অর্ঘ্য উপহার দিয়া কোনক্রমে আবার প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছি, ইক্‌ঘার কাছে শপথ করিয়াছি আর কখনও দেবতার বিধান অগ্রাহ্য করিব না। পর্বতের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মূর্তিমান গাম্ভীর্য। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে বাজিতেছে—না, না, না, না।

ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। স্থির করিয়া ফেলিলাম দেবতার বিধান অগ্রাহ্য করিব না, করিবার উপায়ও ছিল না। আবার হঠাৎ জোলমাকে দেখিলাম। বনের মধ্যে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে যে অবস্থায় ছিল তাহাতে অনায়াসে তাহার উপর বলাৎকার করিতে পারিতাম। কিন্তু বলাৎকার করিবার সাহস ছিল না। ভয় জোলমাকে কিম্বা জোলমার পরিবারবর্গকে নয়, ভয় নিজের মধ্যেই ছিল। জ্ঞান হইয়া অবধি কিম্বদন্তী শুনিয়াছি, পুরাকালে প্রবল পরাক্রান্ত দলপতি বিহাড়া শবরী ওকাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিল। শবরী ওকার মাথার প্রত্যেকটি চুল নাকি নাগিনীতে রূপান্তরিত হইয়া বিহাড়া বংশের প্রত্যেককে দংশন করিয়াছিল, প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু নাকি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হইয়া ছারখার করিয়াছিল তাহার রাজ্যকে। সেই অশ্রু-স্ফুলিঙ্গগুলি আজও আকাশের লক্ষ লক্ষ তারায় জাগিয়া আছে। লক্ষ চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছে কোথাও কেহ কাহাকেও বলাৎকার করিতেছে কি-না। করিলেই আকাশ হইতে তাহার মাথায় বজ্র পড়িবে। নাগিনীরাও লুকাইয়া আছে, পৃথিবীর গর্তে গর্তে তীক্ষ্ন দন্তাগ্রে মৃত্যুদণ্ড বহন করিয়া। ধর্ষণকারী নিস্তার পাইবে না। শবরী ওকা সতর্ক দৃষ্টিতে প্রত্যেক নরনারীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

না, বলাৎকার করিবার সাহস আর ছিল না। তাহার দ্বারে গিয়া প্রার্থী হইতে হইবে। বৃহার পরিচিত বিতং আমাকে এই পরামর্শ দিয়াছিল। বনে ঘুরিতে ঘুরিতে বিতং নামক অদ্ভুত যুবকটির সহিত দেখা হইয়াছিল। বল্‌গা-হরিণের ডাক শুনিয়া গিয়া দেখি বিতং ডাকিতেছে। তাহার গায়ে হরিণের রঙ্, মাথায় হরিণের শিং বাঁধা। সে আমাকে দেখিয়া, হাসিয়া ফেলিল। বলিল, “শেষ হরিণটিকে তুমিই বোধ হয় মারিয়া ফেলিয়াছ। এ বনে আর হরিণ নাই। থাকিলে নিশ্চয় আসিত।”

তাহার কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। “আমি হরিণ মারিয়াছি তুমি কি করিয়া জানিলে?”

“আমি দেখিয়াছি যে। শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের হইয়া আমিই তো এ বনে বলগা হরিণদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করি। আমাদের এলাকায় যখন হরিণ-

দের দল ঢোকে আমি বুহাকে গিয়া খবর দিই। বুহা আমাদের যাদুকর। সে হরিণের ছবি আঁকে, সেই ছবির কানে কানে কি সব বলে। অদ্ভুত লোক সে। বুহাকে চেন না? তাহার মেয়ে জোলমাকে নিশ্চয় দেখিয়াছ, নীল চোখ—"

"দেখিয়াছি।"

"তাহারই বাবা বুহা। বুহা অসাধারণ লোক। সে বীর, সে যাদুকর, সে ছবি আঁকে। জোলমার মা মারা যাইবার পর সে আর দ্বিতীয় কোনও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসে নাই। জোলমার মা-ও অদ্ভুত লোক ছিল। এদেশের মেয়ে ছিল না সে। বহুকাল পূর্বে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে সে যে কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না।"

এই কথা বলিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বিতং হাতের ও পায়ের সাহায্যে হরিণের মতো তুড়ুক তুড়ুক করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিলাম।

"শোন। বুহা কোথায় থাকে, তাহার সহিত আলাপ করিতে চাই। আমি বিদেশী—"

তুড়ুক করিয়া বিতং ঘুরিয়া বসিল এবং আমার মুখের দিকে মিট মিট করিয়া চাহিতে লাগিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল, "সুবিধা হইবে না, সে বড় শক্ত ঠাঁই—"

"কেন?"

"জোলমাকে বিবাহ করিতে চাও তো? তাহা সহজে হইবার নয়। বীরত্বের এবং শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বুহা জোলমাকে দিবে না। আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, পারি নাই।"

"বুহা তোমাকে কি করিতে বলিয়াছিল?"

"জোলমার মা যে গাছের গুঁড়িতে চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল, বুহা সেই গুঁড়িটিকে নিজের গুহার সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড পাথরের উপর সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। তাহাতে সে নানারকম রঙ মাখায়। কখনও লাল, কখনও কালো, কখনও হলুদ, কখনও নানা রঙের সমন্বয়। আমাকে সেই গুঁড়িটা পিঠে করিয়া তুলিতে বলিয়াছিল। আমি পারি নাই।"

বিতং হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"তোমাকে এমনভাবে সাজাইয়াছে কে?"

"বুহা। আমি হরিণ সাজিয়া বনে বনে হরিণের সন্ধানে ভ্রমণ করি। আমার ডাকে হরিণেরা সাড়া দেয়। তখন আমি ডাকিতে ডাকিতে আমাদের এলাকার দিকে চলিতে থাকি, হরিণের দলও আমার পিছু পিছু আসিয়া লাফাইয়া পাহাড়ে চড়ে, তখন আমরা তাহাদের তাড়া দিই।"

"এটা কাহাদের এলাকা?"

"এটা সকলের। তোমাদের এলাকা এবং আমাদের এলাকার মধ্যে এই যে বন এটা সকলের। ইহাতে সকলেই শিকার করিতে পারে।"

"আমরা যদি তোমাদের এলাকায় ঢুকিয়া শিকার করি—"

"তাহা কেন করিতে যাইবে! তোমাদের এলাকাতেই তো যথেষ্ট শিকার আছে।"

বিতংয়ের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কিন্তু যদি কেউ চুরি করিয়া করে।"

"চোরের শাস্তি মৃত্যু।"

মুচকি হাসিয়া বিতং আর একবার হরিণের ডাক ডাকিয়া বনে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিতেছিল। আমি আবার তাহাকে বাধা দিলাম।

"আমি তোমাদের এলাকায় বাস করিতে চাই, কারণ আমার দলের লোকেরা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিতে চাই।"

"তাহা হইলে বৃহার সহিত দেখা কর। বৃহার মা গো যদি তোমাকে মনোনীত করে, বৃহা আপত্তি করিবে না।"

"বৃহা থাকে কোথায়?"

"অরণ্যের প্রান্তে একটা কুটীর দেখিবে, তাহাই বৃহার আস্তানা। বৃহা থাকে একটা গুহার মধ্যে, ওই কুটীরটা গুহা-প্রবেশের পথ মাত্র। সাবধানে যাইও, বৃহার কুকুরটা ভীষণ রাগী।"

"বৃহা কিসে সন্তুষ্ট হয় বল তো।"

"তুমি ছবি আঁকিতে পার?"

"পারি। এই দেখ, আমার এই প্রস্তর কুঠারের হাতল আমি প্রস্তুত করিয়াছি।"

বিতং তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া কাছে আসিল এবং আমার প্রস্তর কুঠারটা দেখিতে লাগিল।

"হরিণের শিং দিয়া করিয়াছ?"

"হ্যাঁ।"

"ইহার উপর হরিণের মুখটি তুমিই খুদিয়াছ?"

"হ্যাঁ।"

"এইটাই গিয়া বৃহাকে উপহার দিও, সে খুশি হইবে। আর গল্প করিব না, যাই।"

বিতং বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

...উপল-বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে করিতে একটা কথা মনে হওয়াতে একটু সান্ত্বনা পাইলাম। জোলমা এবং আমি ভিন্ন-কুলজাত। ইহারা সকলেই শ্যেন পক্ষী। যদিও জোলমার বাহুমূলে শ্যেন পক্ষীর চিহ্ন দেখিতে পাই নাই, কিন্তু উড্ডীয়মান একটা শ্যেন পক্ষীকে দেখিয়া জোলমা শুইয়া পড়িয়াছিল তাহা দেখিয়াছি। আমি ব্যাঘ্রবংশীয়, আমার অতি-অতি-বৃদ্ধ-মাতামহী ব্যাঘ্রকেই আমাদের কুলদেবতা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জোলমার সহিত আমার বিবাহের কোনও বাধা নাই। এই সুখদায়ক চিন্তাটি মনে মনে রোম-

স্থন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কাছাকাছি আসিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম বৃহার কুটীর হইতে ধূমরেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া নির্গত হইতেছে। মানুষ যে এই অঞ্চলে নিজ নিজ এলাকা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে, এই খবরটাও ধূমের মতো আমার অন্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি এখন যে মাটিতে পদার্পণ করিয়াছি, তাহা যে আমার নয়, অপরের, এই ধারণাটা বড়ই অদ্ভুত মনে হইতেছিল। বৃহার কুটীরোদ্গত ধূম-রেখার দিকে চাহিয়া নিষ্পন্দ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা আনন্দে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। সর্পাকৃতি ধূম-রেখা দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। থানকু বলে ইহা অতি শুভ লক্ষণ। দক্ষিণ-গামী সর্প মঙ্গল সূচনা করে। এ বিষয়ে যে গল্প শুনিয়াছি তাহা মনে পড়িল। সোৎসাহে পুনরায় অগ্রসর হইলাম। গিয়াই কিন্তু আমাকে বর্শা উদ্যত করিতে হইল। বৃহার ভীষণাকৃতি কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল। কুকুরটা বাঁধা ছিল, বেশি দূর আগাইয়া আসিতে পারিল না। এ রকম কুকুর পূর্বে কখনও দেখি নাই। কান দুইটা নেকড়ে বাঘের মতো। গায়ে ভালুকের মতো লোম। তাহার বন্ধন-রজ্জুটাও অদ্ভুত ধরণের। প্রকান্ড একটা কাঠের এক দিকে চামড়ার একটি ফিতা, সেটি কুকুরটির গলায় বাঁধা আছে, অন্য দিকে বাঁধা আছে প্রকান্ড একটি পাথর। কুকুরের ডাক শুনিয়াই বৃহা বাহির হইয়া আসিল। তাহার হস্তেও প্রস্তরের একটি বর্শা। আমি বর্শা উদ্যত করিয়াছিলাম বলিয়া সে-ও বর্শা উদ্যত করিল। আমি বর্শা নামাইয়া লইলাম, সে-ও নামাইয়া লইল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি দিয়া যাহা ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা আশ্বাসজনক নহে। সে দৃষ্টি রোষদীপ্ত।

বৃহার হাতে বর্শা ছিল বলিয়া যে আমি দমিয়া গিয়াছিলাম তাহা নয়। সে যুগে বিনা অস্ত্রে ঘর হইতে কেহ বাহির হইত না। আমি মানুষ না হইয়া কোনও হিংস্র জন্তুও হইতে পারিতাম। সে যুগে হিংস্র জন্তুরাও মানুষের মতোই গুহা খুঁজিত আশ্রয় পাইবার আশায়। জন্তুরাই ছিল আদিম গুহা-বাসী। মানুষ তাহাদের গুহাচ্যুত করিয়া নিজেরা সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া-ছিল। গুহাহীন জন্তুরা তাহাদের গুহা পুনরায় অধিকার করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু অগ্নি আবিষ্কারক মানুষ, প্রস্তরায়ুধে বলীয়ান মানুষ, তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিত নিজের নবার্জিত শক্তিবলে। বৃহা দেখি-তেছি পশুকেও নিজের পাহারার কাজে লাগাইয়াছে। শত্রু বন্ধু হইয়াছে। জন্তু জানোয়ারেরাই সেকালে ছিল আমাদের জীবনের প্রধান প্রেরণা। একদল ছিল শত্রু, একদল মিত্র। উভয় দলই আমাদের জীবনের ধর্মেকর্মে উপাদান যোগাইত। তাহাদের আমরা যে কেবল বধই করিতাম তাহা নয়, পূজাও করিতাম, বংশের প্রতীকও করিতাম। শুধু পশু কেন, গাছ, পাথর কিছুই আমাদের কাছে তুচ্ছ ছিল না। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা

সে যুগে সমাজ পত্তন করিয়াছিলাম, ধর্মের পত্তন করিয়াছিলাম, রূপকথা রচনা করিয়াছিলাম। হিংস্র ব্যাঘ্র সিংহ ম্যামথ হিপোপটেমাসরাই আমাদের অস্ত্রনির্মাণে প্রবুদ্ধ করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের বিজ্ঞানী করিয়া তুলিতেছিল, উহাদের মধ্যেই আমরা অজ্ঞাত প্রবল শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া অপ্রত্যক্ষ লোকের আভাস পাইতেছিলাম, উহারাই আমাদের রূপকথায় দৈত্য-দানবে রূপান্তরিত হইতেছিল। প্রাণী মাত্রেই তখন আমাদের কৌতূহলী মনকে নাড়া দিত। প্রাণী সম্বন্ধে সুতরাং আমরা সর্বদাই সচেতন থাকিতাম। প্রতি জন্তুর সঞ্চরণ শব্দ, সঞ্চরণ পথ, কণ্ঠস্বর, গায়ের গন্ধ আমাদের সুবিদিত ছিল। এ বিষয়ে যাহার জ্ঞান যত গভীর সে-ই তত শ্রদ্ধাস্পদ ছিল সে যুগে। সে-ই হইত দলের নেতা, সে-ই হইত পুরোহিত, সে-ই হইত চিকিৎসক। ইক্‌ঘার অদ্ভুত শক্তি ছিল। সে মেঘের দিকে চাহিয়া বলিয়া দিতে পারিত এইবার হাঁসের দল উড়িয়া আসিবে। বাতাসের গন্ধ শুঁকিয়া বলিতে পারিত বন্য মহিষের দল আসিয়াছে কিনা। মানুষ মানুষের কম শত্রু ছিল না সেকালে। যদিও আমরা সমাজের পত্তন করিয়াছিলাম, কিন্তু সমাজের বাহিরের যে কোনও লোককে সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম। বন্ধুত্বের অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে শত্রু মনে করিতাম। সেকালে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ এত বেশি রকম আত্মকেন্দ্রিক ছিল যে, সে সমাজটাকে এক-দেহ বলিলে একটুও অত্যুক্তি হইবে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে রক্তসম্পর্কে সম্পৃক্ত ছিল। এক বা একাধিক নারীর সন্তান-সন্ততিরাই এক একটি সমাজগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিত। রক্তের সম্পর্ককেই আমরা আত্মীয়তার একমাত্র বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিতাম। বাকি সব ছিল শত্রু।

সুতরাং বৃহা যে বর্শা হাতে করিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সহসা বৃহা পর্বত প্রকম্পিত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, "কে তুমি, কি চাও, অবিলম্বে নিজের পরিচয় দাও, তাহা না হইলে—"

আবার সে বর্শা উত্তোলন করিল। তাহার কপালে মুখে বুকে বহু বর্ণের চিত্র অঙ্কিত। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। আকাশের পটভূমিকায় তাহার বিশাল দেহ, শ্মশ্রুগুম্ফাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড মুখ, জটাসম্বদ্ধ বিরাট মাথা দেখিয়া সত্যই আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি কটিবন্ধ হইতে প্রস্তর কুঠারটি খুলিয়া তাহার পাদমূলে ছুঁড়িয়া দিলাম এবং বর্শা সন্নত করিয়া তাহার আনুগত্য-স্বীকার করিলাম। তাহার পর একপায়ে দাঁড়াইয়া দুই হাত আকাশের দিকে তুলিয়া রহিলাম। সেকালে ইহাই আমাদের আত্মসমর্পণের ভঙ্গী ছিল। বৃহা খানিকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল, তাহার পর আমার দিকে একটু আগাইয়া আসিল, আমিও খানিকটা আগাইয়া গেলাম। বৃহা বুঝিয়াছিল যে, শত্রুতা সাধন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে আমার দিকে আর একটু অগ্রসর হইল, আমিও হইলাম। এইভাবে যখন পরস্পরের

নিকটবর্তী হইয়া গেলাম, তখন আমি আমার গাত্রাবরণ ভল্লুকচর্মের অন্তরাল হইতে মৃত একটি শশক বাহির করিয়া তাহার পদপ্রান্তে রাখিলাম। শশকটি পূর্বদিন শিকার করিয়াছিলাম এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। সহসা চাহিয়া দেখি গুহার ভিতর হইতে এক পলিতকেশা বৃদ্ধা আমার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র সে মুণ্ডটা ভিতরে টানিয়া লইল। কুকুরটা ক্রমাগত ডাকিতেছিল। জোলমা বাহিরে আসিয়া তাহাকে গুহার ভিতরে লইয়া চলিল। আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। কুকুরটা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। কুকুরকে ভীষণ বন্য জন্তু হিসাবেই এতকাল দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাকে যে পোষা যায় এই প্রথম দেখিলাম। একটা কথা মনে পড়াতে একটু ভয়-ভয়ও করিতে লাগিল। মনে হইল, জোলমা কোনও মায়াবিনী নয় তো! থানকুর কাছে গল্প শুনিয়াছিলাম জিলাং পাহাড়ের তুষারাবৃত অন্ধকার গুহায় পিপি নামে এক মায়াবিনী বাস করে। মন্ত্রবলে মানুষকে জন্তুতে পরিণত করিবার শক্তি তাহার আছে। গভীর জঙ্গলে যে সব নর-ভুক মানুষ বাস করে, পিপি নাকি তাহাদের নেত্রী। মানুষের মাংস যখন ভাল লাগে না, তখন সে মানুষকে নিজের অভিরুচি অনুসারে অন্য জন্তুতে পরিবর্তিত করিয়া লয়, তাহার পর তাহাকে মারিয়া খায়। তাহার অনুচরেরা মানুষ ধরিয়া তাহাকে দেয়, সে তাহাকে কখনও শূকর, কখনও হরিণ, কখনও সজারু, কখনও শশক—যখন যে জন্তুতে খুশি রূপান্তরিত করিয়া খায়। একবার নাকি লোভে পড়িয়া একটা মানুষকে ম্যামথে পরিণত করিয়া বিপদে পড়িয়াছিল। ম্যামথটাকে সামলাইতে পারে নাই। জিলাং পর্বতের তুষারাবৃত অঞ্চলে সেই দুর্দান্ত ম্যামথটা নাকি এখনও চতুর্দিক তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। একজন মানুষকে বিষধর সর্পে রূপান্তরিত করিয়া সে নাকি বিপক্ষ দলের নেত্রী সিংনাকের গুহায় ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিল। পিপি মায়াবিনীর অনেক গল্প থানকুর কাছে শুনিয়াছি। জোলমা সেইরকম মায়াবিনী নয় তো?

"টাহা, টাহা, টাহা"—

বৃহার কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। দেখিলাম গুহা হইতে আর একটি পুরুষ বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহারও সর্বাঙ্গে লাল ও হলুদ রঙের চিত্রবিচিত্র করা। বৃহা অঙ্গুলিসঙ্কেতে মৃত শশকটা দেখাইয়া দিতেই টাহা সেটা লইয়া গুহার ভিতরে চলিয়া গেল।

বৃহা তখন আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কেনই বা আসিয়াছ?"

নিজের পরিচয় দিলাম এবং কি করিয়া যে দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও বলিলাম।

"আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?"

"পর্বতের আদেশে আমি আমার পুরাতন সমাজে আর ফিরিতে পারিব

না। আমাকে এই অঞ্চলেই থাকিতে হইবে। তাই তোমার কাছে সাহায্যের জন্য আসিয়াছি। আমাকে আশ্রয় দাও—"

"পর্বতের আদেশ তুমি শুনিয়াছ?"

"নদীর জলে যাহা শুনিলাম, তাহা পর্বতের আদেশ বলিয়াই মনে হইল। ইহার অন্য কোনও অর্থ সম্ভব কি না জানি না।"

বৃহা আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে হইল আমার মধ্যে সে যেন অসাধারণ কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাহার পর গুহার দিকে চাহিয়া ডাকিল, "গো গো—"

সেই পলিতকেশা বৃদ্ধা বাহির হইয়া আসিল। বৃহা তখন আমার পরিচয় দিয়া প্রশ্ন করিল, "এ যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কি না?"

গো নির্ণিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কয়েকবার মাথা নাড়িল। তাহার পর ধীরে ধীরে আবার গুহার ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কোনও কথা বলিল না।

বৃহা আমাকে প্রশ্ন করিল, "আমার কি সাহায্য তুমি চাও?"

প্রথমেই জোলমার কথা বলাটা সমীচীন মনে হইল না। বলিলাম, "বাস করিবার জন্য আমার একটা স্থান চাই। গুহা হইলেই ভাল হয়।"

"অনুসন্ধান করিলে গুহা পাওয়া যাইবে। জিকাটু পাহাড়ে একটা ভাল গুহা আছে শুনিয়াছি। টাহা জানে। গো কি বলে আগে শোনা যাক।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গো গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে একটি তিত্তির পক্ষী রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার পর বাহির হইয়া আসিল টাহা, তাহার হাতে একটা জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, টাহার পিছনে পিছনে আসিল জোলমা, তাহার হাতে একটা চামড়ার উপর কিছু শুষ্ক পত্র।

জোলমা পত্রগুলি একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া ঢালিয়া দিল। টাহা জ্বলন্ত কাঠের সাহায্যে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। আগুনের শিখা লেলিহান হইয়া উঠিবামাত্র গো তিত্তিরের মুণ্ডটা মুচড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং মুণ্ডটাকে আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কবন্ধটাকে জোলমার হাতে দিল। জোলমা সেটাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর ধরিয়া রহিল। আমি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। জ্বলন্ত শিখার উপর ফিনকি দিয়া রক্ত পড়িতেই অগ্নিকুণ্ড হইতে কৃষ্ণ সর্পিল ধূম্ররেখা উঠিতে লাগিল। দগ্ধ রক্তের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দেখিলাম পলিতকেশা গো ধূম্ররেখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে এবং বিড়বিড় করিয়া কি যেন আওড়াইতেছে। যতক্ষণ রক্ত পড়িল ততক্ষণ জোলমা ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। আমি রুদ্ধশ্বাসে জোলমার দিকে চাহিয়া ছিলাম। সমস্ত প্রকৃতিই যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ গো সামনের মাটিতে দুই হাত রাখিয়া তিত্তিরের মত ডাকিয়া উঠিল। সেই ডাকে চতুর্দিক সচকিত হইয়া উঠিল যেন। জোলমা তিত্তিরের কবন্ধটা ফেলিয়া দিয়া গুহার মধ্যে চলিয়া

গেল। বৃহা এবং টাহা চতুর্দিকে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, মনে হইল কি যেন একটা খুঁজিতেছে, গৌ তারস্বরে তিত্তিরের ডাক ডাকিয়া যাইতে লাগিল। আমি যে কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। মনে হইল আকাশে বাতাসে অস্বস্তিকর কি যেন সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। এক এক-বার মনে হইতে লাগিল ছুটিয়া পালাই। কিন্তু আমার পা দুইটা যেন মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছিল, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সহসা বৃহার চীৎকারে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া বৃহা এবং টাহা কি যেন দেখিতেছে। বৃহার মুখমণ্ডল গম্ভীর। গৌ তিত্তিরের ডাক থামাইয়া হামাগুড়ি দিয়া বৃহার দিকে আগাইয়া গেল। জোলমাও গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমিও গেলাম। গিয়া দেখিলাম, তিত্তিরের ছিন্নমুণ্ডটি একটি পাথরের ফাঁকে পড়িয়া আছে। গৌ তাহা দেখিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। মুণ্ডটি কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটি চোখ আকাশের দিকে। বৃহা উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল। টাহাও করিল। টাহা বৃহার অনুজ। বৃহার প্রতিটি কর্মের অনুকরণ করাই তাহার কাজ। পলিতকেশা গৌ ইহাদের মা। আমি লক্ষ্য করিলাম গৌ নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার দৃষ্টি হইতে প্রসন্নতা ক্ষরিত হইতেছে। বুঝিলাম ইহারা সকলেই আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছে। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। দগ্ধ তিত্তির-রক্তের ধূমরেখার মধ্যে, তিত্তিরমুণ্ডের আকাশমুখী দৃষ্টিতে শুভলক্ষণ সূচিত হইয়াছে। আমাকে বন্ধুরূপে স্বীকার করিয়া লইতে বৃহা পরিবারের আর আপত্তির কারণ নাই। বৃহা আমাকে সাদরে গুহার ভিতরে লইয়া গেল। আমি যে শশক মাংস আনিয়াছিলাম, জোলমা তাহা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করিতে লাগিল। বৃহা বলিল কিছু মৃগমাংস এবং কন্দও যেন আমাকে দেওয়া হয়। জোলমা মাথা নাড়িয়া সে কথার সমর্থন করিল এবং অতিথি-সৎকারে তৎপর হইয়া উঠিল।

...জোলমাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। জোলমাও আমার দিকে অপাঙ্গে একবার চাহিয়া দেখিল। কিন্তু একবার মাত্র, দ্বিতীয়বার আর দেখিল না, আমার সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলও তাহার ব্যবহারে আর প্রকাশ পাইল না। কিন্তু আমি অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম আমার মনের নিগূঢ় বার্তা তাহার মনেও পৌঁছিয়াছে। কেমন করিয়া করিলাম, তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু করিলাম এবং জোলমার আচরণে কোনও প্রতিবাদ লক্ষ্য না করিয়া আনন্দিত হইলাম। তাহার আপাত-ঔদাসীন্য আমাকে যেন আমন্ত্রণ জানাইল।

আহার করিতে করিতে বৃহার গুহা এবং গুহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রকাণ্ড লম্বা গুহা। সমস্তটা দেখা যায় না। গুহায়

ঢুকিয়াই দেখিলাম প্রশস্ত অগ্নিকুণ্ড, তাহার পাশেই গোলাকৃতি একটি বড় প্রস্তরখণ্ড। তাহার উপরই খাবার রাখিয়া আমরা সকলে আহার করিতেছিলাম। আরও ভিতরের দিকে ভস্মপূর্ণ কয়েকটি লম্বা লম্বা গর্ত ছিল। গর্তের কাছে চর্মাবরণ দেখিয়া অনুমান করিলাম ইহাই সম্ভবত ইহাদের বিছানা। আমরাও আমাদের গুহায় ওইরূপ শয্যাতেই শয়ন করিতাম। গুহার দেওয়ালে দেখিলাম বুহা এবং টাহার অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত আছে। দেওয়ালের আর এক দিকে প্রকাণ্ড একটা বলগা হরিণের ছবি। ছোট ছবি নয়, দেওয়াল জোড়া বিরাট ছবি। একটা বলগা হরিণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে, তাহার পিঠে একটা তীর বিঁধিয়া আছে। বুহার ক্ষমতায় সত্যই আমি চমৎকৃত হইয়া গেলাম। তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা স্বতই অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আড়চোখে তাহার দিকে একবার চাহিলাম। দেখিলাম অন্যমনস্ক হইয়া সে শশকের মাংস খাইয়া চলিয়াছে। জোলমা তাহার কানে কানে আসিয়া কি যেন বলিল। বলিতেই তাহার যেন হুঁস হইল, শশকের সরু সরু হাড়গুলি না চিবাইয়া চুযিয়া একধারে সরাইয়া রাখিল। আমাকেও সসম্ভ্রমে অনুরোধ করিল আমিও যেন হাড়গুলি না চিবাইয়া ফেলি, জোলমা উহা দিয়া ছুঁচ প্রস্তুত করিবে। আমাকে কথাগুলি বলিয়াই আবার সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, টাহা অগ্রেই সরু সরু হাড়গুলি পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। বুহা অন্যমনস্ক হইয়াই আহার শেষ করিল এবং হঠাৎ উঠিয়া গেল। গো পূর্বেই গর্তের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং টাহা ছাড়া আমার কাছাকাছি আর কেহ রহিল না। কারণ বুহার সঙ্গে সঙ্গে জোলমাও তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।

টাহাকে প্রশ্ন করিলাম, "বুহা কোথায় গেল?"

"ছবি আঁকিতে।"

"জোলমা?"

"জোলমা আলো ধরিতে গেল।"

ব্যাপারটা যে আমি মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না, তাহা বোধ হয় আমার চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ টাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের অঞ্চলে কি গুহায় কেহ ছবি আঁকে না?"

"না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া টাহা বলিল, "আমাদের এদেশেও কেহ আঁকিত না। জোলমার মায়ের নিকট হইতে বুহা শিখিয়াছে। বুহা যেখানে ছবি আঁকে সেখানে গাঢ় অন্ধকার, সেই জন্য জোলমা সেখানে আলো ধরিয়া থাকে। ইহার জন্য জোলমা একটা গর্তকরা পাথরের সাহায্যে আলোর ব্যবস্থা করিয়াছে।"

"কি রকম?"

"একটা গর্ত-করা পাথরে সে চর্বি ভরিয়া রাখে এবং সেই চর্বিতে শুষ্ক

শ্যাওলা গঁুজিয়া দেয়। শ্যাওলাটা জ্বালাইয়া দিলে অনেকক্ষণ জ্বলে। আলো হয়।”

আমার কৌতূহল হইল।

“চল, গিয়া দেখি।”

“ছবি আঁকিবার সময় বৃহা জোলমা ছাড়া আর কাহাকেও কাছে থাকিতে দেয় না। সম্প্রতি এই বনে বন্য মহিষ এবং বন্য ঘোড়ার দল আসিয়াছে, বৃহা তাহাদেরই ছবি আঁকিতে ব্যস্ত আছে!”

“ছবি আঁকিয়া কি সুবিধা হইবে?”

“যদি ঠিক মতো ছবি আঁকিয়া বৃহা সেই ছবি ঠিকভাবে মন্ত্রপূত করিতে পারে, আমরা সহজে সেগুলি শিকার করিতে পারিব”

“বল কি!”

“এখানে যখন বসবাস করিবে বলিতেছ স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে”—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া টাহা পুনরায় বলিল, “তুমি বৃহাকে যে কুঠারটি উপহার দিয়াছ, তাহার হাতলে যে হরিণের মুখটি আঁকা আছে, তাহা কি তুমিই

“হ্যাঁ। আমাদের অঞ্চলে অস্ত্রের হাতলে অনেকেই ছবি আঁকিতে পারে, দেওয়ালে কেহ আঁকে না।”

“আমাকে শিখাইয়া দিবে?”

“চেষ্টা করিব। খুব ধারাল ছোট পাথরের ছুরি দরকার।”

“আমার আছে একটা। দেখিবে?”

টাহার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দেওয়াল হইতে একটি প্রস্তর-ছুরিকা আনিয়া আমাকে দেখাইল।

“চমৎকার ছুরি, ইহাতেই হইবে। আমার থাকিবার একটি গুহা ঠিক করিয়া দাও, তাহার পর তোমাকে শিখাইয়া দিব।”

“বেশ, কালই তোমাকে জিকাটু পাহাড়ের দিকে লইয়া যাইব। সেখানে ভাল ভাল গুহা আছে শুনিয়াছি। কিন্তু স্থানটা বড় নির্জন, কেহই ও অঞ্চলে যাইতে চাহে না। এমন কি জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত না। আমিও কোন দিন যাই নাই, কাল সকালে তোমাকে স্থানটা দেখাইয়া দিব।”

“বেশ এখন চল, তোমাদের গুহার চারিপাশটা ঘুরিয়া দেখি।”

বৃহার গুহার সম্মুখে যে বিস্তৃত জমি পড়িয়াছিল তাহা খোলা নহে, ডালপালা দিয়া ঘেরা। উপরে ডালপালা দিয়া চালও করা ছিল। দূরে হইতে তাই কুটীরের মতো দেখাইতেছিল। গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই আমার নজর পড়িল একটা স্থান একটু বিশেষভাবে ঘেরা রহিয়াছে।

“ওখানে কি আছে?”

“ওহালির গাছ।”

“বুঝিতে পারিতেছি না।”

"জোলমার মা ওহালি একটা গাছের গুঁড়িতে চড়িয়া রুপ্রিং নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল। বুহা গুঁড়িটা সুদ্ধ তাহাকে উদ্ধার করে। ওহালি চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গুঁড়িটা ওই ঘরে আছে। বুহা খেয়াল খুশি মতো উহাতে রং মাখায়। দেখিবে?"

টাহার সহিত আগাইয়া গেলাম। দেখিলাম গাছের গুঁড়িটার উভয়প্রান্ত দুইখন্ড উচ্চ প্রস্তরের উপরে রাখিয়া সেটাকে মাটির সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। গুঁড়িটার সর্বাঙ্গে নানাবর্ণের ছাপ, সহসা মনে হয় ওটা যেন জীবন্ত কোনও প্রাণী। মনে পড়িল বিরাট একটা ময়াল সাপের গায়ে ওই ধরণের বর্ণসমাবেশ দেখিয়াছিলাম। সবিস্ময়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া গুঁড়িটাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। নীল-নয়না জোলমার মা ইহার উপর চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল! কোথা হইতে আসিয়াছিল? কোন্ বংশে তাহার জন্ম?

"ওহালি কোথা হইতে আসিয়াছিল?"

টাহা শ্রদ্ধাভরে আকাশের দিকে বাহু উত্তোলন করিয়া বলিল, "আকাশ হইতে। ওহালি আকাশ-কন্যা, তাহার চোখে আকাশ ছিল। আকাশ যেমন নানা রঙে ছবি আঁকে ওহালিও তেমনি নানা রঙে ছবি আঁকিত। বুহা তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া বুহাকেও সে ছবি আঁকার কৌশল শিখাইয়া দিয়াছে।"

"জোলমাও কি ছবি আঁকে?"

"জানি না। জোলমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। সে হয় বুহার কাছে থাকে, কিম্বা একা একা থাকে।"

"একা কোথায় থাকে?"

"বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারও সহিত মেশে না।"

নিমেষের মধ্যে আমি একটা কান্ড করিয়া বসিলাম। হঠাৎ হাঁটু গাড়িয়া সেই গুঁড়িটার নীচে বসিয়া কাঁধ দিয়া সেটাকে তুলিয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। খুবই ভারী বোধ হইল, কিন্তু আমি যে ওটাকে কাঁধে তুলিতে পারিয়াছি এই গর্বে আমার সমস্ত বুকটা ভরিয়া উঠিল। টাহার দিকে চাহিয়া দেখি ঈষৎ ব্যায়ত আননে সে আমার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে।

"হঠাৎ তুমি ওরকম করিলে কেন?"

"ওহালির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম!"

টাহা সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলিল না। আমারও মুখ দিয়া কোনও কথা সরিতেছিল না, আমি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। উভয়ে নীরবে সেই ঘরটা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমিই টাহাকে আবার প্রশ্ন করিলাম, না করিয়া পারিলাম না। কথাটা অনেকক্ষণ হইতেই আমার মনে হইতেছিল।

"এখানে তো কাছে-পিঠে কাহাকেও দেখিতেছি না। শ্যেনপক্ষী-সম্প্রদায়ের লোকেরা কোথায় থাকে?"

"তাহারা ওই যে দূরে পাহাড় দেখিতেছ, ওই পাহাড়ে থাকে। ওই পাহাড়ে অনেক গুহা আছে, প্রত্যেক গুহায় আমাদের দলের লোক থাকে। ওখানে যদি খালি গুহা থাকিত তুমি অনায়াসেই পাইতে পারিতে। কিন্তু ওখানে আমাদেরই স্থানাভাব। জিকাটু পাহাড়ে কয়েকটা গুহা আছে শুনিয়াছি, কিন্তু ওখানে কেহ যাইতে চায় না।"

"কারণটা কি?"

"ও অঞ্চলে প্রায়ই মৃত পশু দেখা যায়। একদিন একটা প্রকাণ্ড মৃত বাইসনও দেখা গিয়াছিল।"

ইহার পর কণ্ঠস্বর নামাইয়া টাহা বলিল, "নাগবংশীয় মানুষরা পূর্বে এ অঞ্চলে থাকিত। শ্যেনপক্ষীদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। নাগদের সবংশে নিধন করিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এ অঞ্চল অধিকার করে। গো তখন বালিকা মাত্র। গো বলে সেই নাগদের দলপতি প্রেত হইয়া ওই জিকাটু পাহাড়ের গুহায় বসিয়া আছে। শ্যেনবংশীয় কেহ গেলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কোন পশুকেও নিজের কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। একাই থাকে—"

টাহার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। আমিও মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। যে স্থানটা এত বিপজ্জনক বৃহা আমাকে সেই স্থানে বাস করিবার নির্দেশ দিল কেন? কিন্তু আমি যে ভয় পাইয়াছি তাহা টাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না।

"বেশ চল কাল জায়গাটা দেখিয়া আসা যাক।"

"আমি কেবল দূর হইতে স্থানটা তোমাকে দেখাইয়া দিব, ভিতরে যাইতে পারিব না। শ্যেনপক্ষীদের ওখানে যাওয়া নিষেধ।"

"তাহা হইলে বৃহা আমাকে ওখানে যাইতে বলিল কেন?"

টাহা সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "তুমি তো শ্যেনপক্ষী নও, তোমার হয়তো কোনও বিপদ ঘটিবে না। তুমি আমাকে ছবি আঁকা কখন শিখাইবে? আমার কুঠারের হাতলে একটা ছবি আঁক না দেখি—"

আমরা একটা গাছের তলায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। বলিলাম, "বেশ, এইখানে বসা যাক তাহা হইলে—"

"বেশ বেশ—"

আগ্রহভরে টাহা বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

টাহা আমার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহার কুঠারের হাতলে একটি হরিণ-মুণ্ডের ছবি আঁকিয়া দিয়াছিলাম। একটি সূক্ষ্মাগ্র কয়লার টুকরা দিয়া প্রথমে ছবিটা আঁকিয়া তাহার পর ছুরি দিয়া কয়লার দাগে দাগে কাটিয়া সেটি হরিণের শিংয়ের উপর ফুটাইয়া তুলিলাম। টাহা সবিস্ময়ে বসিয়া

বসিয়া সব দেখিল, কিন্তু নিজে কিছুতেই ছবি আঁকিতে পারিল না। যতবারই চেষ্টা করিল ততবারই হরিণের মুখ না হইয়া অন্য রকম কিছু একটা হইয়া গেল। তাহার ধারণা হইল আমি নিশ্চয় কোনও যাদুশক্তির অধিকারী, বুহার মতো আমারও উপর কোনও দেবতার বিশেষ অনুগ্রহ আছে, তাই আমি ছবি আঁকিতে পারিতেছি। আমার প্রতি তাহার ব্যবহার ক্রমশ সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি যখন তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে আঁকিতে আঁকিতে সে-ও ক্রমশ ঠিক মতো পারিবে তখন সে আমার ভক্ত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বুহা কিন্তু আমাকে কখনও একথা বলে নাই। সে কি করিয়া ছবি আঁকে তাহা দেখিতেও দেয় নাই। অথচ আমি তাহার কাছে আছি, তাহার প্রতিটি কার্যের অনুকরণ করিতেছি।"

"তুমি কি বুহার কাছেই থাক? তোমার কি স্বতন্ত্র গুহা নাই?"

"আছে বই কি। আমি শ্যেনপক্ষীদের দলেই থাকি, পাহাড়ে আমার গুহাও আছে। কিন্তু আমাদের দল হইতে বুহা নিজের সাহায্যকারী হিসাবে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে। বুহা ওই অন্ধকার গুহায় ছবি আঁকা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সংসারের কাজকর্ম আমাকেই দেখিতে হয়। দূরের পাহাড় হইতে আমাকে রং খুঁড়িয়াও আনিতে হয়।"

"শিকার করিতে যাও না?"

"লাফাই পাহাড় হইতে যে খাবার আসে তাহাতেই আমাদের কুলাইয়া যায়। আমাদের দলই বুহার ভরণপোষণ করে। বুহা অবশ্য মাঝে মাঝে শখ করিয়া শিকার করিতে বাহির হয় এবং যখন হয় তখন প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত শিকার করে। একবার বর্শার এক আঘাতে একটা ম্যামথের মাথা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল এত উহার শক্তি। কিন্তু ছবি আঁকাই বুহার প্রধান কাজ। বুহা ছবি না আঁকিলে আমাদের দলের শিকারীরা শিকার পায় না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া টাহা বলিল, "বুহা কিন্তু আমাকে কিছুই শিখায় না।"

"আমি তোমাকে শিখাইয়া দিব। আমার গুহাটা আগে ঠিক করিয়া লই।"

টাহার চোখে কেমন যেন একটা সভয় দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল সে যেন আমাকে কি বলিতে চাহিতেছে কিন্তু পারিতেছে না।

"চল তোমাদের লাফাই পাহাড় দেখিয়া আসি।"

টাহার সঙ্গে লাফাই পাহাড়ের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

যাহা দেখিলাম তাহা কল্পনাতীত ছিল। লাফাই পাহাড় যেন বৃহৎ একটি মৌমাছির চাক। কেবল প্রভেদ সেখানে মৌমাছির বদলে মানুষ বাস করিতেছে। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহা। যে বনে আমি বিতংয়ের সাক্ষাৎ

পাইয়াছিলাম সেই বন হইতে কোমল তৃণাচ্ছাদিত একটি বিস্তৃত পথ সর্পিল আকারে লাফাই পাহাড়ে আসিয়া উঠিয়াছে। উঠিতে উঠিতে সেই পথ ক্রমশ এমন একটা উচ্চতায় আসিয়া পড়িয়াছে যাহার পর আর পথ নাই—যাহার পর পাহাড় খাড়া নামিয়া গিয়াছে। এখান হইতে পতন হইলে সুনিশ্চিত মরণ। শুনিলাম, বিতং বন হইতে হরিণের দলকে ডাকিতে ডাকিতে এই পথের উপর লইয়া আসে। পথের উপর আসিয়া পড়িলে হরিণের দল আপনিই উপরে উঠিতে থাকে, কারণ পথের উপর এমন চমৎকার ঘাস আছে যে, চরিতে চরিতে তাহারা নিজেরাই উপরের দিকে আগাইয়া যায়। রাস্তাটা যেখানে পাহাড়ের অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে সেখানে রাস্তার একদিকে তো পাহাড় আছেই, অন্য দিকটাও বড় বড় পাথর দিয়া প্রাচীরের মতো করা আছে। হরিণের সমস্ত দল যখন এই স্থানে আসিয়া পড়ে তখন পিছন হইতে সকলে মিলিয়া তাহাদের তাড়া দেয় এবং পাথরের প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। হরিণের দল তখন ছুটিয়া পাহাড়ের উপর ওঠে এবং পাহাড় হইতে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করে। দলে দলে হরিণ এক সঙ্গে মরে। এরূপ অদ্ভুত ফাঁদ কখনও কল্পনা করি নাই। আমরা বর্শা দিয়া অথবা তীরধনুক দিয়া হরিণ মারি, কখনও কখনও পাথর ছুঁড়িয়াও মারি। এরূপ ব্যাপকভাবে হরিণ মারিবার আয়োজন দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইলাম। আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপারও তাহার মুখে শুনিলাম। হরিণের দল যেই ওই পথের উপর আসিয়া পদার্পণ করে অমনি সেগুলি সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হইয়া যায়। এই দল হইতে মধ্যপথে তীর বা অন্য কোনও অস্ত্র দ্বারা হরিণ মারিয়া যদি কেহ অপহরণ করে তাহা হইলে তাহার শাস্তি মৃত্যু। যে অস্ত্র দ্বারা সে হরিণটিকে মারিয়াছে সেই অস্ত্রাঘাতে তাহাকেও সকলে মিলিয়া নিধন করে। ওই পথের বাহিরে অবশ্য যে যত খুশি শিকার করিতে পারে, তাহাতে কেহ আপত্তি করে না, বরং যে যত বেশিসংখ্যক হরিণ মারিতে পারে দলের মধ্যে তাহারই তত প্রতিপত্তি বাড়ে। কিন্তু বিতং যে হরিণের দলকে ডাকিয়া আনিয়া পাহাড়ে চড়ায় তাহার একটিরও উপর কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার নাই। আমিও হরিণের অনুসরণ করিয়াই এতকাল জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি, বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি, প্রয়োজন মতো বনের ধারেই সপরিবারে বাসা বাঁধিয়াছি, সংসার করিয়াছি কিন্তু হরিণকে কেন্দ্র করিয়া এমন আয়োজন কখনও দেখি নাই। আমি যখন লাফাই পাহাড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম উপত্যকার উপর একটি উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। একটি পুরুষ ও একটি যুবতী হরিণ-হরিণী সাজিয়াছে এবং তাহাদের ঘিরিয়া একদল আবালবৃদ্ধবনিতা নাচিতেছে। গানও করিতেছে। পুরুষের দল সুর করিয়া হরিণকে বলিতেছে—"ও হরিণ, ও হরিণ, তুমি ঘাস খাও, জল খাও, হরিণীর দিকে মন দাও, এবার হরিণীর দিকে মন দাও।" মেয়ের দলও সুর করিয়া সেই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া হরিণীকে বলিতেছে—"ও হরিণী, ও

হরিণী, তুমি ঘাস খাও, জল খাও, হরিণের দিকে মন দাও, এবার হরিণের দিকে মন দাও।"

হরিণ এবং হরিণী তাহাদের অনুরোধক্রমে পরস্পরের দিকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহা দেখিয়া সকলের আনন্দ কলরব জমিয়া উঠিতেছে। আমিও খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই আনন্দ উপভোগ করিলাম। শুধু উপভোগ করিলাম বলিলে কিছুই হয় না, নূতন ধরণের এই আনন্দ-স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করিয়া যেন চরিতার্থ হইয়া গেলাম। এতদিন আমার মন আহার-নিদ্রা-মৈথুন-শৃঙ্খলিত হইয়া যে কারাগারে বাস করিতেছিল সহসা যেন সেই কারাগারের প্রাচীরে একটা ফাটল দেখা দিল, সেই ফাটল দিয়া নূতন আলোক প্রবেশ করিল। সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলাম গো-কে দেখিয়া। ওই পলিতকেশা বৃদ্ধাও এই নাচের দলে যোগ দিয়াছে এবং কিশোরীদের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতেছে। আমাকে দেখিয়া গো হাসিল এবং নাচ শেষ হইলে আমার কাছে আসিয়া বলিল, "থাকিবার জায়গা পাইয়াছ?"

"না, এখনও পাই নাই। টাহা কাল আমাকে জিকাটু পাহাড়ের দিকে লইয়া যাইবে বলিয়াছে, সেখানে কি গুহা আছে!"

"জিকাটু পাহাড়ের দিকে!"

গো সবিস্ময়ে টাহার দিকে চাহিল।

টাহা সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল, "ইহাই বৃহার আদেশ।"

গো চুপ করিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আজ রাত্রে তুমি কোথায় থাকিবে?"

"এ কয়দিন যেখানে ছিলাম সেইখানেই ফিরিয়া যাইব।"

"এ কয়দিন কোথায় ছিলে?"

"বিতং যে বনে থাকে সেই বনে একটা বৃক্ষকোটরে ছিলাম।"

গো কিছু বলিল না, কেবল ধীরে ধীরে কয়েকবার মাথা নাড়িল।

সেদিন টাহার সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্যেনপক্ষী সমাজের অনেক কিছুই দেখিলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। কত রকম নূতন অস্ত্রশস্ত্র তাহারা প্রস্তুত করিয়াছে। শুধু পাথরের নয়, হাড়েরও। কেবল বল্লম, বর্শা, কুঠার, ছোরাই নয়, বল্লমে দাঁতের মতো খাঁজ কাটিয়া নানা আকারের অস্ত্র তাহারা বানাইয়াছে। হরিণের এতটুকু হাড় বা শিং তাহারা ফেলিয়া দেয় না, তাহা নানারকম কাজে লাগায়। কোথাও দেখিলাম, একদল স্ত্রীলোক হরিণচর্ম চাঁছিয়া পরিষ্কার করিতেছে, কেহ আগুনে মাংস ঝলসাইতেছে, কেহ হরিণের শিং হইতে অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। সকলেই সমগ্র সমাজের হিতার্থে ব্যস্ত। হরিণচর্ম পরিষ্কৃত হইয়া স্তূপীকৃত হইতেছে কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, মাংস ঝলসানো হইতেছে একটি লোকের জন্য নয়,

অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে একজনের নয়—সকলের জন্য। এক একটি বিভাগে এক একজন কর্তা আছে, সে প্রয়োজন মতো সকলকে ভাগ করিয়া দেয়। বিবাদ উপস্থিত হইলে বৃহা তাহার মীমাংসা করে। বৃহা ইহাদের চক্ষে সাক্ষাৎ দেবতা। জোলমা মানবী নয়, দেবকন্যা। এখানে আমাদের সমাজের মতোই স্ত্রীলোক পর্যন্ত কোনও পুরুষের নিজস্ব নয়। সমস্ত স্ত্রীলোকই সকলের সম্পত্তি। ইহাদের এলাকার পরেই শঙ্খচিল সম্প্রদায়ের এলাকা। শঙ্খচিল সম্প্রদায়ের পুরুষেরা শ্যেন সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিবাহ করে, শঙ্খচিল মেয়েরা বিবাহ করে শ্যেন পুরুষদের। তাহার পরেও নাকি নকুল সম্প্রদায়ের লোকেরা নূতন এলাকা স্থাপন করিয়াছে। তাহাদেরও সহিত ইহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে শুনিলাম। বলগা হরিণই সকলের উপজীব্য। মাঝে মাঝে অন্য জন্তু জানোয়ারও ইহারা শিকার করে। কখনও সমবেতভাবে কখনও একা একা। ইহাদের পরিচয় পাইয়া ইহাদের তুলনায় নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হইতেছিল। আশঙ্কা হইতেছিল, আমি যদি এখানে বাস করি তাহা হইলে ইহাদের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিব কি? কই, কেহই তো আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। দলে দলে মেয়েরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমাকে তো কেহ লক্ষ্যও করিল না, সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। আমি এখানে কোথায় থাকিব, কি করিব...জোলমার কথা মনে পড়িল...অন্যমনস্কভাবে টাহার সহিত সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

...সন্ধ্যাবেলা আমি আমার বৃক্ষকোটর অভিমুখে ফিরিতেছিলাম। টাহা সঙ্গে ছিল। সে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল ছবি আঁকার প্রসঙ্গেই বার বার আসিয়া পড়িতেছিল। তাহার ধারণা আমি কোনও বিশেষ মন্ত্র জানি বলিয়াই ছবি আঁকিতে পারি, সেই মন্ত্রটি কোনরূপে আমার নিকট হইতে সে জানিয়া লইতে চায়। সে বুঝিয়াছে, বৃহা তাহাকে ছবি আঁকা শিখাইবে না। আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে, আমি যদি এখানে থাকি তাহা হইলে আমি তাহাকে নিশ্চয়ই শিখাইয়া দিব। অনেকবার এবং কিছুক্ষণ আগেই তাহাকে একথা বলিয়াছি, কিন্তু পুনরায় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কখন তুমি ছবি আঁকা শিখাইবে? বৃহার কাছে এতদিন আছি, বৃহা আমাকে তো কিছুই শিখাইল না।"

"বৃহা তোমাকে শিখাইল না কেন? তুমি গোকে বল না। গো তোমারও মা, বৃহারও মা। গো অনুরোধ করিলে বৃহা বোধ হয় তোমাকে শিখাইয়া দিবে।"

কোন কথা বলিলে টাহা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কথাটা প্রণিধান করে, তাহার পর উত্তর দেয়। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর টাহা বলিল, "গো বৃহাকে অনুরোধ করিবে না—"

"কেন?"

"কারণ বৃহাকে একটি অনুরোধ সে করিয়াছে, বৃহা যতদিন সে অনুরোধ পালন না করিতেছে, ততদিন গো আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিবে না!"

"বৃহাকে গো কি অনুরোধ করিয়াছে?"

"আবার বিবাহ করিবার জন্য। বুহা কিন্তু বিবাহ করিতেছে না। সে জোলমাকে লইয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতে চায়। জোলমা কাহাকেও বিবাহ করুক ইহাও সে চায় না। সে চায় জোলমা সারা জীবন তাহার ছবি আঁকার কাছে প্রদীপ ধরিয়া থাকুক।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

টাহা মিটিমিটি আমার দিকে চাহিতে লাগিল। মনে হইল আমি যে জোলমাকে বিবাহ করিতে চাই ইহা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে এবং এই সংবাদে আমার মুখভাব কিরূপ হয় তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমার মুখভাবে কি ফুটিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু ভাষায় আমি বিশেষ কিছু প্রকাশ করিলাম না। কেবল বলিলাম, "তাই নাকি, আশ্চর্য তো! গো কিছু বলে না?"

"খুব বলে। গো ছোট ছেলে খুব ভালবাসে। তাহার নিজের গর্ভে সবসুদ্ধ ত্রিশটি সন্তান হইয়াছে। কিন্তু আমি বুহা এবং তিনটি কন্যা ছাড়া কেহই বাঁচে নাই। আজ গো যে কিশোরীদের সহিত নাচিতেছিল তাহারা সকলেই উহার দৌহিত্রী। শিশু উহার খুব প্রিয়। কাহারও শিশু হইয়াছে শুনিলেই গো সেখানে ছুটিয়া যায়। বুহার ঘরে শিশু নাই, জোলমার কোলে শিশু নাই, ইহাতে গো খুবই মর্মাহত হইয়া আছে। সেইজন্যই তো ওই কুকুর-শাবকটাকে আমরা লালন করিতেছে। একবার একটা কুকুরের দলকে শিকারিরা মারিয়া ফেলিয়াছিল এবং বন হইতে জীবন্ত ওই বাচ্চাটাকে লইয়া আসিয়াছিল পোড়াইয়া খাইবে বলিয়া। কিন্তু গো উহাকে পোড়াইতে দেয় নাই, স্নেহভরে লালন করিয়াছে। বুহার বা জোলমার শিশু থাকিলে ওই কুকুরছানাটা বোধ হয় বাঁচিত না।"

"গো কি কোনরকম মন্ত্র তন্ত্র জানে?"

"অনেক রকম। মন্ত্রের জোরেই ও তিত্তির বংশদের ধ্বংস করিতেছে।"

"কেন?"

"তিত্তিরবংশীয়দের সহিত একবার আমাদের খুব যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে আমার অনেকগুলি ভাই মারা যায়। গো তাহার পর হইতে ফাঁদ পাতিয়া তিত্তির পাখী ধরে এবং জীবন্ত পোড়াইয়া মারে। আজ সকালে যেমন করিল, কখনও কখনও তাহার মুন্ডটা মুচড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং রক্তটা আগুনে পোড়ায়। তিত্তিরের ছিন্ন মুন্ড হইতে, পোড়া রক্ত হইতে নানারকম লক্ষণ ও দেখিতে পায়। উহার অনেক ক্ষমতা। তিত্তির পাখী পোড়াইয়া পোড়াইয়া গো তিত্তির বংশকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা বলে, এক একটা উৎকট অসুখে একে একে সব মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু অসুখ নয়, ভূত।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া টাহা বলিল, "গো কিন্তু বুহাকে ভয় করে। বুহারও ক্ষমতা অদ্ভুত। ওহালি বুহাকে অদ্ভুত শক্তি দিয়া গিয়াছে। তাই

গো তাহাকে বেশি অনুরোধ করিতে সাহস করে না।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তাহার পর টাহা আবার সহসা বলিল, "গো কিন্তু তোমাকে সুচক্ষে দেখিয়াছে। তিত্তিরের মুণ্ড বাঁ কাতে পড়া অত্যন্ত সুলক্ষণ। পোড়া রক্তের ধোঁয়াও দক্ষিণ দিকে উড়িয়া গেল, ইহাও খুব ভাল লক্ষণ। বুহা সেই জন্য কোন আপত্তি করিতে পারিল না। কিছুকাল পূর্বে আর একজন বিদেশী আসিয়াছিল। গো তাহাকে সুনজরে দেখে নাই, বুহাও তাহাকে থাকিতে দেয় নাই!"

আমি নীরবে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম। কি যে বলিব, কি বলিলে যে সুবিধা হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তাই চুপ করিয়াই ছিলাম। বনের কাছাকাছি আসিয়া টাহা সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওই দেখ, ওহালি ছবি আঁকিতেছে।"

চাহিয়া দেখিলাম, মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিতেছে। নির্নিমেষে আমিও চাহিয়া রহিলাম। ওহালি ছবি আঁকিতেছে, এই অভিনব কল্পনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে টাহা কখন নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই।

বৃক্ষকোটরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা পাথরের টুকরা গায়ে লাগিতেই উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা লাগিল। তাহার পর আর একটা। মনে হইল, আকাশ হইতে পড়িতেছে। সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলাম। তাহার পরই শুনিতে পাইলাম—"দূর হ, দূর হ, দূর হ। মরিয়া গিয়াও কি তুই নিস্তার দিবি না। দূর হ! আকাশে বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন! রাক্ষসী কোথাকার! আমার বংশ ছারখার করিয়া তোর লাভ কি! তুই তো চলিয়া গিয়াছিস। বুহাকে ছাড়িয়া দে, জোলমাকে ছাড়িয়া দে, এমন করিয়া তাহাদের বংশ লোপ করিবি তুই ডাইনি! দূর হ—দূর হ!"

দেখিলাম, গো আকাশের দিকে চাহিয়া ক্রমাগত বকিয়া চলিয়াছে। চাঁদে এবং মেঘে মিশিয়া আকাশে অদ্ভুত ছবি ফুটিয়াছে একটা। গো মাঝে মাঝে সেই ছবিটার দিকে পাথর ছুঁড়িতেছে। আর দুই হাত তুলিয়া তাহাকে অভিশাপ দিতেছে। তাহার পলিত কেশে, তাহার দীপ্ত চক্ষুর্দ্বয়ে, তাহার ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহুতে, তাহার সর্বাঙ্গে—জ্যোৎস্না। মনে হইতেছে আকাশবাসিনী ওহালি জ্যোৎস্নারূপে নামিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। গো আবার আকাশের দিকে পাথর ছুঁড়িতে লাগিল। আমি সবিস্ময়ে বৃক্ষকোটর হইতে বসিয়া বসিয়া তাহার কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। গো উন্মাদিনী কি না এ সন্দেহ একবারও আমার মনে হইল না। মনে হইল কোনও দৈবশক্তি উহার উপর ভর করিয়াছে এবং সে শক্তি ওহালির শত্রু। যে ওহালি ছবি

আঁকিয়া বহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, যে ওহালির স্মৃতি বহাকে স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তাহার বংশবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে গৌ ক্ষমা করিবে না, তাহার চক্রান্তকে সে যেমন করিয়া হোক ব্যর্থ করিয়া দিতে চায়। হঠাৎ গৌ বলিয়া উঠিল, "বিদেশী বীর আসিয়াছে, এই-বার তোর মায়াজাল সে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে। তুই যে অভিশপ্ত কাঠের উপর চড়িয়া এ দেশে আসিয়াছিলি সেই কাঠকে সে অনায়াসে তুলিয়াছে, তোর স্মৃতিকেও এইবার সে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবে। বহার কবল হইতে জোল-মাকে সে ছিনাইয়া লইবে। বহা তাহাকে জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইয়া হত্যা করিবে ভাবিয়াছে, কিন্তু তাহা আমি হইতে দিব না, আমি তাহাকে যাইতে দিব না—"

আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া গৌ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুঝিলাম গৌ আমার কথাই বলিতেছে। আমি সন্তর্পণে বৃক্ষকোটর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহির হইয়া আসিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইল না। আমি যে গৌয়ের কথা আড়াল হইতে শুনিতে পাইয়াছি তাহাও গৌকে জানান বুদ্ধিমানের কাজ হইবে বলিয়া বোধ হইল না। গৌ যে আমার হিতৈষিণী এ কথা তো জানাই গেল, এখন এভাবে তাহার কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই। বরং এমনভাবে তাহার সম্মুখে আসা যাক যেন আমি তাহাকে দেখিতেই পাই নাই, হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। ধীরে বৃক্ষান্তরালে সরিয়া গেলাম। বনের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িব এইরূপই অভিপ্রায় ছিল। বনের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে একটা বুদ্ধি মাথায় আসিয়া গেল। গৌয়ের নিকট যদি ভাণ করিতে পারি যে, আমিও তাহার মতানুবর্তী, আকাশের ওই জ্যোৎস্নামণ্ডিত মেঘের চিত্র আমারও চক্ষুশূল, তাহা হইলে গৌ একেবারে আমার বাধ্য হইয়া পড়িবে। একটা বুদ্ধিও মাথায় আসিয়া গেল। সঙ্গে তীর ধনুক ছিল। অনেকখানি ঘুরিয়া বন হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম গৌ তখনও আকা-শের দিকে চাহিয়া বকিয়া চলিয়াছে। আমি কিছুদূর পিছু হটিয়া গৌয়ের কাছাকাছি সরিয়া আসিলাম—যেন আমি তাহাকে দেখিতেই পাই নাই। তাহার পর ধনুতে শরযোজনা করিয়া তাহা মেঘের দিকে ছুঁড়িয়া দিলাম।

গৌ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে বুঝিলাম, কারণ সে নীরব হইয়া গেল। আমি যখন ধনুতে দ্বিতীয় তীর লাগাইতেছি তখন পদশব্দ শুনিয়া বুঝিলাম গৌ আমার দিকেই আসিতেছে। কিন্তু আমি ঘাড় ফিরাইলাম না, এমন ভাব করিলাম যেন আমি তাহার পদশব্দ শুনিতে পাই নাই। নিবিষ্টচিত্তে ধনুতে তীরটি লাগাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া মেঘের দিকে পুনরায় একটি শরক্ষেপ করিলাম।

"তুমি এত রাত্রে এখানে কি শিকার করিতেছ?" আমি যেন চমকাইয়া উঠিলাম। তাহার পর এমন ভাণ করিলাম যেন কোনও অপরাধ ধরা পড়িয়া

যাওয়াতে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছি।

"কি করিতেছ এখানে?"

বিস্মিত গো পুনরায় প্রশ্ন করিল।

আমি গম্ভীর কণ্ঠে আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিলাম, "উহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

"কাহাকে?"

"ওই জ্যোৎস্না-মাখা মেঘকে—"

"কেন?"

"ও আমার শান্তি নষ্ট করিতেছে। ঘুমাইতে দিতেছে না। ওই চাঁদের আলো আমার নিদ্রায় প্রবেশ করিয়া স্বপ্নরূপে আমাকে ভয় দেখাইতেছে। তীর দিয়া উহাকে দূর করা যায় কি না চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি।"

উদ্ভাসিত চক্ষু তুলিয়া গো নীরবে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিল। তাহার পর বলিল, "তুমি তোমার অজ্ঞাতসারে ঠিক কাজই করিতেছিলে। ও তোমার শত্রুই। ও কে জান?"

"না।"

"ওহালি। জোলমার মা। উহারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বুহা নিজে বিবাহ করে নাই, জোলমাকে বিবাহ করিতে দেয় নাই। মরিয়া গিয়াও ওহালি নিজের অধিকার ছাড়িবে না। ছবির মায়ায় উহাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

গো নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা বলিল, "কুঠারের হাতলে ওই ছবিটা কি তোমারই আঁকা?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি তাহা হইলে জোলমাকে ভুলাইতে পারিবে। আকাশে তীর ছুঁড়িয়া কিছু হইবে না, জোলমাকে ভোলাও। তুমি এখানে কোথায় আছ?"

"এখন এই বনেই আছি। কাল কিন্তু জিকাটু পাহাড়ে গুহা খুঁজিতে যাইব।"

"যাইও না। সেখানে গেলে আর ফিরিবে না। বুহা একথা জানে বলিয়াই তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে যাইতে বলিয়াছে। সে জোলমার কাছে কাহাকেও ঘেঁষিতে দিতে চায় না। তুমি যাইও না। এই বনেই থাক। এইখানেই জোলমার দেখা পাইবে। সে এখানে কাঠ কুড়াইতে আসে। তাহার সহিত আলাপ কর, তাহাকে মুগ্ধ কর, ওহালির কুহক হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ কর।"

তাহার পর গো খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল—

"সবচেয়ে সুন্দর জিনিস কি জান? ছবি নয়, শিশু। মায়ের কোলে স্তন্যপানরত শিশু। জোলমাকে তাই দাও।"—আবার গো খিলখিল করিয়া

হাসিয়া উঠল।

আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর প্রশ্ন করিলাম, "তুমি এত রাত্রে এখানে কেন আসিয়াছ?"

"তিত্তির ধরিতে। আমি রোজ আসি।"

"ফাঁদ পাতিয়া তিত্তির ধর? —আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম।

"হাঁ। দেখিবে তো আইস।"

তাহার অনুসরণ করিলাম।

কিছুদূর গিয়া গো বলিল, "তুমি ওই গাছের উপর বসিয়া থাক। আমি এই ঝোপের ভিতর ঢুকিব।"

আমি গাছের উপর উঠিয়া বসিলাম। গো ঝোপের পিছনের দিকে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরেই ঝোপের ভিতর হইতে তিত্তিরের ডাক শোনা গেল। অনুমান করিলাম, গো ডাকিতেছে। তিত্তিরের ডাকের এমন চমৎকার অনুকরণ যে মানুষে করিতে পারে তাহা ধারণাতীত ছিল। বিতংয়ের কথা মনে পড়িল। সে-ও চমৎকার হরিণের ডাক ডাকিতে পারে। সহসা মনে হইল অনুকরণ করাই ইহাদের বিশেষত্ব। বৃহাও ছবিতে রং দিয়া জন্তু জানোয়ারের আকৃতির অনুকরণ করিতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য পশুকে নিজের আয়ত্তাধীনে লইয়া আসা। এরূপ বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কিন্তু ছবি আঁকিতে শিখি নাই। কেন যে আমরা ছবি আঁকিতে শিখিয়াছি তাহা জানি না। আমাদের মধ্যে অনেকেই ছবি আঁকে, তাহাদের দেখাদেখি আমিও আঁকিতে শিখিয়াছি। থানকুর মুখে শুনিয়াছি, একবার একটা পাথরের গায়ে আমাদের পূর্বপুরুষ নাকি একটা বল্‌গা হরিণের ছবি আঁকা দেখিয়াছিলেন। বৃষ্টিতে ধূলা জমিয়া আপনিই ছবি আঁকা হইয়া গিয়াছিল। তিনি নাকি পাশেই তাহার অনুকরণে একটা ছবি আঁকেন। এজন্য নিজেদের দলে তাঁহার নাকি খুব খাতির হইয়াছিল। তখন হইতেই আমাদের সমাজে ছবি আঁকার প্রচলন হইয়াছে।

হঠাৎ বনে আরও কয়েকটা তিত্তিরের ডাক শোনা গেল। আমি উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। মনে হইল, তিত্তিরগুলি ক্রমশ যেন নিকটতর হইতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ঝোপের ভিতর গো ক্রমাগত ডাকিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম তিন-চারটি তিত্তির ঝোপের নিকট আসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। ঝোপের ভিতর গোয়ের ডাকও পরিবর্তিত হইল। পুরুষ তিত্তিররা যেভাবে স্ত্রী-তিত্তিরদের সোহাগের সুরে ডাকে, গো ঝোপের ভিতর হইতে ঠিক সেইভাবে ডাকিতে লাগিল। যে তিত্তিরগুলি আসিয়াছিল সেগুলি সম্ভবত স্ত্রী-তিত্তিরই। তাহারা একটু পরেই দেখিলাম ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

"এইবার নামিয়া পড়।"

হেঁট হইয়া দেখিলাম, গো গাছের ঠিক নীচে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে।

নামিয়া পড়িলাম।

"চল এইবার দেখিবে চল।"

"তিন-চারটি তিত্তিরকে ওই ঝোপের মধ্যে ঢুকিতে দেখিলাম এখনই।"

"ওটা ঝোপের মতো দেখিতে বটে কিন্তু ওটা ঝোপ নয়, ফাঁদ। উহার ভিতর ঢুকিলে তিত্তির পাখী আর বাহিরে আসিতে পারে না।"

"তুমি কি উহারই ভিতর বসিয়া ডাকিতেছিলে?"

"না, উহার পিছনে। এইবার ঢুকিব।"

গৌ টপ করিয়া পাতা সরাইয়া চকিতের মধ্যে ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এমন নিমেষের মধ্যে গেল যে আমি অবাক হইয়া গেলাম। মনে হইল, কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, এটা স্বাভাবিক ঝোপ নয়, ডাল পালা পুঁতিয়া এটাকে ঝোপের আকার দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে ঝটপট ঝটপট শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই গৌ বাহির হইয়া আসিল। তাহার হস্তে চারিটি জীবন্ত তিত্তির পক্ষী। আমার সম্মুখেই সে একটি পাখীর মুন্ড ছিঁড়িয়া তাহার রক্ত পান করিতে লাগিল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি একটা খাও। দাঁড়াও একটু আগুন জ্বালি।"

মহাউৎসাহে গৌ শুষ্কপত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। আগুন জ্বালিবার সরঞ্জাম তাহার সঙ্গেই ছিল। সরঞ্জাম বিশেষ কিছু নয়—দুই টুকরা কাষ্ঠ-খন্ড। পরস্পর ঘর্ষণে আগুন হয়। এক টুকরা অপেক্ষাকৃত চওড়া কাষ্ঠে যে গর্তটি আছে তাহার ভিতর গোলাকৃতি আর একটি কাষ্ঠ দন্ড রাখিয়া ঘর্ষণ করিলেই অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং কাছাকাছি কোনও দাহ্য বস্তু থাকিলেই তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। বৃদ্ধা গৌয়ের দেহে যেন কিশোরীসুলভ চঞ্চলতা আবির্ভূত হইল। সে তাড়াতাড়ি শুষ্কপত্র স্তূপীকৃত করিয়া ফেলিল এবং তাহার খানিকটা অংশ লইয়া আগুন ধরাইতে বসিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুষ্ক পত্ররাশি জ্বলিয়া উঠিল। সেই নিবিড় অরণ্যে পাশাপাশি বসিয়া আমরা তিত্তির ঝলসাইয়া আহার করিতে লাগিলাম। দুইটি তিত্তিরকে গৌ বন্য লতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। আহার করিতে করিতে গৌ তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "তোদেরও খাইব। ঠিক এমনি করিয়া মুন্ড ছিঁড়িয়া, এমনি করিয়া আগুনে পোড়াইয়া, এমনি করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া খাইব। আমার সন্তানদের মারিয়া সহজে নিস্তার পাইবি না!"

আহার শেষ করিয়া গৌ পা দিয়া আগুন নিবাইয়া দিল। আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু পড়িয়াছিল—চর্বিত অস্থি, নাড়িভুঁড়ি—একটা পাতায় সেগুলি কুড়াইয়া লইল। আমার চোখে বিস্ময় ফুটিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার কুকুরকে খাওয়াইব। বরাবর খাওয়াইয়াছি। তিত্তির যে উহার শত্রু, উহার খাদ্য তাহা উহার মর্মে মর্মে গাঁথিয়া দিব। আমি তো কিছুদিন পরে মরিয়া যাইব তখন ও-ই আমার হইয়া প্রতিশোধ লইবে। ও-ই প্রকৃত পুত্রের

কাজ করিবে। বুহা টাহা পুত্রের কাজ করে না। ওহালি উহাদের সর্বনাশ করিয়া গিয়াছে। উহারা তিত্তির বংশ ধ্বংশ না করিয়া ছবিতে উন্মত্ত হইয়া আছে। বুহা কি বলে জান?"

গৌ আবার হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"কি বলে?"

"হরিণের দল যেদিন মারা পড়িবে সেই দিনই শুনিতে পাইবে। বুহা পাগল, টাহা নির্বোধ।"

তাহার পর লতায়-বাঁধা তিত্তির দুইটি তুলিয়া লইয়া গৌ বলিল, "খবরদার, তুমি জিকাটু পাহাড়ে যাইও না। এই বনেই লুকাইয়া থাক। বুহার কবল হইতে জোলমাকে উদ্ধার কর। নূতন বংশ স্থাপন কর। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস কি জান? মানুষ, মানুষ, মানুষ। সেই জন্য সবচেয়ে সুন্দর জিনিস কি জান? শিশু, শিশু, শিশু—"

এমন সময় একটু দূরে হরিণের ডাক শোনা গেল। গৌ ক্ষণকাল উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল, "বিতং। বিতংয়ের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে?"

"হইয়াছে।"

"বিতং জোলমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। বুহা দেয় নাই। বুহা তাহাকেও হয়তো জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইত কিন্তু ও চমৎকার হরিণের ডাক ডাকিতে পারে। ও মরিয়া গেলে হরিণ ডাকিয়া আনিবে কে? তাই উহাকে ওই গাছের গুঁড়িটা তুলিতে বলিল। জানে—ও রোগা মানুষ, গাছের গুঁড়ি তুলিতে পারিবে না—"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি কিন্তু তুলিয়াছি।"

"টাহার মুখে সেকথা শুনিয়াছি। তাই তো তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইতেছে। সেখানে গিয়া আজ পর্যন্ত কেহ ফেরে নাই। তুমি যাইও না, এই বনেই থাক।"

"কিন্তু বুহা যদি জানিতে পারে?"

"পারিলেই বা! এ বন তো সকলের সম্পত্তি। যে কেহ এখানে থাকিতে পারে, শিকার করিতে পারে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গৌ বলিল, "আমি রোজ রাত্রে এখানে তিত্তির ধরিতে আসি। যদি কোনও অসুবিধা হয় আমাকে বলিও, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

তাহার পর নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে আমার চাই। তোমার মতো সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষই জোলমার প্রয়োজন। তোমাকে আমি যাইতে দিব না।"

আবার হরিণের ডাক শোনা গেল।

গৌ বলিল, "বিতং এইদিকেই বোধ হয় আসিতেছে। আমি যাই।"

তাহার পর তিত্তির পক্ষী দুটির দিকে চাহিয়া বলিল, "চল, এইবার ঝাউ-ঝাউয়ের বুকের রক্ত তোলপাড় করিবে চল।"

"ঝাউঝাউ কে?"

"কুকুরটা। ইহাদের দুইজনকে এখন তাহার নাগালের বাহিরে অথচ দৃষ্টির সম্মুখে টাঙাইয়া রাখিব। ঝাউঝাউ ইহাদের দেখিবে অথচ ধরিতে পারিবে না। দেখিবে অথচ ধরিতে পারিবে না, মর্মে মর্মে চটিয়া থাকিবে। কি মজাই না হইবে!"

খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে গো চলিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে আবার বৃক্ষকোটরের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখনও প্রভাতের বিলম্ব ছিল। কোটরে ঢুকিয়া আর একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

...ঘুমাইয়া অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম একটা বাঘ আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে। যেন বাঘ নয়, মানুষ। মনে হইতেছিল, এখনই বোধ হয় মনুষ্যকণ্ঠে আমার সহিত কথাও বলিবে। কিন্তু ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে। কেকারবে সমস্ত বন মুখরিত। তীর ধনুক সঙ্গেই ছিল, ইচ্ছা হইল একটা ময়ূর শিকার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। গো যখন বৃহার নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া এই বনেই থাকিতে বলিয়া গিয়াছে তখন শিকার করিয়াই নিজের আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। কেকাধ্বনি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। অনেক দূর যাইতে হইল। ক্রমশ নিবিড় অরণ্যে গিয়া পড়িলাম। অরণ্যের ভিতরও বেশ কিছুদূর গিয়া তাহার পর মনে হইল এইবার বোধ হয় কেকাধ্বনির নিকটবর্তী হইয়াছি। জঙ্গলটা পার হইলেই বোধ হয় ময়ূরের দলকে দেখিতে পাইব। জঙ্গলের শেষ প্রান্তে গিয়া অতি ধীরে ধীরে মুখ বাড়াইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। দেখিলাম, একদল ময়ূর একটা খোলা মাঠে পেখম বিস্তার করিয়া নাচিতেছে এবং তাহাদের সহিত নাচিতেছে জোলমা। ময়ূরেরা তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছে না, সে-ও যেন তাহাদেরি একজন। আমি অনেকক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের নৃত্য দেখিলাম। বস্তুত আমি আত্মহারা হইয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন ভিন্ন লোকেই নীত হইলাম। বনের পাখী মানুষের সহিত এমনভাবে কি করিয়া মিশিতেছে তাহাই আমি ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। পুনরায় আমার থানকুর কথাই মনে হইতেছিল, জোলমা বোধ হয় মায়াবিনী। মানুষকেই পাখীতে পরিণত করিয়া নাচাইতেছে, পরে আহার করিবে। সহসা জোলমা থামিয়া গেল এবং বক্ষো-লগ্ন চর্মাবরণখানা খুলিয়া ফেলিল। দেখিলাম, তাহার গলায় চামড়ার থলির মতো কি যেন একটা বাঁধা রহিয়াছে। জোলমা থলিটাও খুলিয়া ফেলিল এবং থলির ভিতর হাত ঢুকাইয়া কি যেন বাহির করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইতে লাগিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, ময়ূরের দল সেগুলি সাগ্রহে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে।

মানুষ নিজে না খাইয়া পশুদের খাবার বিতরণ করিতেছে, এই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

"দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, ওই তো জোলমা, এত কাছে দাঁড়াইয়া আছে, গিয়া আলাপ কর, উহাকে ভুলাও।"

মনে হইল গো আমার কানে কানে যেন কথাগুলি বলিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমার নিজেরই কামনা যে বাঙময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই তাই ভয় পাইলাম। মনে হইল, যাদুকরী গো হয়তো কোনও অচিন্তনীয় উপায়ে আমাকে আদেশ করিতেছে। তাহার আদেশ যদি পালন না করি বিপদ হইবে। আমার নিজের আগ্রহও কম ছিল না। কিন্তু একটা বিস্ময়ান্বিত শঙ্কা যেন আমার গতিরোধ করিয়াছিল, এই ঘটনায় সাহস পাইয়া বন হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

জোলমা প্রথমে আমাকে লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু ময়ূরেরা আমার আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। কয়েকটা ময়ূর ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই বাকিগুলি সচকিত হইয়া উড়িয়া গেল। তখন জোলমা মুখ তুলিয়া চাহিল। আমাকে দেখিয়া সে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আগাইয়া আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিদেশী, তুমি এখনও এখানে আছ?"

"হাঁ। পর্বতের আদেশে আমাকে থাকিতে হইয়াছে। তোমাদের দেশেই ঘর বাঁধিব।"

"কোনও গুহা কি ঠিক করিয়াছ?"

"না, এখনও করি নাই। কাল জিকাটু পাহাড়ে গুহার সন্ধানে যাইব।"

"ও, জিকাটু পাহাড়ে!"

চুপ করিয়া সে খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমিও নির্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটা তীক্ষ্ণ কেকাস্বর সহসা নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল।

জোলমা বলিল, "তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে কে যাইতে বলিয়াছে?"

"বৃহা।"

"ও।"

জোলমা আবার চুপ করিয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জোলমার আচরণ বড়ই রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। আমন্ত্রণ অথবা প্রত্যাখ্যান, আনন্দ অথবা বিষাদ, কিছুই তো তাহার আচরণে প্রতিভাত হইল না। সে আমাকে চায় কি চায় না তাহা তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেবতার যখন আদেশ তখন এই দেশেই আমাকে থাকিতে হইবে, জোলমাকে লইয়া যদি ঘর না বাঁধিতে পারি, জোলমা যদি আমাকে না চায়...। "জোলমাকে ভোলাও। বৃহার কবল হইতে উহাকে উদ্ধার কর"—অদৃশ্য গো আবার যেন আমার কানে কানে কথা বলিল।

আমি বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম, জোলমা যেদিকে গিয়াছে সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, জোলমাকে কিন্তু দেখা গেল না। কোথায় গেল সে? তাহাকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে চাই। আমাকে সে যদি আশ্বাস দেয়—দিবে কি?—যদি না দেয়...সহসা একটা চীৎকার শুনিতে পাইলাম, জোলমার কণ্ঠস্বর, মনে হইল আকাশ হইতে ভাসিয়া আসিল। নিকটেই প্রকাণ্ড একটা শিমুল গাছ ছিল, তাহার সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে ভরা। চাহিয়া দেখিলাম, তাহারই উঁচু একটা ডালে জোলমা বসিয়া আছে। আমিও পর মুহূর্তে গাছে উঠিতে লাগিলাম। আমাকে গাছে উঠিতে দেখিয়া জোলমার কিন্তু কোনরূপ ভাবান্তর হইল না। দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া সে যেমনভাবে বসিয়াছিল তেমনি-ভাবেই বসিয়া রহিল। আমি যখন তাহার কাছাকাছি হইলাম তখন সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখিল বটে, কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোনও আগ্রহ, ভয় বা বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করিলাম না, সে দৃষ্টি নিতান্তই উদাসীন। আমি তাহার পাশের ডালে আসিয়া উপবেশন করিলাম। কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলাম, "তুমি অমন করিয়া চীৎকার করিলে কেন?"

জোলমা কোনও কথা না বলিয়া চক্রবাল রেখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিলাম, বনের ধারে যে প্রান্তরটি রহিয়াছে তাহাতে এক-দল বন্য মহিষ চরিতেছে।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জোলমার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, বন্য মহিষ সম্বন্ধে আমার মনোভাব আর জোলমার মনোভাব যেন এক নয়। তাহার চোখের রহস্যময় [illegible]তেই তাহা আভাসিত হইতেছিল। বন্য মহিষগুলি দেখিবামাত্র আমার মনে যে লোভ ও হনন-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, জোলমার মনে ঠিক সেরূপ হয় নাই। সে সবিস্ময়ে যেন একটা আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছিল। আমি জোলমার মুখের দিকে চাহিয়াই রহি-লাম, কোন কথা বলিলাম না। আমার নীরবতাই অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিল, জোলমা কথা কহিল।

"বৃহার ছবি ওই মহিষের দলকে টানিয়া আনিয়াছে। এইবার উহারা আমাদের জন্য প্রাণ দান করিবে।"

"বৃহার ছবি উহাদের টানিয়া আনিয়াছে? তাহা কি করিয়া সম্ভব?"

"কি করিয়া তাহা জানি না, কিন্তু সম্ভব। বৃহা ছবি আঁকে বলিয়াই হরিণের দল আসে, ইহা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। শুধু আসে না, আসিয়া আত্মদান করে।"

"আত্মদান করে? আমি তো শুনিলাম, বিতং তাহাদের লাফাই পাহাড়ের দিকে লইয়া যায়, তাহার পর তাড়া খাইয়া তাহারা পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়ে।"

"তুমি যাহা বলিতেছ তাহাও ঠিক, এই বন্য মহিষদের শিকার করিবার

জন্যও বৃহা স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিবে, কিন্তু বৃহার মত যে, প্রাণীরা স্বেচ্ছায় আত্মদান না করিলে কেহ তাহাদের মারিতে পারে না। ছবির অদৃশ্য টানে মুগ্ধ হইয়া তাহারা আসে এবং আমাদের হিতার্থে স্বেচ্ছায় প্রাণদান করে। উহারা দেবতা, পশুরূপে আসিয়া আমাদের উপকার করে। স্বেচ্ছায় না আসিলে কেহ জোর করিয়া উহাদের আনিতে পারে না। বৃহা ছবি আঁকিয়া উহাদের পূজা করে, তাই উহারা সন্তুষ্ট হইয়া আসে।"

আমি এরূপ কথা পূর্বে কখনও শুনি নাই। সবিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলাম। জোলমাই আবার কথা কহিল। বলিল, "সন্তুষ্ট হইয়া উহারা আসে বটে, কিন্তু বীরত্ব না দেখিলে আত্মদান করে না। বৃহাকে তাই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমার বড় ভয় করিতেছে। বন্য মহিষ বড় ভয়ঙ্কর জন্তু, সহজে আত্মদান করে না।"

জোলমার চোখে মুখে শঙ্কা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "বৃহাকে কি যাইতেই হইবে? বৃহার বদলে যদি আমি যাই?"

জোলমা কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "তুমি যাইবে কেন?"

"তোমাকে নির্ভয় করিবার জন্য।"

"তুমি কি বৃহাকে রক্ষা করিবে?"

"বৃহার যাইবার প্রয়োজন কি? আমি একাই গিয়া বন্য মহিষদের সম্মুখীন হইব এবং বেশি না পারি একটাকেও অন্তত বধ করিব।"

জোলমা চকিতে আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াই বলিল, "বৃহাকে কিন্তু যাইতেই হইবে, কারণ সে আমাদের দলপতি। টাহা হয় তো তাহার সঙ্গে থাকিবে, তোমার কথাও বৃহাকে বলিব। তুমি কি ইতিপূর্বে বন্য মহিষ শিকার করিয়াছ?"

"করি নাই। কিন্তু তোমার জন্য আমি যে-কোনও বিপদ বরণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

ইহার উত্তরে কিন্তু জোলমা যাহা করিল তাহাতে আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। সে সহসা মুখ ফিরাইয়া সানুনয়ে বলিল, "বিদেশী, পালাও। আমাকে তুমি পাইবে না। প্রাণ থাকিতে বৃহা কখনও ওহালি-কন্যাকে অপরের হস্তে সমর্পণ করিবে না। যতদিন বাঁচিব, ততদিন অন্ধকার গুহায় বৃহার পার্শ্বে প্রদীপ লইয়া আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। আমার জীবন সাধারণ মানুষের ভোগে লাগিবে না, আমাকে তুমি কামনা করিও না, পালাও—"

দেখিলাম জোলমার মুখ পাংশুবর্ণ, অধর কম্পমান, চক্ষু জ্বালাময়ী। আমার অপ্রস্তুত ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়া গেল, আমার শিরায় উপশিরায় রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল, আমি সহসা তাহার দুই হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম, "আমি সাধারণ মানুষ নই, আমি পর্বতের ভাষা বুঝিতে পারি, বলগা হরিণকে

ছবিতে মূর্ত করিতে পারি, গত রাত্রে ওহালিকে আমি জ্যোৎস্নামাখা মেঘে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তোমাকে পাইবার জন্য যে-কোনও দুরূহ কার্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। তোমার মা যে কাঠের উপর চড়িয়া ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহা আমি অবলীলাক্রমে স্কন্ধে তুলিয়াছি, টাহাকে জিজ্ঞাসা করিও। বূহা যে জিকাটু পর্বতে আমার জন্য বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছে তাহা শুনিয়াছি অতিশয় ভয়ংকর স্থান। যত ভয়ংকর হোক, সেখানে আমি যাইব, নিজের শক্তিতে সে স্থানকে নিরাপদ করিব, আমি প্রমাণ করিয়া দিব যে, আমি সাধারণ লোক নই। তোমাকে কামনা করিবার দাবি আমার আছে—"

জোলমার অধরে মৃদু হাস্য স্ফুরিত হইল। সে বলিল, "দাবি থাকিলেও আমাকে পাইবে না। কারণ, আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। আমাদের সম্প্রদায়কে বাঁচাইতে হইলে বূহাকে ছবি আঁকিতে হইবে। আমি প্রদীপ না ধরিলে বূহা ছবি আঁকিতে পারে না। সুতরাং বূহার পার্শ্বে প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। আমার আশা তুমি ছাড়িয়া দাও। আমাদের সম্প্রদায়ে নারীর অভাব নাই, তুমি অপর কাহাকেও বাছিয়া লও—"

এই বলিয়া জোলমা গাছ হইতে নামিতে শুরু করিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

গাছ হইতে নামিয়া জোলমা বলিল, "তুমি কি সত্যই মহিষ শিকার করিতে যাইবে? যদি যাও তোমার কথা বূহাকে বলিব।"

"বূহা কবে মহিষ শিকারে বাহির হইবে?"

"তাহাকে আজ খবরটা দিব, তাহার পরে সে নিজেই দিন স্থির করিবে।"

"আমি তাহা হইলে আজ জিকাটু পাহাড়টা ঘুরিয়া আসি। কাল সকালে আবার এইখানেই তোমার প্রতীক্ষা করিব।"

"জিকাটু পাহাড়ে তুমি যাইও না, এখানেই থাক"

"আমি যাইবই। বূহার আদেশ আমি অমান্য করিব না।"

জোলমা নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, সে যেন কি বলিতে চাহিতেছে কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। জিকাটু পাহাড় সম্বন্ধে যে ভয় টাহা এবং গোয়ের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি সেই ভয় জোলমাকেও অভিভূত করিয়াছে মনে হইল। অথচ সত্য কথাটা সে যেন বলিতে পারিতেছে না। জোলমার নীরব চাহনির উত্তরে আমি প্রশ্ন করিলাম, "জিকাটু পাহাড়ে যাইতে বারণ করিতেছ কেন? কি আছে সেখানে?"

"কি আছে জানি না, এইটুকু শুধু জানি, সেখানে গেলে কেহ ফেরে না—"

"তবে বূহা আমাকে সেখানে যাইতে বলিল কেন?"

"শ্যেন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য। বূহা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, আমি চলিয়া গেলে তাহার ছবি আঁকা বন্ধ হইয়া যাইবে। আমি তাহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও সহিত থাকি ইহা কল্পনা করাও তাহার পক্ষে শক্ত। তাই সে তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে যাইতে বলিয়াছে।"

সহসা আমার মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া জোলমাকে আলিঙ্গন পাশে বন্ধ করিয়া বলিলাম, "জিকাটু পাহাড়ে আমি যাইব, কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। বুহার কাছে তুমি আর ফিরিয়া যাইবে না।"

"ছাড়, ছাড়, ছাড়িয়া দাও—"

জোলমা চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু আমি তাহাকে মুক্তি দিলাম না। আলিঙ্গন পাশ হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেও আমি বজ্রমুষ্টিতে তাহার একটা হাত ধরিয়া রহিলাম। জোলমার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। সে শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমি আজন্ম কুমারী। আমার পবিত্রতা নষ্ট করিও না। আমার পবিত্রতা প্রভাবেই বুহা ছবি আঁকে, সমস্ত শ্যেন সম্প্রদায়ের জীবন-মরণ আমার পবিত্রতার উপর নির্ভর করিতেছে, আমাকে কলঙ্কিত করিও না, ছাড়িয়া দাও। আমাকে কলঙ্কিত করিলে শুধু শ্যেন সম্প্রদায়ের নয় তোমারও সর্বনাশ হইবে। ওহালি তোমাকে ক্ষমা করিবে না—"

বিহাড়া ও শবরী ওকার গল্পটা আবার মনে পড়িয়া গেল। ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িলাম কিন্তু তবু জোলমার হাত ছাড়িলাম না। ছাড়িতে পারিলাম না।

বলিলাম, "তোমাকে আমি কলঙ্কিত করিব না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে অপমান করিব এতবড় কাপুরুষ আমি নই। কিন্তু তোমাকে আমি ছাড়িব না। আমার সহিত তোমাকে এখনই জিকাটু পাহাড়ে যাইতে হইবে। যে ভয় তোমাদের সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে আমি তোমাকে দেখাইয়া দিতে চাই যে, সে ভয় অতিক্রম করিবার মতো পৌরুষ আমার আছে। তোমাকে আমার সঙ্গে জিকাটু পাহাড়ে যাইতে হইবে।"

"আমি যদি না যাই—"

"জোর করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইব।"

জোলমা-নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "জিকাটু পাহাড়ে যাইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমার জীবনের দায়িত্ব তোমাকে লইতে হইবে। আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের জীবন আমার জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে। আমার জীবন হেলায় নষ্ট করিবার অধিকার আমার নিজেরও নাই, জিকাটু পাহাড়ে গেলে আমার জীবন যে বিপন্ন হইবে না তাহার কি জামিন তুমি দিতে পার?"

আমি আমার চর্মনির্মিত কটিপেটিকা হইতে বৃহত্তম প্রস্তর ছুরিকাটি বাহির করিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম, "যখনই তুমি নিজেকে বিপন্ন মনে করিবে এইটি ব্যবহার করিও। প্রয়োজনবোধ করিলে আমার বুকেও বসাইয়া দিতে পার, আপত্তি করিব না!"

জোলমার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "বেশ, আমার হাত ছাড়িয়া দাও। চল তোমার সঙ্গে যাইতেছি।"

তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। সে পলাইয়া গেল না, অগ্রবর্তিনী হইয়া আমাকে পথ দেখাইয়া জিকাটু পাহাড়ের দিকে লইয়া চলিল। বন্যপথ তাহার সুপরিচিত। বন্য হরিণীর মতো ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়া দ্রুতগতিতে সে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে আমার একটু খটকা লাগিল।

বলিলাম, "একটা কথা আমার মনে হইতেছে। তোমার এমন মূল্যবান জীবন রক্ষণাবেক্ষণ করিবার কোনও ব্যবস্থা কি তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা করে নাই? মনে কর, সত্যই যদি কেহ তোমাকে আক্রমণ করে, তোমার আত্ম-রক্ষা করিবার কি উপায় আছে? তোমার কাছে তো একটা অস্ত্রও নাই।"

"উপায় আছে বই কি, দেখিবে?"

জোলমা হাসিমুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

"কই দেখি?"

জোলমা সহসা কেকা-ধ্বনি করিয়া উঠিল। আরণ্য নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া সে ধ্বনি যেন আকাশকেও চিরিয়া দিল। একবার, দুইবার, তিনবার চীৎকার করিল সে। তাহার পর সে চীৎকার মুহূর্তে মধ্যে শত-চীৎকারে পরিণত হইল। সমস্ত বন কেকা-ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, তীক্ষ্ম তীব্র শব্দময় একটা বিরাট সমুদ্র যেন অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া আসিতেছে। তাহার পরই পক্ষবিধূননের শব্দ। দেখিলাম, দলে দলে শত শত ময়ূর চতুর্দিক হইতে উড়িয়া আসিতেছে। তাহাদের চোখের দৃষ্টি হিংস্র, নখর উদ্যত, তাহাদের তীক্ষ্ম চঞ্চুতে জিঘাংসা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। জোলমা হাসিয়া বলিল, "উহারা যদি দেখে আমি বিপন্ন, প্রাণ দিয়া আমাকে রক্ষা করিবে। এই বনে আমাকে আক্রমণ করিয়া কেহ নিস্তার পাইবে না, উহারা নিমেষে তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে। এই ময়ূরের দলই আমার রক্ষী। বাঘের হাত হইতেও ইহারা আমাকে রক্ষা করিয়াছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে না। শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলেই এ কথা জানে।"

তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, "বিতংকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।"

চতুর্দিকের ঝোপ-ঝাড় বৃক্ষশ্রেণী ময়ূরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আকাশেও দেখিলাম অনেক ময়ূর উড়িতেছে। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জোলমা হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল। ময়ূরের দল আবার ক্রমে অন্তর্ধান করিল।

জোলমা বলিল, "এইবার চল, যাই—"

পুনরায় সে অগ্রবর্তিনী হইল। আমি পুনরায় তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

"আমি যখন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে স্পর্শ করিয়াছিলাম তখন

তুমি ময়ূরের দলকে ডাক নাই কেন?"

প্রশ্নটা না করিয়া পারিলাম না। আমার অভিভূত চেতনায় ওই প্রশ্নটাই কেবল বারম্বার বাঙ্ময় হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

জোলমা মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, "তোমার দৌড় কতদূর দেখিতেছিলাম। তুমি শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংযত করিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি খুশি হইয়াছি এবং সেইজন্যই তোমার সহিত জিকাটু পাহাড়ে যাইতে রাজী হইয়াছি—"

"ইহার পূর্বে জিকাটু পাহাড়ে কখনও গিয়াছ?"

"না। শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলেই জিকাটু পাহাড়কে ভয় করে। ওখানে যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না এইরূপ জনশ্রুতি।"

"তবে এখন যাইতেছ কেন?"

"তোমার জন্য। তুমিই তো আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ।"

"কিন্তু তোমাকে যে জোর করিয়া কোথাও লইয়া যাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণ তুমি এখনই দিয়াছ। তবে যাইতেছ কেন বুঝিতে পারিতেছি না।"

ইহার উত্তরে জোলমা আমার দিকে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিল মাত্র, কোনও কথা বলিল না। আমিও সমস্ত পথ কোনও কথা বলিলাম না। একটা অদ্ভুত বিস্ময়ে আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জোলমাকে আর মানবী বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল, শ্যেন সম্প্রদায়ের লোকেদের বিশ্বাসই বোধ হয় ঠিক, জোলমা দেবকন্যা। আর একটা কথাও অনিবার্যভাবে মনে হইতেছিল। মনে হইতেছিল জোলমা মানবী বা দেবী যাহাই হউক না কেন, জোলমাকে আমার চাই। তাহাকে যদি না পাই আমার সমস্ত পৌরুষ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিছুকাল পূর্বে বহু নারী লইয়া ঘর করিয়াছি। এখন সহসা মনে অভিনব একটা অনুভূতি জাগরিত হইল। মনে হইল, জীবনে এই বোধ হয় প্রথম নারী দেখিলাম। আমার পূর্ব জীবনের পিকী-বনটু-বোহিলা-জমাইকিনা-দোম্বি-ঠাঠা যেন কতকগুলি প্রাণহীন সন্তান প্রসব করিবার যন্ত্রমাত্র ছিল। তাহদের না ছিল ব্যক্তিত্ব, না ছিল রূপ। তাহাদের ঘিরিয়া কল্পনা উদ্দাম হইয়া উঠিত না, এমন কি কৌতূহলও জাগরিত হইত না। তাহাদের সংস্পর্শে যে ক্ষুধা অনুভব করিয়াছি তাহা নিতান্তই পাশবিক ক্ষুধা। জোলমা আমার মনে যে ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছে তাহার স্বাদ ইতিপূর্বে কখনও পাই নাই। জোলমাকে আমার চাই। আমার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হইয়া এই চিন্তাতেই নিবদ্ধ ছিল। জিকাটু পাহাড়ের ভীতিও আমার মন হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো জোলমার অনুসরণ করিতেছিলাম।...

"ওই জিকাটু পাহাড়।"

জোলমার কথায় আমার চমক ভাঙিল। চাহিয়া দেখিলাম, রুক্ষ একটা প্রস্তরস্তূপ অভ্রভেদী হইয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাদদেশে

দেখা যাইতেছে না। ঘননিবদ্ধ শ্যামল তরুশ্রেণীতে দৃষ্টি ব্যাহত হইতেছে। জোলমা এবং আমি উভয়েই রুক্ষ পর্বত চূড়াটার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটা অদ্ভুত নীরবতায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। পশু পক্ষীর কোনও শব্দ নাই, গাছের পাতাও নড়িতেছে না। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রও যেন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে মৃত্যু কাছে-পিঠে কোথাও যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।

"এইবার কি করিবে?"

জোলমাই প্রশ্ন করিল। প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এতক্ষণে যেন যন্ত্রচালিত মূঢ়বৎ জোলমার অনুসরণ করিতেছিলাম, প্রশ্নের আঘাতে জাগরিত হইলাম। চতুর্দিকে চাহিয়া অবশেষে ঠিক করিলাম, জিকাটু পাহাড়ের দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে চতুর্দিকটা একবার পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

"এইবার একটা গাছে উঠিতে চাই।"

"আমাকেও কি উঠিতে হইবে?"

"সেটা তোমার ইচ্ছা।"

"আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছ, এখন একথা বলিতেছ কেন?"

"প্রথমে জোর করিয়াছিলাম বটে, এখন কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি, তোমাকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার মতো শক্তি আমার নাই। তুমি যদি ইচ্ছা কর চলিয়া যাইতে পার। জিকাটু পাহাড়ে আমি একাই যাইব। যদি বাঁচিয়া থাকি কাল তোমার সহিত দেখা হইবে।"

জোলমার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া সত্যই আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে পেশী-শক্তির বলে বলীয়না হইয়া এতদিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছি সহসা তাহার উপর আস্থা হারাইয়া সমস্ত চিত্ত যেন বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। থানকুর নিকট যে সব রূপকথা শুনিয়াছিলাম তাহা বাস্তবে যে রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। বনের ময়ূরকে জোলমা কি করিয়া বশ করিল—ঘুরিয়া ফিরিয়া এই কথাটাই আমার মনকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল, অথচ সাহস করিয়া তাহা জোলমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল জিজ্ঞাসা করিলে সে হয় তো এমন একটা কিছু করিয়া বসিবে, যাহা আরও বিস্ময়কর, হয়তো সে প্রজাপতি বা পাখী হইয়া উড়িয়া যাইবে, আর কখনও তাহাকে পাইব না, চিরকালের মতো সে আমার নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে। পাছে অশোভন কিছু করিয়া ফেলি এই ভয়ে তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছিলাম। তাহার সম্মুখে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার হৃদয় জয় করিবার আশা বহুক্ষণ পূর্বেই বিসর্জন দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে পাইবার আশা বিসর্জন দিই নাই, কিন্তু কি করিয়া যে তাহাকে পাইব তাহাও ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। বস্তুত আমি দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। জোলমাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম—

কিন্তু যদি জোলমা সত্যই চলিয়া যায় এই আশঙ্কায় পরমুহূর্তেই আবার ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। পরাজিত পশু-শক্তি অসহায়ভাবে দৈবী শক্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

জোলমা গেল না। সে যাহা করিল তাহাও অপ্রত্যাশিত। সে জানু পাতিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। আমার দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি জোর করিও না। জোর করিলে আমাকে কখনও পাইবে না। আমাকে আদেশ করিও না, আমাকে স্বেচ্ছায় চলিতে দাও, আমি স্বেচ্ছায় তোমারই পথে চলিব। আমার মা ওহালি মেঘবাহিনী, আকাশচারিণী। ওহালি-কন্যা কাহারও বন্দিনী হইবে না। বিদেশী, তোমাকে আমার ভাল লাগিয়াছে, তোমার সঙ্গিনী হইতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু বুহাকে আমি ত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি..."

জোলমা কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না। পরমুহূর্তে তরুশ্রেণীর মধ্যে হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইল। আমিও চমকাইয়া উঠিলাম এবং পরমুহূর্তেই একটা গাছে চড়িতে শুরু করিয়া দিলাম। জোলমাও আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। গাছের উপরে উঠিয়া দেখিলাম একটা প্রকান্ড বল্‌গা হরিণ তরুশ্রেণী ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। ছুটিয়া আসিয়া হরিণটা একটা প্রান্তরে পড়িল, কিন্তু বেশি দূর যাইতে পারিল না, মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আর উঠিল না, হাত পা টান করিয়া শুইয়া রহিল। আমি কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, তাহার পর গাছ হইতে নামিয়া গেলাম। দ্রুতবেগে কাছে গিয়া দেখিলাম হরিণটা মরিয়া গিয়াছে। উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে লাগিলাম মৃত্যুর কারণ কি। প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তাহার পর সহসা নজরে পড়িল। লোমের জন্য প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। পৃষ্ঠের একধারে পাশাপাশি দুইটি রক্তাক্ত বিন্দু রহিয়াছে। বুঝিলাম সাপে কামড়াইয়াছে। সর্পদষ্ট হরিণের মাংস খাওয়া বিপজ্জনক, তাই সেটাকে আর টানিয়া আনিলাম না, ফেলিয়া আসিলাম।

পুনরায় গাছে উঠিয়া কিন্তু জোলমাকে দেখিতে পাইলাম না। কোথায় গেল সে? পাশাপাশি বৃক্ষশ্রেণী ঘনসন্নিবদ্ধ, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। জোলমা কি অন্য বৃক্ষে চলিয়া গেল? চারিদিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সহসা সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, জোলমার সন্ধানে আমি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এক বৃক্ষ হইতে আর এক বৃক্ষ তাহার পর আর এক বৃক্ষ, ক্রমাগত বৃক্ষের পর বৃক্ষ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। মহীরুহ-শ্রেণী মহাশূন্যে শাখাপত্র-জটিল এক অদ্ভুত পথ সৃজন করিয়াছিল। তাহা কখনও নিবিড়, কখনও শ্যামল, কখনও পুষ্পাকীর্ণ, কখনও আকাশ-চুম্বী, কখনও ভূমি-মুখী, কখনও আলোকোদ্ভাসিত, কখনও অন্ধকারময়। এই পথে আত্মহারা হইয়া আমি জোলমাকে খুঁজিতেছিলাম। মনে হইতেছিল এই পথ যেন আমার মানসিক

অবস্থারই প্রতিচ্ছবি! কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই। কখনও গাছের শাখায় ঝুলিয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও আরোহণ করিয়া, কখনও অবরোহণ করিয়া আরও অনেকক্ষণ হয় তো চলিতাম কিন্তু বাধ্য হইয়া আমাকে অবশেষে থামিয়া যাইতে হইল। কারণ গাছ আর ছিল না। বৃক্ষশ্রেণীর শেষ বৃক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। এতক্ষণ জিকাটু পাহাড়ের কথাও মনে ছিল না, এইবার দেখিলাম নিজের অজ্ঞাতসারেই জিকাটু পাহাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখেই প্রান্তর এবং প্রান্তরের অপর পারেই জিকাটু পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বিস্ফারিত চক্ষে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। একটা নিষ্করুণ রুক্ষতা যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে শ্যামলতার কোন চিহ্ন নাই। পাহাড়ের গায়ে শ্যামলতার কোন চিহ্ন না থাকিলেও তাহার ঠিক পাশেই যে জলাশয়টা দেখিতে পাইলাম তাহা শৈবালাচ্ছন্ন। তাহার চারিদিকে বহুবিধ আগাছাও জন্মিয়াছে। তখন জলাশয় কেহ খনন করিত না, বুঝিলাম পাহাড়ের কোন স্থানে উৎস বা ঝরনা আছে। ইহাও মনে হইল নিশ্চয়ই তাহা ক্ষীণধারা, তাহা না হইলে নদী হইয়া বহিয়া যাইত। জোলমা কোথায় গেল? গাছ হইতে নামিয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল না কি! পাহাড়টার চতুর্দিক আবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার আকুল দৃষ্টি সেই নিষ্ঠুর প্রস্তরস্তূপের প্রতি অংশে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। জোলমাকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু একটা জিনিস আবিষ্কার করিলাম। পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ জলাশয়টার দিকে বেশ বড় একটা গুহা আছে। পাহাড়ের খানিকটা অংশ বারান্দার মতো বাহির হইয়া আসিয়াছে, ঠিক তাহারই সংলগ্ন গুহাটি। ঠিক মনে হইতেছে গুহা-দ্বারের সম্মুখেই কে যেন একটি বারান্দা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। বাস করিবার মতো গুহা সন্দেহ নাই। পরমুহূর্তেই কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে গুহার বাসোপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিল। গুহার কিছু উপরে বিশাল একটা পাথর রহিয়াছে। মনে হইতেছে পাহাড়ের উপর হইতে বিরাট একটা মুণ্ড যেন হুমড়ি খাইয়া গুহাটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। মাথার উপর ওই বিরাট পাথরটা লইয়া বাস করা মোটেই নিরাপদ নয়। মাথার উপর যদি পড়িয়া যায় নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে। হইতে পারে পাথরটা পাহাড়েরই একটা অংশ, কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। কিন্তু ওটা যদি আলাদা পাথর হয়, তাহা হইলে খুবই বিপজ্জনক। তবু ওই গুহাটাকে কেন্দ্র করিয়াই মন স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। জোলমা কি ওখানে আসিয়া বাস করিতে চাহিবে? সে তো বলিল বৃহাকে সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না। তবে? ...সহসা খট্ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকইয়া উঠিলাম। যেন চুরি করিয়া কি একটা অপরাধ করিতেছিলাম, শব্দটা আমাকে সতর্ক করিয়া দিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল জোলমাই কি কোথাও লুকাইয়া আছে? আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য সে-ই

কি শব্দ করিল? জলাশয়টার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শিহরিয়া উঠিলাম। বিরাট এক কৃষ্ণসর্প ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরমুহূর্তেই সে ছোবল মারিল, আবার ফট্ করিয়া শব্দ হইল। আর তাহাকে দেখা গেল না।

সমস্ত ব্যাপারটা এইবার যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। বাল্যকালে আমাদের দলপতি আবারাবার মুখে শঙ্খচূড় সাপের গল্প শুনিয়াছিলাম। শঙ্খচূড় সাপ নির্জন অরণ্যে বাস করে। শঙ্খচূড় যেখানে থাকে সেখানে অন্য কোনও জন্তু থাকিতে পারে না, এমন কি সাপ পর্যন্ত নয়। ইহাদের দংশন সাংঘাতিক, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। জলের ধারে ধারে ঘুরিয়া ইহারা শামুক আহার করে। ইহাদের ছোবলের আঘাতে শামুকের খোলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের ফণা হাতুড়ির মতো, যেখানে আঘাত করে, সেখানটার আর কিছু থাকে না। ইহাদের দৃষ্টিপথে পড়িলে আর রক্ষা নাই। ইহারা তীব্রবেগে ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটিয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে। ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী সকলেই শঙ্খচূড়ের ভয়ে ভীত।

শ্যেন সম্প্রদায়ের ভয়ের কারণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। টাহার কথা মনে পড়িল, "নাগদের দলপতি প্রেত হইয়া জিকাটু পাহাড়ের গুহায় বসিয়া আছে। শ্যেনবংশীয় কেহ গেলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কোন পশুকে সে নিজের কাছে ঘেঁষিতে দেয় না..."

সত্যই কি ওই শঙ্খচূড় সাপটা নাগ-দলপতির প্রেতমূর্তি? না, ওটা সাধারণ সাপ মাত্র? প্রেতমূর্তি যদি হয় পূজা করিলে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইবে। দোম্বির নিকট প্রেতপূজার পদ্ধতি কিছু শিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার জন্য দুইটি কৃষ্ণ কপোত, একটি শ্বেত প্রজাপতি, তিনটি রক্তবর্ণ ফুল এবং একটি বহুরূপী গিরগিটি চাই। এইগুলিকে একসঙ্গে গাঁথিয়া একটি জীবন্ত মৃগের গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ছাড়িয়া দিবামাত্র মৃগ যদি উত্তর দিকে ছুটিতে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রেত প্রসন্ন হইয়াছে। যদি অন্যদিকে ছোটে তাহা হইলে সেই মৃগকে শিকার করিয়া তাহার মাংসের সহিত কপোত, প্রজাপতি, ফুল ও গিরগিটি মিশাইয়া উত্তর দিকে মুখ করিয়া প্রেতের উদ্দেশ্যে উপচার দিতে হইবে। বেশ জটিল পদ্ধতি। সহসা সব উপকরণ সংগ্রহ করাও মুশকিল।

...অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আবার ফট্ করিয়া শব্দ হইল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম শঙ্খচূড় আবার ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এবার আরও খানিকটা কাছে আসিয়াছে। তাহার হিংস্র চক্ষু এবং লকলকায়িত জিহ্বা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম।

সহসা আমার মনের মধ্যে যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। সংস্কারকে পরাভূত করিয়া সহজ বুদ্ধি সহসা প্রাধান্য লাভ করিল। মনের ভিতর কে যেন বলিল, 'প্রেত হউক, সাপ হউক, ও তোমার শত্রু, উহাকে নিপাত করিতে পারিলে জোলমাকে পাইবে, আঘাত কর, তোমার কাছে তীর-ধনুক আছে,

চেষ্টা করিয়া দেখ না, ঠিক যদি মারিতে পার, এখনই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।’

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস হারাই নাই। পরে বহুকাল পর্যন্ত এই বিশ্বাস আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তোমাদের অনেকের জীবনকে এখনও হয় তো নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কিন্তু তখন—ঠিক সেই মুহূর্তে—আমার সহজ বুদ্ধি আমাকে যুক্তিযুক্ত কাজ করিতে প্রবুদ্ধ করিল। ওই সাপটা যদি প্রতিশোধ-কামী নাগ-দলপতির প্রেত হয়, তাহা হইলে সামান্য একটা প্রস্তরনির্মিত তীর যে উহার কিছুই করিতে পারিবে না, বরং অচিন্ত্যপূর্ব ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিয়া যে আমার সর্বনাশ হইয়া যাইতে পারে, একথা আমি সেই মুহূর্তে ভুলিয়া গেলাম। যে বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ যুগে যুগে অনিশ্চিত পথে পা বাড়াইয়াছে, সত্য সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে, চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া নব নব প্রথার প্রবর্তন করিয়াছে, সেই বুদ্ধি ও যুক্তির বশে আমি প্রেতভয় তুচ্ছ করিয়া শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

শঙ্খচূড়ের ফণা লক্ষ্য করিয়া শরটা ছুঁড়িয়া দিলাম। কিন্তু ঠিক লাগিল না। সামান্য একটু আঘাত করিয়া তীর দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। ইহার ফল হইল অতি ভয়ানক। শঙ্খচূড় যেন ক্ষেপিয়া গেল। প্রথমে তীরটার সঙ্গে সঙ্গে সে কিছুদূরে ছুটিয়া গেল, তাহার পর সমস্ত জলাশয়টা মন্থন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার তর্জন-গর্জনে প্রস্তরময় জিকাটু পাহাড়ও শিহরিয়া উঠিল। আমার কিন্তু আর ভয় করিতেছিল না। আমি একাগ্রচিত্তে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম, কখন দ্বিতীয় তীরটি ছুঁড়িব। শঙ্খচূড় আর একবার যদি ফণা তুলিয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিব। ধনুতে শর-যোজনা করিয়া রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জলাশয় আলোড়নের ফলে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মশা উড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, জলাশয় হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। মশকের দল ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রমশ আমার দিকে উড়িয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের কামড়ে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলাম। ধনুতে বা তীরে নিবিষ্টচিত্ত থাকা আর সম্ভবপর হইল না। দেখিলাম, যেখানে বসিয়া আছি, সেখানে বসিয়া শরসন্ধান করা সহজ হইলেও মনঃসংযোগ করা কঠিন। অবিলম্বে পত্রবহুল একটা ডালের উপর উঠিয়া বসিলাম।

একটু পরেই শঙ্খচূড় আবার ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তীর ছুঁড়িলাম। এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। এবার তীরটা শঙ্খচূড়ের কাছ পর্যন্তও পৌঁছাইল না। আমি যে গাছে বসিয়াছিলাম তাহারই সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় তাহা মাটিতে পড়িয়া গেল। এইবারেই সত্যকার বিপদে পড়িলাম। কারণ শঙ্খচূড় সবেগে এবং সগর্জনে তীরটার দিকেই কেবল ছুটিয়া আসিল না আমি যে গাছে বসিয়াছিলাম সেই গাছটার দিকেও ছুটিয়া আসিল। তীরটা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা এবার তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই। শঙ্খ-

চূড় গাছে উঠিতে পারে আবারাবার মুখে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং প্রমাদ গণিতে হইল। স্বয়ং মৃত্যু তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যদি দৌড়াই তাহাতেও নিস্তার পাইব না। অনতিবিলম্বেই শঙ্খচূড় আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। কিছুক্ষণ আগে বলগা হরিণটার যে পরিণাম হইয়াছে আমারও তাহাই হইবে।

আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া ঘনপত্রপল্লবে আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। একটু পরেই অনুভব করিলাম শঙ্খচূড় গাছ বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। তাহার রুষ্ট তর্জন শুনা যাইতে লাগিল। আমি তখন রুদ্ধনিশ্বাসে সন্তর্পণে গাছের একটা ডাল ধরিয়া পাশের গাছে গিয়া আশ্রয় লইলাম। যদিও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম তবু কিন্তু একটু শব্দ হইল। পাশের গাছে গিয়া বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম শঙ্খচূড় আমার সন্ধানে শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি যে বৃক্ষান্তরে আছি সেটা সে তখনও টের পায় নাই। সহসা সে আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িল, আমি আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলাম না, প্রস্তর কুঠারটা সজোরে তাহার শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলাম। এবার কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই, কুঠারটা সমেত শঙ্খচূড় ছিটকাইয়া নীচে পড়িয়া গেল। সভয়ে লক্ষ্য করিলাম পড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কাবু হয় নাই, সরোষে কুঠার-ফলকে ছোবল দিতেছে, মুখ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে, তবু ফণা তুলিতেছে। আবার সে গাছের দিকে ছুটিয়া আসিল, আমি যে গাছটায় ছিলাম সেই গাছে চড়িতে শুরু করিল, আততায়ী কোথায় বসিয়া আছে তাহা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে! আমি ত্বরিত-গতিতে তৃতীয় বৃক্ষে গিয়া বসিলাম। আমার কাছে যে দুইটি তীর ছিল, সে দুটি পূর্বেই ব্যবহার করিয়াছি, কুঠারটি হস্তচ্যুত হইয়াছে, প্রস্তর ছুরিকাটিও জোলমাকে দিয়াছিলাম, আমার কাছে সুতরাং ধনুকটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মাত্র ধনুক লইয়া কি করিয়া ওই বিষধরের সঙ্গে যুঝিব? মটাৎ করিয়া গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া লইলাম। যদিও একটা অস্ত্র হস্তগত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিপদেও পড়িয়া গেলাম। শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সাপ ফণা তুলিল এবং আমাকে দেখিতে পাইল। তাহার হিংস্র চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া আমাকে যেন আঘাত করিল। দেখিলাম আর রক্ষা নাই, কাছে আসিয়া পড়িল বলিয়া! আর একটা শাখা পার হইলেই আমাকে দংশন করিবে। দুই হাতে গাছের ডালটা তুলিয়া সজোরে তাহার ফণায় আঘাত করিলাম। আঘাতের চোটে আবার সে নীচে পড়িয়া গেল, কিন্তু এবারেও দমিল না, আবার দেখিলাম গাছের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ডালটা ছুঁড়িয়া মারিলাম, তবু আসিতেছে। আর একটা ডাল ভাঙিলাম, আবার ছুঁড়িলাম। আর একটা ভাঙিলাম...উন্মাদের মতো কতক্ষণ ধরিয়া যে কত ডাল ভাঙিয়াছি তাহা খেয়াল ছিল না। প্রতিবার আঘাত করিয়া যদিও তাহার গতি ব্যাহত করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি

নাই, হত্যাও করিতে পারি নাই, নিষ্ঠুর নিয়তির মতো আমাকে গ্রাস করিবার জন্য বারম্বার সে গাছের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। আমার আশেপাশে ভাঙিবার মতো আর ডাল ছিল না, আতঙ্কে শ্রান্তিতে আমার হাতও অবশ হইয়া আসিতেছিল, বিষাক্ত মৃত্যুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে তবু প্রস্তুত ছিলাম না। ঠিক করিয়াছিলাম অবশেষে সাপটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিব। যদি মরিতেই হয় একসঙ্গেই মরিব।

...এমন সময় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। কেকারবে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিলাম ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর উড়িয়া আসিতেছে। জোলমাও কেকারব করিতে করিতে একটা গাছে আসিয়া উঠিল।

"জোলমা! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"আমার ময়ূরদের ডাকিতে গিয়াছিলাম। তুমি যখন বল্গা হরিণের দিকে চলিয়া গেলে তখন আমি বিরাট একটা সাপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। মনে হইলে এই সাপের জন্যই বোধ হয় জিকাটু পাহাড় ভয়ানক। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ময়ূরেরা সাপের শত্রু, তাই ময়ূরদের ডাকিয়া আনিলাম। তুমি কি সাপটা দেখিয়াছ?"

"সাপটার সঙ্গেই এতক্ষণ যুদ্ধ করিতেছিলাম। ওই যে—"

দেখিলাম সাপটা ময়ূরদের সাড়া পাইয়া বৃক্ষশ্রেণী হইতে অনেক দূরে সরিয়া ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ফণা উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যদি এভাবে সরিয়া না যাইত তাহা হইলে ময়ূরের দল তাহাকে হয়তো দেখিতেই পাইত না। এবার শঙ্খচূড়কে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে হইল। ময়ূরের দল ছোঁ মারিতে মারিতে তাহাকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। শঙ্খচূড় ফণা তুলিয়া, মাঝে মাঝে শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া, ময়ূরদের কামড়াইবার চেষ্ট করিতেছে, ময়ূরের দলও তারস্বরে চীৎকার করিয়া তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়া পরমুহূর্তেই আবার উদ্যত-নখচঞ্চু হইয়া বিদ্যুদ্বেগে নামিয়া আসিতেছে এবং তাহাকে আঘাত করিতেছে। সহসা শঙ্খচূড় পাহাড় লক্ষ্য করিয়া অতি দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিয়া সেই গুহাটার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ময়ূরের দল চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেকারবে চতুর্দিক পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। আর তাহার নাগাল পাইল না।

আমরা উভয়েই নির্বাক হইয়া এতক্ষণ এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। শঙ্খ-চূড়কে গুহার মধ্যে অন্তর্ধান করিতে দেখিয়া আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। জোলমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে তন্ময় হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। মুখ তুলিয়া দেখি পালক মেঘে আকাশ পরিপূর্ণ।

"কি দেখিতেছ?"

"ছবি। ওহালির ছবি। ভাল করিয়া দেখ, একটু পরে আর থাকিবে না। আশ্চর্য, নয়? ওহালি ছবির পর ছবি আঁকিতেছে, কিন্তু দুইটা ছবি

কখনও একরকম হয় না। একটা ছবিই ধীরে ধীরে আর একটা ছবি হইয়া যায়, তাহার পর আর একটা, তাহার পর আর থাকে না!"

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার নীল চক্ষুর দৃষ্টি আকাশের বিরাট নীলে নিমগ্ন হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল তাহার দেহটাই যেন আমার পাশে বসিয়া আছে, মন নাই। মন অসীম শূন্যে পক্ষবিস্তার করিয়াছে, শঙ্খচূড়, ময়ূর, জিকাটু পাহাড় ছাড়িয়া নামহীন এক সুদূরলোকে কিসের যেন সন্ধান করিতেছে। আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। সত্যই মনে হইতেছিল জোলমা বুঝি এ জগতের নয়। আমি কিন্তু বেশিক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না, শঙ্খচূড় এখনও জীবিত আছে, এই ধারণাটা সাপের মতোই আমার মনে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত আমার কর্তব্য অসমাপ্ত থাকিবে এই ধরণের একটা বোধ আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল। পালক মেঘের মনোরম বিন্যাস আমাকে মুগ্ধ করিলেও তাহা লইয়া আর সময়ক্ষেপ করা অনুচিত মনে হইতেছিল। এখনই বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া গুহার দিকে যাওয়া উচিত, এ কথা বারবার মনে হইলেও কেন জানি না মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, কথা বলিলেই যেন একটা পবিত্র কিছু নষ্ট হইয়া যাইবে। সেই অসভ্য যুগেও বিরাটের মহত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করিত। যাহা অসাধারণ, যাহা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হইতে বিভিন্ন তাহাকে আমরা শুধু ভয় নয়, শ্রদ্ধাও করিতাম। জোলমার যতই পরিচয় পাইতেছিলাম ততই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হইতেছিল। মনে হইতেছিল সে দৈবীশক্তির অধিকারিণী।

জোলমা সহসা বলিল, "ওহালি আকাশে আজ এমন সুন্দর ছবি কেন আঁকিয়াছে জান? লাফাই পাহাড়ে বুহা আজ বল্‌গা হরিণদের পূজা করিবে।"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে, চল।"

"আমি কিন্তু ঐ সাপটাকে শেষ না কয়িয়া ফিরিব না।"

"কি করিয়া শেষ করিবে?"

"দেখ না।"

আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, জোলমাও আমার অনুসরণ করিতেছে। প্রান্তরে নামিয়া আমি দ্রুতবেগে জিকাটু পাহাড়ের দিকে চলিতে লাগিলাম। শঙ্খচূড়কে আর দেখিতে না পাইয়া ময়ূরদল অনেকটা শান্ত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের কেকাধ্বনি যদিও জিকাটু পাহাড়ের ভয়ঙ্কর শান্তিকে আরো ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু তাহারা আর উড়িয়া বেড়াইতেছিল না। বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষে শীর্ষে বসিয়া তাহারা সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

আমাকে প্রান্তর মধ্যে দেখিয়া আবার তাহারা সমবেতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু জোলমা পিছনে ছিল, সে আবার গ্রীবালগ্ন চামড়ার থলি হইতে খাবার বাহির করিয়া তাহাদের দিতে লাগিল। ময়ূরের দল তাহাকে ঘিরিয়া আহারে মাতিল। আমি একবার ফিরিয়া এই দৃশ্য দেখিলাম, তাহার পর আবার চলিতে লাগিলাম। গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম। অন্তরের অন্তঃস্থলে আমি কেমন যেন একটা লজ্জা বোধ করিতেছিলাম। জোলমার ময়ূর-বাহিনীই যে আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, আমার নিজের শক্তিবলে আমি যে কিছুই করিতে পারি নাই, এ কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছিলাম না বলিয়া মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে জোলমার নিকট বীরত্ব আস্ফালন করিয়া তাহাকে 'তাক' লাগাইয়া দিব বলিয়া টানিয়া আনিয়াছিলাম। সে বীরত্বের কোন মর্যাদাই রক্ষা করিতে না পারাতে আমার পৌরুষ আমার নিজের কাছেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। যেমন করিয়া হোক তাহাকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নিজের শক্তিতে জোলমার কোনও সাহায্য না লইয়া ওই শঙ্খচূড়কে বধ করিতেই হইবে। তাহা করিতে গিয়া যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাও শ্রেয়। আমি যে নির্ভীক বীর একথা অন্তত জোলমা বুঝুক। নারীর চক্ষে নিজেকে এতদিন বড় প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছি তাহা নিতান্তই দৈহিক। পুরুষ পশু বা পুরুষ পাখী, সহচরীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য যে প্রকার দৈহিক আস্ফালন করে আমিও এতকাল তাহাই করিয়া আসিয়াছি। প্রেয়সীর চক্ষে নিজের মানসিক উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিবার জন্য সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়ার প্রেরণা আমার জীবনে এই প্রথম। একটা অদ্ভুত উন্মাদনায়, একটা অপূর্ব আনন্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি ছুটিতেছিলাম, আমার ভয় করিতেছিল না। মনে অন্য কোনও অনুভূতিও ছিল না। একমাত্র জোলমার প্রভাবেই আমার সমস্ত চিত্ত পরিপ্লুত হইয়াছিল। যতই মনে হইতেছিল সে আমার নাগালের বাহিরে, ততই তাহাকে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতে-ছিলাম, মনে হইতেছিল তাহার কাছে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করিতে পারিলে সে আমাকে বরণ করিবে। ইহাই তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায়।

পাহাড়ের অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছিলাম। আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, শ্বাসকষ্ট হইতেছিল, তবু থামিতে পারিতেছিলাম না। জোলমা আমার অনুসরণ করিতেছিল কি-না জানি না। তাহাকে আর দেখা যাইতেছিল না। বাঁকা পথ ধরিয়া উপরে উঠিতেছিলাম, প্রান্তরটা দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়াছিল, জোলমা আসুক ইহা আমি চাহিতেও ছিলাম না। এই দুঃসাধ্য সাধন আমি একাই করিব। আমার লক্ষ্য ছিল গুহার ঊর্ধ্বে স্থাপিত সেই বড় গোল পাথরটা, যেটা দেখিয়া মনে হইয়াছিল কেহ যেন উপর হইতে হুমড়ি খাইয়া গুহাটাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর একটু উঠিয়াই পাথরটা দেখিতে পাইলাম। দেখিতে পাইবামাত্র আমার দেহে যেন নববল

সঞ্চারিত হইল। ওই পাথরটাই আমার একমাত্র আশা। ওটাকে যদি উপর হইতে ঠেলিয়া দিতে পারি গুহার মুখটা বন্ধ হইয়া যাইবে। বন্দী শঙ্খচূড়কে হত্যা করা তখন কঠিন হইবে না। গুহার যদি আর একটা মুখ থাকে, শঙ্খচূড় যদি সেদিক দিয়া ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া গিয়া থাকে, এ সকল সম্ভাবনা যে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু এসব কথা আমি ভাবিতেও চাহিতেছিলাম না। আশা করিতেছিলাম ময়ূরের ভয়ে ভীত শঙ্খচূড় এখন কিছুক্ষণ গুহা হইতে বাহির হইবে না, পাহাড়ের গায়ে দ্বিতীয় কোনও ছিদ্রও হয়তো নাই। সুতরাং আমার সমস্ত ভরসা ও স্বপ্ন এখন নিবদ্ধ হইয়াছিল ওই পাথরটার উপর। পাথরটার কাছে আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। আনন্দে উত্তেজনায় আমার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। পাথরটা সম্পূর্ণ আলাদা, পাহাড়ের অংশবিশেষ নহে। পাহাড়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হইয়াও নাই। মাত্র এক জায়গায় সামান্য একটু সংযোগ আছে। ঠেলিয়া দিলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে। প্রাণপণে ঠেলিলাম, পাথর কিন্তু নড়িল না। আবার ঠেলিলাম, কিন্তু না, কোনও ফল হইল না। আবার ঠেলিলাম...

...অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বহুবার ঠেলিয়াও পাথরকে একচুল নড়াইতে পারি নাই। পাথরটাকে ধরিয়াই বসিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিলাম। প্রখর রৌদ্রে সমস্ত পাহাড়টা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, মনে হইতেছিল মৃত্যুর নবতর একটা রুদ্র রূপ যেন ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। জিকাটু নূতন অস্ত্র বাহির করিয়াছে।

সহসা জোলমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, "বিদেশী তুমি কোথায়, সাড়া দাও।"

মনে হইল শব্দটা যেন আকাশ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম দক্ষিণ দিকে পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত শুষ্কপত্র একটা গাছের উপর হইতে জোলমা আমাকে ডাকিতেছে। সাড়া দিলাম। সাড়া পাইয়াই সে গাছ হইতে নামিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। দেখিলাম আমার কুঠারখানা সে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

"ওটা ফেলিয়া দাও। সাপের বিষে ওটা মাখা। শঙ্খচূড় ওটাতে বহুবার ছোবল দিয়াছে।"

"ধুইয়া আনিয়াছি। বাড়ি চল, এখানে কি করিতেছ? আমাকে এতক্ষণ দেখিতে না পাইয়া বুহা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছে। তাছাড়া আজ লাফাই পাহাড়ে উৎসব, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। তুমিও চল।"

"আমি পাথরটাকে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিতে চাই। গুহামুখ বন্ধ হইলে শঙ্খচূড় মরিবে। শঙ্খচূড়কে না মারিয়া আমি যাইব না। তুমি চলিয়া যাইতে পার। আমি কাজ শেষ না করিয়া ফিরিব না।"

জোলমা ঘুরিয়া ফিরিয়া পাথরটাকে দেখিল। একবার ঠেলিবারও চেষ্টা করিল।

"আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, অত সহজে হইবে না।" জোলমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "চল তাহা হইলে ওই গাছটা হইতে গোটা দুই মোটা ডাল কাটিয়া আনি। পাথরের নীচের দিকে ডাল ঢুকাইয়া চাড় দিলে হয়ত কাজ হইবে।"

তাহাই করিলাম। প্রায় সমস্ত গাছটাই কাটিয়া টানিতে টানিতে সেটা উপরে লইয়া আসিলাম। বেশি বড় গাছ নয়, সহজেই কাটা গেল। যদিও খুব ক্লান্ত ছিলাম কিন্তু জোলমার সান্নিধ্যে দেহে নূতন বল সঞ্চারিত হইল। জীবনে বহুবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নূতন প্রেরণা ক্লান্ত দেহকেও উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, দেহের অভ্যন্তরে সহসা নূতন শক্তির উৎস খুলিয়া যায়। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছিল, জিকাটু পর্বতের নিরুদ্ধ উষ্মা প্রকট হইতে প্রকটতর হইতেছিল, আমি ত্বরিতহস্তে কুঠার চালাইয়া গাছটাকে পরিষ্কার করিতেছিলাম, জোলমা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, অতিশয় নির্বিকারভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। প্রখর রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া গাছের ফুল যেমন অতিশয় স্বাভাবিক ঔদাসীন্যভরে গাছের শাখায় ফুটিয়া থাকে, জোলমাও যেন তেমনিভাবে বসিয়া ছিল। ওই বিষধর সর্প, দ্বিপ্রহরের রৌদ্র বা আমার পাথর ফেলিবার আয়েজন কিছুই যেন তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতেছিল না। মাঝে মাঝে আকাশের পালক মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল মাত্র। মনে হইতেছিল আকাশে সে যেন কোনও পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছে।

...গাছের কাণ্ডটার এক প্রান্ত সূচালো করিয়া পাথরটার তলায় ঢুকাইবার পূর্বে পাথরের যে অংশটা পাহাড়ের গায়ে লাগিয়াছিল সেই অংশটার চারিদিক প্রস্তরছুরিকা ও কুঠারের সাহায্যে বেশ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিলাম। পাথরের তলায় গাছের ডালটা বেশ ভালভাবে ঢুকিয়াছিল। সজোরে চাড় দিলাম, কিন্তু পাথরটা নড়িল না। আর একবার দিলাম, তবু কিছু হইল না। প্রাণপণ শক্তিতে ডালটা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম, পাথর নড়িল না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমার পৌরুষের অহঙ্কারকে যেন বারাবার পর্যুদস্ত করিয়া দিতে লাগিল। সেদিন সেই নিদাঘতপ্ত দ্বিপ্রহরে রুক্ষ জিকাটু পাহাড়ের শীর্ষে মর্মান্তিকরূপে পুনরায় অনুভব করিতে হইল যে আমার একক প্রয়াস নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি, মানব-মানবীর সম্মিলিত মনীষাই যে মনুষ্য জাতিকে জয়-যাত্রার পথে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইঙ্গিত অসভ্য যুগেও আমরা বারম্বার পাইয়াছি। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারেই আমাদের একক অহঙ্কার বারম্বার পরাজিত হইয়াছে। সংকল্প করিয়াছিলাম জোলমার সাহায্য লইব না, কিন্তু সে সংকল্প টিকিল না। জোলমা নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিল।

"দুইজনে মিলিয়া চাড় দিলে হয় তো পাথরটা নড়িবে। সাহায্য করিব?"

"বেশ, এস।"

জোলমা এবং আমি দুইজনে মিলিয়া চাড় দিতে লাগিলাম। একটু পরেই পাথরটা স্থানচ্যুত হইল এবং সশব্দে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেল। যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। গুহার মুখটা বন্ধ হইয়া গেল। আপাত-দৃষ্টিতে শঙ্খচূড়ের নির্গমনের আর কোন পথ রহিল না। পাথরটা সরিয়া যাওয়াতে কিন্তু আর একটা গর্ত বাহির হইয়া পড়িল। উঁকি মারিয়া দেখিলাম। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। গর্তের মুখে কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম যদি কিছু শোনা যায়। যাহা শোনা গেল তাহাতে কিন্তু শিহরিয়া উঠিলাম। শঙ্খচূড়ের তর্জন-গর্জন শোনা যাইতেছে। নীচের গুহার সহিত তাহা হইলে ইহার যোগ আছে! কাছেই একটা ছোট গোল পাথর ছিল, সেটা গড়াইয়া আনিয়া গর্তের মুখটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিলাম। জোলমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

"শঙ্খচূড়ের তর্জন শোনা যাইতেছে। হয় তো এই গর্ত দিয়া ও আবার বাহির হইয়া আসিবে। এক কাজ করা যাক্—"

"কি?"

"তুমি গাছের শুষ্কপত্র ও ডালগুলি এদিকে লইয়া এস। ওগুলিতে আগুন লাগাইয়া গুহার ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া যাক। শঙ্খচূড় পুড়িয়া মরুক—"

আমাদের সকলের সঙ্গেই তখন চকমকি পাথর থাকিত। পাথরে পাথরে ঘষিয়া আমরা আগুন জ্বালাইতে পারিতাম। আমাদের দুই-জনের কাছেই চকমকি পাথর ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুষ্ক ডাল-পালাতে আগুন ধরিয়া উঠিল। গর্তের মুখ হইতে পাথরটি সরাইয়া একে একে সেগুলি গুহার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর পাথর দিয়া গর্তের মুখটি যখন বন্ধ করিতেছি তখন জোলমা সহসা বলিল—"এই গুহায় নিশ্চয় আগে মানুষ বাস করিত। তাহারাই বোধ হয় ওই বড় পাথরটা দিয়া এই ছিদ্রটা বন্ধ করিয়াছিল। নাগ-বংশীয়দের সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহা হয় তো মিথ্যা নয়। হয় তো এই শঙ্খচূড় তাহাদেরই কাহারও রূপান্তরিত মূর্তি। তাহাকে এমনভাবে দগ্ধ করাটা কি ভাল হইল? ও কি বল্‌গা হরিণদের মতো স্বেচ্ছায় আমাদের সকলের জন্য আত্মবিসর্জন করিল? চল, বৃহাকে সব কথা খুলিয়া বলি। আমার কেমন যেন ভয় করিতেছে।"

আমি জোলমার সব কথা ভালো বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জোলমা কিন্তু আর কিছু বলিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ইচ্ছা করিলেও সে যেন আর থামিতে পারিবে না। দেখিতে দেখিতে সে অনেক দূর নামিয়া

গেল। আমিও নামিতে লাগিলাম। প্রান্তরে নামিয়া দেখিলাম জোলমা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে।

"জোলমা—জোলমা—"

জোলমা ফিরিয়া চাহিল না, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষশ্রেণী পার হইয়া আমার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলাম, তাহার সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিবার সামর্থ্য আমার ছিল না, তবু যথাসম্ভব দ্রুতবেগেই তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। জিকাটু পর্বতের সীমা সেই বৃক্ষ-বীথিকা যখন পার হইয়া গেলাম তখনও জোলমাকে দেখিতে পাইলাম না। কোন্ দিকে যাইব? বৃহার আস্তানার দিকে যাওয়া নিরাপদ মনে হইল না। টাহা, গো, বিতং এবং জোলমার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা হইতে আমার প্রতি বৃহার মনোভাব যে কি তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। আমি জোলমার সহিত কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা করি ইহা বৃহার অভিপ্রেত নয়। আমাকে নিঃশেষ করিবার জন্যই সে আমাকে জিকাটু পাহাড়ে গুহা অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিল। এখানে থাকিতে হইলে বৃহার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। আমি বনের দিকেই অগ্রসর হইলাম। চলিতে চলিতে নানা কথা মনে হইতেছিল। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পর্বত-দেবতার যে নিগূঢ় আদেশ আমি শুনিয়াছিলাম তাহা অমান্য করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার সাহস আমার ছিল না। আমরা সে যুগে এইরূপ অদ্ভুত সংস্কারের দ্বারাই চালিত হইতাম। জোলমাকে দেখিবার পর হইতে বিশেষত তাহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, এ স্থান ত্যাগ করিবার বাসনাও ত্যাগ করিয়াছি। জোলমাকে লাভ করিবার আশা আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। শক্তিশালী বৃহার বিরুদ্ধ-মনোভাবকে অগ্রাহ্য করিয়াও আমাকে এখানে থাকিতে হইবে। জোলমার মনোভাব কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সে আমার সঙ্গিনী হইতে চায়; কিন্তু বৃহাকেও সে ছাড়িবে না বলিয়াছে। বৃহা যদি আমার সান্নিধ্য পছন্দ করিত, জোলমার প্রতি আমার এই মনোভাবকে সমর্থন করিত, তাহা হইলে কোনও গোল থাকিত না। কিন্তু বৃহা আমাকে বিনাশ করিতে চায়। আমি আর একটা ব্যাপারও ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বৃহা শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি, ইচ্ছা করিলেই সে আমাকে নিজের এলাকা হইতে দূর করিয়া দিতে পারে। প্রথম দিন যখন তাহার কাছে গিয়াছিলাম, কিম্বা যে মুহূর্তে সে জোলমার প্রতি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিল তখনই সে আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিল না কেন—তোমাকে এখানে থাকিতে দিব না, এখানে তোমার স্থান নাই। ইহা বলিলে আমাকে চলিয়া যাইতে হইত। স্পষ্টভাবে আমাকে চলিয়া যাইতে না বলিয়া আমাকে এভাবে জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইয়া বিষধর শঙ্খচূড়ের কবলে ফেলিবার কি প্রয়োজন ছিল? তখনও বুঝি নাই যে, বৃহা সহজ-সরল বন্য প্রকৃতির এক ধাপ ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিল। সেই নিয়ম করিয়াছে যে গো যদি কোনও আগন্তুকের আগমনে কোনও দুর্লক্ষণ দেখিতে না পায় তাহা হইলে সে তাহাকে আলিঙ্গন

করিয়া অভ্যর্থনা করিবে। আগন্তুক যদি শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করিতে চায় বুহা তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিবে। যে নিয়ম নিজেই সে প্রবর্তন করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার পক্ষে অশোভন। তাই সে কৌশল করিয়া বাঁকাপথে আমাকে সরাইতে চাহিয়াছিল। প্রথমে কিন্তু এত কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। কিম্বা জানি না, হয় তো সে আমাকে পরীক্ষা করিতেছিল।

বনে আমার সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরের সমীপবর্তী হইয়া দেখিলাম পলিতকেশা গো বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে ছুটিয়া আসিল।

"তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"জিকাটু পাহাড়ে।"

"জিকাটু পাহাড়ে? সর্বনাশ, সেখানে তোমাকে যাইতে মানা করিয়া গেলাম তবু গেলে কেন? সত্যই সেখানে গিয়াছিলে? সেখানে গেলে তো কেহ ফেরে না।"

আমি স্মিতমুখে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর বলিলাম, "কিন্তু আমি ফিরিয়াছি। যে বিরাট শঙ্খচূড় নাগ এ অঞ্চলে সকলের মনে ত্রাস সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়াও আসিয়াছি।"

"বল কি! সেই সাংঘাতিক নাগরূপী প্রেতকে তুমি বধ করিয়াছ! এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! বল, বল সব খুলিয়া বল। একথা আমি যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। বিদেশী, তুমি মানুষ না ছদ্মবেশী দেবতা—"

গো সহসা আমার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার দুই জানু জড়াইয়া ধরিল। অনুভব করিলাম তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, ভয়ে না আনন্দে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া তুলিয়া ধরিলাম। তাহার পর হাসিয়া বলিলাম—

"আমি তোমাদেরই মতো মানুষ। যাহা করিয়াছি, তাহা তোমাদেরই জোলমার সাহায্যে করিয়াছি। জোলমা না থাকিলে একা আমি পারিতাম না।"

"জোলমা তোমার সঙ্গে ছিল?"

"হাঁ।"

গো-কে তখন আনুপূর্বিক সমস্ত কথা সবিস্তারে বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া গো প্রগল্‌ভা বালিকার মতো হাসিয়া উঠিল, তাহার পর হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, বলিতেও লাগিল, "এইবার বন-ময়ূরীর মন ফিরিয়াছে, এইবার সে ময়ূরের পেখমের শোভা দেখিয়াছে, এইবার সে নীড় বাঁধিবে।" তাহার পর সহসা আবার থামিয়া গেল, আমার সম্মুখে বসিয়া আমার চিবুক ধরিয়া বলিল, "কিছু খাইয়াছ কি? মুখটি যে শুকাইয়া গিয়াছে।"

"না, এখনও কিছু খাই নাই।"

"চল, তোমার জন্য একটা নেউল মারিয়া রাখিয়াছি। আর একটা চমৎকার খাবারও তোমাকে খাওয়াইব। চল—"

হাত ধরিয়া গো আমাকে নিবিড়তর অরণ্যে লইয়া গেল। একটা গাছের তলায় দেখিলাম, মাটি খোঁড়া রহিয়াছে, কেহ যেন গর্ত করিয়া আবার গর্তটা বুজাইয়া দিয়াছে। গর্তের মাটি সরাইয়া গো মৃত নেউলটাকে বাহির করিল। তাহার পর নিজেই সে ত্বরিতহস্তে কিছু শুষ্কপত্র জড়ো করিয়া চকমকি পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইয়া ফেলিল।

"এটাকে ঝলসাইয়া তুমি ততক্ষণ খাও। আমি আসিতেছি।"

তাহাকে কিছু বলিবার পূর্বেই সে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমারও বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। আর কালবিলম্ব না করিয়া আমি আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। নেউলটিকে যখন প্রায় নিঃশেষ করিয়াছি, তখন গো ফিরিয়া আসিল, তাহার হাতে দেখিলাম, পাতায় মোড়া কি যেন রহিয়াছে।

"এগুলিকেও আগুনে একটু সেঁকিয়া লও চমৎকার লাগিবে।"

দেখিলাম, গো পাতায় মুড়িয়া প্রচুর পিপীলিকার ডিম লইয়া আসিয়াছে। বহুদিন পিপীলিকার ডিম খাই নাই, এতগুলি ডিম দেখিয়া রসনা লালায়িত হইয়া উঠিল। গো নিজেই সেগুলিকে আবার পাতা দিয়া মুড়িয়া লতা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিল এবং আগুনের উপর ধরিয়া সেঁকিতে লাগিল।

...আহার শেষ করিয়াছি, সহসা টাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

"জোলমা, জোলমা—"

গো তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হইয়াছে, একথা টাহাকে বলিও না। জোলমা যে তোমার সঙ্গে জিকাটু পাহাড়ে গিয়াছিল, একথা বলিবারও দরকার নাই। টাহা এখনই গিয়া সব কথা বৃহাকে বলিয়া দিবে। জোলমা নিজে গিয়া বৃহাকে কি বলে, তাহাই লক্ষ্য করা এখন দরকার। তুমি মুখ বুজিয়া থাক।"

গো চলিয়া গেল। আমিও উঠিয়া পড়িলাম এবং যেদিক হইতে টাহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া আবার তাহার ডাক শোনা গেল।

"জোলমা, জোলমা, কোথায় তুমি—"

আমি দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম। আমাকে দেখিতে পাইয়া টাহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিল।

"জোলমা কোথায়? জোলমাকে দেখিয়াছ?"

আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলাম, "জোলমার তো বৃহার কাছে থাকা উচিত।"

"জোলমা সকালে এই বনের দিকে আসিয়াছিল, আর ফেরে নাই। তাহাকে

দেখিতে না পাইয়া বুহা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। যত লাল রং ছিল, সব বাহির করিয়া ওহালির কাঠে মাখাইতেছে। পাগলের মতো মাখাইয়া চলিয়াছে। ওহালির কাঠ বিরাট একটা রক্তপিণ্ডের মতো দেখাইতেছে। আমি বড় ভয় পাইয়া গিয়াছি। জোলমা যদি এখনও না ফিরিয়া থাকে, সর্বনাশ হইয়া যাইবে। আজ লাফাই পাহাড়ে মহা-উৎসব, বহু হরিণ মারা পড়িয়াছে, কিন্তু বুহা যদি ক্ষেপিয়া যায়—"

টাহা আর কিছু বলিতে পারিল না, টাহার বিবর্ণ মুখ ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বাকিটা প্রকাশ করিল।

"তুমি কতক্ষণ জোলমাকে খুঁজিতেছ?"

"অনেকক্ষণ। সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি। কোথাও সে নাই!"

"এতক্ষণ হয় তো সে ফিরিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে গিয়া খোঁজ কর।"

আমার কথায় তাহার মনে যেন নূতন আলোকপাত হইল, আপন মনে মাথা নাড়িয়া সে বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিল বুঝিতে পারিলাম না।

"কি বলিতেছ?"

"কিছু নয়, তোমার কথাটা ভাবিয়া দেখিতেছি। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, হয় তো সে এতক্ষণ ফিরিয়া থাকিতেও পারে। ঠিক। আচ্ছা, তুমিই বা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাকেও তো দেখিতে পাই নাই। তুমি জিকাটু পাহাড়ে যাইবে বলিয়াছিলে—"

"জিকাটু পাহাড় হইতেই আসিতেছি।"

টাহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল।

"হাঁ। সেখানে একটা গুহাও দেখিয়া আসিয়াছি।"

"গুহা? আর কিছু দেখ নাই? সেখানে শুনিয়াছি—"

"যাহা শুনিয়াছ তাহা মিথ্যা নয়। বিরাট একটা শঙ্খচূড় সাপ সেখানে ছিল, তাহারই ভয়ে কেহ সেখানে যাইতে পারিত না, তাহারই কামড়ে বহু পশু প্রাণ হারাইয়াছে। আমার চোখের সামনেই বল্‌গা হরিণকে মরিতে দেখিলাম। কিন্তু শঙ্খচূড় আর নাই, তাহাকে নিধন করিয়াছি।"

"কি করিয়া?"

আমি স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলাম। জোলমার কথা বলিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু গো মানা করিয়া গিয়াছিল, বলিতে সাহস করিলাম না। টাহা আমার নীরবতার যে অর্থ করে করুক। টাহা কিন্তু ইহার একটি অর্থই করিল। তাহার মনে হইল যেহেতু আমি চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী সেই হেতু আমি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সেইজন্যই আমি জিকাটু পাহাড় হইতে জীবন্ত ফিরিতে পারিয়াছি। আমাকে নীরব দেখিয়া তাই সে নিজেই উত্তরটা দিয়া দিল।

"ও, তুমি তো পারিবেই। কুঠারের হাতলে যে অমন সুন্দর হরিণের মুখ

আঁকিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছু নাই। আমাকে শিখাইয়া দিবে বলিয়াছিলে, মনে আছে তো?"

"আছে। শিখাইয়া দিব।"

কথাটা বলিয়াই কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল আমি টাহাকে শিখাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিব সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি টাহা শিখিতে না পারে তখন কি হইবে? সে নিশ্চয় মনে করিবে আমি যে বিশেষ মন্ত্রবলে চিত্রকর হইয়াছি সেই বিশেষ মন্ত্রটি তাহাকে শিখাইতেছি না। আমি যে দলে পূর্বে ছিলাম সেই দলেও এইরূপ সংকটে মাঝে মাঝে আমাকে পড়িতে হইয়াছে। সকলে চিত্রকর হইতে পারে না, কিন্তু চিত্রকর হইবার সাধ অল্প-বিস্তর সকলের মনেই জাগে। তখন তাহারা চিত্রকরের খোশামোদ করে, তাহাকে নানারকম লোভ দেখায়। অনেক প্রকৃত চিত্রকর এই সব অপটু অক্ষম শিষ্যদের নানাভাবে ভুলাইয়া নিজেদের আয়ত্তাধীন রাখিবার চেষ্টা করেন। যাদুবিদ্যা, মন্ত্র, বিশেষ রকম লতাপাতার সংমিশ্রণ প্রভৃতির দোহাই দিয়া আসল কথাটা চাপিয়া যান। বিধিদত্ত ক্ষমতা না থাকিলে যে চিত্রকর হওয়া অসম্ভব এ কথাটা কেহ তাই মানিতে চায় না, মনে করে যে বিশেষ একটা তুক্‌তাক্ মন্ত্র বা উপকরণের সন্ধান পাইলেই বুঝি ছবি আঁকিতে পারা যাইবে এবং গুণী চিত্রকর ইচ্ছা করিলে সে সবের সন্ধান দিতে পারে। সে যুগে চিত্রকরের খুব সম্মান ছিল, বহুলোক তাহাকে দেব-অনুগৃহীত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মনে করিত, বহুলোক তাহার বশীভূত থাকিত। কিন্তু এজন্য তাহাকে নানারূপ সংকটেও পড়িতে হইত। টাহার সম্পর্কে এই সব কথা মনে হওয়াতে বেশ একটু অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলাম। টাহা আমার মুখের দিকে ভক্তিগদগদ নেত্রে তাকাইয়াছিল। তাহার মনকে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া যাইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, "লাফাই পাহাড়ে উৎসব কখন হইবে?"

"একটু পরেই।"

"চল, সেইখানেই যাওয়া যাক—"

"কিন্তু জোলমা যদি না ফিরিয়া থাকে—"

"চল, সে খবরটাও লওয়া দরকার।"

বাধ্য বালকের মতো টাহা আমার অনুসরণ করিতে লাগিল।

৫

লাফাই পাহাড়ের নিম্নদেশে বহু বলগা হরিণ পড়িয়াছিল। কাহারও পা ভাঙিয়া গিয়াছে, কাহারও ঘাড় মটকাইয়া গিয়াছে। কাহারও মস্তক বিদীর্ণ। একটা হরিণের শিং আর একটা হরিণের উদরে প্রবেশ করিয়াছে। স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে নানাভাবে আহত, মৃত, নানা বয়সের হরিণ-হরিণীর দল। আহত হরিণগুলি করুণস্বরে চীৎকার করিতেছে। হরিণের স্তূপ হইতে একাধিক রক্তের ধারা সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণকে রক্ত-চর্চিত করিয়াছে। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে প্রকাণ্ড জনতা। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সকলে। আবাল-বৃদ্ধবণিতা কাহারও মধ্যে কোনও চঞ্চলতা নাই। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকের বৃক্ষ-শ্রেণীও জনপূর্ণ। আমি একটি বৃক্ষের উচ্চচূড়ায় বসিয়া আছি। টাহা আমাকে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি আকুল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছি জোলমা কোথায়। কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না, আমার সম্বন্ধে বুহাকে সে কিছু বলিয়াছে কি না জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিলাম।

...সহসা অনুভব করিলাম, দূর হইতে একটা মৃদু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। মৃদু কিন্তু অবিচ্ছিন্ন। ক্রমশ তাহা স্পষ্টতর হইতে লাগিল। হুম, হুম, হুম, হুম এই জাতীয় একটানা শব্দ একটা। সমবেত জনতার আগ্রহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। আকাশ বাতাস সেই শব্দের ছন্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ছন্দের মোহে আমি অবশেষে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। -জোলমার প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ যেন শব্দে রূপান্তরিত হইয়া দিগন্ত সীমায় দিশাহারা হইয়া ফিরিতে লাগিল। আমার স্থূল দেহটাই যেন বৃক্ষশাখায় বসিয়া রহিল, আমার মন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল শব্দের তরঙ্গে তরঙ্গে নামহীন সমুদ্রের তটে তটে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমার বোধ প্রায় অবলুপ্ত হইয়া গেল। হুম হুম হুম হুম—ক্রমবর্ধমান এই শব্দের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া আমি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ বসিয়া রহিলাম। অকস্মাৎ সমবেত কণ্ঠের হর্ষধ্বনিতে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের গা বাহিয়া বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত একটা শোভাযাত্রা মন্থর গতিতে প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইতেছে। শোভা-যাত্রার পুরোভাগে একটা চলন্ত বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের চূড়ায় বসিয়া আছে একটি শ্যেনপক্ষী। তাহার পিছনে আসিতেছে দুইটি নরনারীর শ্রেণী, একটি নরের পাশে একটি নারী, এইরূপ যুগলমূর্তির যুগ্মধারা নামিয়া আসিতেছে। প্রত্যেকেরই মাথায় শ্যেনপক্ষীর পাখা গোঁজা, প্রত্যেকেরই হস্তে কিশলয়-

সমন্বিত ছোট একটি বৃক্ষশাখা, প্রত্যেকেরই কটিতে লতার বেষ্টনী, সেই বেষ্টনী হইতে ঝুলিতেছে কাঁচ কাঁচ ডালপালা, বিচিত্র আকারের পত্র, বহুবর্ণের পুষ্প। ইহাতে কটি হইতে উরুর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঢাকা পড়িয়াছে, দেহের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ অনাবৃত। তাহারও পিছনে একদল হরিণী সাজিয়া আসিতেছে। তাহাদের মাথায় হরিণের শিং বাঁধা। ইহাদের মধ্যে বিতংকে চিনিতে পারিলাম। জোলমা কোথায় গেল? শোভাযাত্রার শেষভাগে দেখিলাম বৃহা আসিতেছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠকায়, মাথায় দীর্ঘ কেশ চূড়ানিবন্ধ, চূড়ার উপর এক গুচ্ছ পলাশ ফুল, দেহের সম্মুখভাগে মৃগচর্ম-বিলম্বিত, স্কন্ধে প্রকাণ্ড একটা প্রস্তর কুঠার, কৃষ্ণ কুঞ্চিত শ্মশ্রু-গুম্ফে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, রক্তাভ আয়ত চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত, চক্ষুর দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত জ্যোতি। দলপতি হইবার উপযুক্ত চেহারা বটে। সহসা আমার সমস্ত বুকটা জ্বালা করিয়া উঠিল, মনে হইল বৃহার রক্ত ব্যতীত সে জ্বালা প্রশমিত হইবে না। অন্তরের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছে, বৃহার রক্তেই সে আগুন নিভিতে পারে। কিন্তু তাহা কি করিয়া সম্ভব? কোন্ অজুহাতে আমি জোলমার পিতাকে হত্যা করিব? হত্যা করিয়াই বা লাভ কি হইবে? জোলমার কথাগুলি মনে পড়িল—"বৃহাকে আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। তুমি জোর করিও না, আমাকে নিজের পথে চলিতে দাও—"

হঠাৎ দেখিলাম বৃহারও পশ্চাতে টাহা আসিতেছে, টাহার স্কন্ধে রহিয়াছে গো। গো-এর দুই হাতে বন্ধপদ কয়েকটি তিত্তিরপক্ষী ছটফট করিতেছে। জোলমাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। সে কোথায়?...শোভাযাত্রা পর্বত হইতে নামিয়া ক্রমশ প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী হইল। চলন্ত বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া নরনারীর শ্রেণী বৃত্তাকারে দাঁড়াইল। বহুকণ্ঠনিঃসৃত হুম হুম শব্দ সমস্ত প্রকৃতিকে স্পন্দিত করিতে লাগিল। মনে হইল একটা অস্পষ্ট বেদনা যেন বাঙময় হইতেছে, এইবার বুঝি কিছু একটা ফাটিয়া যাইবে। হঠাৎ শব্দটা থামিয়া গেল, দেখিলাম প্রাঙ্গণ-সীমায় যে পাথরটা ছিল, তাহার উপর বৃহা দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চলন্ত বৃক্ষের উপর যে শ্যেন পক্ষীটি ছিল, তাহা পাখা ঝটপট করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার পা বৃক্ষশীর্ষে বাঁধা ছিল। টাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া গো চলন্ত বৃক্ষটির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। চলন্ত বৃক্ষ আর চলন্ত ছিল না, বৃত্তের মধ্যস্থলে তাহা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটি মানুষেরই চতুর্দিকে ডাল-পালা ঘিরিয়া যে এই চলন্ত বৃক্ষ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা এইবার বেশ বোঝা যাইতে লাগিল। খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। শাখাপত্রের ভিতর হইতে একটা রক্তবর্ণের আভা কেবল দেখা যাইতেছিল।

...নিস্তব্ধতাকে সচকিত করিয়া গো সহসা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। দেখিলাম হস্তধৃত তিত্তিরপক্ষীগুলিকে সবেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে উন্মাদিনীর

মতো নৃত্য করিতেছে। তাহার মাথার পলিত কেশদাম যেন সর্প-শিশুর ন্যায় ফণা ধরিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গবর্ষী। নাচিতে নাচিতে সহসা সে থামিয়া গেল এবং একটা তিত্তিরপক্ষীর টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। পরমুহূর্তেই দেখিলাম ছিন্নমুণ্ড তিত্তিরপক্ষী ধূলায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। টাহা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে তিত্তিরটিকে তুলিয়া শ্যেনপক্ষীর সম্মুখে আস্ফালন করিল, তাহার পর তাহা দূরে ছুঁড়িয়া দিল। ছুঁড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হইয়া উঠিল শ্যেনপক্ষীটা, গৌ খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার শুরু হইল তাহার উন্মাদ নৃত্য, আবার সে আর একটা তিত্তিরপক্ষীর মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিল, টাহা আবার সেই রক্তাক্ত পাখীটা বৃক্ষচূড়াবদ্ধ শ্যেনকে দেখাইয়া দূরে ছুঁড়িয়া দিল। বিরাট জনতা রুদ্ধ-নিশ্বাসে গৌয়ের কার্যকলাপ দেখিতেছে, আহত হরিণদের ক্ষীয়মান আর্তনাদ ছাড়া, আর কোনও শব্দ নাই। গৌয়ের অট্টহাস্যে মাঝে মাঝে সে আর্তনাদ ডুবিয়া যাইতেছে। অতি অদ্ভুত একটা জগৎ চতুর্দিকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে জগৎ যেন পুরাতন জগৎ নয়, তাহা মানুষের সৃষ্টি, সম্পূর্ণ নূতন অভূতপূর্ব একটা পরিবেশ।

গৌ একে একে সমস্ত তিত্তিরগুলিকে হত্যা করিল। টাহাও প্রত্যেকটি তিত্তির শ্যেনকে দেখাইয়া দেখাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। শেষ তিত্তিরটিকে ফেলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যেনপক্ষীর পায়ের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল। নিমিষের মধ্যে সে আকাশে উড়িল এবং পরমুহূর্তেই একটি মৃত তিত্তিরকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। যে জনতা এতক্ষণ চিত্রার্পিতবৎ নীরব ছিল, এইবার তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল, শত শত কণ্ঠের হর্ষধ্বনি ও উৎক্ষিপ্ত বাহু উড্ডীয়মান শ্যেনপক্ষীকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল।

বৃহা কিন্তু বিচলিত হয় নাই; সে বাহু উত্তোলন করিয়া প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়াছিল। এইবার দেখিলাম ধীরে ধীরে সে স্কন্ধ হইতে কুঠারখানি নামাইয়া পাশে রাখিল। তাহার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া আকাশের দিকে চাহিল। সূর্য তখন দিগন্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশের মেঘে মেঘে বর্ণের মহোৎসব শুরু হইয়াছে। বৃহা সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিশাল জনতা সহসা যেন আবিষ্কার করিল যে, আকাশপটেও নীরবে একটা উৎসব শুরু হইয়াছে। ইহার অভিনবত্ব যেন নূতন বিস্ময়ে তাহাদের নির্বাক করিয়া দিল। তাহারাও নীরব হইয়া গেল।

...কৃতাঞ্জলিবদ্ধ বৃহা কখন যে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আমি বুঝিতে পারি নাই। অভিনব ঘটনাপরম্পরার চমৎকারিত্বে আমি সত্যই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, মনে হইতেছিল, ইহা যেন বাস্তব নয়, আমি কোনও স্বপ্ন-লোকে নীত হইয়াছি। এই অসম্ভব স্বপ্ন-লোকে আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কোনও মূল্য আছে কি-না, সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাই মনে মনে নির্ধারণ করিতেছিলাম, বৃহা কখন কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে টের পাই নাই।

সহসা শুনিতে পাইলাম, বুহা গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছে, "আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্রি অনন্যকর্মা হইয়া অন্ধকারে গুহা-গাত্রে ছবির পর ছবি আঁকিয়া হরিণদেবতার যে অর্চনা করিয়াছিলাম, সে অর্চনা যে বিফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমাদের সকলের সম্মুখে আজ স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য দেবতা হরিণরূপে আসিয়া আত্মদান করিয়াছেন; একা নয়, দলে দলে আসিয়াছেন, লাফাই পাহাড়ের শিখর হইতে পড়িয়া নিজেকে আহত করিয়াছেন, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন, নিজেকে বিনাশ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা আমরা তাঁহার মাংসে পুষ্ট হইয়া তাঁহারই আরাধনা করি। ওই মৃত মৃগস্তূপের মধ্যে যে সব মৃগ এখনও মরে নাই, তাহাদের করুণ কণ্ঠস্বর শোন। করুণ সুরে স্বয়ং দেবতাই বলিতেছেন— 'আমাকে বধ করিয়া আমার মাংস আহার কর। আমাকে কেহ বধ করিতে পারে না, আমি নব নব রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদের হিতার্থে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিলাইয়া দিই। যাহারা আমাকে পূজা করে, তাহাদের নিকট আমি আত্মদান করি। যে রূপে যে মূর্তিতে আমাকে অর্চনা করিবে সেই রূপে সেই মূর্তিতেই আমি তোমাদের কাছে ধরা দিব। তোমরা হরিণের ছবি আঁকিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছ, হরিণরূপেই তোমাদের নিকট ধরা দিয়াছি। আমাকে বধ করিয়া ভক্ষণ কর।' আমরা যদি মন দিয়া শুনি আহত হরিণের কণ্ঠস্বরে এই কথাই শুনিতে পাইব। আজ আর একটা অদ্ভুত কথাও তোমাদের বলিতে চাই। যে আকাশ-কন্যা ওহালি অহোরাত্র আকাশে নিত্যনূতন চিত্রের নমুনা দিয়া আমাকে উৎসাহ দিতেছে, এই মুহূর্তেও আকাশের মেঘে মেঘে যাহার চিত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারই প্রেরণায় আমি কিছুদিন পূর্বে দেবতার নব-রূপ কল্পনা করিয়া বন্য মহিষের ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আজ খবর পাইয়াছি দেবতা আমার অর্চনায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাদের বনে বন্য-মহিষের দল আসিয়াছে। বন্য-মহিষ কিন্তু বল্‌গা হরিণ নহে। বীরত্বের পরিচয় না পাইলে মহিষ-দেবতা আত্মদান করেন না। আমার অর্চনায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের কাছে আসিয়াছেন, শৌর্যের পরিচয় দিলে তিনি আত্মদান করিবেন। সে পরিচয় আমাকেই দিতে হইবে, আমি অবসরমতো সে পরিচয় একদিন দিব। তোমরা যথাকালে তাহার সংবাদ পাইবে। আর একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমার কার্য আরম্ভ করিব। যে ছবির প্রভাবে আমরা দেবতার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছি, সে ছবির প্রেরণা দিয়াছিল আকাশ-কন্যা ওহালি, তাহার প্রেরণা এখনও আমাকে উদ্বুদ্ধ করে; কিন্তু ওহালি-কন্যা জোলমা যদি না থাকিত কেবলমাত্র প্রেরণা লইয়া আমি ছবি আঁকিতে পারিতাম না। গুহার অন্ধকারে জোলমা প্রদীপ হস্তে দিনের পর দিন আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার সান্নিধ্য, তাহার পবিত্র সৌন্দর্য, তাহার নীরবতা, আমার অন্তরে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তাহাই আমার ছবির প্রাণ। জোলমা আমার পার্শ্বে না থাকিলে আমি ছবি আঁকিতে পারিব না। শ্যেন সম্প্রদায়ের

মঙ্গলের জন্য চিরকুমারী জোলমাকে আমার পার্শ্বে আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। জোলমা তাহাতে সম্মত আছে। ওহালি-কন্যা জোলমা দেবী। তোমরা দেবীরূপে তাহাকে বন্দনা কর, দেবীরূপে তাহাকে রক্ষা কর, কাহারও লালসা যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে। কোনও পুরুষের লালসা যদি তাহাকে কলঙ্কিত করে, তাহার আলো আর আমার ছবিকে উজ্জ্বল করিবে না, তাহার সান্নিধ্য আর আমাকে উৎসাহ দিবে না। এই কথা তোমাদের মনে জাগরূক রাখিবার জন্য জোলমাকে দেবীরূপে আজ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, দেবীরূপেই তোমরা তাহাকে পূজা কর।"

বৃহা ধীরে ধীরে প্রস্তরবেদী হইতে অবতরণ করিয়া বৃত্তমধ্যবর্তী সেই চলন্ত বৃক্ষের নিকটে আসিল। তাহার পর কটিবন্ধন হইতে একটি প্রস্তর-ছুরিকা বাহির করিয়া তাহার ডালপালাগুলি কাটিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সমস্ত গাছটাই মাটিতে পড়িয়া গেল। সবিস্ময়ে দেখিলাম জোলমা দাঁড়াইয়া আছে। জোলমার সে কি অদ্ভুত মূর্তি! তাহার সর্বাঙ্গ নানাবর্ণে রঞ্জিত। বাহু এবং উরু দুইটিতে টক্‌টকে লাল রং, কনুই হইতে হাত পর্যন্ত এবং জানু হইতে পা পর্যন্ত সবুজ, গ্রীবা হইতে কোমর পর্যন্ত ঘন কৃষ্ণবর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডলে লাল এবং কালোর ডোরাকাটা। সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী জোলমা প্রসারিত করপল্লবে একটি প্রদীপ ধরিয়া নিমীলিত নয়নে দাঁড়াইয়া আছে। সহসা লক্ষ্য করিলাম বিরাট জনতা শ্রদ্ধায় শির অবনত করিয়াছে। সেই শ্রদ্ধাপ্লুত নীরবতা কিন্তু একটা তীক্ষ্ন অট্টহাস্যে বিঘ্নিত হইল। চাহিয়া দেখিলাম গো হাসিতেছে। আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া কোমরে দুই হাত দিয়া হাসিতেছে। হাসি না আর্তনাদ? ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গো আর সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল না, হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। জোলমা দেখিলাম নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, মৃণ্ময় প্রতিমা। সকলেই দেখিলাম নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে, এমন কি বৃহা পর্যন্ত। বৃহা যাহা বলিয়াছিল, তাহার তাৎপর্য আমি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যে দর্শন পরবর্তী যুগে সর্বদেশের ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রভাবিত করিয়াছে, যাহা তোমাদের বেদে উপনিষদে বিশদতররূপে ব্যক্ত, সেই অসভ্য যুগেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। অসভ্য মানবের মানসপটেই দেবতা প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারাই বৃক্ষে, নদীতে, পর্বতে, প্রস্তরে, পশুতে, পক্ষীতে, সূর্যে, চন্দ্রে এমন কি মৃত্যুর ভয়াবহতার মধ্যেও দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুসারে সমাজ ও জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। তবু আমি বৃহার কথার তাৎপর্য ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না, আমার মনে হইতেছিল—কি যে মনে হইতেছিল, তাহাও ঠিক প্রকাশ করিতে পারিব না—বৃহার কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বৃহা যে ভণ্ডামি করিতেছে, একথা সজ্ঞানে ভাবিবার সাহসও আমার ছিল না, কিন্তু তবু মনে হইতেছিল কোথায় যেন কি একটা গলদ আছে। বল্‌গা হরিণের দলকে ফাঁদে ফেলিয়া তাহার পর সেটাকে দেবতার নামে চালানো কেমন

যেন অদ্ভুত ঠেকিতেছিল। মনে হইতেছিল, শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের প্রভুত্ব অটুট রাখিবার জন্য বুহা নিজেই নিজেকে ভুলাইতেছে; তাহার ছবি আঁকিবার ক্ষমতাই তাহার চোখে মোহের অঞ্জন পরাইয়াছে। সে ভণ্ডামি করিতেছে না, সে যাহা বলিল তাহার প্রত্যেক কথাটি সে নিজে বিশ্বাস করে। তাহার ধারণা জোলমা চিরকুমারী না থাকিলে শ্যেন-সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমি নিজে দেবতায় কম বিশ্বাসী ছিলাম না, পর্বত-দেবতার আদেশ শুনিয়াই আমি এই দেশে বসবাস করিব স্থির করিয়াছিলাম, তবু কিন্তু বুহার কথায় আমার কেমন যেন অবিশ্বাস হইতেছিল; মনে হইতেছিল, বুহা নিজের শিল্প-প্রেরণার মোহে জোলমার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। আমি আমার অবিশ্বাস অনুসারেই চলিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হই নাই। আমার বিফলতার জন্য যে দুর্ঘটনাকে দায়ী করিয়াছিলাম, এখন মনে হয় তাহার পিছনে বিধাতার ইঙ্গিত ছিল। মনে হয়, আমার নিজের মোহ, জোলমার প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি হয়তো আমাকেও ভুল পথে চালিত করিয়াছিল।

...গো চলিয়া যাইবার পর নীরবতাটা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন দুই বিভিন্ন মনোবৃত্তি নীরব হিংস্রতায় পরস্পরের সহিত পাঞ্জা লড়িতেছে। বিরাট জনতা যেন রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের জন্য উৎসুক হইয়া আছে। বুহা সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিল। গম্ভীরকণ্ঠে সে বলিল—"শ্যেন বংশের স্থাপয়িত্রী গো অট্টহাস্য করিয়া আমার ইচ্ছাকে সমর্থন করিয়া গেল ইহাতে আমি আনন্দিত। এইবার আমাদের উৎসব শুরু হোক।"

তাহার পর নৃত্য শুরু হইল। যে নর-নারীরা যুগ্ম-শ্রেণীতে বৃক্ষরূপিণী জোলমার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা ধীরে ধীরে অঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। নাচিতে নাচিতে ক্রমশ তাহারা জোলমার নিকট আসিল এবং বুহা যে গাছের শাখাগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, সেইগুলি একে একে তুলিয়া আবার লতা দিয়া বাঁধিতে লাগিল। বৃক্ষবীথির ভিতর দিয়া বেগে বায়ু বহিলে যে ধরণের মর্মরধ্বনি হয়, সেই ধরণের শব্দ শুনিয়া আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঝড় উঠিতেছে কি না। ক্ষণপরেই আমার ভুল ভাঙিল। বুঝিতে পারিলাম নর্তক-নর্তকীরাই মুখে ওইরূপ শব্দ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে জোলমা পুনরায় চলন্ত বৃক্ষে রূপান্তরিত হইল। আবার সে পর্বত অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। নরনারীর দল নাচিতে নাচিতে আবার তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিলাম তাহাদের মুখনিঃসৃত মর্মরধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। আশা করিয়াছিলাম ইহারা বোধ হয় পুনরায় পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিবে, কিন্তু তাহা উঠিল না। পাহাড়ের সানুদেশে যে প্রকাণ্ড ফাটলটা ছিল, তাহার ভিতরই জোলমা অদৃশ্য হইয়া গেল। যে অন্ধকার গুহায় বুহা ছবি আঁকে, এই ফাটলটা যে তাহার আর একটা প্রবেশ-পথ, তাহা পরে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। আমার সহিত বুহার প্রথম যে স্থানে সাক্ষাৎ হয়, তাহা ওই গুহা-প্রবেশের আর একটা দ্বার। সেখান

হইতে লাফাই পাহাড়ের গায়ে এই ফাটল পর্যন্ত সমস্তটাই গুহা। চলন্ত বৃক্ষরূপী জোলমা ফাটলের ভিতর অন্তর্ধান করিবার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যপরা নর-নারীর দল আবার ফিরিল। এবার তাহাদের নাচের ভঙ্গী ও গানের সুর কিন্তু বদলাইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ সর্বাঙ্গে ছিল মৃদু হিল্লোল, মুখে ছিল মর্মর ধ্বনি, এবার দেখিলাম উদ্বাহু হইয়া প্রত্যেকে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, প্রত্যেকের কণ্ঠে কলহাস্য ছন্দিত হইয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে যেন এক ঝাঁক কলহংস আকাশকে সচকিত করিয়া উড়িয়া আসিতেছে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা আসিয়া আবার প্রাঙ্গণে সমবেত হইল, এবার আর বৃত্তাকারে দাঁড়াইল না, জনতার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। বুহা এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া-ছিল—বস্তুত তাহার এই নীরবতা, এই নির্বাক নিয়মানুবর্তিতা,—আমাকে শুধু বিস্মিত নয়, আতঙ্কিতও করিতেছিল। তাহার এই যন্ত্রবৎ ব্যবহারই সকলের মনে সভয় সম্ভ্রম বিস্তার করিয়া তাহাকে অসাধারণ স্তরে উন্নীত করিয়াছিল, সকলের ধারণা হইয়াছিল সে মানুষ নয়, দেবতা। মানুষ এত স্থির, ধীর, অচঞ্চল মিতবাক হইতে পারে না। আমি অনুভব করিতেছিলাম কেবলমাত্র শিল্প-প্রতিভার জন্য নয়, এই অসাধারণ সংযমের জন্যই বুহা আজ শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি। পরবর্তী জীবনেও বারম্বার আমি ইহা অনুভব করিয়াছি। কেবল প্রতিভা নয়, অসাধারণ চরিত্রই মানুষকে শ্রদ্ধাস্পদ করে। বুহার চরিত্র শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলের মধ্যেই প্রভাবও বিস্তার করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ সেই বিরাট জনতায় কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না, সমস্তই যেন সুনিয়ন্ত্রিত। অদৃশ্য এক দেবতার পূজায় সকলেই যেন সংযত, সশ্রদ্ধ। বুহা কুঠারটি তুলিয়া লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। হরিণস্তূপের ভিতর হইতে যে-ই একটি আহত হরিণ করুণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনই বুহা কথা কহিল। "ওই শোন, দেবতা আবার বলিতেছেন, 'আমাকে বধ করিয়া আমার মাংস তোমরা ভক্ষণ কর।' দেবতার আদেশ পালন করিতে আর আমি বিলম্ব করিব না।"

বুহা কুঠার হস্তে সেই হরিণস্তূপের উপর উঠিয়া গেল এবং যে হরিণগুলি মরে নাই, আহত হইয়া চীৎকার করিতেছিল, তাহাদের একে একে হত্যা করিতে লাগিল। কুঠারের প্রতি আঘাতের সহিত জনতার ভিতর হইতে সমস্বরে রব উঠিতে লাগিল—হে দেবতা, তুমিই ধন্য! হে দেবতা, তুমিই ধন্য! হে দেবতা, তুমিই ধন্য!

...বৃক্ষের কাণ্ডে ঠেস দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, কতকগুলি পেচকের কর্কশ কোলাহলে জাগরিত হইয়া দেখিলাম সকলে চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার, বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না, লাফাই পাহাড়টা কেবল বিরাট একটা অন্ধকার পিণ্ডের মতো আকাশকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিশেষ কিছু শোনাও যাইতেছে না, এমন কি, কীটপতঙ্গের শব্দ পর্যন্ত নয়। যে বিরাট এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এখানে কিছুক্ষণ আগে সংঘটিত হইয়া

গিয়াছে তাহার ভীষণতায় সমস্ত প্রকৃতি যেন আতঙ্ক-বিহ্বল। পেচকগুলো বোধ হয় পথ ভুল করিয়া আসিয়াছিল, আসিয়াই ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। আমি প্রস্তর যুগের অসভ্য মানুষ, পশু হত্যা করিয়া জীবন ধারণ করিতেই আমি অভ্যস্ত, পশুর প্রতি সদয় হইবার নীতি তখনও আমি শিখি নাই, কিন্তু যে অনুভূতি হইতে এই নীতির জন্ম সেদিন অন্ধকারে একা বৃক্ষ-চূড়ায় বসিয়া অস্পষ্টভাবে যেন সেই অনুভূতির সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল বৃহার কথা যদি সত্য না হয়, তাহার লোভই দেবতার ছদ্মবেশে সকলকে ভুলাইতেছে আমার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেবতা কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? বৃহা কি নিস্তার পাইবে? অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম, মানসপটে ধীরে ধীরে যে ছবি ফুটিয়া উঠিল তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও ফোটে নাই—অসংখ্য আহত হরিণের অসহায় মুখচ্ছবি, চোখের দৃষ্টিতে করুণ মিনতি। সহসা শিহরিয়া উঠিলাম। অন্ধকার যেন হাসিয়া উঠিল। নারীকণ্ঠের হাসি! উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম ক্ষণকাল। আবার হাসির শব্দ পাওয়া গেল, মনে হইল দূরে অন্ধকারে কাহারা যেন চাপা-কণ্ঠে কথাও কহিতেছে। আমি আর গাছে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। নামিয়াই দেখিলাম ঠিক গাছের তলায় কাহারা যেন ছিল, আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মনে হইল মৃত হরিণদের প্রেতাত্মারা বোধ হয় অন্ধকারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। পায়ের নীচের মাটি মনে হইল ভিজা, বেশ যেন কাদা-কাদা, বৃষ্টি তো হয় নাই, তবে...সহসা বুঝিতে পারিলাম...হরিদের রক্তে কাদা হইয়া গিয়াছে। বৃহার পেশীসমৃদ্ধ সুদীর্ঘ মূর্তিটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল —বিশাল প্রস্তর কুঠার তুলিয়া হরিণের পর হরিণ কাটিয়া চলিয়াছে...কর্তিত মুণ্ড দূরে ছিটকাইয়া পড়িতেছে—উৎসাকারে রক্তধারা নিঃসৃত হইতেছে—লুব্ধ জনতা সাগ্রহে চীৎকার করিতেছে, "হে দেবতা, তুমিই ধন্য, হে দেবতা, তুমিই ধন্য!" হাসির শব্দ অন্ধকারকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। এবার কাছে নয়, বেশ একটু দূরে। উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কিছু শোনা গেল না। অগ্রসর হইব ভাবিতেছি এমন সময় নারীকণ্ঠে কে যেন প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না, না, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও। প্রতিবাদের সুর পরমুহূর্তে হাসির হিল্লোলে ভাসিয়া গেল। কে যেন হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

...চাঁদ উঠিয়াছে। আমি চন্দ্রালোকে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। হাসির কারণ আবিষ্কার করিয়াছি। শ্যেন-সম্প্রদায়ের সমস্ত নর-নারী মিলনোৎসবে মাতিয়াছে। প্রত্যেকের হাতে এক টুকরা হরিণের মাংস, প্রত্যেকের সঙ্গে একজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী। পাহাড়ের সানুদেশে, উপত্যকায়, গুহায়, বৃক্ষবীথিকার আলো-আঁধারিতে সর্বত্র ওই এক দৃশ্য। আমি পাগলের

মত একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। টাহা যে পথে আমাকে বন হইতে এখানে লইয়া আসিয়াছিল তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। যে পথ দিয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম তাহাই আমাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লাফাই পর্বতের কাছে লইয়া আসিতেছিল। একটা অদ্ভুত মায়াপুরীর অদৃশ্য জালে আমি যেন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। জোলমার জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, মনে হইতেছিল বনে গিয়া যদি আমার সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরে বসিতে পারি জোলমার দেখা পাইব, জোলমা নিশ্চয় সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। বনে ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, লাফাই পাহাড়ের চতুর্দিকে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মিলনোন্মত্ত নর-নারীর হাসি, তর্জন, কলোচ্ছ্বাস আমাকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। আমাকে কেহ গ্রাহ্যও করিতেছিল না, আমি কাছে গেলে কেহ দূরে সরিয়া যাইতেছিল, কেহ বা যাইতেছিল না, আমি নিজেই তখন সরিয়া যাইতেছিলাম। নিজের আচরণে নিজেই আমি বিস্ময় বোধ করিতেছিলাম। আমার চরিত্রে যে এত শক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না, জীবনে যে কোন দিন এমন আত্মসংযমের পরিচয় দিতে পারিব তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়াছিল জোলমার জন্য। আমার কেমন যেন দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছিল অসংযমের স্রোতে গা ভাসাইলে জোলমাকে পাইব না। জোলমা দেব-কন্যা, তাহাকে পাইতে হইলে সংযত হইতে হইবে। তাই সেদিন চন্দ্রালোকিত রজনীতে লাফাই পাহাড়ের আকাশে-বাতাসে যখন লালসার বিদ্যুৎ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল তখন আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। প্রেমই আমাকে রক্ষা করিয়াছিল।

...সহসা লক্ষ্য করিলাম একটা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কে যেন আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আর একটু নিকটে আসিতে বুঝিতে পারিলাম লোকটি পুরুষ, দেখিলাম একটি নারীও তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া রহিয়াছে। পুরুষটি তাহার দুই বলিষ্ঠ বাহুতে নারীটিকে শিশুর মতো ধরিয়া রাখিয়াছে। আমার কাছাকাছি আসিয়া নারীটি পুরুষের বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম গো।

গো বলিল, "তুমি একা ঘুরিতেছ যে? জোলমাকে খুঁজিতেছ বুঝি? আজ জোলমাকে পাইবে না। তাহাকে বৃহা আজ দেবী বানাইতেছে। আজ আর তাহার নাগাল পাইবে না, আর কাহাকেও জুটাইয়া লও। আজ আমাদের লাফাই পাহাড়ে অনেক সম্প্রদায়ের লোক আসিয়াছে। হংস, ডাহুক, শঙ্খচিল, সজারু, শশক—লোকের অভাব নাই। কাহারও সঙ্গে ভাব করিয়া ফেল। আজ রাত্রে একা থাকিতে নাই। এই দেখ না, আমার তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে আমিও একজন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়াছি। এটি কে জান? আমার বড় দৌহিত্রীর বড় দৌহিত্র। সারস বংশের দলপতি। এক পাল হংসীকে লইয়া মাতিয়া-

ছিল, আমি ডাক দিতেই আমাকে আসিয়া কোলে তুলিয়া লইল। ছোকরার গায়ে অসুরের শক্তি। আমাকে লইয়া গাছে উঠিতেছিল এমন সময় আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম, দেখিলাম তুমি একা,—ওকি তুমি অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন, বুহার ভূত তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে না কি—এই রে তবেই সারিয়াছে, দাঁড়াও তোমার ভূত ছাড়াই"—গো অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল। বকুনি থামাইয়া সহসা সে ছুটিয়া আসিয়া বাম হস্তে আমার কোমর জড়াইয়া ধরিল এবং ভঙ্গী-ভরে দক্ষিণ হস্তটি মাথার উপর রাখিয়া কোমর দুলাইয়া গান ধরিল—"গাছের ডালে ফুল ধরিয়াছে। সূর্য রোজ আসিয়া খবর লয়, চাঁদ রোজ আসিয়া উঁকি দেয়, ফল কবে ধরিবে। ফল আন, ফল আন, ওগো ফুল ফল আন, ফুলের কানে কানে বাতাস বলে। সূর্য খবর লয়, চাঁদ উঁকি দেয়—বাতাস কানে কানে বলে—ওগো ফুল ফল চাই, ফল ফল ফল—" বলিতে বলিতে সহসা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। তাহার পর বলিল, "চল তোমাকে হংসীদের সহিত আলাপ করাইয়া দিই। আমার মনের মানুষটির সঙ্গেও আলাপ কর, ঝিংটু, আমাদের বিদেশী অতিথিকে গান শোনাও তুমি—তোমার সেই সারস পাখী গানটা—"

ঝিংটু একটু হাসিয়া আমার দিকে চাহিল, তাহার পরে তারস্বরে গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল—"সারস আকাশে ওড়ে চাঁদের আলোতে, দিনের বেলা ছবি দেখে নদীর জলেতে, নিজের নয় হংসীর, ডাহুকীর, ময়ূরীর, কপোতীর, রাতের বেলা উড়ে বেড়ায় চাঁদের আলোতে, সারস আকাশে ওড়ে—"

তাহার পর সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির সহিত মিশিল গো-এর খিল খিল হাসি। দূর হইতে কাহাদের কলহাস্য ভাসিয়া আসিল, দেখিলাম একদল নরনারী পাহাড়ের সানুদেশ বাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। গো বলিল—"চল আমরাও যাই।" আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। গো বলিতে বলিতে চলিল—"জোলমা তোমার বিরুদ্ধে বুহাকে কিছু বলে নাই, সুতরাং তোমার আশা আছে। তুমি যদি লাগিয়া থাক ওর দেবীত্ব বেশি দিন টিকিবে না। তুমি যখন শঙ্খচূড়কে কাবু করিয়াছ, উহাকেও কাবু করিতে পারিবে। কিন্তু খুব সাবধানে অগ্রসর হও। বুহা শক্তিশালী শ্যেন-পক্ষী, অন্ধ বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। ওহালি উহাকে অন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভুল পথে ভীষণ বেগে বুহা উড়িয়া চলিয়াছে, উহার সামনে পড়িয়া গেলে তীক্ষ্ণনখচঞ্চু দিয়া তোমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিবে, উহার পাখার ঝাপট সহ্য করিতে পারিবে না। তোমাকে খুব সাবধানে চলিতে হইবে।"

"আমি যে বনে ছিলাম সে বনের পথটা কোন্ দিকে? কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

"আর একটু গেলেই দেখিতে পাইবে। আমার কথাগুলি মন দিয়া শোন। বুহার ওসব আজগুবি কথায় বিশ্বাস করিও না, কিন্তু অবিশ্বাস করিতেছ ইহাও বুহাকে বুঝিতে দিও না। বুহা পাগল, অন্ধ এবং পাগল, সেইজন্যই ভয়ানক। জোলমাকে চিরকুমারী করিয়া রাখিতে চায়। বলে কি না জোলমা

কুমারী না থাকিলে ছবি আঁকা হইবে না। জোলমার মা ওহালি তো কুমারী ছিল না, সে তবে কি করিয়া বুহাকে ছবি আঁকা শিখাইল! আর ছবি না আঁকিলে হরিণ আসিবে না, এই বা কেমন কথা! ঝিংটু তো ছবি আঁকে না, তাহাদের কাছে কি হরিণেরা যায় না? যতসব আজগুবি কাণ্ড। বুহার বাপ ছিল পাগল। সে প্রতিটি পাথরে দেবতা দেখিত আর তাহার উপর মাথা কুটিত। মাথা কুটিতে কুটিতে শেষকালে মাথা ফাটিয়া মরিয়াই গেল। আর টাহার বাবা ছিল বোকা। কিছু বলিলেই ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত আর ফিক ফিক করিয়া হাসিত। আমার দুই ছেলে তাই দুই রকমের অদ্ভুত হইয়াছে। একটা পাগল আর একটা বোকা! টাহা বোকা হোক তাহার ছেলে মেয়ে হইয়াছে, বংশ থাকিবে। কিন্তু বুহা এ কি করিতেছে? এ আমি কিছুতেই সহ্য করিব না। শোন, জোলমাকে তুমি ভোলাও। তুমি বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, তুমি ছবি আঁকিতে পার, তুমি পারিবে। বুহাকে ভুলাইবার আয়োজন আমি নিজে করিতেছি। দেখি সে কতক্ষণ নারীকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। হরিণ দেবতা নয়, শিশুই দেবতা, হতভাগাটা একথা কিছুতেই বুঝিবে না! শিশু দেবতা বলিয়াই যে নারীর গর্ভে শিশু আসে, সে নারী উপেক্ষনীয় নয়। একথা তাহাকে বুঝাইয়া তবে আমি ছাড়িব। আমি ক'দিন বাঁচিব? টাহা-বুহার বংশধরেরা যদি সংখ্যায় বেশি হয় তবেই না তাহারা তিতিরদের নিঃশেষ করিতে পারিবে? বুহা অপুত্রক থাকিবে এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। ঝিংটু, তোমার দলের মেয়েরা প্রস্তুত আছে তো?"

ঝিংটু উত্তর দিল, "আছে। তাহারা গোপনে গোপনে বুহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। ওই বোধ হয় একজন এই দিকেই আসিতেছে।"

"ডাক উহাকে—"

ঝিংটু সারসের ডাক ডাকিয়া উঠিল। ডাক শুনিয়া যে ছায়ামূর্তিটি গাছের আলো-আঁধারিতে দাঁড়াইয়াছিল সে আগাইয়া আসিল। দেখিলাম সম্পূর্ণ নগ্না একটি যুবতী। তাহার চোখের দৃষ্টিতে, চলিবার ভঙ্গীতে কামনা উদগ্র হইয়া রহিয়াছে। আমাকে অপাঙ্গে একবার দেখিয়া ঝিংটুর দিকে চাহিল।

"বুহার খবর কি?"—ঝিংটু প্রশ্ন করিল।

"বুহা নিজের আস্তানা ছাড়িয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে কেহ জানে না। খি, পুরা, নিংকা, নোনা চারিদিকে তাহার খোঁজে বাহির হইয়াছে। খবর পাইলেই তাহারা আমাকে এবং টুংগাকে খবর দিবে। টুংগা পাহাড়ের ধারে অপেক্ষা করিতেছে।"

"বেশ, তুমিও অপেক্ষা কর। কাজ হাঁসিল করা চাই কিন্তু।"

মেয়েটি আমার দিকে অপাঙ্গে একবার চাহিয়া মৃদু হাসিল। তাহার পর আবার গিয়া গাছের ছায়ায় দাঁড়াইল। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম বিতং হরিণ সাজিয়া ছুটিতেছে, তাহার পৃষ্ঠে একটি মেয়ে তাহার গলা জড়াইয়া রহিয়াছে।

আমার শিরায় উপশিরায় রক্তস্রোত উন্দাম হইয়া উঠিল। মনে হইতেছিল আমি যেন এক সু-উচ্চ পর্বত-শিখরের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছি, নীচেই অতলস্পর্শী গহ্বর, একটু বিচলিত হইলেই পড়িয়া যাইব। পড়িয়া গেলে কিন্তু জোলমাকে আর পাইব না, এই ধারণাটা যেন আমাকে আগলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্তে তবু মনে হইতেছিল, আর বোধ হয় পারিলাম না, এইবার বোধ হয় পা ফসকাইয়া গেল।

"এই তোমার বনে যাইবার পথ"—গো সহসা কথা কহিয়া উঠিল। অনর্গল কথা কহিবার পর গো কিছুক্ষণ নীরব ছিল। সম্ভবত আপন মনে কিছু ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। আমরাও নীরবে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম। গো-এর কথা শুনিয়া আমি থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। সম্মুখে দেখিলাম একটি পথ বিসর্পিত রেখায় চলিয়া গিয়াছে। আমি গোকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া সোজা সেই পথ দিয়া ছুটিতে লাগিলাম। সহসা মনে হইল এই মায়াপুরী হইতে পলায়ন না করিলে আমার পতন অবশ্যম্ভাবী এবং পতন হইলে জোলমাকে আমি আর পাইব না, কিছুতেই পাইব না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম।

নিজের সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বৃহার উদাত্ত আহ্বানে ঘুম ভাঙিগয়া গেল।

"বিদেশী, বিদেশী, কোথায় আছ তুমি, সাড়া দাও—" বৃক্ষকোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া কিন্তু বৃহাকে দেখিতে পাইলাম না। প্রথমেই চোখে পড়িল বনের যে বৃক্ষহীন অংশটুকু চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল সেই অংশে হামাগুড়ি দিয়া কাহারা যেন সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছে। মুখ তুলিতেই চিনিতে পারিলাম। ঝিংটুর সেই নারীবাহিনী। প্রত্যেকেরই চোখ জ্বল জ্বল করিতেছে। চোখের তারায় প্রতিফলিত চন্দ্রালোকে কামনার লেলিহান দীপ্তি। মানবী নয়, যেন বাঘিনী।

"বিদেশী কোথায় তুমি"—আবার বৃহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। বৃক্ষকোটর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিতে নামিতে আশঙ্কা হইল বৃহার সহিত এখনই হয়তো বোঝাপড়া হইবে। প্রস্তর-কুঠারের হাতলটা চাপিয়া ধরিয়া রহিলাম, কি জানি বৃহা আচমকা যদি আক্রমণ করিয়া বসে। নীচে নামিবামাত্র বৃহাকে দেখিতে পাইলাম। সে ঠিক গাছের নীচেই ছিল। বৃহা যাহা বলিল, তাহাতে আমি কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম। তাহার নিকট এ আচরণ প্রত্যাশা করি নাই।

বৃহা বলিল, "বিদেশী, তোমার বীরত্বে এবং ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। জিকাটু পাহাড়ে গিয়া বিষধর শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া তুমি শ্যেন-সম্প্রদায়কে বিভীষিকামুক্ত করিয়াছ। তোমাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। জোলমার প্রতি তুমি যে ভদ্র ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতেও আমি আনন্দিত। আজ তাই

এমন একটা কার্যের ভার তোমার উপর দিতে আসিয়াছি, যাহা পাইলে শ্যেন-সম্প্রদায়ের যে কোনও লোক নিজেকে ধন্য মনে করিত। এই কার্য যদি তুমি সুসম্পন্ন করিতে পার, শ্যেন-সম্প্রদায় তোমাকে আত্মীয়রূপে গণ্য করিবে। দলপতিরূপে আমিও তোমার যে কোনও প্রার্থনা পূর্ণ করিব।"

"আমাকে কোন কার্য করিতে হইবে, বলুন—"

"এই বনে বন্য-মহিষের দল আসিয়াছে। আমি কাল সশস্ত্র হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইব। তোমাকে আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে।"

"আর কে থাকিবে?"

"টাহা।"

"আমি নিশ্চয়ই যাইব। আমার কিন্তু একটি নিবেদন আছে, শুনিবেন কি?"

"শুনিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কি চাও, তাহা আমি জানি। জোলমার কাছে সব শুনিয়াছি। জোলমাকে চিরকুমারী থাকিতে হইবে, শ্যেন-সম্প্রদায়ের জীবনমরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই অমোঘ বিধান মানিয়াও যদি তুমি জোলমাকে সঙ্গিনীরূপে পাইতে চাও, আমার আপত্তি নাই। তোমার চরিত্র, তোমার বীরত্ব, তোমার ছবি আঁকিবার ক্ষমতা জোলমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমিও মুগ্ধ হইয়াছি। আমি যখন থাকিব না তখন তুমিই দলপতি হইবে। সে যোগ্যতা তোমার আছে। তখন কুমারী জোলমা হয়তো, হয়তো একদিন তোমারই পার্শ্বে অন্ধকার গুহায় প্রদীপ ধরিয়া তোমার ছবিকে উজ্জ্বল করিবে। আমার ইহাতে আপত্তি নাই—"

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম।

"কাল আমার সহিত যাইতেছ তাহা হইলে?"

"যাইব।"

বৃহা আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার বিশাল মূর্তি বৃক্ষের অন্তরালে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল। আমিও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল এখনই একটা অঘটন ঘটিবে। পরমুহূর্তেই বৃহার চীৎকার শুনিতে পাইলাম।

"একি একি একি করিতেছ। ছাড়িয়া দাও আমাকে, ছাড়। কাল আমাকে মহিষ-দেবতার সম্মুখীন হইতে হইবে। আমাকে নষ্ট করিও না, আমি অপবিত্র হইয়া যদি দেবতার কাছে যাই, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন না, আমার মৃত্যু হইবে—ছাড়, ছাড়—"

সম্মিলিত নারীকণ্ঠের কলকাকলীতে বৃহার কণ্ঠস্বর নিমজ্জিত হইয়া গেল। তাহার কোন কথা আর আমি শুনিতে পাইলাম না।

...পরদিন বৃহা, টাহা এবং আমি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বনপথ অতিক্রম করিতে-

ছিলাম। বুহার স্কন্ধে ছিল ধনুক এবং হস্তে ছিল সেই বিরাট প্রস্তর কুঠারটা, যাহা দিয়া সে অবলীলাক্রমে শত শত হরিণ কাটিয়াছে, টাহার স্কন্ধেও ধনুক ছিল, তাছাড়া হাতে ছিল একটা বর্শা এবং বর্শা ছুঁড়িবার একটা যন্ত্র, আমার ছিল প্রস্তর কুঠার এবং ধনুর্বাণ। জোলমা যে বৃক্ষশীর্ষে বসিয়া মহিষের দলটিকে দেখিয়াছিল, আমরা সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম। কাহারও মুখে কোনও কথা ছিল না, চক্ষু, কর্ণ এবং নাসিকার সাহায্যে আমরা একাগ্রচিত্তে কেবল পারিপার্শ্বিক পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। কথা বলিবার অবসর ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। আমরা প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কা করিতেছিলাম দুর্ধর্ষ মহিষের দল অতর্কিতে যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও দিক হইতে আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। নিরাপদে কোনও বৃক্ষে আরোহণ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। কিন্তু কোথায় গিয়া কোন বৃক্ষে আরোহণ করিব, তাহা ঠিক করিবার পূর্বে মহিষের দলটি কোথায় আছে, জানা প্রয়োজন। জোলমা যে বৃক্ষ হইতে তাহাদের দেখিয়াছিল, সেই বৃক্ষ অভিমুখেই তাই আমরা চলিয়াছিলাম। বৃক্ষতলে আসিয়া বুহা আমাদের দিকে একবার চাহিল, তাহার পর নিঃশব্দে নিজেই বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। আমরা দুইজন নীচে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম। একটু পরেই বুহা নামিয়া আসিল এবং মাথা নাড়িল। বুঝিলাম, বুহা মহিষের দলকে দেখিতে পায় নাই। বুহা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ চলিবার পরও কিন্তু শিকারের সন্ধান মিলিল না। বুহা দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল বুহার চোখের জ্যোতি যেন ম্লান দেখাইতেছে। সে একবার টাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় আমার দিকে চাহিল। মনে হইল যেন কোনও গুহ্য খবর সে ব্যক্ত করিতে চায়, কিন্তু কথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করা নিরাপদ মনে করিতেছে না। আমরাও সে খবরটা জানিতে পারিয়াছি কি না তাহাই সে ভুরু নাচাইয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই। বুহা কিছুক্ষণ এইভাবে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যখন আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তির অভাবের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল তখন খবরটি ব্যক্ত করিল। ভাষার দ্বারা নয়, ইশারায়। আঙুল দিয়া কয়েকটি পশু-পদচিহ্ন দেখাইয়া দিল। আমরা এগুলি দেখিতে পাই নাই। ঝুঁকিয়া দেখিলাম, কিন্তু সেগুলি যে কোন পশুর পায়ের চিহ্ন তাহা বোধগম্য হইল না। আমি অন্তত এরূপ পদ-চিহ্ন পূর্বে দেখি নাই। টাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল টাহাও দেখে নাই।

বুহা তখন চুপি চুপি বলিল, "দেবতা আবার আর একরূপে আমাদের দেখা দিতেছে। আমি একদিন দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছি দাড়িওয়ালা একদল ঘোড়া মধ্যে মধ্যে এই বনে যাতায়াত করিতেছে। এগুলি তাহাদেরই পায়ের দাগ।

মনে হইতেছে ইহারাই মহিষের দলকে দূরে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।"

বৃহার কথাটা তুচ্ছ করিবার মতো নহে।

বলিলাম—"তাহা খুবই সম্ভব। ম্যামথরা বল্‌গা হরিণের দলকে তাড়াইয়া দেয়। আর একটু আগাইয়া দেখা যাক তাহা হইলে। হয়ত আর একটু গেলে তাহাদের সন্ধান মিলিবে—"

আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে অরণ্যের এক বৃক্ষ-বহুল স্থানে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে যেন আকাশচুম্বী মহীরুহদল পরামর্শ করিয়া সমবেত হইয়াছে। অবর্ণনীয় গাম্ভীর্যে সমস্ত স্থানটা পরিপূর্ণ। শাখাপত্রের মধ্যে প্রবহমান বাতাসও যেন উচ্চ শব্দ করিতে সাহস করিতেছে না। মৃদু-মর্মর ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সহসা টাহা হর্ষ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম সে বর্শাটা ফেলিয়া দিয়া মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃহাও শুইয়া পড়িল। তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, তাহারা একটা দেবদারু গাছের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতেছে। আমিও কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর আমিও দেখিতে পাইলাম। দেবদারু শীর্ষে একটি শ্যেনপক্ষী বসিয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম কুলদেবতাকে ইহারা সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। আমার কি করা উচিত সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না। অপরের কুলদেবতাকে ইতিপূর্বে কখনও প্রণাম করি নাই। থানকু বলিয়াছিল করিলে আমাদের কুলদেবতা ব্যাঘ্র ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল, যখন শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়রূপে বসবাস করিব ঠিক করিয়াছি তখন ইহাদের কুলদেবতাকে অবহেলা করাও কি ঠিক হইবে? জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং শ্যেনপক্ষীটিকে প্রণাম করিলাম। অন্তরের অন্তস্থলে কিন্তু একটা অপমানের কাঁটা যেন খচখচ করিতে লাগিল, মনে হইল জোলমাকে পাইবার জন্য এই হীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই বৃহার প্রতি মন বিরূপ হইয়া উঠিল। মনে হইল বৃহা যেন আমাকে একটা উদ্ভট ফাঁদে ফেলিয়া আমার ধর্ম নষ্ট করিতেছে, আমার ব্যাঘ্র-দেবতাকে যেন শ্যেনপক্ষীর নিকট নতি স্বীকার করাইতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্যেনপক্ষী কর্কশ ভাষায় কি যেন একটা বলিয়া উড়িয়া গেল। দেখিলাম বৃহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, অপরাধীর মতো সে বারবার সেই উড্ডীয়মান শ্যেনকে প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার পর আমরা তিনজনেই তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বৃহার ভ্রূযুগল আবার একটু কম্পিত হইতে লাগিল। টাহার দিকে চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল—"কুলদেবতা হয়তো ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। চল উহাকেই আমরা অনুসরণ করি।"

...আমরা পূর্বদিকে যাইতেছিলাম, শ্যেনপক্ষীকে অনুসরণ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর চলিবার পর ছোট ছোট গাছের ঘন

জঙ্গল আরম্ভ হইল। সেই জঙ্গলের ভিতরই পথ করিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম, সহসা তিনজনকেই যুগপৎ থামিয়া যাইতে হইল। পশুরা চরিবার সময় ঘাস ছেঁড়ার যে রকম শব্দ হয় ঠিক সেইরকম শব্দ পাওয়া গেল। কাছেই ছিল কয়েকটা বড় গাছ। আমি একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। বুহা এবং টাহাও এক একটা গাছে উঠিল। গাছের শীর্ষদেশে উঠিয়া আমি একটা বন্য-মহিষকে দেখিতে পাইলাম। জঙ্গলের ঠিক ওপারেই তৃণাচ্ছাদিত একটা মাঠ রহিয়াছে। মাঠের ওপারে নদী। মাঠটা ঢালু হইয়া নদীর দিকে নামিয়া গিয়াছে। সেই ঢালুর উপর পুরুষ-মহিষটা চরিতেছে। ভীষণ-দর্শন স্বয়ং কালান্তক যম যেন! আশেপাশেই দলটাও আছে নিশ্চয়। বুহা এবং টাহাও মহিষ দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা তরতর করিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম মাটিতে নামিয়াই তাহারা আনন্দাবেগে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাদের কুলদেবতা ইঙ্গিতে তাহাদের যে ঠিক স্থানটিতে লইয়া আসিয়াছেন এই আনন্দেই তাহারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছিল। আমার দিকে ফিরিয়া বুহা আমাকে গাছ হইতে নামিতে ইঙ্গিত করিল। মনে হইল আমার প্রতি তাহার প্রসন্নতা যেন আর একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

...নিম্নকণ্ঠে তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। ঠিক হইল তিন দিক হইতে আক্রমণ করিতে হইবে। যে মাঠে মহিষগুলি চরিতেছে সেই মাঠ হইতে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার একটি পথ নিশ্চয়ই আছে। একাধিক পথও থাকিতে পারে, কিন্তু একটি পথ নিশ্চয়ই আছে, সেই পথ দিয়াই মহিষের দল জঙ্গল হইতে বাহির হয় এবং জঙ্গলে ঢোকে। আমাকে সেই পথটি আবিষ্কার করিয়া সেই পথের ধারে কুঠার হস্তে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। তাড়া খাইয়া মহিষের দল যদি জঙ্গলে ঢোকে আমি তাহাদের আক্রমণ করিব। টাহা পূর্ব-দিকে এবং বুহা পশ্চিমদিকে গিয়া নানারূপ শব্দ করিতে করিতে জঙ্গল হইতে বাহির হইবে। শব্দ শুনিয়া মহিষের দল তাহাদের আক্রমণ করিতে পারে, তখন তাহারা কুঠার ও বর্শা লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইবে। আক্রমণ না করিয়া মহিষেরা জঙ্গলে ঢুকিতে পারে, কিম্বা নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। জঙ্গলে আমি কুঠারহস্তে অপেক্ষা করিব, নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলে তিনজনে মিলিয়া তীর ছুঁড়িব। এই পরামর্শ করিয়া তিনজনে তিন-দিকে অগ্রসর হইলাম।

...মাঠের দিক হইতে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার পথটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ কিছু সময় লাগিল। পথের ধারেই কিন্তু বেশ একটি বড় গাছ পাওয়া গেল, আমি অবিলম্বে তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। উঠিয়া সানন্দে দেখিলাম গাছের একটি মোটা ডাল ঠিক পথের উপরই বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যদি মহিষরা এইদিকেই আসে গাছের ডালে বসিয়াই কুঠার চালাইতে পারিব, নীচে নামিতে হইবে না।

...গাছে উঠিয়া মহিষগুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। পুরুষ

মহিষটি সত্যই ভীষণ-দর্শন। কুঠারের আঘাতটা যদি সজোরে ঠিক উহার মাথার উপরে না পড়ে তাহা হইলে উহাকে কাবু করা যাইবে না। দুইটি মহিষী এবং দুইটি বাছুরও আছে দেখিলাম। বাছুরদের মধ্যে একটা যদি আসে এক আঘাতেই শেষ করিতে পারিব। মহিষী দুইটিও বেশ বলিষ্ঠ-কায়া। উহাদেরও সহজে কায়দা করা যাইবে না। মাথায়, কোমরে কিংবা পিছনের পায়ে মারিতে না পারিলে, অর্থাৎ এক আঘাতেই চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিতে না পারিলে অভিযান ব্যর্থ হইবে। অনেকদিন পূর্বে একবার মহিষের মাংস খাইয়াছিলাম, বড় ভাল লাগিয়াছিল। মহিষগুলির সুপুষ্ট কান্তি আমার রসনাকে লালায়িত করিয়া তুলিল। হঠাৎ বোহিলার কথা মনে পড়িয়া গেল। বোহিলাই আগুন জ্বালাইয়া মহিষের রাংটা ঝলসাইয়া দিয়াছিল। বোহিলার কালো মুখে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুইটা যেন মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। বোহিলা শুধু আমার নয়, আমাদের দলের সকলেরই প্রেয়সী ছিল। তাহার ক্ষুদে চোখে বিদ্যুৎ খেলিত। বোহিলার কথা ভাবিতে ভাবিতে লুব্ধ দৃষ্টিতে মহিষগুলিকে দেখিতেছিলাম। নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়াইতেছে। একটা মহিষী বোধ হয় প্রহরায় নিযুক্ত আছে। সে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। বৃহা বা টাহার কোনও সাড়াশব্দ নাই। মাঠটাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য গাছের আরও খানিকটা উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখি অরণ্য পশ্চিমদিকেও মাঠকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পূর্বদিক হইতে টাহার তাড়া খাইয়া মহিষের দল পশ্চিমদিকের জঙ্গলেও ঢুকিয়া পড়িতে পারে। পশ্চিমদিকে অবশ্য বৃহা আছে। কিন্তু বৃহার চীৎকার অগ্রাহ্য করিয়া কিম্বা বৃহাকে বিধ্বস্ত করিয়াও তো ঢুকিতে পারে। এই সম্ভাবনাতে মনটা বিষণ্ণ হইয়া গেল। বন্য মহিষের মাংস অনেক দিন খাই নাই, আমাদের ও অঞ্চলে ক্বচিৎ উহাদের দেখা মেলে। শুধু এইজন্যই যে বিষণ্ণ বোধ করিতেছিলাম তাহাও নয়, মনে হইতেছিল অদ্যকার এই অভিযানের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে আমি জোলমাকে পাইব কি না। বৃহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। যে কারণে সেদিন বৃহা আমাকে বিষধর শঙ্খচূড়ের মুখে পাঠাইয়াছিল ঠিক সেই কারণেই হয়তো আজ হিংস্র বন্য মহিষের সম্মুখে আনিয়াছে। যেমন করিয়া হোক আমাকে বিনাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য, আমার মধ্যে সে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বুঝিয়াছে আমাকে জীবন্ত রাখিলে তাহার চলিবে না। শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছি, বন্য মহিষদেরও যদি বধ করিতে পারি তাহা হইলে শক্তি পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইব। ইহার পরেও বৃহা হয়তো আরও নানাপ্রকার কৌশল করিবে—তা করুক, জোলমা আমার স্বপক্ষে আছে—আজ কিন্তু অন্তত একটা বন্য মহিষ শিকার করিয়া তাহার কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিব আশা করিয়া আসিয়াছিলাম। মহিষগুলি হয়তো পশ্চিমদিকের জঙ্গলে ঢুকিয়া হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে এই সম্ভাবনায় তাই বিমর্ষ বোধ করিতে লাগিলাম।

...অরণ্যের যে অংশটা মাঠের পশ্চিমদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সেই অংশটুকুই ভাল করিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম ওই অংশে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার কোনও পথ আছে কি না। বৃহা হয়তো এখনই ওই দিক হইতে বাহির হইবে। ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া হঠাৎ কিন্তু যাহা দেখিয়া ফেলিলাম তাহাতে শরীরের রক্তস্রোত ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল। দেখিলাম পশ্চিমদিকের জঙ্গলের যে অংশটুকু নদীর তীর পর্যন্ত আসিয়াছে, নদী ও অরণ্যের সেই সঙ্গমস্থলে, বিরাট একটি ব্যাঘ্র ওৎ পাতিয়া আছে। রৌদ্র ছায়া ও জঙ্গলের সহিত তাহার গায়ের রং এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, প্রহরারত মহিষী তাহাকে দেখিতে পায় নাই। গন্ধও পায় নাই, কারণ বাতাস উল্টা দিকে বহিতেছিল। দেখিলাম বাঘের লক্ষ্য ওই মহিষগুলি। বাঘ না হইয়া যদি অন্য কোনও জন্তু হইত আমি চীৎকার করিয়া বৃহা টাহাকে সাবধান করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু ব্যাঘ্র যে আমার কুলদেবতা! তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম এবং রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম পুরুষ মহিষটা চরিতে চরিতে বাঘের দিকেই আগাইয়া যাইতেছে। নিঃসংশয়ে অনুভব করিতে লাগিলাম যে, স্বয়ং কুলদেবতা যখন মহিষগুলি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছেন আমার আর কোন আশা নাই। আমার ভবিষ্যতের ছবিটাই যেন দেখিতে দেখিতে বদলাইয়া গেল। আজ যদি মহিষ-শিকারে ব্যর্থকাম হই বৃহার জয় হইবে। আমাকেই সে হয়তো এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করিয়া এখান হইতে দূর করিয়া দিবে। বলিবে এই বিদেশীর জন্যই মহিষ-দেবতা আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। বৃহার জয় হইবে, জোলমাকে আর পাইব না, একথা মনে হওয়ামাত্র শরীরের সমস্ত রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, রগের শিরাগুলি দপদপ করিতে লাগিল। গাছের উপর উঠিয়া চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিবার বাসনা না জাগিলে এ উভয়-সঙ্কটে পড়িতাম না। কৌতূহলের আতিশয্যে জীবনে অনেকবার বিপদে পড়িয়াছি, এবারও পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে অবশেষে তাহাই করিলাম নিরুপায় হইয়া তোমরা আজও যাহা করিয়া থাক। দেবতার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলাম। কুলদেবতা ব্যাঘ্রকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলাম, "তুমি স্বয়ং যখন দেখা দিয়াছ আমার আর কিছুই করিবার নাই। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই তুমি জান। তোমাকে বাল্যকাল হইতে পূজা করিয়াছি, চিরকাল পূজা করিব। তোমাকে চিরকাল রক্ষা করিয়াছি, চিরকাল রক্ষা করিব। আমার ভবিষ্যতের ভালোমন্দ সব তোমার হাতে অর্পণ করিতেছি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" আমার প্রার্থনার জন্য কি না জানি না, কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই বাঘ পুরুষ মহিষের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, দারুণ চীৎকার করিয়া মহিষটাও লাফাইল। পরমুহূর্তেই দেখিলাম বাঘ মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এবং মহিষ তাহাকে গুঁতাইবার জন্য মাথা নীচু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মহিষী দুইটিও মাথা নীচু করিয়া বাঘের দিকে ছুটিতেছে। নিমেষের

মধ্যে ভূপতিত বাঘ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিরাট গর্জনে অরণ্যভূমি প্রকম্পিত করিয়া পুরুষ মহিষটার ঘাড়ে প্রচণ্ড এক থাবা মারিল। মহিষ ছিটকাইয়া পড়িল, কিন্তু মরিল না। আবার ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণ করিল। মহিষী দুইটিও ইতিমধ্যে বাঘের পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে গুঁতাইতে শুরু করিয়াছিল। প্রচণ্ড গর্জন করিয়া বাঘ আবার শূন্যে লাফাইয়া উঠিল এবং অরণ্যের প্রান্ত ঘেঁষিয়া এমন জায়গায় আসিয়া বসিল যেখানে পিছন দিক হইতে মহিষরা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। মহিষের দল অর্ধ-বৃত্তাকারে মাথা নীচু করিয়া বাঘের দিকে আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঘ থাবা গাড়িয়া বসিয়া ল্যাজ আছড়াইতেছিল, সহসা আবার লাফাইয়া উঠিয়া পুরুষ মহিষটার পিঠে বসিয়া ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। মহিষ এক ঝটকায় আবার মাটিতে ফেলিয়া দিল তাহাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আবার লাফাইয়া উঠিল এবং এবার অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করিল একটা বাছুরকে। থাবার এক আঘাতে বাছুরটাকে বোধ হয় মারিয়াই ফেলিল, কারণ আর সে উঠিল না। পুরুষ মহিষটা একটু দূরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে গজরাইতেছিল। হয়তো আবার তাহাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হইত, কিন্তু আর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দেখিলাম বুহা বনের ভিতর হইতে বাঘকে লক্ষ্য করিয়া তাহার কুঠার উত্তোলন করিয়াছে। দেখিবামাত্র আমার মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বুহার হাতে আমার কুলদেবতার জীবন বিপন্ন দেখিয়া আমি ভুলিয়া গেলাম যে, আমি বুহার অতিথি, ভুলিয়া গেলাম যে বুহা জোলমার পিতা। আমার অতি-অতি-বৃদ্ধা-মাতামহী, যিনি ব্যাঘ্রমাংস আহার করিয়া ব্যাঘ্রকে আমাদের কুলদেবতা করিয়াছিলেন, যাঁহাকে আমি কখনও দেখি নাই—তিনিই সহসা যেন আমার অন্তরতম সত্তায় কথা কহিয়া উঠিলেন। সেই বন্যা ব্যাঘ্রিনী-রূপিনী নগ্না রাক্ষসীর আর্তকণ্ঠ যেন শুনিতে পাইলাম, "তোমার বংশমর্যাদা নষ্ট হইতেছে দেখিতেছ না? চুপ করিয়া বসিয়া আছ? চক্ষুর সম্মুখে তোমার বংশের প্রতীককে এমনভাবে লাঞ্ছিত হইতে দিবে? ও যে তোমার শত্রু, এখনও চিনিতে পার নাই? জোলমাকে পাইতে হইলেও যে উহাকেই নিপাত করিতে হইবে তাহা কি এখনও বোঝ নাই? এই সুযোগ, কুলদেবতাকে রক্ষা কর, জোলমাকে অধিকার কর, আত্মসম্মান বাঁচাও। ওঠ, ওঠ, ওঠ—"

আমার সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—ওঠ, ওঠ, ওঠ। নিমেষের মধ্যে আমি ধনুতে শর যোজনা করিলাম এবং পরমুহূর্তেই আমার বাণ বুহার মস্তক বিদীর্ণ করিল। ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় বুহা পড়িয়া গেল। বুহার আর্তনাদে সচকিত হইয়া বাঘ আবার লাফাইয়া উঠিল এবং বুহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বুহা তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল একবার, তাহার পরই থামিয়া গেল। বুহার চীৎকারে মহিষরাও ভীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা বুহাকে দেখিতে পাইল না।

বাঘ তাহাকে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আর একটা চীৎকার শুনিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ তাহারা পূর্বমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় চীৎকারটা টাহার। টাহা শুধু চীৎকার করে নাই, মহিষদের লক্ষ্য করিয়া সে বর্শাও নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঝড়ের বেগে ক্ষিপ্ত মহিষের দল তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। টাহাকে বাঁচাইবার জন্য এবার আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। যে বিবেক সেদিন আমার মধ্যে জাগরিত হইয়াছিল তাহারই আলোকে আমি সেদিন কর্তব্যের এক অভিনব মূর্তি দেখিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল কুলদেবতাকে রক্ষা করিবার জন্য বৃহাকে হত্যা করা যেমন আমার কর্তব্য, এই শিকার-অভিযানে ইহাদের আমি সাহায্য করিব এই প্রতিশ্রুতি পালন করাও তেমনি আমার কর্তব্য। এক ভাইকে হত্যা করিয়া আর এক ভাইকে বাঁচাইবার চেষ্টা তোমরা আজও কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছ না কি? আমিও সেদিনকার বিবেকের আলোকে তাহাই মনে করিয়াছিলাম। অকৃত্রিম আগ্রহ-সহকারেই আমি টাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

...দ্রুতবেগে বন হইতে বাহির হইয়া মাঠে পড়িলাম। মাঠে গিয়া দেখি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে টাহা ভূশায়ী হইয়াছে। আরও দেখিলাম টাহার বর্শা পুরুষ মহিষটার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিয়া তাহাকে অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে। বাঘের আক্রমণে সে ইতিপূর্বেই আহত হইয়াছিল, টাহার বর্শার আঘাত তাই আর সহ্য করিতে পারে নাই, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। টাহাকে ভূপাতিত করিয়াছিল একটি মহিষী। দ্বিতীয় মহিষীটি দূরে মৃতবৎসটিকে ঘিরিয়া নিষ্ফল আক্রোশে ঘুরিতেছিল। বৎসটি সম্ভবত তাহারই। আর একটা বাছুর আরও দূরে ছুটাছুটি করিতেছিল, মাঝে মাঝে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল। এ বাছুরটি নিতান্তই শিশু, এরূপ ভয়ংকর ঘটনা তাহার জীবনে ইতিপূর্বে বোধ হয় আর ঘটে নাই।

...টাহা ভূপাতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ থামায় নাই। সবেগে প্রস্তর-কুঠার চালাইতেছিল। আমি ছুটিয়া গিয়া পিছন দিক হইতে মহিষীর কোমরে সজোরে কুঠারাঘাত করিলাম। মহিষী সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িল। বসিয়া পড়িতেই কুঠারটা তুলিয়া লইয়া আবার তাহার মাথায় আঘাত করিলাম। টাহার কুঠারাঘাতে তাহার মুখের সম্মুখভাগটা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, আমার কুঠারাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল। টাহা নিজে কিন্তু সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল। মহিষী তাহার পেট চিরিয়া দিয়াছিল, অন্ত্রগুলা বাহির হইয়া ঝুলিতেছিল। বুঝিলাম সে আর বাঁচিবে না। আমাকে দেখিয়া মরণোন্মুখ টাহার মুখ আশায় আশ্বাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিলঃ

"বিদেশী, তুমি আসিয়াছ, তোমার ওই ছবি-আঁকা কুঠারখানা আমাকে

একবার দাও। ওটা দিয়া আমি একবার মহিষটাকে আঘাত করি। আহা, একটা ছবি-আঁকা কুঠার যদি আমার থাকিত মহিষ আমার কিছু করিতে পারিত না।"

আমি আমার কুঠারখানা তাহার হাতে দিতে মৃত মহিষীকে সে একবার আঘাত করিল। আঘাত করিতে গিয়া সে বুঝিল যে শরীরে শক্তি নাই, হাত উঠিতেছে না। তখন আমার দিকে করুণনেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "বিদেশী, ইহজন্মে আর তোমার নিকট ছবি-আঁকা বোধ হয় শেখা হইল না। চোখে অন্ধকার দেখিতেছি। আমাকে বাড়ি লইয়া চল। বৃহা কোথায়—"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আমি যে বৃহাকে বিনাশ করিয়াছি এ সত্য-কথা বলিবার সাহস ছিল না। বৃহা যে মারা গিয়াছে একথা বলিতেও বাধিতেছিল।

"বৃহা কোথায়?"

আবার টাহা প্রশ্ন করিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলাম, "বৃহা মারা গিয়াছে—"

"মারা গিয়াছে! শ্যেনবংশও এবার ধ্বংস হইবে। রাক্ষসী গো চক্রান্ত করিয়া এই সর্বনাশ করিল। বৃহা জানিত সে আর ফিরিবে না, আসিবার সময় একথা সে আমাকে বলিয়াছিল—"

আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা একটা নূতন ধরণের যুক্তি মনে হওয়াতে আশ্বস্তও হইলাম। বৃহাকে হত্যা করিয়া সত্যই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। কুলদেবতাকে রক্ষা করিবার জন্য কর্তব্য-বোধেই এই নৃশংস কার্য করিয়াছিলাম, মনের ভিতর কিন্তু কেমন যেন খচখচ করিতেছিল, মনে হইতেছিল এই অজুহাতে জোলমাকে অধিকার করিবার পথ সুগম করিবার জন্যই আমি এই কৃতঘ্ন আচরণ করিলাম। টাহার কথায় কিন্তু মনে হইল আমি হয়তো উপলক্ষ্যমাত্র, স্খলিতচরিত্র বৃহা নিজের মরণ নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে এবং তাহার সহায়ক হইয়াছে তাহার মা। মানসপটে সেই ছবিটা ভাসিয়া উঠিল—চন্দ্রালোকিত অরণ্যের আড়ালে উলঙ্গিনী মায়াবিনীর দল হামাগুড়ি দিয়া বাঘিনীর মতো নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছে। উহারাই বৃহার মৃত্যুর কারণ, আমি নয়। সহসা মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল। একটা ঘড়ঘড় শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমাকে দেখিয়া পুরুষ মহিষটা প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে আগুন ছুটিতেছে। যদিও তাহার নাক দিয়া গলগল করিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল, উঠিতে গিয়া যদিও মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল, তবু মনে হইল সে নিরস্ত হইবে না, প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া আমাকে আক্রমণ করিবেই। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া টাহার কুঠারটা লইয়া ছুটিয়া গেলাম এবং যেমন করিয়া কাঠ চেলায় তেমনিভাবে তাহার মাথার উপর কুঠার চালাইতে লাগিলাম। মাথা চৌচির হইয়া গেল। যে বাছুরটা দূরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল এই

দৃশ্য দেখিয়া সে এক ছুটে বনের ভিতর অন্তর্ধান করিল। যে মহিষী তাহার মৃতবৎসকে ঘিরিয়া আক্রোশে গর্জন করিতেছিল সে-ও সবেগে তাহার অনুসরণ করিল। উপর্যুপরি তিন তিনটি মৃত্যু দেখিয়া তাহারা বোধ হয় অনুভব করিল যে, আপাতত এখন রণে ভঙ্গ দিয়া আত্মরক্ষা করাই সমীচীন। কিন্তু বাছুরটি যে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না তাহা পরমুহূর্তেই দেখিতে পাইলাম। আমার কুলদেবতা ব্যাঘ্র বনের ভিতর হইতে আবার গর্জন করিয়া উঠিল এবং তাহার পরই দেখিতে পাইলাম মহিষ-শাবকটিকে মুখে লইয়া সে নদীর তীর-লগ্ন ঝোপের অন্তরালে এক লম্ফে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"ওটা কিসের গর্জন? বাঘের মনে হইল"—টাহা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল।

"বাঘেরই।"

"আমাকে বাড়ি লইয়া চল।"

আমি একটু মুশকিলে পড়িলাম। তিন তিনটি মৃত মহিষকে অরণ্যপ্রান্তে এমন অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে মন সরিতেছিল না। অন্য কোনও জন্তু আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। আর কেহ না আসুক, শকুনি গৃধিনী তো নিশ্চয় আসিবে। অথচ টাহার এই অনুরোধ রক্ষা না করিয়াও যে উপায় নাই। মরণোন্মুখ মানুষের শেষ ইচ্ছা পালন করা উচিত থানকু বলিয়াছিল। না করিলে প্রেতরূপে সে আসিয়া প্রতিশোধ লইবে। প্রত্যেক মানুষই যে মরিবার পর প্রেত রূপ ধারণ করে এ ধারণা আমাদের সকলের মনে বদ্ধমূল ছিল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমরা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছিলাম। ভক্তিতে নয়, ভয়ে। আমরা কি করিয়া যেন বুঝিয়াছিলাম যে আমাদের জীবন্ত পেশী-শক্তি বা বুদ্ধি ছাড়াও আর একটা এমন শক্তি আছে যাহা দেহাতীত, যাহা অদৃশ্যচারী, যাহা মৃত্যুর সহিত জড়িত এবং সেইজন্যই যাহা ভয়ঙ্কর। টাহা একটু পরেই মরিবে, মরিয়া এমন শক্তি লাভ করিবে যাহা মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি, যাহা আমার ভবিষ্যতকে নির্মাণ অথবা ধ্বংসও করিতে পারে।

"বিদেশী, আমাকে বাড়ি লইয়া চল—"

"এখনই লইয়া যাইতেছি—"

...মৃত মহিষগুলির একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলাম। আজকাল তোমরা যাহাকে 'তুক' বল আমাদের বিপদসংকুল জীবনে তখন তাহাই আমাদের সহায় ছিল। থানকুর নিকটেই জানিয়াছিলাম এবং অনেক সময় পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি যে, কুলদেবতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিলে অপহরণের আশঙ্কা থাকে না। আমার কুলদেবতা তো নিকটেই বনের মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহাকেই মনে মনে স্মরণ করিয়া বলিলাম—আমার জিনিসগুলি তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম, ফিরিয়া আসিয়া আবার যেন পাই। আমার অতি-বৃদ্ধা মাতামহী যিনি এই ব্যাঘ্রবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার মূর্তিও মনে মনে স্মরণ করিলাম। তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার কথা শুনিয়াছি। তাঁহার মূর্তি

কিরূপ ছিল আমাদের বংশের প্রত্যেকের মানসপটে তাহা অঙ্কিত আছে। সে মূর্তি মানবীর নয়, রাক্ষসীর, তাহা মানবী ও ব্যাঘ্রিনীর সমন্বয়। মানবীর দেহে ব্যাঘ্রিনীর মুণ্ড বসানো। হস্তপদের উপরাংশ মানুষের হস্তপদের মতোই, আঙ্গুলের স্থানে কিন্তু নখসমন্বিত থাবা। বক্ষ, উদর, ঊরু মানুষের মতোই, বুকে বিরাট দুইটা স্তনও ঝুলিতেছে, পশ্চাদ্দেশে কিন্তু ব্যাঘ্রপুচ্ছ। কুলদেবতার এই ভীষণ অস্বাভাবিক মূর্তিই আমরা কল্পনা করিতে শিখিয়াছিলাম। মনে মনে ইঁহাকেও স্মরণ করিলাম, বলিলাম এগুলিকে রক্ষা করিও। মনে হইল রাক্ষসী যেন হাসিল।

...টাহা আমার ছবি-আঁকা কুঠারটা দৃঢ়বদ্ধ দক্ষিণ মুষ্টিতে ধরিয়াছিল, মনে হইতেছিল, জীবনের শেষ কামনাটাকে জীবনের শেষ মুহূর্তে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। কিছুতেই আর ছাড়িবে না। তাহার অন্ত্রগুলা বাহির হইয়া আমার বুকের সম্মুখে দুলিতেছিল। আমি তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। তাহার কণ্ঠ হইতে ঘড়ঘড় করিয়া যে শব্দটা হইতেছিল, হঠাৎ সেটা থামিয়া যাইতেই বুঝিলাম, টাহা মারা গেল। তবু তাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিলাম। তাহার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না। ...বন-জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিয়াছি। যতক্ষণ বনের আড়ালে ছিলাম, বিশেষ কোন অসুবিধা ছিল না। উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া মুশকিলে পড়িলাম। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম, যখন আমার কাঁধের উপর পাখা ঝটপট করিয়া একটা শকুনি বসিল। ঠিক আমার কাঁধের উপর নয়, টাহার শবের উপর। বসিয়াই নাড়িভুঁড়িগুলা ধরিয়া টানাটানি শুরু করিয়া দিল। আমার হতে অস্ত্র ছিল, শকুনি তাড়াইতে বেগ পাইতে হইল না, কুঠারটা আস্ফালন করিবামাত্র উড়িয়া গেল। কিন্তু আস্ফালন বন্ধ করিবামাত্র আবার বসিল। ঘাড় তুলিয়া দেখিলাম, আকাশে অনেক শকুনি উড়িতেছে। দক্ষিণ হস্তে টাহার শবটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাম হস্তে কুঠার আস্ফালন করিতে করিতেই পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম। পিছনের দিকে দুইটা শৃগাল কলহ করিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলাম, একদল শৃগালও আমার অনুসরণ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া শৃগালের দল থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু পলাইয়া গেল না ; লুব্ধ দৃষ্টিতে টাহার মৃতদেহের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি কুঠারটা আস্ফালন করিতে যদিও একটু সরিয়া গেল, কিন্তু চলিয়া গেল না, তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাহাদের শাস্তি দিবার ক্ষমতা এখন আমার নাই। ...শকুনি এবং শৃগাল তাড়াইতে তাড়াইতে চলিয়াছিলাম। যে আমি একদিন নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে হত্যা করিয়া আহার করিয়াছি, যে-কোন প্রকারে হোক, যে-কোনও রকম মাংস সংগ্রহ করাই যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সে-আমি কালস্রোতে কোথায় হারাইয়া গিয়াছি। এতখানি বিপ্লব

সম্ভব হইয়াছে কি করিয়া? কে জানে!...

"বিদেশী, বিদেশী, তুমি কোথায়—"

জোলমার আকুল কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। শকুনির দল আবার আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কুঠার আস্ফালন করিতে করিতে আমি চীৎকার করিলাম—"আমি এখানে, বড় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি শীঘ্র এস—"

প্রান্তরের প্রান্তবর্তী জঙ্গল ভেদ করিয়া জোলমা ছুটিয়া বাহির হইল। জোলমার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সে যেন বুঝিতে পারিয়াছিল, কি ঘটিয়াছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সে কাছে আসিয়া পড়িল।

"ওকি, কাঁধে ও কে?"

"টাহা—"

"বুহা কোথায়?"

"বুহাকে বাঘে লইয়া গিয়াছে।"

"কোন্ দিকে গিয়াছিলে তোমরা?"

অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলাম।

"নদীর ধারে যে মাঠটা আছে, সেখানে তিনটি মৃত বন্য মহিষ পড়িয়া আছে দেখিতে পাইবে। সেই বনের পশ্চিম দিকে যে বন আছে, তাহারই ভিতর বাঘ বুহাকে লইয়া ঢুকিয়াছে।"

জোলমা আর অপেক্ষা করিল না, ছুটিয়া চলিয়া গেল।

...টাহা বুহার সমাধি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া হইয়াছে। বুহার দেহটা জোলমা জঙ্গল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল। ব্যাঘ্র দেবতা তাহার হাতের খানিকটা চিবাইয়াছিল মাত্র বাকি শরীরটা ঠিকই ছিল। মহিষ-শাবককে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া মনুষ্যশবের প্রতি বাঘের আর লোভ ছিল না সম্ভবত।

...টাহা বুহার মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া শ্যেনপক্ষী সমাজে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা মন্দীভূত হইয়াছে। নূতন একটা উত্তেজনা শ্যেনপক্ষী সমাজে নূতন একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছিল। বুহার মৃত্যুর পর কে দলপতি হইবে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে কিছুতেই স্থির হইতেছিল না। অনেকে বলিতেছিল শ্যেনপক্ষী সমাজের বৃদ্ধতম শিকারী খোতারি দলপতি হউক। আর একদল বলিতেছিল খোতারি ছবি আঁকিতে জানে না, সে দলপতি হইলে বল্‌গা হরিণ আর আসিবে না। বিতং চেষ্টা করিতেছিল যাহাতে সে দলপতি হয়। সে সকলকে আশ্বাস দিতেছিল যে যদিও সে ছবি আঁকিতে জানে না কিন্তু বল্‌গা হরিণের দলকে সে লাফাই পাহাড়ের শিখরে নিশ্চয়ই লইয়া আসিবে। ছবি আঁকিতে না জানিলেও হরিণকে ভুলাইবার মন্ত্র সে জানে। তৃতীয় আর একদল চাহিতেছিল ওহালি-কন্যা জোলমাই দলের নেত্রী হোক। কারণ প্রথমত সে বুহার কন্যা, দ্বিতীয়ত সে-ই প্রদীপ হস্তে এতকাল বুহার

ছবিতে আলোকপাত করিয়াছে। ওহালি যেমন বূহাকে ছবি-আঁকা শিখাইয়াছিল জোলমাও তেমনি কাহাকেও ছবি-আঁকা শিখাইবে। এ ক্ষমতা তাহার নিশ্চয় আছে। বূহা সেদিন সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছে যে জোলমা দেবী, শ্যেন সম্প্রদায়ের জন্য সে চিরকুমারীত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। তাহাকেই নেত্রীপদে বরণ করা উচিত।

...আমার সহিত মাত্র চারিটি লোকের পরিচয় হইয়াছিল। বূহা, টাহা, জোলমা এবং গো। বিতংকেও চিনিতাম। বূহা, টাহা মারা গিয়াছে। জোলমা এবং গো বূহা টাহার সমাধির পর আর গুহা হইতে নাকি বাহির হয় নাই। আমি আর তাহাদের দেখাই পাইতেছিলাম না। বিতংও আমাকে এড়াইয়া চলিতেছিল, যখনই সে বুঝিয়াছিল যে আমি জোলমার পাণিপ্রার্থী তখন হইতেই সে আমাকে এড়াইয়া চলিতেছিল। আমি সুতরাং একা একা শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। আমার মনের অভিপ্রায় কাহারও নিকট ব্যক্ত করি নাই, ব্যক্ত করিবার সাহসই ছিল না। ইহাদের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম—সকলেই আমাকে সম্ভ্রম করিতেছে। জিকাটু পাহাড়ের কাহিনী পল্লবিত হইয়া প্রচরিত হইয়াছে। সম্ভব টাহা এবং গো কাহিনীটি প্রচার করিয়াছে। যে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া বূহা টাহা মারা গেল, সে শিকার হইতে আমি যে জীবন্ত ও জয়ী হইয়া ফিরিয়াছি—রিক্ত হস্তে ফিরি নাই, তিনটি মৃত মহিষ লইয়া ফিরিয়াছি—এ ঘটনাও সকলকে আমার প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষত আমি স্বেচ্ছায় আমার হরিণের মুখ-আঁকা কুঠারটি টাহার সমাধিতে সমর্পণ করিয়াছিলাম বলিয়া সকলে আমার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া আমাকে খুবই সমীহ করিয়া চলিতেছে। আমি বিদেশী হইয়াও যে লাফাই পাহাড়ে আসিয়া শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করিতে ইচ্ছুক এবং আমার সে ইচ্ছা যে বূহা এবং গো উভয়েই সমর্থন করিয়াছে এ সংবাদও দেখিলাম গোপন নাই। লক্ষ্য করিলাম সকলেই ইহাতে আনন্দ প্রকাশও করিতেছে, এমন কি, টাহা যে গুহায় যে রমণী দল লইয়া বাস করিত সেই গুহায় সেই রমণী দল আমাকে থাকিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমাকে দলপতিরূপে কেহই কল্পনা করে নাই, তাহার কারণ প্রথমত আমি বিদেশী, দ্বিতীয়ত আমি ভিন্ন বংশীয়।

...আমি টাহার গুহায় যাই নাই। আমি সেই বনে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেই বৃক্ষকোটরে রাত্রিবাস করিতেছিলাম, স্বহস্তে শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতেছিলাম। আর অনন্যমনে চিন্তা করিতেছিলাম জোলমা আমাকে পরিত্যাগ করিল কেন, গো কোথায়...।

...সহসা একদিন শ্যেন সম্প্রদায়ের এলাহির সহিত দেখা হইল। দেখিলাম সে আমার বৃক্ষটাকে কেন্দ্র করিয়াই ঘুরিতেছে, কখনও কাঠ কুড়াইতেছে,

কখনও কোন গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতেছে। একটা বন্য শশককে তাড়া করিয়া কিছুদূর ছুটিয়া গেল আবার ফিরিয়া আসিল, আমার দিকে অপাঙ্গে দুই একবার চাহিয়া মৃদু হাসিল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না। বুঝিলাম আমার সহিত আলাপ করিতে চায়, কিন্তু তাহার ইচ্ছা আমিই আলাপটা শুরু করি। তরুণী এলাহি ইতিপূর্বেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি জোলমার কথা ভাবিয়া কোন নারীর প্রতিই মনোযোগ দিই নাই। ব্যাপারটা আমার নিজের নিকটই কেমন অস্বাভাবিক মনে হইতেছিল, কিন্তু মনে হইতেছিল এই অস্বাভাবিকতাকে আঁকড়াইয়া থাকাই জোলমাকে পাইবার একমাত্র উপায়। জোলমাও অস্বাভাবিক, তাহাকে অস্বাভাবিক উপায়েই লাভ করিতে হইবে। এলাহি আর একবার আমার দিকে চাহিল। মনে করিলাম শ্যেন সম্প্রদায়ের খবরটা ইহার নিকট জানিয়া লইলে ক্ষতি কি? তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলাম। ডাকবামাত্র সে ছুটিয়া পলাইল, পলাইতে পলাইতে পিছু ফিরিয়া চাহিল, ইচ্ছাটা আমিও ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করি। কিন্তু আমি তাহা করিলাম না। একটু পরে দেখি আবার সে পাশের ঝোপ ভেদ করিয়া উঁকি দিতেছে।

"শোন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের দলপতি কে হইবে, কিছু ঠিক হইল?"

"কিছু ঠিক হয় নাই। শুনিলাম গো যাহাকে ঠিক করিবে সে-ই হইবে। গো এখনও কিছু ঠিক করে নাই।"

"গো কোথায়?"

"এখনও সে গুহার ভিতরেই আছে। সে নাকি বৃহার প্রেতাত্মার সহিত পরামর্শ করিতেছে। বৃহা যাহাকে দলপতি করিতে বলিবে গো তাহারই নাম করিবে।"

"তাই না কি!"

"তাই তো শুনিতেছি। জানি না গো কাহার নাম করিবে।"

"গো-এর কথা সকলে মানিয়া লইবে?"

"নিশ্চয়। দেখ না, গো আমার কি দুর্দশা করিয়াছে। আমার কোন সন্তান হয় নাই সে কি আমার দোষ! গো সকলকে বলিয়া দিয়াছে আমার পেটে নাকি আগুন জ্বলিতেছে, তাই আমার সন্তানেরা পেটেই পুড়িয়া যায়। একথা শুনিবার পর কোনও পুরুষ আমার কাছে আসে না। শনকার সঙ্গে ভাব হইয়াছিল, কিন্তু গো নিজেই শনকাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে। গোকে কেহ অমান্য করিতে সাহস করে না। একটা কথা বলিতেছি গোকে বলিও না যেন। গো রাক্ষসী, ডাইনী—ওই শ্যেনবংশকে ছারখার করিবে। তিত্তির পাখী মারিলে কি হইবে, নিজের ছেলেগুলি তো একে একে সব মরিয়া গেল। আমি এবার যাই, আমার কাজ আছে—" ব্যস্ততার ভান করিয়া এলাহি চলিয়া যাইতে লাগিল, যাইতে যাইতে কয়েক-

বার পিছু ফিরিয়া চাহিল, আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। সহসা মনে হইল জোলমার খবর তো লওয়া হইল না।

"শোন—"

এলাহি আবার ফিরিয়া আসিল।

"জোলমা কোথায়? তাহাকেও তো বাহিরে দেখিতে পাই না আজকাল—"

"সে-ও গুহার ভিতরে আছে। বুহার শেষ ছবিটি শেষ হয় নাই, জোলমাই নাকি সেটি শেষ করিতেছে। বড় ভালো মেয়ে জোলমা, সত্যই দেবী। আমি তাহার প্রদীপের জন্য শ্যাওলা সংগ্রহ করিয়া আনি। জোলমা বলিয়াছে ইহার জন্য সে আমাকে একটা পুরস্কার দিবে।"

"কি পুরস্কার?"

"যাহা চাহিব তাহাই দিবে বলিয়াছে।"

"কি চাহিবে এখনও ঠিক কর নাই বুঝি?"

"না।"

মুচকি হাসিয়া এলাহি এবার একছুটে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, আর ফিরিল না।

...অন্ধকার অরণ্যে একা একা বৃক্ষকোটরে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পর্বত-দেবতার যে বাণী আমি সেদিন শুনিয়াছিলাম তাহার অর্থ কি আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছিল? তিনি সত্যই কি আমাকে আমার পুরাতন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন সমাজে বাস করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন? না, জোলমাকে দেখিয়া আমার মনের কামনা আমার কানে কানে ওই কথা বলিয়াছিল? জোলমাকে দেখিয়া আমি যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সহিত পর্বত-দেবতার আদেশ জড়াইয়া গেল কি করিয়া! নদীর কলধ্বনিতে আমি পর্বত-দেবতার আদেশ স্পষ্ট শুনিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। সহসা দেখিলাম অন্ধকার আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকান্ড একটা উল্কাপাত হইল। মনে হইল আকাশ হইতে আলোকরূপে পৃথিবীর দিকে ও কে ছুটিয়া আসিল? ও কি আবার আকাশে ফিরিয়া যাইবে? দেবতা কি আবার কোনও ইঙ্গিত করিলেন? নিস্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। বুহার মুখটা মনে পড়িল। সত্যই তাহার দৈবী শক্তি ছিল। সত্যই যদি সে নারী-সম্পর্ক-বিবর্জিত জীবন যাপন করিতে পারিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আরও অনেক শক্তির অধিকারী হইত। শিকার অভিযান হইতে সে যে আর ফিরিবে না তাহা সে জানিত, টাহাকে সেকথা বলিয়াছিল, নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও সে নিরস্ত হয় নাই। কেন হয় নাই? কর্তব্যবোধে, না ঘৃণায় অভিমানে স্বেচ্ছায় সে এই সমাজ ত্যাগ করিয়া গেল? প্রেতরূপে সে কি প্রতিশোধ লইবে!

অন্ধকারকে চিরিয়া একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল বুহাই বুঝি আমার প্রশ্নের উত্তর দিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম এবং প্রস্তর কুঠারটাকে চাপিয়া ধরিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম, ভয় হইতে লাগিল শব্দটা বুঝি মূর্তি ধরিয়া এখনই আমাকে আক্রমণ করিবে। পরমুহূর্তেই মনে হইল বুহাকে প্রস্তর তীর দিয়া নিধন করিয়াছি বটে, কিন্তু বুহার প্রেতকে প্রস্তর-কুঠার দিয়া হনন করিতে পারিব না। সহসা সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, কাতরভাবে আমার কুলদেবতাকে ডাকিতে লাগিলাম—হে দেবতা, তোমার জন্যই আমি বুহাকে বধ করিয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। পর্বত-দেবতার উদ্দেশে বলিতে লাগিলাম—হে দেবতা, তোমারই আদেশে আমি এদেশে বসবাস করিতে চাহিয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর।...

...ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আচমকা ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার গলায় কামড়াইয়া ধরিয়াছে! মানুষ! মাথায় চুল রহিয়াছে! মাথায় চুল রহিয়াছে! ছাড়াইতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। ধস্তাধস্তি করিতে করিতে দুইজনেই নীচে পড়িয়া গেলাম। তবু সে আমাকে ছাড়ে না, গাছের নীচে ঘন অন্ধকার, সেই অন্ধকারে প্রাণপণে তাহার গলার টুঁটিটা চাপিয়া ধরিতে তবে তাহার কামড় আলগা হইল, এক ঝটকায় তাহাকে দূরে ছুঁড়িয়া দিলাম। তাড়াতাড়ি গলায় হাত দিয়া দেখিলাম গলায় কোন ক্ষত হয় নাই, সমস্ত গলাটা লালায় পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে মাত্র। গাছের তলা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম, বাহিরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটিতেছে, গাছের তলায় যদিও নিবিড় অন্ধকার। কোথায় গেল সে? পরমুহূর্তেই দেখিলাম বিস্রস্ত-কেশা স্ফুরিতাধরা গো আমার দিকে সর্পিণীর মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে আছে।

"পুত্রহন্তা শয়তান! বুহাকে বাঘে খাইয়াছে আর যে-ই বিশ্বাস করুক, আমি করিব না। আমি তাহার মাথায় তীরের আঘাত দেখিয়াছি। এ তীর কার? বুহার মৃতদেহের পাশে এই তীর ছিল, জোলমা কুড়াইয়া আনিয়াছে। শ্যেন সম্প্রদায়ের তীরের গড়ন এমন নয়—"

বনের ভিতর হইতে একটা তীর আনিয়া গো সেটা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। রক্তাক্ত তীর। রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। তীরটার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, "উহা আমারই তীর। বাঘকে লক্ষ্য করিয়া আমি এই তীর ছুঁড়িয়াছিলাম।"

"মিথ্যা কথা। বুহা এখনই আসিয়াছিল, সে আমাকে সত্য কথা বলিয়া গিয়াছে। উঃ, কি আফসোস যে আমার একটাও দাঁত নাই, তোমার টুঁটিটা কামড়াইয়া ছিঁড়িতে পারিলাম না। কিন্তু বুহা বলিয়া গিয়াছে তুমি নিস্তার পাইবে না। কিছুতেই নিস্তার পাইবে না—হা হা হা হা—বুহা বলিয়া গিয়াছে তুমি কিছুতেই নিস্তার পাইবে না।..."

গো উন্মাদিনীর মতো হাসিতে হাসিতে নাচিতে লাগিল। আমি স্তম্ভিত

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বুহা আসিয়াছিল! আমার মনে হইল আত্মসমর্পণ করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নাই। আমি জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—"আমি বিদেশী, তোমাদের অনুমতি লইয়াই তোমাদের দেশে বাস করিয়াছি ; যথাসাধ্য তোমার আদেশ পালন করিয়াছি, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করি নাই, তবু যদি না জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি তাহার শাস্তি আমাকে দাও, মাথা পাতিয়া লইব"—সত্য সত্যই আমি মাথা পাতিয়া দিলাম। গো থামিয়া গেল। আমার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া ঝুঁকিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর আবার সহসা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"বুহা তোমার শাস্তি ঠিক করিয়া দিয়াছে। কি করিয়াছে জান? বুহাটা চিরকালই পাগল, সে বুঝিল না যে এটা শাস্তি না হইয়া পুরস্কার হইবে। সে তোমাকে শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি হইতে বলিয়াছে। বলিয়াছে দলপতি হইয়া তুমি গুহায় ছবি আঁকিবে আর চিরকুমারী জোলমা অন্ধকার গুহায় তোমার পাশে আলো ধরিয়া থাকিবে। অন্ধকার গুহায়, চিরকুমারী জোলমা —হা, হা, হা—"

আমি মুখ তুলিয়া বলিলাম—"আমি বুহার আদেশ পালন করিব।"

গো-এর চক্ষুর দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল। নিম্নকণ্ঠে ফিস ফিস করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল সে।

"বুহার নয়, আমার আদেশ পালন করিতে হইবে। বুহার আদেশে তুমি দলপতি হও আমার আপত্তি নাই, আমি কালই সে আদেশ ঘোষণা করিয়া দিব। কিন্তু আমার আদেশে তুমি জোলমাকে বিবাহ করিবে। জোলমা বুহার একমাত্র সন্তান, সে চিরকুমারী থাকিবে ইহা আমার পক্ষে অসহ্য। আমি তাহার কোলে শিশু দেখিতে চাই। অনেক শিশু—"

"কিন্তু বুহার প্রেতাত্মা যদি ইহাতে রুষ্ট হয়, যদি কোনও বিপদ ঘটে—"

"সে বিপদ তোমাকে বরণ করিতে হইবে। প্রতি মুহূর্তে সে বিপদের সম্ভাবনা সম্মুখে রাখিয়া আমার আদেশ তোমাকে পালন করিতে হইবে এই তোমার শাস্তি। তুমি রাজী আছ?"

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম।

গো আবার বলিল—"যদি রাজী না হও তোমার শাস্তি মৃত্যু। তুমি যে বুহাকে হত্যা করিয়াছ একথা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। বুহার মস্তকের আঘাতকে আর সকলেই ব্যাঘ্রদংশন ভাবিয়াছে, এমন কি জোলমা পর্যন্ত। আমি যদি আজ সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিই সকলে মিলিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। কেহই তোমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। বুহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া আমি নিজেই আজ তোমায় হত্যা করিতাম, কিন্তু আমার দাঁত নাই। আমার দন্তহীন মাড়ি দিয়া আমি তিত্তির পক্ষীর মুণ্ড ছিঁড়িয়া লইতে পারি, কিন্তু হায় হায়, তোমার কিছু করিতে পারিলাম না!

নিজে যদি তোমার রক্তপান করিতে পারিতাম আমার এই জ্বালা, এই অসহ্য জ্বালা, হয়তো খানিকটা কমিত। তাহা যখন হইল না তখন অপরকে দিয়া তোমাকে হত্যা করাইয়া কোনও সুখ হইবে না। বৃহার কথাই থাক, তুমি দলপতি হও, জোলমা তোমার ছবির পাশে আলো ধরুক আমার আপত্তি নাই। বৃহার বংশ কিন্তু লোপ পাইতে দিব না, কিছুতেই না, জোলমার কোলে শিশু দেখিতে চাই। বৃহার প্রেতাত্মা হয়তো ইহার প্রতিশোধ লইবে, হয়তো সে প্রতিশোধ অতি ভয়ঙ্কর এ কথা জানিয়াও যদি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী হও, কাল আমি তোমাকে দলপতি মনোনীত করিব। যদি রাজী না হও সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিব। সকলে যখন তোমাকে হত্যা করিবে তখনই তোমার রক্ত পান করিব।"

আমার, কেন জানি না, হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "আমার রক্ত পান করিলে যদি তোমার মনের জ্বালা কমে এখনই তোমাকে রক্তপান করাইতে পারি।"

"কিরূপে?"

আমার প্রস্তর ছুরিকা কাছেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ তর্জনীর অগ্রভাগে একটি ছিদ্র করিয়া দিলাম। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইল।

"এই যে—"

গো সাগ্রহে আমার আঙ্গুলটি মুখে পুরিয়া চুষিতে লাগিল। কিছুতেই ছাড়ে না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু ছাড়ে না। ক্রমশ আমার হাতটা যেন অবশ হইয়া আসিতে ল্যাগিল। এক ঝটকায় শেষে হাতটা তাহার মুখ হইতে খুলিয়া লইলাম। গো কিন্তু ইহাতে রুষ্ট হইল না। দেখিলাম, সে হাসিতেছে। চন্দ্রালোকে সেই রক্তাক্ত হাসি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—"আমি তৃপ্ত হইয়াছি।" গো সত্যই তৃপ্ত হইয়াছিল, খুশীও হইয়াছিল।

বলিল, "আনন্দ পাইলাম। বহুকাল আগে, বাল্যকালে একবার মনুষ্যরক্ত পান করিয়াছিলাম। আমার মা তাহার সতীনকে হত্যা করিয়া তাহার রক্ত পান করিয়াছিল, মায়ের সঙ্গে আমরাও করিয়াছিলাম ; যাক সে কথা, আমার প্রস্তাবে রাজী আছ কি না বল—"

গো উঠিয়া আসিয়া আমাকে চুম্বন করিল।

গো তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল।

পরদিন বৈকালে লাফাই পাহাড়ের উপত্যকায় সমবেত শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের সভায় গো ঘোষণা করিল—"গতরাত্রে আমি বৃহাকে দেখিয়াছি, বৃহার কথা শুনিয়াছি। বৃহা কাল তোমাদের দলপতিও নির্বাচন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহাকে নির্বাচন করিয়াছে সে তোমাদের দলের কেহ নয়, সে বিদেশী, সে ব্যাঘ্রবংশীয়।" গো-এরই নির্দেশ অনুসারে আমি একটি বৃহৎ পর্বতের

অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সব শুনিতেছিলাম। ইহার ঠিক পরেই গো যাহা বলিল তাহাতে চমৎকৃত হইলাম। যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে এমন সুন্দর-ভাবে যে কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহা আমার ধারণার অতীত ছিল। গো-এর কল্পনাশক্তিকে প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। তখন এটা কল্পনা-শক্তি বলিয়াও আমার মনে হয় নাই, আমার মনে হইতেছিল কোন এক অদৃশ্য শক্তি বুঝি গো-এর উপর ভর করিয়া অনিবার্য ঘটনাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতেছে। এবং সে অদৃশ্য শক্তি হয়তো আমার কুলদেবতার!

গো বলিল—"বৃহা বলিয়াছে, 'দেবতার ইচ্ছা এবার ব্যাঘ্র সম্প্রদায়ের কেহ আমাদের দলের নেতৃত্ব করুক। তাই তিনি ব্যাঘ্ররূপে আসিয়া আমাকে নিধন করিয়াছেন। দেবতার ইচ্ছা যে শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি চিত্রাঙ্কন করিয়া দেবতার আরাধনা করুক, তবেই তিনি তুষ্ট হইয়া আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে ঠিক এমনি একটি বিদেশী কিছু দিন পূর্বে আসিয়াছেন। তিনি একাধারে ব্যাঘ্রবংশীয় এবং চিত্রশিল্পী। আমার ইচ্ছা তিনিই এবার শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি হউন। আমি যখন বাঁচিয়াছিলাম তখনই তিনি আসিয়াছিলেন। জিকাটু পাহাড়ে নাগরাজ শঙ্খচূড়কে হত্যা করিয়া তিনি অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বন্য-মহিষ শিকারেও তাঁহার কৃতিত্ব যে কম নয় তাহা সকলেই জানে। তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি, তিনি শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি হউন। জোলমা তাঁহারই পার্শ্বে প্রদীপ ধরিয়া তাঁহার ছবিতে আলোকপাত করুক। তিনি যদি ইচ্ছা করেন জোলমাকে বিবাহও করিতে পারেন। বিবাহ করিবার কোন বাধা আর নাই। জোলমা যতদিন আমার পার্শ্বে প্রদীপ ধরিয়া ছিল ততদিনই তাহার কুমারী থাকার সার্থকতা ছিল। এখন আমি নাই, সে সার্থকতাও নাই। পিতা অবর্তমানে স্বামীই নারীর রক্ষক। ওই বিদেশী শিল্পী জোলমাকে বিবাহ করুক ইহাই আমার ইচ্ছা।' কাল রাত্রে বৃহা যেসব কথা বলিয়াছে তাহা তোমাদিগকে সবিস্তারে বলিলাম, এখন তোমাদের যদি কিছু বলিবার থাকে বলিতে পার।"

গো সভার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমস্ত সভা নীরব। আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইল। ভাবিলাম অসম্ভব বোধ হয় সম্ভব হইবে। সহসা বিতংয়ের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

"দলপতি বৃহার যদি ইহাই নির্দেশ হয় তাহা আমরা নিশ্চয় মানিব। জিকাটু পাহাড়ের সম্বন্ধে কিন্তু আমার একটু বক্তব্য আছে। আমার বিশ্বাস নাগরাজ শঙ্খচূড়কে বিদেশী হত্যা করিতে পারে নাই। সে ওই পর্বতগুহার মধ্যে বন্দী হইয়া আছে। কাল আমি জিকাটু পাহাড়ে গিয়াছিলাম, গুহার মুখে যে পাথরটা আছে সেখানে কান পাতিয়া শুনিলাম, শঙ্খচূড় এখনও সেখানে তর্জন করিতেছে। মহিষ-শিকার অভিযানেও বিদেশীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। টাহার অস্ত্রই মহিষীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিল। মহিষ এবং মহিষ-শাবকটিকে হত্যা করিয়াছে বাঘ। বিদেশীর

বীরত্বের বিশেষ পরিচয় ইহাতে নাই।"

বিতং থামিয়া গেল। গো-এর চক্ষু স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছিল।

গো বলিল—"শঙ্খচূড় যদি না মরিয়া থাকে তাহাকে মারিবার দায়িত্ব বিদেশী লইবে। মহিষ শিকার করিতে বৃহা গিয়াছিল, বিতং যায় নাই। বৃহার কথাই আমি বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি। আর কাহারও কিছু বলিবার আছে?"

বৃদ্ধ খোতারি উঠিয়া বলিল—"দলপতি বৃহার আদেশ আমি নতশিরে মানিয়া লইলাম। আগন্তুক বিদেশীই আমাদের দলপতি হোক।"

গো-এর নির্দেশেই আমি বৃহার গুহায় একা বসিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশা করিতেছিলাম জোলমা এবার আসিবে। বৃহার মৃত্যুর পর তাহার সহিত একবারও দেখা হয় নাই। আমি দলপতি নির্বাচিত হইলাম, জোলমার সহিত আমার বিবাহ হইবে ঠিক হইয়া গেল, কিন্তু জোলমা তো এখনও আসিল না। কোথায় সে? ...গো-এর কুকুরটা অবিরাম ডাকিতেছিল। গো তাহার নাগালের বাহিরে অথচ দৃষ্টির সম্মুখে একটি তিত্তির পক্ষী বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল। বলিয়া গিয়াছিল সে লাফাই পাহাড়ে যাইতেছে, আমার বিবাহের আয়োজনের জন্যই যাইতেছে; রাত্রে আর ফিরিবে না। এখানে বিবাহের নিয়ম কেমন কে জানে। আমাদের ব্যাঘ্র-সমাজে বিবাহ হয় পরিবর্তন করিয়া। আমার দশটি ভগ্নীর পরিবর্তে আমি দশটি স্ত্রী পাইয়াছিলাম। আমার ভগ্নীগুলিকে যাহারা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের ভগ্নীরাই আমার স্ত্রী হইয়াছিল। আমার, মানে অবশ্য আমাদের গোষ্ঠীর সকলের। জামাইকিনাকে কেবল আমি একটি কুঠারের বদলে পাইয়াছিলাম। ইহাদের বিবাহের নিয়ম কিরূপ? ইহারাও তো কেহ এক-পত্নীক নয়। একাধিক পুরুষের সংশ্রবে আসাও ইহাদের নারীদের পক্ষে দোষাবহ নয়, পুরুষরা শ্যেনপক্ষী না হইলেই হইল। জোলমা কি একাধিক পুরুষকে প্রশ্রয় দিবে? জোলমা কোথায়! সহসা মনে হইল জোলমা বোধ হয় আর আসিবে না। আমার মিথ্যাচরণ ও গো-এর চক্রান্ত বোধ হয় সে টের পাইয়া গিয়াছে। সে হয়তো তাহার ময়ূরবাহিনীর পিঠে চড়িয়া বৃহার খোঁজে ওহালির দেশে চলিয়া গিয়াছে। কল্পনা করিতে লাগিলাম যেন পাশাপাশি সার বাঁধিয়া ময়ূরদল উড়িয়া চলিয়াছে, তাহাদের পিঠের উপর বসিয়া আছে জোলমা। ময়ূর মানুষকে বহন করিতে সক্ষম কি না এ প্রশ্ন মনে জাগিল না। সেই অন্ধকার গুহায় একা বসিয়া এই অসম্ভব কল্পনায় অনেকক্ষণ মগ্ন হইয়া রহিলাম। পক্ষ-বিধূননের শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম সহসা। মনে হইল ময়ূরের দল বুঝি নিকটবর্তী হইয়াছে। কুকুরের চীৎকারে পরমুহূর্তেই কিন্তু ভুল ভাঙিল, বদ্ধ তিত্তিরপাখীটাই পাখা ঝটপট করিতেছে। এই অদ্ভুত

পরিবেশে এমন করিয়া আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিব? ইচ্ছা করিতেছিল বনে ফিরিয়া গিয়া আবার আমার সেই বৃক্ষকোটরটিতে বসিয়া থাকি। কিন্তু গো-এর আদেশ অমান্য করিতে সাহস হইতেছিল না, ভয় হইতেছিল চলিয়া গেলে হয়তো কোনও অঘটন ঘটিয়া যাইবে। গো-কে আর সামান্য মানবী বলিয়া উপেক্ষা করিবার সাহস ছিল না, দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম সে মানবী নয়, পিশাচী। অসম্ভবকে সে সম্ভব করিতে পারে তাহার প্রমাণ তো প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বৃহার হত্যাকারী জানিয়াও আমাকে সে শ্যেনপক্ষী সমাজের দলপতি করিয়া দিল। যে জোলমাকে পাইবার জন্য আমি এত কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছি, আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাধা বৃহাকে হত্যা করিয়াও যে জোলমাকে আমি আয়ত্তাধীন করিতে পারি নাই, গো অবলীলাক্রমে সেই জোলমার সহিত আমার বিবাহের আয়োজন করিয়া ফেলিল। কিন্তু কেন? আমার প্রতি এত সদয় হইবার কি হেতু আছে তাহার? ছিন্ন তিত্তিরমুণ্ডের আকাশমুখী দৃষ্টিতে এমন কি সূচিত হইয়াছিল যাহা পুত্রহত্যার অপরাধকেও লঘু করিয়া দিতে পারে? কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, সেইজন্যই ভয় করিতেছিল, গো-এর নির্দেশ অমান্য করিয়া অন্যত্র যাইবার মতো সাহস পাইতেছিলাম না, মনে হইতেছিল গুহা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে হয়তো...সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে কিন্তু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সমস্তটাই আমাকে হত্যা করিবার একটা ষড়যন্ত্র নয় তো? মিথ্যা সভা করিয়া হয়তো আমাকে ভুলানো হইয়াছে, হয়তো আমাকে একটা বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে (হয়তো বা বৃহার এই গুহাতেই) বিশেষ লোক দিয়া হত্যা করা হইবে। আজ হয়তো সেই দিন, গো আমাকে বসাইয়া সেই বিশেষ হত্যাকারীদের ডাকিতে গিয়াছে। নিস্তব্ধ উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিত্তির পক্ষীর পক্ষবিধূনন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সে আর থামিতেছে না। প্রলুব্ধ কুকুরটার চীৎকার অন্ধকারকেই যেন দংশন করিয়া চলিয়াছে। মনে পড়িল আমাদের সমাজে একবার এইরূপে একটা লোককে হত্যা করা হইয়াছিল। পার্মা যে বৃক্ষতলে কিকনকে খুন করিয়াছিল ঠিক সেই বৃক্ষতলেই কিকনের আত্মীয়রা পার্মাকে হত্যা করে। পার্মাকে সেই বৃক্ষতলে গভীর রাত্রে ভুলাইয়া আনিয়াছিল পার্মার প্রণয়িনী বোহিলা, আমার স্ত্রী বোহিলা। আমিও সে ষড়যন্ত্রে ছিলাম। পার্মা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলিয়াই আমি তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছিলাম। গো বিতংকে ডাকিতে গিয়াছে না কি? কুকুরটা বেশি জোরে ডাকিয়া উঠিল। বাতাসে ভাসিয়া আসিল একটা তীব্র গন্ধ, মাংস পোড়া গন্ধ, গো গুহার পিছনে বসিয়া তিত্তির পোড়াইতেছে না তো? হয়তো পিশাচী আমার নিধনের জন্যই কোনও মন্ত্র পাঠ করিতেছে। অন্ধকার গুহায় এমনভাবে একা দাঁড়াইয়া থাকা আর নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না, গা ছমছম করিতে লাগিল। বাহির হইয়া যাইতেছিলাম অকস্মাৎ একটা আলোক-রেখা আসিয়া অন্ধকারকে বিদ্ধ করিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, লম্বা গুহার

দক্ষিণ প্রান্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, আলোটা যেন ভূগর্ভ হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে। পরমুহূর্তেই দেখিলাম, জোলমা প্রদীপ হস্তে ভূগর্ভ হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। গুহার দক্ষিণ প্রান্ত যে ভূগর্ভে নামিয়া গিয়াছে তাহা আমার জানা ছিল না। নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জোলমা প্রদীপ হস্তে আমার দিকেই আগাইয়া আসিল। যে গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ডের উপর খাবার রাখিয়া আমি প্রথম দিন বৃহার সহিত আহার করিয়াছিলাম সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রদীপটি রাখিয়া জোলমা আমার মুখের দিকে চাহিল। অদ্ভুত সে চাহনি। বিষণ্ণ কিন্তু শান্ত। তাহাতে কোনও উষ্মা নাই, হিংসা নাই, এমন কি, শোকের উগ্রতাও নাই। মনে হইল সে সব জানে, কিন্তু সব ক্ষমা করিয়াছে, নিয়তির অমোঘ বিধানকে অনিবার্য জানিয়াই সে তাহা মানিয়া লইয়াছে, এজন্য কাহারও উপর তাহার যেন রাগ নাই। জোলমার অঙ্গে কোনও আবরণ ছিল না, আলুলায়িত কেশভার পৃষ্ঠে লুটাইতেছিল। শান্তভাবে আমার দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার নীল নয়নে একটা প্রচ্ছন্ন মিনতি নীরব ভাষায় কি যে বলিতে চাহিল বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক মুহূর্ত পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাকেই শেষে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল।

"সব কথা শুনিয়াছ?"

"শুনিয়াছি।"

"তোমার কি কিছু বলিবার আছে?"

"আমার বক্তব্য অনেক পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি। তোমার মতো বীরের সঙ্গিনী হইতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব। কিন্তু আমার শ্যেন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য আমাকে চিরকুমারী থাকিতে হইবে। বৃহা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃহার নির্দেশ চলিয়া যায় নাই। তাহার ইচ্ছা, তাহার আদেশ আমার মনে সর্বদা জাগরূক আছে। বিদেশী, তুমি গুহার প্রাচীর নব নব চিত্রে অলঙ্কৃত কর, আমি তোমার পার্শ্বে আলো ধরিয়া ধন্য হই, কিন্তু তুমি শপথ কর যে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না—"

"কিন্তু গো যে বলিল—"

"গো মিথ্যা কথা বলিয়াছে। গো শিশু ছাড়া আর কিছু চায় না। তাহার ধারণা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইলেই বুঝি শ্যেনপক্ষী সমাজ উন্নতি করিবে। বৃহার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। আমার ধারণাও অন্যরূপ। সকলের অগোচরে আমাদের সহিত গো-এর একটা নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সেই দ্বন্দ্বের ফলেই বৃহা প্রাণ হারাইয়াছে। হয়তো আমিও হারাইব। কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নই। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, বৃহার ইচ্ছা এখনও ফলবতী হইবে। বল, তুমি কি আমার সহায় হইবে?"

সেই অসভ্যযুগে যুবতী নারীর মুখে এরূপ উক্তি যে কত অশোভন তাহা

তোমরা যেমন অনুভব করিতেছ, আমিও তেমনি অনুভব করিতেছিলাম। প্রথম হইতেই বৃহা এবং জোলমার চরিত্র, আচরণ, কথাবার্তা আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল। আমি বরাবরই ভাবিয়াছিলাম, বৃহা হয়তো নিজের স্বার্থের জন্য জোলমাকে অন্য কোন পুরুষের সংশ্রবে আসিতে দিতে চাহিতেছে না। বৃহার ভয়ে জোলমাও চিরকুমারী থাকিতে চাহিতেছে, বৃহার অবর্তমানে তাহার মত পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু এখনও জোলমা একথা বলিতেছে কেন? তাহার প্রশ্নের উত্তরে কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, নির্বাক বিস্ময়ে শুধু চাহিয়া রহিলাম। এখন মনে হয় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ক্ষণকালের জন্য চাঁদ উঁকি দিয়া যেমন অন্তর্হিত হয়, সেই অন্ধকার অসভ্য-যুগের মধ্যেও তেমনি বর্ণবহুল একটা সুন্দর সভ্যযুগ কিছুদিনের জন্য আসিয়া আবার অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বৃহা জোলমা সেই যুগের প্রতীক। আমরা তাহাদের বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু আমি অন্তত প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও পারি নাই। জোলমাকে পাইবার আশায় নারীসঙ্গ বর্জন করিয়া আমি কঠিন সংযমে নিজেকে সম্বৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম। গো-এর কুহকিনীরা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, এলাহির ইঙ্গিতও আমি অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার পুরস্কার পাইব। জোলমা নিশ্চয়ই আমার বাহু-পাশে ধরা দিবে। কিন্তু জোলমা এ কি বলিতেছে!

"বল, তুমি আমার সহায় হইবে?"

জোলমা পুনরায় প্রশ্ন করিয়া সোৎসুক নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "কিন্তু গো যদি তোমার কোলে শিশু না দেখিতে পায় আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ছলে বলে কৌশলে সে আমাকে সংহার করিবে। তোমার কোলে শিশু আসিবে এই আশাতেই সে আমাকে দলপতি করিয়াছে, এই আশাতেই তোমার সহিত বিবাহ দিতেছে—"

জোলমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "গো-এর আশা অপূর্ণ থাকিবে না। তাহাকে আমি শিশু দিব।"

"কিরূপে? তুমি যে চিরকুমারী থাকিতে চাও।"

"দেবতা যদি ইচ্ছা করেন কুমারীর কোলেও শিশু আসিতে পারে। বৃহা আমাকে বলিয়াছিল যে দেবতা শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়কে সন্তান দান করেন, তিনি আমাদের অরণ্যেই থাকেন। অরণ্যপ্রান্তবর্তী বিশাল দেবদারু বৃক্ষে তাঁহার বাস। ওহালি একটি পাথরে ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সেই পাথর লইয়া দেবদারু বৃক্ষের নিকট অন্ধকার রাত্রে গিয়া কোন কুমারী যদি সন্তান প্রার্থনা করে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।"

"কোথায় সে পাথর?"

"আমার কাছে আছে।"

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। আমার চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় অবিশ্বাস

ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

জোলমা বলিল, "দেখিবে?"

"কোথায় আছে?"

"আমার সঙ্গে এস।"

জোলমা প্রদীপটি তুলিয়া লইল। আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়া ভূগর্ভে অবতরণ করিলাম। মাটির নীচে যে এত বড় একটা গুহা আছে বাহির হইতে তাহা কল্পনা করা যায় না। আমি কিন্তু বিস্মিত হইয়া গেলাম গুহা দেখিয়া নয়, গুহার গায়ে ছবির সারি দেখিয়া। জীবন্ত বলগা হরিণের দল যেন সারি দিয়া চলিয়াছে। নানা ভঙ্গীর বলগা হরিণ। কেহ ছুটিতেছে, কেহ বসিয়া আছে, কাহারও পিঠে তীর বিঁধিয়া আছে...

"সব বুহার আঁকা?"

"ওহালিও আঁকিয়াছে কিছু। আসলে সবই ওহালির।"

"আমি এমন সুন্দর করিয়া আঁকিতে পারিব কি?"

"তুমি তো আঁকিবে না, ওহালি আঁকিবে। তুমি যদি নিজেকে পবিত্র রাখিতে পার ওহালি তোমার মধ্যে আসিবে, তোমার হাত দিয়া ওহালিই ছবি আঁকিবে।"

"কেমন করিয়া নিজেকে পবিত্র রাখিব?"

"ওহালি মানুষ ভালবাসে। তুমি যত কম পশু হইবে, ওহালি তত তোমার কাছে আসিবে।"

জোলমার বিষণ্ণ মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সশঙ্ক হাসি। তাহার যেন আশঙ্কা হইতেছিল তাহার এই অদ্ভুত অনুরোধ আমি রাখিতে পারিব কি না।

"তোমার সে পাথর কোথায়?"

জোলমা প্রদীপ লইয়া গুহার এক প্রান্তে চলিয়া গেল, আমি অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল যেন বলগা হরিণের দল অন্ধকারে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দ্রুত লঘু পদশব্দ যেন শুনিতে পাইলাম, তাহারা যেন ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে, পুরুষ হরিণটা কি ডাকিয়া উঠিল? প্রদীপের আলো দেখা গেল আবার। চাহিয়া দেখিলাম দেওয়ালের বলগা হরিণদের চোখে-মুখে যেন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আবার ছবি হইয়া গিয়াছে।

"এই দেখ—"

দেখিলাম জোলমা বহুবর্ণ-বিচিত্র একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ড হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাথরের গায়ে নানা বর্ণের নানা পরিধির অনেক বৃত্ত আঁকা, বৃত্তগুলিকে ঘিরিয়া সরল ও বক্ররেখার বহু বিচিত্র জটিলতা। মনে হইল ওই ছোট পাথরটির উপর শিল্পী যেন রেখার সাহায্যেই সৃষ্টি-রহস্য ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে। বহুবর্ণের বিবিধ সমন্বয়ে কি এক নিগূঢ় ইঙ্গিত যেন

পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

"এ কি ওহালির আঁকা?"

"বৃহার মুখে তাহাই শুনিয়াছি।"

"এ পাথর লইয়া কেহ কি দেবদারু বৃক্ষের নিকট গিয়া সন্তান পাইয়াছে?"

"এ পাথর আমারই জন্য ওহালি রাখিয়া গিয়াছে। আমি যদি কোন দিন সন্তান কামনা করি, পাইব। এ পাথর আর কেহ ব্যবহার করে নাই, করিলেও বোধ হয় ফল ফলিবে না। ওহালিই বৃহাকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল আমি যেন চিরকুমারী থাকি। হয় তো সে আশংকা করিয়াছিল যে গো একদিন আমার নিকট সন্তান দাবী করিবে, তাই এই পাথর বৃহাকে সে দিয়া গিয়াছে। গো যদি আমার কোলে শিশু দেখিতে চায় দেখিতে পাইবে, সেজন্য তুমি চিন্তিত হইও না। তুমি কেবল আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে তুমি আমার অংগ স্পর্শ করিবে না।"

"দিলাম।"

আমার ভিতর হইতে আর একজন কে যেন কথা বলিল। পরক্ষণেই কিন্তু আবার আমি সুস্থ হইলাম। বলিলাম—"আমি কিন্তু সংযম করিতে অভ্যস্ত নই। এতদিন আমি যে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে সংযমের কোনও স্থান ছিল না। জানি না, এরূপ অস্বাভাবিক অনভ্যস্ত জীবন যাপন করিতে পারিব কি না। চেষ্টা করিব।"

জোলমার বিষণ্ণ চোখে আবার একটু হাসির আলোক আভাসিত হইল।

"চেষ্টা কর। নিতান্তই যদি না পার, অন্য কাহাকেও বিবাহ করিও ঃ একাধিক স্ত্রী তো সকলেরই আছে।"

"আবার কাহাকে বিবাহ করিব?"

"আমিই বাছিয়া দিব।"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জোলমা আমার মধ্যে কি দেখিতেছিল জানি না, কিন্তু আমি তাহার মধ্যে এক অসীম করুণাময়ী নারীকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল আমাকে খঞ্জ জানিয়াও সে আমাকে দুরারোহ পর্বত-শিখরে আরোহণ করিতে উৎসাহ দিতেছে, প্রয়োজন হইলে সে আমাকে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছে, কিন্তু শিখরে আমাকে সে লইয়া যাইবেই। ইহাতে তাহার নিজের কোন লাভ নাই, লাভ আমার, শিখরে উঠিয়া আমিই বিরাট দিগ্বলয় দেখিতে পাইব। পর্বত-শিখরের উপমাটা মনে পড়িল, কারণ সত্যই এক বলিষ্ঠা নারী একদা আমাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া পর্বত-শিখরে লইয়া গিয়াছিল আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। পর্বত-শিখরে উঠিয়া চক্রবাল-রেখার সুদূরপ্রসারী মহিমা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। সেই বলিষ্ঠা নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছিলাম। বলিষ্ঠা নারীটি আর কেহ নয়, আমারই মা। আমি ভয়ে পাহাড়ে উঠিতে চাহিতাম না, মা-ই আমার ভয় ভাঙাইয়া দিয়াছিল। জোলমা আমাকে কোন্ পর্বত-শিখরে লইয়া যাইতে

চায় ?...

"চল।"

আবার জোলমাকে অনুসরণ করিয়া ভূগর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া আসিলাম। কুকুরের চীৎকার এবং তিত্তিরের পক্ষ-আক্ষেপ তখনও নৈশ-নীরবতাকে ক্ষুব্ধ করিতেছিল। পোড়া মাংসের গন্ধটাও উগ্রতর হইয়াছে মনে হইল।

"মাংস কোথায় পোড়ান হইতেছে?"

"লাফাই পাহাড়ে। সেদিন সহস্রাধিক হরিণ মরিয়াছে। তাহাদের মাংস আগুনে সেঁকিয়া ফুটন্ত চর্বিতে ভিজাইয়া রাখা হইতেছে। মাংসের অভাব ঘটিলে ওই মাংস কাজে লাগিবে। তা ছাড়া, কাল আমাদের বিবাহ, সেজন্যও বোধ হয় কিছু আহারের আয়োজন হইতেছে।"

"এখানে বিবাহ কিরূপে হয়?"

জোলমা হাসিয়া বলিল, "দেখিতেই পাইবে। আমার হাতটা কিন্তু কিছুতেই ছাড়িও না, ছাড়িয়া দিলেই বিবাহ পণ্ড হইবে।"

পরদিনই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

লাফাই পাহাড়ের উপত্যকায় শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের সকলে সমবেত হইয়াছিল। অনেকেই দেখিলাম সশস্ত্র হইয়া আসিয়াছে। গো আমাকে লইয়া উপত্যকার প্রান্তদেশে উপস্থিত হইল। বামহস্তে গো একটি জীবন্ত শ্যেনপক্ষীকে ধরিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার কানে কি বলিতেছিল। উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া সে আমার কানে কানে বলিল, "তুমি ছুটিয়া গিয়া জোলমার হাতটা বাম হাত দিয়া চাপিয়া ধর, আর দক্ষিণ হস্ত দিয়া চাপিয়া ধর তোমার কুঠারটা। জোলমার হাত চাপিয়া ধরিলেই অনেকে তোমাকে আক্রমণ করিবে, তুমি তখন কুঠার দিয়া আত্মরক্ষা করিও। জোলমার হাত কিন্তু ছাড়িও না।"

দেখিলাম নানাবর্ণে চর্চিত বহু যুবতী একস্থানে বসিয়া হাসাহাসি করিতেছে। জোলমাও তাহাদের মধ্যে আছে। তাহার সর্বাঙ্গও নানাবর্ণে রঞ্জিত। সে কিন্তু হাসিতেছে না। নিস্তব্ধ হইয়া দিগন্তলগ্ন শুভ্র মেঘস্তূপের দিকে চাহিয়া আছে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে যেন সচেতন নয়। লক্ষ্য করিলাম এলাহিও তাহারই পাশে বসিয়া আছে।

গো আমার কানের কাছে তর্জন করিয়া উঠিল—"যাও, যাও, আর দেরি করিও না।" পরবর্তী যুগে আমরা শিকারের দিকে যেমন কুকুর লেলাইয়া দিতাম গো ঠিক তেমনিভাবেই যেন আমাকে উৎসাহিত করিল, জোলমা যেন তাহার শিকার।

আমি ছুটিয়া গিয়া জোলমার হাত চাপিয়া ধরিলাম। দশ-বারো জন যুবক সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তাহার পর কিছুক্ষণ আমি নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাই নাই, চক্ষু বুজিয়া কেবল কুঠার চালাইয়া

গিয়াছি। আমার স্কন্ধদেশে একটা বর্শার খোঁচা বেশ একটু জোরে লাগিয়াছিল, তাহারই বেদনাটা অনুভব করিতেছিলাম। ছোটখাটো যে সব ক্ষত আমার সর্বাঙ্গে হইয়াছিল তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নাই। অবসরই ছিল না।

সহসা গো চীৎকার করিয়া উঠিল, "এইবার থাম, শ্যেনপক্ষী চলিয়া গিয়াছে।"

আক্রমণকারীরা সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত হইল। দেখিলাম আমার কুঠারাঘাতে তিনজন নিহত হইয়াছে, আরও তিনজন খুব বেশি আহত হইয়াছে। বাকি কয়জনের আঘাত সামান্য। জোলমার হাত কিন্তু আমি ছাড়ি নাই। জোলমার কোনও আঘাত লাগিয়াছে কি না দেখিতে গিয়া দেখিলাম জোলমা এলাহির হাত ধরিয়া আছে। ইহার অর্থ এলাহির সহিতও আমার বিবাহ হইয়া গেল। এলাহি যদি আর কাহারও হাত ধরিত তাহার সহিতও হইয়া যাইত। তখন কিন্তু বুঝিতে পারি নাই।

গো আমার কাছে আসিয়া বলিল, "শ্যেনপক্ষী তোমার উপর দয়া করিয়াছে। তুমি ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ও যদি এখানেই কোনও গাছে বসিত বা উড়িয়া উড়িয়া তাহা হইলে তোমাদের যুদ্ধ থাকিত। কিন্তু শ্যেন এক পাক ঘুরিয়াই উড়িয়া গেল। এ কি এলাহিটাও জুটিয়া গেল নাকি! কি আপদ! বিলচু, খানা, গোলগোল মারা গিয়াছে দেখিতেছি। আমাদের নিয়ম জান তো? উহাদের পরিবারের ভারও তোমাকে লইতে হইবে। কয়টাকে সামলাইবে তুমি! তোমার বেশ চোট লাগিয়াছে দেখিতেছি। চল, চল—"

জয়ধ্বনি করিতে করিতে আমাকে সকলে কাঁধে করিয়া বৃহার গুহায় পৌঁছাইয়া দিল।

রক্তক্ষয়ের ফলে আমি সম্ভবত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। বৃহার গুহায় আমার যখন জ্ঞান হইল তখন প্রথমটা বুঝিতেই পারিলাম না আমি কোথায় আছি। ঘুমের ঘোরে মনে হইল আমি কি আবার আমাদের সেই পুরাতন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াছি না কি? চারিদিকে হাত বুলাইয়া দেখিতে গেলাম, কাঁধে ব্যথা লাগিল। বুঝিলাম, আমি শয্যার উপর শুইয়া আছি, ভস্মশয্যায়, আমাদের সমাজেও আমরা স্তূপীকৃত ভস্মের উপর শুইতাম...সহসা কে যেন আমার হাতটা চাপিয়া ধরিল।

"কে বোহিলা?"

"না, আমি এলাহি।"

ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে মনে পড়িল আমি এখন শ্যেন-পক্ষী সম্প্রদায়ের দলপতি, বৃহার উত্তরাধিকারী, জোলমার স্বামী। উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এলাহি আমাকে বাধা দিল। বিস্মিত হইয়া

ভাবিলাম, এলাহি এখানে কেন?

"এখন উঠিও না, চুপ করিয়া শুইয়া থাক। আমি তোমার কাঁধে পাতা ছেঁচিয়া লাগাইয়া দিয়াছি, হাত নাড়িলে সেটা পড়িয়া যাইবে। তুমি শোও।"

এলাহি জোর করিয়া আমাকে শোয়াইয়া দিল।

"পাতা? কিসের পাতা?"

"তা তোমাকে বলিব কেন? কেমন তাড়াতাড়ি ঘা সারিয়া যাইবে দেখিও।"

"তাই না কি! কিন্তু পাতার নামটা বলিতে বাধা কি?"

"ও পাতার নাম আমি কাহাকেও বলি না। ওইটুকুই তো আমার সম্বল। আমার একটিও সন্তান হয় নাই, গোঁ হয়তো সমাজ হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিত, কেবল কোন পাতায় তাড়াতাড়ি ঘা সারে তাহা জানি বলিয়া আমাকে তাড়ায় না। অনেকেই এইজন্য খাতির করে আমাকে।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলাম। তাহার পর এলাহি বাহু দিয়া আমার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আমার কানে বলিল, "মরিবার পূর্বে তোমাকে বলিয়া যাইব।"

"ছাড় ছাড়।"

আমি নিজেকে তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। ভয় হইতেছিল জোলমা যদি আসিয়া পড়ে। তখনও জানিতাম না যে জোলমার আদেশেই সে আমার পরিচর্যা করিতেছে। সে যে আমার স্ত্রী-পদবাচ্য হইয়াছে তাহাও তখন জানিতাম না।

"ছাড়িব কেন, আমাকে বিবাহ করিয়াছ জান না?"

"কই, না।"

"জোলমা যে আমার হাত ধরিয়াছিল দেখ নাই?"

"দেখিয়াছি। তাহাতেই কি বিবাহ করা হইল?"

"নিশ্চয়। তুমি যদি তখন আপত্তি করিতে, কিম্বা জোলমা যদি আমার হাত ছাড়িয়া দিত তাহা হইলে হইত না। কিন্তু তুমিও আপত্তি কর নাই, জোলমাও হাত ছাড়ে নাই।"

গ্রীবা হইতে এলাহির বাহুপাশ মুক্ত করিতে পারিলাম না।

"জোলমা তোমার হাত ধরিয়াছিল কেন?"

"সে যে আমাকে পুরস্কার দিবে বলিয়াছিল। আমি তোমাকে চাহিয়া লইয়াছি।"

"জোলমা কোন আপত্তি করিল না?"

"না। বড় ভাল মেয়ে সে।"

"জোলমা কোথায়?"

"কি জানি। গুহার ভিতর কোথাও নিশ্চয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তোমাকে শোওয়াইয়াই গুহার ভিতর চলিয়া গিয়াছে।"

"গুহাটা কত বড়?"

"প্রকাণ্ড। এখান হইতে লাফাই পাহাড় পর্যন্ত। সমস্তটাই ফাঁপা।

ভিতরে ভিতরে কত গুহা যে আছে এক জোলমা ছাড়া আর কেহ জানে না বোধ হয়।"

"গো কোথায় থাকে?"

"যেখানে যখন খুশি। লাফাই পাহাড়ের পিছনে প্রকাণ্ড একটা পাথর আছে দেখিয়াছ? দূর হইতে অনেকটা মানুষের মুখের মতো দেখিতে? গো সেখানে প্রায়ই যায়।"

"কেন?"

"কি জানি। মনে হয় ওই পাথরটার সহিত কি যেন কথা কয়, পাথরের উপর তিত্তিরের রক্ত মাখায়। নিশ্চয় কিছু আছে একটা ব্যাপার, ঠিক জানি না। জানিতে ইচ্ছাও করে না।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। দুর্বল বোধ করিতেছিলাম। এলাহি ধীরে ধীরে আমার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। আবার আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমের মধ্যেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল জোলমাকে পাইয়াও বোধ হয় পাইলাম না। মনে হইতেছিল, প্রথম তাহার সহিত একা যেদিন আলাপ হইয়াছিল—সেই নৃত্যচঞ্চলা ময়ূর-বেষ্টিত জোলমা—সেদিনও সে যেমন দূরে ছিল আজও তেমনি দূরে আছে। একটুও কাছে আসে নাই। ক্ষুধিত পশুটার সম্মুখে খানিকটা খাদ্য ধরিয়া দিয়া যেন আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে।

...গুহার অন্ধকারে জোলমার নিকট বসিয়া ছবি-আঁকা শিখিতেছিলাম। একটি ছোট প্রস্তরখণ্ডের উপর জোলমা দেখাইয়া দিতেছিল ছবিতে কি করিয়া রং দিতে হয়। আমি আর একটি ছোট প্রস্তরখণ্ডে তাহার অনুকরণ করিতেছিলাম। জোলমার মধ্যে কোনও চঞ্চলতা ছিল না, আমি যে তাহার স্বামী এ বোধই যেন ছিল না, আমার সহিত তাহার দেখা হইত কেবল ছবি-আঁকার সময়। অন্য সময় সে যে কোথায় থাকিত আমি জানি না। অতি প্রত্যুষে প্রত্যহ একবার সে বনে যাইত জানি। রাত্রে কোথায় থাকিত জানি না। রাত্রে আমার কাছে থাকিত এলাহি এবং বিলচুর স্ত্রী টিনা। খানা এবং গোলগোলের স্ত্রীদের দখল করিয়াছিল বিতং। আমি আপত্তি করিলে দখল করিতে পারিত না, কিন্তু আমি আপত্তি করি নাই। এলাহি এবং টিনাও যদি না থাকিত আমি নির্ভয়ে আমার নব-সাধনায় অগ্রসর হইতাম। সত্যই আমি কম-পশু হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। জোলমার নিকট বসিয়া ছবি-আঁকা শিখিতেই বেশি ভাল লাগিত। রেখার ফাঁদে বর্ণের জালে বড় বড় হরিণ ধরা পড়িয়া যাইতেছে! কি অদ্ভুত! ওহালির মোহ আমার মনকেও আচ্ছন্ন করিতেছিল। ধীরে ধীরে একটা নূতন জগতে যেন আমি প্রবেশ করিতেছিলাম, যে জগতে জ্যোৎস্নার স্পর্শে কৃষ্ণমেঘের ভয়াবহতা স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়, যে জগতে ছবির

বলগা হরিণ রক্তমাংসের বলগা হরিণকে ডাকিয়া আনে, যে জগতে মাটির রং প্রস্তর-প্রাচীরকে প্রাণবন্ত করে চিত্র-গৌরবে, কণ্টকবৃক্ষকে মহিমান্বিত করে পুষ্পশোভায়।

...বলগা হরিণের পেটের কাছে যেখানে পেটের হরিদ্রাভ বাদামী রং শাদায় আসিয়া মিশিয়াছে সেখানটায় আমার বর্ণবিন্যাস ঠিক হইতেছিল না। জোলমা ঝুঁকিয়া নিজেই সেটা ঠিক করিয়া দিতেছিল। খিল খিল হাসির শব্দে উভয়েই চমকাইয়া উঠিলাম। নিঃশব্দচরণে গৌ কখন আসিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। ঈষদালোকিত অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম।

"কি ছবি হইতেছে দেখি?"

আবছা অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "এ সব তো নকল ছবি। আসল ছবি কবে হইবে?"

জোলমা কোনও উত্তর না দিয়া উঠিয়া গেল এবং গুহার অন্ধকারে অন্তর্ধান করিল। গৌ কাছে আসিলেই সে চলিয়া যাইত।

"কত দূর?"

ভ্রূ নাচাইয়া গৌ আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। আমার উত্তরের উপর যেন তাহার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। আমি মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

"অপদার্থ অকর্মণ্য পাথর—"

দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি বক্র করিয়া সে আমার দিকে ছুটিয়া আসিল, মনে হইল বুঝি বা আমার মুখটা আঁচড়াইয়া দিবে। কিন্তু সে কিছুই করিল না, আমার মুখের কাছে আসিয়া তাহার বক্র অঙ্গুলি সোজা হইয়া গেল, হাসিতে হাসিতে সে আমার গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

"হইবে হইবে সব হইবে, অধীর হইও না। এখন উপরে চল। শ্যেন সম্প্রদায়ের বহু লোক বাহিরে জমা হইয়াছে। বিতং একটা দল পাকাইয়া আনিয়াছে। জিকাটু পাহাড়ে শঙ্খচূড় না কি মরে নাই, গুহার মধ্যে এখনও তাহার তর্জন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। উহারা জানিতে আসিয়াছে ইহার কি ব্যবস্থা তুমি করিবে। লাফাই পাহাড়ে আর স্থান নাই। জিকাটু পাহাড় যদি নিরাপদ হয় শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের অনেকে গিয়া সেখানে বাস করিবে।"

"উহারাই গিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলুক না।"

"সাপ বলিয়া মানিলে পূর্বেই মারিয়া ফেলিত। উহাদের ধারণা অন্যরূপ। আমারও। শ্যেন সম্প্রদায়ের কেহ উহার গায়ে অস্ত্রাঘাত করিবে না। তোমাকেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

"কি করিব?"

"তুমিই ঠিক কর।"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম বিরাট জনতা আমার প্রতীক্ষা করিতেছে

আমাকে দেখিয়াই তাহাদের কলরব থামিয়া গেল। আমি নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। কি যে বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। সহসা মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল।

বলিলাম, "জিকাটু পাহাড়ে তোমরা যে যত পার শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া চল তাহার পর আমি ব্যবস্থা করিব। শুষ্ক কাষ্ঠ পাহাড়ে জমা হইলেই আমাকে খবর দিও।"

জনতা ছত্রভঙ্গ হইতেছিল, বিতং সহসা জনতার ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ছবি আঁকা কেমন চলিতেছে? বলগা হরিণ কিন্তু আজকাল আর আসিতেছে না।"

বলিয়াই সে জনতার মধ্যে মিলাইয়া গেল, তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

গো আমার কানে কানে ফিস ফিস করিয়া বলিল, "বিতংকে সাবধান। ও যে কেবল ভাল হরিণের ডাক ডাকিতে পারে তাহা নয়, ভাল তীরও ছুঁড়িতে পারে। জোলমাকে না পাওয়ার অপমান ও ভোলে নাই, শীঘ্র ভুলিবেও না। মনে রাখিও, তোমার মাথাটাই উহার লক্ষ্য।"

আমার আত্মসম্মান আহত হইল।

বলিলাম, "আমি ব্যাঘ্র, শ্যেনপক্ষী আমার কিছু করিতে পারিবে না। বড় জোর একটু আঁচড়াইয়া দিবে, তাহাতে আমার বিশেষ কিছু হইবে না।"

গো-এর চক্ষু নিষ্পলক হইয়া গেল। তাহার চোখের তারা দুইটির দিকে চাহিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম, মনে হইল যেন দুইটি রক্তখদ্যোত জ্বলিতেছে। গো সেই ভয়ঙ্কর নিষ্পলক দৃষ্টি আমার মুখের উপর কিছুক্ষণ নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার পর বলিল, "তুমি যাহা বলিলে তাহা আর কখনও বলিও না। তুমি যদি জোলমার স্বামী না হইতে, জোলমার কোলে শিশু দিয়া বৃহার বংশরক্ষা করিবে এ আশ্বাস যদি তোমার নিকট না পাইতাম, তাহা হইলে তোমার এই উক্তির জন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইত। তোমার ব্যাঘ্র-পরাক্রম তোমাকে রক্ষা করিতে পারিত না। আর একটা কথাও মনে রাখিও, বিতং শ্যেনপক্ষী নয়, বিতং সিংহ। সিংহ হইয়াও সে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে জোলমার জন্য। জোলমার জন্যই সে বনে বনে হরিণের ডাক ডাকিয়া বেড়াইতেছে এতকাল। বৃহার পাগলামির জন্যই বিতংয়ের সহিত জোলমার বিবাহ হয় নাই, হইলে হয়তো জোলমার কোলে এতদিন শিশু দেখিতে পাইতাম।"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া গো তর তর করিয়া নামিয়া গেল। আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমারও রক্তে আগুন জ্বলিতেছিল, কানে কানে কে যেন বলিতেছিল, 'এত অপমান সহ্য করিবে? কেন, আর কিসের ভয়, জোলমাকে তো পাইয়াছ!' আমার কুলদেবতা ধীরে ধীরে চোখের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিলেন। দেখিলাম ব্যাঘ্রবদনা মানবীর নয়ন-যুগলে

ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া কালাগ্নি জ্বলিতেছে। মনস্থ করিলাম বিতংকে অবিলম্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিব।

...এলাহি এবং টিনা দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি আমার বর্শা ও ধনুর্বাণ লইয়া নিঃশব্দে গুহা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বিতং কোথায় আছে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত হইবে না। খানা এবং গোলগোলের পরিবারবর্গের ভার সে যখন লইয়াছে তখন তাহাদের গুহায় গেলেই বিতংয়ের ঠিকানা পাইব। ঠিকানা যদি না-ও পাই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব, সমস্ত লাফাই পাহাড়, সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিব। বিতং সিংহ : সিংহের আস্ফালনে ব্যাঘ্র ভয় পাইবে? এ যে কল্পনাতীত! দেহের শিরায় উপশিরায় আমার ক্ষুব্ধ বন্য আভিজাত্য যেন তান্ডব নৃত্য করিতেছিল। বিতংয়ের সহিত একটা বোঝাপড়া করিতেই হইবে। নিবিড় অন্ধকারে নিঃশব্দ চরণে বাহির হইয়া পড়িলাম।

...অন্ধকারে সেদিন বন্য শ্বাপদের মতোই আমি সন্তর্পণে বহুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। যদি বিতংয়ের দেখা পাইতাম—শ্বাপদের মতোই তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতাম। কিন্তু তাহার দেখা পাইলাম না। যখন ক্রোধভরে বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম তখন খেয়াল ছিল না যে, এতরাত্রে কেহই গুহার বাহিরে থাকিবে না, সকলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। লাফাই পাহাড়ে গিয়া দেখিলাম সমস্ত গুহার মুখে ঝাঁপ লাগানো এবং প্রত্যেক গুহার সম্মুখে অগ্নিকুন্ড জ্বলিতেছে। জন্তু জানোয়ারের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার ইহাই তখন একমাত্র উপায় ছিল। কেহ জাগিয়া নাই দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। যদি ইহারা জাগিয়াই থাকিত তাহা হইলেই বা কি হইত? ইহাদের নিকট হইতে বিতংয়ের খোঁজ লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিতাম? দলপতির পক্ষে এ আচরণ কি শোভন হইত? এ সমাজের দলপতি থাকা কি আর সম্ভব হইত সে ঘটনার পর? তাহাকে যদি হত্যা করিতেই হয়, গোপনে করিতে হইবে, যেন কেহ জানিতে না পারে। সহসা চমকাইয়া উঠিলাম।

"হোই, হোই, হোই—"

ক্রমবর্ধমান উচ্চৈস্বরে তিনবার শব্দ হইয়া থামিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর নজর পড়িল দূরে অবস্থিত একটা বৃক্ষ হইতে কে যেন লাফাইয়া নীচে নামিল। আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম সে আমার দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। একটু কাছে আসিতে দেখিলাম তাহার হাতে বর্শা রহিয়াছে। স্কন্ধে ধনু ঝুলিতেছে।

"কে?"

আমিই প্রথমে প্রশ্ন করিলাম।

একটি যুবক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া

বর্শা সন্নত করিল। শ্যেন সম্প্রদায়েরই যুবক একটি।

"তুমি কি করিতেছ?"

"পাহারা দিতেছি।"

"তিত্তির সম্প্রদায়ের একদল লোক একবার গভীর রাত্রে আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল। তখন হইতেই গৌ পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আজ আমার পালা।"

"তিত্তির সম্প্রদায় কি এখনও নিঃশেষ হয় নাই?"

"না, কিছু বাকি আছে এখনও। তাহাদের দলপতি মুনজট্ খুব বড় যাদুকর। তাহারই শক্তির জোরে কিছু এখনও টিকিয়া আছে। সে না থাকিলে গৌ এতদিন সকলকেই শেষ করিয়া দিত—"

"কি করে সে?"

"ঠিক জানি না, তবে শুনিয়াছি সে শ্যেনপক্ষীদের জীবন্ত পোড়াইয়া মারে। তাহার পর সেই ভস্মে মন্ত্রপাঠ করিয়া তাহা মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলে।"

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। আমার ক্রোধ সহসা যেন খানিকটা কমিয়া গেল। আমি যে সম্প্রদায়ের দলপতি হইয়াছি সেই সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য এই যুবক একাকী রাত্রি জাগরণ করিতেছে, আর আমি...

"আপনি কি কাহাকেও খুঁজিতেছেন?"

"না, আমিও তোমাদের পাহারা দিতেছি। তোমাকে দেখিয়া খুব খুশি হইলাম। যাও, তুমি নিজের কাজ কর।"

যুবক চলিয়া গেল। আমি একাকী অন্ধকারে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার আর ক্রোধ ছিল না বটে, যে উত্তেজনার তাড়নায় নির্বোধের মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম সে উত্তেজনাও অপনোদিত হইয়াছিল কিন্তু অপমানের জ্বালাটা কমে নাই। আমি যে সমাজে এতকাল বাস করিয়া আসিয়াছি সে সমাজে কুলদেবতার অপমান সহ্য করা নিয়ম নয়। সে সমাজে কোনও পুরুষ কুলদেবতার নিন্দা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার প্রতিশোধ না লয় তাহাকে সকলে মিলিয়া শাস্তি দেয়। এজন্য এক অদ্ভুত শাস্তি প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে। তাহাকে সকলে মিলিয়া চিৎ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখে এবং আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে তাহার মুখে লাথি মারে। আমি অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছিলাম। বিতং আমার কুলদেবতার অপমান করে নাই, অপমান করিয়াছে গৌ। শাস্তি দিতে হইলে গৌকেই শাস্তি দিতে হয়। তাহার পাকা-চুলের ঝুঁটি ধরিয়া কুঠার দিয়া তাহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিতে আমার আপত্তি নাই, তাহার পা দুইটা ধরিয়া পাথরের উপর আছড়াইয়াও তাহাকে আমি অনায়াসে মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু সেটা কি সমীচীন হইবে? সমস্ত শ্যেনপক্ষী সমাজ তাহা হইলে যে ক্ষেপিয়া যাইবে! জোলমাকে ফেলিয়া পলায়ন করা ছাড়া যে তখন আর গত্যন্তর থাকিবে না। আমার চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। বল্গা হরিণের

ডাক শুনিতে পাইলাম। দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি বনের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। লাফাই পাহাড় ছাড়িয়া আসিয়া কখন যে বনের ভিতর ঢুকিয়াছি, তাহা জানি না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চাঁদ উঠিয়াছে, নৈশ অরণ্যের বিচিত্র শব্দে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। যে চাঁদ এবং যে শব্দ এতকাল আমাদের বন্য জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে সেই চাঁদ এবং সেই শব্দ মনে হইল আজ যেন কি একটা অভিনব বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। কাহার বার্তা? ওহালির, না, আমার কুলদেবতার? সহসা মনে হইল জোলমা যেন আমাকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে। অসংখ্য ঝিল্লীর ঝঙ্কারে, জ্যোৎস্নার শান্ত আবেদনে সে যেন বলিতেছে—ফিরিয়া এস, ফিরিয়া এস। মনে হইতে লাগিল শত শিখীকণ্ঠে বুঝি এইবার ওই কথা বিঘোষিত হইবে। উৎকর্ণ হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু ময়ূরের ডাক শুনিতে পাইলাম না। ধীরে ধীরে আমার সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ওই বৃক্ষকোটরকে কেন্দ্র করিয়াই আমার এই সম্পূর্ণ নূতন জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, এত কাছে আসিয়া তাহাকে একবার না দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। কিছু দূর গিয়া আবার বল্‌গা হরিণের ডাক শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার। এবার খুব কাছে। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছি সহসা বিতং একটা ঝোপ হইতে তুড়ুক তুড়ুক করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

"বিতং!"

ডাক শুনিয়া বিতং ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাহার পর আমাকে চিনিয়া তুড়ুক তুড়ুক করিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিল। কাছে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল।

"বিতং, আমি তোমাকে খুঁজিতেই আজ রাত্রে বাহির হইয়াছি।"

"কেন?"

"তোমার সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে চাই। তুমি সুযোগ পাইলেই আমাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন? যদি আমার প্রতি তোমার কোনও আক্রোশ থাকে, সম্মুখ যুদ্ধে তাহা প্রকাশ কর। আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি।"

বিতং তুড়ুক করিয়া আর একটু আগাইয়া আসিল এবং আমার দিকে চোখ মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল।

"আমি জোলমাকে চাহিয়াছিলাম—পাই নাই, তুমি তাহাকে পাইয়াছ। তোমার প্রতি আমার আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক, আছেও, কিন্তু সেজন্য আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নই। আমাকে হত্যা করিবার যদি বাসনা থাকে মাথা পাতিয়া দিতেছি, কুঠার বা খড়্গ যাহা চালাইতে চাও চালাও, কিন্তু ইহাও বলিয়া দিতেছি, বুহা চলিয়া গিয়াছে, আমিও যদি না থাকি, বনে একটি হরিণ আর আসিবে না।"

এই বলিয়া সে সত্য সত্যই মাথা পাতিয়া দিল। পরমুহূর্তেই মাথাটা তুলিয়া বলিল, "মাথাটা স্কন্ধচ্যুত হইবার পূর্বে আর একটা কথা বলিয়া যাই। আমি সভায় তোমার বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা গোঁ-এর আদেশ অনুসারে। গোঁ-এর আদেশ অমান্য করিবার সাহস আমার নাই, কারণ সে পিশাচী। আমি মৃত্যুভয় করি না, কিন্তু গোঁ যদি আমাকে আজন্ম রুগ্ন করিয়া দেয়? লাফাই পাহাড়ের ফানঝাকে দেখিয়াছ? গালটা পচিয়া দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে? কারণ কি জান? গোঁ উহার উপর চটিয়াছিল। এলাহির একটি ছেলেও ভূমিষ্ঠ হয় নাই, খাম্বার চোখ পচিয়া গিয়াছে, সব গোঁ-এর অভিশাপ। উহাকে চটাইবার সাহস নাই। উহারই আদেশে তোমাকে কটু-কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। নাও, এইবার মার—"

আবার বিতং মাথা পাতিয়া দিল। আমি বিস্ময়ে যেন পাথর হইয়া গিয়াছিলাম, আমার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল, আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"মারিবে না?"

"না। সব কথা না জানিয়া তোমার প্রতি অবিচার করিয়াছি, কিছু মনে করিও না। একটা কথা শুনিলে, হয়তো তুমি সান্ত্বনা পাইবে, জোলমাকে আমি পাইয়াও পাই নাই। সে তখনও যেমন দূরে ছিল, এখনও তেমনি দূরেই আছে। আমি নামে মাত্র তাহার স্বামী—"

"তাই না কি?"

বিতং হরিণের ডাক ডাকিয়া তুড়ুক করিয়া আবার ঘুরিয়া বসিল।

"চলিয়া যাইতেছ?"

"হাঁ, বনের ওধারটায় এখনও যাওয়া হয় নাই।"

"আচ্ছা, গোঁ আমার সহিত এমন রহস্যময় ব্যবহার করিতেছে কেন বলিতে পার?"

"না। তবে একটা কথা জানি, তাহা গোপনে তোমাকে বলিতেও আপত্তি নাই। গোঁ জোলমাকে বিনাশ করিতে চায়; কিন্তু গোঁ যে পিশাচ-মন্ত্র জানে, তাহা আকাশ-কন্যা জোলমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাই গোঁ অহরহ অন্য উপায় সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। আমার বিশ্বাস তোমাকে হয়তো অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে। আর কিছু জানি না, চলিলাম।"

"শোন, শোন।"

বিতংয়ের নির্বিকার ভাব দেখিয়া সত্যই আমি বিস্ময় বোধ করিতেছিলাম, এমন আর কখনও দেখি নাই। আমার কুঠারের তলায় নির্বিকারভাবে মাথা পাতিয়া দিয়াছিল, আমি কিছু করিলাম না দেখিয়া ঠিক তেমনি নির্বিকার-ভাবে চলিয়া যাইতেছে। আশ্চর্য কাণ্ড!

"কি—"

"তুমি যে আমার কাছে মাথা পাতিয়া দিয়াছিলে যদি সত্যই আমি

মারিতাম—”

বিতং হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

“আমি জানিতাম, তুমি মারিবে না। আমি মানুষ চিনি। অন্য লোক হইলে তাহাকে এত কথা বলিতাম না। সাবধান, কিন্তু যাহা বলিলাম তাহার প্রতি কথাটি সত্য।”

বিতং হরিণের ডাক ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমি প্রথম যেন সত্যভাবে অনুভব করিলাম যে আমি বিদেশী, ইহাদের আমি বুঝিতে পারি নাই। বৃহা, গোঁ, জোলমা, বিতং প্রত্যেকেই আমার কাছে রহস্যাবৃত, আমাকে দলপতি সাজাইয়া কেন যে ইহারা অভিনয় করিতেছে, তাহাও রহস্যাবৃত।

...বৃক্ষকোটরে গিয়া দেখিলাম সেখানে স্থানাভাব। একটি প্রকাণ্ড পেচক আমার স্থানটি দখল করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। তাহাকে অনায়াসে তাড়াইয়া অথবা শিকার করিয়া নিজের কোটর দখল করিতে পারিতাম, তাহার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তিও হইত, কিন্তু তাহা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রবৃত্তির চেহারাই যেন বদলাইয়া গিয়াছিল। সমস্ত অন্তর দিয়া তখন যাহা কামনা করিতেছিলাম তাহা যে ঠিক কি তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু তাহা আর যাহাই হউক বৃক্ষকোটর অথবা পেচক-মাংস নহে। ধীরে ধীরে আবার লাফাই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। হঠাৎ জ্যোৎস্নাটা নিবিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম প্রকাণ্ড একটা কালো মেঘ চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কালো মেঘ ঘিরিয়া জ্যোৎস্নার জরি জ্বলিতেছে। অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সত্যই কি ওহালি দিবারাত্রি আকাশ-পটে নিত্য নব ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে? কেহ দেখুক বা না দেখুক, তাহার ছবি আঁকার কি সত্যই বিরাম নাই? সত্যই কি ওহালি পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া বৃহাকে বরণ করিয়াছিল? জোলমা সত্যই কি ওই ওহালির কন্যা? সেদিন সেই জ্যোৎস্না-মণ্ডিত কালো মেঘ দেখিয়া আমার মনে যেন প্রশ্নের বান ডাকিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে কত কথাই যে মনে হইল ! মনে হইল বৃহা শুধু হরিণের ছবি আঁকিয়া হরিণদলকে আহ্বান করিত, ওহালি এত অসংখ্য ছবি আঁকিয়া কাহাদের আহ্বান করিতেছে? ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সেই উপল-বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। একটু পরে মনে হইল অন্ধকারে বোধ হয় পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। পাহাড়ে উঠিয়াছি, কিন্তু জনমানবের কোন চিহ্ন নাই, কোথাও আগুন দেখা যাইতেছে না। কৃষ্ণ মেঘ সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে মাঝে মাঝে। ওহালি নূতন ছবি আঁকিতেছে। স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, লাফাই পাহাড়টা কোন্ দিকে? পর মুহূর্তেই বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল, বিদ্যুতালোকে দেখিলাম দূরে দুইজন দাঁড়াইয়া আছে। একটি দীর্ঘকায় পুরুষ আর একটি নারী। দূরে একটি প্রস্তরের স্তূপ রহিয়াছে, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া আছে দুই-

ভূনে। পুনরায় বিদ্যুৎ চমকাইতেই দেখিলাম প্রস্তর স্তূপ হইতে তাহারা অবতরণ করিতেছে। নারীটিকে চিনিতে পারিলাম। গো। নিমেষের মধ্যে আমি শুইয়া পড়িলাম এবং বুকে হাঁটিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এলাহির কথা নিমেষে মনে পড়িয়া গেল। লাফাই পাহাড়ের পিছনে মানুষের মুখের মতো দেখিতে যে প্রকাণ্ড পাথরটা আছে সেখানে গো যেন কি করে।

...পাথরটার কাছে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মেঘ ফাটিয়া চাঁদ বাহির হইল, চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কোথাও কেহ নাই। সেই মনুষ্য মুখাকৃতি পাথরটার পাশেই আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। সহসা পাথরটাই পুরুষ কণ্ঠে কথা কহিয়া উঠিল।

"গো, আমি তোমার সহিত সন্ধি করিতে আসিয়াছি। তিত্তির সম্প্রদায়ের দলপতি কখনও কাহারও নিকট নতজানু হয় নই। আমি তোমার নিকট নতজানু হইয়াছি, ইহাতেও কি তুমি তুষ্ট হইবে না?"

"দেখ মুনজট্, আমার নাম গো, আমি বারম্বার মত পরিবর্তন করি না। প্রথম যৌবনে তোমার সহিত আমার যখন প্রথম ভাব হইয়াছিল তখন যদি তুমি নতজানু হইতে এ সব হয়তো কিছুই হইত না। কিন্তু তখন তুমি শোন পক্ষী আমাকে ত্যাগ করিয়া তিত্তির পক্ষী রুবাকে বিবাহ করিলে। সে অপমান আমি ভুলি নাই, কখনও ভুলিব না।"

"কিন্তু তাঃ লাভ কি তোমার একটি পুত্রও তো বাঁচিয়া নাই।"

"থাকিবে কি করিয়া? আমার একটি পুত্রও কি মানুষের মতো হইয়াছিল? ইহার জন্য তুমিই দায়ী। তাহার পর যতগুলি পুরুষের সংশ্রবে আমি আসিয়াছিলাম তাহাদের প্রত্যেকটি ছিল কাপুরুষ। আমার তাই একটাও ভাল ছেলে হয় নাই। গিয়াছে ভাল হইয়াছে। বৃহাটাকে আমিই হত্যা করিয়াছি। জোলমাকেও শেষ করিব। কিন্তু তিত্তির বংশের কাহাকেও আমি রাখিব না। গো নির্বংশ হইয়াছে, রুরাও হইবে। তুমি নতজানু নতমস্তক যাহাই হও না কেন, আমার এ মত পরিবর্তিত হইবে না।"

বুঝিলাম পাথরটা ফাঁপা, ভিতরে বসিবার স্থান আছে। প্রবেশপথও আছে নিশ্চয়ই কোথাও। পাথরের ছায়ায় গুঁড়ি মারিয়া বসিলাম।

"জোলমা শুনিয়াছি আকাশ-কন্যা। তাহাকে কি কুঠার দিয়া হত্যা করিবে? তোমার মন্ত্রে তো তাহার কিছু হইবে না, সে তো তিত্তির-পক্ষী নয়।"

"তাহার মারণ মন্ত্র কি তাহাও আমি জানি। ওহালি বৃহাকে বলিয়া গিয়াছিল, আমি আড়ি পাতিয়া লুকাইয়া শুনিয়াছি একদিন।"

"কি সেটা?"

"তোমাকে বলিব কেন?"

যদিও গো-কে আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু কল্পনা করিতেছিলাম যে, গো-য়ের নয়নে রক্ত-খদ্যোত জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

"আমাকে বলিবে কারণ আমি মুনজট্। ও কি, ও কি, আমাকে মারিতেছ কেন। রাক্ষসী, পিশাচী—"

পাথরের ভিতর একটা হুড়মুড় শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পরই গো-য়ের আর্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, "ছাড়, ছাড় বলিতেছি।"

"তুই আগে বল্ তবে ছাড়িব। না বলিলে তোকে টুঁটি টিপিয়া এখনই শেষ করিয়া দিব ডাইনী—"

"প্রতিজ্ঞা কর কাহাকেও একথা বলিবে না।"

"করিলাম। বল এবার।"

"ওহালি বলিয়াছিল জোলমা যদি কোন দিন কোনও পুরুষের সংস্রবে আসে ভাসিয়া যাইবে।"

"ভাসিয়া যাইবে মানে?"

"মানে মরিয়া যাইবে। মানুষ আর কতক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারে। ওহালির ভাষাই ওই রকম অদ্ভুত ছিল। ছাড়।"

"আমি যে অনুরোধ আজ করিয়াছি তাহা রাখিবে না?"

"না।"

"যদি মারিয়া ফেলি।"

"তবু না। তিত্তির বংশ ধ্বংস না করিয়া আমি মরিব না। আমাকে যদি মারিয়াও ফেল আমি প্রেতিনী হইয়া রুরার বংশ লোপ করিব। মার আপত্তি নাই।"

মুনজটের পরুষ কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল।

"গো, ক্ষমা কর আমাকে। সন্ধি কর—"

"না, না, না, না—"

গো-য়ের চীৎকার এত তীব্র হইয়া উঠিল যে মনে হইতে লাগিল পাথরটা বুঝি চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইবে। সেখানে বসিয়া থাকা আর নিরাপদ মনে হইল না, উহারা যে কোনও মুহূর্তে বাহির হইয়া আসিতে পারে। নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

আমার এই নৈশ অভিযানের কথা কাহাকেও বলি নাই, এমন কি জোলমাকেও নয়। এখন মনে হইতেছে জোলমাকে যদি বলিতাম তাহা হইলে হয়তো যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঘটিত না। সে হয়তো ইহার কোনও প্রতিবিধান করিতে পারিত। কিন্তু তাহাকে বলি নাই। বলি নাই তাহার কারণ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমার বন্য প্রকৃতি তখনও অসাধারণ চরিত্রকে বিশ্বাস করিতে শিখে নাই। দেবতায় বিশ্বাস করিতাম, ভূত প্রেত বিশ্বাস করিতাম ভয়ে। তাহারা অদৃশ্যচারী। মনে করিতাম সেইজন্যই বুঝি তাহারা অপরিমিত শক্তির অধিকারী।

তাহাদের বিশ্বাস করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই এই ধারণাও আজন্ম মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। জোলমার অসাধারণত্ব সহজ আড়ম্বর-হীন ছিল বলিয়াই ভাবিয়াছিলাম তাহা বুঝি অসাধারণ নয়, মনে হইত কোনও বিশেষ কারণে ও একটা বিশেষ ধরণের জীবন-যাপন করিতেছে, কিছু-দিন পরে আবার আমাদের মতো হইয়া যাইবে। বৃহাকেও বিশ্বাস করি নাই। বৃহা জোলমা যে জগতের জীব ছিল সে জগতে আমরা তখনও প্রবেশ করিতে পারি নাই। গো সে জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ঘোষণা করিয়াছিল। তাহার হিংস্র প্রকৃতি নানাভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া বৃহার আদর্শকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিয়া উহারা যে পথে পা বাড়াইতেছে তাহা ধ্বংসের পথ। লতা বৃক্ষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—দৃশ্যমান সমস্ত জীবজগৎ—যে চিরন্তন উপায়ে অবিরত বংশ-বৃদ্ধি করিয়া জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতেছে তাহাই সনাতন পথ। সংযম, ব্রহ্ম-চর্য, ছবির ধ্যানে জীবনকে নিঃসন্তান নিষ্ফল করিয়া দেওয়া, ইহা অন্যায়, অসঙ্গত, অস্বাভাবিক এবং সেইজন্যই ইহা মৃত্যুরই নামান্তর। বৃহার সংযমকে সে কাপুরুষতা মনে করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল ওহালি বুঝি তাহাকে নপুংসক করিয়া দিয়াছে, তাই ওহালি-কন্যা জোলমাকে সে সুচক্ষে দেখে নাই। তাই বোধ হয় তাহাকে বিনষ্ট করিতে চাহিয়াছিল।

...না, জোলমাকে আমি আমার নৈশ অভিযানের কথা বলি নাই। তবে একটি বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলাম। জোলমা আর যে কোনও পুরুষের সংস্রবে আসে আসুক, আমি তাহাকে স্পর্শ করিব না। আমি তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহা পালন করিব। আমি তাহার মৃত্যুর কারণ হইব না। অন্ধকার গুহায় ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া একটি হরিণের শিং-এ রং লাগাইতেছিলাম। জোলমা আমার পাশে আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে উপদেশও দিতেছিল। আমি সাগ্রহে চেষ্টা করিতে-ছিলাম ছবিটি যাহাতে নিখুঁত হয়। সেদিন বিতং জনতার ভিতর হইতে যে কথাটা বলিয়াছিল তাহা আমি ভুলি নাই। বৃহার মৃত্যুর পর হইতে বনে আর বল্‌গা হরিণ আসিতেছে না...বৃহার জন্যই বল্‌গা হরিণ আসিত কি? ...বৃহার ছবির মতো ছবি আঁকিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে সেটা। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলিতে দুলিতে ছবি আঁকিতেছিলাম, তাই বোধ হয় ছবিও ঠিক হইতেছিল না।

জোলমা মৃদুস্বরে বলিল, "ওইখানে আর একটু গাঢ় করিয়া রং দাও।"

গাঢ় করিয়া রং দিতে লাগিলাম। রং দিতে দিতে অবান্তর একটা কথা মনে হইল।

"আচ্ছা, জোলমা, ময়ূরদের সঙ্গে তোমার ভাব হইল কি করিয়া?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোলমা বলিল, "কাহারও সহিত তো আমার

ঝগড়া নাই। তবে ময়ূরদের আমি বেশি ভালবাসি।”

“কেন বল তো?”

“উহাদের রূপের জন্য। উহাদের প্রত্যহ না দেখিলে আমার সমস্ত দিনটা যেন ব্যর্থ হইয়া যায়।”

“আজও তুমি বনে গিয়াছিলে?”

“রোজই যাই।”

“আহা আমিও যদি ময়ূর হইতাম!”

ঘাড় ফিরাইয়া জোলমার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম জোলমার নীল চক্ষু দুইটি হাসিতে ঝলমল করিতেছে।

“এ কথা বিতং বলিতে পারে, তুমি কেন বলিতেছ? আমি তো তোমার সঙ্গিনী হইয়াছি।”

“কিন্তু তবু তোমাকে যেন পাই নাই। কেন বল তো?”

জোলমা চুপ করিয়া রহিল।

“বলিবে না?”

“যাহা বলিতে চাই তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে না।”

“বলিয়াই দেখ।”

“আমাকে তুমি পাও না কেন জান? আমাকে তুমি যেখানে চাও আমি সেখানে থাকি না। ওহালি আকাশে যখন ছবি আঁকে তুমি যদি সেখানে যাও আমাকে ঠিক পাইবে, ফুলের পাপড়িতে যখন রং ফোটে আমি সেখানে থাকি, তুমি তো তখন সেখানে থাক না, তাই আমাকে পাও না।”

পরমুহূর্তেই অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। গো খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দচরণে কখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই।

“পাইবে, পাইবে, এইখানেই, এই অন্ধকার গুহাতেই পাইবে। ফুলের পাপড়িতে যাইবার দরকার নাই। ফুলের পাপড়িতে দুইজনের কুলাইবেও না। হি, হি, হি,—”

জোলমার মুখের উপর সর্পদৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া গো হাসিতে লাগিল। জোলমা প্রদীপটি নামাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমিও একটু ইতস্তত করিয়া জোলমার অনুসরণ করিতেছিলাম, গো বাধা দিল।

“ফুলের পাপড়ির আলোচনা পরে করিলেও চলিবে, এখন বাহিরে চল, খোতার্ির আসিয়াছে, সে তোমাকে কিছু বলিতে চায়।”

“কি?”

“আমি জানি না। আমি দলপতি নই, আমাকে সে বলিবে কেন। আমি জানিতেও চাহি না। আমি যাহা জানিতে চাই তাহা এই”—আমার কানে কানে গো ফিস ফিস করিয়া প্রশ্ন করিল, “জোলমার মন পাইয়াছ কি?”

আমার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। গো-য়ের কথায় সহসা যেন

লজ্জিতও হইলাম, আমার পৌরুষই যেন আমাকে ধিক্কার দিল। গো প্রশ্ন করিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, আমি তাহার চোখের দিকে চাহিতে পারিলাম না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। যে আমি কিছুক্ষণ আগে সংকল্প করিয়াছিলাম যে জোলমাকে কিছুতেই স্পর্শ করিব না, সেই আমিই এখন এই সংকল্পকে অযৌক্তিক মনে করিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল জোলমার সম্বন্ধে আমার এই সঙ্কোচ হয় তো আমার অক্ষমতারই পরিচয়। দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম।

"ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেছ তো? লাফাই পাহাড় হইতে তোমার জন্য মাংস প্রচুর পরিমাণে আসে তো?"

"আসে।"

"আচ্ছা, আমি কাল নিজে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিব। তোমার জন্য নিজ হাতে মাংস সেঁকিয়া আনিব। একরকম ফলও আনিব, খাইয়া দেখিও কেমন চমৎকার। এখন চল, খোতারি কি বলিতেছে শুনিবে চল—"

গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম খোতারি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ ভাবলেশহীন। আমাকে দেখিয়া সে বলিল—

"জিকাটু পাহাড়ে প্রচুর শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এইবার কি করিব?"

"শংখচূড়ের গর্জন কি এখনও শোনা যাইতেছে?"

"যাইতেছে। ভাভা, বিতং, লোলো এবং আমি শুনিয়াছি। মনে হই-তেছে পাহাড়ের ভিতরে সে যেন তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। ওই ক্রুদ্ধ নাগ-প্রেতকে যদি অবিলম্বে শান্ত না করা যায় ভীষণ একটা কিছু অমঙ্গল ঘটিবে। শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলেই খুব ভয় পাইয়াছে।"

আমি গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। তাহার পর বলিলাম, "ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমি কাল জিকাটু পাহাড়ে যাইব। তোমরা কিছু আগুন লইয়া সেখানে উপস্থিত থাকিও।"

খোতারিও গম্ভীরভাবে আমার আদেশটা কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রণিধান করিল তাহার পর চলিয়া গেল।

গো প্রশ্ন করিল, "সাপটাকে কি পোড়াইয়া মারিবে?"

"দেখি—"

"একটা কথা কিন্তু মনে রাখিও ও সাপ সাধারণ সাপ নয়। ও নাগরূপী প্রেত। উহাকে কি করিয়া তুমি যে গুহার ভিতরে বন্দী করিয়াছ তাহা জানি না। হয় তো স্বেচ্ছায় ও বন্দীত্ব বরণ করিয়াছে, ভীষণ কোনও প্রতিশোধ লইবে বলিয়া। উহাকে সন্তুষ্ট করিবার একটি উপায় আমি জানি, কিন্তু তাহা তো হইবার নয়।"

"কি উপায়?"

"জোলমাকে লইয়া গিয়া যদি উহার মুখে সমর্পণ করিয়া দাও ও খুশি হইবে। একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছি ও যেন আসিয়া আমাকে বলিতেছে— আমি জোলমাকে চাই, আর কিছু চাই না। জোলমাকে পাইলে আমি জিকাটু পাহাড় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

সহসা আমার সেই ময়ূরবাহিনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সত্যই তো, জোলমার ময়ূরেরাই উহাকে বন্দী করিয়াছে, জোলমার উপর উহার রাগ হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। গো স্বপ্ন দেখিয়াছে? তাহা হইলে কি...। একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, গো-য়ের কথায় আবার স্বস্থ হইলাম।

"জোলমাকে ছাড়িতে রাজি আছ?"

"না।"

গো আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আমিও ছাড়িতে রাজি নই। আগে জোলমার কোলে একটি সন্তান দেখিতে চাই, বেশি নয় একটি, তাহার পর জোলমা যদি না-ও থাকে আপত্তি নাই, আমি সেই শিশুকে মানুষ করিব। কুকুর ছানাকে মানুষ করিয়াছি, মানুষের শিশুকে পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব। শিশুর অধর স্পর্শে আমার শুষ্ক স্তনেও দুধ উথলাইয়া উঠিবে। উঠিবে না?"

গো-য়ের হিংস্র চোখের তীব্র দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আকুল প্রত্যাশায় যেন তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে আমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ অথচ নিম্নকণ্ঠে বলিল, "আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, তাহা যেন মনে থাকে। সে প্রতিশ্রুতি যদি পালন করিতে না পার তোমার অশেষ দুর্গতি হইবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এলাহি আর টিলাকে আমি এখান হইতে দূর করিয়া দিয়াছি!"

"কেন?"

"আমার খুশি!"

স্পর্ধিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গো বলিল, "বুহা যখন দলপতি ছিল, তখনও আমি যা খুশি করিতাম, এখনও করিব, যতদিন বাঁচিয়া আছি আমার খুশি অপ্রতিহত থাকিবে।"

আমাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া গো চলিয়া গেল। পরমুহূর্তে ফিরিয়া আসিল আবার।

"মনে থাকে যেন আমি কাল সন্ধ্যায় তোমার জন্য মাংস আনিব। আগেই যেন পেট ভরাইয়া ফেলিও না, পেটে স্থান রাখিও, খুব ভাল খাবার আনিব, তেমন খাবার জীবনে কখনও খাও নাই।"

বলিয়াই আবার চলিয়া গেল। আমি সেই অন্ধকার গুহায় স্তিমিত দীপালোকে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্রীড়াচঞ্চল যে হরিণটি আঁকিতেছিলাম তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা শঙ্কা ঘনাইয়া আসিয়াছে মনে হইল। মনে হইল সে বুঝি আমার কানে কানে কিছু বলিবে। তাহার মুখের

কাছে কানটা লইয়া গেলাম, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

...প্রদীপ হাতে করিয়া অন্ধকার গুহায় জোলমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে-ছিলাম। কোথায় গেল সে? প্রদীপের চকিত আলোকে প্রাচীরগাত্রে কখনও বাইসন্, কখনও বন্যমহিষ, কখনও বল্গা হরিণ, কখনও বন্যশূকর মূর্ত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল, গুহার অলিতে গলিতে বুহার শিল্পী-জীবনের আয়োজনসম্ভার ক্ষণিক আলোকে প্রকাশিত হইয়া আবার অন্ধকারে লুপ্ত হইতেছিল, আলো-আঁধারিতে মনে হইতেছিল আমাকে দেখিয়া বুঝি বা কেহ সরিয়া গেল, মনে হইতেছিল বুহার ছায়ামূর্তি হয় তো এখনই আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। প্রদীপ হস্তে গুহার পর গুহা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম কিন্তু জোলমাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না। কোথায় গেল সে...।

জিকাটু পাহাড়ে খোতারির দল সত্যই প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়াছিল। আমি যখন গেলাম তখন দেখি প্রায় শতাধিক লোকও সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। অনেকের হস্তে মশাল জ্বলিতেছে। আমাকে দেখিয়া খোতারি অগ্রসর হইয়া আসিল।

"আপনার আদেশ অনুসারে আগুনও আনা হইয়াছে। এইবার কি করিব বলুন।"

"শঙ্খচূড় গর্জন করিতেছে কি না স্বকর্ণে শুনিতে চাই।"

আমি পর্বতারোহণ করিতে লাগিলাম। সকলে নীরবে আমার অনুসরণ করিল।

...পর্বতশৃঙ্গ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া যে গুহামুখ আমি বন্ধ করিয়াছিলাম সেই গুহামুখে আসিয়া অবশেষে উপস্থিত হইলাম। গুহার মুখটি দেখিলাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধই আছে। প্রস্তরে কর্ণসংলগ্ন করিয়া বসিলাম। বেশীক্ষণ বসিতে হইল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্খচূড়ের তর্জন শুনিতে পাইলাম। খোতারি ঠিকই বলিয়াছিল। মনে হইতেছে পাহাড়ের ভিতরটা কে যেন তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। আমার সন্দেহ হইতে লাগিল বোধ হয় একাধিক শঙ্খচূড় ওই গুহায় বন্দী হইয়াছে। একটি শঙ্খ-চূড়ের পক্ষে এত তর্জন করা কি সম্ভব? আমি কি করিব পূর্বেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

"চল, একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে হইবে।"

পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম—যে স্থান হইতে বৃহৎ প্রস্তরটিকে স্থানচ্যুত করিয়া নীচে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে প্রস্তরটি স্থানচ্যুত করার ফলে একটা গর্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, সেই গর্তে কান দিয়া আমি শঙ্খচূড়ের তর্জন

শুনিতে পাইয়াছিলাম। তাহাতেই বুঝিতে পারি যে, নীচের গুহার সহিত এই গর্তের যোগ আছে। শংখচূড় পাছে এই গর্ত দিয়া বাহির হইয়া আসে সেজন্য এই গর্তটিও দ্বিতীয় একটি প্রস্তর দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। বন্ধ করিবার পূর্বে জ্বলন্ত শুষ্ক কাষ্ঠও উহার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছিলাম শংখচূড়কে পোড়াইয়া মারিবার জন্য। কিন্তু দেখিতেছি সে মরে নাই।

"এই প্রস্তরটিকে এইবার সরাও।"

প্রস্তরটি ছোট ছিল, অনায়াসেই সরানো গেল।

"এইবার ওই শুষ্ক কাষ্ঠগুলিতে আগুন ধরাইয়া গতের্র ভিতর ঢুকাইয়া দাও।"

প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। সেগুলিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া গর্তের ভিতর ফেলিতে অনেক সময় লাগিল। প্রায় সমস্ত দিনই লাগিয়া গেল। সমস্ত জ্বলন্ত কাষ্ঠগুলি গর্তে ঢুকাইয়া গর্তের মুখ আবার পাথর দিয়া ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলাম।

খোতারির দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কাল তোমরা আসিয়া শুনিও শংখ-চূড়ের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে কি না। আমার বিশ্বাস আজই সে সবংশে নিহত হইল, আর সে তোমাদের ভয় দেখাইতে পারিবে না। এই-বার আমরা জিকাটু পাহাড় অধিকার করিয়া বসবাস করিতে পারিব।"

খোতারি কিন্তু বিশেষ কিছু বলিল না। তাহার ভ্রূর ঈষৎ স্পন্দন হইতে অনুমান করিলাম যে, আমার কথার উপর সে খুব বেশি আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আরও অনেকের ভ্রূ স্পন্দিত হইতে লাগিল। যাহারা অল্পবয়স্ক যুবক তাহারাই কেবল হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালায় আগুন জ্বলিতেছে। প্রথম যেদিন বৃহার নিকট গিয়াছিলাম সেদিনও মেঘে এইরূপ অগ্নিশিখা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। আজ আবার করিলাম। রক্তের রঙে ওহালি এ কোন্ ছবি আঁকিতেছে? জোলমা কোথায়? তাহার পর হইতে জোলমার আর দেখা পাই নাই। অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া সেই রুক্ষ পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

...জিকাটু পর্বত হইতে বৃহার গুহায় যখন ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটা অজানা আশঙ্কায় আমার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি জোলমাকে খুঁজিতেছিলাম, মনে হইতেছিল তাহাকে আর বুঝি পাইব না। চতুর্দিকে অদ্ভুত একটা নীরবতা ঘনাইয়া আসিয়া-ছিল। গো বলিয়া গিয়াছে, আমার জন্য মাংস আনিবে, কিন্তু কোথায় সে? ঝাউঝাউটা পর্যন্ত নাই, গো তাহাকে লইয়া গিয়াছে। গুহার ভিতরটা অন্ধকার। জোলমা তাহার প্রদীপটা কোথায় রাখিয়া গিয়াছে কে জানে। অন্ধকারকে এতদিন অসহ্য মনে হয় নাই, সেদিন মনে হইতে লাগিল আর যেন অন্ধকারকে সহ্য করিতে পারিতেছি না। গুহার ভিতর হাতড়াইয়া

হাতড়াইয়া প্রদীপটা খুঁজিতেছিলাম, হঠাৎ কাহার গায়ে হাত ঠেকিল, চমকাইয়া উঠিলাম।

"কে?"

"আমি এলাহি। বেশি জোরে কথা বলিও না। গৌ হয় তো শুনিতে পাইবে। এটা রাখ।"

"কি?"

"সেই গাছের পাতা, যাহা দিয়া তোমার ঘা সারিয়াছিল। পাতাটা ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিও, খুব উপকারী পাতা।"

"এখন হঠাৎ পাতা আনিবার মানে? আমার ঘা তো সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে।"

"পাতাটা তোমাকে চিনাইবার জন্য আনিয়াছি। সেদিন তুমি পাতাটার নাম জানিতে চাহিয়াছিলে, মনে নাই? ইহার নাম আমি জানি না।"

"কাল দিনের বেলা চিনাইয়া দিলেই হইত।"

"কাল আমি থাকিব না।"

"কোথায় যইাবে?"

"যেদিকে দুই চক্ষু যায়। এখানে গৌ আমাকে থাকিতে দিবে না। আমি আজই লাফাই পাহাড় ত্যাগ করিব। এটা রাখ, ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগিবে, তা ছাড়া এটার জন্যই হয় তো আমাকেও মনে পড়িবে মাঝে মাঝে। আমি যাই—গৌ আসিতেছে—"

ত্রস্ত এলাহি সভয়ে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। আমি কয়েকটা পাতা হাতে করিয়া মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঝাউঝাউয়ের ডাক শোনা যাইতেছিল। একটু পরেই গৌ আসিল। তাহার সাড়া পাইয়া আমি গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম আকাশে চাঁদ উঠিতেছে। জ্যোৎস্নার পটভূমিকায় জোলমাকেও সহসা দেখিতে পাইলাম। সে ওহালির কাঠে হেলান দিয়া চন্দ্রোদয় দেখিতেছিল। নিস্পন্দ নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল সে। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জ্যোৎস্না, তাহার দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। গৌ ঝাউঝাউকে পাথরে বাঁধিয়া আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

"তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি। জোলমা কোথায়?"

অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিলাম। গৌ ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার চোখের দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। নিজেকে সম্বরণ করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠেই গৌ জোলমাকে আহ্বান করিল।

"জোলমা খাইবে এস।"

"আমার এখন খাইতে ইচ্ছা করিতেছে না।"

"কেন?"

"জানি না।"

গো-য়ের চক্ষুর দৃষ্টিতে আবার আগুন ধরিয়া গেল। নীরবে সে জোলমার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। জোলমার কিন্তু কোন ভাবান্তর হইল না, সে যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

"ও থাক্, তুমি চল।"

আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গো আমাকে গুহার ভিতরে লইয়া গেল। চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল, তাহার কটি-সংলগ্ন চর্মপেটিকা হইতে কিছু মাংস বাহির করিয়া আমরা মুখে গুঁজিয়া দিল। চিবাইয়া বুঝিতে পারিলাম শুধু মাংস নয়, মাংসের সহিত আরও কি যেন রহিয়াছে। কি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিতে না পারিলেও চিবাইয়া যাইতে লাগিলাম, এত সুস্বাদু মাংস ইতিপূর্বে কখনও খাই নাই।

"কেমন লাগিতেছে?"

"খুব ভাল। মাংসের সহিত আর কি আছে?"

"তিত্তিরের ডিম আর মধু। খাও, সবটাই তোমার জন্য আনিয়াছি।"

গো আমার মুখে মাংস তুলিয়া দিতে লাগিল, আমি লোভীর মত গ্রাস করিতে লাগিলাম। গো-য়ের চোখে মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা অবর্ণনীয়। হিংস্রতা, কোমলতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বিহ্বলতার সে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

"এইবার এই ফলগুলি খাও।"

"কি ফল?"

"মহুয়া। খাইয়াছ কখনও?"

"না।"

"খাইয়া দেখ, চমৎকার লাগিবে।"

খাইতে লাগিলাম। গো অনেকগুলি ফল আনিয়াছিল, সব নিঃশেষ হইয়া গেল। আরও থাকিলে তাহাও নিঃশেষ হইয়া যাইত। সমস্ত দেহ মনে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমশ অপূর্ব একটি উন্মাদনায় দেহের অণু-পরমাণু স্পন্দিত হইতে লাগিল। গো আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। বাহিরে জ্যোৎস্নাও হাসিতেছিল। সহসা জোলমা ভিতরে ঢুকিল, আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর গুহার অপর প্রান্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভূগর্ভেই নামিয়া গেল সম্ভবত।

"তুমিও যাও"—গো হাসিয়া বলিল।

"জোলমা না ডাকিলে—"

আমি ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেলাম। জোলমা না ডাকিলে জোলমার কাছে যাইব না—জোলমার অনুরোধেই এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম।

"জোলমা না ডাকিলে যাইবে না?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গো-য়ের চক্ষুর দৃষ্টি ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"কাপুরুষ, নপুংসক—"

গো আমার দুই গণ্ডে দুইটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই লাফাইয়া উঠিলাম। সেই মুহূর্তে যদি গো-কে নাগালের মধ্যে পাইতাম হয় তো তাহাকে শেষ করিয়া দিতাম। কিন্তু বাহিরে আসিয়া গো-কে দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

...গুহার ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম ভূগর্ভ হইতে মৃদু আলোর আভা গুহার অপর প্রান্তের অন্ধকারকে স্বচ্ছ করিয়াছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ নিজের সহিত যে তর্কে লিপ্ত ছিলাম ওই আলোর আভায় সেটা যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। জোলমা আমার স্ত্রী। তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে আমার বাধিতেছে কেন? ইহা কি সত্যই আমার কাপুরুষতা? একটা অজ্ঞাত ভয়ের বশবর্তী হইয়াই যে আমি এই অস্বাভাবিক আচরণ করিতেছি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিসের ভয়? ব্যাঘ্র-সমাজের কোন নিয়ম অমান্য করিলে ভয়ের কারণ ছিল, শ্যেনপক্ষী সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ যদি কিছু করিতাম তাহা হইলেও হয় তো শ্যেনপক্ষী দেবতা অসন্তুষ্ট হইতে পারিতেন, কিন্তু জোলমার সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহার হেতু জোলমার মধ্যেই আছে। জোলমাকেই কি আমি ভয় করিতেছি? জোলমার ক্ষমতা আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। বিশেষত সে যখন বনে থাকে তখন তাহার ময়ূরের দল সত্যই ভীতিপ্রদ, কিন্তু এখানে, এই অন্ধকার গুহার মধ্যে, কিসের ভয়? জামাইকিনার সঙ্গে যখন বিবাহ হইয়াছিল সে-ও কাছে ঘেঁষিতে দিত না। আঁচড়াইয়া দিত, কামড়াইয়া দিত, দূর হইতে পাথর ছুঁড়িত। বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বশ করিতে হইয়াছিল। জোলমাও নারী, সে-ও হয় তো নূতন রকম অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আমাকে প্রতিহত করিতেছে ... তা ছাড়া গো-কে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি ... সহসা মনে হইল জোলমাকেও কি প্রতিশ্রুতি দিই নাই? ...জোলমা বলিয়াছিল প্রয়োজন হইলে গো-কে সে শিশু আনিয়া দিবে, ওহালির আঁকা সেই প্রস্তরখণ্ড লইয়া...হঠাৎ আবার একটা কথা মনে হইল ...জোলমা লুকাইয়া কাহাকেও ভালবাসে না তো...হয়তো সেইজন্যই ছলনা করিয়া আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে, হয় তো পাথর লইয়া গভীর নিশীথে বৃক্ষতলে গিয়া সেই প্রণয়ীর সহিতই মিলিত হইবে ... গো ঠিকই বলিয়াছে, আমি নির্বোধ নপুংসক। কথাটা মনে হইবামাত্র শরীরের শিরায় উপশিরায় রক্তস্রোত উন্মাদ হইয়া উঠিল।

...ভূগর্ভে নামিয়া দেখিলাম জোলমা নাই। প্রদীপটা জ্বলিতেছে। প্রাচীরে বিশালশৃঙ্গ একটা বল্‌গা হরিণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া যেন বলিল—এই তো এইবার ঠিক পুরুষের মতো আচরণ করিতেছ!

"জোলমা!"

বিরাট গুহায় আমার চীৎকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রাচীর

গাত্রে অঙ্কিত পশুর দলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল যেন। তাহারা জীবন্ত হইয়া যেন আমাকে ঘিরিয়া ধরিল, তাহাদের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে লাগিলাম। নীরব ভাষায় তাহারা যেন বলিল, "রেখার বর্ণে আমাদের ইহারা বন্দী করিয়াছে, আমাদের বন্দীত্ব মোচন কর, তুমিও মুক্ত হও, চল আবার আমরা সেই উদ্দাম আরণ্য জীবনে ফিরিয়া যাই। এই মোহ-কারাগার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দাও ..."

"জোলমা!"

গুহা-প্রান্তের অন্ধকারটা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। তাহার পরই দেখিলাম জোলমা আগাইয়া আসিতেছে। তাহার অঙ্গে কোন আবরণ নাই, ওহালির সেই বর্ণবিচিত্র পাথরটা কেবল সে বুকের কাছে ধরিয়া আছে। আমার কাছে আসিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "এখন আসিলে কেন, আমি তো তোমায় ডাকি নাই।"

"তুমি কোথা ছিলে? কি করিতেছ?"

"আমি এই পাথরটা লইয়া বনে যাইতেছিলাম।"

"কেন?"

"তোমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য। আমার কোলে গৌ যদি শিশু না দেখে তাহা হইলে—"

"তাহার জন্য তোমাকে বনে যাইতে হইবে না।"

আগাইয়া গিয়া আমি তাহার হাত ধরিলাম।

"ইহার অর্থ?"

তাহার হাত হইতে পাথরটা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

"এ কি? ছি, ছি, ছাড়, ছাড়—"

আমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া জোলমা ছটফট করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমাকে ঘিরিয়া হরিণ, বাইসন, মহিষ, শূকরের দল জয়ধ্বনি দিতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভীষণ শব্দ হইল। সেরূপ ভীষণ শব্দ আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। তাহার পরই চতুর্দিক কাঁপিতে লাগিল, মনে হইল পাহাড়টা বুঝি এখনই ধ্বসিয়া যাইবে। জোলমাকে ছাড়িয়া আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়াও দেখিলাম চতুর্দিক কাঁপিতেছে। আবার ভীষণ শব্দ হইল একটা। তাহার পর আবার। মুহুর্মুহু যেন বজ্রপাত হইতে লাগিল। ছুটিয়া পাহাড় হইতে নামিতে গেলাম, কিন্তু নামিতে পারিলাম না। মাটি এত কাঁপিতেছিল যে, দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব ছিল না, নামিতে গিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। শেষে গড়াইয়া গড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া যখন সমতলে পৌঁছিলাম তখন দেখি সম্মুখেই বড় একটা গাছ রহিয়াছে। তাহাতেই আরোহণ করিতে লাগিলাম। সর্বপ্রকার আপদে বিপদে যে বৃক্ষদেবতা চিরকাল আমাদের আশ্রয় দিয়াছে তাহার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

...অন্ধকারের মধ্যেই একটা কলকলধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলাম। প্রভাতের আলোকে যাহা দেখিলাম তাহা বিস্ময়কর। চতুর্দিক জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বহুদূরে একটা পাহাড়ের চূড়া জাগিয়া আছে কেবল, আর কিছু নাই। লাফাই পাহাড়, বুহার গুহা সমস্ত জলমগ্ন। চক্রবালরেখা পর্যন্ত কেবল জল, জল, জল। বহু জন্তু জানোয়ার ভাসিয়া যাইতেছে। বন্য মহিষ, বাইসন, শূকর, বলগা হরিণ ... । সহসা গাছের চূড়া হইতে বলগা হরিণের ডাক শুনিতে পাইলাম। ভাসমান বলগা হরিণেরা সে ডাক শুনিয়া ইতস্তত চাহিতে লাগিল। বিতং না কি? উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—হাঁ, বিতংই বটে। আমাকে দেখিয়া বিতং নামিয়া আসিল।

"বিতং, সহসা এ কি হইল?"

"জিকাটু পাহাড় কাল রাত্রে ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতে এই কাণ্ড। তোমরা নাগ-প্রেতকে পোড়াইয়া মারিবে ভাবিয়াছিলে। অত সহজ নয়। পাতাল হইতে জল উঠিয়া তোমাদের আগুন নিভাইয়া দিল। শ্যেনপক্ষীরা নাগদের ধ্বংস করিয়াছিল, নাগ দলপতি তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িয়াছে। আমি এবার চলি—"

"কোথায়?"

"ওই বলগা হরিণদের সঙ্গে। উহারা যেখানে যাইবে আমিও সেখানে যাইব। চলি—"

বিতং ঝপাং করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সে দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। আমি কি করিব? কত দিন এই বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া থাকিব? সহসা দেখিতে পাইলাম জোলমা ভাসিয়া চলিয়াছে। ঘোর রক্তবর্ণ ওহালির গাছের উপর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সে। তাহার দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। গো মুনজুটকে যাহা বলিয়াছিল তাহা মনে পড়িল। ওহালির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, জোলমা ভাসিয়া চলিয়াছে। আমি নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার সমস্ত চেতনা অসাড় হইয়া গিয়াছিল। আমিও জলে লাফাইয়া পড়িয়া অনায়াসেই জোলমার অনুসরণ করিতে পারিতাম কিন্তু তাহা করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। জীবনে যে অনুভূতি ইতিপূর্বে কখনও আমাকে বিহ্বল করে নাই সেই অনুভূতি আমার সমস্ত চিত্তকে বিকল করিয়া দিয়াছিল। আমি লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে জোলমাকে লাভ করিবার জন্য আমি মিথ্যাচরণ, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ, এমন কি হত্যা পর্যন্ত করিতে ইতস্তত করি নাই, যাহাকে লাভ করিলে আমার জীবন ধন্য হইয়া যাইত, সেই জোলমা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া চলিয়া গেল, আমি তাহার কাছে গিয়া তাহার চোখের দিকে তাকাইবার সাহস পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। আমার বন্য জীবনে যে অপূর্ব স্বপ্ন বর্ণসমারোহে কিছুকালের জন্য মূর্ত হইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা মিলাইয়া গেল, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিলাম না। কেবল

অস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে লাগিলাম স্থূল হস্ত দিয়া জোলমাকে ধরা যায় না। আমি আকাশ-কন্যাকে বাসনার ফাঁদে বন্দিনী করিতে গিয়া কেবল অপ্রস্তুত হইয়াছি মাত্র। নিজের এই শোচনীয় পরাভবের জন্য মনে কোনও গ্লানিও হইতেছিল না। অন্তরের অন্তস্থলে মনে হইতেছিল ঠিকই হইয়াছে। জোলমা যদি সামান্য রমণীর মতো আমার বাহুপাশে ধরা দিয়া আমার লালসার ইন্ধন যোগাইত তাহা হইলে কেমন যেন ছন্দপতন হইত, দেবতার অপমান হইত। একথা সেই অসভ্য যুগেও আমার বর্বর হৃদয়ে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছিলাম। আকাশ যেখানে আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে জোলমা দেখিতে দেখিতে সেই দিগন্ত-রেখায় বিলীন হইয়া গেল। হয় তো বুহা এবং ওহালি সেখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল।

...আমি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আরও হয় তো অনেকক্ষণ থাকিতাম, কিন্তু জলের বেগ বাড়িয়া গাছটা নড়িতে লাগিল। গাছে বসিয়া থাকা আর নিরাপদ মনে হইল না। জলে লাফাইয়া পড়িলাম এবং দূরবর্তী পর্বত-চূড়া লক্ষ্য করিয়া সন্তরণ দিতে লাগিলাম।

...পর্বত চূড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখি বিরাট একটা গুহা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া তাহারই ভিতর অবশেষে অবতরণ করিলাম। সেই গুহার সুড়ঙ্গ পথে কতকাল যে চলিয়াছি তাহার ঠিক নাই। কত শতাব্দীর পর শতাব্দী। সেই অন্ধকার যাত্রার স্মৃতি অস্পষ্টভাবে কিছু মনে আছে। সমস্তই মুছিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ছবি স্পষ্ট হইয়া আছে। যদিও আমি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবন অতিবাহিত করি কিন্তু আমার মনে হইতেছে, আমি যেন সেই গুহার সুড়ঙ্গপথেই যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়াছি। সুড়ঙ্গপথের বাঁকে বাঁকে যেন নূতন নূতন লোক ভীড় করিয়া আসিয়াছে, তা সহিত কিছুকাল কাটাইয়া আবার আমার নূতন যাত্রা শুরু হইয়াছে। যেন স্বপ্নের মতো মনে হইতেছে।

...আবার সেই তুষার দেশ। এবার আমি পুরুষ নই। আমি ঝিলমের স্ত্রী জিতা। ঝিলম 'কোয়াক' নামক নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে তিমি শিকার করিতে গিয়াছে, আমি হরিণ-চর্ম নির্মিত তাঁবুর সম্মুখে বসিয়া চাটিয়া চাটিয়া আমার সন্তানদের অঙ্গ পরিষ্কার করিতেছি। আমার পরিধানে শীল চর্মের পরিচ্ছদ। আমার স্বামীর সহিত আরও জন কয়েক গিয়াছে। তিমি মাছ দেখা গেলে সকলে একসঙ্গে হার্পুন নিক্ষেপ করিবে, তাহার পর তিমিকে তাড়াইয়া অগভীর জলে লইয়া গিয়া তাহাকে শিকার করিবে। তিমি একটা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের শীত-ভবন এখনও প্রস্তুত হয় নাই, কুকুরের গাড়িটাও ভাঙিয়া গিয়াছে। তিমি পাওয়া গেলে শুধু যে তাহার মাংস এবং

চর্বি আমাদের কাজে লাগিবে তাহা নয়, তাহার পঞ্জর দিয়া আমাদের শীত-ভবনের কড়ি-বরগা হইবে, তাহার চোয়ালের হাড় দিয়া আমরা আমাদের কুকুরের গাড়ি নির্মাণ করিব। পূঠার কাছে শুনিয়াছিলাম টিটিভ সম্প্রদায়ের লোকেরা কুকুরের গাড়ি চড়িত। আমি এখন যে সমাজে আছি সে সমাজের সহিত টিট্টিভ সম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক ছিল কি কোন কালে? কে জানে। বলগা হরিণ এখনও আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু তাহাদের আমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রাচীর-গাত্রে আর ছবি আঁকিতে হয় না। ঝিলম এবং তাহার সঙ্গীরা তাহাদের গমনাগমনের পথে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। গ্রীষ্ম আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বে বলগা হরিণের দল অরণ্যভূমি ত্যাগ করিয়া তুন্দ্রা পার হইয়া বরফের উপর দিয়া উত্তর দিকে চলিতে থাকে। তাহারা যখন আমাদের এলাকায় আসে তখন ঝিলম এবং তাহার সঙ্গীরা তাহাদের শিকার করে। গ্রীষ্ম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলিয়া যায়। বলগা হরিণের দল যে দ্বীপগুলিতে গিয়া আশ্রয় লয় সেগুলি তখন আমাদের তটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন আমরা বলগা হরিণদের নাগাল আর পাই না। গ্রীষ্মকালে দ্বীপগুলি তৃণাচ্ছাদিত হইয়া যায়, বলগা হরিণরা তখন সেখানে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। সে সময় আমরা মাছ শিকার করি। জাল দিয়া অনেক রকম মাছ ধরিতে শিখিয়াছি। আমরাই, মানে মেয়েরাই, মাছ ধরি। ছেলেমেয়েরাও আমাদের সাহায্য করে। কিনাপা (আমার বড় ছেলে) এ বিষয়ে খুব পারদর্শী। অনেক রকম মাছ পাওয়া যায়। এক রকম শাদা মাছ আমাদের খুব প্রিয়। আমরা উহাদের নাম দিয়াছি 'জলের বলগা হরিণ'। পুরুষরা পাখীও শিকার করে। উড়ন্ত পাখীকে বর্শা দিয়া গাঁথিয়া ফেলে। ভীষণ-দর্শন লোমশ কস্তুরী-বৃষও তাহারা শিকার করে। গ্রীষ্মের পরে শীত আসে। সমুদ্রের জল আবার জমিয়া যায়। দ্বীপগুলিতে তৃণগুল্মও থাকে না। বলগা হরিণের দল তখন আবার অরণ্যে ফিরিয়া আসে। ফিরিবার মুখে ঝিলমের দল আবার তাহাদের শিকার করে। পাথর গাঁথিয়া গাঁথিয়া প্রকাণ্ড দুইটি প্রাচীর হ্রদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করা আছে। ঝিলমের দল তাড়া দিয়া হরিণদের সেই প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। ঝিলম হ্রদের উপর নৌকায় বসিয়া থাকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া। হরিণের দল হ্রদের সমীপবর্তী হইলেই তাহাদের শিকার করে। এইভাবে দিনের পর দিন কাটিতেছে, শীতের পর গ্রীষ্ম। এই ছবিটুকুই শুধু মনে আছে, আর সব ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর যে চিত্রটি মনে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার পটভূমি তুষারের দেশে নয়। পর্বতও নয়, অরণ্যও নয়। আমি ক্ষুদ্র একটি গ্রামে রহিয়াছি। এবার আমি পুরুষ, কিন্তু যুবক নহি। আমার বয়স মাত্র দশ বৎসর। যে বিশেষ দিনটির কথা মনে পড়িতেছে সেদিন আমার দীক্ষা। সেইদিনই আমি সমাজের

দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হইব। আমি আমার মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। আমি যে সমাজে আছি সে সমাজে প্রথম সন্তানকে বাঁচিতে দেওয়া হয় না। ইহাদের ধারণা প্রথম সন্তানের দেহ অপুষ্ট থাকে, তাছাড়া তাহার পিতার পরিচয়ও সুনির্দিষ্ট থাকে না অনেক সময়। সেইজন্য প্রথম সন্তান সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ আগ্রহ নাই। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই প্রথম সন্তানই দ্বিতীয় সন্তানরূপে মাতৃগর্ভে আবার আবির্ভূত হয় ইহাই সকলের বিশ্বাস এবং জননীর সান্ত্বনা। আমি সেই দ্বিতীয় সন্তান। আমি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত জননীর স্তন্য পান করিয়াছি। আমাকে আনন্দ দান করিবার জন্য আমার পিতামাতা কত কি যে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পাখী ধরিয়া দিয়াছেন, কড়ির মালা কিনিয়া দিয়াছেন, ছাগলের চামড়া দিয়া টুপি করিয়া দিয়াছেন। আমাকে পিঠে করিয়া বেড়াইয়াছেন, আমার সহিত ছাগল-ভালুক খেলা করিয়াছেন। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি যাহা চাহিয়াছি পাইয়াছি, যাহা খুশি করিয়াছি, কেহ বাধা দেয় নাই।

এইবার কিন্তু আমাকে নিয়মের বশবর্তী হইতে হইবে। দীক্ষা লইতে হইবে। আজ আমার সেই দীক্ষা দিবস। প্রভাতেই গ্রামের লোকেরা আসিয়া আমাকে আমার মায়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। গান গাহিয়া বলিয়াছে, "ওগো মা, তোমার ছেলেকে আর খোকা করিয়া রাখিও না, এবার সে পুরুষ হোক, এবার সে সমাজের হোক, এবার সে ভার বহিতে শিখুক, কষ্টসহিষ্ণু হোক, শিকারী হোক।" মা আমাকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন, মায়ের কোল হইতে তাহারা আমাকে তুলিয়া লইয়া গেল। তাহাদের সহিত গিয়া নদীতে স্নান করিলাম। সকলে মিলিয়া আমাকে স্নান করাইল। আমার সমবয়সী বালিকারা জলে নামিয়া আমার অঙ্গ মার্জনা করিয়া দিল। আমার দীক্ষার পর তাহাদেরই ভিতর হইতে আমাকে ভাবী বধূ নির্বাচন করিতে হইবে।

স্নান শেষ করিয়া গ্রামপ্রান্তের বিরাট প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রান্তর পূর্বেই পরিষ্কৃত হইয়াছিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম গ্রামের যুবকদল আমার অপেক্ষায় সমবেত হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহার পর আমাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া তাহারা প্রত্যেকে কুকুর সাজিয়া আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই হামাগুড়ি দিয়া চতুষ্পদ কুকুরের মতোই চলিতেছিল, ছোট ছোট লাঠি কোমরে বাঁধিয়া প্রত্যেকে একটা করিয়া ল্যাজও বানাইয়া লইয়াছিল, মুখে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ শব্দও করিতেছিল। আমি মধ্যস্থলে নীরবে বসিয়া রহিলাম, মানুষ-কুকুরের দল আমাকে ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। আমি তখন যে সমাজে ছিলাম সে সমাজে সকলের ধারণা ছিল যে এরূপভাবে প্রদক্ষিণ করিলে কুকুরের সমস্ত সদ্‌গুণ আমার মধ্যে প্রবেশ করিবে। আমিও কুকুরের মতো শিকারী ও সাবধানী হইব। আমার ঘ্রাণশক্তি এবং দৃষ্টি-শক্তিও কুকুরের মত তীক্ষ্ণ তীব্র হইবে। প্রদক্ষিণকারীরা

কুকুরের সমস্তপ্রকার হাবভাবের অনুকরণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ প্রদক্ষিণ করিবার পর মানুষ-কুকুরেরা চলিয়া গেল, আসিল মানুষ-ক্যাঙারুরা। তাহারাও ক্যাঙারুর ল্যাজের অনুকরণে খড়ের ল্যাজ পরিয়া আসিয়াছিল, ক্যাঙারুর মতো হাবভাব করিতে করিতে তাহারাও আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা অতিশয় বেদনা-দায়ক ব্যাপার। একজন বৃদ্ধ আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। আমি তাহার কাঁধের উপর বসিয়া তাহার বুকের দুইধারে পা ঝুলাইয়া দিয়া তাহার মাথাটি ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। আর একজন পিছন দিক হইতে আমার মাথাটা টানিয়া ধরিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি একটি পাথরের ছোট নোড়া আনিয়া আমার সম্মুখের দন্তে আঘাত করিতে লাগিল। দুই-তিন আঘাতেই আমার দাঁতটা ভাঙিয়া গেল এবং আমি তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ তখন বলিতে লাগিল—"কাঁদিও না, বেদনা সহ্য কর, বেদনায় অধীর হয় নারীরা, তুমি পুরুষ, তুমি সহ্য কর।"

ইহার পর তাহারা আমাকে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে বসাইয়া দিয়া গেল। আমি ভগ্ন দন্তের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, প্রচুর রক্তপাতও হইতেছিল, কিন্তু আমি ভয়ে কাঁদিতে পারিতেছিলাম না। যে বৃদ্ধের স্কন্ধে আমি বসিয়াছিলাম সেই বৃদ্ধও নিষ্পলক নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার সম্মুখে বসিয়াছিল। তাহার ঠোঁট দুইটা নড়িতেছিল, কিন্তু সে কি বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বৃদ্ধ লেহন আমাদের গ্রাম-পতি, সকলে তাহাকে ভয় করে। যখন তাহার ঠোঁট নড়ে অথচ কথা শোনা যায় না তখন সে নাকি মনে মনে মন্ত্রপাঠ করে এবং সে মন্ত্র না কি ভয়ানক। বৃদ্ধ লেহন যখন চটিয়া যায় তখনই নাকি ওইভাবে মন্ত্র পড়ে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার উদ্‌গত অশ্রু চোখেই শুকাইল। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া লেহন চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতে লাগিল। আমি অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি আমাদের গ্রামের পুরোহিত-চিকিৎসক ঝলক্‌নীল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। ঝলক্‌নীলের নাকের ডগায় বিরাট একটা কালো আঁচিল, দুই কানে দুইটা বাঘের দাঁত গোঁজা, কপালে, গালে নানা বর্ণের চিত্রবিচিত্র করা। তাহাকে দেখিয়া আমি ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিলাম। বাল্যকালে আমার অসুখের সময় সে একবার আসিয়াছিল, আসিয়া আমাকে একটা গাছের ডাল দিয়া আপাদমস্তক প্রহার করিয়াছিল। মারের চোটে আমার অসুখ সারিয়া যায়। ঝলক্‌নীল বলিল, "ভয় নাই। আমি যাহা বলিতেছি তাহা মন দিয়া শোন। এ উপদেশ যদি পালন করিতে পার জীবনে কখনও কষ্ট পাইবে না, মৃত্যুর পরও সুখে থাকিবে। শোন, খুব বেশি স্বার্থপর হইও না, যাহা শিকার করিবে তাহা একা ভোগ করিও না। সকলে মিলিয়া ভোগ করিলে বেশি আনন্দ পাইবে। কলহ করিও না, শান্তিতে থাকিবার চেষ্টা করিবে। মিথ্যা কথা বলিবে না,

চুরি করিবে না। গুরুজনের কথা মান্য করিবে। তোমাদের কুলদেবতা বানরের মাংস কখনও খাইবে না। বানরের যাহাতে অপকার হয় তাহাও কখনও করিবে না। স্ত্রীলোকদের বেশি প্রশ্রয় দিও না। বেশি স্ত্রীলোকের সংস্রবেও আসিও না। গ্রামের সমস্ত লোককে নিজের লোক মনে করিবে। জানিবে তাহাদের সম্মানে তোমার সম্মান, তাহাদের অপমানে তোমার অপমান। যাহা বলিলাম, তাহা যদি পালন কর হোমভু তোমার সহায় হইবেন। হোমভু সর্বত্র আছেন। আকাশে তাঁহার বাড়ি, কিন্তু থাকেন তিনি সর্বত্র, কে কি করিতেছে সব লক্ষ্য করেন। পাপ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। যত লুকাইয়াই পাপ কর না কেন হোমভু দেখিতে পাইবেন। সুতরাং সাবধান। আমি যাহা বলিলাম তাহা মনে গাঁথিয়া লও। ভাল করিয়া গাঁথিয়া লও। একা একা বসিয়া প্রত্যেক কথাটি ভাব। আমি আবার কাল আসিব।..."

ঝলক্‌নীল চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল আমার মা, আমার খাবার লইয়া। খাবার আমার কাছে রাখিয়াই মা চলিয়া গেল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল না পর্যন্ত। দেখিবার নিয়ম নাই। আমি একা বসিয়া বসিয়া ঝলক্‌নীলের কথাগুলি মনে মনে রোমন্থন করিতে লাগিলাম। সহসা চোখে পড়িল একটি কাক সম্মুখের বৃক্ষে বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমি তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল—কা, কা। আমি শুনিলাম সে যেন খা খা বলিতেছে। কেন জানি না একটা অদ্ভুত কথা মনে হইল। মনে হইল মায়ের মনের কথা বোধ হয় কাকের মুখে ব্যক্ত হইতেছে। আমি যতদিন এই ঝোপে থাকিব মা আমার সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতে পাইবে না। এই কাক বোধ হয় তাই...। বিস্মিত দৃষ্টিতে কাকের দিকে আবার চাহিলাম। কাক আবার বলিল, "খা খা।" আহারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কিছু খাবার লইয়া কাককে ছুঁড়িয়া দিলাম। কাক মহানন্দে নামিয়া মাংসের টুকরাটি লইয়া ডালে বসিল এবং ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। ঝলক্‌নীলের কথাগুলি আবার যেন শুনিতে পাইলাম, "খুব বেশি স্বার্থপর হইও না। সকলে মিলিয়া ভোগ করিলে বেশি আনন্দ পাইবে—।" সত্যিই আমার খুব আনন্দ হইতেছিল। আর এক টুকরা মাংস কাককে দিলাম। আমি যতদিন ঝোপে ছিলাম কাকটা রোজ আসিত। ঝলক্‌নীলও আসিত এবং আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিয়া যাইত—"ভয় নাই। আমি যাহা বলিতেছি মন দিয়া শোন। এ উপদেশ যদি পালন করিতে পার জীবনে কখনও কষ্ট পাইবে না, মৃত্যুর পরও সুখে থাকিবে। শোন, খুব বেশি স্বার্থপর হইও না..."

এই এক কথা এক সুরে দিনের পর দিন সে আমাকে শুনাইয়া যাইত। আমি সেই ঝোপের মধ্যে তিনমাস ছিলাম। একা ছিলাম। রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া একা সেই ঝোপের মধ্যে বসিয়া ঝলক্‌নীলের উপদেশগুলি অন্তরে গাঁথিয়া লইতেছিলাম। দ্বিতীয় কোনও মানুষের কণ্ঠস্বর আর

শুনি নাই। পাখীর স্বর শুনিতাম, তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতাম। একদল বক রোজ ঝাঁক বাঁধিয়া সন্ধ্যার পূর্বে উড়িয়া যাইত, একটা নীলকণ্ঠ প্রতিদিন বৈকালে সজিনা গাছের উচ্চতম শাখাটায় বসিয়া ল্যাজ দোলাইয়া ড্যা ড্যা শব্দ করিত, আকাশে মেঘের রূপ দেখিতাম। রাত্রে শ্বাপদেরা চীৎকার করিত। গ্রামের ভিতর ঢুকিতে সাহস করিত না। আমার কাছে কোন দিন আসে নাই। পরে শুনিয়াছিলাম যে গ্রামের যুবকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রতি রাত্রে আমাকে পাহারা দিত, কিন্তু একথা আমাকে তখন কেহ জানায় নাই। ঝলক্‌নীল আমার নিকট কিছু অস্ত্র রাখিয়া গিয়াছিল। বলিয়াছিল, বিপদে পড়িলে আমি যেন নিজেই আত্মরক্ষা করি। বলিয়াছিল, "তুমি নিজে যদি নিজের সহায় হও, হোমভু তোমার সহায় হইবেন। যাহারা পরমুখাপেক্ষী তাহাদের হোমভু সাহায্য করেন না।" তোমরা যাহাকে ভগবান বল আমরা তখন তাহাকেই হোমভু বলিতাম। এই তিনমাস ধরিয়া হোমভুরই চিন্তা করিয়াছি। আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিয়াছি হোমভু যদি এখন একবার নামিয়া আসেন বড় ভাল হয়, তাহার সহিত আলাপ করি। পরমুহূর্তেই স্তূপীকৃত মেঘের রাশিতে অস্তমান সূর্যের রক্তিমাভা দেখিয়া মনে হইয়াছে হোমভু এখন মেঘ রাঙ্গাইতে ব্যস্ত, আমার নিকট আসিবার তাঁহার বোধ হয় অবসর নাই। ঝোপের ভিতর বসিয়া কত কি ভাবিতাম। টৌনটু এবং লিমার কথাও মনে হইত। টৌনটু এবং লিমা দুইজনকেই আমার ভাল লাগে। ইহাদের মধ্যে কাহাকে বিবাহ করিব জানি না। আমার দুইজনকেই বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে। লিমার বাবা গরীব। সে দুইটি শঙ্খের মালা এবং একটি শৃগালের চর্ম দিতে পারে। আমার মা চারিটি শঙ্খের মালা এবং একটি ব্যাঘ্র-চর্ম দাবি করিয়াছেন। টৌনটুর বাবা হয়তো মায়ের দাবি মিটাইতে পারিবে। লিমার চোখ দুইটি মানসপটে জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। লিমার চোখের তারায় আকাশের তারা জ্বলিত। কিন্তু মনে হইত—হায়, তাহাকে পাইব না বোধ হয়।

এখন কোথায় টৌনটু, কোথায় লিমা, কোথায় ঝলক্‌নীল, কোথায় বা সেই গ্রাম? সব হারাইয়া গিয়াছে। সামান্য ছবির টুকরাটুকু স্মৃতির কোঠায় পড়িয়া আছে। দুদিন পরে হয়তো ইহাও থাকিবে না।

...অন্ধকার গুহাপথে বিরামহীন চলিয়াছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইতেছে।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। নৌকার উপর বর্শা হস্তে একা দাঁড়াইয়া আছি। জোরে বাতাস বহিতেছে। হ্রদের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাষা জাগিয়াছে। ঘো আমার

পাশে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘো মানুষ নয়, কুকুর। আমরা কুকুর পুষিতে শিখিয়াছি। আগুন এবং পাথরের মতো কুকুরও আমাদের জীবন-সংগ্রামে সহায় হইয়াছে। জীবন-সংগ্রাম এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, অহরহ সচেষ্ট না থাকিলে প্রাণধারণ করা দুষ্কর। শিকার কমিয়া গিয়াছে। যথেচ্ছ শিকার করিবার সুযোগও নাই। যে সব বনে শিকার পাওয়া যায়, সবল মানুষেরা তাহা অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বিদূরিত হইয়াছি। আত্মরক্ষা করিবার জন্য হ্রদের মধ্যস্থলে বড় বড় নৌকায় বাস করিতেছি। হ্রদের মধ্যস্থলে নৌকার গ্রাম। সেই গ্রামের আমি দলপতি। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ঘো-কে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ গোপনে শিকার করিয়া বেড়াই। ভৃঙ্গ সম্প্রদায় সমস্ত বনটা দখল করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রে তাহারা উৎসবে মাতিয়া থাকে সেই সময় আমি আর ঘো গিয়া তাহাদের বনে হানা দিই। ঘো-র দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তির সাহায্য না পাইলে শিকার করিতে পারিতাম না। বনের মধ্যে কোথায় হরিণ লুকাইয়া আছে ঘো তাহা ঠিক বাহির করিতে পারে, তাহার পর সেটাকে তাড়াইয়া আমার নাগালের মধ্যে লইয়া আসে। ঘো এখন আমার জীবনে অপরিহার্য। ঘোর পূর্বে আমার যে কুকুরটি ছিল তাহার নাম ছিল জিঘা। ভৃঙ্গ সম্প্রদায়ের শরাঘাতে জিঘা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার দাঁত-গুলি মালা করিয়া আমি গলায় পরিধান করিয়া রহিয়াছি।

...বাতাসের বেগ বাড়িতেছে। গোধা, অবহি, চোনা এখনও বাহির হইতেছে না কেন? গোধা, অবহি আমার দুই পুত্র। তাহারাও আমার সঙ্গে শিকারে বাহির হইবে। গোধার বয়স তের, অবহির এগারো। ভৃঙ্গ সম্প্রদায়কে ফাঁকি দিয়া কতরূপে তাহাদের বন হইতে শিকার সংগ্রহ করা যায় তাহার কৌশল তাহাদের শিখাইতেছি। চোনা আমার কন্যা, বয়স ষোল। সে-ও আমাদের সহিত বাহির হইবে। ঘোর মতো সে-ও আমাদের শিকারের একজন প্রধান সহায়। সে কিন্তু সহায়তা করে অন্যপ্রকারে। সে শঙ্খের গহনা পরিয়া, কড়ির মেখলা দুলাইয়া, সর্বাঙ্গ নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, চোখে মুখে হাবভাব ফুটাইয়া ভৃঙ্গ সম্প্রদায়ের বন-রক্ষকদের ভুলাইতে যায়। চোনা গান গাহিতে পারে, নাচিতেও পারে। ভৃঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের দূর করিয়া দিয়াছে বটে, আমাদের সম্প্রদায়ের কোনও পুরুষকে তাহারা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে তাহাদের মোহের অন্ত নাই। আমরা তাহাদের এই দুর্বলতার সুযোগ লইতে ছাড়ি না। বনরক্ষক ভুরুষ ভয়ানক লোক। তাহার দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ন, শক্তিও তেমনি প্রচুর। অব্যর্থ হাতের লক্ষ্য। ভুরুষই জিঘাকে শেষ করিয়াছিল। ভুরুষ কিন্তু চোনাকে দেখিলে আত্মহারা হইয়া পড়ে। চোনা তাহাকে লইয়া যাহা খুশি করিতে পারে। এখনও কিন্তু উহারা বাহির হইতেছে না কেন? চোনার সাজসজ্জা করিতে দেরি হইতেছে না কি? চোনা কিন্তু সাধারণত দেরি করে না। তবে কি গোধা অবহি ভয় পাইয়াছে? দুইদিন পূর্বে শিকার করিতে গিয়া আমার

জ্যেষ্ঠপুত্র লোহা ভুরুষের বর্শার আঘাতে নিহত হইয়াছে। ভুরুষের বর্শা তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছিল। কালই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া সেই মুণ্ডটি আমরা সমাধিস্থ করিয়াছি। দেহটি ভস্মীভূত করিয়া ভস্মগুলি হ্রদের জলে ছড়াইয়া দিয়াছি। গোধা অবহি নিজেরাই এসব করিয়াছে। লোহার মৃত্যু কি তাহাদের কর্তব্যে বাধা দিতেছে? লোহার প্রেতাত্মা তাহাদের কি শিকারে যাইতে বারণ করিয়া গিয়াছে? বহু প্রকার সম্ভাবনা মনের মধ্যে ভীড় করিয়া আসিল। বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল। "ঘউ, ঘউ, ঘউ"—ঘো অধীর হইয়া উঠিয়াছে। উহারা কেন বিলম্ব করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আমিই হয় তো ফিরিয়া যাইতাম, কিন্তু আমার ফিরিবার উপায় ছিল না। আমি কুলদেবতাকে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলাম শিকারের সঙ্কল্প লইয়া। শিকার লইয়া না ফিরিলে কুলদেবতা অসন্তুষ্ট হইবেন। যতক্ষণ শিকার করিতে না পারিব ততক্ষণ ঘরে ফিরিব না এই সঙ্কল্প লইয়া গৃহ ছাড়িয়া বাহির হই, শিকার লইয়া তবে গৃহে ফিরি। অনেক সময় দিনের পর দিন বাহিরে থাকিতে হয়। জঙ্গলে বা গুহায় লুকাইয়া থাকি। সুতরাং উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

...ওই যে চোনা আসিতেছে। গোধা, অবহি কোথা? চোনার পিছু পিছু চোনার মা শীলিনাও আসিতেছে দেখিতেছি। শীলিনা কখন ফিরিল? সে হরিণের শিং লইয়া নাভা গ্রামে গিয়াছিল। তাহার বদলে রঙ্গীন ঝিনুক, কড়ি এবং শঙ্খ আনিয়াছে নিশ্চয়। তাহারা কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোধা, অবহি কোথা? তাহারা আসিতেছে না কেন?"

শীলিনা বলিল, "তাহাদের বদলে আজ আমি যাইব।"

"তুমি চল আপত্তি নাই। কিন্তু গোধা অবহি যাইবে না কেন?"

শীলিনা চুপ করিয়া রহিল। শীলিনার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম সে-ও রণসজ্জায় সাজিয়া আসিয়াছে। তাহারও চোখে মুখে বর্ণের সমারোহ। কণ্ঠে হস্তে কটিদেশে রঙ্গীন ঝিনুকের গহনা। কোমরে একটি ছোরা গোঁজা।

"গোধা অবহি কোথা?"

"তাহাদের আমি বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। যে যম আমার লোহাকে হরণ করিয়াছে, তাহার সহিত আগে বোঝাপড়া করিতে চাই—"

"ঘউ ঘউ ঘউ—"

ঘো পুচ্ছ আন্দোলন করিয়া যেন শীলিনাকে সমর্থন করিল।

"তাহাদের বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছ? তাহারা কি এখনও শিশু আছে যে জলে পড়িয়া যাইবার ভয়ে তাহাদের বাঁধিয়া রাখিতে হইবে! লোহার বুকে যখন ভুরুষের বর্শা বিদ্ধ হয় তখন গোধা অবহি নিকটেই ছিল। লোহার মৃত্যু তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। সে মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার সুযোগ তাহারাই বা পাইবে না কেন? উহাদের ডাকিয়া আন।"

শীলিনা তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

"যাও।"

শীলিনা তবু গেল না। আমার মুখের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে অনুভব করিতেছিল যে শেষ পর্যন্ত তাহাকে হার মানিতেই হইবে, তবু দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, সজোরে তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলাম। আর্তনাদ করিয়া শীলিনা হ্রদের জলে পড়িয়া গেল। সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। চোনার দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে আদেশ করিলাম, "শীঘ্র উহাদের ডাকিয়া আন।" চোনা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর ছুটিয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই দেখিলাম সে গোধা ও অবহিকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছে। গোধার চোখে জল, অবহির মুখ বিবর্ণ। চোনা যদিও মুচকি মুচকি হাসিতেছিল, কিন্তু তাহার হাসির অন্তরালে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ভুরুষকে ভুলাইতে যাইবার ইচ্ছা তাহারও ছিল না। আমার ভয়েই সে সাজ-সজ্জা করিয়া আসিয়াছিল।

"তোমরা আগে আগে চল।"

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। তাহারা অগ্রবর্তী হইলে ঘো এবং আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় শাঁ করিয়া একটা ছোরা আমার পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল। আর একটু হইলেই আমার পাঁজরে বিঁধিয়া যাইত। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম শীলিনা হ্রদের জল হইতে উঠিয়াছে। তাহার মুখের রং উঠিয়া গিয়া তাহাকে বীভৎস দেখাইতেছে। আমাকে ঘাড় ফিরাইতে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"আমি হরিণের মাংস চাই না, আমরা মাছ খাইয়াই থাকিব, আমার ছেলে-মেয়েদের ফিরাইয়া দাও, উহাদের আমি যাইতে দিব না—"

উন্মাদিনীর কথায় কর্ণপাত করিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। অগ্রসর হইয়া গেলাম। বাতাসের বেগ আরও বাড়িল।

...প্রবল বেগে ঝড় উঠিয়াছে। আকাশে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। বিরাট একটা বটবৃক্ষের তলায় গোধা, অবহি, ঘো এবং আমি বসিয়া আছি। চোনা ভুরুষের সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। সহসা দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। ঘো উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আমিও সন্তর্পণে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মনে হইল কে যেন আমাদের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। হরিণের দল কি? না, তাহাদের পদশব্দ অন্যপ্রকার। ঝড়ের বেগে শীলিনা আসিয়া প্রবেশ করিল। আবার সে নূতন করিয়া সাজসজ্জা করিয়াছে, নূতন করিয়া রং মাখিয়াছে।

"চোনা কোথা?..."

"ভুরুষের সন্ধানে গিয়াছে।"

"আমিও চলিলাম।"

শীলিনা ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিস্মিত হইলাম। মনে হইল, শীলিনার সহিত এতকাল বাস করিতেছি তবু তাহাকে বোধ হয় আমি ভাল করিয়া চিনি না। সে রাক্ষসী, না জননী, না অভিসারিকা, না গৃহিণী? সহসা চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া বজ্রাঘাত হইল। শিহরিয়া উঠিলাম।

...না, নারীকে চিনিতে পারি নাই। নারীকে কেন্দ্র করিয়াই যুগে যুগে আমার জীবন সুখ-দুঃখের ঘূর্ণায় আবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে চিনিতে ঠিক পারি নাই। বহু যুগ যুগান্তরের পটভূমিকায় আজ তাহার যে মূর্তি দেখিতেছি তাহা রহস্যময়ীর মূর্তি। সে কখনও কামিনী, কখনও জননী, কখনও রমণী, কখনও নারী। কখনও অবলা, কখনও শক্তিস্বরূপিণী। কখনও মধুরা, কখনও ভীষণা। বিচিত্ররূপিণী পৃথিবীর মতোই নানা প্রয়োজনে তাহার নানা অভিব্যক্তি। একটি চিত্র মনে পড়িতেছে। তোমাদের পুরাণে অন্নপূর্ণার একটি চিত্র আছে। শিব অন্নপূর্ণার নিকট অন্নভিক্ষা করিতেছেন। আমিও সেদিন রাহুলার নিকট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু অন্ন নয়, বিষ। যে রাহুলাকে আমি কিছুদিন পূর্বে দূর করিয়া দিয়াছিলাম প্রয়োজনের তাগিদে সেই রাহুলারই দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। রাহুলা ছিল বিদ্রোহিনী। সে আমাদের সমাজের চিরাচরিত প্রথা মানে নাই। আমরা তখন হস্তী শিকার করিতাম। হস্তীই ছিল আমাদের প্রধান উপজীব্য। হস্তীর মাংস আহার করিতাম, হস্তীর দন্ত ও অস্থি দিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতাম, তাহার বদলে ঝিনুক, মৎস্য, শঙ্খ, চকমকি পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করিতাম। হস্তীর চর্মে আমাদের পরিচ্ছদ হইত, তাহা দিয়া আমরা তাঁবুও প্রস্তুত করিতাম। এই হস্তী সহসা সংখ্যায় হ্রাস পাইতে লাগিল। যে দুই-চারিটি রহিল তাহারা এমন দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইল যে, তাহাদের আমরা নাগাল পাইতাম না। আমাদের পুরোহিত জোনাফুদিন বলিল পূজা করিতে হইবে। হস্তীর যাহাতে বংশবৃদ্ধি হয়, এদেশের জলহাওয়ায় যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে পূজা-দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিলে আমাদের আর কোনও অভাব থাকিবে না। আমরা সকলেই পূজা করিতে সম্মত হইলাম। রাহুলা হইল না। সে বলিল, "পূজা করিয়া হাতী বশ মানিবে না। তীর মারিয়া তাহাকে বশ করিতে হইবে। দুর্গম স্থানে আমরা পৌঁছিতে না পারিলেও তীর পৌঁছিবে। সে তীর এমন হওয়া চাই যে হাতীর গায়ে বিঁধিলে হাতী আর নড়িতে পারিবে না। যদি বা নড়ে বেশি দূর যাইতে পারিবে না, আমাদের এলাকার মধ্যেই মুখ থুবড়াইয়া মরিবে।"

জোনাফুদিন প্রশ্ন করিল, "তাহা কি করিয়া সম্ভব?"

"সম্ভব বই কি। আমাকে যদি পুরোহিত করিয়া দাও, আমি দেখাইয়া দিতে পারি—"

রাহুলার প্রদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে জোনাফুদিন সেদিন সহসা যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল। পরদিন কিন্তু জোনাফুদিনের আদেশে আমি অশিষ্টা

রাহুলাকে ত্যাগ করিলাম। না করিলে জোনাফুদিনকে ত্যাগ করিতে হইত। তাহা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। জোনাফুদিনকে ত্যাগ করিলে জোনাফুদিন যে সমাজের পুরোহিত সে-সমাজও ত্যাগ করিতে হইত। সে সাহস আমার ছিল না। রাহুলাকেই ত্যাগ করিতে হইল। রাহুলা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

...জোনাফুদিনের পূজা-পদ্ধতিতে কিন্তু কোনও সুফল ফলে নাই। তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সে পূজা-পদ্ধতির কিছু বর্ণনা দিতেছি। সুদীর্ঘ পূজা, বহুদিন ধরিয়া করিতে হইত।

...আমাদের এলাকায় প্রকাণ্ড কালো একটা পাথর ছিল। দূর হইতে দেখিলে সহসা মনে হইত একটা হাতী বুঝি দাঁড়াইয়া আছে। যদিও ওই একটি পাথরকেই হাতী বলিয়া ভ্রম হইত কিন্তু ওই রকম সাতটি কালো পাথরের চাঙড় আমাদের এলাকায় ছিল। জোনাফুদিন বলিল, উহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই হস্তী-দেবতার সত্তা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। উহাদের পূজা করিতে হইবে। নর-নারী সকলকেই এই পূজায় যোগ দিতে হইবে। পূজার পদ্ধতি জোনাফুদিনই ঠিক করিয়া দিল। পূজার পূর্বরাত্রে আমরা সকলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে আকাশের নীচে শয়ন করিয়া রহিলাম। জোনাফুদিন প্রত্যেক পুরুষের কানে কানে বলিয়া গেল, "তুমি মনে মনে কেবল হস্তিনীর রূপ চিন্তা কর।" জোনাফুদিনের প্রধানা পত্নী অংঘী প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কানে কানে বলিয়া গেল, "তুমি মনে মনে কেবল পুরুষ হস্তীর রূপ চিন্তা কর।" সকলে তাহাই করিতে লাগিল। অতি প্রত্যূষে জোনাফুদিনের আহ্বানে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার আদেশে আমরা সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলাম। জোনাফুদিন বলিতে লাগিল, "আমরা এইবার সকলে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিব, যে জঙ্গলে হস্তীরা একদা বাস করিত কিন্তু যে জঙ্গল এখন ত্যাগ করিয়াছে, সেই জঙ্গলে হস্তী ও হস্তিনী সাজিয়া আমরা প্রবেশ করিব। সেই হস্তী-শূন্য অরণ্য আমাদের বৃংহিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে। হস্তীর মতো আমরাও গাছের ডালপালা আহার করিব। মদমত্ত হস্তীরা হস্তিনীর নিকট যেভাবে প্রণয় নিবেদন করে আমরাও তাহার অনুকরণ করিব। আমরা আর মানুষ থাকিব না, আমরা সকলে হস্তী হইয়া যাইব। আজ সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি আমাদের অরণ্যেই কাটিবে। আমাদের এই অরণ্যবাসের মুহূর্তগুলিতে আমরা কায়মনোবাক্যে যেন হস্তী-হস্তিনী হইয়া যাই। আমরা উলঙ্গ অবস্থাতেই অরণ্যে প্রবেশ করিব। গ্রামের বালকবালিকারা আমাদের গাত্রের চর্মাবরণ অরণ্যের প্রান্তে রাখিয়া আসিবে। অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেগুলি আমাদের কাজে লাগিবে। চল এখন অরণ্য অভিমুখে অগ্রসর হই!"

মিছিল করিয়া সকলে আমরা অরণ্য অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গেলাম। সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি সেই অরণ্যে হস্তি-হস্তিনীর অভিনয় করিয়া আমাদের কাটিয়া গেল। সত্যই সেদিন আমরা মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতে জোনাফদ্দিন আমাদের সকলকে পাথরা নদীতে লইয়া গেল। পাথরা নদী উপলবহুল। জোনাফদ্দিন প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একটি করিয়া বড় উপলখণ্ড কুড়াইয়া লইতে বলিল। একটি করিয়া উপলখণ্ড হস্তে লইয়া জোনাফদ্দিনের আদেশে তাহারা আবার অরণ্য অভিমুখে চলিতে লাগিল। আমরা, অর্থাৎ পুরুষরা গান গাহিতে গাহিতে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। জোনাফদ্দিন গানের একটি কলি গাহিতেছিল আমরা সেইটি সমস্বরে আবৃত্তি করিতেছিলাম। গানের ধুয়া—'প্রতি হস্তিনীর গর্ভে এবার হস্তী-শাবক আসিয়াছে, এস এইবার আমরা আনন্দ করি। মনুষ্য-হস্তিনীর গর্ভে এবার প্রস্তর-হস্তী-শাবক আসিয়াছে, আর আমাদের ভয় নাই, এস আমরা আনন্দ করি।' প্রভাত-আলোকে আমাদের সমবেত কণ্ঠের এই গান আর্তনাদের মতো শুনাইতেছিল। আসন্ন অনশনের ভয়ে ভীত হইয়া আমরা চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। জোনাফদ্দিন আশা দিয়াছিল ইহাতে সুফল ফলিবে। অরণ্যপ্রান্তে আসিয়া দেখিলাম বালকেরা আমাদের হস্তী-চর্মনির্মিত গাত্রাবরণগুলি একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছে।

জোনাফদ্দিন বলিল, "প্রতি স্ত্রীলোকের পেটে একটি করিয়া চর্ম বাঁধিয়া দেওয়া হোক। সেই চর্মের ভিতর প্রত্যেকে নিজের নিজের উপলখণ্ড রাখিয়া দাও। তাহার পর হস্ত ও পদের সাহায্যে চতুষ্পদ হস্তীর মতো হাঁটিতে হাঁটিতে আমার অনুসরণ কর। আমরা এইবার সেই হস্তী-প্রস্তরের নিকট যাইব।"

প্রায় শতাধিক স্ত্রীলোক উদরসংলগ্ন চর্মাবরণের ভিতর উপলখণ্ড লইয়া চতুষ্পদ হস্তীর মতো জোনাফদ্দিনের অনুসরণ করিতে লাগিল। জোনাফদ্দিন গান গাহিতেছিল—"হস্তিনীরা এইবার হস্তীশাবক প্রসব করিবে, এস এইবার আমরা আনন্দ করি। মনুষ্য-হস্তিনীরা এইবার প্রস্তর-হস্তী-শাবক প্রসব করিবে, আর আমাদের ভয় নাই, এস আমরা আনন্দ করি। হস্তী-প্রস্তর তাহার শাবকগুলির জন্য ধৈর্যভরে নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। চল, চল, আমরা শীঘ্র যাই।" চীৎকার করিতে করিতে জোনাফদ্দিনের স্বরভঙ্গ হইয়াছিল, তাহার রুক্ষ কেশ, জটিল শ্মশ্রু বিস্রস্ত অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার রগের শিরাগুলি স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া তাহাকে উন্মত্তবৎ দেখাইতেছিল। তাহার অনুকরণ করিয়া আমরাও গান গাহিতেছিলাম। গান গাহিতে গাহিতে আমরা জোনাফদ্দিনকে এবং হস্তীরূপিণী নারীযূথকে প্রদক্ষিণও করিতেছিলাম।

অবশেষে আমরা যখন হস্তীবৎ সেই কৃষ্ণ প্রস্তরটার নিকটবর্তী হইলাম জোনাফদ্দিন আদেশ করিল, "হস্তিনী যেমন তাহাদের শাবককে প্রসব করে,

তোমরাও তেমনি ওই উপলখণ্ডগুলি প্রসব কর। প্রসববেদনাতুরা হস্তিনীর অনুকরণ কর সকলে। ঠিকমত যদি করিতে পার হস্তীর মত বলশালী পুত্রলাভ করিবে।...”

সমস্ত স্ত্রীলোক তখন সেই বৃহৎ কৃষ্ণ-প্রস্তরের পাদমূলে সমবেত হইয়া কুন্থন করিতে করিতে উপলখণ্ডগুলি প্রসব করিবার ভান করিল। একটি প্রস্তরের পাদমূলেই আমাদের তিন দিন কাটিয়া গেল।

তাহার পর পুনরায় আমরা গান গাহিতে গাহিতে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে গেলাম, আবার তেমনি খোলা আকাশের নীচে শয়ন করিলাম, জোনাফুদিন ও অংঘী আবার আমাদের কানে কানে হস্তীর রূপ চিন্তা করিবার নির্দেশ দিয়া গেল, পুনরায় আমরা অরণ্যে গেলাম, অর্থাৎ প্রথমবার যাহা যাহা হইয়াছিল দ্বিতীয়বারও ঠিক সেই সবই হইল। তফাতের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা এইবার দ্বিতীয় কৃষ্ণপ্রস্তরের পাদমূলে সমবেত হইয়া উপল-প্রসব করিল। আমাদের এলাকায় সাতটি কৃষ্ণপ্রস্তর ছিল। সাতটিকেই কেন্দ্র করিয়া আমরা ওই একই ধরণের পূজা সাত বার করিলাম। কিন্তু কোনও ফল হইল না। হস্তী আরও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে তাহাদের দূরে দেখা যাইত, কিন্তু আমাদের দেখিলেই তাহারা দুর্গম অরণ্যের ভিতর অন্তর্ধান করিত। আমরা তীর এবং বর্শার দ্বারা দুই-এক বার দুই-একটা হাতীকে আঘাতও করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আঘাতে তাহারা কাবু হয় নাই। পূর্বে তাহারা সংখ্যায় অনেক ছিল, একটা না একটাকে আমরা ঘিরিয়া ফেলিতে পারিতাম এবং একটা বড় হাতী শিকার করিতে পারিলে আমাদের অনেক দিন চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল, ক্ষুধার তাড়নায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম।

অবশেষে একদিন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়া গেল। ক্ষুধিত জনতা জোনাফুদিনকে হত্যা করিয়া ফেলিল। শুধু জোনাফুদিনকে নয়, অংঘীকেও, তাহার পুত্রকন্যাদেরও। তাহাদেরই মাংস আমরা ভোজন করিলাম। তাহার পর সমবেত জনতা আমাকে দলপতি করিয়া বলিল, “রাহুলা জোনাফুদিনকে চিনিতে পারিয়াছিল। সে বলিয়াছিল পূজা করিলে হাতী বশ মানিবে না। তাহাকে তীর মারিয়া বশ করিতে হইবে। সে তীর এমন হওয়া চাই যে, হাতীর গায়ে বিঁধিলে হাতী আর নড়িতে পারিবে না। আমাকে যদি পুরোহিত করিয়া দাও আমি দেখাইয়া দিতে পারি। রাহুলার এসব কথা মনে আছে?”

বলিলাম, “মনে আছে—”

“তাহা হইলে চল আমরা রাহুলার শরণাপন্ন হই। আমাদের হইয়া তুমিই তাহার কাছে যাও। সে শকুন পাহাড়ের গুহায় বাস করে শুনিয়াছি। অধিঙগা সম্প্রদায়ের লোকেরা রাহুলার নিকট হইতে তীর লইয়া হস্তী শিকার করিতেছে। রাহুলা নিশ্চয়ই কোন নূতন তীর আবিষ্কার করিয়াছে। তুমি

তাহার নিকট যাও, আর বিলম্ব করিও না।"

দশ দিন দশ রাত্রি অবিরাম হাঁটিয়া শকুন পাহাড়ে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের পাদদেশ ঘন-বন-সমাচ্ছন্ন। কাছাকাছি মনুষ্যের বসতি আছে বলিয়া মনে হয় না, মাঝে মাঝে দুই-একটা পাখীর ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই। পাহাড়ের চূড়ার দিকে চাহিয়া মনে হইল একটা গুহার মতো কি যেন দেখা যাইতেছে। একটা পথও যেন বিসর্পিত রেখায় উঠিয়া গিয়া গুহার দ্বারে শেষ হইয়াছে। ভাবিলাম, পাহাড়ের পাদদেশে ওই পথের আরম্ভ নিশ্চয়ই কোথাও আছে। চতুর্দিকে ঘুরিয়া কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে গেলেই কণ্টকময় দুর্ভেদ্য অরণ্য পথরোধ করে। তবু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কারণ নিরস্ত হইলে চলিবে না। সহসা দেখিলাম একটু দূরে রক্তবদনা রুক্ষকেশিনী একটি নারী গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল শোণিতবর্ণে রঞ্জিত, মস্তকের চুল চমরী-পুচ্ছের ন্যায়। আমিও নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে সেই ঝোপের সমীপবর্তী হইলাম। সন্তর্পণে গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, মেয়েটি মাকড়শা ধরিতেছে। ঝোপের মধ্যে অসংখ্য মাকড়শার জাল। দুইটি কাঠির সাহায্যে মেয়েটি অতি নিপুণতার সহিত মাকড়শা ধরিয়া একটি চামড়ার থলিতে পুরিতেছিল। আমি কোনও শব্দ করি নাই, কিন্তু তবু কি করিয়া জানি না সে আমার সান্নিধ্য টের পাইল। হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর কথা বলিল।

"কে তুমি?"

"আমি জলৌকা সম্প্রদায়ের দলপতি। রাহুলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তুমি কে?"

"আমি দুস্তীর্ণা। রাহুলার সহিত দেখা করিতে হইলে দুইটি বন্য মোরগ, ছয়টি বন্য কপোত এবং কিছু মধু দিতে হইবে।"

"কাহাকে দিতে হইবে?"

"আমাকে। আমার সাহায্য ব্যতীত কেহ রাহুলার নিকট যাইতে পারে না।"

"কেন?"

"কারণ আমি ছাড়া আর কেহ পথ জানে না।"

একবার ইচ্ছা হইল বলি, "রাহুলাকে গিয়া বল যে তাহার স্বামী তাহার সহিত বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করিতে আসিয়াছে"—কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম। আশঙ্কা হইল বিপরীত ফল ফলিতে পারে।

বলিলাম, "যাহা তুমি চাহিতেছ তাহা দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি বিদেশী, সহসা বন্য কপোত, বন্য মোরগ, মধু কি করিয়া সংগ্রহ করিব?"

"উপায় বলিয়া দিতেছি। পাহাড়ের ওপারে খঞ্জন সম্প্রদায়ের গ্রাম আছে। তাহারা কপোত, মোরগ ও মধু আমার জন্যই সংগ্রহ করিয়া রাখে। তুমি যদি

তোমার কণ্ঠের ওই ঝিনুকের মালা দুইটি তাহাদের দাও এখনই কপোত, মোরগ ও মধু পাইবে।"

"তাহাতে কিন্তু বিলম্ব হইবে। আমি রাহুলার সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে চাই। আমি আমার ঝিনুকের মালা দুইটি তোমাকেই দিতেছি, তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইও।"

দুস্তীর্ণার নাকের ভিতর হইতে ঘড় ঘড় করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহার পর দন্তবিকাশ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

"সংগ্রহ করিয়া লইবার অবসর আমারও নাই। রাহুলার জন্য পোকা-মাকড় সংগ্রহ করিতেই আমার সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। লেধুকে পাঠাইতে পারি, কিন্তু সে কিছু না দিলে যাইতে চাহিবে না। তোমার বাহুলগ্ন মালা দুইটিও তাহা হইলে দাও।"

"লেধু কে?"

"আমার পুরুষ।"

তৎক্ষণাৎ ঝিনুকের মালাগুলি তাহাকে খুলিয়া দিলাম। লোভীর মতো হাত বাড়াইয়া দুস্তীর্ণা সেগুলি লইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিধান করিল।

"চল এইবার তোমাকে রাহুলার নিকট লইয়া যাই। তুমি বুকে ভর দিয়া হাঁটিতে পারিবে তো?"

"পারিব।"

"আমার অনুসরণ কর।"

কিছুদূর গিয়া দুস্তীর্ণা বলিল, "দাঁড়াও, এইবার তোমার চোখ বাঁধিয়া দিব।"

"কেন?"

"পথের সন্ধান কাহাকেও জানাইবার ইচ্ছা নাই।"

একটি গাছে বৃহৎ পত্রসমন্বিত একটি লতা উঠিয়াছিল। দুস্তীর্ণা সেই লতা ছিঁড়িয়া আনিল। লতার বড় বড় পাতায় আমার চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া দিয়া লতা দিয়া সেগুলি বাঁধিয়া দিল।

"এইবার আমার হাত ধরিয়া চল।"

চলিলাম। বড় অদ্ভুত মনে হইতে লাগিল। এরূপ পরিস্থিতিতে জীবনে আর কখনও পড়ি নাই। কিছু দূরে গিয়া একটা কথা মনে হইল। যে জন্য এত কষ্ট, এত হীনতা স্বীকার করিতেছি সে সম্বন্ধে দুস্তীর্ণাকে তো কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

"রাহুলা যে বিশেষ রকম তীর প্রস্তুত করিয়াছে শুনিয়াছি তাহা কি উপায়ে পাওয়া যায়?"

"রাহুলার নিকট ভিক্ষা করিতে হইবে। রাহুলার যদি ইচ্ছা হয়, দিবে। অধিকাংশ লোককেই দেয় না। অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতি কিছুদিন আগে কয়েকটা তীর লইয়া গিয়াছে।"

"কি করিয়া সে তীর প্রস্তুত করিতে হয় জান তুমি?"

"কিছু কিছু জানি, সবটা জানি না।"

"যতটুকু জান বল না, শুনি।"

"বলিব না।"

বিদ্যার বলে সেদিন দুস্তীর্ণা আমাকে পরাভূত করিয়াছিল। আমি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ, আমার গায়ে অসুরের শক্তি। দুস্তীর্ণা তন্বী। তাহার ধৃষ্টতার জন্য একটি চপেটাঘাতেই তাহাকে চিরদিনের মতো নীরব করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু সে সাহস ছিল না, বাধ্য হইয়া তাহার স্পর্ধা সহ্য করিতে ছিলাম, কারণ যে জ্ঞানের উপর আমাদের সম্প্রদায়ের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছিল, সে জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি ছিল দুস্তীর্ণার হাতে। তাহাকে হত্যা করিলে নিজেরই সমূহ ক্ষতি।

"তোমাকে যদি আরও ঝিনুকের মালা আনিয়া দিই, তাহা হইলেও বলিবে না?"

"একথা প্রকাশ করিলে রাহুলা আমাকে হত্যা করিবে। এইজন্যই সে উৎকটাকে হত্যা করিয়াছে।"

"হত্যা করিয়াছে? কি প্রকারে?"

"তীর মারিয়া। রাহুলার তীর অব্যর্থ এবং অমোঘ।"

"রাহুলা এসব কোথায় শিখিয়াছে?"

"জানি না।"

"রাহুলা তাহার এ বিদ্যা কাহাকেও শিখাইবে না?"

"একটি মাত্র লোককে সে শিখাইবে বলিয়াছে।"

"কে সে?"

"তাহার স্বামী, যে স্বামী তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল। সে যদি আসিয়া তাহার গুহাদ্বারে নতজানু হইয়া ভিক্ষা করে..."

"তাহার স্বামী কোথায় থাকে জান তুমি?"

"জানি না। রাহুলা কাহাকেও সে কথা বলে না।"

"রাহুলা আর বিবাহ করে নাই?"

"না। কোনও পুরুষের সংশ্রবেই সে আসে না। সে ওই গুহায় একা একা থাকে আর তীরে মাখাইবার ঔষধ প্রস্তুত করে। আমরা তাহাকে সাহায্য করি, উৎকটা তো মরিয়া গিয়াছে, এখন আমি একাই সাহায্য করি।"

"তোমাদের সহিত রাহুলার সম্পর্ক কি?"

"কোনও সম্পর্ক নাই। আমরা পাহাড়ের ওপারে থাকি, রাহুলার ফরমাস খাটি..."

"কেন?"

"এমনি।"

বুঝিলাম আসল কারণটা দুস্তীর্ণা প্রকাশ করিবে না।

আরও কিছুক্ষণ পথ অতিবাহন করিবার পর দুস্তীর্ণা বলিল, "এইবার থাম, তোমার চোখ খুলিয়া দিই।"

খুলিয়া দিল। দেখিলাম বনের ভিতর অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত একটা স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। তাহার পর আবার বন শুরু হইয়াছে। দুস্তীর্ণা বলিল, "ওই বনের ভিতর সোজা হাঁটিবার উপায় নাই। অত্যন্ত ঘন কুলবন। গিরগিটির মতো বুকে হাঁটিয়া ওই বনটুকু পার হইয়া যাও, তাহা হইলে পাহাড় পাইবে। পাহাড়ের কাছাকাছি আসিলে পাহাড়ে উঠিবার পথও দেখিতে পাইবে। যাও—"

"তুমি আসিবে না?"

"না। আমি যে তোমাকে পথ বলিয়া দিয়াছি একথা যেন রাহুলাকে বলিও না। বলিবে না তো?"

দুস্তীর্ণার চোখের দৃষ্টি শঙ্কাতুর হইয়া উঠিল।

"তুমি যখন বারণ করিতেছ বলিব না। কিন্তু কেন বল তো?"

"রাহুলা চায় না যে লোকে গিয়া তাহাকে বিরক্ত করুক। যেদিন অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতিকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম, সেই দিনই রাহুলা আমাকে বারণ করিয়া দিয়াছিল। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলিও যে উৎকটার প্রেতাত্মা আসিয়া তোমাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। আমার নাম বলিও না।"

"রাহুলার বারণ সত্ত্বেও তুমি পথ দেখাইলে কেন?"

"আমি পথ না দেখাইলে তুমি রাহুলার নিকট পৌঁছিতে পারিতে কি? আর আমিও কি বন্য মুরগী, বন্য কপোত, মধু পাইতাম?"

দুস্তীর্ণার হাসি সহসা আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল।

"রাহুলাকে আমার কথা বলিও না কিন্তু।"

"বেশ, বলিব না। গুহার নিকট গেলেই কি তাহার সহিত দেখা হইবে?"

"তাহার সহিত দেখা হইবে না। গুহার বেশী নিকটেও যাইও না। বিষাক্ত সাপ, বিছে, মাকড়শা প্রভৃতি গুহার কাছে ছড়ানো আছে।"

"জীবন্ত?"

"জীবন্ত নয়, কিন্তু পায়ে যদি হাড় টাড় ফুটিয়া যায়, অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তাই সাবধান করিয়া দিলাম।"

"তুমি কি রাহুলার জন্য মাকড়শা ধরিতেছিলে?"

দুস্তীর্ণার চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

"তুমি দেখিয়া ফেলিয়াছ নাকি! হাঁ, রাহুলার জন্যই।"

"ইহার বদলে রাহুলা তোমাকে কি দেয়?"

"তীর। সেই তীর লইয়া লেধু হস্তী শিকার করে।"

"ও।"

কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম। ব্যাপারটা ক্রমশ যেন স্পষ্টতর হইতেছিল।

"সাপ আর বিছে কি রাহুলা নিজেই ধরে?"

"না। সাপ আগে উৎকটা ধরিত, এখন হংকী ধরে।"

"কি করিয়া সাপ ধরে সে? ফাঁদ পাতে না কি!"

"সে এক অদ্ভুত উপায়ে ধরে। তাহার হাত দুইটাই সাপের মতো লিকলিকে। তাহাতে সে যখন রং মাখায় তখন ঠিক সাপের মতোই দেখিতে হয়। হংকী ঘাসের মধ্যে শুইয়া তাহার হাত দুইটা ঠিক সাপের মতো আঁকাইতে বাঁকাইতে থাকে আর মুখে সাপের মতো শব্দ করে। কাছাকাছি সাপ থাকিলে সে সাপ তাহার হাতের কাছে আসিয়া পড়ে, তাহারা তাহার হাত দুইটাকে সাপই মনে করে। হংকী হাত দিয়া সাপের ফণার অদ্ভুত নকলও করিতে পারে। হাতের কাছে সাপ আসিলেই টপ করিয়া ধরিয়া ফেলে সে..."

এই পর্যন্ত বলিয়া দুস্তীর্ণা থামিয়া গেল।

"তুমি ভয়ানক লোক তো! কথার পিঠে কথা বলিয়া আমাদের ভিতরের খবর সব জানিয়া লইতেছ। যাও, আর তোমার কথার জবাব দিব না। যাও, পাহাড়ে উঠিয়া যাও।"

"রাহুলা যদি আমার সহিত দেখা না করে কি করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিব?"

"তুমি গুহার কাছাকাছি আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিও, 'রাহুলা, রাহুলা, বড় বিপদে পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, আমার কথা দয়া করিয়া শোন।' গুহার ভিতর হইতে রাহুলা উত্তর দিবে। গুহার দেওয়ালে একটা ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র দিয়া রাহুলা তোমাকে দেখিতেও পাইবে।"

"রাহুলা যদি উত্তর না দেয়?"

"অনেক সময় রাহুলা ঘুমাইয়া থাকে। কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়াও যদি উত্তর না পাও বুঝিবে রাহুলা তোমার সহিত কথা কহিবে না। তোমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

"যদি না ফিরি?"

"রাহুলার অমোঘ তীর তোমাকে ফিরিতে বাধ্য করিবে।"

"ফিরিয়া তোমাকে আবার এইখানেই পাইব তো?"

"পাইবে।"

পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। দুস্তীর্ণার কথাগুলি কানে বাজিতেছিল—"তাহার যে স্বামী তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল সে যদি আসিয়া গুহাদ্বারে নতজানু হইয়া ভিক্ষা করে..."

"রাহুলা"—গুহাদ্বারে পৌঁছিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলাম। ভিতর হইতে কোনও সাড়া আসিল না।

"রাহুলা—"

কোনও সাড়া নাই। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম সাপের চামড়া, মৃত কাঁকড়াবিছা, গাছের শিকড় প্রভৃতি চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম। গুহার ভিতর হইতে একটা তীর শাঁ করিয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, দেখিলাম পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়া একটি রোমশ পাহাড়ী ছাগের গায়ে সেটি বিদ্ধ হইল। ছাগটাকে প্রথমে আমি দেখিতে পাই নাই, তীর দেখিয়া আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম তীরটি তাহার পিছনের একটা পায়ে গাঁথিয়া গিয়াছে এবং সে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতেছে। বেশি দূর কিন্তু ছুটিতে পারিল না, কিছু দূর গিয়া পড়িয়া গেল।

"আমি জানিতাম তোমাকে আসিতে হইবে।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম গুহাদ্বারে রাহুলা দাঁড়াইয়া আছে। কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম, বামহস্তে ধনু, দক্ষিণ হস্তে একটা তীর। শরীরের উপরার্ধ আবরণ-হীন। লক্ষ্য করিলাম তাহার নারীত্বের সমস্ত চিহ্ন অবলুপ্ত হইয়াছে। স্তনযুগল শুষ্ক, মুখভাবে নারীসুলভ কমনীয়তা নাই, মাথার চুল চূড়ার মতো করিয়া বাঁধা, চক্ষুর দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক তীব্রতা। আমি বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

"কেন আসিয়াছ তাহাও জানি"—রাহুলাই পুনরায় কথা বলিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"জোনাফুদিন মরিয়াছে?"

"হাঁ।"

"মরিবে জানিতাম। কি করিয়া মরিল? অনাহারে?"

"সকলে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।"

"বেশ করিয়াছে। এখন দলপতি কে?"

"আমি। তোমার সাহায্য পাইব এই আশাতেই উহারা আমাকে দলপতি করিয়াছে। হস্তী-শিকার করিবার কৌশল তুমি যদি আমাকে না শিখাইয়া দাও আমাকেও হয়তো উহারা মারিয়া ফেলিবে।"

রাহুলা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের তীব্র দৃষ্টিতে একটা চাপা কৌতুক মিশিয়া তাহাকে যেন আরও শাণিত করিয়া তুলিল।

"অধিঙগা সম্প্রদায়ের দলপতি তোমার নিকট হইতে কিছু তীর লইয়া গিয়া হস্তী শিকার করিতেছে। আমাকেও যদি সেই প্রকার তীর কিছু দাও—"

"অধিঙগা সম্প্রদায়ের দলপতি নিতান্ত নাছোড়বান্দা বলিয়া কয়েকটি তীর দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছি। সে তীরগুলি নিঃশেষ হইয়া গেলে তাহাকে আবার বিপন্ন হইতে হইবে। কয়েকটি তীর লইয়া বিশেষ কিছু লাভ হয় না। তীর প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।"

"সেই প্রণালীটিই তাহা হইলে আমাকে শিখাইয়া দাও।"

রাহুলার দৃষ্টি হইতে পুনরায় কৌতুকবহ্নি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাহুলা বলিল, "সামান্য কুক্কুরীর মতো তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে। মনে আছে?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"কথার উত্তর দাও। মনে আছে?"

"আছে। আমি ঘোর অপরাধ করিয়াছিলাম রাহুলা। কিন্তু কেন করিয়াছিলাম তাহাও তুমি জান। জোনাফুদিনকে চটাইবার উপায় আমার ছিল না। প্রকৃত অপরাধী জোনাফুদিন, তাহাকে আমরা শাস্তি দিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হও—"

"তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম। আমার মা পুরোহিত ঘোনজার নিকট বিষক্রিয়ার রহস্য কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই আমি শুনিয়াছিলাম তীরে বিষ মাখাইয়া দিলে বড় বড় জন্তুকে অনায়াসে কাবু করা যায়। তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া আমি নানাপ্রকার বিষ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছি, পুরোহিত ঘোনজার বহু সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও বহু জিনিস পাইয়াছি। তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম, তাই আমি শিখিয়াছি কোন্ বিষ দিয়া হস্তীকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলা যায়, কোন্ বিষ দিয়া হস্তীকে হত্যা করা সম্ভব। সামান্য একটু বিষ তীরের মুখে লাগাইয়া দিলেই হইল। সে বিষ হস্তীকে মারিবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সে বিষে মানুষের কিছু হইবে না। তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম, তাই ইহা যত্ন করিয়া এতদিন শিখিয়াছি। ওই ছাগটাকে দেখ, ওটা মরে নাই, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, ওটাকে এখন অনায়াসে টানিয়া আনা যাইবে। বাঘে লইয়া যাইবার পূর্বে চল আমরাই গিয়া ওটাকে লইয়া আসি.."

রাহুলা ত্বরিতপদে পাহাড় বাহিয়া নামিতে লাগিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

...জীবন্ত ছাগটাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছিলাম। রাহুলা আমার পিছনে পিছনে আসিতেছিল। এতক্ষণ উভয়েই কোন কথা বলি নাই। এইবার আমি কথা বলিলাম।

"রাহুলা, আমাকে শিখাইয়া দিবে না?"

"যদি বলি দিব না?"

আমরা গুহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রাহুলা প্রশ্নটা করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অর্ধমৃত চলচ্ছক্তিহীন ছাগটাকে একধারে রাখিয়া আমি রাহুলার মুখের দিকে চাহিলাম। রাহুলার দৃষ্টিতে যেন ব্যঙ্গ ও কৌতুকের বহ্ন্যুৎসব হইতেছিল। সে দৃষ্টি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছিল —'আমার কাছে না আসিয়া তুই যাইবি কোথায়? আসিতেই হইবে। এক-বার নয়, বার বার আসিতে হইবে।'

তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আমার পৌরুষ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। মনে

মনে অপমানিত বোধ করিলাম। কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না।

বলিলাম, "আমার অবস্থা এখন এই চলচ্ছক্তিহীন ছাগের মতো। ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে মারিতেও পার, রাখিতেও পার।"

রাহুলা কোনও উত্তর দিল না।

"শিখাইয়া দিবে না?"

রাহুলা সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল যেন আর্তনাদ করিতেছে। কোন কথা নাই, কেবল চীৎকার। পর্বত বিদীর্ণ করিয়া ঝরণাধারা যেমন নির্গত হয়, মনে হইল, তেমনি একটা কিছু বিদীর্ণ হইয়া যেন এই শব্দধারা বাহির হইতেছে। সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন কাঁপিতে লাগিল।

"অমন করিতেছ কেন রাহুলা? কি বলিবে, বল। কথা বল, আমাকে কি শিখাইয়া দিবে না?"

সহসা যেমন সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, সহসা তেমনি আবার প্রকৃতিস্থও হইল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে শিখাইব বলিয়াই তো যত্ন করিয়া নিজে শিখিয়াছি। কিন্তু অত সহজে শিখাইব না। তোমার জন্য যে নিদারুণ কষ্ট আমি ভোগ করিয়াছি, যে অপমান, যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি তাহার কিছুটা তোমাকেও ভোগ করিতে হইবে।"

"কি করিতে হইবে বল।"

আদেশের ভঙ্গীতে তীক্ষ্নকণ্ঠে রাহুলা বলিল, "নতজানু হও। গুহার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া ক্রমাগত অহোরাত্র বলিতে থাক—'রাহুলা, দয়া কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তুমি দয়া না করিলে আমি বাঁচিব না, দয়া কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে শিখাইয়া দাও। আর কখনও তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিব না, আমাকে বাঁচাও।' তোমার এই প্রার্থনা শুনিয়া যদি আমার দয়া হয় শিখাইয়া দিব, যদি না হয় দিব না—"

রাহুলা গুহার মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

আমি গুহার সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলাম, "রাহুলা, দয়া কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তুমি দয়া না করিলে আমি বাঁচিব না..."

কোথায় সেই রাহুলা, কোথায় সেই হস্তী-যূথ, কোথায় সেই বিষের থলি যাহা লইয়া আমি একদা দিগ্বিজয় করিয়াছিলাম? কেহ নাই, কেহ থাকিবে না। থাকিব কেবল আমি। আমি! আমিই বা কে? তাহা জানি না। শুধু জানি আমিই চলিয়াছি। আমাকে কেন্দ্র করিয়া এক এক দল নর-নারী আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ কখনও সংকীর্ণ কখনও প্রশস্ত হইয়াছে। কখনও পর্বত, কখনও নদী, কখনও অরণ্য, কখনও হ্রদ...প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্রের নানা বিবর্তন, পরিবর্তন ... জোলমার স্মৃতি অস্পষ্ট

হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অবলুপ্ত হয় নাই ... অন্ধকার গুহা-পথে জোলমাকেই যেন খুঁজিতেছি, জোলমাকে লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছি, জ্ঞাতসারে না, অজ্ঞাতসারে... ।

...নতুন বাঁকে নূতন জীবন শুরু হইয়াছে আবার।

"হো, হো, হৈইই—হো-ও-ও।"

অন্ধকার রাত্রিকে সচকিত করিয়া অরণ্যপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছি। আমি যেই থামিলাম, অমনি কিছুদূরে আর একজন শুরু করিল, "হো, হো, হৈইই—হো-ও-ও।" সে থামিলে আর একজন শুরু করিবে। সমস্ত বন ঘিরিয়া আমাদের দল দাঁড়াইয়া আছে। বন্য গরুর দল তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছি। বন বলিতেছি বটে, কিন্তু বন বলিতে যাহা বুঝায় ইহা ঠিক তাহা নয়। এ বনে বৃক্ষ নাই। ঘাসের বন। লম্বা লম্বা ঘাসে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর পরিপূর্ণ। বনের মধ্যে গরুর দল রহিয়াছে, আর তাহাদের ঘিরিয়া রহিয়াছি আমরা। গরুগুলি সাধারণ গরু নয়, মহা-গরু। উচ্চতায় প্রায় হাতীর সমান। প্রকাণ্ড শিং দুইটি মাথার উভয় দিকে। আমরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস ইহাদের অনুসরণ করিতেছি। আমাদের কৌশল আমরা ইহাদিগকে ক্রমাগত তাড়াইয়া লইয়া যাইব, একদণ্ড স্থির থাকিতে দিব না। অবিরাম চলিতে চলিতে এক একটা গরু পরিশ্রান্ত হইয়া দল ছাড়া হইয়া যায়, ক্রমশ সে আর চলিতে পারে না, তখন সেটাকে আমরা দখল করি।

"হো-হো-হৈইই-হো-ও-ও।"

চীৎকার করিয়া আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। আমার পরেই যাহার চীৎকার করিবার কথা সে কিন্তু এবার চীৎকার করিল না। আমি তখন আর একবার চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গেলাম অনুসন্ধান করিবার জন্য। গিয়া দেখিলাম পরিশ্রান্ত নাভিলা শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরিতেছে না। ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিলাম। পরমুহূর্তেই পাইলাম: "হো-হো-হৈই—আগাও—আগাইয়া চল—আগাইয়া চল।" দলপতির কণ্ঠস্বর। তাহার আদেশ মুখে মুখে চতুর্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নাভিলা করুণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল একবার। বুঝিল তাহাকে ফেলিয়া আমরা এবার চলিয়া যাইব। সে-ও অনেককে ফেলিয়া আসিয়াছে। আমাদের থামিবার উপায় নাই। আমরা নিজেরাও থামিব না, গরুর দলকেও থামিতে দিব না। যে দুর্বল, যে অসমর্থ (মানুষই হোক বা গরুই হোক) সে পথের প্রান্তে পড়িয়া থাকিবে। মৃত্যুই তখন তাহার একমাত্র গতি। যাহারা শক্তিমান তাহারা আগাইয়া যাইবে। অনুসৃত ও অনুসরণকারী এই একই নীতির খর-স্রোতে সেদিন ভাসিয়া চলিয়াছিলাম। থামিবার উপায় ছিল না।

"হো-হো-হৈই—আগাও—আগাইয়া চল"—নাভিলাকে ফেলিয়া আগাইয়া

গেলাম। খিংখু ও নিমার কথা মনে পড়িল। তাহাদেরও ফেলিয়া আসিয়াছি। খিংখু আমার ভাই, নিমা আমার স্ত্রী।

...সমস্ত রাত্রি চীৎকার করিতে করিতে আগাইয়া গেলাম। প্রভাতে আসিয়া যেখানে উপস্থিত হইলাম সেখানে দেখিলাম কিছু গাছও আছে। নিশ্চিন্ত হইলাম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারা যাইবে। দলপতি কাংড়া তাহার সহচরদের লইয়া প্রতি গাছে গাছে উঠিয়া এখন বিতাড়িত পশুর দলকে পর্যবেক্ষণ করিবে। তাহার পর তাহার নির্দেশ অনুসারে আমরা হয় এখানে অপেক্ষা করিব, কিম্বা পুনরায় চলিতে শুরু করিব। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম দুই-চারিটা আসন্নপ্রসবা গাভী যেন কাংড়ার চোখে পড়ে। আসন্ন-প্রসবা গাভী থাকিলে কাংড়া অপেক্ষা করিবে। বাছুরগুলি একটু বড় হইয়া ছুটিতে না পারা পর্যন্ত আমরা এখানে বিশ্রাম করিতে পাইব। আমরা সমস্ত স্থানটা ঘিরিয়া রাখিয়া তাহাদের আগলাইয়া রাখিব, রাত্রে মাঝে মাঝে আগুন জ্বালিয়া তাহাদের পাহারা দিব, কিন্তু আর চলিতে হইবে না। ক্রমাগত হাঁটিয়া সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

"হো-হৈ-ই—হো-ও—হো-ও-ও—"

একস্থানে বসিয়াই মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছি। সহসা বিদা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে উলুমের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সে এখনই একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছে, কিন্তু তাহার বাঁচিবার আশা নাই। শ্বাস উঠিয়াছে। বলিয়াই সে চলিয়া গেল, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। গিয়া দেখিলাম উলুম মারা গিয়াছে। পাশেই সদ্যোজাত শিশুটা পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। এরূপ ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছে, ইহার পর যে কি করিতে হইবে তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। একটি গর্ত খুঁড়িয়া উলুমকে যথাবিধি কবর দিতে হইবে, সদ্যোজাত শিশুটাকেও তাহার বুকের উপর দিয়া দিতে হইবে। সেই ভ্রাম্যমান জীবনে একটা সদ্যোজাত মাতৃহীন শিশু লইয়া বিব্রত হইবার কল্পনাও কেহ করিত না। বিদা কিন্তু একটা অদ্ভুত কান্ড করিয়া বসিল। সে শিশুটাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "ইহাকে আমি ছাড়িব না। এ যতক্ষণ বাঁচিয়া আছে, আমারই বুকে থাকিবে।" আমরা বিদার এই অসমসাহসিকতায় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম মনে আছে। দলপতি কাংড়ার নির্দেশ অগ্রাহ্য করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার ছিল। দলের জন্য সে যে সব নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম হইতে বড় একটা দেখা যায় নাই। কাংড়া বলিত, 'আমার নিয়ম যদি না মানিতে পার দল ছাড়িয়া চলিয়া যাও। নিয়ম বদলাইবে না।' দলবদ্ধ হইয়া না থাকিলে সে যুগে জীবন ধারণ করা অসম্ভব ছিল। একটা দল ত্যাগ করিয়া অন্য দলে ঢোকাও সহজ ছিল না। কারণ কোন দলই আগন্তুককে সহসা প্রশ্রয় দিত না। বহুদূর উত্তরে শীতপ্রধান অঞ্চলে মীহার দল বাইসন শিকার করে। তাহার দলে ঢোকা না কি সহজ, কারণ বাইসনদের তাড়াইয়া লইয়া যাইতে বহুলোকের প্রয়োজন হয়, অনেক লোক মারাও যায়।

কিন্তু মীহা কাংড়ার দলের কোন লোককে লইতে চায় না। মীহার ধারণা যাহারা গরু তাড়াইয়া বেড়ায় বাইসন তাড়ানো তাহাদের কর্ম নয়। সুতরাং কাংড়ার দল ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না। বিদার মুখের দিকে আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সে এ কি করিতে উদ্যত হইয়াছে! তাহাকে এ পাগলামি করিতে আমরা সকলেই বারণ করিতে লাগিলাম। ঝুঝু বলিল, "স্ত্রীলোকের যখন অভাব নাই, সন্তানেরও অভাব হইবে না। ওটাকে কবরে ফেলিয়া দাও। উলুমের সন্তান উলুমের কাছেই থাকুক।" বিদা কিন্তু আমাদের কথা শুনিল না, কোনও প্রত্যুত্তর করিল না, সদ্যোজাত শিশুটাকে বুকে আঁকড়াইয়া অবুঝের মত বসিয়া রহিল। তাহার পর সহসা উঠিয়া বনের মধ্যে আত্মগোপন করিল। আমরা তাড়াতাড়ি গর্ত খুঁড়িয়া উলুমকে কবরস্থ করিলাম। কাংড়া ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই ব্যাপারটা সমাধা হইয়া গেল। তখন আমরা সকলে মিলিয়া স্থির করিলাম, কাংড়ার নিকট বিদার আচরণ আমরা গোপন রাখিব। কাংড়া নিজেই যদি আবিষ্কার করে করুক, আমরা কেহ বিদার নামে নালিশ করিব না। আমাদের মনে হইল দুই-একদিনের মধ্যেই শিশুটা অনাহারে মারা যাইবে, তখন তাহাকে লুকাইয়া পুঁতিয়া ফেলিলে কাংড়া জানিতেও পারিবে না। যে বিরাট অরণ্য-পরিবেশে যেভাবে ছড়াইয়া থাকিতাম তাহাতে সামান্য একটা শিশুকে লুকাইয়া রাখা মোটেই অসম্ভব ছিল না। অনেক সময় দিনের পর দিন আমাদের কাংড়ার সহিত দেখাই হইত না। অনেকের সহিতই হইত না। অদৃশ্য বন্ধনে আমরা বাঁধা ছিলাম। হো—হে-ই—হো-ও—হো-ও-ও— এই ডাক আমাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এই ডাক শুনিলেই আমাদের প্রত্যেককেই একে একে অনুরূপভাবে সাড়া দিতে হইত। সাড়া শুনিয়া আমরা বুঝিতাম কে সাড়া দিল। সকলের কণ্ঠস্বর আমরা সকলে চিনিতাম। কাংড়ার শ্রবণশক্তি এবিষয়ে অতিশয় প্রখর ছিল। আমাদের ওই বিরাট দলের মধ্যে কেহ সাড়া না দিলে কাংড়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিত।

...কিছুক্ষণ পরে কাংড়া ও তাহার প্রধান অনুচরেরা ফিরিয়া আসিয়া যাহা ব্যক্ত করিল তাহাতে আমরা খুশী হইলাম। কাংড়া বলিল, "অনেকগুলি আসন্ন প্রসবা গাভী আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তাহাদের তাড়া দিয়া লইয়া গেলে একটাও বাঁচিবে না। তাহারা তো মরিবেই, তাহাদের পেটের বাছুর-গুলোও বাঁচিবে না। অকারণে এতগুলি গাভী হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। একটি আসন্ন-প্রসবা গাভী শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে দেখিলাম। সেটাকে টানিয়া আনিতে হইবে। সেটা যদি মরিয়া যায়, তাহার মাংসটা আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখিব। এখন আমাদের খাইবার মতো মাংস প্রচুর আছে। এই বনে দুই চারিটা শশক এবং হরিণও আছে দেখিতেছি। সেগুলিও আমাদের কাজে লাগিবে। আমি ঠিক করিয়াছি যতদিন আসন্ন-প্রসবা গাভীগুলি প্রসব না করিতেছে, ততদিন আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব না। বাছুরগুলি যখন ছুটিতে পারিবে, তখন আমরা আবার তাহাদের তাড়া দিব। আপাতত যে

গাভীটা শুইয়া পড়িয়াছে, সেটাকে দখল করিয়া আমরা এই স্থানটাকে ঘিরিয়া থাকি এবং শশক-হরিণ শিকার করিয়া আমাদের অবসর বিনোদন করি।"

আমরা সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া কাংড়ার প্রস্তাব সমর্থন করিলাম।

...অর্ধমৃত গরুকে কবলিত করিবার জন্য আমরা শক্ত লতা পাকাইয়া খুব ধরনের লম্বা দড়ি প্রস্তুত করিতাম। তে একটা ফাঁসের মতো করিয়া দূর হইতে গরুর গলা লক্ষ্য করিয়া দড়িটা ছোঁড়া হইত। ফাঁসটা গরুর গলায় লাগিয়া গেলে আমরা সকলে মিলিয়া টানিতাম। অধিকাংশ সময়ে দম-বন্ধ হইয়াই গরুটা মারা যাইত। কাংড়ার নির্দেশ অনুসারে সেদিন যখন আসন্ন-প্রসবা গাভীটাকে আমরা আনিতে গেলাম সেদিন ফাঁসটা দৈবাৎ গলায় না লাগিয়া পিঠ এবং সম্মুখের পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া রহিল। টানিতেই ফাঁসটা পিঠ এবং কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে লাগিয়া গেল, গলায় লাগিল না। টানিতে টানিতে তাহাকে যখন আমরা নিজেদের আস্তানায় লইয়া আসিলাম তখনও দেখি সে জীবিত আছে। কাংড়া বলিল, "উহাকে এখন মারিও না। ও যদি বাছুর প্রসব করে তাহা হইলে বাছুরটাকে আমরা সঙ্গে রাখিব। একটা বাছুরকে সঙ্গে রাখা খুব বেশি অসুবিধাজনক হইবে না। একটু বড় করিয়া বাছুরটাকে যদি মারি বেশি মাংস পাওয়া যাইবে। গাভীটার পায়ে শিঙে কোমরে ভাল করিয়া দড়ি জড়াইয়া এই গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখ। দেখাই যাক না কি হয়।" প্রতিভাবান কাংড়া যে ব্যবস্থা করিয়া গেল সেই ব্যবস্থাটা যে ভবিষ্যতে মানব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে, সেদিন তাহা আমরা কেহ কল্পনা করি নাই। বন্য গরু যে আমাদের আত্মীয় হইবে, তাহাকে হত্যা না করিয়া পালন করিলে যে আমরা আরও বেশি লাভবান হইব, তাহাকে ঘিরিয়া যে নব নব ধর্ম, নীতি, সমাজ গঠিত হইবে একথা মনে করিবার তখন কোনও হেতুও ছিল না। দলপতির আদেশ অমান্য করিবার সাহস ছিল না বলিয়াই সেই গাভীটিকে সেদিন আমরা হত্যা করি নাই, কাংড়ার এই অদ্ভুত খেয়াল বরং বিস্ময়বোধই করিয়াছিলাম, অনেকে গোপনে হাস্যও করিয়াছিল।

...গাভীটি কিন্তু জীবন্ত বাছুর প্রসব করিল না। কিছুক্ষণ ছটফট করিবার পর গভীর রাত্রে সে প্রসব করিল বটে, কিন্তু বৎসটি জীবন্ত নহে, মৃত। মৃত বৎসটিকে আগুনে ঝলসাইয়া আমরা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিলাম। কাংড়া বলিল, "গাভীটা যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে থাক। এখন উহাকে হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিবে ততক্ষণ মাংসটা পচিবার ভয় থাকিবে না।"

সে যুগে পশু-মাংসই ছিল আমাদের প্রধান খাদ্য। সেই খাদ্যকে যথাসম্ভব সাবধানে আমরা খরচ করিতাম। পশু পাইলেই তাহাকে হত্যা করার প্রবৃত্তি আমাদের তত ছিল না। তাহাকে ঘিরিয়া আগলাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তিই প্রবলতর ছিল। সুতরাং কাংড়ার এই আদেশে আমরা তেমন বিস্ময়বোধ করিলাম না। বিস্মিত হইলাম আরও কিছুক্ষণ পরে।

কাংড়া এবং তাহার অনুচরেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পশু-চর্মনির্মিত তাহার তাঁবুর সম্মুখে পাহারা দিতেছিল নাটা। আমি এবং আমার বন্ধু-বান্ধবেরা সেই গাভীটাকে পাহারা দিতেছিলাম। হা হা হা হা হা শব্দ করিয়া দূরে হায়েনা ডাকিতেছিল। তীক্ষ্মকণ্ঠ দুইটি নৈশ কীট অন্ধকারকে সচকিত করিয়া পরস্পর আলাপ করিতেছিল। আমরা উৎকর্ণ সশস্ত্র হইয়া বসিয়াছিলাম। গাভীটিকে গ্রাস করিবার জন্য যে কোন শ্বাপদ যে কোনও মুহূর্তে আসিয়া পড়িতে পারে, এই সম্ভাবনা আমাদের তন্দ্রা হরণ করিয়াছিল। দীর্ঘ ঘাসের জঙ্গল চতুর্দিকে, আশেপাশেই হয়তো কোনও ভীষণ জন্তু ওৎ পাতিয়া আছে। খস খস করিয়া একটা শব্দ হইল। তাহার পর একটা কান্না শুনিতে পাইলাম, পরমুহূর্তেই কান্নাটা চাপা কান্না হইয়া গেল। মনে হইল ক্রন্দমান ব্যক্তিটির মুখটা কে যেন চাপিয়া ধরিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বাঘ বা নেকড়ে আসিল না, বিদা আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার বুকে সেই সদ্যোজাত শিশুটা। বিদা হাত দিয়া তাহার মুখটা চাপিয়া রহিয়াছে। তাহার চোখে মুখে একটা অসহায় ভীত ভাব।

"ব্যাপার কি বিদা?"—সকলে প্রায় একসঙ্গেই আমরা প্রশ্নটা করিলাম।

"ইহার কান্না কিছুতেই থামাইতে পারিতেছি না।" ঝুঝু বলিল, "থামাইতে পারিবেও না। একটি মাত্র লোক উহার কান্না থামাইতে পারে।"

"কে?"

"উলুম। তাহার কাছেই উহাকে দিয়া দাও।"

বিদা বলিল, "মুশকিল হইয়াছে কাংড়া যদি ইহার কান্না শুনিতে পায় ধরা পড়িয়া যাইব। ইহাকে যদি দুধ খাওয়াইতে পারিতাম তাহা হইলে কাঁদিত না। আহা, আমাদের দলে দুধ দিতে পারে এমন একটি মেয়েও যদি থাকিত।"

নীবারা আমাদের কাছে বসিয়াছিল। কিছুদিন আগে তাহার একটি সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে। বিদা তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিল, "আমার দুধ শুকাইয়া গিয়াছে, তবু দাও দেখি।"

বক্ষের চর্মাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া সে সদ্যোজাত শিশুটাকে স্তন্য পান করাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে শিশুর ক্রন্দন থামিল না, বরং বাড়িয়া গেল। নীবারার স্তনে দুধ ছিল না। বিদা বলিল, "জোহু, টালা, বিজঘারা, তিমানী, কিরখো, বুভা সকলের কাছে আমি গিয়াছিলাম, কেহই ইহার কান্না থামাইতে পারিল না।"

ঝুঝু বলিল, "উলুম পারিবে।"

বিদা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিশুর ক্রন্দন কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, আমরা সকলেই মনে মনে অস্বস্তি-বোধ করিতেছিলাম, কাংড়া যদি জানিতে পারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

ঝুঝু বলিল, "পাগলামি করিও না, ওটাকে উলুমের কবরের ভিতর পুরিয়া মাটি চাপা দিয়া উহাকে নিশ্চিত কর, উলুমকে নিশ্চিন্ত কর, আমাদের নিশ্চিন্ত

কর। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি..

বিদার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল, চোখের দৃষ্টিতে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এক চপেটাঘাতে ঝুঝুকে সে ভূশায়ী করিয়া ফেলিল। ঝুঝুও ছাড়িবার পাত্র নয়, সে-ও নিমেষের মধ্যে উঠিয়া আক্রমণ করিল বিদাকে। বিদার বক্ষ হইতে শিশুটা ছিটকাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মশালটাও নিবিয়া গেল। শিশুটা কোথায় যে পড়িল তাহা আমরা কেহ লক্ষ্য করিলাম না, বস্তুত শিশুটার সম্বন্ধে আমাদের তেমন আগ্রহই ছিল না, ঝুঝু ও বিদার দ্বন্দ্বটাই আমরা উপভোগ করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু মশালটা নিবিয়া যাওয়াতে চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। সকলে আমরা নীবারাকে অনুরোধ করিলাম।

"নীবারা মশাল আন একটা।"

দূরে দূরে মশাল জ্বলিতেছিল। তাহারই একটা হইতে আমাদের মশালটা জ্বালাইয়া আনিবার জন্য নীবারা উঠিয়া গেল। ঝুঝু ও বিদা অন্ধকারেই ঝুটাপুটি করিতে লাগিল। শিশুর ক্রন্দন কিন্তু বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল সে আর বাঁচিয়া নাই।

"কাংড়া আসিতেছে, কাংড়া, কাংড়া—"

মশাল হস্তে নীবারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ঝুঝু ও বিদা নিমেষের মধ্যে পরস্পরকে ছাড়িয়া দিল। নিজেদের মধ্যে মারামারি করা কাংড়ার আইনে ভীষণতম অপরাধ। এবং সে অপরাধের শাস্তি মৃত্যু। নীবারা মশালটা আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। মশাল আলোকে কিন্তু আমরা যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই অদৃষ্টপূর্ব। বিদার শিশুটা সেই বন্য-গাভীর স্তনে মুখ লাগাইয়া দুগ্ধপান করিতেছে। গাভীটাও ছটফট করিতেছে না, অর্ধনিমীলিত নেত্রে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। তাহার পিছনের একটা পা আমরা দড়ি দিয়া গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। সুতরাং তাহার স্তন উন্মুক্তই ছিল। বিদার শিশু ছিটকাইয়া বোধ হয় তাহার স্তনের উপরেই পড়িয়াছিল। আমরা সকলেই বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম, এমন সময় কাংড়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কিছুক্ষণ হইতে একটা শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছি, কাহারও ছেলে হইয়াছে না কি?"

আমরা সকলেই প্রমাদ গণিলাম। নীবারা কাংড়ার প্রিয়পাত্রী, তাহারই মুখের দিকে আমরা মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। সে দৃষ্টির অর্থ—তুমি আমাদের উদ্ধার কর। কোনও একটা ছুতা করিয়া কাংড়াকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাও।

নীবারা বুদ্ধিমতী। কাংড়ার মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া সে বলিল, "একটা শিশু আমরা কুড়াইয়া পাইয়াছি। ঘাসের মধ্যে পড়িয়া কাঁদিতেছিল। আমরা ওই গাভীর স্তনে শিশুর মুখটা লাগাইয়া দেখিতে-

ছিলাম দুধ খায় কি না। চমৎকার খাইতেছে। তুলিয়া লইব?"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কাংড়া শিশুটার দিকে চাহিয়াছিল। নির্বাক হইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা লাফাইয়া উঠিল। নীবারার কথা সে বোধ হয় শুনিতে পায় নাই।

"বাঃ, বাঃ চমৎকার, চমৎকার! এ ঘটনা যদি আগে ঘটিত অনেক শিশুকে আমরা বাঁচাইতে পারিতাম। কত শিশু যে অকালে মরিয়াছে। গাভীটাকে ভাল করিয়া খাইতে দাও, ওটাকে আমরা মারিব না, পুষিব। চল নীবারা সকলকে খবরটা দেওয়া যাক, কি আশ্চর্য!"

আনন্দের আতিশয্যে কাংড়া নীবারাকে তাহার পেশীসমৃদ্ধ বাহুদ্বয়ের উপর তুলিয়া লইল এবং হর্ষধ্বনি করিতে করিতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

...আর একটি ছবিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। মানব-জীবনের আদিম সভ্যতার পত্তন হইয়াছিল যে দুইটি আবিষ্কারের ফলে তাহার একটি ঘটিয়াছিল কাংড়ার নেতৃত্বে আর একটি ওবুকীর। তখন আমরা রিয়া নদীর তীরে বাস করিতাম। আমাদের দলপতি ছিল ওবুকী। ওবুকী নিতান্তই ভাল মানুষ লোক ছিল। প্রায় সমস্ত দিনই সে সূর্য পূজা করিত। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আকাশের দিকে চাহিয়াই বসিয়া থাকিত সে। মধ্যে মধ্যে রিয়া নদীর জল অঞ্জলি ভরিয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিত। তাহার ধারণা ছিল আকাশ এই জল শতগুণ করিয়া বৃষ্টিরূপে ফিরাইয়া দিবে। বৃষ্টি হইলে আমরা তখন যে ঘাসের বীজ খাইয়া জীবন ধারণ করিতাম সেই ঘাস বেশি করিয়া জন্মিবে, আমাদের আর অন্নাভাব থাকিবে না। ওবুকী নাকি খুব বড় শিকারী ছিল এককালে। বন্য গরু শিকার করিত। যে বন্যগরুর দলকে ঘিরিয়া তাহার শিকার চলিত একবার অনা-বৃষ্টির ফলে সে দল নাকি নিঃশেষ হইয়া যায়। ওবুকী এবং তাহার সহচরেরা গরুর দলকে যদি ঘিরিয়া না রাখিত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় কোন নদী বা ঝরনার নিকট গিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু গরুর দলকে ঘিরিয়া রাখাই তখন নিয়ম ছিল। ওবুকী সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সাহস করে নাই। ফলে সমস্ত গরু তৃষ্ণায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণ-ত্যাগ করিল। শুধু তাহাই নয়, ওবুকী একদিন প্রভাতে উঠিয়া আবিষ্কার করিল যে, তাহার সহচরেরাও তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু অরণ্য ত্যাগ করিল না। তৃণাচ্ছাদিত বিরাট অরণ্যে একা একা পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ওবুকী কতদিন যে এরূপভাবে একা একা ছিল তাহা কেহ জানে না। লিনাপা বলে, এই সময়ই সে না কি সূর্যদেবের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। সূর্যদেব তাহাকে বলেন, 'তুমি রিয়া নদীর তীরে যে বড় বড়

ঘাস আছে তাহার বীজ আহার করিয়া জীবন ধারণ কর।' ওবুকী নিজে কিন্তু বলে অন্যরকম। সে বলে যে, কয়েকদিন অনাহারে থাকিবার পর সহসা তাহার মনে একটা প্রেরণা জাগিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল যে গরুরা তো মাংস খাইয়া জীবনধারণ করে না, তাহারা ঘাস খাইয়াই বাঁচে। ঘাসের মধ্যেও তাহা হইলে নিশ্চয় এমন জিনিস আছে যাহা জীবের প্রাণরক্ষা করিতে পারে। প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় ওবুকী অবশেষে ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিছুদিন ঘাস খাইয়াই বাঁচিয়াছিল সে। ক্রমশ ঘাস খাইয়া তাহার দেহে শক্তিও সঞ্চারিত হইয়াছিল। এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ওবুকীর জীবনে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। কিছুদিন হইতে তাহার উদরে সামান্য বেদনা হইতেছিল, একদিন সে বেদনা এমন নিদারুণ হইয়া উঠিল যে ওবুকী অস্থির হইয়া পড়িল। ওবুকী বলে যে, চীৎকার করিতে করিতে সে নাকি সারা বনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহার পর অজ্ঞান হইয়া যায়। যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল যে বৃষ্টি হইতেছে। বহুকাল অনাবৃষ্টির পর এই বৃষ্টি তাহার সর্বাঙ্গে যেন অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিল। সে উদ্বাহু হইয়া নাচিতে শুরু করিল, নাচিতে নাচিতে বদন ব্যায়ত করিয়া জল-ধারা পান করিতে লাগিল। সহসা সে দেখিতে পাইল, একস্থানে মেঘ ফাটিয়া গিয়াছে এবং সেই ফাটল দিয়া একটা আলোক-রেখা নামিয়া আসিয়া তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের খানিকটা অংশকে আলোকিত করিয়াছে। ওবুকী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, আলোকিত অংশের তৃণগুলির প্রত্যেকটির মাথায় শীষ রহিয়াছে। তাহার মনে হইল আকাশ হইতে সূর্যদেব যেন আঙুল দিয়া ওই পক্ক তৃণশীর্ষগুলির দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। সে ছুটিয়া গেল এবং শীষগুলি ভক্ষণ করিতে লাগিল। ওবুকী বলে যে গরুদের ভক্ষ্য ঘাস লতাপাতা যদৃচ্ছ আহার করিয়া এতদিন সে কোনক্রমে জীবনধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পক্ক শীষগুলি আহার করিয়া একটা বিশেষ স্বাদ ও তৃপ্তি যেন সে অনুভব করিল। তাহার পর হইতে সে শীষ ছাড়া আর কিছু আহার করে না। শীষসমন্বিত তৃণ অনুসন্ধান করিতে করিতেই অবশেষে সে রিয়া নদীর তীরে আসিয়া লিনাপাকে দেখিতে পায়। কিশোরী লিনাপা রিয়া নদীর জলে মৎস্য শিকার করিতেছিল।

...বহুকাল পূর্বে এই লিনাপাকে লইয়া রিয়া নদীর তীরে ওবুকী যে শফরী-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিল, আমরা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। মেয়েরা নদীর জলে মাছ ধরিত, আমরা তৃণশীর্ষ আহরণ করিয়া আনিতাম। মাঝে মাঝে শিকারও করিতাম। কিন্তু শিকার করা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য প্রাত্যহিক কর্ম ছিল না। শিকারও বেশি মিলিত না সে সময়। শশক, শূকর, শজারু, পাখী মাঝে মাঝে আমরা শিকার করিয়া আনিতাম। কিন্তু ঘাসের বীজই আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল। ওবুকী যদিও কাহাকেও শিকার করিতে বারণ করিত না, কিন্তু শিকার করাটা সে খুব পছন্দও করিত না। সে বলিত,

"যে বীজ আহার করিয়া প্রাণীরা বাঁচিয়া আছে সেই সহজ-লভ্য বীজ আহার করিয়া আমাদেরও বাঁচিয়া থাকা উচিত। পশুর পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া সময় নষ্ট করার কোনও অর্থ হয় না।" লিনাপার কিন্তু এ বিষয়ে মত-ভেদ ছিল। লিনাপা বলিত, "সহজলভ্য তৃণবীজ আহার করিলে আমরাও ক্রমশ ওই তৃণদলের মতো সহজলভ্য হইয়া পড়িব। তখন গরুরাও আসিয়া আমাদের মুড়াইয়া খাইবে।" ওবুকী আকাশের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া উত্তর দিত, "হস্তীকে গরু মুড়াইয়া খাইয়াছে এরূপ খবর তো শোনা যায় নাই। হস্তীরা শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য শশক বা শজারুর পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে এরূপ খবরও কখনও শুনি নাই।" লিনাপাও হটিবার পাত্রী ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিত, "তাহা শোনা যায় নাই বটে, কিন্তু বিশালকায় হস্তীর মাথার উপর বসিয়া সিংহ যে তাহার মস্তক বিদীর্ণ করে এ খবর তাহারও অজানা নয়। আমরা হস্তী হইতে চাই না, আমরা সিংহ হইতে চাই।" ওবুকী একথা শুনিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত, দিনের পর দিন কোনও উত্তর দিত না। তাহার সে দৃষ্টি দেখিয়া আমরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতাম, অনুভব করিতাম, শিকার না করিয়া তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া আনিলেই ওবুকী খুশী হইবে, আবার হয়তো কথা কহিবে। লিনাপারও তাহাই মনে হইত, সে তখন আমাদের তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া আনিতে উৎসাহ দিত, নিজেও সংগ্রহ করিয়া আনিত। কয়েকদিন পরে ওবুকীর দৃষ্টি আকাশ হইতে নামিয়া হঠাৎ আবার নিবদ্ধ হইত লিনাপার মুখের উপর। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ লিনাপার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ওবুকী বলিত, "মাংস অনেকদিন খাওয়া হয় নাই। লিনাপা, তুমি অনেকদিন মাছও তো ধরিতেছ না। তোমার সিংহ হইবার বাসনাটা কি তবে নিছক ভণ্ডামি না কি?" লিনাপা হাসিত, ওবুকীও হাসিত। আমরা শিকারে বাহির হইয়া পড়িতাম। খুব সুখেই ছিলাম আমরা। রিয়া নদীর তীরে শাখা-প্রশাখা লতা-পাতা ঘাস দিয়া আমরা ছোট ছোট কুটির প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেই সব কুটিরে আমরা তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। অনাবৃষ্টির সময় ঘাস যখন শুকাইয়া যাইত, রিয়া নদী যখন শীর্ণকায়া হইয়া আসিত, পশুপক্ষীরাও যখন অন্তর্ধান করিত তখন ওই সংগৃহীত তৃণবীজের সাহায্যে আমরা জীবন ধারণ করিতাম। আমাদের তখন আর একটা কাজ ছিল, রিয়া নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া ঝিনুক সংগ্রহ করা। ঝিনুক সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা অনেক সময় বহুদূরে চলিয়া যাইতাম। বহু বর্ণের বহু রকম ঝিনুক আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সব ঝিনুক দিয়া মেয়েরা নিজেদের অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। ঝিনুকের বিনিময়ে আমরা প্রয়োজনীয় নানারকম দ্রব্যও সংগ্রহ করিতাম। অরণ্যবাসী তরক্ষু সম্প্রদায়ের লোকেরা পশুচর্মের বিনিময়ে ঝিনুক লইয়া যাইত। আমরা পশুচর্ম দিয়া নিজেদের গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিতাম। এইভাবেই আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। একদিন রিয়া নদীর জলে সাঁতার

দিতে দিতে অপরূপ লাবণ্যময়ী এক তরুণী আসিয়া আমাদের মধ্যে সহসা উপস্থিত হইল। সেরূপ লাবণ্যময়ী রমণী আমরা কেহই দেখি নাই। যে রমণীদের লইয়া আমরা ঘর করিতাম তাহাদের ক্ষুদ্র নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু, বৃহদ্দন্ত-শোভিত মুখ-মণ্ডলে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ছাড়া আনন্দজনক আর কিছুই যে ছিল না বংশীনাসা, আয়তনয়না, কুন্দদন্তী লীরাকে দেখিবার পর শফরী সম্প্রদায়ের সমস্ত পুরুষ তাহা যুগপৎ অনুভব করিলাম। লীরাকে ঘিরিয়া আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। লীরা কিন্তু আমাদের ভাষা বুঝিত না, আমরাও তাহার ভাষা বুঝিতাম না। তাহার নাম লীরা না আর কিছু তাহাও ঠিক জানিতাম না আমরা। আমরা তাহাকে লীরা নামে অভিহিত করিয়াছিলাম, কারণ নদীর জল হইতে উঠিয়া সে নিজের বুকের দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিল—লীরা। ওই একটিমাত্র শব্দই সে উচ্চারণ করিয়াছিল। যতদিন আমাদের মধ্যে ছিল আর দ্বিতীয় কোনও কথা সে বলে নাই। আমরা তাহাকে লীরা বলিয়াই ডাকিতাম, আমাদের ডাকে সে ঘাড় ফিরাইয়া মুচকি হাসিয়া সাড়াও দিত। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের সে বশ করিয়া ফেলিয়াছিল, এমন কি ওবুকীও পর্যন্ত তাহার মোহিনী শক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। প্রায়ই দেখা যাইত তাহার আকাশমুখী দৃষ্টি আর আকাশমুখী নাই, তাহা লীরাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। লীরা প্রত্যেকের কুটিরে যাইত, প্রত্যেকের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিত, প্রত্যেককে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া অরণ্যাভিমুখে লইয়া যাইত।

...একদিন গভীর নিশীথে নিদারুণ চীৎকার শুনিয়া ঘুম ভাঙিগয়া গেল। উঠিয়া দেখি শফরী প্রস্প্রদায়ের সমস্ত নারী একত্রিত হইয়া রোষভরে চীৎকার করিতেছে। চক্রাকারে দাঁড়াইয়া হস্তপদ আস্ফালন করিয়া বলিতেছে, “শেষ করিয়া ফেল, টুকরা টুকরা করিয়া ফেল, কুটি কুটি কর”। চক্রের মধ্যস্থলে কয়েকজন নারী দেখিলাম ধস্তাধস্তি করিতেছে। মনে হইল একটা বিরাট নারী-পিণ্ড যেন ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে। সহসা সেই পিণ্ড ভেদ করিয়া লীরা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম তাহার মাথার কুঞ্চিত কেশ-দাম ছিন্নভিন্ন, একটি স্তন নাই, সমস্ত বক্ষস্থল রক্তাপ্লুত। লীরা ছুটিয়া গিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহাকে অনুসরণ করিয়া কয়েকটি শফরী-রমণীও রিয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা লীরাকে আর ধরিতে পারে নাই।

...আমাদের জীবন যেমন চলিতেছিল, আবার তেমনি চলিতে লাগিল। ওবুকীর দৃষ্টি পূর্ববৎ আকাশমুখী হইয়া সূর্যবন্দনায় নিবিষ্ট হইল, অঞ্জলি ভরিয়া সে আবার আগের মতো মেঘের প্রত্যাশায় দিনযাপন করিতে লাগিল। আমরাও আবার শিকার এবং তৃণবীজ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলাম। লীরার স্মৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিল। লীরাকে ক্রমশঃ ভুলিয়াই গেলাম।

...সহসা আবার একদিন নৈশ নীরবতা একটা তীক্ষ্ম চীৎকারে বিঘ্নিত হইল। শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম—রিয়া নদীর জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি ভাসিতেছে, এবং প্রত্যেক গুঁড়ির উপর সশস্ত্র বহু লোক। পরে জানিয়াছিলাম ওগুলি নৌকা। গাছের গুঁড়িকে পোড়াইয়া তাহার মধ্যে খোলের মতো করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম নৌকায় দেখিলাম মশালহস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এক-স্তনী লীরা। তাহার চোখের দৃষ্টিতেও আগুন জ্বলিতেছে। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত। আমাদের কুটিরগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তীক্ষ্মকণ্ঠে সে কি যে বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সভয়ে চাহিয়া রহিলাম। সেই মোহিনী লীরা যে এমন ভয়ংকরী হইতে পারে তাহা কল্পনাতীত ছিল। বেশিক্ষণ কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিবার অবসর পাইলাম না। সশস্ত্র পুরুষগুলি সগর্জনে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল এবং আমাদের কুটিরগুলি আক্রমণ করিল। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলাম। কিছুদূরে একটা গাছ ছিল, আমি তাড়াতাড়ি সেই গাছের উপরে উঠিয়া পড়িলাম। বৃক্ষশীর্ষে বসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সর্বাঙ্গ বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। দেখিলাম সেই সশস্ত্র পুরুষগুলি আমাদের কুটিরের ভিতর ঢুকিয়া মেয়েদের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতেছে এবং লীরার পদপ্রান্তে লইয়া গিয়া বিরাট প্রস্তর কুঠারাঘাতে তাহাদের হত্যা করিতেছে। দেখিলাম উৎসাকারে উৎসারিত তাহাদের শোণিতধারা অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া লীরা তাহা নিজের বক্ষঃস্থলে সাগ্রহে লেপন করিতেছে। নারীকণ্ঠের আর্তনাদে রিয়া নদীর তীর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে শত শত মশাল জ্বলিতেছে, সেই মশাল আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম লীরাকে ঘিরিয়া নারী-মুণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আক্ষিপ্ত নারী-কবন্ধ শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া পুনরায় ভূ-শায়ী হইতেছে। সবিস্ময়ে ইহাও লক্ষ্য করিলাম যে, প্রত্যেক কবন্ধে একটি করিয়া স্তন নাই। সশস্ত্র পুরুষগুলি আমাদের সংগৃহীত ঝিনুকগুলিও বহন করিয়া নৌকায় তুলিতেছে দেখিলাম। সহসা আমার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইল। গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া লইয়া তরতর করিয়া গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং উন্মাদের মতো ছুটিয়া গিয়া শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর কি ঘটিয়াছে জানি না।

...যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম আমি ঘন ঘাসের বনে শুইয়া আছি। চতুর্দিকে কোনও শব্দ নাই। প্রখর রৌদ্রে চরাচর যেন পুড়িয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উঠিবার সময় লক্ষ্য করিলাম আমার পায়ে একটা দড়ি বাঁধা রহিয়াছে। আমার পায়ে দড়ি বাঁধিল কে? কখন বাঁধিল? ধীরে ধীরে ঘাসের বন হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, নির্জন প্রান্তর, দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, জন-মানবের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।, তাহার

পর বসিয়া পায়ের দড়িটা খুলিয়া ফেলিলাম। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। ঘাসের বনে ঢুকিয়া পড়িলাম আবার। তৃণবীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। ওবুকী যে তৃণবীজ আমাদের সংগ্রহ করিতে শিখাইয়াছিল সে তৃণ দেখিতে পাইলাম না। অন্য আর একপ্রকার তৃণে প্রচুর শীষ ধরিয়াছিল কিন্তু তাহা খাইতে সাহস হইতেছিল না। যদি খাদ্য না হইয়া বিষ হয়? আমাদের দলের টিনা ভুল করিয়া অন্য কি একটা গাছের পাতা খাইয়াছিল। ফলে তাহার মৃত্যু হয়। আমি লুব্ধ দৃষ্টিতে শীষগুলির দিকে চাহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলাম এমন সময় 'কুক্' করিয়া একটা শব্দ হইল। এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি আবার শব্দ হইল। পাখীর ডাক নয়, মানুষের কণ্ঠস্বর। সবিস্ময়ে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আবার অগ্রসর হইতে যাইতেছি আবার শব্দ হইল। কিছু দূরে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল, মনে হইল শব্দটা সেই গাছের উপর হইতে আসিতেছে। ভাবিলাম তাহা হইলে নূতন ধরণের কোনও পাখীই হইবে। কিন্তু যেই আবার অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইয়াছি আবার শব্দ হইল। কেহ আমাকে লক্ষ্য করিতেছে না কি? গাছটার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। কুক্ কুক্ উপর্যুপরি দুইটি শব্দ হইল এবার। কৌতূহলী হইয়া তখন গাছের দিকেই অগ্রসর হইলাম। গাছের যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম শব্দটা তত যেন ঘন ঘন হইতে লাগিল। নিকটে গিয়া দেখি শাখাপত্রবহুল প্রকাণ্ড গাছ। প্রথমে কিন্তু কিছুই দেখিতে পাই নাই, তাহার পর গাছের নীচে গিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন লালচুমের বাসাটা চোখে পড়িল। শবরী লালচুমকেও দেখিতে পাইলাম। গাছের কয়েকটি শাখাকে ঘাস পাতা দিয়া ঘিরিয়া, চমৎকার একটি ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল সে। তাহাতে একটি বাতায়নও ছিল। বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া লালচুম আমাকে দেখিতেছিল। তাহার মাথায় নানাবর্ণের বহুরকম পাখীর পালক, অঙ্গেও পাখীর পালকের আবরণ। আমার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র লালচুম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কুক্ কুক্ কুক্ শব্দে কলকাকলী করিয়া উঠিল যেন। আমি সবিস্ময়ে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। লাল-চুম তরতর করিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল এবং আমার দুই হাত ধরিয়া ইঙ্গিত করিল—চল, উপরে চল। কি একটা বলিল, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি উত্তরে বলিলাম, "কোথায় যাইব?" লালচুমও আমার কথা বুঝিতে পারিল না। হাসিমুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাত ধরিয়া পুনরায় আমাকে আকর্ষণ করিয়া আঙ্গুল দিয়া গাছের উপর তাহার বাসাটি দেখাইল। তাহাকে অনুসরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। সেই যে আরোহণ করিলাম, বহুকাল আর নামি নাই। নামিবার প্রয়োজনই হয় নাই। যদিও আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতাম না তবু অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে বহুকাল একসঙ্গে বাস করিয়াছিলাম।

পরস্পরের মনোভাব সহজেই আমরা বুঝিতে পারিতাম। মনে হয় পরস্পরের ভাষা জানা থাকিলে হয়তো এত সহজে বুঝিতে পারিতাম না। কারণ ভাষার দ্বারা আমরা মনোভাব প্রকাশও করি, আড়ালও করি। লালচুমের মনের ভাব মুখের মুকুরে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইত, আমারও হয়তো হইত। লালচুমের সঙ্গে অতিশয় অভিনব সুন্দর জীবন যাপন করিয়াছিলাম। ভাষা বাধা সৃষ্টি করে নাই।

...লালচুম ছিল শবরী। গাছের উপরই নানারকম ফাঁদ পাতিয়া সে পাখী ধরিত। কাক, বক, টিয়া, শালিক, হাঁস, কত রকম পাখীই যে তাহার ফাঁদে পড়িত তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায় প্রতি দিন আট-দশটা বড় পাখী ধরা পড়িত। তাহাতেই আমাদের দুইজনের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। লালচুম গাছ হইতে নামিয়া গিয়া ফল এবং জলও সংগ্রহ করিয়া আনিত মাঝে মাঝে। জল আনিত মানুষের মাথার খুলিতে। আমাকে কিন্তু সে কিছুতেই নামিতে দিত না। আমি নামিবার উপক্রম করিলেই দুই হাত বাড়াইয়া সে পথরোধ করিত। শুধু তাই নয়, ক্রোধে উত্তেজনায় তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিত। কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া আমি শেষে আর নামিবার চেষ্টাই করিতাম না। লালচুম কিন্তু নামিয়া যাইত। শুধু যে জল ও ফল সংগ্রহ করিবার জন্যই লালচুমকে নামিতে হইত তাহা নয়, ফাঁদের জন্য একরকম আঠাও সে সংগ্রহ করিয়া আনিত। আর একটা কারণেও সে নামিয়া যাইত মাঝে মাঝে। দূরে ঘাসের জঙ্গলে, বা আরও দূর প্রান্তরে মানুষ দেখিলে সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না। দ্রুত-বেগে নামিয়া গিয়া সে তাহাদের কি যে বলিত জানি না, কিন্তু দেখিতাম যে তাহার সহিত কথা কহিবার পর আগন্তুকের দল আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে। যতক্ষণ তাহারা দৃষ্টির সীমা পার হইয়া চলিয়া না যাইত লালচুম ফিরিত না। কখনও কখনও দেখিতাম লালচুমও তাহাদের সহিত চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের সহিত হাসিতেছে, তাহাদের নাচও দেখাইতেছে। কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। লালচুমের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার জীবনের অধিকাংশ রহস্যই আমি সমাধান করিতে পারি নাই। লালচুম যখন গাছ হইতে নামিয়া দূরে চলিয়া যাইত তখন আমি অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিতাম। পাছে আমি পলায়ন করি সেইজন্য লালচুম একটা 'তুক' করিয়া যাইত প্রতিবার। একটা জীবন্ত পাখীকে আমার সর্বাঙ্গে ছোঁয়াইয়া পাখীটা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। তাহার 'তুক' সত্ত্বেও হয়তো আমি পলায়ন করিতে পারিতাম, কোথাও কোনও বাধা অন্তত ছিল না, লালচুম অনেক সময় সমস্ত দিন অনুপস্থিত থাকিত, আমি একাই গাছের উপর বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু আমার পলাইতে ইচ্ছাই করিত না। লালচুমের আন্তরিক যত্নই যে শুধু আমাকে বশ করিয়াছিল তাহা নয়, গাছের ডালে ডালে তাহার পাখী ধরিবার ফাঁদগুলিও আমাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বিশাল মহীরুহের কোন শাখায় কোন পত্রগুচ্ছের অন্তরালে সে যে কখন ফাঁদ পাতিয়া রাখিত

তাহা আমাকে জানিতে দিত না। গাছের উপর যতক্ষণ থাকিত অধিকাংশ সময়ই গাছের শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়াইত সে। তাহার পর সে চলিয়া যাইত, আমি উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিতাম কোন ফাঁদে কোন পাখী পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে এই আশায়। কখনও দেখিতাম তীক্ষ্ন নখ-চঞ্চু শ্যেনপক্ষী একটা শাখায় আটকাইয়া ঝটপট করিতেছে, কখনও মরকতাঙ্গী শুক, কখনও দুগ্ধ-ধবল বক। কখন কে যে কোথায় ধরা পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। বলিয়াই ঔৎসুক্য প্রবল ছিল। প্রত্যাশিত অথচ অপ্রত্যাশিত, সুনিশ্চিত অথচ অনিশ্চিত এই ঘটনা-পরম্পরা আমাকে যেন মোহজালে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। লালচুমের যত্নও ছিল আর একটা মোহ। লালচুম আমাকে যে সেবাটা করিত তেমন সেবা জননীও বোধ হয় সন্তানকে করে না। যে খাদ্য সে সংগ্রহ করিয়া আনিত তাহার অধিকাংশই আমাকে খাইতে হইত, আপত্তি করিবার উপায় ছিল না, আপত্তি করিলে সে জোর করিয়া মুখে পুরিয়া দিত, আমি চিবাইতে অপারগ হইলে অনেক সময় চিবাইয়াও দিত। ইহা ছাড়া আর একটা জিনিসও সে করিত যাহার সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। সে আমার সর্বাঙ্গ টিপিয়া দিত। ইতিপূর্বে এরূপভাবে কেহ আমার অঙ্গ-সেবা করে নাই, অননুভূত একটা আরামে আমার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিত। প্রতি-দিন আমি মনে মনে অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম কখন সে আমার অঙ্গসেবা করিবে।

...একদিন লক্ষ্য করিলাম মাতৃত্বের সমস্ত লক্ষণ লালচুমের অঙ্গেপ্রত্যঙ্গে পরিস্ফুট হইয়াছে। লালচুম সন্তানসম্ভবা। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিলাম, লালচুম আমার সম্বন্ধে একটু যেন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। যত দিন যাইতে লাগিল তাহার ঔদাসীন্য বাড়িতে লাগিল। যে আগ্রহ লইয়া পূর্বে সে আমার সেবা করিতে উৎসুক হইত, দেখিলাম সে আগ্রহ তাহার আর নাই। গাছ হইতে নামিয়া যাইবার পূর্বে সে যে 'তুক' করিত ক্রমশ তাহাও করা ছাড়িয়া দিল। আমার চিন্তা হইত গাছের সঙ্কীর্ণ নীড়ে লালচুম সন্তান প্রসব করিবে কি করিয়া। কিন্তু আমার চিন্তার কথা তাহাকে আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম না, আমার ভাষা সে বুঝিত না। তথাপি অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহাকে এক দিন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহাতে সে মৃদু হাসিয়াছিল মাত্র। তাহার সেই বিষণ্ণ মৃদু হাসির অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। পারি-লাম কয়েক দিন পরে। লালচুম যখন আসন্নপ্রসবা তখনও সে প্রতি দিন গাছ হইতে নামিয়া যাইত। সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসিত আবার। এক দিন কিন্তু সে ফিরিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, কিন্তু লালচুম আর ফিরিল না। আমি চিন্তিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। সমস্ত রাত্রিই হয়তো বসিয়া থাকিতাম কিন্তু আমার ঠিক মাথার উপরেই একটা পেচক হঠাৎ ফাঁদে আটকাইয়া গেল। তাহার পক্ষ-বিধূনন ও কর্কশ আর্তনাদ আমাকে যেন ঘাড় ধরিয়া গাছ হইতে নামাইয়া দিল। মনে

হইতে লাগিল সমস্ত বৃক্ষটাই যেন বাঙ্ময় হইয়া আমাকে লালচুমের সন্ধানে প্ররোচিত করিতেছে।

লালচুম যে পথ দিয়া রোজ চলিয়া যাইত, সে পথ আমার অজানা ছিল না। গাছের উপর বসিয়া বসিয়া রোজই লালচুমকে চলিয়া যাইতে দেখিতাম। ঘন-দীর্ঘ ঘাসের মধ্য দিয়া তারার অস্পষ্ট আলোকে আন্দাজে সেই পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর ঘাসের বন শেষ হইয়া গেল, আমি একটা প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। বিরাট প্রান্তর। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নির্মেঘ আকাশে অগণিত নক্ষত্র উঠিয়াছে। মনে হইল তাহারা যেন আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে, তাহাদের হাসিভরা দৃষ্টি যেন ভাষাময়, কিন্তু সে ভাষা আমি বুঝিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার চলিতে শুরু করিয়া দিলাম। বহুক্ষণ চলিবার পর প্রান্তর শেষ হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল রাত্রিও বোধ হয় এইবার শেষ হইয়া যাইবে। প্রান্তরের পর আবার অরণ্য আরম্ভ হইয়াছিল। ছোট ছোট ঝোপ ও গুল্মই বেশি, মাঝে মাঝে এক-একটা বড় গাছ। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিয়াছিলাম একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইব। কিন্তু বিশ্রাম কপালে লেখা ছিল না। গাছে উঠিয়া দেখিতে পাইলাম অনতিদূরে কতকগুলি মশাল জ্বলিতেছে। মনে হইল কাহাকে ঘিরিয়া যেন কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে। গাছ হইতে নামিয়া সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া নিঃশব্দে তাহাদের নিকটবর্তী হইলাম। ঘন ঘাস থাকাতে কোনরূপ অসুবিধা হইল না। ঘাসের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া প্রথমেই লালচুমকে দেখিতে পাইলাম। সে উপুড় হইয়া কাতর শব্দ করিতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম প্রসব-বেদনাতেই সে কাতর হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের মুখের দিকে তখন একে একে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রদীপ্ত মশাল আলোকে দেখিলাম অধিকাংশ লোকের চোখেমুখে একটা তীব্র লালসার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা লোভনীয় কিছুর প্রত্যাশায় সকলেই যেন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ শোংছাকে দেখিতে পাইলাম। শোংছা আমাদের দলের লোক, ওবুকীর দৌহিত্র। এখানে কি করিয়া আসিল? শোংছার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। লক্ষ্য করিলাম একমাত্র তাহারই চোখেমুখে লালসার কোনও চিহ্ন নাই, বরং সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা বিষণ্ণতার ছাপই রহিয়াছে, সে যেন বাধ্য হইয়া ইহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, স্বেচ্ছায় বা সানন্দে নহে। শোংছার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলাম, যদি সে আমাকে দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার মুখভাব দেখিয়া মনে হইল না যে সে আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। লালচুম সহসা নিদারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই দেখিলাম তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু যাহা ঘটিল তাহার

জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। লালচুমের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। কেবল শোংছাই প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনও শব্দ নির্গত হইল না। একজন মশালধারী দেখিলাম ছুটিয়া আসিয়া সদ্যোজাত শিশুটাকে তুলিয়া লেহন করিতেছে। পরমুহূর্তেই দেখিলাম আর একজন তাহার হাত হইতে শিশুটাকে ছিনাইয়া লইল। তাহার পর কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। দেখিলাম জীবন্ত শিশুটাকে সকলে মিলিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া আহার করিতেছে। লালচুম নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সদ্যোজাত শিশুটার আর্ত চীৎকার সহসা থামিয়া গেল, দেখিলাম একজন তাহার গলাটা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। আমি নিজেও যে একদিন নরভূক ছিলাম, ঠিক ওই ভাবেই আমিও যে বহু শিশুমাংস আহার করিয়াছি তাহা আর স্মরণ ছিল না। জন্মজন্মান্তরের আবর্তে আবর্তিত হইয়া আমি যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, যে নবচেতনা লাভ করিয়াছিলাম তাহার সহিত ওই নরভুক পশুগুলার কোন সাদৃশ্যই ছিল না। আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল, চক্ষু বুজিয়া আমিও নিস্পন্দের মতো পড়িয়া রহিলাম। নরভুক পশুগুলা শিশুমাংস লইয়া কোলাহল করিতেছিল। অনুভব করিলাম কোলাহলটা ক্রমশ দূরে চলিয়া যাইতেছে। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম সকলেই চলিয়া গিয়াছে লালচুমও নাই। একটু উঁচু হইয়া দেখিলাম লালচুমকে কয়েকজন লোক স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। উহাকেও উহারা আহার করিবে না কি? সহসা ভীত হইয়া পড়িলাম। আমাকে যদি দেখিতে পায় তাহা হইলে...... মাথাটা পুনরায় নামাইয়া লইয়া সভয়ে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, কিছু দূর গিয়া কিন্তু থামিয়া গেলাম। শোংছার কথা মনে পড়িল, তাহার বিষণ্ণ মুখটা মনে পড়িল। মনে হইল শোংছার সহিত যদি কোন রকমে একবার দেখা করিতে পারি সমস্ত সমস্যাটার হয়তো সমাধান হইয়া যাইবে। এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর পরিবেশ পরিত্যাগ করিবার উপায়ও হয়তো সে বলিয়া দিতে পারিবে। সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া যেখানে ছিলাম আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিয়াছিলাম যতক্ষণ না শোংছার দেখা পাই ততক্ষণ জাগিয়া থাকিব, অনেকক্ষণ জাগিয়াও ছিলাম, কিন্তু কখন যে চোখের পাতা বুজিয়া আসিয়াছে জানি না, সেই ঘন ঘাসের বনেই হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা কাহার স্পর্শে ঘুমটা ভাঙিয়া গেল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, মুখের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়া শোংছা দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলাম কোনও কথা বলিতে বারণ করিতেছে। নির্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। শোংছা ইঙ্গিত করিয়া আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। শোংছাও আমারি মতো বুকে ভর দিয়া সরীসৃপের মতো হাঁটিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা প্রান্তরের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নিকটেই একটা বড় গাছ ছিল। শোংছা এক ছুটে গিয়া সেই

গাছটার উপর উঠিয়া পড়িল। একটু পরে আমিও গিয়া উঠিলাম।

"শোংছা তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?"

"লীরার দল আমাকে এবং আমাদের দলের অনেককে এই নরমাংসভুক পশুদের মুখে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে।"

"প্রতিশোধ কামনায়?"

পরিবর্তে তাহারা অনেক ঝিনুক এবং কড়ির মালাও পাইয়াছে।"

"তোমাদের কি করিয়া এখানে লইয়া আসিল?"

"পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়াছে।"

আমার তখন মনে পড়িল আমার পায়েও তো একটা দড়ি বাঁধা ছিল। আমার দড়িটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল সম্ভবত। তাই আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।

শোংছা প্রশ্ন করিল, "তুমি কি করিয়া এখানে আসিলে?"

আমার কাহিনী আনুপূর্বিক তাহাকে বলিলাম।

"তুমিই লালচুমের সহিত ছিলে?"

আমার বৃক্ষবাসিনী সঙ্গিনীর নাম যে লালচুম তাহা শোংছার নিকটই সেদিন প্রথম শুনিলাম।

"হ্যাঁ। ব্যাপার কি বল তো? ধরণধারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

"লালচুম কে, কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, তাহা আমিও জানি না। শুধু এইটুকু জানি, মাঝে মাঝে একটি শিশু এবং একটি বয়স্ক মানব ইহাদের উপহার দিবে এই সর্তে লালচুম ওই বৃক্ষ এবং বৃক্ষের চতুর্দিকের জমি ভোগদখল করিতে পায়। অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুটিকে এবং শিশুর জন্মদাতাটিকে লালচুম মাঝে মাঝে আনিয়া ইহাদের মুখে সমর্পণ করিয়া যায়। লালচুমের মতো আরও কয়েকটি বৃক্ষবাসিনী নারী এ অঞ্চলে আছে।"

"ইহারা বৃক্ষে বাস করে কেন?"

"অনেক দূর হইতে মানুষ দেখিতে পাইবে বলিয়া!"

"তাহা হইলে ইহারা তো এইবার আমার সন্ধানে বাহির হইবে নিশ্চয়।"

"হইবে না, হইয়াছে। মূর্ছিতা লালচুম ছাড়া কেহই এখন এ অঞ্চলে নাই। আমি সেইজন্যই ভরসা করিয়া তোমার খোঁজে বাহির হইতে পারিয়াছি। তুমি যখন ঘাসের মধ্যে লুকাইয়াছিলে তখনই আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তখন হইতে আমি আশা করিয়া আছি—তোমার সঙ্গে আজ এখান হইতে সরিয়া পড়িব। সরিয়া পড়িবার এ রকম সুযোগ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু একা এদেশ হইতে পলায়ন করা সম্ভব নয়। চতুর্দিকেই নদী, কিছু দূরে সমুদ্র। নদীতে নৌকা আছে, গাছের বড় বড় গুঁড়ি কুরিয়া ইহারা নৌকা প্রস্তুত করিয়াছে। সেই নৌকায় একজন না একজন লোক সদাসর্বদা বসিয়া থাকে। তাহার চক্ষু এড়াইয়া নদী পার হওয়া অসম্ভব। তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।

কিন্তু একা তাহাকে হত্যা করাও সম্ভব নয়। অন্তত আর একজন লোক চাই। তুমি যখন ভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়িয়াছ চল আর দেরি করা ঠিক হইবে না। আমি কিছু অস্ত্রশস্ত্রও গোপনে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। সেগুলি লইয়া চল বাহির হইয়া পড়ি। চল চল—"

শোংছার চোখে মুখে একটা ত্রস্ত ভীত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমিও কম ভীত হই নাই, তবু আমি প্রশ্ন করিলাম, "তোমার সঙ্গে আরও যাহারা ছিল তাহারা কোথায়?"

"তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই। ওই রাক্ষসরাক্ষসীরা তাহাদের একে একে নিঃশেষ করিয়াছে। আগামী পূর্ণিমায় আমাকেও শেষ করিয়া ফেলিবে। আমি কয়েকবার পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বলিলাম তো একা এখান হইতে পলায়ন করা সম্ভব নয়। চল, দুইজনে মিলিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি যদি নৌকার লোকটাকে হত্যা করিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। চল..."

...নৌকার লোকটিকে হত্যা করা অসম্ভব হয় নাই। শোংছা যে প্রস্তর-কুঠারটি গোপনে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল তাহার এক আঘাতেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল, সে চীৎকার করিবার অবকাশ পর্যন্ত পাইল না। তাহার নৌকাতে আরোহণ করিয়াই আমরা নদী পার হইলাম। আমরা তখনও নৌকা বাহিতে শিখি নাই। নৌকা জলের স্রোতে আপনি ভাসিয়া চলিল, আমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ ভাসিবার পরে আমরা জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতে লাগিলাম। বেশ খানিকক্ষণ সাঁতরাইবার পর প্রভাত হইয়া গেল। শোংছা বলিল, "আর জলে থাকা নিরাপদ নয়, চল আমরা তীরে উঠিয়া পড়ি।" তীরে উঠিয়া শোংছা ছুটিতে লাগিল, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। মধ্যে মধ্যে একটু বিশ্রাম করিয়া আমরা সমস্ত দিনই ছুটিয়াছিলাম। ছুটিয়া কোথায় চলিতেছিলাম তাহা তখনও জানিতাম না, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওই নরভুক রাক্ষসদের নিকট হইতে পলায়ন করা। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল তাহারা বোধ হয় আমাদের অনুসরণ করিতেছে, আমাদের পিছনে বহু দূরে তাহাদের চীৎকার যেন শোনা যাইতেছে। সুতরাং দাঁড়াইবার বা বিশ্রাম করিবার অবসর বড় একটা পাই নাই। নিতান্ত শ্বাসকষ্ট যখন হইতেছিল তখন কোনও ঝোপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ় হইয়া আসিল তখন এক স্থানে একটা বেড়ায় আটকাইয়া গেলাম। শোংছা হোঁচট খাইয়া পড়িয়াই গেল। হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখিলাম গাছের বড় বড় ডাল পুঁতিয়া একটা সুদীর্ঘ বেড়া কে যেন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ নিশ্চয়ই। বিস্মিত হইলাম। এত বড় দীর্ঘ বেড়া তো কোনও মানুষকে কখনও দিতে দেখি নাই। কোনও ফাঁদ নয় তো! আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। নিকটেই যে বড় গাছটি ছিল তাহাতেই

আরোহণ করিয়া রাত্রিবাস করিব ঠিক করিলাম। শোংছা বলিল, "এক সঙ্গে দুইজনেরই ঘুমানো চলিবে না। একজনকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। তুমি আগে ঘুমাও, আমি জাগিয়া থাকিব। নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসিবে না।"

...শোংছা আমাকে একবারও জাগায় নাই। আমার যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম শোংছা পাশে নাই। সম্মুখের দিকে চাহিয়া যাহা নজরে পড়িল তাহা এখন হয়তো কাহারও মনে বিস্ময় উৎপাদন করিবে না, কিন্তু আমাকে তখন তাহা শুধু বিস্মিতই করিল না, মুগ্ধও করিল। আমি চমৎকৃত হইয়া বেড়া-দেওয়া শ্যামল ক্ষেতটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইতেছিল যেন চোখ জুড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে পিশাচ-পিশাচীদের নিষ্ঠুরতা মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল এই দৃশ্য সেই ক্ষতস্থানে যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়া দিল। প্রকৃতির স্বাভাবিক শ্যামল বন্যশোভা বহুবার দেখিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষেতটির শোভা সে সব হইতে এত পৃথক, এত বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ যে আমি অবাক হইয়া রহিলাম। চতুর্দিকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া এমন সুবিন্যস্ত করিয়া ঘাসের সারি কে লাগাইয়াছে? নিশ্চয় মানুষ। কে সে? শোংছা কোথায় গেল? অনুসন্ধান করিবার জন্যই নিশ্চয় সে নামিয়া গিয়াছে। আমিও নামিয়া পড়িলাম। বেড়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ওবুকী যে তৃণবীজ আমাদের সংগ্রহ করিতে শিখাইয়াছিল দেখিলাম সমস্ত ক্ষেত ভরিয়া সেই তৃণই রহিয়াছে। সহসা দূরে একজন মানুষ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম তাহার স্কন্ধে একটি প্রস্তর-কুঠার রহিয়াছে। সে হস্ত উত্তোলন করিয়া আমাকে কি যেন একটা বলিল, দূর হইতে ভাল শুনিতে পাইলাম না। আমার নিকটও একটা প্রস্তর-কুঠার ছিল। মনে হইল যদি লোকটা আমাকে আক্রমণই করে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভয়ও করিতে-ছিল না। সেই শ্যামল তৃণক্ষেত্র আমার মনে এমন একটা স্নিগ্ধ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই কেমন করিয়া যেন নির্ভয় হইয়াছিলাম, মনে হইতেছিল যে আসিতেছে সে শত্রু নয়, মিত্র। কাছাকাছি আসিয়া লোকটি উপর্যুপরি তিনটি প্রশ্ন করিল, "তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি চাও?" বহুকাল পরে নিজের ভাষা শুনিয়া মনে হইল দীর্ঘ বিচ্ছেদের শেষে যেন পরম আত্মীয়ের দেখা পাইলাম। এ লোকটি যখন আমার ভাষা বলিতেছে তখন নিশ্চয়ই আত্মীয়। ভাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পরিচিত মনে হইল না। শফরী সম্প্রদায়ের সকলকেই আমি চিনিতাম। এ লোকটি তাহা হইলে শফরী সম্প্রদায়ের নয়।

বলিলাম, "আমি একজন শফরী, ওবুকীকে খুঁজিতেছি। সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে? তাহার কোনও খবর কি দিতে পার?"

"নিশ্চয় দিতে পারি। ওবুকী তো আমাদের দলপতি। তুমি একজন

শফরী? ওবুকীর মুখে শুনিয়াছি লীরার দল আসিয়া শফরী বংশকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।"

লোকটি বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, "ঠিকই শুনিয়াছ। আমি আর শোংছা কেবল বাঁচিয়া আছি। আর কেহ আছে কি না জানি না। তুমি কি শফরী নও?"

"না, আমি নীল গাই। ওবুকী আমার মাকে বিবাহ করিয়া এখানে নূতন দলের পত্তন করিয়াছে। আমার মা মৃন্তা নীল গাই। আমরা সকলে নীল গাই। ওবুকীর নির্দেশ অনুসারে আমরা এখানে ঘাসের চাষ করি।"

"ওবুকী কোথায়? তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

"ওবুকী মাটির নীচে গুহায় বাস করে। ক্ষেতের ওপারে ওই যে কুটিরের মতো দেখিতেছ, ওইটাই গুহার প্রবেশ পথ। দুইজন সশস্ত্র নীলগাই ওই গুহামুখে প্রহরায় নিযুক্ত আছে। তাহাদের নিকট গিয়া তোমার পরিচয় দাও, তাহারা ওবুকীকে খবর দিবে। ওবুকী যদি তোমার সহিত দেখা করিতে চায় তাহা হইলে দেখা হইবে।"

"পূর্বে তো এরূপ ছিল না। পূর্বে ওবুকী রিয়া নদীর তীরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সূর্যপূজা করিত। রিয়া নদীর জল অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিত, তাহার নিকটে আমরা যখন খুশী যাইতে পারিতাম, কোনও মানা ছিল না।"

"এখনও ওবুকী সূর্যপূজা করে, এখনও রিয়া নদীর জল সে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে, কিন্তু এখন তাহার চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরী থাকে। লীরার দল আক্রমণ করার পর হইতে ওবুকী এই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে। ওবুকীরই নির্দেশ অনুসারে আমরা সশস্ত্র হইয়া এই তৃণ-ক্ষেত্রের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াই। লীরার দল শফরী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু নীলগাইদের কিছু করিতে পারিবে না। তুমি যদি ওবুকীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাও, ওই কুটীর অভিমুখে যাও।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম শোংছা আসিতেছে। শোংছা হাত তুলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিল। আমি তখন নীলগাই যুবককে বলিলাম, "ওই আর একজন শফরী। বোধ হয় ওবুকীর খোঁজ পাইয়াছে। কি বলিতেছে শুনিয়া আসি।"

নিকটে যাইতেই শোংছা বলিল, "ওবুকী ডাকিতেছে, চল।"

"তুমি কি করিয়া ওবুকীর সন্ধান পাইলে?"

নীলগাই যুবকটি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, সে বলিল, "আমিই উহাকে সন্ধান দিয়াছি।"

শোংছার সহিত আমি ওবুকীর গুহার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। গুহার নিকট গিয়া দেখিলাম, ওবুকী গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। যে কুটীরটি দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহারই ছায়ায় সে আমাদের

অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার পার্শ্বে দেখিলাম, একটি বলিষ্ঠকায়া নারীও একটি সদ্যোজাত শিশু ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। নীলগাই মুন্তা। আমাদের দেখিয়া ওবুকী বলিল, "তোমরা যে আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহা আশা করি নাই। আমি নিজেই যে ফিরিব, সে আশাও তো ছিল না। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাও অপ্রত্যাশিত এবং তাহা আমার মনে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, সে প্রেরণাও অদ্ভুত। আমাদের আশা-প্রত্যাশা অতিশয় সীমাবদ্ধ, আমাদের কল্পনাও অতিশয় সংকীর্ণ। সেই সংকীর্ণ সীমার বাহিরে বিরাট একটা জগৎ আছে, সেই জগতে বহু অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। মাঝে মাঝে সেই জগতের দুই-একটা ঘটনা আমাদের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ছিটকাইয়া আসিয়া পড়ে, তখন আমরা অপ্রত্যাশিত নূতন আলোক প্রত্যক্ষ করি। লীরা অপ্রত্যাশিতভাবেই আমাদের মধ্যে আসিয়াছিল, অপ্রত্যাশিতভাবেই শফরী সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করিয়া চলিয়া গেল। নূতন আলোকে আমরা নিজেদের অসংযম, নিজেদের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিলাম। লীরার দল আক্রমণ করিতেই আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। দুই দিন, দুই রাত্রি অবিরাম হাঁটিবার পর তৃতীয় সন্ধ্যায় যে স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিব মনস্থ করিলাম, সে স্থানে বিশ্রাম করা সম্ভবপর হইল না। একটা করুণ ক্রন্দন দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া আমাকে উতলা করিয়া তুলিল। যদিও অতিশয় ক্লান্ত ছিলাম, তথাপি সেই করুণ শব্দ অনিবার্যভাবে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অন্ধকারে সেই শব্দকে অনুসরণ করিয়া শিংশপা-বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এক প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রান্তরের মধ্যস্থলে শাখা-প্রশাখাবহুল একটি বটবৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষতলে একটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম ঊর্ধ্বমুখ হইয়া একটি নারী ক্রন্দন করিতেছে। হাঁ, অপ্রত্যাশিতভাবেই সেদিন নীলগাই মুন্তার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম—"

এই পর্যন্ত বলিয়া ওবুকী মুন্তার দিকে চাহিল। মুন্তা শিশুটিকে স্তন্যদান করিতেছিল, দেখিলাম তাহার অধরে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলাম শিশুটি তাহার যে স্তনটি পান করিতেছিল না, সেই স্তন হইতেও দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে এবং মুন্তা বাম হস্ত দিয়া তাহা প্রতিরোধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।

ওবুকী বলিল, "মুন্তা, সেদিনের সমস্ত ঘটনা কি ইহাদের বলিব? ইহারা আমার আপন লোক। লিনাপার বংশ ইহারা। ইহাদের নিকট কোনও কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। তবে তোমার যদি আপত্তি থাকে, বলিব না।"

মুন্তা বলিল, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমারও আপত্তি নাই। তোমরা কথা বল, আমি ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইয়া আসি।" মুন্তা উঠিয়া গুহার ভিতরে চলিয়া গেল।

ওবুকী বলিল, "বটবৃক্ষতলে বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে এই মুন্তাই সেদিন

ক্রন্দন করিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। উহাদের সামাজিক নিয়ম অনুসারে তাহার স্বামীর শবদেহ বটবৃক্ষের শাখায় বাঁধা ছিল এবং উহাদের সামাজিক নিয়ম অনুসারেই মূন্তা গভীর রাত্রিতে আসিয়া ঊর্ধ্বমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিতেছিল যে সে পুনরায় বিবাহ করিবে কি না। মূন্তাদের পুরোহিত জাঋক্ষ বলিয়াছিলেন যে তাহার স্বামীর প্রেতাত্মা যদি অনুমতি দেয়, তাহা হইলে ওই গভীর রাত্রেই ওই বটবৃক্ষতলেই তাহার নূতন স্বামী আবির্ভূত হইবে। আমাকে দেখিয়া মূন্তা ক্রন্দনাবেগ সম্বরণ করিল, তাহার পর নতমুখে বলিল, "বিদেশী, আমার গৃহে আজ আতিথ্য-গ্রহণ করিবে কি? আমি অনাথা হইয়াছি, জানি না, তুমি আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লইতে পারিবে কি না।"

এই পর্যন্ত বলিয়া ওবুকী আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল। আমরাও নীরব রহিলাম। তাহার পর ওবুকী আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "নীলগাই মূন্তার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা ছিল। আমি ইহাদের সকলেরই ভার লইতে সম্মত হইলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, রিয়া নদীর তীরে ফিরিয়া আসিয়া যদি নূতন সমাজ পত্তন করিতে হয়, একাকী তাহা সম্ভব হইবে না। জনবল চাই। নীলগাই মূন্তার চারিটি পুত্রই বলিষ্ঠ, অস্ত্রশস্ত্র চালনায় নিপুণ। তাহারাও আমার সহিত আসিতে সম্মত হইল। অপ্রত্যাশিতভাবে নীলগাই মূন্তার সহিত সেদিন যদি আমার সাক্ষাৎ না ঘটিত, তাহা হইলে আমি রিয়া নদীর তীরে, আমার পূর্ব বাসস্থানে, আর প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতাম না। অপ্রত্যাশিতভাবেই আমি একদিন নীলগাই মূন্তার পরিবারবর্গকে লইয়া রিয়া নদীর তীরে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাও অপ্রত্যাশিত। আশা করি তোমাদের মনে আছে যে, আমারই নির্দেশে তোমরা কুটীরে কুটীরে তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া আনিতে। মায়াবিনী লীরার নেতৃত্বে যে দস্যুদল আসিয়াছিল, তাহারা আমাদের সকলকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তোমাদের ঝিনুক ও রঙীন প্রস্তরগুলি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সংগৃহীত তৃণবীজগুলি তাহারা স্পর্শও করে নাই। তাহারা মাংসাশী, তৃণবীজের মর্ম তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। আমি আসিয়া দেখিলাম, আমাদের কুটীর একটিও নাই, কিন্তু যে যে স্থানে সেই তৃণবীজগুলি স্তূপীকৃত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তৃণ অঙ্কুরিত হইয়াছে। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। সেই লক্ষ লক্ষ তৃণাঙ্কুর যেন আমাকে বলিতে লাগিল, "একদিন আমরা বীজ ছিলাম, এখন তৃণ হইয়াছি, পুনরায় বীজ হইব, পুনরায় সেই বীজ তৃণে রূপান্তরিত হইবে। আমাদের তোমরা যদি রক্ষা কর, তোমাদেরও আমরা রক্ষা করিব।" আমার মনে হইল, দেবতাই বোধ হয় আমাকে নবজীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। নীলগাই মূন্তার পুত্রচতুষ্টয়কে বলিলাম, "এস আমরা এই ভূমি খনন করিয়া তাহাতে তৃণবীজ বপন করি। একটি বীজ শত শত বীজ

প্রসব করিবে, আমাদের খাদ্য সমস্যা আর থাকিবে না।" মনুতার পুত্র-চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া একদিন আমিই নিজে উৎসাহী হইয়া ভূমি খনন আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ তোমরা স্বচক্ষেই দেখিয়াছ, তাহার ফল কি হইয়াছে। এখন আমাদের আর খাদ্য-সমস্যা নাই। বন্যজন্তুর পিছনে পিছনে ঘুরিয়া এখন আমাদের আর অনিশ্চিত শিকারী জীবন যাপন করিতে হয় না। তৃণের লোভে বন্য গরু, বন্য ঘোড়া, বন্য মহিষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরং মাঝে মাঝে আমাদের তৃণক্ষেত্রে আসিয়া হানা দেয়, তাহাদের বধ করিবার জন্য আমাদের কোথাও যাইবার প্রয়োজন হয় না। তাহাদের আক্রমণ হইতে আমাদের ক্ষেত্র-গুলিকে রক্ষা করিবার জন্যই আমরা গাছের ডাল কাটিয়া বেড়া দিয়াছি। শুধু তাহাদের আক্রমণ নয়, মানুষেরও আক্রমণ আছে। নীলগাই মনুতার পুত্রগুলি দিবারাত্রি সেইজন্য কুঠার স্কন্ধে পাহারা দিতেছে। তোমরা আসাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। নীলগাই মনুতার কন্যা দুইটি এখনও অনূঢ়া আছে। তোমরা তাহাদের লইয়া এইখানেই নূতন গৃহস্থালি স্থাপন কর। লিনাপার জন্য আমি মাঝে মাঝে দুঃখ বোধ করি, নীলগাই মনুতা তাহার বিগত দুই স্বামীর জন্য মাঝে মাঝে অশ্রুপাত করে। তোমরাও ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পার। কিন্তু যাহারা চলিয়া গিয়াছে, আর কখনও ফিরিবে না, তাহাদের প্রত্যাশায় বসিয়া অমূল্য জীবন নিষ্ফল করিও না। রিয়া নদীর তীরে প্রত্যাবর্তন করিয়া অঙ্কুরিত তৃণবীজগুলির নিকট আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা এই—যাহা পুরাতন তাহাই আবার নূতন আকারে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেই রূপান্তরিত পুরাতনকে নবরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়। আর একটা কথা শুনিলেও তোমরা বোধ হয় আশ্বস্ত হইবে। নীলগাই মনুতার জননী নীলগাই কাঙখী একদা শফরী জল্লুককে বিবাহ করিয়া নীলগাই সম্প্রদায়ের সূচনা করিয়াছিল। আমার প্রথম যৌবনে অনাবৃষ্টির ফলে আমাদের শিকার জীবনের যখন অবসান ঘটিল, যে বনে আমরা শিকার করিতাম জলাভাবে সেই বন যখন পশুপক্ষী শূন্য হইল তখন শফরী সম্প্রদায়ের বহুলোক বহুস্থানে চলিয়া গিয়াছিল। জল্লুক তাহাদেরই একজন। নীলগাই কাঙখীর সহিত মিলিত হইয়া সে গুল্ম কন্দ ভোজন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। শফরী সম্প্রদায়ের লিনাপাকে লইয়া আমি নূতন সমাজের পত্তন করিয়াছিলাম, তোমরা তাহারই ফল। আশ্চর্যের শফরী জল্লুকের বংশ আজ আবার নীলগাইরূপে আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখিতেছ আমাদের ভাষা এক, আচরণও বিভিন্ন নহে। আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা তোমরাও কর। গাই রুমিলা, নীলগাই শোহিলা উভয়েই স্বাস্থ্যবতী, তোমরা তাহাদের বিবাহ করিয়া তৃণবীজ উৎপাদনে মনোনিবেশ কর। নীলগাই মনুতার গণ ভগিনীগণ সকলেই আসিয়া আমার এই কৃষিকার্যে যোগদান করিয়াছে। শুনিতেছি ছাগ সম্প্রদায়ের লোকেরাও আসিবে। আমাদের বৃহৎ গোষ্ঠী

গড়িয়া উঠিবে ; আমরা আমাদের সমবেত শক্তি দিয়া একটি তৃণবীজকে বহু তৃণবীজে রূপান্তরিত করিব, আমাদের খাদ্যাভাব আর থাকিবে না।"

ওবুকী আবার তাহার দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ করিল। মনে পড়িল এই দৃষ্টি দেখিয়া আমরা পূর্বে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতাম। বুঝিলাম আমাদের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ওবুকী তাহার দৃষ্টি আকাশ হইতে নামাইবে না।

আমরা উভয়েই প্রায় যুগপৎ বলিয়া উঠিলাম, "তাহাই হইবে। রুমিলা শোহিলাকেই আমরা বিবাহ করিব।"

ওবুকী তখন তাহার ঊর্ধ্বমুখী দৃষ্টি গুহার দিকে ফিরাইয়া ডাক দিল —"রুমিলা, শোহিলা, বাহিরে আসিয়া দেখ কাহারা আসিয়াছে।"

দুইটি পুষ্টকায়া যুবতী গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ওবুকী বলিল, "ইহারা তোমাদের বিবাহ করিবে।"

শুনিবামাত্র তাহারা আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। ওবুকী তখন আমাদের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি কৌতুকদীপ্ত।

"এইবার তোমরা কে কোনটিকে লইবে বল। শোংছা তুমি যাহাকে চাও তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াও!"

শোংছা একজনের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

ওবুকী তখন আমাকে বলিল, "শোংছা শোহিলাকে পছন্দ করিয়াছে, তুমি তাহা হইলে রুমিলাকে গ্রহণ কর। আশা করি ইহাতে তোমার আপত্তি নাই।"

"না।"

আমি গিয়া রুমিলার পিছনে দণ্ডায়মান হইলাম। আবার আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইয়া গেল।

...জোলমাকে হারাইয়া যে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সে সুড়ঙ্গপথ তখনও শেষ হয় নাই। জোলমাকে কেন্দ্র করিয়া যে আশ্চর্য কল্পনা আমার পশুচিত্তকে বিচিত্রিত করিয়াছিল সে কল্পনারও অবসান ঘটে নাই। জন্ম জন্মান্তর আমি বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জীবনের আবর্তে আবর্তিত হইয়াছি, কখনও পুরুষরূপে কখনও নারীরূপে বহু বিচিত্র নর-নারীর সঙ্গ-স্বাদ অনুভব করিয়াছি কিন্তু জোলমাকে ভুলি নাই। জোলমা নামক বিশেষ ব্যক্তিটিকে হয়তো ভুলিয়াছি কিন্তু জোলমার আদর্শ আমার চেতনায় যে বর্ণবহুল ছাপটি আঁকিয়া দিয়াছিল তাহা লুপ্ত হয় নাই। জন্মজন্মান্তরের নানা স্বপ্নে নানা প্রেরণায় তাহা কেবল নানারূপে রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল মাত্র দৈনন্দিন জীবনের অতি স্বাভাবিক গতিপথে প্রতি জন্মেই নিজের অজ্ঞাতসারে আমি যেন অলৌকিক অস্বাভাবিক জোলমার আবির্ভাব প্রত্যাশা করিতে ছিলাম। শিল্পীমনের মানসীকে স্থূল দৈহিক সীমায় প্রত্যক্ষ করিতে

চাহিতেছিলাম। একদিন যাহাকে পাইয়াও হারাইয়াছিলাম, কামনার গভীর অন্তরে আশা ছিল আবার তাহাকে পাইব। বস্তুত তাহাকে পাইবার আশাই যেন যুগে যুগে আমার অন্তর্জীবনে কাব্যশিল্পসুষমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অসম্ভবকে সম্ভাবনার সীমায় মূর্ত করিয়া কল্পলোকে রূপকথা রচনা করিয়াছে। কামনার কলুষ যাহাকে ম্লান করিয়া দেয় তাহাকেই কামনা করিয়া আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, আশা করিয়াছি যে কামনার পঙ্ককুণ্ডে পঙ্কজের মতই সে একদিন ফুটিয়া উঠিবে। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী জীবনে তাহার আভাস পাইয়াছিলাম শিলাঙ্গীর মধ্যে।

...অনাবৃষ্টি চলিতেছিল।

উন্নগা পর্বত হইতে যে ঝরণাধারা নামিয়া শীর্ণধারায় কন্যা নদীরূপে বহিয়া গিয়াছিল আমরা তখন সেই কন্যা নদীর তীরে বাস করি। ওবুকী একদা যে নবজীবনের প্রবর্তন করিয়াছিল সেই জীবনধারাই আমরা তখন অনুসরণ করিতেছি। ওবুকীর কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু কৃষি-কার্য ভুলি নাই। বস্তুত কৃষিকর্মই আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্যই আমরা নদীর তীরে বসতি করিয়াছিলাম। অনাবৃষ্টির ফলে আর একটা কাণ্ড ঘটিয়াছিল। প্রাণীমাত্রেরই জলের প্রয়োজন হয়। পিপাসার তাড়নায় সর্বপ্রকার প্রাণীই কন্যা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইত। গরু, মহিষ, বাইসন, ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল, ভল্লুক, ছাগ, মেষ, অশ্ব, সর্প, নকুল, শজারু, শশক প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণী উন্নগা পর্বতের অরণ্যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত জলের আশায়। কন্যা নদীর শীর্ণ ধারা এই বিভিন্ন জাতীয় পরস্পর শত্রু পশুদলকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। আমরা, নিম্ব সম্প্রদায়ের লোকেরা কন্যা নদীর উভয় তীরে বাস করিতাম। মধ্যে মধ্যে কন্যা নদীর শীর্ণধারা স্ফীত হইয়া উভয় কুল প্লাবিত করিয়া দিত। এই প্লাবন যে আমাদের চাষের পক্ষে হিতকর তাহা আমরা বুঝিয়াছিলাম। প্লাবন হইয়া যাইবার পর উভয় তীরে যে পলি পড়িত তাহাতে আমাদের ফসল ভাল হইত। তাই আমরা কন্যা নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতাম—"হে নদী, তুমি স্ফীত হও, অঙ্গ বিস্তার কর।" কন্যা নদীর সহিত আমাদের যেন একটা আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। আমরা তাহাকে নিজের লোক মনে করিতাম। তাহার বিভিন্ন মনোভাবও যেন আমরা বুঝিতে পারিতাম। কখনও মনে হইত সে আনন্দিত, কখনও ভাবিতাম সে অভিমান করিয়াছে, কখনও অনুভব করিতাম তাহার শীর্ণধারায় তাহার রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহার কলধ্বনিতে কখনও আশ্বাস, কখনও তর্জন, কখনও ঔদাসীন্যের সুর শ্রবণ করিয়া আমরা কখনও পুলকিত, কখনও আতঙ্কিত হইতাম। অঞ্জলি ভরিয়া আমাদের তৃণবীজের ফসল তাহার তরঙ্গধারায় নিক্ষেপ করিয়া, ঋতুতে ঋতুতে আরণ্য কুসুমের অর্ঘ্য দিয়া আমরা কন্যা নদীকে সম্বোধন করিয়া

বলিতাম—"হে নদী, তুমি প্রসন্ন হও, প্রশস্ত হও, প্রসারিত হও। তোমার জলধারা জননীর স্তন্যধারার মতো আমাদের ক্ষেত্রকে সঞ্জীবিত করুক।" নিম্ব-জননীরা নিজেদের স্তন্যদুগ্ধ নিঙড়াইয়া কন্যা নদীর জলে নিক্ষেপ করিত। নিম্ব-পুরুষরা নিজেদের শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া শোণিত-অর্ঘ্যে কন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইত। নিম্ব-দলপতি ধবল কন্যার তীরে তীরে অহরহ পর্যটন করিয়া বেড়াইত কন্যার মনোভাব জানিবার আশায়। তাহার আর কোনও কাজ ছিল না। প্রখর দ্বিপ্রহরের তপ্ত রৌদ্রে, গভীর নিশীথের সূচীভেদ্য অন্ধকারে সে একা একা কন্যার তীরে ঘুরিয়া বেড়াইত কন্যার সূক্ষ্ম কলধ্বনির ভাষ্য করিবার জন্য। মধ্যে মধ্যে সে কন্যার মনের গোপন বাসনা বুঝিতেও পারিত। তদনুসারে আমাদের অদ্ভুত নির্দেশও দিত। আমরা হয়ত জমি খুঁড়িতেছি (তখন আমরা গাছের মজবুত শাখা সূক্ষ্মাগ্র করিয়া লইয়া তাহা দিয়াই মাটি খুঁড়িতাম) দলপতি ধবল উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল, "আজ চল আমরা পাহাড়ে গিয়া পলাশ ফুল সংগ্রহ করি। কন্যার পলাশফুলে সাজিবার সাধ হইয়াছে। আজ ভূমি খনন করিবার প্রয়োজন নাই।" দলপতির আদেশে আমরা সকলে পাহাড়ে গিয়া রাশি রাশি পলাশ ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। কিছুক্ষণের জন্য কন্যার তরঙ্গে সহস্র সহস্র পলাশ ফুল ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত নদীটাই যেন লাল হইয়া গেল। ধবল আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল, "কন্যা এইবার আবার দুকূল-প্লাবিনী হইয়া উঠিবে, আর আমাদের কোথাও যাইতে হইবে না, কন্যা তাহার তীরে আমাদের বাঁধিয়া রাখিবে..."

এই উক্তির একটা বিশেষ অর্থ ছিল। বাধ্য হইয়া কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর আমাদের স্থান পরিবর্তন করিতে হইত। আমরা তখন জমিতে সার দিতে জানিতাম না। কিছুকাল চাষ করিবার পর জমি বন্ধ্যা হইয়া পড়িত, আর ফসল ফলিত না, আমরা বাধ্য হইয়া তখন অন্যত্র চলিয়া যাইতাম। অন্যত্র চলিয়া যাওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কারণ চাষ করিবার উপযোগী জমি সেকালে প্রায়ই অনধিকৃত থাকিত না। জমির সন্ধানে আমাদের বহুদিন ধরিয়া বহু পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অনাহারে জলাভাবে পথে অনেকে মারা পড়িত। চাষ করিতে শিখিয়া আমরা খাদ্য উৎপাদন করিতে পারিতাম, আগেকার মতো অনিশ্চিত শিকারের আশায় আমরা ছুটিয়া বেড়াইতাম না, সুতরাং আমাদের বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। আমাদের শিকার-জীবনে বংশবৃদ্ধি হইলে আমরা বিব্রত হইয়া পড়িতাম। সীমাবদ্ধ এবং অনিশ্চিত পশুমাংসে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি প্রতিপালিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। শিকারজীবনে তাই আমাদের বংশবৃদ্ধি তেমন হয় নাই। অনেক সময় সদ্যোজাত শিশুকে আমরা ফেলিয়া দিতাম। কৃষিজীবন আরম্ভ করিবার পর হইতেই শিশু আমাদের প্রিয় হইয়াছিল, তাহাদের আমরা সযত্নে লালন করিতাম, কারণ একটু বড় হইয়া তাহারা আমাদের কৃষিকর্মে সহায়তা

করিত। সুতরাং এক একটা দলে বহু বৃদ্ধ, বহু নারী, বহু শিশু থাকিত সে যুগে। এই বিরাট পরিবার লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ানো মোটেই সহজ ছিল না, তাই জমির ফসল কমিয়া গেলে আমরা ভীত হইয়া পড়িতাম। আশঙ্কা হইত দেবতা বুঝি বিরূপ হইয়াছেন। বিরূপ দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমরা পূজা করিতাম, প্রার্থনা করিতাম। কখনও দেবতা প্রসন্ন হইতেন, কখনও হইতেন না। তখন আমাদের স্থানত্যাগ করিতে হইত। কন্যা নদীর তীরে আসিয়া বসবাস করিবার পূর্বে আমরা তোলাবাহা নামক অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বাস করিতাম। তাহার নিকটে কোনও নদী ছিল না। অনেক দূরে হ্রদ ছিল একটা। জলাভাবেই আমাদের সে স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কন্যা নদীর সন্ধান দিয়াছিল মীংরা। বাসোপযোগী জমি সন্ধান করিবার জন্য কিছুদিন অন্তর আমাদের এক একটা ছোট ছোট দল বাহির হইত। আমাদের মধ্যে যাহারা ছিল সাহসী এবং বলিষ্ঠ তাহারাই হইত এইসব দলের নেতা। অজানার সন্ধানে অনিশ্চিত পথে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাহির হইয়া পড়িত তাহারা। বহুদিন পরে কেহ কেহ সুসংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিত, কেহ আবার ফিরিতও না। মীংরা কন্যা নদীর সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কন্যা নদীর তীরে আসিয়া পোঁছিতে আমাদের কতদিন যে লাগিয়াছিল তাহা গণনা করিবার মতো বুদ্ধি আমাদের তখন ছিল না, কিন্তু অনেক দিন লাগিয়াছিল। কত দিন কত রাত্রি যে আমরা হাঁটিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পথ চলিতে চলিতে বহু রমণী সন্তান প্রসব করিয়াছিল, পথেই তাহারা বড় হইয়াও উঠিয়াছিল। ধবলের তৃতীয়া পত্নী গহীনা এই সময়ই মারা যায়। একটা পর্বতের উপত্যকায় আমরা বিশ্রাম করিতেছিলাম, একটা বাঘ আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। আমাদের দলের দুইজন প্রবীণ ব্যক্তি—জম্বীরা এবং খুখনও এই সময়ই মারা যায়। পথের কষ্ট তাহারা সহ্য করিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া উপর্যুপরি কয়েকদিন জলাভাব ঘটাতে তাহারা বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। একস্থানে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া বিশ্রামের সুযোগ দিলে তাহারা হয়তো মরিত না, কিন্তু পথে সময় নষ্ট করিবার সাহস ধবলের ছিল না। বিলম্ব হইয়া গেলে অন্য কোনও দল আসিয়া কন্যা নদীর তীর দখল করিয়া ফেলিতে পারে এ সম্ভাবনাটা যে তুচ্ছ করিবার মতো নহে একথা আমরাও সকলে অনুভব করিতেছিলাম। জম্বীরা খুখনও করিতেছিল। একটা নদীর তীরে আসিয়া বসবাস করিবার সুযোগ পাওয়া একটা দুর্লভ সুযোগ ছিল সে যুগে। উন্মুখ আগ্রহে আমরা সকলেই মীংরাকে অনুসরণ করিতেছিলাম। থামিবার অবকাশ ছিল না। দুই-একটা মৃত্যু বা ছোটখাটো বাধা আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনি নাই।

আমাদের লক্ষ্য ছিল যত শীঘ্র সম্ভব কন্যা নদীর তীরে উত্তীর্ণ হওয়া। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে আমরা লক্ষ্যে পোঁছিয়াছিলাম। আমাদের

সমস্ত শ্রম যেন সার্থক হইয়া গিয়াছিল। ধবল বলিয়াছিল, "একটা নদীর তীরে যখন আশ্রয় পাইয়াছি তখন আমাদের আর কোথাও নড়িতে হইবে না। নদীতীরে জমি কখনও নিষ্ফলা হয় না শুনিয়াছি। মীংরা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কপোত সম্প্রদায়রা বাহা নদীর তীরে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। কন্যা নদীর তীরে আমরাও পুরুষানুক্রমে বাস করিব। কি বল মীংরা?" মীংরা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে কোনও উত্তর দিল না, মৃদু হাসিল মাত্র। মীংরা বহুদর্শী লোক, বহুদিন ধরিয়া বহু দেশ পর্যটন করিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার যাহা বাস্তবিক অভিজ্ঞতা তাহা সর্বসমক্ষে সেদিন সে ব্যক্ত করে নাই। যাইবার পূর্বে ধবলকে গোপনে বলিয়া গিয়াছিল। মীংরা, নীহু, রাবো, ঘংকা ইহারা আমাদের দলের পর্যটক ছিল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে আসিয়া সংবাদ দিত চাষ করিবার মতো জমি আর কোথাও আছে কি না। ইহাদের আমরা অত্যন্ত খাতির করিয়া চলিতাম, কারণ ইহারাই ছিল বহির্জগতের বার্তাবহ। আমরা সীমাবদ্ধ স্থানে চাষ লইয়া ব্যস্ত থাকিতাম, ইহারা নানা দেশ হইতে নানা খবর সংগ্রহ করিয়া আনিত। ইহারা ছিল স্বাবলম্বী সন্ন্যাসী প্রকৃতির লোক, নিজেরাই শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত, খাদ্যের জন্য আমাদের উপর নির্ভরশীল ছিল না, মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আসিত, কিছুদিন আমাদের মধ্যে বাস করিত, আবার চলিয়া যাইত। তাহাদের আগমনের জন্য মনে মনে আমরা সকলেই উন্মুখ হইয়া থাকিতাম। আজকাল গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র তোমাদের যে পিপাসা মিটায় উহারাও আমাদের সেই পিপাসা মিটাইত। অনেক নূতন সংবাদ, অনেক কল্পনার খোরাক তাহাদের মাধ্যমেই আমরা পাইতাম। তাহা ছাড়া, সর্বাপেক্ষা বড় কথা তাহারা অনধিকৃত নূতন জমির সন্ধান আনিয়া দিত। মীংরা কন্যা নদীর সংবাদ আমাদের আনিয়া দিয়াছিল বলিয়াই আমরা প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলাম। কারণ সেই অনাবৃষ্টির যুগে শিকারও সুলভ ছিল না, আমরা অনেকে শিকার করিবার দক্ষতাও হারাইয়াছিলাম।

...আমরা যখন কন্যা নদীর উভয় তীরের সমস্ত জমি দখল করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম তখন মীংরা একদিন চলিয়া গেল। যেদিন চলিয়া গেল তাহার আগের দিন রাত্রে সে আর ধবল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া কি সব পরামর্শ করিয়াছিল। গোপন পরামর্শ। আমরা কেহ কিছুই জানিতাম না। আমাদের তৃতীয় ফসল যখন আশানুরূপ হইল না, তখন আমরা ইহার আভাস পাইলাম।

প্রথম দুই বৎসর ফসল আমাদের খুব ভাল হইয়াছিল। আমরা নদীর উভয় তীরই খুঁড়িয়া বীজ বপন করিয়াছিলাম, এত ফসল ফলিয়াছিল যে, আমাদের সকলের আহারের সংস্থান হইয়াও প্রচুর উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। মাটি খুঁড়িয়া মাটির নীচে সেই উদ্বৃত্ত শস্য আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম। মাটির নীচে শস্য অতি চমৎকার থাকিত। আমাদের পর্যটক নীহু সঞ্চয়

করিবার এই কৌশলটি আমাদের শিখাইয়া দিয়াছিল। গর্তের মেঝেতে আমরা পুরু খড়ের আস্তরণ বিছাইয়া দিতাম, গর্তের দেওয়ালেও আমরা কাদা দিয়া লেপিয়া সেই কাদায় সারি সারি নলখাগড়ার নল এমনভাবে বসাইয়া দিতাম যে, শস্য মাটির সংস্পর্শে আসিতে পারিত না। সেই গর্তে শস্য জমা করিয়া তাহার উপর পুরু করিয়া শুষ্ক খড় চাপা দিয়া গর্তের মুখটা আমরা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিতাম। শস্য একটুও নষ্ট হইত না। নীহু কোথা হইতে এই বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া আমাদের শিখাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

...কন্যা নদীর তীরে প্রথম কিছুদিন আমরা অতিশয় আনন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলাম। শুধু আনন্দ নয়, নিত্য নব বিস্ময়ও আমাদের জীবনকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। উন্নগা পর্বতের সানুদেশ অরণ্যময় ছিল এবং সেই অরণ্যে আমাদের পরিচিত-অপরিচিত বহুবিধ পশুপক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এজন্য আমাদের অসুবিধাও কম ভোগ করিতে হয় নাই, বন্য গরু ছাগল মহিষের দল আসিয়া আমাদের ক্ষেত নষ্ট করিত, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা আসিয়া আমাদের তৃণশীর্ষগুলি খাইয়া ফেলিত, তাহাদের তাড়াইবার জন্য অথবা শিকার করিবার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের বহু লোককে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, কিন্তু তবু ইহাতে একটা নূতন ধরণের বিস্ময় আমরা অনুভব করিতাম। ইতিপূর্বে এতগুলি পশুপক্ষীকে এত নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই। তাহাদের যে সব সময় তাড়াইতে হইত বা শিকার করিতে হইত তাহা নয়, আমাদের ক্ষেতগুলি সু-উচ্চ বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল, সব সময়ে তাহারা আমাদের ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে যখন তাহারা বেড়া ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িত তখনই আমরা তাহাদের আক্রমণ করিতাম, মাংসের প্রয়োজনেও মাঝে মাঝে শিকার করিতে হইত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমরা তাহাদের নজরে নজরে রাখিতাম। কন্যা নদীর তীরে দেবদারু বৃক্ষ অনেক ছিল। দেবদারুশীর্ষে বসিয়া বসিয়া আমরা ইহাদের উপর লক্ষ্য রাখিতাম। তাহারাও আমাদের উপর লক্ষ্য রাখিত। বিশেষ করিয়া তাহারা, যাহারা আমাদের অন্যমনস্কতা অসাবধানতার সুযোগ লইয়া আমাদের শস্যে ভাগ বসাইত। সেকালের কয়েকটি চিত্র এখনও মনে আছে।

...উন্নগা পর্বতের উপত্যকা রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। উপত্যকা সন্নিহিত অরণ্য হইতে একদল গরু বাহির হইল। বিরাট ককুৎ ও গলকম্বল সমন্বিত একটি ষণ্ডের সমভিব্যাহারে কয়েকটি গাভী। ষণ্ডটি একবার ঘাড় তুলিয়া আমাদের ক্ষেতের দিকে চাহিল। আমাদের ক্ষেতে বালকবালিকারা সব সময়ই পাহারা দিত। সম্ভবত সে তাহাদের দেখিতে পাইল, বুঝিল এখন ওদিকে যাওয়া নিরাপদ হইবে না। দুষ্ট বালকেরা শিক্ষকের সাড়া পাইয়া যেমন পড়ায় মনোযোগ দেয় অনেকটা সেইভাবেই সে উপত্যকায় চরিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেখাদেখি গাভীরাও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উপত্যকার

চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং উপত্যকার ঘাসেই মনোনিবেশ করিল। গাভীদের সঙ্গে নানা বয়সের বাছুরও ছিল। নিতান্ত শিশু যাহারা তাহারা মাতৃস্তন্য পান করিতেছিল। মাতৃস্তন্য-পাননিরত গোবৎস ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। দেখিতে বড়ই ভাল লাগিত। পিছনের পা দুইটির মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া তাহারা স্তন্যপান করিতে করিতে মায়েদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইত। কুকুর-শাবককে স্তন্যপান করিতে দেখিয়াছি, কারণ কুকুর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের সঙ্গেই অনেক কুকুর ছিল। তাহারা কি করিয়া কবে যে আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছিল তাহা মনে নাই। গৌ প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া অথবা স্নেহের তাড়নায় কেন যে ঝাউঝাউকে পুষিয়াছিল জানি না। তাহার পর হইতেই কিন্তু কুকুর আমাদের জীবনের সঙ্গী হইয়া আছে। দেবদারু বৃক্ষের শীর্ষে বসিয়া পাননিরত গোবৎসগুলিকে দেখিয়া তাহাদেরও পুষিতে ইচ্ছা করিত। সে ইচ্ছা যে কেবল আমারই হইত তাহা নয়, অনেকেরই হইত। কিন্তু সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার সঙ্গতিও আমাদের তখন ছিল না, সাহসও ছিল না। তাহারা আমাদের খাদ্যে ভাগ বসাইত বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিরূপতাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তবু তাহাদের নিকটে পাইবার জন্য একটা লোলুপতা জাগিত, নিছক সৌন্দর্য প্রীতির জন্যই জাগিত বোধ হয়। সুন্দর ফুল তুলিয়া আমরা মাথায় পরিতাম, রঙীন পাথর এবং ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিতাম। যাহা কিছু সুন্দর তাহাকে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের জীবনকে নিত্য নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আমার মনে হয়, পরবর্তী যুগে আমরা যে গোপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম আপাতদৃষ্টিতে তাহার অন্য কারণ থাকিলেও আসল কারণের বীজ বোধ হয় আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্ন চেতনায় তখনই উপ্ত হইতেছিল। ক্রীড়াশীল গোবৎসগুলির দিকে আমরা ক্রীড়নকলুব্ধ শিশুর মতোই চাহিয়া থাকিতাম। এই আগ্রহ, এই সৌন্দর্যপ্রীতি, দুর্লভকে লাভ করিবার এই আকাঙ্ক্ষা অবশেষে আমাদের জয়ী করিয়াছে, শত্রুকেও আমরা মিত্র করিয়াছি। আর একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। মনে হয় সেদিন আমি আমার জীবনের চরমতম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। কোনও কিছু আবিষ্কার করার চেয়ে বড় আনন্দ তখন আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। সেদিন আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম তাহা এখন অতিশয় সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু তখন তাহা আমার অতিশয় অভিনব মনে হইয়াছিল। সেদিন শিকারের আশায় উন্নগা পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলাম। আমিই তখন আমাদের দলের মধ্যে সেরা শিকারী ছিলাম। গরুর মাংসে আমাদের অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল, ধবলের নূতন প্রিয়তমা নিনানির আদেশে আমি পাহাড়ী ছাগল শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। পাহাড়ী ছাগল শিকার করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। পাহাড়ী ছাগলের মতো অমন চতুর এবং পলায়নদক্ষ জানোয়ার খুব

কম দেখিয়াছি। পারতপক্ষে তাহারা সমতলভূমিতে নামিত না, পর্বতের দুর্গম স্থানেই অতিশয় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। খাড়া পাহাড় সোজা উঠিয়া গিয়াছে, তাহারও গায়ে পাহাড়ী ছাগলকে উঠিতে দেখিয়াছি। পাশাপাশি দুইটি পর্বতশৃঙ্গ, তাহার মধ্যস্থলে অতি সঙ্কীর্ণ পথ, পাহাড়ী ছাগল তাহার ভিতর অনায়াসে ঢুকিয়া পড়ে। বহুদূর হইতেই তাহারা শত্রুর আগমন টের পায় এবং টের পাইলে এমনভাবে আত্মগোপন করে যে শত্রুকে হার মানিতে হয়। অতর্কিতে তাহাদের নিকটবর্তী হইতে না পারিলে তাহাদের শিকার করা যায় না। হাওয়ায় তাহারা মানুষের গন্ধ টের পায় এবং টের পাইলে তাহাদের দলের নেত্রী (ছাগীরাই প্রায় দলের নেত্রী হয়) সামনের পাটি ঠুকিয়া সামান্য একটু শব্দ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটি অদৃশ্য হইয়া যায়। আমি পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে লক্ষ্য করিলাম উপত্যকার বাম ধারে পর্বতশৃঙ্গের ঈষৎ নিম্নে বারান্দার মতো যে স্থানটুকু বাহির হইয়া রহিয়াছে তাহার উপর দুইটি ছাগশিশু দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত। পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহারা পরস্পরকে ঢুঁ মারিতেছে। একটু পা ফসকাইয়া গেলেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু উহাদের কখনও পা ফসকাইতে দেখি নাই। ছাগশিশু দেখিয়া বুঝিলাম যে দলটিও তাহা হইলে নিকটেই কোথাও আছে। কিছুদূর গিয়াই কিন্তু থামিয়া গেলাম। হাওয়া ওই দিকেই বহিতেছিল। মনে হইল এখন আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, হয় তো ইতিমধ্যেই উহারা আমার আগমন টের পাইয়া গিয়াছে। কোথাও কিছুক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকা যাক, হাওয়া ঘুরিলে তাহার পর অগ্রসর হওয়া যাইবে। উহারাও হয়তো নামিয়া আসিতে পারে। তীব্রবেগে হাওয়া বহিতেছিল। হাওয়া এড়াইবার জন্য আমি বৃক্ষ-বেষ্টিত একটা ঘন ঝোপে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা দেখিয়া দ্রুতগতিতে প্রথমেই একটি গাছে উঠিয়া পড়িতে হইল। ঝোপের অন্তরালে একটি বন্য গরু বসিয়াছিল। কোনও বন্য জন্তুর খুব কাছে থাকা নিরাপদ নয়, এই বোধটা আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। বন্য গরুর সম্মুখীন হইবার মতো ভারী অস্ত্রও আমার কাছে ছিল না, তীর ধনুক লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। গাছে উঠিয়া দেখিলাম গরুটা চলিয়া গেল না, বসিয়াই রহিল। আমাকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, উঠিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠিল না, বসিয়া রহিল। তখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম ওটা একটা গাভী এবং তাহার পিছনের দিক হইতে কি যেন একটা বাহির হইয়া আছে। চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গেল—গাভীটি প্রসব করিতেছে। বিস্ময় ও আনন্দের একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার সমস্ত চিত্তকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। সেই বৃক্ষশাখায় চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া নীরবে রুদ্ধশ্বাসে আমি সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিলাম। মনে হইল অপরূপ একটা কিছু দেখিতেছি। মনুষ্যসন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে বহু বার দেখিয়াছি, আমাদের বৃহৎ গোষ্ঠিতে এ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে

কোন অভিনবত্ব আছে বলিয়া কখনও মনে হয় নাই। কিন্তু এই গো-জননীর প্রসব ব্যাপারটা আমাকে সেদিন বড়ই অভিভূত করিল। তাহার কারণ বোধ হয় আমাদের দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। জমি চাষ করিয়া বীজ বপন করা, বীজ অঙ্কুরিত হইলে পাহারা দেওয়া, তাহার পর শস্য পাকিলে সেগুলি ঝাড়িয়া সঞ্চয় করা এবং এই সবেরই পুনরাবৃত্তি আমাদের কৌতূহলকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিত। যদিও কন্যা নদীকে প্রসন্ন করিবার জন্য নানাবিধ নৃত্যগীত পূজা উৎসব আমাদের জীবনকে বিচিত্র করিত কিন্তু সে সবই একটা বিশেষ পদ্ধতির গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া অভিনবত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যে অপ্রত্যাশিত নূতনত্বের সংঘাতে সমস্ত সত্তা অপূর্ব পুলকে মাতিয়া ওঠে আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা সেই অজানা বিস্ময়ের জন্য মনে মনে উন্মুখ হইয়া থাকি। আজ তোমাদের কবি ও বৈজ্ঞানিকরা নিত্য নূতন সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া যে আনন্দে অভিভূত হন আমিও তখন ঠিক সেই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। সেইদিন আর একটা বিস্ময়ও আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেইদিনই আমি প্রথম শিলাঙ্গীকে দেখিয়াছিলাম। ওই সদ্যপ্রসূতা গাভীটিই শিলাঙ্গীকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। বাছুরটি তখন সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, গাভীটি চাটিয়া চাটিয়া তাহার অঙ্গ পরিষ্কার করিতেছে, এমন সময় ঠিক আমার সম্মুখের একটি বৃক্ষ হইতে এক বোঝা কচি ঘাস গাভীটির মুখের সম্মুখে পড়িল। গাভীটি এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় প্রথমটা একটু সচকিত হইয়া উঠিলেও বিশেষ বিচলিত হইল না, বরং মুখের কাছে খাদ্য পাইয়া অবিলম্বে তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। বলা বাহুল্য, আমি খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গিয়াছিল ওই কচি ঘাসের বোঝাটার দিকে চাহিয়া। ওগুলি যে আমাদেরই ক্ষেতের তৃণ-শস্য, ওগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য আমাদের সমস্ত দলটাই যে সর্বদা সজাগ হইয়া আছে। যে গরুকে আমাদের ক্ষেত হইতে দূরে রাখিবার জন্য আমরা নানাভাবে সচেষ্ট হইয়া রহিয়াছি সেই গরুর মুখেই তৃণশস্য এমনভাবে কে আনিয়া দিল! অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া সম্মুখের বৃক্ষটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর লক্ষ্য করিলাম নিকষকৃষ্ণাঙ্গী একটি কিশোরী অতি সন্তর্পণে বৃক্ষের কাণ্ড বাহিয়া নামিতেছে। নিমেষের মধ্যে নিঃশব্দে নামিয়া সে বনান্তরালে মিলাইয়া গেল। আমিও পরমুহূর্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতেই পাইলাম না। মনে হইল ঝোপের আড়ালেই সে কোথাও আছে, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সেই বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। সদ্যোজাত গো-শাবকটি আমাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিলাম তাহার মা তাহাকে চাটিয়া চাটিয়া প্রায় পরিষ্কার

করিয়া ফেলিয়াছে, সে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি মুগ্ধনেত্রে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। সহসা একটা অসমসাহসিক স্পৃহা আমাকে পাইয়া বসিল। বাছুরটাকে চুরি করিয়া লইয়া গেলে কেমন হয়! উহাকে যদি আমরা পুষি, ধবল কি খুব আপত্তি করিবে? ধবল যদি আপত্তি করে তখন না হয় ওটাকে মারিয়া আহার করিয়া ফেলিলেই চলিবে। কিন্তু এখন যদি একটা জীবন্ত বাছুর কাঁধে করিয়া হাজির হইতে পারি আমাদের দলের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে। কিন্তু কি করিয়া ধরা যায়। উহার মায়ের নিকট যাওয়া তো অসম্ভব। একটা চিল আসিয়া একটু দূরে বসিয়াছিল, গাভীটা এমন তাড়া করিয়া গেল যে সে পলাইবার পথ পাইল না। ভাবিলাম সন্ধ্যার অন্ধকার নামিলে হয় তো নিঃশব্দচরণে উহার নিকটবর্তী হইতে পারিব। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। উন্নগা পর্বতের আশেপাশে বহুরকম হিংস্র শ্বাপদ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাঘের গর্জন, এমন কি সিংহের গর্জনও মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। হায়েনার ডাক তো প্রায়ই শোনা যায়। তা ছাড়া আমাদের দলের জিজা বন্যকুক্কুরও দেখিয়াছে নাকি। বন্যকুক্কুরের মতো ভয়ানক প্রাণী আর কিছু নাই। একবার তাহাদের কবলে পড়িলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। একা আসিয়াছি, উদ্ভট খেয়ালের বশীভূত হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত হইবে কি-না ভাবিতেছিলাম, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। বাছুরটা উঠিয়া টলিতে টলিতে ঠিক আমার গাছটার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মা যদিও তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিল কিন্তু ঠিক কাছটিতে ছিল না, শিলাঙ্গী গাছের উপর হইতে তাহাকে যে ঘাসের বোঝা দিয়া গিয়াছিল সেইটিই সে তখন শেষ করিতেছিল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আমি টপ করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাছুরটিকে কাঁধে তুলিয়া লইলাম এবং মুখ দিয়া তাহার একটা পা কামড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি আবার গাছে উঠিয়া গেলাম। যতক্ষণ আমি গাছে উঠিতেছিলাম ততক্ষণ বাছুরটা আমার মুখ হইতে ঝুলিতেছিল। চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। গাছে উঠিয়া বাছুরটাকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিলাম। কিন্তু সে এত ছটফট এবং চীৎকার করিতেছিল যে তাহাকে সামলানো শক্ত হইয়া উঠিল। তাহার মা-ও গাছের নীচে ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং উর্ধ্বমুখ হইয়া হাম্বারব করিতেছিল। বাছুরটাকে এক হাতে আঁকড়াইয়া বুকের কাছে ধরিয়াছিলাম, আর এক হাত দিয়া ধরিয়াছিলাম একটা গাছের ডাল। ভয় হইতেছিল যদি গাছের ডালটা ভাঙিয়া যায় তাহা হইলে নীচে পড়িয়া যাইব এবং নীচে পড়িয়া গেলেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। বাছুরটাকে ফেলিয়া দিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত, কিন্তু বাছুরটাকে কিছুতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না, আসন্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে আমি তাহাকে আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিলাম। সহসা লক্ষ্য করিলাম কোথা হইতে

ধোঁয়া আসিতেছে, এখানে আগুন জ্বালাইল কে? কাছে পিঠে তো কোনও মানুষ আছে বলিয়া জানা নাই। পরমুহূর্তেই সেই কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরীর কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা আশঙ্কাও ঘনাইয়া আসিল মনের ভিতর। উন্নগা পর্বত যদি মনুষ্য অধ্যুষিত হয় তাহা হইলে চিন্তার কথা। যে কোনও দিন অতর্কিতে তাহারা আসিয়া হানা দিতে পারে। ফিরিয়া গিয়াই ধবলকে কথাটা বলিতে হইবে। আমার চিন্তাধারা আর অগ্রসর হইবার অবসর পাইল না, কারণ পরমুহূর্তেই একটা বর্শা আসিয়া আমার মাথার ঠিক উপরের ডালটাতে বিঁধিল, একটুর জন্য আমার মাথাটা বাঁচিয়া গেল। কাহারও বর্শার লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া থাকা নিরাপদ নহে মনে করিয়া যে-ই স্থানপরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিলাম অমনি বাছুরটা আমার কোল হইতে নীচে পড়িয়া গেল। বড়ই দুঃখ হইল, কিন্তু একটা গো-শাবকের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করা চলে না। গাছের আরও উপরে উঠিয়া ঘনপত্রপল্লবাচ্ছন্ন একটা স্থানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। অনেকক্ষণ আর কোনও কিছু ঘটিল না। সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া দেখিলাম বাছুরটার কি হইল। কিছুই হয় নাই, দেখিলাম তাহার মা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিয়া দিতেছে। সে দিব্য মায়ের আশেপাশে ঘুরিতেছে, মাঝে মাঝে লাফাইবার চেষ্টাও করিতেছে। তাহাদের দিকে কিন্তু ভাল করিয়া আর মন দিতে পারিতেছিলাম না। বর্শাটা শুধু যে গাছের ডালেই বিঁধিয়াছিল তাহা নয়, আমার মনেও বিঁধিয়াছিল। বর্শাটা কে নিক্ষেপ করিল না জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। আস্তে আস্তে আবার উপর হইতে নীচে নামিলাম এবং বর্শাটা বৃক্ষশাখা হইতে খুলিয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। চমৎকার পালিশ করা পাথরের বর্শা, খুব বড় নয়, কিন্তু বেশ তীক্ষ্ন। সে যুগে আমরা সকলেই পালিশ করা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতাম, কিন্তু এমন চমৎকার পালিশ করা অস্ত্র আমাদের ছিল না। আমি সবিস্ময়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অস্ত্রটিকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এমন একটা চমৎকার অস্ত্র হস্তগত হওয়াতে অতিশয় পুলকিতও হইয়াছিলাম। একবার ইচ্ছা হইল এই অস্ত্রের দ্বারাই গাভীটাকে হত্যা করিয়া গো-শাবকটিকে হরণ করি। গাভীর কপালের ঠিক মধ্যস্থলে যদি এই বর্শা বিদ্ধ করিতে পারি তাহা হইলে তাহাকে আর উঠিতে হইবে না। আর একবার উঁকি দিয়া দেখিলাম তাহারা কোথায় কিভাবে আছে। এবার কিন্তু তাহাদের আর দেখিতে পাইলাম না। আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া দেখিলাম, তাহারা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। সেই বৃক্ষবেষ্টিত ঝোপের বাহিরে বেশ খানিকটা বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের মতো স্থান ছিল। দেখিলাম, তাহারা সেই মাঠের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। মাঠের অপর পারে একদল গরু চরিতেছে। সেইদিকেই তাহারা চলিয়াছে। একটা জীবন্ত গো-শাবক লইয়া গিয়া আমাদের দলের মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিব আশা করিয়াছিলাম তাহা বিসর্জন দিতে হইল। নামিতে যাইব এমন সময় দেখি নীচের একটা ডালে সেই কৃষ্ণ কিশোরীটি

আমার দিকে নির্ণিমেষে তাকাইয়া বসিয়া আছে। তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, চোখের পলক পড়িতেছে না। আমিও নির্ণিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। অমন নিখুঁত চোখমুখের গড়ন ইতিপূর্বে দেখি নাই। তাহা এতই অপূর্ব যে সহসা আমি ভয় পাইয়া গেলাম। মনে হইল মানুষ নয়, কোনও দেবতা, বা অপদেবতা। অপদেবতার ভয়টাই আমাদের বেশি ছিল সে যুগে। উন্নগা পর্বতে যে একাধিক অপদেবতা নিশ্চয়ই আছে এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হইয়াছিল। একদিন ধবলের বৃদ্ধা জননী শার্নাগিজাকি বলিতেছিল উড্ডীয়মান শকুনদের ভাবগতিক দেখিয়া তাহার মনে হয় যে, উন্নগা পর্বতে প্রেতিনীরা বাস করে। আমাদের দলের আর একজন শিকারী রুতারু একদিন স্বচক্ষে নাকি একটা মায়ামৃগও দেখিয়াছিল। রুতারু মৃগটিকে অনুসরণ করিতেছিল, কিছুদূর যাইবার পর মৃগটি তাহার চোখের সামনেই নাকি অদৃশ্য হইয়া গেল, পরমুহূর্তে রুতারু দেখিতে পাইল, অদূর-বর্তী ঝোপটা নড়িতেছে। রুতারু ভাবিল হরিণটাই হয় তো সেই ঝোপে ঢুকিয়াছে, ছুটিয়া সেখানে গেল কিন্তু হরিণ দেখিতে পাইল না, দেখিল বৃহচ্চক্ষু একটা বিরাট পেচক বসিয়া আছে। রুতারুর দৃঢ় ধারণা মৃগটাই পেচকে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। শিলাঙ্গীকে দেখিয়া আমিও তাই প্রথমটা ভীত হইয়াছিলাম। আরও ঘাবড়াইয়া গেলাম যখন সে কোনও কথা না বলিয়া আমার দিকে হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া দিল।

"কে তুমি, কি চাও?"

আমার মুখ দিয়া কথাগুলি বাহির হইয়া পড়িল। অনেকটা ধমকের মতো শুনাইল। কথাগুলি বলিয়া আমি আরও ভয় পাইয়া গেলাম, যদি প্রেতিনীই হয়, ধমক সহ্য করিবে না, হয়তো—।

"আমার বর্শা ফিরাইয়া দাও।"

শুনিয়া তাক লাগিয়া গেল! এ যে আমাদের ভাষায় কথা কহিতেছে!

"কে তুমি?"

"আমি শঙ্খীর কন্যা শিলাঙ্গী।"

"কোথায় থাক তুমি?"

"উন্নগা পর্বতের অপর পারে। আমার বর্শা দাও—"

"তুমি বর্শা ছুঁড়িয়াছিলে কেন?"

"তোমাকে আঘাত করিবার জন্য।"

"আমার অপরাধ?"

"তুমি আমার বাছুর চুরি করিয়াছিলে।"

"তোমার বাছুর? বাছুরটিকে তো আমি ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিলাম। তোমার হইল কখন?"

"উহার জন্মের পূর্ব হইতেই। ও যখন মায়ের পেটে আসে নাই, তখন হইতে! উহার মা যে আমার—"

"পুষিয়াছ?"

"না। উহাকে আমি অনেকদিন হইতেই পছন্দ করিয়াছি। সেইজন্য আমাদের দলের কেহ উহাকে কিছু বলে না। উহার নাম কি জান? দুধুনী। উহার বাছুরের নাম রাখিব মধুনী। আমার বর্শাটা দাও, আমি চলিয়া যাই।"

"তোমরা কাহার দল? দলপতির নাম কি?"

"রোহা।"

"তোমার কে হয়?"

"বাবা।"

"তোমরা কি চাষ কর?"

"না। আমরা গরু পালন করি। আমাদের গরুর দল এখন উলঙ্গ পাহাড়ে আসিয়াছে, তাই আমরাও এখানে আসিয়াছি।"

"পালন কর, মানে? পোষ না অথচ পালন কর কিরূপে?"

"আমরা একদল গরুকে আগলাইয়া বেড়াই। কোন গাভীর যখন বাছুর হয়, তখন ফাঁস লাগাইয়া সেই গাভীটিকে আমরা ধরি, ধরিয়া তাহার দুধ খাই। দুধুনীকে কিন্তু কেহ ধরিবে না বলিয়াছে।"

"দুধ খাও!"

খবরটা শুনিয়া সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। খাদ্য হিসাবে বহু প্রকার জিনিসের ব্যবহার আমরা নিজেরা করিতাম, অপরকেও করিতে শুনিয়াছি। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে আহার করে, এ সংবাদও বিস্ময়কর ছিল না। কিন্তু মানুষ গরুর দুধ খাইতেছে, এ সংবাদ ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া শিলাঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"আমার বর্শাটা দাও!"

"তোমরা গরুর দুধ খাও কি করিয়া? গাভীর বাঁটে মুখ লাগাও নাকি! তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব?"

শিলাঙ্গী হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

"বল না, কি করিয়া দুধ খাও তোমরা?"

"নিজেই আসিয়া দেখিয়া যাও।"

পরমুহূর্তেই তাহার চোখে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। বলিল, "না, আসিবার দরকার নাই। আমাদের দলের ঝোন্‌ঝিরা বড় ভয়ানক লোক। বাহিরের কাহাকেও সে সহ্য করিতে পারে না। একবার একজন বিদেশী আমাদের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছিল, ঝোন্‌ঝিরা বর্শার এক আঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলে। তাহার যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। তোমার যাইবার দরকার নাই। আমার বর্শাটা দাও, আমি চলিয়া যাই এবার।"

আমার আত্মসম্মান আহত হইয়াছিল। মনস্থ করিলাম, ঝোন্‌ঝিরা যত ভয়ানক লোকই হোক না কেন, শিলাঙ্গীদের আস্তানাটা একবার দেখিয়া

আসিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ঝোন্‌ঝিরার সম্মুখীনও হইব। তখন কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিলাম না। কেবল বলিলাম, "আমাকে আগে বল, কি করিয়া তোমরা দুধ খাও? আমার তো কিছুতেই মাথায় ঢুকিতেছে না।"

"তুমি বোকা তাই ঢুকিতেছে না। গরুর পা চারিটি খুঁটিতে ভাল করিয়া বাঁধিয়া তাহার পর বাঁট হইতে টানিয়া টানিয়া আমরা দুধ বাহির করি।"

"দুধ মাটিতে পড়িয়া যায় না?"

"মাটিতে পড়িবে কেন? বাঁশ কাটিয়া জীবা যে চমৎকার কেঁড়ে প্রস্তুত করে। তাহাই একজন ধরিয়া থাকে, দুধ তাহাতেই পড়ে।"

রূপকথা শুনিয়া তোমরা যে আনন্দ পাও, আমি তখন সেই আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। আমরা তখনও পাত্র প্রস্তুত করিতে শিখি নাই। ঘাংকো অনেকদিন পরে সহসা একদিন আসিয়া আমাদের শিখাইয়া দিয়াছিল কি করিয়া মাটি হইতে পাত্র প্রস্তুত করিতে হয়। সে সঙ্গে করিয়া একটা লাউ এবং কিছু লাউয়ের বীজও আনিয়াছিল। মাটি হইতে পাত্র প্রস্তুত করিতে হইলে লাউয়ের খোলার প্রয়োজন। এইজন্যই কিছুদিন পরে আমাদের লাউ চাষও করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বাঁশ কাটিয়া যে দুধের কেঁড়ে প্রস্তুত হইতে পারে, একথা শিলাঙ্গীর মুখেই প্রথম শুনিলাম এবং শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। একটা অপূর্ব পুলকও আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বাঁশ ইতিপূর্বে আমিও বহুবার দেখিয়াছি, বাঁশ দিয়া বেড়া প্রস্তুত করিয়াছি, ঘরের চাল বানাইয়াছি, কিন্তু বাঁশের যে এ-সম্ভাবনা ছিল, তাহা কোন দিন ভাবি নাই। মনে হইল, সত্যই তো, একটা গ্রন্থির সহায়তা লইলেই তো চমৎকার একটি পাত্র হয়। এই সহজ সত্যটি যাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, গাভীর বাঁট হইতে দুগ্ধ আহরণ করিয়া যাহারা পান করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য লোক। তাহাদের সহিত যেমন করিয়া হোক আলাপ করিতে হইবে। কোনও অজানা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়াই তখন নিয়ম ছিল, তাহারা যে মিত্রভাবাপন্ন, ইহার নিঃসংশয় প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে শত্রুই মনে করিতে হইবে, এই নীতি পালন করিয়াই আমরা চলিতাম, কিন্তু এই অজানা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ না হইয়া পারিলাম না। সেকালে শ্রদ্ধার সহিত ভয়ও জড়িত হইয়া থাকিত। শিলাঙ্গীর মুখের দিকে আমি সভয় সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। কোন্ সূত্রে ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা সম্ভব, মনে মনে তাহাও চিন্তা করিতেছিলাম, সহসা একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

"এইবার আমার বর্শাটা দাও—"

শিলাঙ্গী উঠিয়া আসিয়া বর্শাটা ধরিয়া টান দিল।

"দিতেছি। আমার আর একটি কথার জবাব দাও। গাছের উপর হইতে ওই গাভীটির মুখের সামনে ঘাসের বোঝা কে ফেলিয়াছিল? তুমি কি?"

"হাঁ, আমিই।"

"ওই ঘাস কোথা হইতে পাইলে? ও-ঘাস তো পাহাড়ে কোথাও হয় না।"

"কেন, তোমাদের ক্ষেতেই তো প্রচুর হয়।"

"আমাদের ক্ষেত হইতে আনিয়াছ?"

শিলাঙ্গী মুচকি হাসিয়া মাথা নাড়িল।

"কি করিয়া আনিলে, আমাদের ক্ষেতে তো সর্বদা পাহারা থাকে।"

শিলাঙ্গী স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ওটা তোমার ভুল ধারণা। সর্বদা পাহারা থাকে না। গভীর রাত্রে সকলেই তোমরা ঘুমাইয়া পড়।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"আমি যে রোজ যাই।"

"রোজ যাও! বল কি!"

শিলাঙ্গীর চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কোনও উত্তর দিল না।

"রোজ যাও? কোন্ পথ দিয়া যাও? বেড়া ডিঙাইয়া?"

এবারও শিলাঙ্গী কোনও উত্তর দিল না। তাহার হাস্য-দীপ্ত চক্ষু দুইটি কেবল জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। পরমুহূর্তেই সে যাহা করিল, তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ফস্ করিয়া আমার হাত হইতে বর্শাটা কাড়িয়া লইয়া তরতর করিয়া সে গাছ হইতে নামিয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুসরণ করিলাম। এবারও কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। আশ্চর্যভাবে সে যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঝোপের চতুর্দিকেই উন্মুক্ত উপত্যকা, লুকাইয়া থাকিবার মতো কোন আড়াল ছিল না, অল্প সময়ের মধ্যে অত বড় প্রান্তর ছুটিয়া পার হওয়াও সম্ভব নয়। গেল কোথায়? চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। সহসা সেই ধোঁয়াটা আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঝোপের মধ্যে পুনরায় ঢুকিয়া দেখিলাম, শুষ্ক খড়ের বাণ্ডিলটা তখনও জ্বলিতেছে। পূর্বে তো এটা এখানে ছিল না, শিলাঙ্গীই নিশ্চয় আনিয়াছে। চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম, কিছু দূরে দূরে দগ্ধ খড়ের অঙ্গার ও ভস্ম পড়িয়া রহিয়াছে। সেইগুলিকে অনুসরণ করিয়া অবশেষে একটি গর্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গর্তের মুখটি পাথর দিয়া ঘেরা। দূর হইতে সহসা বুঝিতে পারা যায় না যে এই স্থানে একটা গর্ত আছে, মনে হয়, ছোট-বড় কতকগুলি পাথর বুঝি স্বাভাবিকভাবেই স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। সন্দেহ রহিল না যে, শিলাঙ্গী এই পথেই অন্তর্ধান করিয়াছে। নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। দেখিতে পাইলাম, গরুর দল চরিতে চরিতে আরও দূরে চলিয়া গিয়াছে। মনে হইল, দক্ষিণ দিকে পর্বতের সানুদেশে কয়েকটি ছাগলও নামিয়া আসিয়াছে। ধবলের প্রিয়তমা পত্নী নিনানির আবদার-মাখা আদেশ মনে পড়িল। নিনানি কখনও রূঢ়ভাবে আদেশ করিত না; তাহার আদেশ অনুরোধের মতো শুনাইত। "দেখ্ না বাপু, একটা ছাগল যদি

পাও, গরুর মাংস আর ভাল লাগে না।"—তাহার এই কথাগুলির সঙ্গে নয়নের দৃষ্টি ও অধরের ভঙ্গিমা মিলিয়া যাহা হইত, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা আর যাহারই থাক আমার ছিল না। নিনানি ধবলের প্রিয়তমা পত্নী ছিল বটে, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসিত। আমিও তাহার জন্য বহু অসাধ্য সাধন করিতাম। কন্যা নদীর অভিমুখে যখন আমরা আসিতেছিলাম, তখন মাঝে মাঝে নিনানি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল যে, তাহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া না আনিলে ফেলিয়া আসিতে হইত। মীংরা, ঘিসু এবং আমি—আমরা তিনজনই তাহাকে বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। নিনানি কিন্তু আমার স্কন্ধেই উঠিয়াছিল, যেন কৃপাপরবশ হইয়াই উঠিয়াছিল। ধবল নিনানিকে পত্নীরূপে দাবি করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে পাই নাই (দলপতির দাবি অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না) কিন্তু সে যে আমাকেই চায়, তাহার অজস্র প্রমাণ দিতে সে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। ছাগলগুলির দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব নাকি যদি একটাকেও অন্তত মারিতে পারা যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা অদ্ভুত যুক্তি আমাকে নিরস্ত করিল। ভাবিলাম, এই অপরিচিতা মেয়েটির সংবাদ যতটা পারি সংগ্রহ করিয়া না লইয়া গেলে দলপতি ধবলের নিকট আমি অপরাধী হইব। বিশেষত ইহারা যখন আমাদের ক্ষেত হইতে ফসল চুরি করিয়া লইয়া যায়, তখন ইহাদের সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তখন এইরূপ ভাবিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন ইহা অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, শিলাঙ্গী যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে আমার কর্তব্যবোধ আমাকে ওই গর্তে প্রবেশ করিতে প্ররোচনা দিত না। আমি বড় জোর সংবাদটা ধবলের কর্ণগোচর করিয়া দিয়া তাহার নির্দেশের অপেক্ষা করিতাম। সে যুগেও আমরা মোহের কবলে পড়িয়া মনকে চোখ ঠারিতে শিখিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাই নিনানির অনুরোধের মূল্যটা আমার নিকট কমিয়া গিয়াছিল।

...গর্তের ভিতর অবতরণ করিলাম। গর্তের মুখটা বেশ বড় ছিল, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই দেখিলাম তাহা ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সর্পের মতো বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, আমার ধনুক লইয়া তাহা অসম্ভব। ফিরিয়া আসিলাম। যে বৃক্ষগুলি সেই ঝোপটিকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহারই একটাতে আরোহণ করিয়া আমার তীরগুলি ও ধনুকটি লুকাইয়া রাখিলাম। একটা লতা দিয়া একটা গাছের ডালে বেশ দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দিলাম সেগুলিকে। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া গর্তে প্রবেশ করিলাম। খেয়াল হইল না যে সন্ধ্যা আসন্ন, সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। গর্তের ভিতর কতক্ষণ যে বুকে হাঁটিয়াছিলাম, তাহা জানি না, ঘণ্টা মিনিটের কোন আন্দাজই ছিল না তখন আমাদের। আকাশ দেখিয়া সময় নির্ণয় করিতাম, কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে সে সুযোগও ছিল না। তবে বহুক্ষণ যে লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, শ্বাসকষ্ট হইতেছিল। সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে যখন উপস্থিত হইলাম কোনও আলো দেখিতে পাইলাম না, কারণ রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছিল। অসংখ্য ঝিল্লী-ধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম সুড়ঙ্গপথ শেষ হইয়াছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়াও আমাকে সে-কথা জানাইয়া দিল। তাহার পর সহসা মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। কে যেন আমাদের ভাষাতেই কথা বলিতেছে। আবার মনে বিস্ময় জাগিল। ইহারা আমাদের ভাষা জানিল কি করিয়া! ইহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক কি ছিল কখনও? স্মরণ করিতে পারিলাম না। এখন যে শক্তির বলে আমি জন্ম-জন্মান্তরের ঘটনা বিবৃত করিয়া চলিয়াছি তখন সে শক্তি থাকিলে যাহা শুনিলাম তাহাতেই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইতাম। কিন্তু তখন সে শক্তি ছিল না। জন্মান্তরে যে কাংড়ার দলে আমি নিজেই একদিন ছিলাম, বারংবার সেই কাংড়ার নাম শুনিয়াও আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, আমরা এবং ইহারা একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা মাত্র। সেইজন্যই আমাদের ভাষা এক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আমরা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছি, ভাষা বিশেষ বদলায় নাই।

...সুড়ঙ্গ মুখে উৎকর্ণ হইয়া শুইয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, কে যেন রূপকথা বলিতেছে, অনেকে বসিয়া শুনিতেছে। যদিও আমি কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু একটা অস্ফুট কলরব হইতে বোধ হইতেছিল যে, কোনও কথক একদল লোকের সম্মুখে কথকতা করিতেছে।

কথক বলিতেছিল, "সাকুণ্ডা অরণ্যের প্রান্তে একটি পাথর আছে অবিকল গাভীর মত দেখিতে। আমাদের পূর্বপুরুষ কাংড়া সেই প্রস্তর-গাভীর পঞ্জর ভেদ করিয়া পাতাল হইতে উঠিয়াছিল। তাহার হস্তে ছিল শ্যামল তৃণ-গুচ্ছ"...কথক এইবার গান গাহিয়া উঠিল। "কাংড়ার হাতে ছিল শ্যামল তৃণগুচ্ছ। যে গাভী তাহাকে প্রসব করিয়াছিল, সেই গাভীর প্রাণই ছিল তাহার হস্তে শ্যামল তৃণগুচ্ছের রূপ ধরিয়া। যে শ্যামল তৃণগুচ্ছ গাভীর স্তনে শুভ্র দুগ্ধে রূপান্তরিত হয়, সেই শ্যামল তৃণগুচ্ছ ছিল কাংড়ার হস্তে। যে হস্তে কাংড়া পরে দলপতির নিষ্ঠুর দণ্ড ধারণ করিবে, সেই হস্তে সে তখন ধরিয়া-ছিল শ্যামল তৃণগুচ্ছ। যে শ্যামল তৃণগুচ্ছের সন্ধানে সমস্ত দলকে একদা ব্যাপৃত হইতে হইবে, সেই শ্যামল তৃণগুচ্ছ ছিল কাংড়ার হস্তে"... এই একই কথা নানাভাবে সুর করিয়া কথক বারম্বার আবৃত্তি করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিলাম, তাহার সহিত আরও অনেকে যোগ দিয়া তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছে। অবিশ্রান্ত ঝিল্লী-ধ্বনির সহিত মিশিয়া সমবেত কণ্ঠের সুরলহরী অন্ধকার পর্বতের সানুদেশে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করিল। কিছুক্ষণ পরে গান থামিয়া গেল। কথক আবার বলিতে লাগিল, "সেই প্রস্তর-গাভীর ঠিক পাশেই ছিল একটি গর্ত। সেই গর্ত হইতে বাহির হইল একটি জীবন্ত গাভী এবং তাহার পিছু পিছু একটি গো-শাবক। গাভীটি ছিল ঘটোধ্নী

তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। কাংড়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমি তোমার জন্য ঘাস আনিয়াছি, তুমি আমাকে তোমার দুধ দাও। গাভী বলিল, "ঘাস তোমার নয়, ঘাস ভূমির। ভূমি হইতে তুমিও যেমন ছিঁড়িয়া আনিয়াছ, আমিও তেমনি ছিঁড়িয়া লইতে পারি। কেবল ঘাসের জন্য তোমাকে দুধ দিব না, যে দুধ আমার বাছুরের জন্য সে দুধ আমি তোমাকে ঘাসের বদলে দিব না।" কথকের এই কথা শেষ হইতে না হইতে সমবেত নারীরা গান গাহিয়া উঠিল, "দুধ দিব না, বাছুরের জন্য যে দুধ রাখিয়াছি তাহা দিব না, তাহা দিব না।" এক কলি গাহিয়াই তাহারা থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত একও কিছু বলিল না। ঝিল্লীর ঐক্য-ঝঙ্কারটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল সহসা। মনে হইল তাহারাও এ বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য যেন বলিতেছে। একটু পরে কথক পুনরায় আরম্ভ করিল তাহার কথকতা। কাংড়া উত্তর দিল, "আমি তোমার দুধ লইবই। ঘাসের বদলে তাহা যদি না দিতে চাও, কিসের বদলে দিবে বল। দুধ আমার চাই। তোমার শাবককে আমি বঞ্চিত করিব না, তোমার বিশাল স্তনে এত দুধ আছে, তোমার শাবককে দিয়াও অনেক উদ্বৃত্ত থাকিবে। তোমার সেই উদ্বৃত্ত দুধ আমি চাই। কিসের বদলে দিবে বল।" গাভী উত্তর দিল, "তোমার শক্তির বদলে। আমাকে যদি জয় করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার আহরিত তৃণ আমি ভোজন করিব।"

আবার কথক গান গাহিয়া উঠিল, "আমাকে জয় কর। তোমার শক্তির পরিচয় দিয়া আমাকে নতি স্বীকার করাও, আমাকে জয় কর। তোমার শক্তির বন্ধনে আমাকে বাঁধ, তোমার শক্তির আকর্ষণেই আমার স্তন হইতে দুগ্ধ দোহন কর, আমাকে জয় কর, হে কাংড়া, শক্তির পরিচয় দাও, আমাকে জয় কর।" এবারও কথকের সহিত শ্রোতারা গাহিতে লাগিল। এবার কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, একবার পুরুষরা একবার মেয়েরা গাহিতেছে। সঙ্গীতের সহিত মধ্যে মধ্যে হুড়াহুড়ি এবং কলহাস্য-ধ্বনিও শুনা যাইতেছে। সন্তর্পণে মাথা আর একটু তুলিয়া দেখিলাম শুধু গান নয়, গানের সহিত অভিনয়ও যুক্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুরুষদের দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া যখন গান গাহিতেছে 'আমাকে জয় কর, আমাকে জয় কর'— তখন পুরুষদের মধ্যে দুই-চারিজন উঠিয়া তাহাদের জয় করিবার জন্যই সচেষ্ট হইতেছে। কলহাস্য-ধ্বনি এবং হুড়াহুড়ি ইহারই ফল। আবার পুরুষরা যখন উঠিয়া মেয়েদের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া গাহিতেছে—'আমাদের জয় কর, আমাদের জয় কর' —তখন মেয়েরাও তাহাদের আক্রমণ করিতে ছাড়িতেছে না। সমস্ত সভায় একটা আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে। আমার সর্বাঙ্গও অবর্ণনীয় পুলকে বারম্বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিয়া গান ও অভিনয় থামিয়া গেল। কথক তাহার গল্প আরম্ভ করিল আবার।

কাংড়া বলিল, "তুমি যাহা দাবি করিয়াছ, তাহা পাইবে। আমি যাহা দাবি করিয়াছি, তাহাও আমি অর্জন করিব।" কাংড়া গাভীর দিকে অগ্রসর

হইল, গাভী ঊর্ধ্বপুচ্ছে পলাইতে লাগিল। গো-শাবকটি কিন্তু কিছুদূর ছুটিয়া আর ছুটিতে পারিল না। কাংড়া তখন তাহাকে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইল। গো-শাবককে স্কন্ধে লইয়াও পূর্ববৎ বেগে ছুটিতে লাগিল সে। গাভীটি পিছন ফিরিয়া দেখিল যে, তাহার বৎসটি কাংড়ার বলিষ্ঠ স্কন্ধের উপর নিরাপদে রহিয়াছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। নিশ্চিন্ত হওয়াতে তাহার গতি-বেগ আরও বাড়িয়া গেল যেন। কাংড়াও তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিল। কত দিন তাহারা যে ছুটিয়াছিল, তাহার হিসাব রাখিয়াছিল আকাশের সূর্য, চন্দ্র, আর নক্ষত্রেরা। দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন একে একে আসিল এবং চলিয়া গেল। ক্লান্তির পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর উদ্যম আসিল এবং চলিয়া গেল। আশার পর নিরাশা এবং নিরাশার পর নূতন আশা আসিল এবং চলিয়া গেল। অবশেষে তাহারা যে স্থানে উপস্থিত হইল, সে স্থানের চতুর্দিক পর্বত-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশের একটি মাত্র সংকীর্ণ পথ ছিল, সেই পথ দিয়া তাহারা এক পর্বত-পরিবৃত উপত্যকায় প্রবেশ করিল। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাংড়া নিমেষের মধ্যে বুঝিতে পারিল আর ছুটিতে হইবে না। গো-বৎসটিকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া কাংড়া ছুটিয়া একটি পর্বতের উপর উঠিয়া গেল এবং সেখান হইতে বিশাল একটি প্রস্তরখণ্ড ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া সেই সংকীর্ণ প্রবেশপথটি অবরুদ্ধ করিয়া দিল। গাভী বন্দিনী হইল।”

কথক গান শুরু করিল আবার।

“গাভী বন্দিনী হইল। যে পর্বত-দেবতা চিরকাল মানুষের সহায়তা করিয়াছেন, তিনিই কাংড়ার সহায় হইলেন। দুরারোহ দুর্গম হইয়া তিনিই গাভীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। নির্গমনের একমাত্র পথটি বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তরখণ্ডও তিনি দিলেন। সেই পথটি বন্ধ করিবার বুদ্ধিও তিনি জাগাইয়া দিলেন কাংড়ার মস্তিষ্কে। কাংড়ার দুর্দম অধ্যবসায়ে প্রীত হইয়া স্বয়ং পর্বত-দেবতা তাহাকে সাহায্য করিলেন। গাভী বন্দিনী হইল।”

কথক গান থামাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল কিছুক্ষণ। শ্রোতারাও নির্বাক হইয়া রহিল। প্রকট হইয়া উঠিল কেবল ঝিল্লী-ধ্বনি। সেই ঝিল্লী-ধ্বনি ভেদ করিয়া একটা হাম্বারব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল সহসা। কথক সঙ্গে সঙ্গে কথকতা শুরু করিল।

“গাভী বন্দিনী হইল বটে, কিন্তু সহজে ধরা দিল না। কাংড়া ধরিতে গেলেই ছুটিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। সাত দিন সাত রাত্রি অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি করিয়াও কাংড়া গাভীর নাগাল পাইল না। গাভী যখন ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে, কাংড়াকেও তখন বসিয়া পড়িতে হয়। কাংড়া দেখিল এভাবে গাভীকে জয় করা যাইবে না। একাধিক লোক থাকিলে হয় তো যাইত, কিন্তু একা সম্ভব নয়। কাংড়া তখন একটা বুদ্ধি বাহির করিল। গাভীকে দেখাইয়া দেখাইয়া সে তাহার শাবককে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহার মানে প্রহারের

অভিনয়। বস্তুত শাবকের কোনরূপ আঘাতই লাগে নাই। সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবে প্রহার করিয়া কাংড়া অবশেষে শাবকটিকে জড়াইয়া একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া ঘুমের ভান করিতে লাগিল। যাহা প্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। গভীর রাত্রে গাভীটি চুপি চুপি কাংড়ার কাছে আসিয়া শাবকটিকে শুঁকিয়া শুঁকিয়া দেখিতে লাগিল, যে সত্যই সে বাঁচিয়া আছে কি না। কাংড়া ঘুমায় নাই। গাভীটি নিকটে আসিতেই সে একলম্ফে তাহার স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া বসিল এবং শিং দুইটি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। কাংড়াকে কাঁধে করিয়াই গাভীটি পরমুহূর্তেই ছুট দিল। লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কাঁধ ঝাড়া দিয়া নানাভাবে সে চেষ্টাও করিল কাংড়াকে ফেলিয়া দিতে। কিন্তু পারিল না। কাংড়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার শিং দুইটি ধরিয়াছিল। অনেকক্ষণ এইভাবে ছুটিয়া গাভী অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। কাংড়া সবলে তখন তাহার শিং দুইটি ধরিয়া পিছন দিকে টান দিতেই গাভীর মুণ্ডটি পৃষ্ঠের দিকে নীত হইল। তাহার চোখে চোখ রাখিয়া কাংড়া তখন প্রশ্ন করিল, 'বল, এইবার তোমাকে জয় করিয়াছি কিনা।' গাভী উত্তর দিল, 'করিয়াছ। আমি তোমার নিকট হার মানিলাম।' কাংড়া বলিল, 'এইবার তবে আমাকে দুধ দাও। বলিয়া দাও কি করিয়া আমি তোমার দুগ্ধ পান করিব। তোমার শাবক যেভাবে দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, সেইভাবেই করিব কি?' গাভী বলিল, 'কর। কিন্তু তাহার পূর্বে আমাকে শাবকের কাছে লইয়া চল। কারণ শাবকের ওষ্ঠ-স্পর্শ ব্যতি-রেকে আমার স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হইবে না। আমার স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে। শাবক পান করিতে আরম্ভ করিলে আবার স্তনে দুগ্ধ আসিবে। আমাকে শাবকের নিকট লইয়া চল।' কাংড়া গাভীকে শাবকের নিকট লইয়া গেল। শাবক আর শাবক ছিল না, তথাপি সে জননীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিল। দশ দিন দশ রাত্রি স্তন্যপান করিবার পর গাভীর স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হইল। কাংড়াকে সম্বোধন করিয়া গাভী তখন বলিল, 'হে কাংড়া, এইবার তুমি আমার দুগ্ধ পান কর।' গো-শাবকের ন্যায়ই কাংড়া প্রথমে গাভীর দুগ্ধ পান করিয়াছিল। দুগ্ধ পান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তৃপ্ত হইলাম। আজ হইতে আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব, তোমার খাদ্য সংগ্রহের ভার লইব, পরিবর্তে তুমি আমাকে দুগ্ধ দিও।' গাভী উত্তর দিয়াছিল, 'দিব। কিন্তু আমাকে একেবারে বন্দিনী করিও না, আমাকে বনে বনে বিচরণ করিবার অধিকার দিও। আমি তোমারই অধীনে থাকিব, কিন্তু একেবারে আমার স্বাধীনতা হরণ করিও না। আমাকে যখন চাহিবে ফাঁদ পাতিও, আমি আসিয়া ধরা দিব। যখন আমার দুগ্ধ চাহিবে আমার পদ-চতুষ্টয়কে খুঁটিতে বাঁধিয়া দিও, আমি দুগ্ধ দিব। হে কাংড়া, আমি হার মানিয়াছি, কিন্তু আমার স্বাধীনতা একেবারে হরণ করিও না।' কাংড়া বলিল, 'বেশ তাহাই হইবে। তোমার যথেচ্ছ ভ্রমণের স্বাধীনতা আমি হরণ করিব না, কিন্তু আমার দুগ্ধপানের স্বাধীনতাও তুমি হরণ করিও না। হে গাভী,

শিকারের পিছনে পিছনে ছুটিয়া আমি আর খাদ্য সংগ্রহ করিতে চাহি না, তুমি দুগ্ধ দান করিয়া আমার খাদ্য-সমস্যার সমাধান কর। হে গাভী, আমাকে দুগ্ধ দাও—"

কথক গান আরম্ভ করিল।

"হে গাভী, আমাকে দুগ্ধ দাও, দুগ্ধ দাও। জ্যোৎস্নার মত শুভ্র, ঝরনার মতো ফেনিল তোমার দুগ্ধ-ধারায় আমার দুঃখ দূর কর। আমাকে দুগ্ধ দাও। আমি তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে দুগ্ধ দাও, আমি তোমার পূজো করিব, আমাকে দুগ্ধ দাও। তোমার দুগ্ধের শুভ্রতা আমার সমস্ত মলিনতাকে শুভ্র করিয়া দিক, আমাকে দুগ্ধ দাও..."

শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সুড়ঙ্গের মুখটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল, শীতল বাতাস বহিতেছিল, গানের সুরে আমার ক্লান্ত দেহ কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতেও পারি নাই। তন্দ্রার ঘোরেও আমি অস্পষ্টভাবে উহাদের সমবেত সংগীত শুনিতে পাইতে-ছিলাম, মনে হইতেছিল বহুদূর হইতে ঝরনার অস্ফুট কলধ্বনি ভাসিয়া আসি-তেছে। আমি যেন সেই ঝরনার উদ্দেশ্যে চলিয়াছি, এই ধরনের একটা এলো-মেলো স্বপ্নও যেন তন্দ্রার ঘোরে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আচমকা শ্বাসরোধ হইয়া ঘুমটা ভাঙিগয়া গেল। কে যেন আমার মুখের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

"কে, কে তুমি?"

"আমি শিলাঙ্গী। তুমি কে?"

শিলাঙ্গী তাড়াতাড়ি গর্তের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিও বাহির হইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রি, চতুর্দিকে নির্জন, আকাশে চাঁদ উঠিয়া-ছিল। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শিলাঙ্গী বলিল, "ও, তুমি! তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?"

"সুড়ঙ্গ পথে।"

"কেন আসিয়াছ?"

"তোমাকে দেখিব বলিয়া।"

"মিথ্যা কথা। তুমি আমার বাছুর চুরি করিতে আসিয়াছ। কিন্তু বৃথা আসিয়াছ, বাছুর এখানে নাই। সে এমন জায়গায় আছে যে সহজে খুঁজিয়া পাইবে না।"

তাহার সরল চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"বাছুর চুরি করিতে আসি নাই, সত্যই তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তোমাকে আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।"

শিলাঙ্গী নির্নিমেষে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল আমার কথাগুলি সে বিশ্বাস করিয়াছে।

"আমি তাহা হইলে যাহা চাহিব দিবে?"

নিতান্ত সরলভাবে কথাগুলি বলিয়া সে সোৎসুকে আমার মুখের দিকে তাকার চাহিল।

"কি চাও বল, যদি অসম্ভব না হয় নিশ্চয়ই দিব।"

"মোটেই অসম্ভব নয়।"

"কি?"

"তোমাদের ক্ষেতের ঘাস। আমার দুধুনী মধুনীকে খাইতে দিব। তুমি যদি দাও, তাহা হইলে রোজ আমাকে কষ্ট করিয়া আর চুরি করিতে হয় না।"

"তুমি কি রোজ চুরি করিয়া আন?"

"রোজ। এখনই তো চুরি করিতে যাইতেছিলাম।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"বল, দিবে?"

তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমি তাহাকে পাল্টা আর একটা প্রশ্ন করিলাম। বস্তুত এবিষয়ে আমার মনে কৌতূহলও কম হয় নাই।

"তুমি আমাদের ক্ষেতে যাও কি করিয়া?"

শিলাঙ্গী সরল সত্য কথাই বলিল। তাহাকে মিথ্যা বলিতে কখনও শুনি নাই।

"আমি সুড়ঙ্গ পথেই যাই। ইঁদুরের মতো আমরা মাটির নীচে গর্ত করিয়াছি। ইঁদুরের গর্তগুলিকেই বড় করিয়া লইয়াছি। এই সুড়ঙ্গ পথে গিয়া আমি পাহাড়ের উপত্যকায় উপস্থিত হইব। সেখানে আর একটি সুড়ঙ্গ আছে কিছু দূরে। সেই সুড়ঙ্গটি একেবারে তোমাদের ক্ষেতের মাঝখানে গিয়া পড়িয়াছে। এই সুড়ঙ্গটি খরগোশরা করিয়াছিল, তাহারা তোমাদের ক্ষেতের মাঝখানে গিয়া কচি কচি ঘাস খাইয়া আসিত। আমিই প্রথমে সেটা আবিষ্কার করি, তারপর ঝোনঝিরা, রাঠা, বানন্দা, এবং আরও অনেকে মিলিয়া গর্তটাকে বড় করিয়া দিয়াছে, এখন বেশ সহজে যাওয়া যায়। আমি রোজ যাই।"

আমি অবাক হইয়া শিলাঙ্গীর কথা শুনিতেছিলাম। আমাদের সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়া এই তস্করী প্রত্যহ আমাদের খাদ্য চুরি করিয়া আনে এবং তাহা এমনভাবে বলিতেছে যেন তাহা কোনও অন্যায় কার্য নহে! পরে জানিয়াছিলাম, তাহার ন্যায়-অন্যায়ের বোধটা একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

"কাজটা কি ভাল কর?"

তাহার কথা শেষ হইবামাত্র আমি আবার প্রশ্ন করিলাম।

"কোন্ কাজটা—"

"এমনভাবে আমাদের ঘাস চুরি করিয়া আনা?"

"চুরি করিয়া না আনিলে দুধনী মধুনীকে খাওয়াইব কি করিয়া? তুমি আমাকে যদি রোজ কিছু কিছু দাও, আমি আর চুরি করিব না। দিবে?"

"ওই ক্ষেত যদি আমার একার হইত, নিশ্চয় দিতাম। কিন্তু উহা যে সকলের। সকলের মত না লইয়া কি করিয়া দিব বল? আমাদের দলপতি

ধবলকে যদি তোমাদের দলপতি গিয়া বলে এবং সে যদি রাজী হয়, তাহা হইলে নিয়মিতভাবে ঘাস পাইবে। কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

"রোহা কাহারও নিকট ভিক্ষা করে না। আমার দুধনী মধুনীর জন্য কেনই বা সে নিজেকে নীচু করিবে? আমি যদি তোমাদের দলপতিকে গিয়া বলি, সে কি রাজী হইবে?"

"বোধ হয় না। এক টুকরা ঘাসও সে নষ্ট করিতে চায় না। উহাই যে আমাদের খাদ্য। উহার বীজ আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখি—"

"আমি বলিব অন্যায় কর। যাহা গরুর খাদ্য তাহাকে যদি তোমরা নিজেদের খাদ্যে পরিণত কর, গরুরা কি খাইবে?"

প্রশ্নটা এভাবে কোনও দিন ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করি নাই। তবু উত্তর দিলাম, "গরুরা কি খাইবে বা পাখীরা কি খাইবে, তাহা তো আমাদের সমস্যা নয়, তাহা লইয়া আমরা কখনও মাথাও ঘামাই নাই। আমরা কি খাইব, সেই সমস্যা সমাধান করিতেই আমরা ব্যস্ত।"

"তোমরা কি মাংস খাও না?"

"খাই বইকি। কিন্তু আমাদের দলে কত লোক, অত মাংস পাইব কোথায়?"

"আমরা যাহা করি, তাহাই করিলে পার। আমরা মাংস খাই, গরুর দুধও খাই। আমরা ঘাস খুঁজি গরুকে খাওয়াইব বলিয়া। তোমরা যখন আস নাই, তখন কন্যা নদীর তীরে আমাদের গরুরা আনন্দে চরিয়া বেড়াইত। তোমরা আসাতে মুশকিল হইয়াছে। বাধ্য হইয়া চুরি করিতে হইতেছে। আচ্ছা, গরুর বেলায় আমরা যাহা করি, তোমরা তাহা করিলেও তো পার।"

"কি?"

"কোনও গরুর সব দুধটা আমরা খাই না, বাছুরের জন্যও রাখিয়া দিই, কারণ গরুর দুধ তো বাছুরের জন্যই, তোমরাও তাই কর না। ঘাস তো গরুর জন্যই, গরুর জন্য কিছু ঘাস তোমরা ছাড়িয়া দাও। তোমাদের দলপতিকে আমি যদি গিয়া বলি, তিনি কি রাজী হইবেন না?"

"তুমি বলিলে হইবেন না। তোমার বাবা রোহা যদি যান, তাহা হইলে কি করিবেন বলা যায় না। নিতান্ত অসম্ভব না হইলে একজন দলপতির অনুরোধ আর একজন দলপতি উপেক্ষা করেন না। তোমার বাবাকে একদিন আসিতে বল—"

"রোহা কখনও কাহারও কাছে ভিক্ষা করিবে না। সে আমাদের কন্যা নদীর তীরে যাইতে বারণ করিয়া দিয়াছে। আমাদের গরুরা এখন নিগম বনে আছে, সেখানে খাদ্যেরও অভাব নাই, আমরা কয়েকজন লুকাইয়া তোমাদের ক্ষেতে যাই আমাদের নিজেদের প্রিয় গরুগুলির জন্য ঘাস আনিতে। আমি যাই দুধুনীর জন্য। ঝোনাঝিরার একটি প্রিয় ষাঁড় আছে পিঙ্গল, ঝোনাঝিরাও তাহার জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের ক্ষেতে গিয়া ঘাস আনে। বানন্দা রাঠাও যায়। তাহাদেরও নিজের নিজের গরু আছে। চার-পাঁচটি গরুর মতো ঘাস

তুমি ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে না?"

আমি মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। শিলাঙ্গী সোৎসুকে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শিলাঙ্গীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে আমি খুবই আনন্দিত হইতাম। কিন্তু তাহা অসম্ভব ছিল। ধবলের অজ্ঞাতসারে এ ধরনের কিছু করিবার কল্পনাও আমরা করিতে পারিতাম না। ধবলকে এবিষয়ে অনুরোধ করিলেও কিছু হইবে না, তাহাও আমি জানিতাম। খানিকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া তাই সত্য কথাটাই বলিতে হইল।

"আমি কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিব না।"

"তবে যে বলিলে আমাকে তোমার ভাল লাগিয়াছে?"

"সে কথা মিথ্যা নয়। সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে। তোমাকে দেখিতেই এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমাকে বর্শা ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিতে পার, তাহা জানিয়াও আসিয়াছি।"

তুমি যদি আমার বাছুর চুরি না করিতে আমি বর্শা ছুঁড়িতাম না। শুধু শুধু তোমাকে মারিতে যাইব কেন! তবে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সহিত বোধ হয় যুদ্ধই করিতে হইবে। ঝোনাঝিরার তাহাই ইচ্ছা, সে তোমাদের কন্যা নদীর তীর হইতে তাড়াইয়া দিতে চায়। তোমাদের বিরুদ্ধে সে একটা দল গঠন করিতেছে। রোহাকেও একথা বলিয়াছে। কিন্তু রোহা এখনও সম্মতি দেয় নাই। রোহা কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চায় না। কিন্তু ঝোনাঝিরা যদি ক্রমাগত রোহাকে বলিতে থাকে, তাহা হইলে সে একদিন হয়তো রাজী হইয়া যাইবে। নিগম বনে এখন গরুদের প্রচুর খাদ্য আছে, সে খাদ্য যখন ফুরাইয়া যাইবে, তখন রোহাকে রাজি হইতে হইবে, কন্যা নদীর তীরে তখন গরুর দলকে লইয়া না গেলে তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে? তাই বলিতেছি ভালভাবে আমাদের সহিত যদি একটা রফা করিয়া ফেল, তাহা হইলে উভয় পক্ষই শান্তিতে থাকিতে পারিব, তাহা না হইলে যুদ্ধ অনিবার্য।"

"বেশ, আমি আমাদের দলপতি ধবলকে একথা বলিব। চেষ্টা করিব যাহাতে সে তোমাদের কিছু ঘাস দিতে রাজী হয়।"

"এখান হইতে তাহা হইলে সর, আমি যাই।"

"কোথায়?"

"এই সুড়ঙ্গে ঢুকিব। এখন তোমাদের ক্ষেতের প্রহরীরা ঘুমাইতেছে, এই সময় চুরি করিবার সুযোগ।"

"আমি যদি তোমাকে বাধা দিই?"

"আমি জানি, তুমি দিবে না।"

"দিব না! কেন?"

"তুমি যে বলিতেছ, আমাকে তোমার ভাল লাগিয়াছে।"

মুচকি হাসিয়া সে সুড়ঙ্গে গিয়া ঢুকিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

...গর্তের অপর প্রান্তে যখন উপনীত হইলাম তখন প্রভাতের আর বেশি দেরি নাই, পূর্ব দিগন্তে ঊষার রক্তিমাভা দেখা যাইতেছে। অন্ধকার সরিয়া গিয়াছে। চন্দ্র অস্তমিত। ঝিল্লী-ধ্বনিও নাই। একটা তীব্র হাওয়ায় সমস্ত উপত্যকা আলোড়িত হইতেছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শিলাঙ্গীকে দেখিতে পাইলাম না। যতক্ষণ সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণও তাহার নাগাল, এমন কি সাড়া শব্দ পর্যন্ত পাই নাই। অতিশয় দ্রুতগতিতে সে আগাইয়া গিয়াছিল। ঠিক করিলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিব। কোন্ সুড়ঙ্গ দিয়া সে আমাদের মাঠের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সেই গাছে উঠিয়া আমার ধনুর্বাণ পাড়িয়া আনিলাম এবং সেই ঈষৎ অন্ধকারে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বারম্বার মনে হইতে লাগিল ওই কিশোরী মেয়েটির নিকট আমি পরাজিত হইয়া গিয়াছি।

...সহসা নিনানির কথা মনে পড়িল। মনে হইল সে হয় তো আমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছতর হইতেছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম যদি পাহাড়ী ছাগল দেখিতে পাই, কিন্তু একটাও দেখা গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও দেখা গেল না। নিনানির আবদার-মাখা মুখটা মনে পড়িল। তাহার বাসনা কখনও অপূর্ণ রাখি নাই। শিলাঙ্গীর আবির্ভাবে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও শিলাঙ্গীকে আর সেদিন দেখিতে পাইলাম না। নিজেদের আস্তানার অভিমুখেই রওনা হইলাম অবশেষে।

...নিনানি পথের ধারেই অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া আগাইয়া আসিল।

"তোমার এত দেরি হইল যে—"

"পাহাড়ী ছাগল খুঁজিতেছিলাম।"

"আন নাই তো একটাও?"

"পাইলাম না। কাল পাহাড়ী ছাগল একটাও বাহির হয় নাই।"

"ঘিসু কিন্তু দুইটা ছাগল কাল মারিয়া আনিয়াছে।"

"ঘিসু? সে কখন গিয়াছিল?"

"তুমি যাইবার একটু পরেই। তুমি আমার জন্য ছাগল মারিতে গিয়াছ শুনিয়া সে কি স্থির থাকিতে পারে?"

নিনানির চোখে মুখে একটা দুষ্ট হাসি চকমক করিয়া উঠিল।

"কাল সমস্ত রাত্রি কোথায় ছিলে?"

"একটা গাছের উপর।"

"একা ছিলে?"

"দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথায় পাইব?"

"মনে হইতেছে সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছ, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে—"

"তাই নাকি! জাগিয়াই ছিলাম, ভাল ঘুম হয় নাই।"

"তোমার জন্য কিছু ছাগলের মাংস রাখিয়াছি, চল, আগে সেটা খাইয়া লও। ...নু জানিতে পারিলে আর থাকিবে না।"

"ঘিসুর মাংস ঘিসুই খাক, আমার প্রয়োজন নাই।"

নিনানির মুখে আবার সেই দুষ্ট হাসিটা ফুটিয়া উঠিল।

"ঘিসুকে দিলেই ঘিসু খাইবে, কিন্তু আমার ইচ্ছা তুমি খাও।"

নিনানি আমার দিকে একটু ঢলিয়া এক হাত দিয়া আমার কোমরটা ...ইয়া ধরিল। নিনানি এরূপ করিলে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিতাম। ...মার ভয় হইত যদি ধবল দেখিতে পায় মুশকিলে পড়িব। আইনত যদিও ...রের স্ত্রীর উপর আমার অধিকার ছিল, কিন্তু কার্যত সে অধিকার আমরা ...করিয়াছিলাম। অপরের স্ত্রীর বিষয়ে উদাসীন থাকাটাই ক্রমশ আমাদের মধ্যে ...ন বিবেচিত হইতেছিল। দল বাঁধিয়া যখন থাকিতে হইবে তখন নিজেদের ... মনোমালিন্য যাহাতে না হয় সে বিষয়ে ক্রমশ আমরা সচেতন হইতেছিলাম। ...নি কিন্তু ধবলকে অপমান করিবার জন্যই যেন যখন তখন আমাকে ...ইয়া ধরিত। দলপতির বিশেষ অধিকারের জোরে বৃদ্ধ ধবল নিনানিকে ...হ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। এ কথাটা ... ছলে নিনানি ধবলকে জানাইয়া দিতে ছাড়িত না। মুশকিলে পড়িতাম ...মি। কারণ দলপতির বিরাগভাজন হইয়া থাকা নিরাপদ ছিল না।

"কোমরটা ছাড়। ধবল যদি দেখিতে পায়—"

"পাইলেই বা। আমি যতক্ষণ আছি ধবল তোমার কিছু করিতে পারিবে না।"

"তবু ছাড়। ঘিসুকে চটাইয়াও লাভ নাই।"

"আসল কথাটা বলিতেছ না কেন?"

"কোন্ কথাটা?"

"আমাকে আর তোমার ভাল লাগিতেছে না। কাল পাহাড়ে অনেক ছাগল ...ময়াছিল, ইচ্ছা করিলেই তুমি মারিয়া আনিতে পারিতে। কিন্তু কাল তুমি ... ব্যাপারে মাতিয়াছিলে, আমার কথা মনে ছিল না।"

"কি যা-তা বলিতেছ?"

"ঠিকই বলিতেছি।"

নিনানির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। যদিও সে হাসিতেছিল, কিন্তু সে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎচমক দেখিয়া বুঝিলাম তাহার মনের ভিতর ...নিগর্ভ মেঘ জমিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর ...র করিলাম সমস্ত ঘটনাটা নিনানির কাছে গোপন করা সমীচীন হইবে না। ...হাকে খানিকটা অন্তত বলা উচিত।

"চুপ করিয়া আছ যে"—নিনানিই আবার প্রশ্ন করিল।

"ভয় হইতেছে সত্য কথা বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না।"

"ভণিতা ছাড়িয়া কি বলিতে চাহ বল।"

"কাল আমি আবিষ্কার করিয়াছি যে উন্নগা পাহাড়ের অপর পারে একটা অদ্ভুত জাতি বাস করে। আমাদের মতো তৃণবীজ খাইয়া থাকে না, গরুর দুধই তাহাদের প্রধান খাদ্য।"

"গরুর দুধ? পায় কি করিয়া?"

"ফাঁদ পাতিয়া গরুকে ধরে, তাহার পর তাহার বাঁট হইতে দুধ টানিয়া বাঁশের কোঁড়েতে ভরিয়া লয়। সেই দুধ তাহারা পান করে।"

"বল কি! কি করিয়া তুমি উহাদের সন্ধান পাইলে?"

এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইলাম। শিলাঙ্গীর কথাটা নিনানিকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না।

বলিলাম, "ছাগলের খোঁজে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রশস্ত সুড়ঙ্গ-পথ দেখিলাম। কৌতূহল হইল ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি কি আছে। আশা করিয়াছিলাম, শজারু শশক অথবা শৃগালের সন্ধান পাইব। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই বুঝিতে পারিলাম ইহা মনুষ্য চলাচলের পথ। সেই পথ অনুসরণ করিয়া অবশেষে পর্বতের অপরপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বিরাট এক সভায় একজন কথক কথকতা করিতেছিল। সে কথকতা অতি চমৎকার। সেই কথকতার মধ্যেই উহাদের পরিচয় পাইলাম। উহাদের পূর্ব-পুরুষ কাংড়া পাতাল হইতে উঠিয়াছিল একটি প্রস্তর ভেদ করিয়া। তাহার ঠিক পাশেই ছিল আর একটি গর্ত। সেই গর্ত হইতে উঠিয়াছিল একটি সদ্যপ্রসূতা গাভী ও তাহার বৎস। কি করিয়া কাংড়া সেই গাভীকে বশ করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ কথক কখনও বক্তৃতা করিয়া, কখনও গান করিয়া বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই সভায় আর একটি ভয়ানক কথাও শুনিলাম। উহারা শীঘ্রই নাকি আমাদের আক্রমণ করিবে।"

"কেন?"

নিনানির চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। যে-কোনও প্রকার হুজুগে মাতিবার জন্য নিনানি সতত উৎসুক হইয়া থাকিত।

"তাহাদের গরুর জন্য ঘাস চাই। পূর্বে তাহাদের গরুরা কন্যা নদীর তীরে চরিত, এখন আমরা সেখানে ঘাস বুনিয়াছি। হয় তাহাদের গরুর ঘাস দিতে হইবে, নতুবা যুদ্ধ করিতে হইবে।"

"আমরা ঘাস দিব না। যুদ্ধ করিব। আমাদের সহিত উহারা পারিবে কি?"

"চল, ধবলের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখা যাক।"

"ইহাতে আবার পরামর্শ করিবার কি আছে? যুদ্ধই করিতে হইবে এবং সে যুদ্ধে আমরা জিতিবই। আমাদের দলের মেয়েরা যদি পবিত্রভাবে অগ্নি-পূজা করিয়া যুদ্ধের নাচ নাচিতে পারে কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাদের হারাইয়া দেয়। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধের কথা মনে নাই?"

"আমরা অল্পদিন মাত্র এখানে আসিয়াছি। এ অঞ্চলের পথ-ঘাটও

আমাদের ভাল করিয়া চেনা হয় নাই, এ অবস্থায় যুদ্ধ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না!"

"উহাদের হুমকি সহ্য করিয়া থাকাটাও কি বুদ্ধিমানের কাজ হইবে? আজ যদি উহাদের ঘাস দাও, কাল জমি চাহিবে।"

"দেখাই যাক না কি করে। তবে উহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। ধবল কি বলে শোনা যাক।"

"ধবল যুদ্ধ করিতে চাহিবে না, কারণ সে বুড়া হইয়াছে। তোমরা তাহার কথায় সায় দিও না। অপমান আমরা সহ্য করিব না।"

নিনানি যদিও একটু আদুরে আবদেরে গোছের ছিল, কিন্তু উত্তেজিত হইলে সে ভয়ংকরী হইয়া উঠিত। খঞ্জনদের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল তখন নিনানি কুঠার ও বর্শা লইয়া রণক্ষেত্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে কোমল ও কঠিনের একটা অদ্ভুত সমন্বয় আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সে জন্যই নিনানিকে চটাইতে সাহস করিতাম না।

তাহার প্রশ্নের উত্তরে তাই বলিলাম, "ঠিকই তো, অপমান সহ্য করিতে যাইব কোন্ দুঃখে? তবে ধবল যখন আমাদের দলপতি, তাহার অভিজ্ঞতা যখন আমাদের অপেক্ষা অধিক, তখন তাহার মতামত আমাদের শুনিতেই হইবে।"

"তবে তাই শোন গিয়া। ওখানে আবার ভীড় জমিয়াছে দেখিতেছি।"

আমরা আমাদের আস্তানার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। দেখিলাম ধবলের কুটির-প্রাঙ্গণে অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। তাহাদের ঠিক মধ্যস্থলে শালপ্রাংশু মহাভুজ এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে কি যেন বলিতেছে। কাছে গিয়া দেখিলাম লোকটি আগন্তুক, তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

লোকটি ধবলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল, "আমাদের দলপতি উলম্ভন এই সমস্ত প্রদেশের অধিপতি। এ প্রদেশের সমস্ত নদী, বন, পর্বত, জমি, পশুপক্ষী তাহার অধিকারভুক্ত। উলম্ভনের প্রপিতামহ বন্‌জিরা নিজের বাহুবলে একদা এই সমস্ত অঞ্চলে একাধিপত্য করিয়া বেড়াইত। তাহারই বংশধর উলম্ভন এখন সরসরা নদীর তীরে বাস করিতেছে। উলম্ভনের আদেশ অনুসারে আমি তোমাকে বলিতে আসিয়াছি যে কন্যা নদীর তীরে এতদিন কেহ বসবাস করিতে আসে নাই বলিয়াই ইহা অনধিকৃত ছিল, তোমরা আসাতে উলম্ভন অতিশয় আনন্দিত হইয়াছে, তোমরা কৃষিকর্ম করিয়া এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর ইহাই উলম্ভনের ইচ্ছা। কিন্তু একটি সর্ত আছে। তোমাদের উলম্ভনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে।"

"বশ্যতা স্বীকার? সে আবার কি?"

ধবল সত্যই ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই। আমরা কেহই পারি নাই। দীর্ঘকায় লোকটি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "এ প্রদেশের সকল লোকই উলম্ভনকে দলপতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তোমাদেরও মানিয়া লইতে হইবে।"

"তাহাতে আমাদের লাভ?"

"লাভ আছে। তোমরা যদি কোনপ্রকার বিপদে পড় উলম্ভন সদলবলে আসিয়া তোমাদের সাহায্য করিবে। উলম্ভন বিপদে পড়িলে তাহাকেও তোমাদের সাহায্য করিতে হইবে। ইহারই নাম বশ্যতা স্বীকার। অবশ্য ইহার পরিবর্তে তোমাদের উলম্ভনকে মধ্যে মধ্যে কিছু উপহারও প্রেরণ করিতে হইবে।"

"কি উপহার?"

"পশুপক্ষী শিকার করিয়া পাঠাইতে পার। তোমাদের তৃণবীজ দিতে পার। প্রয়োজন হইলে তোমাদের বাড়তি যুবক-যুবতীদের দান করিতে পার।"

ধবল নির্বাক হইয়া রহিল। আগন্তুক ভীষণ-দর্শন এবং বলিষ্ঠ, তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীও স্পর্ধা-ব্যঞ্জক, সহসা তাহার কথার প্রতিবাদ করা নিরাপদ নহে ভাবিয়াই সে চুপ করিয়াছিল। ভীড় ঠেলিয়া নিনানি কিন্তু আগাইয়া গেল এবং আগন্তুকের মুখের দিক নির্ভয়দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "আমরা যদি বশ্যতা স্বীকার না করি উলম্ভন কি করিবে?"

আগন্তুক নিনানির দিকে প্রলুব্ধদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "উলম্ভন কি করিবে তাহা উলম্ভনই জানে। আমি তাহার আদেশ তোমাদের শুনাইয়া দিলাম। তোমরা প্রত্যুত্তরে যাহা বলিবে তাহাও তাহাকে গিয়া বলিব। তবে এটা ঠিক, তোমরা যদি বশ্যতা স্বীকার না করিতে চাও উলম্ভন তোমাদের সহিত শত্রুতা করিবে, অবশেষে তোমাদের এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

নিনানি বলিল, "বেশ, আমরা উলম্ভনের সহিতই গিয়া এ বিষয়ে আলাপ করিব। উলম্ভনের নিকট আমাদের প্রতিনিধি যাইবে। তুমি যখন এ বিষয়ে সঠিক কিছুই বলিতে পারিতেছ না তখন তোমার সহিত আলাপ করিয়া লাভ নাই। তুমি আসিয়াছ ইহাতে অবশ্য আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি। এস, আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর। প্রতাপশালী উলম্ভনের প্রতিনিধিকে সমাদর করিবার মতো উপকরণ আমাদের নাই, তবু যাহা আছে তাহা দিয়াই তোমাকে অভ্যর্থনা করিব।"

নিনানি চিরকালই সপ্রতিভ। সকলে যেখানে ইতস্তত করে নিনানি সেখানে আগাইয়া গিয়া স্পষ্ট কথা সহজভাবে বলিতে পারে। ধবল পর্যন্ত তাহার ভয়ে ভীত। পাছে নিনানি অপর কাহাকেও বিবাহ করিয়া সমস্ত দলের উপর কর্তৃত্ব করে সেই আশঙ্কাতেই ধবল তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল। নিনানি অপরাজিতা বংশের মেয়ে। আমাদের দলের কলঙ্গা দূর দেশ হইতে একদা তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই সে মারা যায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই নিনানিকে বিবাহ করিতে উৎসুক ছিলাম কিন্তু ধবল অবশেষে তাহাকে দাবি করিল বলিয়া আমরা বঞ্চিত হইলাম। বস্তুত নিনানিই আমাদের দলের প্রাণ ছিল। ধবল দলপতি

ছিল বটে, কিন্তু নিনানির ইচ্ছাতেই সমস্ত হইত। নিনানির দিকে চাহিয়া ধবল মৃদুহাস্যসহকারে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিল। ভাবটা—আমার মনের কথাগুলি তুমি ঠিক গুছাইয়া বলিয়াছ।

আগন্তুক নিনানির মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। নিনানির বক্তব্য শেষ হইলে বলিল, "তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার পূর্বে তুমি কে তাহা জানিতে পারি কি?"

"আমি? ইহাদের নিকট প্রশ্ন করিলেই জানিতে পারিবে।"

নিনানি মৃদুহাস্যসহকারে আমাদের দিকে হস্ত সঞ্চালন করিয়া কুরঙ্গীর ন্যায় লীলায়িত গতিতে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ঘিসু আগন্তুকের প্রশ্নের জবাব দিল।

"নিনানি আমাদের দলপতির প্রিয়তমা পত্নী।"

"ও! তাহা হইলে তো আমি পরম সম্মানিত হইলাম। নিশ্চয়ই উহার আতিথ্য গ্রহণ করিব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

ধবল সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমরা সকলে নিনানির ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

...শালপাতার উপর কিছু তৃণবীজ চূর্ণ, আগুনে-ঝলসানো ছাগলের রাং, নারিকেলের খোলে কিছু মধু, কন্দ ও ফল সাজাইয়া দিয়া নিনানি আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিল। নিনানির অভ্যর্থনাপদ্ধতিতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আগন্তুক সমস্ত খাদ্যগুলি একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটু একটু করিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, "আপনারা অগ্রে আহার করুন, তাহার পর আমি আহার করিব। অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের গৃহে যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, তাহার অগ্রভাগ অন্নদাতাকে না খাওয়াইয়া আমরা খাইতে পারি না। ইহাই আমাদের নিয়ম। আপনারা খাদ্যগুলি গলাধঃকরণ করুন, তাহার পর আমি খাইব।"

নিনানি বলিল, "ইহাই যদি আপনাদের নিয়ম হয়, সে নিয়মের মর্যাদা আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা করিব। কিন্তু এই নিয়মের পশ্চাতে যে অবিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা আমাদের সম্মানকে আঘাত করিতেছে। অতিথিকে বিষ-প্রয়োগ করিয়া হত্যা করিবার প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। যাই হোক, আপনাদের নিয়ম আপনি পালন করুন। আমাকেও কিছু দিন—"

নিনানি দুই হস্ত পাতিয়া আগন্তুকের মুখের উপর তাহার ব্যঙ্গদীপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। আগন্তুক নিনানির প্রসারিত হস্তে একটু মধু ঢালিয়া দিয়া বলিল, "আমাকে ব্যঙ্গ অথবা ভর্ৎসনা করা বৃথা, কারণ আমি আমাদের দলপতি উলম্ভনের নির্দেশ পালন করিতেছি মাত্র।"

"ঠিক, ঠিক।"

ধবল সোৎসাহে তাহাকে সমর্থন করিল!

নিনানি নিপুণতার সহিত মধু চাটিতে চাটিতে প্রশ্ন করিল, "তোমার নামটি জানিতে পারি কি?"

"আমার নাম গজন্ধর।"

গজন্ধর উবু হইয়া বসিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল এবং যতক্ষণ আহারে ব্যাপৃত রহিল, একটি কথা বলিল না। আহারান্তে ধবলের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল, "বহুদিন এ ধরনের খাদ্য আহার করি নাই। আহার করিতে করিতে মনে হইতেছিল, আবার যেন শৈশবে ফিরিয়া গিয়াছি।"

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত ধবল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতেছিল। আমরাও ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

নিনানি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম, প্রতাপশালী উলম্ভনের প্রতিনিধিকে সম্যকরূপে সম্বর্ধনা করিবার মতো উপকরণ আমাদের নাই। এখন কি কি দ্রব্য কিভাবে ভক্ষণ করা তোমার অভ্যাস তাহা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে তদনুযায়ী আয়োজনের চেষ্টা করিব।"

গজন্ধর বলিল, "আমরা এই সব জিনিসই আহার করি, কিন্তু আমরা রন্ধন করিতে শিখিয়াছি। মাটির পাত্র প্রস্তুত করিবার রীতি আমাদের মধ্যে বহুকাল পূর্বে প্রচলিত হইয়াছে। সেই সব মাটির পাত্রে আমরা তৃণবীজ সিদ্ধ করিয়া খাই। শাক-পাতা, কন্দ, ফল-মূলও সিদ্ধ করি। মাংসও সিদ্ধ করিলে সুপাচ্য ও সুস্বাদু হয়। তোমরা যদি উলম্ভনের নিকট যাও, সবই দেখিতে পাইবে।"

"আমরা যাইব"—ধবল সোৎসাহে বলিল।

"তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাইতে চাও, তাহা হইলে অদ্যই সন্ধ্যার পর যাত্রা করিতে হইবে। কারণ আমি আগামী কল্য সন্ধ্যায় উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিব এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছি।"

ধবল ঘিসুর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঘিসু, তুমি, আমি এবং ভঙ্গা চল যাই।"

ঘিসু এবং ভঙ্গা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আপত্তি করিল না। আমার ভয় হইতেছিল, পাছে ধবল আমাকেও যাইতে বলে। কিন্তু বলিল না। বলিলে মুশকিলে পড়িতাম, কারণ সেই রাত্রেই আমি শিলাঙ্গীর সহিত সাক্ষাৎ করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিভাবে যে তাহার সাক্ষাৎ পাইব তাহা জানিতাম না, কিন্তু তবু অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছিলাম যে নিশ্চয়ই তাহার দেখা পাইব।

গজন্ধর নিনানির দিকে চাহিয়া বলিল—"দলপতির প্রিয়তমা পত্নীও যদি স্বামীর সঙ্গে গমন করে উলম্ভন অতিশয় প্রীত হইবে।"

"বিনা আমন্ত্রণে আমি কোথাও যাই না," নিনানি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

"আমি আমন্ত্রণ করিতেই আসিয়াছি। আমি সাদর নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিতেছি।'

ধবল ভীত হইয়া পড়িল। নিনানিকে লইয়া গজন্ধরের দেশে যাইবার

সাহস তাহার ছিল না।

সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমরা দুইজন অনুপস্থিত থাকিলে এখানে কাজের ক্ষতি হইবে।"

আমাদের দলের সমস্ত নারী একত্রিত হইয়া গজন্ধরকে দেখিতেছিল। গজন্ধর তাহাদের দিকে দেখাইয়া বলিল, "এতগুলি স্ত্রীলোক তো রহিয়াছে, ইহারা কি দুই-চারি দিনের জন্য কাজ চালাইয়া লইতে পারিবে না?"

ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "নিনানি যখন আসে তখন সমস্ত কাজ আমিই তো নির্বাহ করিতাম। জমির সমস্ত কাজ এখনও আমিই চালাই।"

নিনানি হাসিয়া বলিল, "এসব আলোচনা অতিশয় অবান্তর। আমাদের জাতির সহিত উলম্ভন কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। উলম্ভনের সহিত আমাদের শত্রু-সম্পর্ক অথবা মিত্র-সম্পর্ক হইবে, তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এ অবস্থায় আমি তোমার সহিত যাইতে পারি না। উলম্ভন যদি আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে তখন তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করিব।"

গজন্ধর ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "বেশ তাহাই হউক।"

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে গজন্ধরের সহিত ধবল, ঘিসু, ভঙ্গা চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে আমাদের প্রথামতো আমাদের কুলদেবতা নিম্ব বৃক্ষের নিকট তিনটি পারাবত বলি দেওয়া হইল। বলি দিবার জন্য আমরা বন্য পারাবত ধরিয়া রাখিতাম। ইহা ব্যতীত প্রত্যেকের গলায় এবং হাতে কুমীরের এবং কাছিমের হাড়ের টুকরাও বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস ছিল কুমীর এবং কাছিম যেমন আত্মরক্ষায় দক্ষ, কেহ যদি তাহাদের অস্থি অঙ্গে ধারণ করে, সে-ও অনুরূপ দক্ষতা লাভ করিবে। কেহ বিদেশে গেলে আমরা তাহাদের গলায় হাতে তাই কুমীর এবং কাছিমের হাড় বাঁধিয়া দিতাম। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কুমীর এবং কাছিমের হাড়ও সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ধবল, ঘিসু এবং ভঙ্গা অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর লইয়া গেল। তাহারা যখন চলিয়া গেল, তখন হইতে ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচি, ঘিসুর প্রবীণা পত্নী নারো এবং ভঙ্গার প্রবীণা পত্নী সাংরা উপবাস করিতে লাগিল। তাহাদের স্বামীরা ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহারা অন্ন গ্রহণ করিবে না—ইহাই আমাদের নিয়ম।

তাহারা চলিয়া যাইবার পর নিনানি আর একটা কাজও করিল। আমাদের দলে চন্মনা নামে একটি দুঃসাহসিক যুবক ছিল। নিনানির আদেশে সে ধবল, ঘিসু ও ভঙ্গার অনুসরণ করিল। নিনানি তাহাকে বলিল, "দূরে দূরে উহাদের অনুসরণ করিবে। উহাদের গতিবিধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবে। গজন্ধরের আচরণে যদি কোনওপ্রকার দুরভিসন্ধির আভাস পাও, কিম্বা ধবল, ঘিসু বা ভঙ্গার যদি কোনও বিপদ হইয়াছে বোঝ

তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাদের খবর দিও। সর্বদা সজাগ থাকিও।" চন্মনা চলিয়া গেল। আমরা সকলেই নিনানির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। চন্মনা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু আমাদের দলের বিঘাও এমন একটি কান্ড করিয়া বসিল যাহাতে আমরা সকলেই চঞ্চল হই পড়িলাম। বিঘাও সহসা মূর্ছিত হইয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে উপদেবতা ভর করিত। ইতিপূর্বে মূর্ছিত অবস্থায় সে দুই-একবার আতঙ্কজনক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। সেগুলি ফলিয়া যাওয়াতে আমরা তাহার মূর্ছাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণ করিবার মতো বুদ্ধি আমাদের তখন ছিল না। প্রথমবার বিঘাও বলিয়াছিল "জিনার দিন ফুরাইয়াছে। অশ্বত্থদেবতা তাহাকে যদি সাহায্য না করে সে বাঁচিবে না।" জিনা ছিল আমাদের দলের একটি বৃদ্ধা। ভবিষ্যদ্বাণী করিবার কিছুদিন পরে সে মরিয়া গেল। যদি সে না মরিত বিঘাও নিশ্চয়ই বলিত যে অশ্বত্থদেবতার সহায়তাতেই সে বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু এভাবে বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতাই আমাদের তখন ছিল না। আমরা প্রত্যেকে ভূত প্রেতের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতাম। শুধু যে তাহাদেরই ভয় করিতাম পূজা করিতাম তাহা নয়, যাহার যাহার মুখ দিয়া তাহারা নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিত তাহাদেরও আমরা ভয় করিতাম, তাহাদেরও আমরা সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইতাম। সে যুগে একটা অদৃশ্য প্রবল শক্তির নিকট আমরা সকলে যেন দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কল্পনা কেহ করিতে পারিত না। এইজন্যই নিনানি ধবলকে বিবাহ করিয়াছিল কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দলপতির কথা অমান্য করিলে কানা ভীষণ প্রতিশোধ লইবে। ধবলের প্রমাতামহ কানা ছিল, তাহার প্রেতাত্মা ধবলের রক্ষণাবেক্ষণ করে ইহা সকলে জানিত এবং মানিত। ক্ষেতে ফসল না হইলে আমরা মনে করিতাম সেই একচক্ষু উপদেবতা রুষ্ট হইয়া আমাদের ফসল নষ্ট করিয়া দিতেছেন। রুষ্ট উপদেবতাকে তুষ্ট করিবার নানাবিধ পদ্ধতি ধবলের জানা ছিল বলিয়াই ধবল আমাদের দলপতি হইয়াছিল। রুষ্ট দেবতা কিছুতেই তুষ্ট না হইলে অবশেষে আমরা সে জমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য জমিতে চাষ করিতাম, ভাবিতে পারিতাম না যে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গিয়াছে। ধবলের কথাই সত্য বলিয়া মনে হইত। মনে হইত জমিতে উপদেবতার যে পাপদৃষ্টি লাগিয়াছে তাহা দূর করা মানুষের সাধ্যাতীত। ধবলের অলৌকিক শক্তির উপর আমরা অগাধ বিশ্বাস পোষণ করিতাম। আমাদের দলে এ বিষয়ে ধবলের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিঘাও। কারণ তাহারও অলৌকিক শক্তি ছিল। সুতরাং বিঘাও মূর্ছিত হইয়া পড়াতে আমরা সকলেই খুব ভীত হইয়া পড়িলাম। আমাদের মধ্যে তখন প্রেতকে শান্ত করিবার যে উপায়টি সাধারণ লোকে জানিত সেই উপায়টিই আমরা অবলম্বন করিলাম। বিঘাওকে ঘিরিয়া সকলে মিলিয়া গান করিতে লাগিলাম।

আমাদের মধ্যে সুকণ্ঠী যে সকল রমণী ক্ষেতে কাজ করিতেছিল (তখন মেয়েরাই প্রধানত ক্ষেতের কাজ করিত) তাহাদেরও ডাকিয়া আনা হইল। তাহারা কন্যা নদীতে স্নান করিয়া আসিল এবং আলুলায়িত সিক্ত কেশে বিঘাওকে ঘিরিয়া গান গাহিতে লাগিল। তাহারাই হইল মূল গায়িকা, আমরা সকলে তাহাদের দোহারকি করিতে লাগিলাম। গায়িকাদের মধ্যে নিনানিও ছিল। কিছুক্ষণ গান চলিবার পর বিঘাও বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "আমি ধবলের প্রমাতামহ। আমার ইচ্ছা নিনানি সিক্ত কেশ দিয়া আমার পা মুছাইয়া দিক। তাহার পর আমি ব্যক্ত করিব কেন আমি বিঘাওয়ের উপর ভর করিয়াছি।"

নিনানির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বিঘাওয়ের দুই পায়ে কুষ্ঠের মতো একপ্রকার ঘা ছিল। কেশ দিয়া সেই পা মুছাইয়া দেওয়া সত্যই কঠিন কাজ। কিন্তু যতই কঠিন হউক নিনানি আপত্তি করিতে পারিল না। কোনও প্রেতাত্মার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাহস কাহারও তখন ছিল না। মনে মনে থাকিলেও সে তাহা ব্যক্ত করিবার সাহস পাইত না। আপত্তি করিলে সমস্ত দলের আক্রোশ তাহার উপর গিয়া পড়িবে। সমস্ত দলের হিতাহিত প্রেতাত্মারাই নিয়ন্ত্রণ করে এ বিশ্বাস আমাদের মনে তখন বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং দলের মঙ্গলের জন্য প্রেতাত্মার আদেশ আমাদের সকলকেই শিরোধার্য করিতে হইত। এখনও তোমরা সমাজের হিতার্থে যেমন অনেক অপ্রিয় আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হও আমরাও তেমনি হইতাম। পরলোকই তখন ইহ-লোককে শাসন করিত এবং পরলোকের প্রতিনিধি ছিল বিঘাওয়ের মতো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোকেরা।

বিঘাওয়ের রক্ত পুঁজমাখা চরণ দুটি নিনানি তাহার সিক্ত কেশ দিয়া মুছাইয়া দিল। তাহার পর সে মূর্ছিত বিঘাওকে প্রশ্ন করিল, "এবার আমি স্নান করিয়া আসিব কি?"

"না। ধবল না ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তুমি তোমার কেশ ধৌত করিবে না।"

আমরা সকলে নির্বাক হইয়া রহিলাম।

বিঘাও বলিতে লাগিল, "তোমার অহঙ্কৃত উক্তিই ধবলকে উলম্ভনের নিকট যাইতে বাধ্য করিয়াছে। ধবল যতক্ষণ না নিরাপদে ফিরিয়া আসে ততক্ষণ তোমাকে অস্নাত থাকিতে হইবে। এইবার আমি কেন আসিয়াছি শুন। আমি সাবধান করিতে আসিয়াছি। তোমাদের সর্বনাশ রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তোমাদের নিকট সে কবে আসিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে তোমাদেরই চক্ষু! তাহার পদধ্বনি অশ্রান্তভাবে শ্রবণ করিতে পারে তোমাদেরই কর্ণ। তোমরা চক্ষুকর্ণ খুলিয়া রাখ, তোমাদের সাবধান করিয়া দিতেছি, রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া তোমাদের সর্বনাশ ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হই-তেছে।" এই পর্যন্ত বলিয়া বিঘাও নীরব হইল। আমরা আবার গান

গাহিতে লাগিলাম, কারণ তখনও পর্যন্ত বিঘাওয়ের মূর্ছা ভংগ হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে বিঘাও আবার বিড়বিড় করিয়া কথা বলিতে লাগিল। "উলম্ভনের সহিত ধবল বন্ধুত্ব করিতে গিয়াছে বলিয়া তোমরা উল্লসিত হইও না। বন্ধুত্ব এবং দাসত্বের প্রভেদ অতি অল্প। স্বাধীনতার মূল্যে বন্ধুত্ব লাভ করিতে হয়, স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া লোকে দাসত্বও বরণ করে। ধবলের স্বাধীন বুদ্ধি যাহাতে আচ্ছন্ন না হয় তাহার জন্য তোমরা নিম্বদেবতাকে রক্তার্চিত কর। আবার বলিতেছি, চক্ষু কর্ণ খুলিয়া রাখ, রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া তোমাদের সর্বনাশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।"

বিঘাও আবার নীরব হইল। নিনানি এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল, এইবার সে চীৎকার করিয়া উঠিল। যে চীৎকারের কোনও ভাষা নাই, তাহা কেবল চীৎকার মাত্র। মনে হইল, আকাশ বাতাস যেন সশব্দে ফাটিয়া গেল। আমরা সকলে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে দুই হস্তে তাহার মাথার চুল মুঠি করিয়া ধরিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টিতে মধুর বহ্নিদীপ্তি নাই, তাহা ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তরের স্বতোৎসারিত প্রতিবাদ যেন চোখের ভাষায় বলিতে চাহিতেছে—এ অন্যায় আদেশ আমি মানিব না। চীৎকার করিতে করিতে নিনানিও অজ্ঞান হইয়া গেল। আমরা যন্ত্রচালিতবৎ পুনরায় গান গাহিতে উদ্যত হইয়াছিলাম—কেহ অজ্ঞান হইয়া গেলে গান গাওয়াই নিয়ম ছিল—আমরা মনে মনে ইহাও প্রত্যাশা করিতেছিলাম যে নিনানির মুখ দিয়া আমরা হয়তো অন্য কোনও প্রেতাত্মার নির্দেশ শুনিতে পাইব, কিন্তু বিঘাও সহসা বলিল, "উহাকে তোমরা ঘরের ভিতরে লইয়া যাও।" সবিস্ময়ে দেখিলাম, বিঘাও উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার চোখে মুখে এক অদ্ভুত ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সে হাসি দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। বিঘাওকে আমরা সকলেই ভয় করিতাম। কারণ সে ছিল যাদুকর। যাদুশক্তিবলে সে অঘটন ঘটাইতে পারে এই বিশ্বাস সে আমাদের সকলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। ধবলের সহিত তাহার মূলত বিরোধও ছিল এইখানে। ধবলেরও অলৌকিক ক্ষমতায় আমরা বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু তাহাকে আমরা ভালবাসিতাম, ভক্তি করিতাম, তাহাকে লইয়া উপহাস বিদ্রূপ করিতেও আমাদের বাধিত না, তাহাকে কখনও ভয় করি নাই কারণ ধবল কখনও নিজের শক্তির আস্ফালন করিত না। এক অদৃশ্য অমোঘ শক্তিকে প্রার্থনা করিয়া সে সমস্ত দলের কল্যাণ সাধন করিত। বিঘাও কিন্তু নিজেই ছিল শক্তিমান। নিজের যাদুশক্তি বলেই সে যে কোন লোকের ইষ্ট বা অনিষ্ট করিতে পারে এই বিশ্বাস থাকাতে আমরা তাহার ভয়ে ভীত হইয়া থাকিতাম। মনে হইত, সে যেন মনুষ্যরূপী সর্প বা ব্যাঘ্র। ধবলকে সে মনে মনে অবজ্ঞা করে ইহাও আমরা জানিতাম। একদা সে গোধিকা-সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল শুনিয়াছিলাম। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে তাহারই অভিশাপে নাকি গোধিকা সম্প্রদায় মহামারী রোগে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর

পর্যটক মীংরার সহিত ইহার দেখা হয়। মীংরাই ইহাকে আমাদের দলে আনিয়াছিল, ধবলকে বলিয়াছিল, 'বিঘাও শক্তিশালী লোক, ইহাকে দলে রাখিলে অনেক আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, ইহার যাদুশক্তি তুচ্ছ করিবার মতো নহে, ইহাকে আশ্রয় দাও।' মীংরার কথাতেই ধবল বিঘাওকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম যে, বিঘাও ধবলকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে। অনেকের কাছে সে বলিত, 'যে লোক নিজে শক্তিমান নয়, কেবলমাত্র প্রার্থনা করিয়া দেবতার শক্তিকে কাজে লাগাইতে চায়, তাহার নেতৃত্ব নিরাপদ নয়। অক্ষম লোককে দেবতা দয়া করেন না, দেবতা কাহাকেও স্বেচ্ছায় দয়া করেন না, নিজের শক্তিবলে দেবতার দয়া আদায় করিয়া লইতে হয়। ধবলের সে শক্তি আছে কি-না সন্দেহ।' তাহার কথা-বার্তা আমরা সভয় বিস্ময়ের সহিত শুনিতাম। অনেকের মধ্যে এ ধারণাও হইয়াছিল যে ধবলের পরিবর্তে সে যদি আমাদের দলপতি হয় তাহা হইলে আমরা বোধ হয় নিরাপদ হইব। ধবল কিন্তু এসব বিষয়ে সচেতন ছিল না। সে ছিল আনমনা আপনভোলা লোক। কন্যা নদীর তীরে তীরে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ানোই ছিল তাহার প্রধান কাজ। পূর্বেই বলিয়াছি, সে কন্যা নদীর মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিত। তাহার আর একটি আকর্ষণও ছিল। নিনানি। নিনানিকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল, নিনানিকে সে ভয়ও করিত, তাই নিনানির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলেরও অন্ত ছিল না। বিঘাও ঠিকই ধরিয়াছিল। নিনানির সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই সে উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল।...নিনানিকে ধরাধরি করিয়া আমরা কুটিরের ভিতর লইয়া গেলাম। কয়েকটি রমণী তাহাকে ঘিরিয়া গান গাহিতে লাগিল। আমিও কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত গান গাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছিল। শিলাঙ্গীর সন্ধানে আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

...আকাশে অগণিত নক্ষত্র উঠিয়াছিল। আকাশে যে এত নক্ষত্র আছে নিবিষ্টচিত্তে এমনভাবে তাহা বোধ হয় আর কখনও দেখি নাই, কারণ এমন-ভাবে আর কখনও একাকী আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিবার সুযোগই মেলে নাই জীবনে। উন্মুক্ত প্রান্তরে ইতিপূর্বে বহুবার শয়ন করিয়াছি, কিন্তু একা নয়, সঙ্গে কেহ না কেহ থাকিত, তাহাকে লইয়াই মগ্ন থাকিতাম, আকাশের দিকে চাহিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল ধবল উহাদের দিকে চাহিয়া গভীর রাত্রে প্রার্থনা করে, কিন্তু সে প্রার্থনা কি কখনও সফল হওয়া সম্ভব? ধবলের ভাষা কি অতদূর পৌঁছায়? পৌঁছাইলেও কি তাহারা আমাদের মঙ্গল করিতে সক্ষম? অতগুলি নক্ষত্রের মধ্যে কে আমাদের বন্ধু কে শত্রু তাহা ধবল ঠিক করিতে পারে কি করিয়া? উহারা কত দূরে আছে কে জানে! উহারা কি আমাদের পরিচিত সূর্যের সগোত্র? সূর্যেরই কি সন্তানসন্ততি উহারা? তাহা হইলে দিনের বেলা

কোথা থাকে! বৃদ্ধা জিনা একটা গল্প বলিত তাহা মনে পড়িল। সে বলিত, সূর্যের দুইটি বিবাহ। তাহার একটি পত্নী দিবস। তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া সে সূর্যকে ছাড়িতে চাহে না, সন্তানকামনায় সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দ্বিতীয় পত্নী রাত্রি, তাহার অনেক সন্তান, সন্তানদের লইয়াই সে এত ব্যস্ত যে সূর্যের দিকে তাকাইবার অবসর পায় না। মাঝে মাঝে কিন্তু সূর্যকে দাবি করে সে। সন্ধ্যায় বা ঊষায় ঘনঘটা করিয়া ঝড়বৃষ্টি হইলে জিনা বলিত রাত্রির সহিত দিবসের কলহ বাধিয়াছে, রাত্রি দিবসের নিকট হইতে সূর্যকে ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে। জিনার গল্পটা বড় ভাল লাগিত, ভাল লাগিত বলিয়াই বোধ হয় বিশ্বাস করিতাম। বহু জন্ম পূর্বে আর একটা যে গল্প শুনিয়াছিলাম, ধর্ষিতা শবরী ওকার অশ্রু-বিন্দুগুলি আকাশের গায়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া জাগিয়া আছে, সে গল্প আর মনে ছিল না। নূতন গল্পে নূতন আস্থা স্থাপন করিয়া নূতন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, বিঘাও যাহা বলে তাহাই হয়তো ঠিক। গাছের শাখা ধরিয়া সজোরে টান দিলেই গাছ অবনত হইতে পারে, প্রার্থনা করিলে হইবে না। বহুকাল পূর্বে রাহুলাও ঠিক এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া বিষের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা মনে ছিল না। জোনাফুদিনের বিফলতাকে আমরা ক্ষমা করি নাই, কিন্তু সে কথাও মনে ছিল না। রাহুলা-জোনাফুদিনকে মনে না থাকিলেও জীবনযুদ্ধের তাড়নায় যুগে-যুগে জন্মজন্মান্তরে বারংবার আমরা যে দুইটি পথের সম্মুখীন হইতেছিলাম সে পথ দুইটিকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ তাহা মানব-সভ্যতার দুইটি দিক অলঙ্কৃত করিয়াছে। কোন্ পথটা সত্য তাহা আজও বোধ হয় সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত হয় নাই। একটি পথ শক্তির, আর একটি পথ ভক্তির। এক পথের পথিক রাহুলা, কাংড়া, বিঘাওরা, আর এক পথের পথিক জোনাফুদিন, ওবুকী, ধবলরা। কখনও রাহুলারা জিতিয়াছে, কখনও জোনাফুদিনরা। কখনও মনে হইয়াছে পুরুষকারই সত্য, কখনও আবার আমরা দৈবকে সত্যরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। সেদিন গভীর নিশীথে আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছিল ওই অগণিত নক্ষত্রদলে ক্ষীণকণ্ঠ ধবলের প্রার্থনা কি দিশাহারা হইয়া পড়িবে না? মনে হইতেছিল ধবল বোধ হয় ভুল পথে আমাদের লইয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছিল শক্তিশালী বিঘাওই বোধ হয় চালক হিসাবে অধিকতর সক্ষম। তাহার ক্ষমতা আছে। বৃদ্ধা জিনার মৃত্যু সংবাদ সে পূর্বেই টের পাইয়াছিল। আজই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, সে অহঙ্কৃতা নিনানির মস্তক তাহার কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত চরণের উপর টানিয়া আনিয়াছে। অভিশাপ দিয়া গোধিকা সম্প্রদায়কে সে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতেই হইবে। ক্ষমতাবান নেতারই তো প্রয়োজন আমাদের। আরও কিছুদিন পূর্বে যদি বিঘাও আসিত তাহা হইলে হয়তো আমাদের এত কষ্ট করিয়া কন্যা নদীর

তীরে আসিতে হইত না। সে হয়তো মন্ত্রবলে সেই সব জমিকে আবার শস্য-পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিত।

...আমি মাঠের মাঝখানে ঘন ফসলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শুইয়া-ছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া যদিও নানারূপ অসংলগ্ন চিন্তার ধারা মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল কিন্তু একটি চিন্তা যেন অনড় হইয়া মনের কেন্দ্রে বসিয়াছিল। ঠিক চিন্তা নয়, আকাঙ্ক্ষা। মার্জার যেমন মূষিকের গর্তের নিকট ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে আমিও তেমনি আমাদের ক্ষেত্রমধ্যস্থ গর্তটির পাশে ওৎ পাতিয়া শুইয়াছিলাম। প্রতিমুহূর্তে আশা করিতেছিলাম শিলাঙ্গী ওই গর্ত দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। আমার সমস্ত অন্তর ওই নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী আয়ত-নয়না উজ্জ্বল-দৃষ্টি সরলা কিশোরীকে ঘিরিয়া যেন স্বপ্নলোকে আরতি করিতেছিল। গরবিনী বুদ্ধিদীপ্তা নিনানির মধ্যে নারীত্বের যে স্বাদ পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহাও অপরূপ, তাহার মাদকতায় আমার সমস্ত সত্তা অভিভূত হইয়া পড়িত, কিন্তু শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল এরকমটি আর কখনও দেখি নাই। তাহার সরল সাহস, তাহার অকপট সত্যভাষণ, বন্য গাভীর মুখে সবুজ ঘাস তুলিয়া দিবার জন্য দুরূহ অভিযান, সর্বোপরি আমার পৌরুষ সম্বন্ধে তাহার ঔদাসীন্য তাহাকে এমন একটা মহিমা দান করিয়াছিল যাহা আমি আর কখনও দেখি নাই। ইচ্ছা করিলে সে আমার পশু প্রবৃত্তিকে অনায়াসে উত্তেজিত করিতে পারিত কিন্তু সেদিকে তাহার যেন লক্ষ্যই ছিল না। মনে হইতেছিল সে যেন তাহার আসন্ন যৌবন বিষয়ে সচেতন নয়। তাহার মুঞ্জরিত দেহ-শ্রীর সহিত বালিকাসুলভ একটা উৎসুক কৌতুকশীলতা যুক্ত হইয়া এমন একটা অনন্যতার সৃষ্টি করিয়া-ছিল যে আমার বন্য প্রকৃতি তাহাকে অধিকার করিবার জন্য অধীর উন্মুখ না হইয়া পারে নাই। আমার প্রকৃতির মধ্যেও একজন উৎসুক বালক বাস করিত। যে কারণে আমি সদ্যোজাত গোবৎসটি লাভ করিবার জন্য আগ্রহা-ন্বিত হইয়াছিলাম ঠিক সেই কারণেই আমি শিলাঙ্গীকেও চাহিয়াছিলাম। আমার ক্রীড়াপ্রবণ চরিত্র তাহার মধ্যে একজন ক্রীড়াসঙ্গিনীকে আবিষ্কার করিয়াছিল, যে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ নয়, পাশবিক ক্ষুধার ক্রীড়নক মাত্র নয়, যাহার মন নিত্য নব ঔৎসুক্যে নিত্য নব উৎসাহভরে দৈনন্দিন জীবনের অতি-পরিচিত সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়াই আনন্দলাভ করে।

...কন্যা নদীর পশ্চিম তীরে আমাদের তৃণক্ষেত্রটি উন্নগা পর্বতের পাদ-মূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরিসরে নিতান্ত কম ছিল না। একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাইত না। এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে শিলাঙ্গীর গর্তটি খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়া-ছিল। শশক অথবা শজারুর গর্ত অনুসন্ধান করিতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, শিলাঙ্গীর গর্তের মুখ নিতান্ত ছোট ছিল না, তবু তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক সময় লাগিল, কারণ মুখটি তৃণাচ্ছাদিত ছিল, এক বোঝা

সবুজ ঘাস দিয়া মুখটি কে যেন বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছিল, যাহাতে সহসা দেখিলে মনে হয় উহা ক্ষেতেরই একটা অংশ। বোঝার তৃণগুচ্ছ কিন্তু জীবন্ত তৃণের মতো সতেজ ছিল না, তাহাদের ম্রিয়মাণ মূর্তি দেখিয়াই আমি সেই-দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর চাতুরী আমার নিকট ধরা পড়িয়া যাওয়াতে খুবই কৌতুকবোধ করিয়াছিলাম, ইহাতে তাহাকে পাইবার আগ্রহটা আরও যেন বাড়িয়া গিয়াছিল।

...রাত্রি কত হইয়াছিল জানি না। অপেক্ষা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর স্পর্শেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

শিলাঙ্গী হাসিয়া বলিল, "আমাকে ধরিবে বলিয়াই এখানে আসিয়া শুইয়াছ নিশ্চয়। কিন্তু আমি যদি চলিয়া যাইতাম তুমি জানিতেও পারিতে না। এই তো তোমাদের পাহারা দেওয়ার নমুনা—"

দেখিলাম শিলাঙ্গী কয়েকটি ছোট ছোট তৃণগুচ্ছ আলাদা আলাদা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার কোমরে একটা বড় লতা জড়ানো ছিল। সেই লতায় তৃণগুচ্ছগুলি সে পৃথক পৃথকভাবে বাঁধিতে লাগিল।

"অমন করিয়া বাঁধিতেছ কেন?"

"বোঝা বড় হইয়া গেলে গর্তের ভিতর ঢোকে না। এইভাবে বেশ সহজে লইয়া যাওয়া যায়। লতাটা কোমরে বাঁধা থাকে, সুড়ঙ্গের ভিতর আমি যখন বুকে হাঁটিয়া চলি ঘাসের ছোট ছোট বোঝাগুলি আমার পিছনে পিছনে আসে। আজ দেখিলাম বাছুরটাও একটু একটু ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার জন্য কচি কচি ঘাস লইয়াছি কিছু। এই দেখ!"

তিনটি ছোট ছোট ঘাসের বোঝা সে তুলিয়া ধরিল। এমন সহজ আনন্দে সে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল যেন সে আমাদের তৃণশস্য এমনভাবে অপহরণ করিয়া কোনও অন্যায় করে নাই। আমি যে তাহার শত্রুপক্ষ, ইচ্ছা করিলে এখনই যে আমি তাহাকে বন্দী করিতে পারি বা মারিয়া ফেলিতে পারি এসবের আভাসমাত্রও তাহার চোখের দৃষ্টিতে বা কণ্ঠস্বরে ছিল না। পরিচিত বন্ধুর নিকট সে যেন মনের আনন্দে গল্প করিয়া চলিয়াছে। আমার কথায় সে কিন্তু বিস্মিত হইল। আমি বলিলাম, "এ ঘাস কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে দিব না।"

"কেন?"

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার বিস্মিত নয়নযুগল হইতে চন্দ্রালোকও যেন প্রতিফলিত হইয়া নীরব ভাষায় আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল—কেন?

"তুমিই বল না আমাদের ঘাস তোমাকে লইয়া যাইতে দিব কেন? এ ঘাস সাধারণ ঘাস নয়। ইহারা আপনাআপনি হয় নাই। ইহাদের উৎপন্ন করিতে আমাদের মেয়েদের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহারা এই বিস্তৃত ভূমি খুঁড়িয়াছে—একবার নয়, বার বার খুঁড়িয়াছে—তাহার পর বীজ বুনিয়াছে।

বীজ যাহাতে অঙ্কুরিত হয় তাহার জন্য উপবাস করিয়া পূজা করিয়াছে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে আমরা বেড়া দিয়া সমস্ত মাঠটা ঘিরিয়াছি, দিবারাত্রি পাহারা দিতেছি। সেই ঘাস তুমি আসিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড।"

আমার কথা শুনিয়া সে একটুও অপ্রতিভ হইল না। বরং তাহার কণ্ঠস্বরে একটা তর্কের সুর ফুটিয়া উঠিল।

"অদ্ভুত কাণ্ড তো তোমরাই করিয়াছ। কোথা হইতে আসিয়া আমাদের গরুদের জমিগুলিতে বেড়া ঘিরিয়া নিজেদের দখল জমাইয়া বসিয়াছ। তাহারা এখন খাইবে কি বল? তুমি কি বলিতে চাও আমার দুধুনী মধুনী না খাইয়া মারা যাইবে? এ জমি তাহাদের, এ জমির ঘাসও তাহাদের। তাহারাই জমির আদিম মালিক। তোমরা হঠাৎ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বলিয়া কি তাহাদের দাবি লোপ পাইবে?"

আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম, "যাহার জোর বেশি তাহারই দাবি টিকিবে। গরুর দাবির চেয়ে মানুষের দাবি যে অনেক বেশি একথা কি তুমি জান না?"

"জানিলেও মানিতে রাজী নই"—শিলাঙ্গী হাসিয়া উত্তর দিল, "তা ছাড়া, আর একটা কথাও তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে দাবিটা ঠিক গরুর নয়, দাবিটা মানুষেরই। ওই গরুর দলের পিছনে আমরা আছি। আজ তুমি যদি আমার ঘাস কাড়িয়া লও এবং সে কথা আমি যদি রোহাকে গিয়া বলি রোহা তোমাদের আসিয়া আক্রমণ করিবে, হয়তো তোমাদের এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে। তোমাকে তো বলিয়াছি যে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমি গিয়া যদি আজ বলি—"

"মনে কর তোমাকেই যদি যাইতে না দিই—"

"আমাকে ধরিয়া রাখিবে? বেশ তো।"

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টি আগ্রহে আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল। বিপজ্জনক একটা ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত প্রাণশক্তিই যেন উন্মুখ একাগ্র হইয়া উঠিল। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। শিলাঙ্গী একটুও ভয় পাইল না। আমার আশা ছিল ভয় পাইলে সে হয়তো আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। শিলাঙ্গীর প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া আমার এত ভালো লাগিল যে আমি আর কোনও কথা বলিতে পারিলাম না, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম কেবল।

শিলাঙ্গী বলিল—"বেশ চল, তোমাদের দলপতির সহিত আলাপ করিয়া ফেলি। এখন ফিরিয়া যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। চল তোমাদের কাছেই রাতটা কাটাইয়া যাই।"

"ফিরিয়া যাওয়া নিরাপদ নয় কেন?"

"একটু আগেই যে ভীষণ শব্দ হইল তাহা শুনিতে পাও নাই?"

"না। কিসের শব্দ?"

শিলাঙগী হাসিয়া ফেলিল।

"বাঘের গর্জনেও তোমার ঘুম ভাঙে নাই! সমস্ত পাহাড়টা কাঁপিয়া উঠিল আর তুমি ঘুমাইতেছিলে! চল, তোমাদের দলপতিকে গিয়া বলি যে, তোমার মতো নিদ্রালু লোক যদি ক্ষেত পাহারা দেয় তাহা হইলে ক্ষেতের ফসল একটিও থাকিবে না। আমরাই আসিয়া সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইব।"

আমি মনে মনে সত্যই অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবু বলিলাম, "আজ আমার পাহারা দেওয়ার পালা নয় তাই আমি ঘুমাইতেছিলাম। এখানে আসিয়া শুইয়াছিলাম তোমাকে ধরিব বলিয়া।"

"কিন্তু আমি তোমাকে না জাগাইলে কি আমাকে ধরিতে পারিতে?"

"আমি জানিতাম, তুমি আমাকে জাগাইবে।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"এ খবর তোমার চোখের দৃষ্টিতে কাল দেখিয়াছিলাম।"

"সত্য না কি!"

তাহার বিস্ফারিত নয়নে সরল বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর সহসা আমার হাত দুইটি ধরিয়া অকৃত্রিম আনন্দ সহকারে সে বলিল, "তুমি ঠিক ধরিয়াছ কিন্তু। তোমাকে আমার এত ভালো লাগিয়াছে যে আজ বাহির হইবার পূর্বেই আমি মনে মনে ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে যেমন করিয়া হোক তোমার সহিত আমি দেখা করিবই! তোমাকে যদি এখানে না পাইতাম তাহা হইলে হয়তো তোমাদেরই পল্লীতে গিয়া তোমার অনুসন্ধান করিতাম। একথা আমার চোখ দেখিয়াই তুমি কাল বুঝিতে পারিয়াছিলে?"

"না পারিলে এমনভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতাম না। আমি ইহাও আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে আমাকে এখানে না পাইলে তুমি হয়তো পল্লীর ভিতরে যাইবে। তাই এখানে আসিয়া শুইয়াছিলাম।"

"তোমাদের পল্লীর ভিতরে গেলে ক্ষতি কি? তোমাদের দলপতি লোক ভাল নয়?"

"ধবল লোক ভাল, কিন্তু দলপতি ছাড়াও আরও নানা ধরনের লোক আছে তো! কাহার মাথায় কি কুমতলব জাগিবে কে বলিতে পারে। তোমার এমন রূপ, আমাদের দলে অবিবাহিত যুবকের সংখ্যাও কম নয়, কেহ হয়তো তোমাকে দখল করিয়া বসিবে।"

"ইস, আমাকে দখল করা অত সহজ নয়। আমি বাঘকে পর্যন্ত ভয় করি না। এখনই তো বাঘের ঠিক পাশ দিয়া চলিয়া আসিলাম, বাঘ আমার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এমন আরও অনেকবার ঘটিয়াছে।"

"এখন তুমি বাঘের পাশ দিয়া আসিয়াছ? বল কি! কোথায় বাঘ—"

"উন্নগা পাহাড়ের উপত্যকায়। এই সুড়ঙ্গের অপর মুখটা যেখানে আছে ঠিক তাহার পাশেই একটা বাঘ হরিণ মারিয়াছে। আমি যখন উপত্যকার ঠিক মাঝখানে তখন চাঁদও ঠিক পাহাড়ের মাথায়। জ্যোৎস্নায় সমস্ত উপত্যকাটা

ভরিয়া গিয়াছিল। আমি দেখিলাম সুড়ঙ্গের কাছে একদল হরিণ চরিতেছে। আমি গাছের ছায়ায় ছায়ায় আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেক দিন হইতেই আমার একটি হরিণ শাবক পুষিবার ইচ্ছা আছে, ভাবিলাম যদি উহাদের দলে হরিণ শাবক থাকে তাড়া করিব। কচি শিশু নিশ্চয়ই আমার সহিত ছুটিয়া পাল্লা দিতে পারিবে না। ঠিক ধরিয়া ফেলিব। প্রায় যখন উহাদের কাছাকাছি আসিয়াছি তখন একটা গাছের উপর হইতে বাঘটা উহাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল এবং একটা হরিণকে ঘায়েল করিল। তাহার পর হরিণটাকে টানিতে টানিতে সুড়ঙ্গের ধারে আনিয়া ভীষণ গর্জন করিল একটা। তুমি নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমাইতেছিলে তাই গর্জনটা শুনিতে পাও নাই। গর্জন করিয়া সেই-খানেই বসিয়া পড়িল বাঘটা, বসিয়া হরিণের রক্তপান করিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাঘ কিছুতে ওঠে না। আমি দেখিলাম দাঁড়াইয়া থাকিলে সময়মতো এখানে পৌঁছিতে পারিব না, সকাল হইয়া যাইবে। তখন আমি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বাঘের কাছাকাছি যখন আসিয়াছি তখন বাঘটা ঘাড় তুলিয়া আমার দিকে একবার তাকাইল, আমিও তাহার চোখে চোখ রাখিয়া তাকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাঘটা আবার আহারে মনোনিবেশ করিল। আমি ঠিক তাহার পাশ দিয়া আসিয়া সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম। আরও কয়েকবার বাঘের সামনে পড়িয়াছি। দেখিয়াছি তাহাদের ভয় না করিলে তাহারা কিছু বলে না।

বলিতে বলিতে গর্বে তাহার চক্ষু দুইটি যেন আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মানুষ কিন্তু বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। বাঘকে বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস করিও না।"

"নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিব। বিশ্বাস করিয়া দুই-একবার ঠকিয়াছি বটে, কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতককে শাস্তি দিতেও ছাড়ি নাই।"

তাহার কালো চোখের তারায় প্রতিফলিত জ্যোৎস্নালোক যেন কৌতুকে নাচিতে লাগিল।

"শাস্তি দিবার শক্তি তোমার আছে? কিন্তু মনে হয় না। ধর, আমি যদি এখন তোমাকে আক্রমণ করি তুমি কি করিবে?"

বহু জন্ম পূর্বে জোলমাকেও ঠিক এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। জোলমা সমুচিত উত্তরও দিয়াছিল। কিন্তু সে প্রশ্ন আর সে উত্তর বিস্মৃতির অতলে হারাইয়া গিয়াছিল। সেই পুরাতন আমি যে নূতন মঞ্চে পুরাতন নাটকেরই নব-রূপ দান করিতেছি তাহা মনে ছিল না। তন্বী শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল উহার গায়ে আর কত শক্তি থাকিতে পারে? হাতটা যদি সজোরে চাপিয়া ধরি, ছাড়াইয়া লইতে পারিবে না।

"করিয়াই দেখ না।"

মৃদু হাসিয়া শিলাঙ্গী উত্তর দিল।

উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিলাম।

পর মুহূর্তে কিন্তু যাহা ঘটিল তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শিলাঙ্গী ছিটকাইয়া সরিয়া গেল এবং পর-মুহূর্তেই দেখিলাম একটা ফাঁস আমার গলদেশে লাগিয়া শ্বাসরোধ করিতেছে।

"কি করিতেছ, ছাড় ছাড়, আমার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে।"

শিলাঙ্গী দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

"আর একটু জোরে যদি টানি চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া যাইবে। বড় বড় গরু আমাদের এই ফাঁসে আটকাইয়া কাবু হইয়া পড়ে।"

"খুলিয়া দাও, বড় কষ্ট হইতেছে।"

"শপথ কর আর কখনও আমার গায়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত দিবে না।"

শপথ করিলাম।

"তিনবার কর।"

তিনবার করিলাম। তবু শিলাঙ্গী আমাকে বন্ধনমুক্ত করিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না, দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। ফাঁসটা এমনভাবে আটকাইয়া গিয়াছিল এবং দড়িটা এত শক্ত যে আমি চেষ্টা করিয়াও তাহা খুলিতে পারিলাম না। আমার ব্যর্থ প্রয়াস শিলাঙ্গীর হাসির খোরাক জোগাইতে লাগিল কেবল। অবশেষে করুণকণ্ঠে আবার মিনতি করিতে হইল।

"শপথ তো করিয়াছি, এইবার খুলিয়া দাও।"

"তোমাকে আর একটা শপথ করিতে হইবে।"

"কি বল?"

"শপথ কর যে তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে।"

"তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আমি নিজেই উৎসুক, ইহার জন্য শপথ করিবার প্রয়োজন নাই।"

"তবু শপথ কর। মুখের বন্ধুত্ব আমি চাই না, সে রকম বন্ধুত্ব অনেকের সহিত আছে, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব চাই।"

সেদিন গভীর রাত্রে চন্দ্রালোকিত শ্যামল ক্ষেত্রে বসিয়া শিলাঙ্গীর এই দাবি বড় অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। আজও অদ্ভুত মনে হইতেছে। মনে হইতেছে ইহাই বোধ হয় পুরুষের কাছে নারীর চিরন্তন দাবি। তখনকার দিনে মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি শস্যক্ষেত্র, তাহারই মধ্যস্থলে আমি বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম, আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছিল একটি অপরিচিতা তন্বী কিশোরীর উপর, আর সে আমার জীবনের বিনিময়ে দাবি করিতেছিল প্রকৃত বন্ধুত্ব। আজও কি অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

"প্রকৃত বন্ধুত্ব বলিতে তুমি ঠিক কি বোঝ তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি সত্যই তোমার বন্ধু হইতে চাই তাহা শপথ করিয়া বলিতেছি। আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর।"

"আমার যাহাতে অপমান বা অমঙ্গল হয় তাহা তুমি ইচ্ছা করিয়া কখনও

করিবে না—ইহাকেই আমি প্রকৃত বন্ধুত্ব বলি। এরকম বন্ধু আমার একজনও নাই। অনেকেই আমাকে বিবাহ করিতে চায়, অনেকে আমাকে লইয়া একটু মজা করিতে চায়, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু আমার একজনও নাই। তুমি হইবে?"

"হইব। তোমার নিকটও আমি এই দাবি করিতে পারি কি?"

"নিশ্চয়—।"

শিলাঙ্গী আসিয়া আমার গলার ফাঁস খুলিয়া দিল। শুধু তাই নয়, ছুটিয়া আসিয়া বাহুদ্বারা কণ্ঠবেষ্টন করিয়া সে আমার ক্রোড়ের উপর উপবেশন করিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে এক অপূর্ব কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জোলমার নিস্পৃহতা আমার পৌরুষকে একদিন কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল। শিলাঙ্গীর আগ্রহ সেদিন আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। জোলমার নিস্পৃহতা তাহাকে রহস্যময়ীও করিয়াছিল, শিলাঙ্গীর অতি-সরলতাও তাহাকে কম রহস্যময়ী করে নাই। আমি তাহার সম্বন্ধে আকুল হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কারণ সে যুগেও যে মানব-চরিত্রের সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম তাহাতেও কপটতার খাদ থাকিত। পশুত্বের স্তর হইতে যতই আমরা সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইতেছিলাম ততই আমাদের সারল্য অবলুপ্ত হইতেছিল। আমাদের জীবনধারণ পদ্ধতির সহিত তাল রাখিয়া আমাদের চরিত্রও জটিল হইতেছিল। কাহাকেও ভাল লাগিলে সে যুগেও আমরা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে পারিতাম না—"আমি তোমার বন্ধুত্ব কামনা করি।" কাহারও উপর ক্রোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণও আমরা করিতাম না। শত্রুর সহিতও হাসিমুখে আলাপ করিবার পদ্ধতি আমরা শিখিয়াছিলাম। তাই শিলাঙ্গীকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই, তাহার সরলতার পূর্ণ মূল্য দিতে পারি নাই। শিলাঙ্গী যদি নারী না হইয়া পুরুষ হইত, তাহা হইলে তাহার এই আচরণে হয়তো আমি বিস্মিত হইতাম, হয়তো ভয় পাইতাম, হয় তো তাহাকে কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতাম। শিলাঙ্গী নারী বলিয়া তাহার আচরণের একটি অর্থ সেদিন আমার চক্ষে প্রতিভাত হইল—সে আমার পৌরুষকে কামনা করিয়াছে। প্রকৃত বন্ধুত্বের অন্য কোনও অর্থ করিতে পারি নাই সেদিন। তাই পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলাম, "তোমাদের দলের লোক যদি আমাদের সহিত শত্রুতা করে তাহা হইলেও তুমি আমার বন্ধু থাকিবে তো?"

শিলাঙ্গী বলিল, "নিশ্চয়। আমাদের দলের সহিত তোমাদের যাহাতে শত্রুতা না হয় সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে। রোহার সহিত যদি ভাব করিতে পার তাহা হইলে সহজেই তাহা হইয়া যাইতে পারে। রোহার কাছে চল না একদিন। রোহা যখন একা থাকিবে তখন তাহার সহিত দেখা করিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই। রোহা লোক খুব ভাল।"

"কি করিয়া জানিব কখন কোথায় সে একা থাকে।"

"সেটা জানা মুশকিল বটে। তবে প্রত্যহই সে খানিকটা সময় একা থাকে।

আমাদের গরুরা নিগম বনে এখন আছে, সেখানে একা একা সে প্রায়ই যায়। সেইখানে আমি তোমাকে একদিন লইয়া যাইব। কিন্তু কোথায় তোমাকে খবর দিব? উন্নগা পাহাড়ে যেখানে তোমার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল সেইখানে তুমি যদি দুপুরে যাও, আমিও আসিব। দূরে কে যেন আসিতেছে একজন—"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম। সত্যই দূরে একটি মনুষ্যমূর্তি দেখা যাইতেছিল। সন্দেহ হইল হয় তো নিনানি।

শিলাঙগীকে বলিলাম, "তুমি এখন চলিয়া যাও। আমি কাল তোমার সহিত দেখা করিব।"

"যে আসিতেছে তাহার সহিত যদি আলাপ করি ক্ষতি কি। তুমি যদি আমাকে নিজের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দাও—"

আমি শিলাঙগীকে কথা শেষ করিতে দিলাম না।

"কে আসিতেছে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি এখন যাও। আলাপের ব্যবস্থা পরে করিব। আমাদের দুই দলের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব হয় আলাপ তো হইবেই। এখন কিন্তু ও যদি তোমাকে এইভাবে দেখে—বিশেষত তুমি আমাদের শস্য কাটিয়া লইয়াছ—তাহা হইলে সমূহ গোলযোগের সম্ভাবনা। তুমি এখন যাও—"।

"বেশ। তুমি তাহা হইলে ঘাস দিয়া গর্তের মুখটা বন্ধ করিয়া দাও।"

একটু অনিচ্ছাভরেই শিলাঙগী চলিয়া গেল। সরীসৃপের মতো গর্তের মধ্যে ঢুকিল, ছোট ছোট তৃণগুচ্ছগুলিও তাহার অনুসরণ করিল। যে ঘাসের বোঝাটা দিয়া আগের দিন গর্তের মুখ ঢাকা ছিল সেইটা দিয়াই মুখটা বন্ধ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু মনে হইল তাহা সমীচীন হইবে না, মুখটা খোলাই থাক। গভীর রাত্রে আমার এখানে অবস্থানের কারণটা তাহা হইলে দেখাইতে পারিব।

নিনানিই আসিতেছিল। সে কাছাকাছি আসিতেই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিনানির চুল আলুলায়িত। আমাকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি এখানে! আমি কতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে খুঁজিতেছি। তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?"

বলিলাম, "দেখিলাম এখানকার তৃণগুলি খুব বেশি নড়িতেছে। ভাবিলাম হয় তো ছাগল বা গরু ঢুকিয়াছে। কিন্তু আসিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল এই গর্তটা দেখিতেছি। বোধ হয় ইঁদুর কিম্বা খরগোসের গর্ত!"

নিনানি গর্তের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করিল না।

বলিল, "আমি কন্যা নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াছি। ধবলের প্রমাতামহের আদেশ আমি মানিতে পারিলাম না। জানি সে প্রতিশোধ লইবে, তবু মানিতে পারিলাম না। বিঘাওয়ের পায়ের পুঁজরক্ত আমি মাথায় করিয়া থাকিতে পারিব না। ইহার অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল। যে-কোনও মুহূর্তেই

হয় তো আমার মৃত্যু হইবে, তাই যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি তোমার কাছেই থাকিব।"

এই বলিয়া সে আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। দেখিলাম সে কাঁপিতেছে।

"কখন তুমি স্নান করিলে?"

"একটু আগে।"

"আর কেহ কি তোমাকে স্নান করিতে দেখিয়াছে?"

"না। আমার যখন মূর্ছা ভাঙিল তখন উঠিয়া দেখি সকলে ঘুমাইতেছে। তোমাকে খুঁজিলাম কিন্তু পাইলাম না। একাই তখন বাহির হইয়া আসিলাম। কেবল জিগা আমার সঙ্গে ছিল।"

ধবলের কুকুরের নাম জিগা।

"জিগা কোথায়?"

"তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। জিগার সঙ্গও আমার ভাল লাগিল না। বিঘাওয়ের পুঁজরক্ত মাথায় মাখিয়া আমি খোলা আকাশের নীচে আসিয়া দাড়াইলাম। মনে হইল আকাশের জ্যোৎস্নাও আমার কেশ স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করিতেছে, মনে হইল পৃথিবীর সর্বত্রই চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে আর সমস্ত অন্ধকার আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে আমার মাথায়, আমার পুঁজরক্তমাখা কেশে। মনে হইল ইহার অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। ধবলের প্রেতাত্মা যদি আমাকে মারিয়া ফেলিতে চায় মারিয়া ফেলুক। অপরাজিতা বংশের কন্যা আমি, এত প্লানি বহন করিয়া বাঁচিতে চাই না। এই কথা মনে হওয়ামাত্র আমি কন্যা নদীতে নামিয়া অবগাহন করিলাম। এইবার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে না তো?"

"না—"

নিনানি উৎসুক নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিলাম তাহার অধরে আবার মৃদু মৃদু হাসিও ফুটিতেছে।

"আমার চুলে হাত দিয়া দেখ, একটুও পুঁজরক্ত নাই। কন্যা নদীর জলে বার বার ধুইয়াছি। হাত দিয়া দেখ না একবার।"

তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাহার পর বলিলাম, "চল, এবার ফিরি—"

"কোথায় ফিরিব?"

"ঘরে চল—"

"সকলে যদি জানিতে পারে যে আমি বিঘাওয়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্নান করিয়াছি, তাহা হইলে কি তাহারা আমাকে ঘরে থাকিতে দিবে?"

"তুমি যদি ঘরে থাকিতে চাও তাহা হইলে আপত্তি করিবার সাহস কাহারও হইবে না। তুমি দলপতি ধবলের পত্নী একথা ভুলিয়া যাইতেছ কেন?"

"ভানা, টুলা, কিম্বা, বেসু—ইহারাও ধবলের পত্নী। তোমরা ইহাদের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছ তাহা মনে হয় না। সেদিন ঠেঠরা ধবলের সম্মুখেই

টুলাকে প্রহার করিল, ধবল তো কিছুই বলিল না। তোমরাও সকলে চুপ করিয়া ছিলে। একমাত্র আমিই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে নির্যাতন করিলে কেহই প্রতিবাদ করিবে না জানি। কারণ আমি সকলেরই চক্ষুশূল।

"আমি প্রতিবাদ করিব। আমি বাঁচিয়া থাকিতে কেহই তোমাকে অপমান করিতে পারিবে না। তা ছাড়া, আর একটা কথা। তুমি যে স্নান করিয়াছ একথা কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন কি। কেহ যখন তোমাকে স্নান করিতে দেখে নাই তখন চুপচাপ থাকাই ভাল। দেখাই যাক না কি হয়।"

"আমার মাথার চুলই যে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। আমার চুল। দেখিবামাত্র সকলে বুঝিতে পারিবে যে আমি স্নান করিয়াছি।"

সহসা আমার মাথায় একটা প্রেরণা আসিল।

আমি বলিলাম, "চল, তোমার মাথার চুল আমি ঢাকিয়া দিব—"

"ঢাকিয়া দিবে? কিরূপে তাহা সম্ভব!"

"গাছের সরু সরু ডাল ও পাতার সাহায্যে।"

কথাটা বলিয়া আমি নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। সহসা-উদ্বুদ্ধ কল্পনা আমাকে নিমেষে যেন নূতন লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। কল্পনানেত্রে আমি নিনানির মস্তকে শাখা-পত্র-নির্মিত শিরস্ত্রাণটা যেন দেখিতে পাইলাম। নিনানিকে আমি যে ভালবাসি, শিলাঙ্গীকে ভাল লাগিয়াছে বলিয়া সে ভালবাসা যে এতটুকু ম্লান হয় নাই সহসা তাহা যেন উপলব্ধি করিলাম। তাহার দুঃখ, তাহার আতঙ্ক, তাহার বিচূর্ণিত আত্মসম্মান, আমার উপর তাহার আন্তরিক নির্ভরশীলতা আমার পৌরুষকে একাগ্র করিয়া তুলিল। সেই একাগ্রতাই বোধ হয় আমাকে স্রষ্টাপদেও উন্নীত করিল। প্রেমের প্রেরণায় আমি এমন একটা সৃষ্টিকর্মে মাতিয়া উঠিলাম যাহা ভবিষ্যতে যুগান্তকারী বলিয়া বিঘোষিত হইবে। তখন কিন্তু চুপড়ি বা ঝুড়ির সম্ভাবনা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। অপমানিতা নিনানিকে রক্ষা করিবার জন্য আমার কল্পনা তখন উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল, তাহার সম্বৃত কেশপাশ বেষ্টন করিয়া শাখা-পত্রের আবরণ সৃজন করিতেছিল, তাহার পরিণামের কথা ভাবে নাই। উন্নগা পর্বতের সানুদেশে আমাদের জমির প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল। সেই গাছটা দেখাইয়া নিনানিকে বলিলাম, "চল, আমরা ওই গাছের তলায় যাই। ওখানে গিয়া এখনই তোমার মাথা ঢাকিয়া দিব।"

নিনানি আবদার-মাখা কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না। আমাকে তুমি তুলিয়া লইয়া চল।"

নিনানিকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। হাঁটিতে হাঁটিতেই ঠিক করিয়া ফেলিলাম কি-করিয়া তাহার মাথার চুল ঢাকিব। চুলগুলি প্রথমে চূড়া করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে। তাহার পর তাহার কপালে একটা লতার বেষ্টনী দিব, তাহার পর চুলের চূড়ায় সরু সরু গাছের ডাল বাঁধিয়া সেই ডালগুলি নোয়াইয়া আনিয়া সেই লতা-বেষ্টনীতে আটকাইয়া দিব। খুব ঘন ঘন করিয়া দিতে

হইবে, যাহাতে চুল না দেখা যায়। ডালের ফাঁকে ফাঁকে পাতা গুঁজিয়া দিলে একেবারেই দেখা যাইবে না। কল্পনার উন্মাদনায় আমি অতিশয় দ্রুতবেগে গাছের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গাছের তলায় পৌঁছিতে খুব বেশি সময় লাগিল না, স্কন্ধারূঢ়া নিনানির ভার আমাকে ক্লান্তও করে নাই, আমি কল্পনার পাখা মেলিয়া যেন উড়িয়া চলিয়া গেলাম। গাছের তলায় দেখিলাম ঘন অন্ধকার। কেবল একটি স্থানে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। নিনানিকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া বলিলাম, "তুমি ওই চাঁদের আলোয় বস। আমি গাছের উপর উঠিয়া শাখা-পত্র সংগ্রহ করি। একটি লতাও সংগ্রহ করিতে হইবে।"

"লতা? লতা লইয়া কি করিবে?"

"দেখিতেই পাইবে।"

"ও বুঝিয়াছি।"

নিনানির চোখে হাসির দীপ্তি ফুটিল। আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম। গাছে এক ঝাঁক বক বসিয়াছিল। আমি গাছে উঠিতেই তাহারা 'ওয়াক্ ওয়াক্' শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখি তাহারা মাথার উপর চক্রাকারে উড়িতেছে। কৃষ্ণ-আকাশের পটভূমিকায় চন্দ্রালোকে সেই শ্বেতপক্ষ বিহঙ্গম দল আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিল। আমি মুগ্ধনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটা উদ্ভট উপমাও মনে জাগিল। হঠাৎ মনে হইল জ্যোৎস্না বোধ হয় বিহঙ্গ-রূপ ধরিয়া এই বৃক্ষে আসিয়া বসিয়াছিল! দেখিতে দেখিতে বকের দল দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আমি ডাল ও পাতা সংগ্রহে মন দিলাম। ডাল ও পাতার বোঝা লইয়া নীচে নামিয়া দেখি নিনানি নাই।

কোনও সাড়া পাইলাম না।

"নিনানি—"

তবু কোনও সাড়া নাই। কোথায় গেল সে? সহসা শিলাঙ্গীর কথা মনে পড়িল। কাছেই কোথায় যেন বাঘ বাহির হইয়াছে!

"নিনানি—"

"আঃ, অত চীৎকার করিতেছ কেন। আমি লতা সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম। দেখ, এই লতায় হইবে কি না।"

"কোথায় গিয়াছিলে?"

"পাহাড়ের উপর। নীচে কোথাও পাইলাম না। পাহাড়ের উপরও পাই নাই, একটি মেয়ে আমাকে দিল।"

"মেয়ে? কাহাদের মেয়ে?"

"তুমি যাহাদের কথা বলিতেছিলে, পাহাড়ের ওপারে যাহারা থাকে, যাহারা গরুর দুধ পান করে তাহাদের মেয়ে। নাম বলিল শিলাঙ্গী। মেয়েটি একটি লতায় ঘাসের কয়েকটি ছোট ছোট আঁটি বাঁধিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে-

ছিল, আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর আমার কাছে আগাইয়া আসিল। আসিয়া প্রশ্ন করিল—আমি এমনভাবে একা দাঁড়াইয়া আছি কেন। আমি বলিলাম—আমার একটা লতার দরকার, তাহাই খুঁজিতে আসিয়াছি। সে বলিল—এখন পাহাড়ে লতা খোঁজা নিরাপদ নয়। বাঘ বাহির হইয়াছে। তোমার যদি বিশেষ দরকার থাকে আমার এই লতার খানিকটা অংশ লও। এই বলিয়া সে দাঁত দিয়া খানিকটা লতা ছিঁড়িয়া আমাকে দিল। দিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল। বেশ মেয়েটি। দেখ, এই লতায় হইবে কি না।"

আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর সহিত নিনানির দেখা হইয়াছে! এখন হইলে বলিতাম বিধাতার কি অদ্ভুত পরিহাস। কিন্তু তখন বিধাতার সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না, তাই এই ধরণের কথা মনে হইল না। কিন্তু এই অদ্ভুত যোগাযোগের বিস্ময়টা আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। মনে হইল একটা অজানা ইঙ্গিত আমাকে কি যেন বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বহুকাল পরে বুঝিয়াছিলাম, তাহাও অস্পষ্টভাবে।

"অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন?"

"বাঘ বাহির হইয়াছে না কি?"

আমার নীরব বিস্ময়ের হেতুটা বাঘের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া চক্ষু দুইটি আর একটু বিস্ফারিত করিলাম।

"তোমার তো বাঘকে ভয় পাইবার কথা নয়। তুমি বাহির হইয়াছ শুনিলে বাঘেরই বরং ভয় পাইবার কথা। কন্যা নদীর তীরে আসিবার পথে কুঠারের এক আঘাতে তুমি যে প্রকান্ড বাঘটাকে মারিয়াছিলে তাহার প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই তোমার সম্বন্ধে সমস্ত বাঘদের সাবধান করিয়া দিয়াছে। নাও, এখন কি করিবে কর, আমার বড় ক্লান্ত লাগিতেছে।"

"যেখানে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ওইখানে বস।"

নিনানি গিয়া সেই আলোকিত স্থানটিতে উপবেশন করিল। সেই বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষতলে গভীর রাত্রে জমাট অন্ধকারের পটভূমিকায় নিনানিকে বড় অদ্ভুত দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল, সে-ই যেন মূর্তিমতী আলোক, জমাট অন্ধকারের বুকে বসিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা
নদীতে অবগাহন করিয়া সত্যই সেদিন সে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছিল। তাহা যে কত বড় বিদ্রোহী মনের পরিচয় তাহার স্বরূপ কল্পনা করা আজ হয় তো তোমাদের পক্ষে শক্ত। মানব-মনের সৌন্দর্যপ্রিয়তার নিগূঢ় প্রেরণায় সে স্বয়ং মৃত্যুকেই বরণ করিয়াছিল। জিঘাওয়ের আদেশ উপেক্ষা করিলে যে কানা ভীষণ প্রতিশোধ লইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল, তবু সে মাথায় পঙ্ক মাখিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার অন্তরের শুচিতাবোধ তাহাকে বিদ্রোহিনী করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধকার-পরিবেষ্টিতা জ্যোৎস্নালোকিতা নিনানির

দিকে চাহিয়া আমি যে বিস্ময় অনুভব করিতেছিলাম তাহার মধ্যে ভয়ও ছিল। কারণ আমিও বিশ্বাস করিতেছিলাম যে নিনানির অবাধ্যতার ভয়ঙ্কর পরিণাম এবার আসন্ন, কানা তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। নিনানি মৃত্যুর পর প্রেতিনী হইয়া হয় তো আমাদের কাছাকাছি কোথাও আশ্রয় লইবে। আমি যদি এখন নিনানিকে তুষ্ট করিতে পারি নিনানির প্রেতিনীও আমার প্রতি তুষ্ট থাকিবে। আমি যে ঠিক জ্ঞাতসারে এসব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা নয়, নিনানির প্রতি প্রেমই প্রধানত আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ইহাই সত্য, কিন্তু আজ আমার সন্দেহ হইতেছে যে নিনানিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি সেদিন যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার অন্তরালে হয় তো ভয়ও ছিল। কারণ, সে যুগে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রক ছিল পরলোক। যে পরলোকে বিদ্রোহী প্রেতাত্মারা অসীম শক্তিলাভ করিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ওঠে, যে পরলোকের রহস্য উদ্ভেদ করিয়া ইহলোকে জিঘাওরা আধিপত্য করে, সে পরলোককে উপেক্ষা করিয়া অথবা তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া সে যুগে কোনও কার্যই আমরা করিতে পারিতাম না।

“তুমি মাথাটা একটু নীচু করিয়া বস। তোমার চুলগুলো আগে চূড়া করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে।”

নিনানি মাথা নীচু করিল। আমি আমার শাখাপত্রের বোঝাটা লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলাম। বাধ্য বালিকার মতো নিনানি মাথা নীচু করিয়া রহিল।

...নিনানির মাথাটুকু ঢাকিতে আমার অনেকক্ষণ সময় লাগিল। তাহার মাথার কেশরাশি যে কতবার কতপ্রকারে বাঁধিলাম ও খুলিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। নিনানি কিন্তু ধৈর্যভরে বসিয়া রহিল, একটুও প্রতিবাদ করিল না। চন্দ্রালোকিত অংশটুকু ক্রমে ক্রমে স্থান পরিবর্তন করিতেছিল, আমরাও সরিয়া সরিয়া বসিতেছিলাম। উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়া বসিবার সাহস আমাদের ছিল না, সে যুগে আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই আমরা নিরাপদ বোধ করিতাম।

নিনানির মস্তকের আবরণটা যখন শেষ হইল তখন নিজের কারুকর্ম দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। শাখাপত্রের শিরস্ত্রাণ পরিয়া নিনানিকে নূতন দেখাইতেছিল। রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতের কোমল আলোকে শ্যাম-শিরোভূষণ-শোভিতা নিনানিকে যেন অবাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। কল্পনায় আমি যে চিত্র দেখিয়াছিলাম বাস্তবে তাহাই যেন অবাস্তব হইয়া গেল। অপূর্ব পুলকে ও গর্বে আমার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল আমি যেন নিনানিকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলাম। এ নিনানি আমার, একান্তভাবেই আমার। ইহাকে আমি ধবলের কাছে আর ফিরাইয়া দিব না। সহসা আবেগভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, তাহার পর স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। আদরে নিনানির কখনও অরুচি ছিল না, সে পর্যন্ত বলিল, “জংলা, তুমি কি পাগল হইয়া গেলে নাকি! আমাকে নামাইয়া

দাও, চল এবার ফিরিয়া যাওয়া যাক।"

"তোমাকে আমি ফিরিতে দিব না। তুমি এইখানেই থাক—"

"মানে—?"

"এখন এইখানে থাক, তাহার পর তোমার জন্য আমি অন্য একটা বাসা ঠিক করিব। সকলে জানুক যে তুমি মরিয়া গিয়াছ, জিঘাওয়ের উপর ভর করিয়া কানা যে নিদারুণ আদেশ তোমাকে দিয়াছে সেই আদেশের ফলে তোমার মৃত্যু হইয়াছে। এই কথা আমি গিয়া এখনই সকলকে বলিয়া দিতেছি। আমি বলিব যে জিঘাওয়ের কথা অমান্য করিয়া তুমি কন্যা নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছিলে, কানা ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। তুমি আর ফিরিয়া যাইও না।"

নিনানি বলিল, "মৃত্যু তো আমার হইবেই। তখনই সকলে দেখিবে। এখন হইতে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া লাভ কি।"

"লাভ এই যে যতক্ষণ তুমি বাঁচিয়া থাকিবে একান্তভাবে আমারই থাকিবে। জিঘাও জানুক যে তুমি আর নাই।"

"তাহাতেই বা লাভ কি তোমার!"

নিনানির চোখে এক ঝলক আলো চকমক করিয়া উঠিল, মুখে মৃদু হাসি ফুটিল।

"তোমার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া জিঘাও কি করে দেখা যাক না। তোমার অন্তর্ধানে তাহার মনে কি-ভাব জাগে দেখিতে চাই। লাভ হয় তো তেমন কিছু হইবে না, তবু কৌতূহল হইতেছে।—"

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ব্যাপারটার অভিনবত্ব আমাকে ক্রমশ যেন পাইয়া বসিল। নিনানির মস্তক ঘিরিয়া শাখা-পত্রের যে শিরস্ত্রাণ শোভা পাইতেছিল, আমিই যে তাহার স্রষ্টা এই বোধ আমাকে যেন নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিল, মনে হইতেছিল, আমি যাহা খুশি করিতে পারি, জীবন্ত নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করার দুঃসাহসিকতাও অসম্ভব নয় আমার পক্ষে। ইহার মধ্যে যে অভিনবত্ব ছিল তাহাই আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। নিনানি কিন্তু একটা অদ্ভুত খবর দিল। যদিও ঘটনাটা আমার নিকট স্বাভাবিক মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অদ্ভুত ঠেকিল।

মৃদু হাসিয়া নিনানি বলিল, "এ খবর শুনিয়া জিঘাওয়ের মনে কি ভাব হইবে তাহা আমি জানি।"

"জান?"

"হাঁ জানি। জিঘাও হতাশ হইবে।"

"হতাশ হইবে? কেন?"

"কারণ সে একাধিকবার আমার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছে। তাহার আশা আছে যে আমি একদিন তাহার নিকট ধরা দিব। তাহার আকাঙ্ক্ষা

ছেলেকে সরাইয়া আমাকে বিবাহ করিয়া সে-ই একদিন নিম্ব-সম্প্রদায়ের দলপতি হইবে। সে এখনও বোধ হয় আশা করে যে আমি তাহার সহায়তা করিব। সুতরাং আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিলে সে হতাশই হইবে।"

"তবে সে তোমাকে এমনভাবে অপমান করিল কেন?"

কথাটা বলিয়াই আমি বুঝিলাম যে, ভুল বলিয়াছি। নিনানি আমাকে সংশোধন করিয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে।

"সে তো আমাকে অপমান করে নাই। আমাকে শাস্তি দিয়াছে ধবলের প্রেতাত্মা কানা। জিঘাওয়ের উপর যদি কোনও প্রেতাত্মা ভর করিয়া কোন কথা বলে তাহার জন্য জিঘাওকে দায়ী করা চলে না।"

"ঠিক ঠিক।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম। প্রেতাত্মাদের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলাম। জিঘাও-জাতীয় যাদুকরদের মারফতই যে তাহারা নিজেদের অভিপ্রায় কখনও সরল ভাষায় কখনও নিগূঢ় ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, ইহাতেও আমাদের কাহারও সন্দেহ ছিল না। তবু ওই ধরনের কথা আমার মুখে যে কেন আসিল তাহা জানি না।

"জিঘাও তোমার কাছে প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল, একথা আমাকে তো বল নাই—"

নিনানির চোখে মুখে দুষ্টামিমাখা হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল।

"অনেক পুরুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। কত লোকে কত কথা বলে। সব কথা কি সকলকে বলিতে পারি? বলিলে তোমাদের নিম্ব-সম্প্রদায় এতদিন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইত।"

আমি নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার মাথার শাখা-পল্লবময় শিরোভূষণটা আবার আমাকে উদ্দীপ্ত করিল, আবার আমার মনে হইল আমি অসাধ্য সাধন করিতে পারি। জিঘাওকে কঠোর শাস্তি দিবার অসম-সাহসিক কল্পনাও একবার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল।

"জিঘাও যখন তোমার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল তখন তুমি কি উত্তর দিয়াছিলে?"

"তাহা তোমাকে বলিব কেন?"

"বলিতেই হইবে।"

আগাইয়া গিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে আমি নিনানির হাত দুইটি চাপিয়া ধরিলাম। আমার মূর্তি দেখিয়া নিনানির মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

"বল তুমি কি উত্তর দিয়াছিলে?"

"বলিয়াছিলাম যে তোমার পায়ের ঘা আগে সারুক তাহার পর তোমার কথার জবাব দিব।"

"এই জবাব দিয়াছিলে? পায়ের ঘায়ের কথা বলিয়াছিলে?"

"হাঁ।"

নিনানির চোখের দৃষ্টি ভাষাময় হইয়া উঠিল। আমার চোখেও হয় তো ভাষা ফুটিয়াছিল। আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনে যাহা জাগিতেছিল, তাহা মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করা দূরে থাক ভালভাবে চিন্তা করিতেও সাহস পাইতেছিলাম না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে ঠিক করিয়া ফেলিলাম, নিনানিকে আর ফিরিয়া যাইতে দিব না, লুকাইয়াই রাখিব। জিঘাওকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

"সত্যই তাহা হইলে আমরা আর ফিরিয়া যাইব না?"

"না। আপাতত তুমি এখানে গাছের উপর লুকাইয়া থাক। আমি উন্নগা পর্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখি, যদি থাকিবার মতো গুহা পাওয়া যায় একটা। নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।"

"গুহা? আমি গুহায় একা থাকিতে পারিব না।"

"একা থাকিবে কেন, আমিও তোমার সঙ্গে থাকিব। আমার তো ঘরে বউ নাই যে তাহার জন্য প্রত্যহ ঘরে ফিরিতে হইবে। আমি দিনের বেলায় মাঠে কাজ করিব, তাহার পর রাত্রে পাহারা দিবার ছুতায় বাহির হইয়া পড়িব। তখন তোমার কাছে যাইব।"

"সমস্ত দিন আমি একা গুহায় বসিয়া বসিয়া করিব কি?"

"শিকার করিবে। তোমার হাতের লক্ষ্য তো অব্যর্থ। আমি তোমাকে তীর ধনুক দিয়া আসিব। চকমকি ও কিছু কাঠও লইয়া যাইব। তুমি শিকার করিয়া রাখিবে, আমি রাত্রে গিয়া সেগুলি ঝলসাইব। তাহার পর দুইজনে মিলিয়া আনন্দ করিয়া খাওয়া যাইবে। ইহাতে ভয় পাইতেছ কেন? নূতন ধরণের জীবন যাপন করিয়া দেখা যাক না কি হয়।"

নিনানির মন যে এই অভিনবত্বের প্রলোভনে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মুখে সে আপত্তি করিতেছিল ছলনার বশে। তাহার মতো ছলনাময়ী রমণী আমাদের দলে আর ছিল না।

"ধবল ঘিসু যদি ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসে?"

"ফিরিয়া আসিলে তাহারাও তোমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিবে, তখন বোঝা যাইবে তাহারা তোমাকে কতটা ভালবাসে।"

নিনানির চক্ষু দুইটি আর একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"ভানা টুলা কিম্বা বেসুও আমার মৃত্যু-সংবাদে কি করে তাহাও একটু লক্ষ্য করিও। আমার মনে হয় টুলাটা কাঁদিবে।"

"লক্ষ্য করিব। তুমি তাহা হইলে গাছে উঠিয়া বসিয়া থাক, আমি গুহার সন্ধানে চলিলাম।"

...উন্নগা পর্বতে গুহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আমার মন আর একটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতেছিল। শিলাঙ্গীর কথা নিনানিকে বলিব কি না, নিনানির কথাও শিলাঙ্গীকে বলা সমীচীন হইবে কি না।

একাধিক স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক রাখা, এমন কি অপরের বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যৌন সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া সে যুগে পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। জননীর পরিচয়েই তখন পুত্রের পরিচয় হইত। আমার বয়সও তখন বেশি নয়, যে বালিকাটির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল সে বহুকাল পূর্বে মারা গিয়াছে, সুতরাং একাধিক স্ত্রীর সহিত যে আমি সংশ্লিষ্ট থাকিব ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই সকলে মনে করিবে, ইহার বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক আপত্তি উঠিবে না তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু তবু নিনানির প্রতি আমার যে দুর্বলতা আছে তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার সাহস আমার ছিল না, ধবলের নিকট কথাটা গোপন করিয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করিতাম। কারণ আমি জানিতাম—আমরা সকলেই জানিতাম যে, সামাজিক নিয়ম যাহাই থাক ঈর্ষা নামক সহজাত প্রবৃত্তিটি সকল বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের নিয়মেই চলে। ধবল যদি টের পায় আমি নিনানির প্রতি আসক্ত সে কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করিবে না। সুযোগ পাইলেই সে প্রতিশোধ লইবে। নিনানি অথবা শিলাঙ্গীর মনোভাব যে ইহা হইতে বিভিন্ন হইবে সে প্রত্যাশা আমার ছিল না। নিনানির সহিত শিলাঙ্গীর যোগসূত্রের কথা আমি চিন্তা করিতেছিলাম প্রয়োজনের খাতিরে। নিনানিকে যদি উন্নগা পর্বতের গুহায় থাকিতে হয় তাহা হইলে শিলাঙ্গীর সহায়তা অতিশয় সুবিধাজনক হইবে। নিনানির সহিত পাহাড়ে একটু আগে শিলাঙ্গীর পরিচয় হইয়াছে, নিনানিকে গিয়া যদি বলি যে, শিলাঙ্গীর সহিত পাহাড়ে আমারও হঠাৎ দেখা হইয়া গেল তাহা হইলে নিনানি কোনও সন্দেহ করিবে না। শিলাঙ্গীকে কিন্তু কি বলিব? শিলাঙ্গীর সহিত আমার যে পূর্বে আলাপ হইয়াছে একথা শিলাঙ্গীকে যদি নিনানির নিকট গোপন রাখিতে বলি সে কি রাজি হইবে? এইসব কথা চিন্তা করিতে করিতে উন্নগা পর্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করিয়া পারে অবস্থিত পর্বতস্তূপগুলির দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। দূর হইতে পাঁচটি শৃঙ্গ দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে হইতেছিল বিরাটকায় উন্নতশীর্ষ পাঁচটি দৈত্যভ্রাতা যেন ঠেসাঠেসি করিয়া পাশাপাশি বসিয়া আছে। ইতি-পূর্বে উপত্যকার অপর পারে কখনও যাই নাই, যাইবার প্রয়োজনও হয় নাই, একা যাইতে একটু ভয় ভয়ও করিতেছিল, কারণ সঙ্গে একটি প্রস্তর ছুরিকা ব্যতীত অন্য অস্ত্র ছিল না। বাধ্য হইয়া তবু যাইতে হইতেছিল, কারণ উপত্যকার এধারে কোনও গুহা দেখিতে পাইলাম না। উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে দেখিলাম গরুর দল চরিতেছে, মনে হইল শিলাঙ্গীর দুধুনী মধুনীও যেন উহাদের মধ্যে রহিয়াছে। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশাও উঁকি দিতেছিল যদি শিলাঙ্গীকে দেখিতে পাই। তাহার নিকট উন্নগা পাহাড়ের অনেক খবর পাওয়া যাইবে নিশ্চয়। শিলাঙ্গীকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। একাই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

...পঞ্চ-পর্বতের সন্নিকটে আসিয়া দেখিলাম একটি ঝরনা রহিয়াছে।

ঝরনাটা প্রথমে ঠিক দেখিতে পাই নাই, শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম। দুইটি পাহাড় পাশাপাশি খাড়া হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের মাঝে রহিয়াছে প্রকাণ্ড একটা ফাটল, তাহার ভিতর দিয়া একটা জল-স্রোতও বাহির হইতেছে একটু পরে দেখিতে পাইলাম। জলধারা পাহাড় বেষ্টন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরবর্তী একটা ঘন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মনে হইল, ইহাই তাহা হইলে কন্যা নদীর উৎস। ইহার নাম কন্যা নদী কে দিয়াছিল জানি না, মীংরার মুখে শুনিয়াছিলাম নদীটির নাম কন্যা। উৎসের কাছাকাছি কন্যা নদীকে দেখিয়া মনে হইল নামটি সার্থক। দুরন্ত কিশোরীর মতোই কন্যা যেন পাহাড়ের ফাটল হইতে বাহির হইয়া অরণ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে। মনে হইল, সে যেন লুকোচুরি খেলিতেছে। জল-স্রোতের দুই তীর শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত। অনেক বৃক্ষ, অনেক গুল্ম, বহুপ্রকার লতা ও পুষ্পে উভয় তীর অলংকৃত। বৃক্ষের শাখায় শাখায় নানা বর্ণের নানা আকৃতির পক্ষী বসিয়া আছে। গত রাত্রে যে বকের দলকে দেখিয়াছিলাম তাহাদের আবার এখানে দেখিতে পাইলাম। মাছরাঙা পাখীও ছিল কয়েক রকম। আরও অনেক পাখী ছিল যাহাদের আমি চিনি না, ইতিপূর্বে দেখি নাই। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল একটা নূতন দেশে আসিয়াছি যেন। একটা অদ্ভুত বাসনাও মনের মধ্যে উঁকি দিয়া গেল। সেই আদিম যুগে যখন আমি সাধারণ বন্য পশুমাত্র ছিলাম তখন ইকাকে সবলে হরণ করিয়া নির্জন গুহায় নিজস্ব গৃহ-স্থাপনের প্রেরণা যে স্বার্থবুদ্ধি আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল সেই বুদ্ধি আমার মনে নূতন বাসনারূপে আবার আবির্ভূত হইয়া কহিল, 'এই স্থানে তুমি যদি নিনানি ও শিলাঙ্গীকে লইয়া নিজের ঘর বাঁধ কেমন হয়।' ইকার কথা আমার মনে ছিল না কিন্তু সেই প্রবৃত্তিটা অন্তরের মধ্যে সুপ্ত ছিল, সহসা যেন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কথাটা ভাবিয়াই কিন্তু আমি হাসিয়া উঠিলাম। সমাজ ছাড়িয়া একা একা বাস করিব কিরূপে? যে জীবনে আমি এখন অভ্যস্ত হইয়াছি সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া সে জীবন যাপন করা যায় না। একা আমি চাষ করিতে পারিব না। শিকার হয়তো করিতে পারি কিন্তু শিকারের মাংস ঝলসাইয়া দিবে কে? আমাদের দলের কতকগুলি নারী এই কর্মের জন্যই নিযুক্ত আছে। আরও কতকগুলি নারী পশুচর্ম পরিষ্কার করে। পশুচর্মগুলি চামড়ার সুতা দিয়া শেলাই করিবার দক্ষতা অর্জন করিয়াছে কয়েকজন। তাহারা সকলের জন্য অঙ্গচ্ছদ প্রস্তুত করে। তা ছাড়া অস্ত্র পাইব কোথায়? আমাদের সম্প্রদায়ে বিবা, কাটেম, শাম্বো, তিনা, রিখুলি, বিন্ধা দিবারাত্রি বসিয়া পাথর ঘষিতেছে, পাথর ফুরাইলে পাথর খুঁজিয়া আনিতেছে, পশুচর্মের বিনিময়ে, তৃণবীজের বিনিময়ে অন্যত্র হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে, ইহা কি আমার একার দ্বারা সম্ভব? তা ছাড়া যে অগ্নি-পূজা, প্রস্তর-পূজা, বৃক্ষ-পূজা, ভূমি-পূজা, নদী-পূজা আমাদের জীবনের প্রধান নির্ভর তাহা করিবে কে? ধবল নিশ্চয় আসিবে

না। অদৃশ্যলোক-নিবাসী ভূতপ্রেতদেরই বা কে শান্ত করিয়া রাখিবে? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন বিপন্ন হইব তখন যাদুবিদ্যাবিৎ জিঘাও কি আমাকে রক্ষা করিতে আসিবে? না, একা বাস করা সম্ভব নয়। সহসা তখন মনে হইল তবে কি জন্য আমি গুহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি? মাত্র কয়েকদিনের জন্য নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া কি লাভ হইবে? নিনানি যখন কানার আদেশ অবহেলা করিয়াছে তখন তো তাহার নিস্তার নাই। তাহাকে মরিতেই হইবে। তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে একান্তভাবে কয়েকদিন পাইবার জন্যই কি আমি তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে চাই? লুকাইয়া না রাখিলেও তো তাহা অসম্ভব হইত না। নিশীথ রাত্রিই যে আমাদের জীবনে প্রত্যহ গোপনতার সৃষ্টি করে। এতদিন যে নিনানির সঙ্গলাভ করিয়াছি তাহা কি কম নিবিড় কম ঘনিষ্ঠ ছিল?

যে প্রশ্নটাকে মন এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছিল আত্মবিশ্লেষণ করিতে করিতে অবশেষে তাহারই সম্মুখীন হইতে হইল। তবে কি জিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে আমি সন্দিহান হইয়াছি? নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া আমি কি দেখিতে চাই যে জিঘাও সত্যই শক্তিশালী কি-না? ধবলের প্রমাতামহ কানার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি সন্দিহান নাকি! কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পাখী একযোগে চীৎকার করিয়া উড়িতে লাগিল, চতুর্দিক যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, আমি ভয় পাইয়া গেলাম, আমার আশঙ্কা হইল আমার অবিশ্বাসের কথা কানা বোধ হয় টের পাইয়াছে, অভাবিত উপায়ে এখনই হয়তো শাস্তিও দিবে। একবার ইচ্ছা হইল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করি। নিনানিকে গিয়া বলি যে গুহা পাওয়া গেল না, সে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল ফিরিয়া যাক। আমার পলাইবার ইচ্ছা হইল বটে কিন্তু আমি নড়িতে পারিলাম না। আর একটা প্রবলতর প্রবৃত্তি আমাকে সেইখানে অনড় করিয়া রাখিল। ভয়কে পরাভব করিয়া কৌতূহল জয়ী হইল। আমি সভয়ে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম পাখীরা সহসা এমনভাবে ডাকিয়া উঠিল কেন। দেখিলাম, পাখীগুলি যে গাছ হইতে উড়িয়াছিল সে গাছে গিয়া আর বসিল না। কতকগুলি দূরের গাছে বসিল, কতকগুলি উড়িতেই লাগিল। তাহার পর একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল একটা নিষ্পিষ্ট আর্তনাদ যেন ধীরে ধীরে বাঙ্ময় হইবার চেষ্টা করিতেছে। আবার ভয় হইল, এসব কানার কারসাজি নয় তো! উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনিবার্য কৌতূহল আমাকে যেন ভীত শিশুর মতো টানিয়া লইয়া চলিল। সন্তর্পণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অবশেষে সেই জল-ধারার তীরে উপস্থিত হইলাম। তখনও ব্যাপারটা দেখিতে পাই নাই। পরমুহূর্তেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম একটা ময়াল সাপ একটা হরিণকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। এ অঞ্চলে যে হরিণ আছে তাহা জানিতাম না। নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া

রহিলাম। আরও বিস্ময়ের হেতু বনান্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। বৃদ্ধা যক্ষিণীকে তখনও দেখিতে পাই নাই। একটু পরেই সে বনের আড়াল হইতে এক বোঝা শুষ্ক খড় লইয়া বাহির হইল। আবার চলিয়া গেল, একটু পরে আর এক বোঝা শুষ্ক খড় লইয়া আসিল। আবার গেল, আবার খড় আনিল। কয়েকবার গিয়া অনেক খড় সে জমা করিয়া ফেলিল। আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছিল, কিন্তু তাহা যেন সীমা অতিক্রম করিয়া গেল যখন দেখিলাম সে খড়ের বোঝাগুলি সাপটার চারিদিকে বৃত্তাকারে সাজাইতেছে। ময়াল সাপটা হরিণের সর্বাঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া একটা স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই স্তূপকে কেন্দ্র করিয়া বুড়ি বোঝাগুলি সাজাইয়া ফেলিল।

নির্ভয়ে সে ময়াল সাপটার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোঝাগুলি সাজানো হইয়া গেলে সে কোমরের চর্মপেটিকা হইতে চকমকি বাহির করিয়া আগুন জ্বালিল এবং একটি খড়ের স্তূপে আগুন ধরাইয়া দিল। তাহার পর আর একটা স্তূপে ধরাইল। তাহার পর পা দিয়া ঠেলিয়া সেই জ্বলন্ত স্তূপ দুইটি ময়াল সাপটার কাছে আগাইয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধার মুখটা প্রকাণ্ড, নাকটা খড়্গের মতো, চিবুকের নীচে গলা পর্যন্ত একটা চামড়ার মতো ঝুলিতেছে। গরুদের যেমন গলকম্বল থাকে, অনেকটা তেমনি। কোনওকালে বোধ হয় চিবুকের নীচে প্রচুর চর্বি ছিল, এখন চর্বি না লোলচম ঢা তেছে। তাহার পলিতকেশ পীতাভ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি কোটরগত। দাঁত আছে। প্রকাণ্ড কয়েকটা দাঁত বাহিরে প্রকট হইয়াছে, ঠোঁটে ঢাকা পড়ে নাই। আমি রুদ্ধশ্বাসে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। মনে হইল সে কি যেন বলিল। বলিয়া খড়ের জ্বলন্ত স্তূপ দুইটিকে আর একটু আগাইয়া দিল। দেখিলাম ময়াল সাপ ধীরে ধীরে তাহার বন্ধন শিথিল করিতেছে। বৃদ্ধা ভর্ৎসনার সুরে আবার তাহাকে কি যেন বলিল, জ্বলন্ত খড়ের স্তূপ আর একটু অগাইয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, ময়াল সাপ হরিণটিকে ছাড়িয়া ধীরে ধীরে বনান্তরালে চলিয়া যাইতেছে। মৃত হরিণটা পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধা তখন মৃত হরিণকে টানিয়া আনিয়া জলন্ত খড়ের স্তূপের ভিতর ফেলিয়া আরও শুষ্ক খড় তাহার উপর চাপাইয়া দিল। দগ্ধ হরিণ-চর্মের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিলাম বৃদ্ধার জিহ্বাগ্র মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ময়াল সাপটা যেদিকে চলিয়া গিয়াছিল, সেদিকে চাহিয়া বৃদ্ধা মৃদুস্বরে মাঝে মাঝে কি যেন বলিতেছিল. সহসা একটা গাছের দিকে চাহিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, সু-উচ্চ বৃক্ষশাখায় একদল শকুনি বসিয়া রহিয়াছে। আমার এইবার ভয়-ভয় করিতে লাগিল, আশঙ্কা হইল, এ আমাকে যদি দেখিতে পায়, হয়তো...। সন্তর্পণে সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। কিছুদূর গিয়া গতিবেগ দ্রুত করিয়া দিলাম। উন্মুক্ত উপত্যকায় গিয়া যখন পড়িলাম, তখন আমি ছুটিতেছি। রৌদ্রের স্বর্ণকিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছিল, নির্মেঘ

নীল আকাশে চক্রাকারে চিলের দল উড়িতেছিল, একটা নামহীন পাখী তালে তালে চীৎকার করিতেছিল, দূরে বন্য গরুর দল চরিতেছিল, পাহাড়ের সানুদেশে পাহাড়ী ছাগলেরা নামিয়া আসিয়াছিল, আমার কিন্তু এসব দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না, আমি সেই বৃক্ষবেষ্টিত ঝোপটা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিলাম। আমার আশঙ্কা হইতেছিল, শিলাঙ্গী হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শিলাঙ্গীকে সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিলে যে সমস্যার সমাধান হইবে না, তাহা আমি অনুভব করিতেছিলাম। ঠিক করিয়াছিলাম, তাহার নিকট কিছুই গোপন করিব না। নিনানি-সম্পর্কিত সমস্ত কথা তাহার কাছে অকপটে বলিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিব। সে আমার বন্ধু হইয়াছে। সে নিশ্চয়ই আপদেবিপদে আমার সহায় হইবে, কখনও এমন কিছু করিবে না, যাহাতে আমার অপমান বা অমঙ্গল হয়...

...শিলাঙ্গী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিলাম, হঠাৎ সে একটা গাছের ডাল হইতে লাফাইয়া নীচে নামিল!

"তুমি অত হাঁপাইতেছ কেন"—নামিয়াই প্রশ্ন করিল সে।

"ছুটিয়া আসিয়াছি।"

মনে হইল কথাটা শুনিয়া শিলাঙ্গী খুশি হইল। তাহার সরল চোখের দৃষ্টিতে আনন্দের ছটা দেখিতে পাইলাম।

"ছুটিয়া আসিয়াছ? কি দরকার ছিল?"

"আমার ভয় করিতেছিল, যদি তুমি চলিয়া যাও।"

"বাঃ, আমি যখন কথা দিয়াছি, তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিব, তখন কি চলিয়া যাইতে পারি? আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করিতাম। তোমার জন্য একটা জিনিস আনিয়াছি—এই দেখ—"

শিলাঙ্গী তরতর করিয়া গাছে উঠিয়া গেল এবং একটি ছোট বাঁশের কেঁড়ে লইয়া নামিয়া আসিল।

"দুধ! খাইয়া দেখ।"

দুধ পূর্বে কখনও পান করি নাই। কেঁড়েটা মুখে তুলিয়া একটু চাখিয়া দেখিলাম প্রথম। স্বাদটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হইল, খুব ভাল লাগিল না।

"কেমন লাগিতেছে?"

"খুব ভাল নয়। কেমন যেন মিষ্টি ফলের স্বাদ—মনে হইতেছে যেন তরল কোনও ফল"—আমি চাখিয়া চাখিয়া সন্দিগ্ধভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম।

"শরীরের তেজ কিন্তু খুব বাড়ায়। ঝোনঝিরা প্রচুর দুধ খায় রোজ। তাই উহার গায়ে খুব জোর। ঝোনঝিরা মাংসও কম খায় না। ওটা একটা রাক্ষস। বাঃ, তুমি সবটা খাইও না, আমার জন্যও একটু রাখ। আমি আমার

অংশের দুধটুকু তোমার জন্য আনিয়াছিলাম—আমাকে একটু দাও।”

আমার হাত হইতে দুধের কেঁড়েটা কাড়িয়া লইয়া বাকি দুধটুকু সে ঢক ঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

“আজ রোহার নিকট যাইবে? আজ রোহা বোধ হয় একা আছে। কারণ আসিবার সময় দেখিলাম ঝোনাঝিরার দল অস্ত্রে শান দিতে বসিয়াছে।”

“আজ আমার কোথাও যাইবার উপায় নাই। সর্বপ্রথম আমাকে তুমি একটা গুহা খুঁজিয়া দাও।”

“গুহা? তার মানে! গুহা লইয়া কি করিবে?”

“নিনানিকে রাখিব।”

“সে আবার কে?”

“তাহা হইলে চল এক জায়গায় বসি। সমস্ত কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। কিন্তু তোমাকে শপথ করিতে হইবে যে একথা আর কাহাকেও বলিবে না। নিনানির কাছেও না। নিনানি যেন জানিতেও না পারে যে, তোমার সহিত আমার ভাব হইয়াছে, তাহা হইলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে।”

“নিনানি কে?”

“চল সব বলিতেছি।”

সেই ঝোপের ধারে একটি বিস্তৃত প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া শিলাঙ্গীকে আনুপূর্বিক সমস্ত খুলিয়া বলিলাম, কিছুই গোপন করিলাম না। সমস্ত কথা শুনিয়া শিলাঙ্গী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল, সে যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর আমার মুখের উপর সরল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, “নিনানিকে তুমি বুঝি ভালবাস?”

“তোমার কাছে মিথ্যা বলিব না, বাসি। ধবল দলপতির অধিকার লইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, তাহা না হইলে আমাকেই সে বিবাহ করিত।”

“সে-ও তোমাকে খুব ভালবাসে তাহা হইলে?”

“বাসে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে কানা তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। তাই সে জীবনের শেষ কয়টা দিন একা আমার কাছে থাকিতে চায়। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে তাহাকে একটা গুহা খুঁজিয়া দিব। এ প্রতিশ্রুতি আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি আমাকে সাহায্য কর।”

“তাহা না হয় করিব। একটা গুহার খবর আমি জানিও। কিন্তু আগে তুমি আমার আর একটা কথার জবাব দাও।”

“বল—”

“আমাকে তুমি নিনানির নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেছ কেন? তুমি তো আমাকেও ভালবাস, আমাকে দেখিয়া সে রাগ করিবে কেন?”

“নিনানি বড় হিংসুক। আমি যে আর কাহাকেও ভালবাসি ইহা সে সহ্য করিতে পারে না—”

শিলাঙ্গী সহসা উভয় বাহু দিয়া আমার গলাটা জড়াইয়া ধরিল।

637

"আমিও হিংসুক। নিনানির উপর আমারও হিংসা হইতেছে। কিন্তু আমি কখনও তাহার অনিষ্ট করিব না, কারণ তুমি যে তাহাকে ভালবাস।"

আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সেযুগে এমন কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। শুনিব বলিয়া প্রত্যাশাও করি নাই। আমার পূর্ব জীবনে জোলমার আবির্ভাবও এমনি অপ্রত্যাশিত ছিল। সে-ও আমাকে ভালো বাসিয়াছিল—কেন যে বাসিয়াছিল তাহা জানি না—হয়তো বা আমার মধ্যেও এমন একটা বিশিষ্ট রূপ ছিল যাহার সম্বন্ধে আমি নিজে সচেতন ছিলাম না—কিন্তু আমি তাহাকে বুঝিতে পারি নাই, কারণ তখন সেরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব আমার ধারণার অতীত ছিল। বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তাহাকে পাইয়াও পাই নাই। অপ্রত্যাশিতকে বুঝিতে সময় লাগে, যখন তাহাকে বোঝা যায় তখন সে আয়ত্তাতীত হইয়া যায়। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনুষ্যত্ব জন্ম-জন্মান্তরে জোলমাকেই কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। আজ এত-দূরের ব্যবধানে সেই প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানকে সমগ্রভাবে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে আজও আমি সেই অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত আছি। আমি জোলমাকে নানারূপে বারম্বার পাইয়াছি এবং হারাইয়াছি। শিলাঙ্গীর মধ্যেই জোলমা ফিরিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তাহার মুখে এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক উক্তি শুনিয়া আমি অভিভূত চিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, আমার সন্দেহও হইল তাহার এ যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য কি না। প্রথম দর্শনে তাহার সম্বন্ধে যে কথা মনে হইয়াছিল আবার সে কথা মনে হইল। সত্যই এ মানবী তো, না কোনও উপদেবতা আমার সহিত ছলনা করিতেছে। কিন্তু আমার সমস্ত বিস্ময়, সন্দেহ ভয়কে ছাপাইয়া অপূর্ব আনন্দ একটা আমার অন্তরে উথলিয়া উঠিল! আমার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব যেন ক্ষণিকের জন্য শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল, আমি তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম।

আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া শিলাঙ্গী প্রশ্ন করিল, "তোমার নিনানি দেখিতে কেমন?"

"তুমি তাহাকে দেখিয়াছ। কাল রাত্রে তুমি যে মেয়েটিকে লতা দিয়াছিলে সেই নিনানি।"

"সেই নিনানি!"

শিলাঙ্গী তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"হাঁ, সেই নিনানি। অমন করিয়া উঠিলে যে?"

"সে তো অপরূপ সুন্দরী। আমি তো প্রথমে তাহাকে জ্যোৎস্নাপরী ভাবিয়াছিলাম। আমাদের কথক মিনাহা বলে জ্যোৎস্নাপরীরা গভীর রাত্রে পৃথিবীতে ফুলের মধু খাইবার জন্য আসে। আমি ভাবিয়াছিলাম মধু খাইবার লোভেই কোনও জ্যোৎস্নাপরী বোধ হয় মহুয়া বনে আসিয়াছে। কিন্তু সে যখন আগাইয়া আসিয়া লতার খোঁজ করিল তখন অবাক হইয়া

দেখিলাম অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। তাহার সহিত আলাপ করিয়া বড় ভাল লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল বাঘের কথা, আমার কাছে যে লতা ছিল তাহারই খানিকটা অংশ দিয়া তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। নিনানি তো চমৎকার মেয়ে। আমার সেই লতা দিয়াই তাহার মাথার আবরণ প্রস্তুত করিয়াছ?"

"হাঁ।"

শিলাঙ্গীর মুখভাবে আবার বিমর্ষতা ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "নিনানিকে যখন তুমি ভালবাস তখন কি আর আমাকে তোমার ভাল লাগিবে?"

"নিশ্চয় লাগিবে। তুমি নিনানি নও, কিন্তু তুমিও অপরূপ"—আমার আবেগপূর্ণ এই কথাগুলি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিলাঙ্গী শুনিল। মনে হইল সে যেন বিস্ময়কর কিছু একটা শুনিতেছে। তাহার পর সহসা আবার সে আমার কণ্ঠলগ্না হইল।

"নিনানির সহিত আমার আলাপ করাইয়া দাও।"

"না, তাহা নিরাপদ নয়। নিনানি বড় হিংসুক, বড় প্রতিহিংসাপরায়ণ। হয়তো তোমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে। তা ছাড়া সে তো আর বেশি দিন বাঁচিবেও না। যে কয়টা দিন বাঁচে তাহার মনে কষ্ট দিয়া লাভ কি। তোমার সহিত আমার ভাব হইয়াছে জানিতে পারিলে সে কষ্ট পাইবে। তাহার জন্য একটা গুহা দেখিয়া দাও। খালি গুহা আছে কি কোথাও?"

"আছে। উপত্যকার পরপারে পঞ্চ-পর্বতে যক্ষিণী বুড়ির দখলে কয়েকটা খালি গুহা আছে। বুড়ি আমাকে ভালবাসে খুব। আমি যদি বলি একটা গুহা দিতে পারে—"

পঞ্চ-পর্বতে আমার অভিযানের কথা তখনও শিলাঙ্গীকে আমি বলি নাই। শিলাঙ্গীর কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শিলাঙ্গী ওই বৃদ্ধাকে চেনে না কি!

"গুহার খোঁজে আমিও পঞ্চ-পর্বতের দিকে গিয়াছিলাম। যক্ষিণী বৃদ্ধাকে দেখিয়াছি। বড় অদ্ভুত মনে হইল। একটা ময়াল সাপ হরিণ ধরিয়াছিল—"

"ও, ময়াল সাপটাকেও তুমি দেখিয়াছ। ওটা ওর পোষা ময়াল সাপ। আমরা যেমন কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরি যক্ষিণী তেমন ময়াল সাপের সাহায্যে শিকার ধরে। ময়াল সাপটাকে শিশু অবস্থা হইতে ও নাকি পুষিয়াছে। ময়াল সাপের জন্য ফাঁদ পাতিয়া ও খরগোস, পাখী প্রভৃতি ধরিয়া রাখে। উহার জন্য একটা গুহাও আলাদা করিয়া রাখিয়াছে। যক্ষিণী বড় অদ্ভুত লোক। উহার ভাষাও অদ্ভুত। অধিকাংশ কথা ইঙ্গিতে বলে। মনে হয় ও জন্তু-জানোয়ারের ভাষা বোঝে। তাদের সহিত তাহাদের ভাষাতেই কথাও কয় মাঝে মাঝে।"

"তুমি উহার কথা বুঝিতে পার?"

"পারি বই কি। তুমিও একটু চেষ্টা করিলে পারিবে।"

"তোমার সহিত উহার আলাপ হইল কি করিয়া? ও কে?"

"ও কে তা জানি না। দুধুনীর জন্য ঘাস খুঁজিতে একদিন পঞ্চপাহাড়ে গিয়াছিলাম, তখন উহার চেহারা দেখি। প্রথমটা ভয় হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছি। মাঝে মাঝে উহাকে দুধ দিয়া আসি। যক্ষিণী যদিও মাংসাশী, কিন্তু দুধও খুব ভালবাসে।"

"উন্নগা পাহাড়ে ও কোথা হইতে আসিল, উহার বংশপরিচয় কি তাহা জান না?"

"না। তবে আমার মনে হয় ময়াল সাপই উহার বংশদেবতা। কারণ ও ময়াল সাপ ছাড়া আর সমস্ত রকম জন্তু আহার করে। যত্ন করে কেবল ময়াল সাপকে।"

"উহার অধিকারে খালি গুহা আছে তুমি জান?"

"উহার অধিকারে কয়েকটি গুহা খালি আছে। একটিতে ও থাকে। আর একটিতে থাকে দুইটি ময়াল সাপ। তৃতীয় গুহাটিতে যক্ষিণী শশক, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুদের বন্দী করিয়া রাখে। মাঝে মাঝে এক একটি জন্তু বাহির করিয়া ময়াল সাপদের খাইতে দেয়। এই তিনটি গুহা প্রায় পাশাপাশি আছে। আর একটু দূরে বেশ বড় গুহা আছে, সেটি খালি।"

"এই ভয়াবহ পরিবেশে নিনানি কি থাকিতে পারিবে?"

"যক্ষিণী যদি থাকিতে দিতে রাজি হয় অনায়াসেই পারিবে। কারণ যক্ষিণী লোক ভাল। সে নিনানিকে যত্নেই রাখিবে। কিন্তু যক্ষিণী যদি রাজী না হয় তাহা হইলে অন্য গুহার সন্ধান করিতে হইবে। আমি ঠিক যক্ষিণীকে রাজি করিতে পারিব, চলই না চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।"

"বেশ, চল।"

"ব্যাপারটা তুমি উহাকে বুঝাইতে পারিবে তো?"

"আশা করি পারিব।"

...আমরা পুনরায় সেই উপত্যকা অতিক্রম করিতেছিলাম। শিলাঙ্গী ঠিক যেন হরিণীর মতো চলিতেছিল। তাহার সহিত কুরঙ্গিনীর অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। তাহার চক্ষু দুইটি ঠিক যেন কুরঙ্গ-নয়ন। তাহার চাল-চলন গতিভঙ্গী সমস্তই হরিণের মতো। চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে সে আমার স্কন্ধ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছিল, লাফাইয়া নামিয়া আবার ছুটিয়া চলিতেছিল। মাঝে মাঝে ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ কোনও ঝোপে আত্মগোপন করিয়া আমাকে নাকাল করিবার চেষ্টাও করিতেছিল। ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া আমি যখন তাহাকে খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি তখন সহসা তাহার কলহাস্য শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম যে সে আমাকে ঠকাইয়াছে। আমি তাহাকে যেখানে খুঁজিতেছি সেখানে সে নাই. অনেক দূরে আর একটা ঝোপের অন্তরাল হইতে

সে উঁকি দিতেছে। এইভাবে আমরা যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি তখন একটা কথা কেন জানি না আমার মনে হইল। যে প্রশ্নের উত্তর কেহ কখনও দিতে পারে নাই সেই প্রশ্নটাই শিলাঙ্গীকে আমি করিলাম।

"আচ্ছা, শিলাঙ্গী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, ঠিক উত্তরটি চাই কিন্তু।"

"কি কথা?"

"তোমার আমাকে ভাল লাগিল কেন?"

"কি জানি।"

টপ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সে আমার কাঁধ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। টপ করিয়া ঝুলিয়া নামিয়া পড়িল আবার। দুরন্ত বালক যেন।

"মনে পড়িয়াছে কেন তোমাকে ভাল লাগিয়াছিল। তুমি সেদিন গাছ হইতে লাফাইয়া মধুনীকে তুলিয়া গাছে উঠিয়া গেলে, তাহার একটা পা কামড়াইয়া ধরিয়া অবলীলাক্রমে শাখা ধরিয়া আরও উপরে চলিয়া গেলে তখনই তোমাকে আমার ভাল লাগিয়াছিল।"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে মারিবার জন্য বর্শা ছুঁড়িয়াছিলে—"

"বাঃ ছুঁড়িব না? আমার মধুনীকে তুমি তুলিয়া লইয়া গেলে, তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব না? কিন্তু যখন দেখিলাম তুমি অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে, এমন কি আমার বর্শাটাও হস্তগত করিলে তখন তোমাকে আরও ভাল লাগিয়া গেল।"

শিলাঙ্গী ঘাড় ফিরাইয়া আমার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য নিবদ্ধ করিয়া আবার কিছুদূর ছুটিয়া গেল।

"শোন শোন—"

"কি?"

"তোমাদের ঝোনাঝিরাও তোমাকে খুব ভালবাসে না কি?"

"খুব।"

"তুমিও তাহাকে ভালবাস?"

"মোটেই না। ঝোনাঝিরার ইচ্ছা আমাকে বিবাহ করিয়া আমাদের দলের দলপতি হইবে। আমি কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিব না।"

"তোমার ইচ্ছার উপরই তোমার বিবাহ নির্ভর করে না কি? আমাদের সমাজে তো মেয়ের মা-ই এ বিষয়ে কর্ত্রী, ছেলের মা-ও।"

"আমাদের সমাজেও তাই। আমি কিন্তু দলপতি রোহার কন্যা, আমার মা শঙ্খী রোহাকে বলিয়া গিয়াছে আমার অমতে রোহা যেন কাহারও সহিত আমার বিবাহ না দেয়। রোহাও শঙ্খীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে!"

"শঙ্খী কোথায় গিয়াছে?"

"পরলোকে। সেইজন্যই তো আমার জোর আরও বেশি। শঙ্খী হয়তো মত পরিবর্তন করিতে পারিত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। এখন

রোহাকে তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতেই হইবে। রোহা লোক খুব ভাল। সে আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করিবে না।"

ইহার পর ঠিক যে প্রশ্নটি আমার মনে জাগিতেছিল তাহা কিন্তু আমি আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। শিলাঙ্গীও কিছু বলিল না, সে কেবল আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

...পণ্ড-পর্বতের নিকট সেই স্থানটিতে পৌঁছিয়া দেখিলাম যক্ষিণী নাই, ময়াল সাপ নাই, হরিণও নাই। খড়ের স্তূপগুলি ভস্মে পরিণত হইয়াছে, কোন কোনটার ভিতর হইতে ধূমও বাহির হইতেছে। পাখীগুলিও আর কলরব করিতেছে না, সকলেই স্ব স্ব স্থানে আবার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে দেখিলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, "যক্ষিণী তাহা হইলে বোধ হয় ঝলসানো হরিণটা লইয়া নিজের গুহায় গিয়াছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি খোঁজ লইয়া আসি। আমি ডাকিলে তাহার পর তুমি যাইও। এখন এইখানেই দাঁড়াইয়া থাক।"

শিলাঙ্গী চলিয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটা কথাই আমার মনে হইতে লাগিল। শিলাঙ্গী যদি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়, রোহাকেও সে যদি সম্মত করাইতে পারে, তাহা হইলে এই অভিনব গো-দুগ্ধপায়ী সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বন্ধুত্ব হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে কি? সে কথা স্থির করিবে ধবল কিম্বা জিঘাও। তাহারা যদি আপত্তি করে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে না। নিতান্তই যদি বিবাহ করিতে হয়, দল ত্যাগ করিতে হইবে। রোহার দল কি আমাকে আশ্রয় দিবে? আশ্রয় পাইলেও কি শান্তিতে থাকিতে প্যারিব? ঝোনঝিরার কথা মনে পড়িল। ঝোনঝিরা যদি কিছু না-ও বলে তাহা হইলেও কি সুখে থাকিতে পারিব? আমাদের এই পুরাতন দল, যে দলের সহিত আমি আজন্ম সংশ্লিষ্ট রহিয়াছি, যে দলের জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া আমার পিতা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে দলে আমার মায়ের একদা একাধিপত্য ছিল, যে দলে আমার সহোদর-সহোদরার সংখ্যা বাইশজন, যে দলের সহিত আমি কত দেশ-দেশান্তর পর্যটন করিয়াছি, আমার সর্বপ্রকার শিক্ষা-দীক্ষা যে দলের মধ্যে হইয়াছে, যে দলের কত কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়ার সহিত আজও আমার সম্বন্ধ নিবিড়, সে দল ত্যাগ করিয়া আমি কি থাকিতে পারিব? তা ছাড়া নিনানি, নিনানির যদি মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? আর একটা কথাও মনে পড়িল। ধবল উলম্ভনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছে, তাহার ফলাফল কি হইবে, তাহা অনিশ্চিত। যদি যুদ্ধ বাধে, সে যুদ্ধে আমাকেও যোগ দিতে হইবে। এ অবস্থায় দলত্যাগের কথা ভাবাই অনুচিত। শিলাঙ্গীকে স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য কিন্তু সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ড-পর্বতের শিখরলগ্ন একখণ্ড শুভ্র মেঘের মতো তাই আমার চিন্তা নানাভাবে নিজেকে প্রসারিত করিয়া আমার মনের মধ্যে নানা

মূর্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। সহসা শিলাঙ্গীর ডাক শুনিতে পাইলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইলাম, শিলাঙ্গী একটি বৃক্ষের উপরে উঠিয়াছে। বৃক্ষশীর্ষ হইতেই সে আমাকে ডাকিতেছিল। সেই দিকেই অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিতে পাইলাম, শিলাঙ্গী আমার দিকে আসিতেছে। ছুটিয়া আসিতেছে।

"যক্ষিণীর সহিত দেখা হইয়াছে?"

"হইয়াছে।"

"তাহাকে সব কথা বলিয়াছ?"

"বলিয়াছি। সে নিনানির জন্য গুহা দিতে রাজী আছে। নিনানি আসিবে শুনিয়া সে খুব খুশি। বলিতেছিল একা-একা তাহার আর ভাল লাগে না। একজন সঙ্গিনী যদি তাহার কাছে থাকে, সে তাহাকে যত্ন করিয়া রাখিবে। তুমি চল না আলাপ করিবে।"

যক্ষিণীর গুহাটি বেশ বড় এবং সুরক্ষিত। আমি গিয়া দেখিলাম, সে আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঝলসানো হরিণের মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। আমার দিকে সে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিল, তাহার পর শিলাঙ্গীর দিকে চাহিয়া অদ্ভুত ভাষায় কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না।

শিলাঙ্গী বলিল, "যক্ষিণী জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি কি হরিণের মাংস খাইবে? খাইতে চাহিও না। চাহিলে হয়তো ও তোমাকে একটু মাংস দিবে, কিন্তু খাদ্যে ভাগ বসাইলে যক্ষিণী মনে মনে খুব চটিয়া যায়। কারণ বড় পশুর মাংস ও আজকাল বড় একটা পায় না। ময়াল সাপ যদি কোনও দিন কিছু ধরে তবেই পায়। ফাঁদ পাতিয়া খরগোস ইঁদুর ধরে, তাহারও ভাগ ময়াল সাপকে দিতে হয়। আমি মাঝে মাঝে ইহাকে খাদ্য আনিয়া দিই, তাই ও আমার উপর খুব খুশি।"

শিলাঙ্গীর কথা শুনিয়া যক্ষিণীর দিকে চাহিয়া আমি মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিলাম যে, মাংস আমার চাই না। যক্ষিণী আপন মনে মাংস খাইতে খাইতে শিলাঙ্গীর সহিত মাঝে মাঝে কথা বলিতে লাগিল। বানরের কিচিরমিচিরের সহিত শালিকের ভাষা মিশিলে যেমন শোনায়, যক্ষিণীর ভাষা অনেকটা সেইরূপ শুনাইতে লাগিল। দেখিলাম, শিলঙ্গীও সে ভাষা কিছু কিছু শিখিয়াছে। বলিতে না পারিলেও বুঝিতে পারে। কথা বলিতে বলিতে যক্ষিণী সহসা ভীত শালিকের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর শিলাঙ্গীকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পাহাড়ের গায়ে কি দেখাইতে লাগিল।

...আস্তানায় ফিরিয়া দেখিলাম, বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের অনুপস্থিতির জন্য ততটা নয় যতটা ধবল এবং চন্মনা ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া। তাহারা যে সংবাদ আনিয়াছিল তাহা সত্যই চাঞ্চল্যকর।

ধবলকে ঘিরিয়া সকলে দাঁড়াইয়াছিল।

ধবল বলিতেছিল, "আমরা যখন এখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন কিছুক্ষণ গজন্ধর কোনও কথা বলে নাই। কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটিবার পর গজন্ধর অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করিল। আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেহ মরিয়া গেলে আমরা কিভাবে শব সংকার করি। আমি উত্তর দিলাম, 'আমরা মৃতদেহকে পুঁতিয়া ফেলি। মৃতদেহের সহিত খাদ্যদ্রব্য এবং অস্ত্র-শস্ত্রও দিই। বিশেষ করিয়া যে জিনিস তাহার প্রিয় ছিল, সেই জিনিসগুলি আমরা যত্নের সহিত শবের নিকটে রাখিয়া দিই। তাহার পর প্রতি মাসে মাসে তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সেই কবরের পাশে বসিয়া প্রার্থনা করে যেন তাহার প্রেতাত্মা নিম্ব সম্প্রদায়ের সহায়ক হয়। তাহাদের তুষ্ট রাখিবার জন্য আমরা তাহার কবরের পাশে পশুবলিও দিয়া থাকি।' আমার কথা শুনিয়া গজন্ধর একটু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না। ঘিসু নিম্নকণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, সহসা এসব কথা তুলিবার অর্থ কি। ভংগা ফিসফিস করিয়া বলিল, মৃত্যু-প্রসঙ্গ বড়ই অমঙ্গলসূচক। আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। আবার কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটিবার পর গজন্ধর বলিল, 'নিম্ব সম্প্রদায় অনেক বিষয়ে এখন অনেক পিছাইয়া আছে। তাহার প্রথম প্রমাণ পাইয়াছি তোমাদের খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া, দ্বিতীয় প্রমাণ পাইলাম তোমাদের শব-সংকারের ব্যবস্থা শুনিয়া। প্রেতাত্মার প্রতি কি করিয়া সম্যক সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা এখনও তোমরা শিখ নাই। শবদেহকে কেবল মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই প্রেতাত্মা শান্ত হয় না, অশান্ত হয়। মাটির কীটপতঙ্গ যখন তাহার দেহ কুরিয়া কুরিয়া খায়, তখন প্রেতাত্মা অস্থির হইয়া ওঠে। তাহারা অস্থির হইয়া উঠিলে চতুর্দিকে অমঙ্গল হয়। এই যে দেশ-ব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিয়াছে। তাহার কারণ ইহাই। অশান্ত ক্রুদ্ধ প্রেতাত্মা-দের উষ্ণ নিশ্বাসে দেশ জ্বলিয়া যাইতেছে। সেইজন্য উলম্ভন নিয়ম করিয়াছে যে, মাটির নীচে পাথরের ঘর প্রস্তুত করিয়া সেই ঘরে শবদেহকে স্থাপন করিতে হইবে। তবে সে শান্ত থাকিবে। মাটির কীটপতঙ্গদল যখন তাহার দেহ কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে, তখন তাহার কবরের পার্শ্বে পশু-বলি দিলে তাহার অশান্তি কমিবে না, বাড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অশান্তি বাড়িবে। দলপতি উলম্ভন সেইজন্য স্থির করিয়াছে যে, তাহার রাজত্বে কাহাকেও শবদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে দিবে না। কি করিয়া শবদেহকে সংকার করিতে হয়, তাহা হাতে-কলমে সে সকলকে শিখাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছে। তোমরাও তাহা শিখিয়া আসিবে'—এই পর্যন্ত বলিয়া গজন্ধর আবার চুপ করিয়া গেল। এসব আলোচনার কোনও তাৎপর্য আমি ধরিতে পারিলাম না। নীরবে গজন্ধরের অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না, মনে মনে নিম্ব-দেবতাকে স্মরণ করিয়া তাহাই করিতে লাগিলাম। বড়ই অস্বস্তি হইতে লাগিল। বহুক্ষণ চলিবার পর দিগন্তবিস্তৃত এক বিরাট

অরণ্য দেখা গেল। সে অরণ্য শুধু বিরাট নয়, তাহা অদ্ভুত। তাহা জীবন্ত নয়, মৃত। বিশালাকৃতি গগনচুম্বী মহীরুহদল প্রেতের মতো সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দিকে রাশি রাশি শুষ্কপত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মাটিও ফাটিয়া গিয়াছে। মাটির বর্ণ কৃষ্ণ নয়, পিঙ্গল। কোথাও কোথাও বালুকা ধূ ধূ করিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া একটা চাপা কান্নার মতো শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, বহুদূর হইতে বহুলোক যেন আর্তনাদ করিতেছে। তাহার পরই একটা হাওয়া উঠিল, শুষ্কপত্রের রাশি হাওয়ায় আবর্তিত হইতে লাগিল, দেখিলাম বিরাটাকৃতি বৃক্ষ-কঙ্কালগুলি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন বুঝিতে পারিলাম হাওয়ার জন্য অরণ্যের ভিতর হইতে ওই প্রকার শব্দ হইতেছে। কিন্তু তাহা মর্মরধ্বনি নহে, তাহা মৃত অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস। গজন্ধর সেই অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিল। একটু ইতস্তত করিয়া আমরাও করিলাম। মৃত অরণ্যে আর কখনও প্রবেশ করি নাই। মনে হইল যেন, মৃত্যুপুরীতে প্রবেশ করিয়াছি। অরণ্যের ভিতর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে মনে হইল কাহারা যেন ফিসফিস করিয়া কথা কহিতেছে। শিহরিয়া উঠিলাম। পর-ক্ষণেই গজন্ধরের কথা শুনিতে পাইলাম। গজন্ধর বলিল, তোমাদের অনা-চারের জন্যই নিদারুণ অনাবৃষ্টি হইয়াছে, সেই অনাবৃষ্টির ফলে এই বিরাট অরণ্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার জন্য তোমরাই দায়ী। এই মৃত অরণ্যের ভিতর দাঁড়াইয়া আজ তোমরা শপথ কর যে, এইবার মৃতের প্রতি তোমরা সদ্ব্যবহার করিবে। শপথ কর যে উলম্ভনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তোমরা তাহার নিকট হইতে কবর-প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবে। যাহারা তোমাদের শিক্ষা দিবে, তাহারা তোমাদের লইতে আসিয়াছে, তোমরা ইহাদের সঙ্গে যাও। আমি দুইদিন পরে গিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।' তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি অরণ্যের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমাদের তিনজনকে ঘিরিয়া ফেলিল। দেখিলাম প্রত্যেকটি লোকই বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকৃতি। সংখ্যাতেও তাহারা অনেক। যদিও আমরা তিনজনই সশস্ত্র ছিলাম, কিন্তু তবু দেখিলাম, ইহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলে মৃত্যুকেই বরণ করিতে হইবে। গজন্ধর বলিল, 'কোনও ভয় নাই, ইহাদের অনুগমন কর। আপাতত তোমাদের প্রস্তর বহন করা ছাড়া আর কিছু করিতে হইবে না।' আমি বলিলাম, 'তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া আমরা আসিয়াছিলাম তোমাদের দলপতি উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। এখন আমাদের প্রস্তর বহন করিতে বলিতেছ কেন?' গজন্ধর বলিল, 'প্রস্তর বহন না করিলে উলম্ভন কাহারও সহিত দেখা করে না। তোমরা প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া গেলেই সে তোমাদের সহিত আলাপ করিবে।' ঘিসু এতক্ষণ নীরব ছিল। সে বলিল, 'প্রস্তর লইয়া উলম্ভন কি করিবে বুঝিতে পারিতেছি না।' গজন্ধর উত্তর দিল, 'প্রস্তর দিয়া সে নিজের কবর প্রস্তুত করিতেছে। তাহা

দেখিয়াই তোমরা শিক্ষালাভ করিবে কি করিয়া কবর প্রস্তুত করিতে হয়। যাও, শোহান্‌কি পর্বত হইতে প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলেই সব বুঝিতে পারিবে।' ঘিসু প্রশ্ন করিল, 'প্রস্তর কি আমাদের মাথায় করিয়া বহন করিতে হইবে?' গজন্ধর বলিল, 'না। টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। শোহান্‌কি পর্বতে বহু কর্মী পর্বতগাত্র হইতে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া কাটিয়া বাহির করিতেছে। সেই বিরাট প্রস্তরখণ্ডগুলিতে দড়ি বাঁধিয়া বহুলোক মিলিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যায়। যাও, তোমরা গিয়া সেই দলে যোগদান কর।' ভংগা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, 'যদি আমরা না যাই—' গজন্ধর উত্তর দিল, 'তাহা হইলে ইহারা বলপূর্বক তোমাদের বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। নির্বোধের মতো আচরণ করিও না। ইহাদের অনুগমন কর।' গজন্ধরের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল। আমি মনে মনে নিম্ব দেবতাকে ডাকিতেছিলাম। চক্ষুর ইসারায় ভংগাকে প্রতিবাদ করিতে বারণ করিলাম। কারণ নির্বোধের মতো বাদানুবাদ করিয়া লাভ হয় না, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আকস্মিক কিছু করিলে ক্ষতিই হয়। গজন্ধর আর কিছু না বলিয়া বনান্তরালে অন্তর্ধান করিল। তাহার পর সেই লোকগুলি আমাদের কোমরে দড়ি বাঁধিতে উদ্যত হওয়াতে আমি আপত্তি করিলাম। বলিলাম আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তোমাদের অনুসরণ করিব, দড়ি বাঁধিবার প্রয়োজন নাই। আমার এই কথায় তাহারা নিবৃত্ত হইল, নিম্বদেবতাই বোধ হয়, তাহাদের নিবৃত্ত করিলেন। তাহার পর তাহাদের অনুসরণ করিয়া আমরা গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার প্রার্থনা বিফল হয় নাই। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই ব্যাঘ্রের গর্জন শোনা গেল। নিম্ব-দেবতাই ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া বোধ হয় গর্জন করিলেন। সহসা দেখিলাম সেই বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি লোকগুলি সভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। আমরাও সকলে পলায়ন করিতে লাগিলাম। সেই গভীর অরণ্যে ছত্রভংগ হইয়া কে যে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, আমি একা একটা কণ্টকবনের ভিতর আটকাইয়া পড়িয়াছি। চতুর্দিকে কেহ নাই। ভংগা ঘিসুর নাম ধরিয়া তিনবার ডাকিলাম, কোনও উত্তর পাইলাম না। অতিকষ্টে আমি তখন নিজেকে সেই কণ্টকবন হইতে উদ্ধার করিলাম। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। আবার ভংগা এবং ঘিসুকে ডাকিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলাম না। তখন একাই নিম্বদেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে বনের মধ্যে যদৃচ্ছ চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর সহসা দেখিলাম বন শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রান্তরের অপর প্রান্তে অপ্রত্যাশিতভাবে চম্মনাকেও দেখিতে পাইলাম। চম্মনাকে আমাদের অনুসরণ করিতে বলিয়া নিনানি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। তখন যদি আমি চম্মনাকে দেখিতে না পাইতাম তাহা হইলে হয়তো এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। গজন্ধরের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়াছিলাম,

রাত্রিও অন্ধকার ছিল, প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হইয়াছি এইটুকু মনে ছিল শুধু, চন্দনাকে না পাইলে আমি হয়তো পথই চিনিতে পারিতাম না। নিনানি কোথায়, তাহাকে দেখিতেছি না—"

ধবল সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল কিন্তু কেহই কোনও উত্তর দিতে সাহস করিল না। অবশেষে ধবলের দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল এবং নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

আমি বলিলাম, "নিনানি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কাল রাত্রিতে সে কন্যা নদীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

"কেন ?"

ধবলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি তখন তাহাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। সমবেত সকলেই রুদ্ধশ্বাসে আমার বর্ণনা শুনিল। জনতার মধ্যে বিঘাওও ছিল, সে-ও শুনিল। দেখিলাম তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছে, বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে তাহার মুখমণ্ডল হইতে এক অস্বাভাবিক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আমার বর্ণনা শেষ হইলে ধবল বিঘাওয়ের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, কোন কথা বলিল না। বিঘাওয়ের আচরণের প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস করিত না, এমন কি দলপতি ধবলও না। ধবলের মৌন দৃষ্টি কিন্তু নীরব ভাষায় যাহা বলিল কথা দ্বারা তদপেক্ষা বেশি সে বলিতে পারিত না। সে চাহনি বিঘাওকেও বিচলিত করিল।

বিঘাও বলিল, "তুমি চলিয়া যাইবার পর আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। তাহার পর আমার মধ্যে তোমার প্রমাতামহ আসিয়া আমার মুখ দিয়া কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। আমার মূর্ছা যখন ভাঙিল তখন দেখিলাম নিনানিও মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া গান করিতেছে। আমি তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে বলিলাম। সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। তাহার পর কি ঘটিয়াছে আমিও জানি না। জংলা যাহা বলিতেছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর এবং মর্মান্তিক। জংলা, তুমি কি স্বচক্ষে দেখিলে সে ডুবিয়া গেল ?"

আমি তখন মিথ্যা কাহিনীটা বিশদতর করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলাম।

বলিলাম, "আমি গভীর রাত্রে একটা শব্দ শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিলাম। মনে হইল আমাদের ক্ষেতে বোধ হয় কোনও জানোয়ার আসিয়াছে। বাহির হইয়া কিন্তু কোনও জানোয়ার দেখিতে পাইলাম না। ক্ষেতের যে অংশটুকু আমাদের আস্তানা ছাড়াইয়া কন্যা নদীর বাঁকের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, মনে হইল সেই অংশে কি যেন নড়িতেছে। আমার সন্দেহ হইল হয়তো খরগোসের দল আসিয়াছে। ক্ষেতের ভিতর দিয়াই আমি আগাইয়া যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে সহসা কন্যা নদীর জলে একটা আলোড়ন শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন ঝপাং করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। সন্দেহ হইল—হয়তো উদবিড়াল বা অন্য কোনও জলজন্তু। ছুটিয়া কাছে গিয়া কিন্তু

দেখিলাম নিনানি। নিনানিও আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে বলিল—কানার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমি স্নান করিতে আসিয়াছি। বিঘাওয়ের ঘায়ের পুঁজরক্ত মাথায় করিয়া আমি থাকিতে পারিব না। ইঁহার জন্য কানা যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় দিক।' এইটুকু বলিয়াই কিন্তু পরমুহূর্তে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল, 'আমাকে জলের তলায় কে যেন টানিতেছে, আমি তলাইয়া যাইতেছি, গেলাম, গেলাম।' নিমেষের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম কিন্তু নিনানিকে আর পাইলাম না। বহুবার ডুবিয়া ডুবিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু তাহাকে আর ধরিতে পারিলাম না। একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া আসিয়া সকলকে খবর দিই, কিন্তু আবার মনে হইল খবর দিতে গেলে দেরি হইয়া যাইবে, নিনানিকে পাইবার আশা তাহা হইলে একেবারেই আর থাকিবে না। আমার চক্ষুর সম্মুখে সে যে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে আমিই বরং সেই স্থানটা ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখি। পাগলের মতো আমি ক্রমাগত ডুবিয়া ডুবিয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম। ক্রমশ মনে হইল, কন্যা নদীর স্রোতের বেগ বাড়িতেছে, তাহা যেন আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছে। সেই স্রোতের বেগে গা ভাসাইয়া দিলে নিনানি যে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে সে স্থান হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে এই আশঙ্কায় আমি স্রোতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলাম। কন্যা নদীর সহিত কাল সমস্ত রাত্রি মল্লযুদ্ধ করিয়াছি। আমার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। কিন্তু কন্যা যে অবশেষে আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল একটু আগে তাহার প্রমাণ পাইলাম। ওই বাঁকের মুখে যে গাছ তিনটি জলের উপর ঝুঁকিয়া আছে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম আমি সেই গাছের তলায় পড়িয়া আছি। ও স্থানে যে কি করিয়া আসিলাম তাহা জানি না। মনে হয় আমি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম; আমার দেহটাকে কন্যা নদী ভাসাইয়া আনিয়া তীরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। আমি এতক্ষণ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

সকলে আমার এই কল্পিত কাহিনী নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেছিল, আমার নিজের কাহিনী শুনিয়া আমি নিজেই মনে মনে মুগ্ধ হইতেছিলাম। আমি যে রূপকথা সৃষ্টি করিতে পারি তাহা আমি নিজেও জানিতাম না। আমার কাহিনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে একটা ভয়সূচক আর্তধ্বনি করিল। মেয়েদের মধ্যে অনেকে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল, পুরুষদের মধ্যে অনেকে বুক চাপড়াইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। সকলেই যে শোকাক্রান্ত হইয়াছে তাহা মনে হইল না, ধবলের তুষ্টি বিধানের জন্যই অনেকে শোকের অভিনয় করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ধবল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রবীণা পত্নী ইলচি আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল এবং বলিল, "তুমি যখন ওই অজ্ঞাতকুলশীলা বিধবাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছিলে তখনই আমি তোমাকে মানা করিয়াছিলাম। অপরাজিতা বংশের নামও আমরা কেহ কখনও শুনি নাই। আমাদের কলঙ্গা জমির সন্ধানে বাহির

হইয়া কোথা হইতে যে উহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা কাহাকেও বলে নাই। উহাকে বিবাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কলঙ্গা মারাও গেল। আমার বিশ্বাস নিনানি মায়াবিনী ছিল, এখন তোমার না কোনও অমঙ্গল হয়। তাহার প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা কর, ওঠ—"

ধবল উঠিয়া দাঁড়াইল। ইলচির জ্যেষ্ঠ পুত্র মোকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,"নিনানি ফুল ভালবাসিত। তাহার তৃপ্তির জন্য তোমরা আজ কন্যা নদীকে ফুল দিয়া সাজাও। তুমি সকলকে লইয়া যাও ফুল সংগ্রহ করিয়া আন।"

ঘিসুর প্রবীণা পত্নী নারো এবং ভংগার প্রবীণা পত্নী সাংরা ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিল।

নারো বলিল, "ঘিসু কবে ফিরিবে—?"

সাংরা বলিল, "আমি আর কতদিন উপবাস করিব?"

ধবল বিপন্ন বোধ করিলে চক্ষু বুজিয়া ফেলিত। সে কোনও উত্তর না দিয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল।

নারো বলিল, "আমি গোক্ষুর বংশের মেয়ে। আমি প্রতিশোধ লইব। ঘিসু দুই-এক দিনের মধ্যে যদি ফিরিয়া না আসে আমরা সকলে উলম্ভনের দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিব, উলম্ভনকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া আসিব।"

"আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঘিসুর দ্বাদশ পত্নী এবং চল্লিশটি পুত্র কন্যা নারোর পিছনে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সকলেরই দক্ষিণ বাহু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত এবং হস্ত মুষ্টিবন্ধ। পরমুহূর্তেই সাংরা এবং সাংরার সপত্নীগণ পুত্র-কন্যাসহ নারোর দলে আসিয়া যোগদান করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল, "আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব।"

ধবল চক্ষু বুজিয়া ছিল, বুজিয়াই রহিল। তাহার পর কলরব যখন একটু প্রশমিত হইল তখন ধীরে ধীরে বলিল, "ঘিসু এবং ভংগার জন্য আমিও কম চিন্তিত নই। তাহাদের মঙ্গলের জন্য আমিও নিম্বদেবতার নিকট প্রতিমুহূর্তে প্রার্থনা প্রেরণ করিতেছি। চিন্তাও করিতেছি তাহারা যদি না ফেরে কি উপায়ে তাহাদের ফিরাইয়া আনা সম্ভব। কিন্তু গজন্ধরের আচরণ হইতে এবং অরণ্য মধ্যস্থ ওই লোকগুলির আকৃতি প্রকৃতি হইতে এইটুকু আমি বুঝিয়াছি যে, হঠকারিতা করিলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্থ হইব। উলম্ভন শক্তিশালী দলপতি, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমার প্রমাতামহ কানাকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। বিঘাওয়ের উপর ভর করিয়া নিনানিকে তিনি যে শাস্তিদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার রোষেরই পরিচয় পাইতেছি। তিনি কেন রুষ্ট হইয়াছেন তাহা আগে আমাকে জানিতে দাও। আমাকে কিছু সময় দাও তোমরা। তোমরা যদি শোকাবেগে অধীর হইয়া এখনই উলম্ভনের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর তাহার একটিমাত্রই সুনিশ্চিত ফল হইবে।

কয়েকদিন পরে তোমাদের জন্যও আমাদের শোক করিতে হইবে। তোমরা ধৈর্য ধরিয়া কিছুকাল অপেক্ষা কর। যে বৃক্ষ আমাদের কুলদেবতা তিনি ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, তাই তিনি ফলবান। তোমরা অধীর হইও না। নিনানির প্রেতাত্মাকে তৃপ্ত করবার জন্য মোকা ফুল সংগ্রহ করুক, কানাকে তুষ্ট করিবার জন্য এস আমরা সকলে নিজ নিজ শরীর হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া নিম্ব বৃক্ষ-তলে উপহার দিই। ইহাতেই সুফল ফলিবে। অধীর হইলে কোন লাভ হইবে না। তোমরা এই সবেরই আয়োজন কর। আমি একবার আমাদের ক্ষেতগুলি পরিদর্শন করিয়া আসি।"

দলপতি ধবলের এই কথাগুলিতে কাজ হইল। সাংরা এবং নারোর দল ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। বিঘাও এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। ধবল উঠিয়া যখন ক্ষেতের দিকে চলিয়া গেল তখন সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ মাটির উপর সে ভেকের মতো শুইয়া পড়িল এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া অদ্ভুত একটা শব্দ করিতে লাগিল—"ঘেক ঘেক ঘেক ঘেক।" বালক-বালিকারা তাহাকে ভয় করিত, তাহারা পলায়ন করিল। আমরাও অনেকে ভীত হইলাম, আবার কোন উপদেবতা আসিয়া ভর করিলেন নাকি! বিঘাও কিন্তু একটি কথাও বলিল না। সে কেবল ঘেক ঘেক ঘেক ঘেক শব্দ করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। তাহার পর ভেকের মতোই লাফাইতে লাফাইতে সে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমরা সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। বিঘাও যে শব্দ করিতেছিল তাহা অনেকটা কুকুরের ডাকের মতো, কিন্তু ভেকের অনুকরণে সে কেন যে লাফাইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভীত হইয়া পড়িলাম।

...কিছুক্ষণের মধ্যেই কন্যা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পুষ্পসম্ভার দুলিতে লাগিল। যে ক্ষুদ্র নিম্ববৃক্ষটি আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতাম সেই বৃক্ষের তলদেশ, কাণ্ড, এমন কি শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত আমাদের রক্তে চর্চিত হইয়া গেল। আমরা যখন পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম তখন কয়েকটি নিম্ব বৃক্ষের চারা এবং বীজ সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেগুলি আমাদের ক্ষেতের ধারে ধারে রোপণ করা হইয়াছিল। আমাদের আশঙ্কা ছিল নূতন স্থানে নিম্ব বৃক্ষ যদি না থাকে আমরা মুশকিলে পড়িব। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হইয়াছিল, উন্নগা পর্বতের সানুদেশে একটি ক্ষুদ্র নিম্ব বৃক্ষ আবিষ্কার করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। বিপদে পড়িলে এই বৃক্ষ-তলেই আসিয়া আমরা পূজা করিতাম। আমাদের ক্ষেতের ধারে যে ছোট ছোট চারাগুলি আমরা পুঁতিয়াছিলাম ধবলের নির্দেশ অনুসারে সেগুলিকেও রক্ত-সিক্ত করা হইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অঙ্গুলি বিদ্ধ করিয়া যে রক্ত বাহির হইল সেই রক্তবিন্দুগুলি তাহাদের শাখায় পত্রে চন্দনা লাগাইয়া দিল। চন্দনার উপরই এই ভার পড়িয়াছিল। সে-ই তীক্ষ্ণমুখ এক প্রস্তর ছুরিকা

দিয়া সকলের অঙ্গুলি হইতে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল। লক্ষ্য করিলাম এই সুযোগে সে কয়েকটি আসন্ন-যৌবনা কিশোরীর নিকট প্রণয় দাবী করিতেছে, বলিতেছে তাহারা যদি অসম্মত হয় তাহা হইলে সে তাহাদের অঙ্গুলিতে এমন-ভাবে ছুরিকাঘাত করিবে যে রক্ত আর বন্ধ হইবে না। উন্নগা পর্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র নিম্ব বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া যে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল সেখানে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল ধবলের পত্নীরা। তাহাদের সহায়তা করিতে-ছিল সাংরা এবং নারো।

...নিম্ব বৃক্ষতলে রক্তদান করিয়া আমি তাড়াতাড়ি ভিড় হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। উন্নগা পাহাড়ে ফিরিয়া গিয়া শিলাঙ্গীর সহিত দেখা করিবার জন্য আমার সমস্ত চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেখা পাইব কি-না কিছুই ঠিক ছিল না; তবু সেই উদ্দেশ্যেই আমি উন্নগা পর্বতের দিকেই চলিয়াছিলাম। যাইতে যাইতে সহসা আবার বিঘাওয়ের কথা মনে হইল। সে ওরূপ করিল কেন? আমার মিথ্যাচরণ সে কি যাদুশক্তি বলে জানিতে পারি-য়াছে? ভেকের মুখে কুকুরের ভাষা দিয়া সে কি এই কথাই বলিতে চাহিল, ভেকের মুখ হইতে কুকুরের ডাক বাহির হওয়া যেমন অসম্ভব, বিঘাওকে প্রতা-রণা করাও তেমনি অসম্ভব? সে কি যাদুশক্তি বলে সব জানিতে পারিয়াছে? ধবল চলিয়া যাইবার পরই সে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল— "তোমাদের সর্বনাশ রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে" —তাহা তো নিতান্ত মিথ্যা নয়। গজন্ধরের আচরণ, ঘিসু-ভংগার অন্তর্ধান সত্যই অমঙ্গল-সূচক। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়াছিলাম। যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিয়াছিলাম বটে কিন্তু যে ক্ষতি আমাদের হইয়াছিল তাহাও ভয়াবহ। আবার যদি যুদ্ধ বাধে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। মনে হইল বিঘাওয়ের খবরটা একবার লওয়া যাক। দেখা যাক আমাকে দেখিয়া সে কিছু বলে কি-না। এখন তাহার কুটীরের কাছে কেহ নাই (তাহার কুটীরের কাছে কেহ থাকিতেও চাহিত না, আমাকে দেখিলে হয়তো সে কিছু বলিতে পারে। বিশেষত তাহার অদ্যকার অদ্ভুত আচরণের কারণ যদি আমিই হই নিশ্চয় কিছু বলিবে। উন্নগা পর্বতে কিছুদূর উঠিয়া গিয়াছিলাম পুনরায় নামিয়া আসিলাম।

...বিঘাও কুটীরের বাহিরে বসিয়াছিল। তাহার হস্তে ছিল মৃত বাঘের থাবাটা। এটি তাহার অতিশয় প্রিয় বস্তু ছিল। কবে কোথা হইতে কোন মৃত বাঘের দেহ হইতে যে সে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। বাঘের সম্মুখের একটা পা-কে সে যষ্টির মতো ব্যবহার করিত। তাহার ভিতরের মাংস ছিল না। হাড়টা ছিল, চামড়াটা ছিল আর ছিল নখগুলি। চামড়ার খোলটার ভিতর বিঘাও নানাপ্রকার মাটি, পাথরের টুকরা, গাছের শিকড় প্রভৃতি পুরিয়া রাখিত। অদ্ভুত জিনিস ছিল সেটা একটা। আমি দূর হইতে দেখিলাম বিঘাও নিবিষ্টচিত্তে বাঘের নখগুলি পর্যবেক্ষণ করিতেছে। নখগুলিকে

সে সূক্ষ্ম লতা দিয়া এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে সেগুলি খুলিয়া পড়িয়া যায় নাই। আমি গিয়া তাহার সম্মুখে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিকে এইভাবেই তখন আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতাম। তাহার পর উঠিয়া অদূরে উপবেশন করিলাম। বিঘাও কিন্তু এমনভাবে ব্যাঘ্রনখগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল যেন সে আমাকে দেখেই নাই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর অবশেষে আমি কথা কহিলাম।

বলিলাম, "আমাদের এই বিপদে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।"

বিঘাও ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তাহার পর উত্তর দিল, "প্রস্তরের উপর বীজ বপন করিলে তাহা অংকুরিত হয় না। প্রস্তরের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিলেও হয় না। প্রস্তরকে বাহুবলে সরাইয়া দিয়া মাটি খুঁড়িয়া বীজ বপন করিলে অংকুর হইবার সম্ভাবনা আছে।"

এই কথা কয়টি বলিয়া আবার সে বাঘের থাবাটা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি আবার একটি প্রশ্ন করিলাম।

"নিন্নানির প্রেতাত্মা কিসে তৃপ্ত হইবে? শুধু ফুল দিলেই হইবে কি?"

"নিন্নানির মৃতদেহ যতক্ষণ না দেখা যাইবে ততক্ষণ তাহার প্রেতাত্মা বিষয়ে কোনও আলোচনা করা বৃথা। আমার বিশ্বাস তাহার যদি কোনও কারণে অতৃপ্তি হয় সে নিজেই আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিবে।"

তাহার পর সহসা সে আমার মুখের উপর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বাঘের থাবাটি তুলিয়া ধরিল এবং নখরগুলি দেখাইয়া বলিল, "ইহাদের তীক্ষ্ণতার মধ্যেই আমি প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছি। ইহারা মৃত নয়, জীবন্ত। ইহাদের নির্দেশ অমোঘ, লক্ষ্য সুনিশ্চিত।" আমি সভয়ে বাঘের থাবাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম, মনে হইল সেগুলি নড়িতেছে। আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, দ্রুতবেগে উঠিয়া পলায়ন করিলাম। বিঘাও অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

...দূর হইতে দেখিতে পাইলাম ধবল নদীতীরে একা বসিয়া আছে। তন্ময় একাগ্র হইয়া বসিয়া আছে, কন্যা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে যে কলধ্বনি জাগিয়াছে তাহারই নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিবার প্রয়াস করিতেছে মনে হইল। আর একটু কাছে আসিয়া দেখিলাম সে প্রার্থনা করিতেছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত, পাণিদ্বয় যুক্ত। ধবলও প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু ভিন্নপথে।

...শিলাঙ্গীর সন্ধানে উন্নগার উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন সুড়ঙ্গের যে মুখটি দিয়া প্রবেশ করিয়া আমি কথকের অদ্ভুত কথকতা শুনিয়াছিলাম সেই মুখের ভিতর ঢুকিয়া বসিয়া রহিলাম। ঠিক করিলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যদি তাহার দেখা না পাই নিন্নানির কাছে যাইব। নির্জন সুড়ঙ্গমুখে বসিয়া বসিয়া বিগত কয়েক দিনের ঘটনাবলীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে হইল কন্যা নদীর

তীরে প্রথম ফসল বেশ নির্বিঘ্নে হইয়াছিল, ফলিয়াছিলও প্রচুর। কিন্তু দ্বিতীয় ফসলের বেলায় একটা না একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অনাবৃষ্টির জন্য কন্যা নদীতে বান হয় নাই, ফসলও তাই এবার কম ফলিয়াছে। সহসা মনে হইল নিনানিকে এমনভাবে লুকাইয়া রাখা কি ঠিক হইয়াছে? তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটু আগে যে মিথ্যার জাল রচনা করিলাম সেই জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িব না তো? আমাদের সমস্ত সম্প্রদায় জড়াইয়া পড়িবে না তো? বিঘাওয়ের কথা শুনিয়া মনে হইল নিনানির মৃত্যুসংবাদ সে সম্পূর্ণ-ভাবে বিশ্বাস করে নাই। বাঘনখের মধ্যে সে কিসের প্রতিকার সন্ধান করিতে-ছিল? আমাকে সন্দেহ করে নাই তো? একটা অনির্দিষ্ট ভয় আমার সমস্ত চেতনাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ভয় হইতে লাগিল কানা যদি ভীষণ প্রতিশোধ লয়? নিনানিকে এমনভাবে শুধু শুধু লুকাইয়া রাখিতে গেলাম কেন! ধবল এবং বিঘাওয়ের নিকট যদি সত্য কথা সরলভাবে স্বীকার করি তাহা হইলে কি হয়? তাহারা এখন এই সত্যের মূল্য দিবে কি? নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করিয়াছিল। সহসা শিলাঙ্গীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। সে তাহার গাভীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল।

"দুধু—নী, দুধু—নী—"

মনে হইতেছিল কোনও অচেনা পাখীর ডাকে সমস্ত উপত্যকাটাই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমি সুড়ঙ্গমুখ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম শিলাঙ্গী এক বোঝা সবুজ ঘাস লইয়া একটা গাছের ডালে বসিয়া আছে। সবৎসা গাভীটি মাঝে মাঝে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কিন্তু কাছে আসিতেছে না।

"আমি তাহা হইলে ঘাস এইখানে ফেলিয়া দিয়া চলিলাম। অন্য গরু যদি খাইয়া যায় আমি জানি না।"

শিলাঙ্গী তখনও আমাকে দেখিতে পায় নাই। গাভীর উদ্দেশ্যে উক্ত কথাগুলি বলিয়া সে অধীরভাবে পা দুইটি দোলাইতে লাগিল। গাভী আর একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাছে আসিল না।

"দুধুনী—আহ্—আহ্—আহ্। মধুনী, মধুনী—"

সহসা দুধুনী মধুনী ঊর্ধ্বপুচ্ছে পলায়ন করিল। তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। শিলাঙ্গীও ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং টপ করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। ঘাসের বোঝাটাও নীচে পড়িয়া গেল।

"উহাদের অদৃষ্টে আজ আর ঘাস নাই দেখিতেছি। এখনই অন্য গরু আসিয়া খাইয়া যাইবে।"

"তুমি গাছে উঠিয়াছিলে কেন? উহাদের কাছে গিয়া দিলেই পারিতে—"

"কাছে গেলে গুঁতাইতে আসে।"

"তুমি ঘাস দাও তবু গুঁতাইতে আসে?"

"বোকা যে।"

হাসির আভা তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। মনে হইল ভিতর হইতে কে যেন আলো জ্বালিয়া দিল। পরমুহূর্তে কিন্তু আবার গম্ভীর হইয়া গেল সে। চোখে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

বলিল, "একটা ভয়নক কাণ্ড হইয়াছে, জান? আমাদের হয় তো এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।"

"কেন?"

"উলম্ভন নামে এখানে কোথায় যেন একজন রাজা আছে। সে নাকি এ অঞ্চলের সমস্ত বন পাহাড় প্রান্তর নদীর অধিপতি। রোহার নিকট সে লোক পাঠাইয়াছিল বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য। রোহা বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। রোহা বলিতেছে যদি প্রয়োজন হয় এস্থান পরিত্যাগ করিব তবু বশ্যতা স্বীকার করিব না। ঝোনাঝিরা বলিতেছে, এস্থান পরিত্যাগই বা করিব কেন, যুদ্ধ করিব। রোহা কিন্তু যুদ্ধ করিতে চাহে না। রোহা বলিতেছে আমাদের জনবল কম, অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর নাই, যুদ্ধ করিতে গেলে আমাদের গরুর দল এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িবে—"

"উলম্ভন আমাদের নিকটও লোক পাঠাইয়াছিল। লোকটির নাম গজন্ধর। ভীষণাকৃতি দৈত্য একটা। আমাদের দলপতি ধবল আমাদের দলের ঘিসু ও ভংগাকে লইয়া গজন্ধরের সহিত গিয়াছিল উলম্ভনের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য। কিন্তু গজন্ধর তাহাদের উলম্ভনের কাছে না লইয়া গিয়া লইয়া গেল একটা গভীর অরণ্যের মধ্যে। সেখানে আরও কয়েকজন দৈত্যাকৃতি লোক লুকাইয়াছিল। তাহারা ধবল ঘিসু ভংগাকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বন্দী করিতে চাহিল। বলিল তাহাদের কোন পাহাড় হইতে নাকি পাথর বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। উলম্ভন নাকি দেশের মঙ্গলের জন্য প্রস্তর-নির্মিত কবর প্রস্তুত করাইতেছে। বনের মধ্যে হঠাৎ একটা বাঘ বাহির হইয়া পড়াতে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ধবল কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ঘিসু ভংগার এখনও কোন পাত্তা নাই।"

শিলাঙ্গী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমার কথা শুনিতেছিল।

"তোমরা এবার কি করিবে?"

"এখনও কিছুই ঠিক হয় নাই। ধবল বলিতেছে, কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া দেখা যাক কি হয়। যুদ্ধ করা তাহারও ইচ্ছা নয়। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের লোকবলও প্রচুর নয়। ক্ষেতের কাজ করিতেই বহু লোকের প্রয়োজন, যুদ্ধ করিবার লোক কই?"

শিলাঙ্গী বলিল, "আমরা দুই দল যদি একত্রিত হই তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা উলম্ভনকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি। তাহার এই স্পর্ধা সহ্য করা উচিত নয়। ধবল যদি রোহার কাছে যায়—"

"ধবল কোথাও যাইবে না; তুমি যদি রোহাকে আনিতে পারো—"

"রোহাও আসিবে না—"

আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর হাসিয়া উঠিলাম সহসা। জগদ্দলবৎ অনড় সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আজও উদীয়মান যৌবন যে অট্টহাস্য করে আমাদের মুখ দিয়াও সেদিন সেই হাসি নির্গত হইল।

শিলাঙ্গী বলিল, "তুমিও রোহার কাছে চল; আমিও ধবলের কাছে যাই।"

"তাহার পর?"

তুমি রোহাকে গিয়া সোজা বলিবে আমরা তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাই। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তোমাদের শিলাঙ্গীকে আমি বিবাহ করিব। উলম্ভন আমাদেরও অপমান করিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আমরা উভয় দল একত্রিত হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া আসিব।"

"কিন্তু সব শুনিয়াও রোহা যদি আমাকে দূর করিয়া দেয়?"

"চলিয়া আসিবে।"

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল।

"ধবলের কাছে যাইতে তোমার ভয় করিবে না?"

"একটুও না।"

"তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও একথা তুমি ধবলকে বলিতে পারিবে?"

"স্বচ্ছন্দে। আমাকে বিবাহ করিলে তোমাদের কি কি সুবিধা হইবে তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিব। তোমাদের ধবল লোক কেমন?"

"লোক খুব ভাল। রোহা?"

"রোহাও ভাল। তাহাকে একটা কথা বলিও তাহা হইলে সে খুব খুশী হইবে।"

"কি কথা?"

"বলিও যে তোমার বিশ্বাস গরুই সর্বশ্রেষ্ট প্রাণী। ঝোনঝিরা একথা স্বীকার করে না বলিয়া রোহা ঝোনঝিরার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট। ঝোনঝিরা বলে কোন প্রাণীকে ছোট করিয়া দেখা বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ। প্রত্যেক প্রাণীই নিজ নিজ গুণে শ্রেষ্ঠ। বাঘের যে গুণ আছে তাহা গরুর নাই। শশকের যে গুণ আছে তাহা আবার বাঘেরও নাই, গরুরও নাই। গরুকে শ্রেষ্ঠ বলার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু এসব কথা বলিয়া রোহার মনে কষ্ট দেওয়া কি ঝোনঝিরার উচিত? তুমিই বল।"

আমি একটু মুচকি হাসিলাম শুধু।

শিলাঙ্গী বলিল, "এই সবের জন্য ঝোনঝিরাকে আমার ভালও লাগে কিন্তু। ঝোনঝিরা বেশ নূতন রকম করিয়া সব জিনিস ভাবিতে পারে। খুব বুদ্ধিমান—"

"ঝোনঝিরা তোমাকে তো বিবাহও করিতে চায়।"

"চায়। কিন্তু শুধু আমাকে নয় আরও অনেককে। টংখীরা, মাজুম, মাদারী এই তিনজনকে সে ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়াছে। ভিদা, হৈনু, জাংটির সঙ্গেও বেশ ভাব হইয়াছে তাহার। হয়তো সে তাহাদেরও বিবাহ করিবে।

আমি রাজী হইলে আমাকেও করিবে। কিন্তু আমি ওই ভিড়ে যাইতে রাজী নই।"

সে যুগের পক্ষে কথাটা অদ্ভুত। এক পুরুষের বহু স্ত্রী থাকাই নিয়ম ছিল সে যুগে।

"আমার যে স্ত্রী নাই তাহা তুমি জানিলে কিরূপে?"

"খবর লইয়াছি।"

"কি করিয়া খবর পাইলে?"

"তোমাদের দলের সকলকে আমি চিনি। খুব ভোরে দেবদারু গাছের উপর উঠিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেকের কুটীর লক্ষ্য করিয়াছি। কে কে কোন্ কুটীরে থাকে সব জানি। তোমার সহিত আলাপ হইবার পূর্বেও জানিতাম তুমি কোন্ ঘরটিতে থাক। তোমার ঘরে কখনও কোনও স্ত্রীলোক দেখি নাই। তুমি বিবাহিত হইলে নিশ্চয় স্ত্রীলোক থাকিত।"

ভুরু নাচাইয়া শিলাঙ্গী হাসিয়া উঠিল, তাহার পর লাফাইয়া আমার গলদেশে দুই বাহু বেষ্টন করিয়া ঝুলিতে লাগিল।

"সব জানি, তোমার সম্বন্ধে সব জানি।"

"কিন্তু আমি যে নিনানিকে ভালবাসি।"

"বাসিলেই বা। তাহাকে বিবাহ তো করিতে পারিবে না।"

"তোমাকে বিবাহ করিলে আর কখন বিবাহ করিতে পারিব না বলিতে চাও?"

"না। আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। তোমার ইচ্ছাও হইবে না। আমি একাই তোমার চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিয়া রাখিব।"

"একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকাই তো নিয়ম। তুমি ইহাতে আপত্তি কেন করিতেছ?"

"বড় ঝগড়া হয়। টংখীরা, মাজুম, মাদারী অহোরাত্র কলহ করিতেছে। কাল মাজুম টংখীরার নাক কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, জান?" শিলাঙ্গী আমার কণ্ঠ ছাড়িয়া নীচে নামিয়া পড়িল এবং হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

"সে যে কি কাণ্ড যদি দেখিতে! মাজুম কিছুতেই টংখীরার নাক ছাড়ে না। ঝোনঝিরাও হিমসিম খাইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত প্রহার করিতে তবে ছাড়িল। টংখীরার নাকের খানিকটা একেবারে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। তোমাদের নিনানিরও নিশ্চয় সপত্নী আছে?"

"আছে বই কি।"

"মারামারি করে?"

"করে। সকলেরই নিনানির উপর আক্রোশ।"

"হইবেই। সে যে দেখিতে সুন্দর। টংখীরাও খুব রূপসী, তাই বেচারীর নাকটি গেল। আমি ওসবের মধ্যে কখনও যাইব না। আমার মনে হয় তোমার নিনানিও পলাইয়া আসিয়াছে সপত্নীদের জ্বালায়—"

"সে স্বেচ্ছায় আসে নাই, আমিই তাহাকে আনিয়াছি। আমারই অনুরোধে সে যক্ষিণীর গুহায় আশ্রয় লইয়াছে।"

"সে কি আসিয়া গিয়াছে?"

"হাঁ। যক্ষিণীর সহিত তাহার ভাবও হইয়া গিয়াছে। যক্ষিণী তাহার দিদিমা হয়—"

"বল কি!"

শিলাঙ্গী ক্ষণকাল বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "চল তাহার সহিত ভাব করিয়া আসি।"

"আমি আগে যাই, তুমি একটু পরে আসিও। দুইজনকে এক সঙ্গে দেখিলে নিনানির মনে সন্দেহ জাগিবে। সে বড় হিংসুক।"

"আমি তাহা হইলে কিছু দুধ আনি। যক্ষিণীকে তো আমি প্রায়ই দুধ দিতে যাই, সেইভাবেই যাইব। আজ কিছু বেশি দুধ আনিব যাহাতে নিনানিও একটু ভাগ পায়। দেখিও, দুধ খাওয়াইয়া ঠিক তাহাকে বশ করিয়া ফেলিব।"

"বেশ।"

"তুমি রোহার নিকট কখন যাইবে?"

"নিনানিকে আগে দেখিয়া আসি।"

"তোমার দেখা কখন পাইব?"

"সন্ধ্যায়।"

"কোথায়?"

"ওই ঝোপের নিকটই আমি দেখা করিব।"

"আমি এখন যাই তাহা হইলে। রোহাকে তোমার কথা বলিয়া রাখিব। নিগম বন হইতে রোহা আজ আসিয়াছে। আবার হয়তো সেখানে ফিরিয়া যাইবে। তোমাকে হয়তো নিগম বনেই যাইতে হইবে। বেশি দূর নয়—"

"যত দূরই হোক যাইব। কিন্তু তাহার আগে ধবলের সহিতও এবিষয়ে আলাপ করিতে হইবে একটু। তোমাদের দলের সহিত যোগ দিয়া আমরা উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব কি না তাহা ধবলই ঠিক করিবে, কারণ সে-ই আমাদের দলপতি। ঘিসু এবং ভঙ্গা যদি ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে যুদ্ধ একটা করিতেই হইবে। ফিরিয়া আসিলেও হয়তো করিতে হইবে, কারণ উলম্ভন যে আমাদের সহজে নিস্তার দিবে তাহা মনে হয় না।"

"দেখ, দেখ দুধুনী মধুনী ফিরিয়া আসিয়া ঘাস খাইতেছে। প্রায় সবটাই খাইয়া ফেলিয়াছে। কখন চুপি চুপি আসিয়াছে আমরা জানিতেও পারি নাই।"

শিলাঙ্গী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। যে যুদ্ধপ্রসঙ্গ আমি তুলিয়াছিলাম মনে হইল তাহা তাহাকে মোটেই বিচলিত করে নাই সহসা বলিল—"খুব সুন্দর, নয়?"

"উহাদের ধরিয়া রাখিলেই পার।"

"ঝোনাঝিরা ধরিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি রাজি হই নাই। ধরিলে

কষ্ট হইবে না উহাদের? তাছাড়া আর একটা কথাও মনে হয় আমার।"

"কি?"

"ধরিলেই উহারা ফুরাইয়া যাইবে। এখন যেমন সকালে উঠিয়াই খোঁজে বাহির হই, কোথায় আছে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াই, উহাদের জন্য ঘাস সংগ্রহ করি, দূর হইতে ঘাস ছুঁড়িয়া দিয়া দেখি উহারা খাইতেছে কিনা—তখন আর এসব হইবে না। উহারাও ফুরাইয়া যাইবে, আমারও কাজ থাকিবে না।"

আমার মনে একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল।

বলিলাম, "আমার সহিত তোমার যদি বিবাহ হয় তাহা হইলে আমিও তো তোমার কাছে ফুরাইয়া যাইব!"

"তুমি কি গরু না কি! তুমি যে মানুষ।"

"হইলই বা।"

"মানুষ অত সহজে ফুরায় না। প্রত্যেক মানুষ এক একটি ধাঁধাঁ। তাহাকে চিনিতেই অনেক দিন লাগে, বুঝিতে আরও বেশী দিন লাগে, তাহার আদি অন্ত জানিতে জীবনই শেষ হইয়া যায়।"

শিলাঙ্গীর চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

"এসব কথা আমার নয় কিন্তু, আমাদের কথক নীল-মিল একদিন বলিয়াছিল। আমার মনে হয় নীল-মিল ঠিকই বলিয়াছে। তোমাকে আমি মোটেই চিনিতে পারি নাই। ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু চিনিতে পারি নাই। তুমি আমাকে পারিয়াছ কি?"

"না—"

"কিন্তু একদিন আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারিব। পারিব না?"

শিলাঙ্গী সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

"নিশ্চয়ই পারিব"।

সেদিন একথা বলিয়াছিলাম বটে কিন্তু সত্যই কি শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারিয়াছিলাম? পারি নাই। আমার ভোগের নাগালের মধ্যে তাহাকে যতটুকু পাইয়াছিলাম ততটুকুই তাহাকে চিনিয়াছি। কিন্তু আমার ভোগের নাগাল কতটুকু? সে ক্ষুদ্র পরিধিকে অতিক্রম করিয়া যে মহিমময়ী শিলাঙ্গী আমার ভোগাতীত লোকে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তাহার আভাসমাত্র পাইয়াছিলাম যখন সে আমার নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল।

"তুমি তাহা হইলে নিনানির কাছে যাও। আমিও একটু পরে আসিতেছি। তুমি কতক্ষণ থাকিবে?"

"বেশীক্ষণ নয়। তাহার খবরটা লইয়া চলিয়া যাইব। আমাকে আজই আবার ধবলের সহিত দেখা করিতে হইবে। কাল সময় পাওয়া যাইবে না, কারণ, কাল আমাদের খনিত্র পূজা, ধবল ব্যস্ত থাকিবে।"

"খনিত্র পূজা কি?"

"আমরা গাছের শাখা সূচালো করিয়া তাহা দিয়াই জমি খুঁড়ি। কাল

সেইগ্ুলিকে একত্রিত করিয়া আমরা তাহাদের পূজা করিব। মেয়েরাই করিবে, আমরা কেবল উপবাস করিয়া থাকিব। আমাদের মেয়েরা এতক্ষণ বোধ হয় ইঁদুর খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। এবার আমাদের ফসল তেমন ভাল হয় নাই। প্রথম বৎসর খুব ভাল হইয়াছিল। এবার তাই পূজাটা ভাল করিয়া করিতে হইবে—কাল ধবল হয়তো সমস্ত দিনই প্রার্থনা করিবে। আজই তাহার সহিত কথাবার্তা বলিব। নিনানির কাছে বেশীক্ষণ থাকা চলিবে না।"

"আমি সন্ধ্যার আগেই কিন্তু ঝোপের মধ্যে আসিয়া বসিয়া থাকিব। তুমি যেন বেশী দেরি করিও না।"

"না, দেরি করিব না। আমি তাহা হইলে যাই এখন।"

"বেশ—"

যক্ষিণীর গুহার উদ্দেশ্যে আমি যাত্রা করিলাম। শিলাঙ্গী কিন্তু গেল না। সে তাহার দুধুনী মধুনীকেই দেখিতে লাগিল। আমি চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম সে তাহাদের কি যেন বলিতেছে, মাঝে মাঝে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাদের ডাকিতেছে, কিন্তু দুধুনী মধুনী কিছুতেই কাছে আসিতেছে না।

...যক্ষিণীর গুহার কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম যক্ষিণী একদল কাকের সহিত কাকের ভাষায় কথোপকথন করিতেছে। যক্ষিণী আমার আগমন টের পায় নাই, আমি একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। এমন বিস্ময়কর ব্যাপার আমি আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। মনে হইল কাকগুলি হরিণের মাংসে ভাগ বসাইতে আসিয়াছে। বিদ্রোহী জনতা রাজশক্তির নিকট যেমন খাদ্যের দাবী করে তাহারাও যেন ঠিক তেমনি-ভাবে যক্ষিণীর নিকট দাবী জানাইতেছে। যক্ষিণীও তাহাদের দাবীর উত্তরে 'কা কা' 'ক-আ' 'ক্যাক্ ক্যাক্' শব্দ করিয়া বায়স-ভাষায় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখিলাম তাহার গুহার সম্মুখে অনেক কাক উড়িতেছে, আশেপাশে যে সব বৃক্ষ ছিল তাহাদের শাখায় শাখায় বহু কাক বসিয়াছে এবং প্রত্যেকেই চীৎকার করিতেছে। যক্ষিণীও চীৎকার করিতেছে। আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেস্থান হইতে যক্ষিণীর গুহার ভিতরটা সব দেখা যাইতেছিল না, যক্ষিণীর মুখের খানিকটা অংশ কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে হইতেছিল তাহার চোখের দৃষ্টি ভীত ত্রস্ত, তাহাতে ক্রোধ বা স্পর্ধার প্রকাশ নাই, তাহা যেন আর্ত অসহায়। যক্ষিণী কাকগুলিকে তাড়াইয়া দিতেছে না কেন এই কথাই বারম্বার আমার মনে হইতেছিল। তাহার কাছে কি কোনও অস্ত্র নাই? এমন কি লাঠি পর্যন্ত নাই না কি? যদি না-ও বা থাকে কাক তাড়াইবার মতো অস্ত্র সংগ্রহ করিতে কতটুকু সময় লাগে? উঠিয়া একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া লইলেই তো হইল। তা ছাড়া নিনানি কোথায় গেল? সে কি তাহার নিজের গুহায় চলিয়া গিয়াছে? সে থাকিলে নিশ্চয় কাকগুলাকে তাড়াইয়া দিত। এইসব চিন্তা পরম্পরায় মগ্ন হইয়া আমি দূর হইতে কাক-কোলাহল শুনিতে-

ছিলাম এমন সময় আর একটা কাণ্ড ঘটিল। একটা প্রকাণ্ড শকুনি শোঁ করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল এবং ডানা ঝটপট করিয়া যক্ষিণীর গুহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। যক্ষিণীর আর্ত চীৎকারে মনে হইল পণ্ড-পর্বত বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। কাকেরা মহা উৎসাহে কলরব করিতে লাগিল, মনে হইল তাহারা যেন একজন নেতা পাইয়াছে। আমি আর নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া গিয়া একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া লইয়া যক্ষিণীর গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলাম। শকুনি এবং কাকের দল নিমেষে ছত্রভঙ্গ হইয়া উড়িয়া গেল। তখন আমি দেখিলাম যক্ষিণী হরিণের কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে আবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, আরও জোরে কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। আমি যে তাহার উপকারী বন্ধু এ কথা সে যেন বুঝিতেই পারিল না। মনে করিল আমিও একজন আততায়ী, তাহার হরিণটাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি। আমি সবিস্ময়ে যক্ষিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার মুখের চতুর্দিকে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকাইয়া আছে মাংস অস্থি এবং চর্বির টুকরা। তাহার ওষ্ঠ এবং অধরের আশপাশে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নও দেখা যাইতেছিল। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, এমন অদ্ভুত বীভৎস দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। হয়তো আমার কোনও পূর্ব-জন্মে এতদপেক্ষা বীভৎসতর কোন দৃশ্যের আমি সাক্ষী ছিলাম, হয়তো বা কারণও ছিলাম কিন্তু সে কথা আমার মনে ছিল না, মনে হইতেছিল এ দৃশ্য আর দেখি নাই, মনে হইতেছিল ইহা আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব, ইহা যে আমারই অতীত জীবনের প্রেত-মূর্তি একথা কল্পনা করা অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে তখন। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম। দেখিলাম যক্ষিণীর অঙ্গে কোন আবরণ নাই, তাহার বৃহদাকৃতি স্তনযুগল স্ফীত উদরের উপর প্রলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। স্তনযুগলও হরিণরক্তে রঞ্জিত, হরিণ-বসায় পিচ্ছিলীকৃত। তাহার উদরদেশ অস্বাভাবিক রকম স্ফীত মনে হইল। তাহা শরীরের একটা অংশ বলিয়া মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল কে যেন বাহির হইতে একটা বোঝা বা স্তূপ তাহার বুকের নীচে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার উপর রক্ত এবং চর্বির দাগ। সহসা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলাম, যক্ষিণী এত খাইয়াছে যে নড়িতে পারিতেছে না। প্রায় একটা গোটা হরিণ গলাধঃকরণ করিয়া সে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। কাক এবং শকুনির নিকট তাই তাহাকে হার মানিতে হইয়াছে। আমার আচরণে যক্ষিণী কিন্তু একটুও আশ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। আমি যতক্ষণ তাহার কাছে ছিলাম সে চীৎকার করিতেছিল। কি যে বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিতে-ছিলাম না, কিন্তু তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে আমাকে গালি দিতেছে। নিনানি কোথায় গেল? ময়াল সাপটাই বা কোথায়? এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। শেষে গুহার ভিতর হইতে

বাহির হইয়া আসিলাম, ভয় হইল ময়াল সাপটা নিনানিকে আক্রমণ করে নাই তো। তাড়াতাড়ি গুহার নিকট হইতে নামিয়া গেলাম, নামিয়া যাইবামাত্র কিন্তু কাকের দল আবার আসিয়া গুহামুখে হানা দিল, তাহারা নিকটেই বৃক্ষ-শাখায় বসিয়াছিল। দেখিলাম শকুনিটাও অপেক্ষা করিতেছে। তাহার পর সহসা আগড়টা নজরে পড়িল। সেটা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। আগড়টা তুলিয়া যক্ষিণীর গুহামুখ বন্ধ করিয়া দিলাম। আগড়টা পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই যক্ষিণী বিপদে পড়িয়াছিল। হয়তো নিনানিই আগড়টা খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে গেল কোথায়? তাহার পর মনে পড়িল ময়াল সাপের গুহাও তো যক্ষিণী আগড় দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। উঁকি দিয়া দেখিলাম, সেটা বন্ধই আছে। ময়াল সাপ তাহা হইলে বাহির হয় নাই। নিঃসংশয় হইবার জন্য তবু সে গুহাটার কাছে গেলাম একবার, ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলাম সাপটা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, একটা মৃদু শোঁ শোঁ শব্দও শোনা যাইতেছে। নিশ্চিন্ত হইয়া তখন নিনানির খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলাম। নিনানির গুহায় গিয়া দেখিলাম সেখানে সে নাই। কোথায় গেল? যে শুষ্ক খড়ের বোঝা রাখিয়া গিয়াছিলাম সেগুলি দেখিয়া মনে হইল না যে নিনানি তাহার উপর শুইয়াছে। সহসা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন গান গাহিতেছে। উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিনানি কি? কিন্তু সেই দূরাগত সঙ্গীত এত মৃদু যে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছিল, সেই বাতাসে সেই মৃদু সঙ্গীত ভাসিয়া যাইতে-ছিল। মাঝে মাঝে ভ্রম হইতেছিল তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর কি না। বাতাসের আলোড়নে অরণ্যানি গর্জন করিতেছিল, সেই গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে এক এক-বার মৃদু সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছিলাম। সহসা একটা অদ্ভূত কথা মনে হইল। মনে হইল উন্নতশীর্ষ পাষাণময় গম্ভীর পঞ্চ-পর্বতই কি গান গাহি-তেছে? তাহার আপাত-কঠিন মূর্তির অন্তরালে যে কোমল হৃদয় প্রচ্ছন্ন আছে এই মৃদু সঙ্গীত হয় তো সেই হৃদয়েরই প্রকাশ। বিস্মিত-উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। সে যুগে আমরা বিশ্বাস করিতাম যে সমস্ত জগৎই প্রাণময়। জড় ও জীবের বিশেষ পার্থক্য ছিল না আমাদের কাছে। পঞ্চ-পর্বতের নিগূঢ় বাণী হয়তো শুনিতে পাইলাম এই ধারণাটা কিছুক্ষণ আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিল, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর সঙ্গীতটাকে ধীরে ধীরে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অনুসরণ করিবার পরই কিন্তু ভুল ভাঙিল, নিনানির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলাম, আর একটু অগ্রসর হইয়া তাহার গানের কথাগুলিও শুনিতে পাইলাম। কন্যা নদীর তীরে নিম্ব সম্প্রদায়ের মেয়েরাও আজ এই গান গাহিতেছে। আজ খনিত্র পূজা। নিনানিও সেই পূজা করিতেছে না কি? নিশ্চয়ই করিতেছে। নিনানি চরিত্রের একটা নূতন দিক সহসা আমার কাছে পরিস্ফুট হইল। বিদ্রোহ করিয়া সে দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে বটে

কিন্তু দলের সহিত তাহার আন্তরিক যোগ ছিন্ন হয় নাই। দলের মঙ্গলের জন্য সে গোপনে গোপনে পূজাও করিতেছে। বিস্মিত হইলাম।

...একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া আমি নিনানির পূজা দেখিতেছিলাম। সে খনিত্র পূজাই করিতেছিল, কিন্তু নিজের পদ্ধতিতে করিতেছিল। খনিত্র পূজায় ইঁদুর বলি দেওয়া হয় কারণ ইঁদুর মাটিতে গর্ত খনন করে। খনিত্রের সঙ্গে ইঁদুরের রক্ত লাগাইয়া দিলে তাহাও ইঁদুরের মতোই খননশীল হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। তখন আমাদের খনিত্র ছিল সূচাগ্র গাছের ডাল। খনিত্র পূজার দিন প্রত্যেক নারীই একটি সূচাগ্র বৃক্ষশাখাকে মূষিক-রক্ত-চর্চিত করিয়া পূজা করিত। গানও গাহিত। নিনানিও একটি মোটা গাছের ডালকে পূজা করিতেছিল। দেখিলাম ডালটি সে একটি প্রস্তরের গায়ে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে তাহার পাদদেশে ছোট একটা বেদীর মতও করিয়াছে। সেই বেদীর উপর দেখিলাম কয়েকটি ছিন্ন-মুণ্ড মূষিক ও শশক স্তূপীকৃত রহিয়াছে। দেখিলাম বৃক্ষশাখাটি শুধু রক্ত-রঞ্জিতই হয় নাই তাহার উপরিভাগে কয়েকটি রক্তবিন্দু দিয়া নিনানি সেটিকে মনুষ্য-মুখাকৃতি করিবার চেষ্টাও করিয়াছে। মূষিক এবং শশক-শবগুলির পার্শ্বে কিছু সবুজ তৃণগুচ্ছ এবং বন্য পুষ্পও বেদীটির উপর সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। সেই পুষ্পগুলিকে ঘিরিয়া কয়েকটি মধুকর গুঞ্জন করিতেছিল। রক্তাক্ত বৃক্ষদণ্ডটির উপর রক্তলোভী পতঙ্গ ও মক্ষিকার দল বসিতেছিল এবং উড়িয়া যইাতেছিল। দূরে শোনা যাইতেছিল একটা ঝর্ণার ঝরঝর শব্দ। এই পটভূমিকায় নিনানি নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছিল। তাহার অঙ্গে কোনও আবরণ ছিল না, এমন কি আমি তাহার জন্য যে শিরস্ত্রাণটি করিয়া দিয়াছিলাম সেটিও তাহার মাথায় ছিল না। তাহার কুঞ্চিত কেশদাম নৃত্যাবেগে ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল কোন বৃহৎ বন্যপুষ্পের অসংখ্য কেশর যেন তাহার মস্তক ঘিরিয়া আস্ফালন করি-তেছে। আমাদের দলের পরিচিত সঙ্গীতটিই নিনানি গাহিতেছিল।

"ওগো, বৃক্ষশাখা, যে শক্তিবলে তুমি একদিন বীজের কঠিন আবরণ বিদীর্ণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলে, তোমার যে শক্তি তোমাকে মাটির অন্ধকার হইতে আকাশের আলোকের দিকে লইয়া আসিয়াছিল তোমার সেই শক্তি শত-গুণ বৃদ্ধি হোক। সেই শক্তি দিয়া আবার তুমি মৃত্তিকার কঠিন বক্ষ কর্ষণ কর। তাহাকে বিদ্ধ কর, তাহাকে চূর্ণ কর, তাহাকে শিথিল কর। আলোকের প্রত্যাশায় অসংখ্য বীজ মাটির অন্ধকারে এখনও অপেক্ষা করিতেছে, ওগো বৃক্ষশাখা, তুমি তাহাদের পথ সুগম করিয়া দাও। তুমি অগ্রণী, তুমি প্রবীণ, তুমি দলপতি, তুমি বনস্পতি, পথভ্রান্ত শিশু তরুদের তুমি পথ দেখাও। মৃত্তিকার বাধা অপসারিত করিয়া দাও। তাহাকে কর্ষণ কর, বিদ্ধ কর, চূর্ণ কর, শিথিল কর—"

নিনানি নাচিতে নাচিতে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষশাখাটি তুলিয়া লইতেছিল।

তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছিল। তাহা দিয়া নিজের সর্বাঙ্গ বিদ্ধও করিতেছিল। মনে হইতেছিল সে যেন নিজেকেই মৃত্তিকার প্রতীকরূপে কল্পনা করিতেছে। তাহার অঙ্গের নানা স্থানে রক্তের দাগ লাগিয়াছিল, কিছু কিছু ক্ষতও হইয়াছিল। নিনানির কিন্তু সে-সব দিকে লক্ষ্য ছিল না। বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া উন্মাদিনীর মতো নাচিয়া গাহিয়া খনিত্র পূজা করিতেছিল সে। আমি নির্বাক বিস্ময়ে বসিয়াছিলাম। পূর্বেও নিনানিকে খনিত্র পূজা করিতে দেখিয়াছি, তখন সে সকলের মতো চিরাচরিত রীতিতেই পূজা করিয়াছে। সে পূজাতে বৃক্ষশাখা, মূষিকরক্ত এবং সঙ্গীত ছিল, কিন্তু তাহাতে এ মহিমা ছিল না।

...নিনানির পূজা শেষ হইল। মনে হইল সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নৃত্য বন্ধ করিয়া সে স্খলিতচরণে পাশের ঝোপটার ভিতর ঢুকিল এবং দুইটি জীবন্ত মূষিক লইয়া বাহির হইয়া আসিল। মূষিক দুইটির মুণ্ড ছিন্ন করিয়া সে বৃক্ষশাখাটিকে শেষবার রক্তে স্নান করাইল। স্নান করাইয়া জানু পাতিয়া লুটাইয়া পড়িল সেই রক্তাক্ত বৃক্ষশাখার সম্মুখে। ঝর্ণার ঝরঝর শব্দটা সহসা বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দেখিলাম ফুলের উপর মধুকরবৃন্দও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

"নিনানি—"

আমার ডাক শুনিয়া নিনানি উঠিয়া বসিল।

"তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ?"

"অনেকক্ষণ। বসিয়া বসিয়া তোমার পূজা দেখিতেছিলাম।"

"আমি ঝর্ণায় স্নান করিব। আমাকে তুমি কোলে করিয়া লইয়া চল। বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

আমার দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। আমি উঠিয়া গিয়া তাহাকে তুলিয়া লইলাম।

আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া সে বলিল, "আমার ভয় হইতেছিল তুমি বুঝি আর আসিবে না।"

"কাল কি তুমি সমস্ত রাত যক্ষিণীর কাছেই ছিলে?"

"হ্যাঁ, শালমিটিনাকে কোলে করিয়াই বসিয়াছিলাম। কাল কিছুক্ষণের জন্য অতীত আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল, আমার কোলের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। তাহার পর সহসা চাঁদ উঠিল, আবার বর্তমানে ফিরিয়া আসিলাম, মনে পড়িল আজ আমাদের খনিত্র পূজা। সেই মুহূর্তে শালমিটিনাও আমার কানে কানে বলিল,—যাও খরগোস ধরিয়া আন। ময়াল সাপটাকে কিছু খাইতে দিতে হইবে। না দিলে ও শেষে আমাকেই খাইয়া ফেলিবে। শালমিটিনা আমাকে শিখাইয়া দিল কি করিয়া কোথায় আত্মগোপন করিয়া ফাঁদ পাতিতে হইবে। তাহার নিজের গাত্রাবরণটাও খুলিয়া আমাকে দিল। বলিল, ঝোপের ধারে এইটা টাঙাইয়া রাখিলে খরগোসেরা সেদিকে যাইবে না, ফাঁদের দিকে

যাইবে। খরগোস ধরিতে গিয়া ইঁদুরও অনেক ধরিয়াছি। শার্লমিটনার ফাঁদগুলি চমৎকার। তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?"

"আমি ফিরিয়া দেখিলাম ধবল আসিয়াছে।"

"তাহার পর?"

যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বিশদরূপে বর্ণনা করিলাম।

"আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ধবল কাঁদিল না?"

"না।"

"কেহই কাঁদিল না?"

"মেয়েদের মধ্যে অনেকে আর্তনাদ করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহাদের এ শোকোচ্ছ্বাস আন্তরিক কি না বলা শক্ত। দলপতির প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু-সংবাদে শোকপ্রকাশ না করিলে দলপতিকেই অপমান করা হয় যে—"

নিনানি চুপ করিয়া রহিল। তাহার মৃত্যুসংবাদ কাহাকেও বিশেষ বিচলিত করে নাই এ সংবাদটা তাহাকে যেন বিচলিত করিল। তাহার নীরবতা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিনানি বলিল—"ঘিসু থাকিলে ঘিসু ঠিক কাঁদিত।"

"সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

"আমি যখন মরিয়া যাইব, তুমি কাঁদিবে?"

"কি যে বল—"

নিনানি দুই বাহু দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিল। আরও কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিল—"আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে আর একজনও কাঁদিত। সে কিন্তু নাই।"

"মীংরার কথা বলিতেছ?"

"না, কলঙ্গা, যে আমাকে তোমাদের দলে আনিয়াছিল।"

একটা অদ্ভুত কথা সহসা মনে হইল। কলঙ্গার বিধবা, ধবলের পত্নী, ঘিসুর প্রণয়িনীকে আমি কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছি। নারী সম্বন্ধে আজ তোমাদের যে শুচিতা-বোধ প্রবল হইয়াছে তখন তাহা তত প্রবল ছিল না, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। যে প্রয়োজনের দাবী আমাদের পর-স্ত্রীর সম্বন্ধে সংযত করিতেছিল সেই প্রয়োজনের দাবীই ক্রমশঃ ধর্মরূপ পরিগ্রহ করিতে-ছিল। প্রয়োজনের দাবীতেই আমরা একদিন প্রস্তরকে বৃক্ষকে পূজা করিতাম, প্রয়োজনের দাবীই তাহাদের দেবতা পদে উন্নীত করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের শুচিতাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল। পর-স্ত্রী সম্বন্ধেও আমরা তেমনি সচেতন হইতেছিলাম। আমার অন্তরের অন্তস্থলে কে যেন বলিয়া উঠিল—তুমি অন্যায় করিতেছ। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছ। ধবলের সহিত মিথ্যাচরণ করিয়া তুমি পাপ করিতেছ। এখনও সময় আছে, এখনও নিনানিকে ত্যাগ কর, এখনও গিয়া ধবলকে সত্য কথা খুলিয়া বল...।

"তুমি চুপ করিয়া আছ কেন, কথা বল। আমার সম্বন্ধে সকলেই তো

চুপ করিয়া গেল, আমার মৃত্যুসংবাদে কেহ কাঁদিল না পর্যন্ত। তুমি চুপ করিও না, তুমি কথা বল। আমার ভয় হইতেছে তুমিও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কথা বল, চুপ করিয়া থাকিও না—"

"কি কথা বলিব?"

"আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পর তুমি কি কি করিয়াছ সমস্ত বল—"

"সমস্তই তো বলিলাম।"

"মনে হইতেছে তুমি কিছু গোপন করিতেছ।"

"না, কিছুই তো গোপন করি নাই। তোমার ঝরণা কতদূরে?"

"এই চড়াইটা শেষ হইলেই দেখিতে পাইবে।"

"তুমি ঝরণাটা আবিষ্কার করিলে কিরূপে?"

"কাল রাত্রে শালমিটিনার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া সমস্ত রাত্রি আমি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা ঝরণার শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল ঝরণা আমাকে যেন ডাকিতেছে। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল জ্যোৎস্না কিরণের মধ্যেও যেন সেই ডাক সঞ্চারিত হইয়াছে। আমার সর্বাঙ্গে যেন ঝরণার আহ্বান জ্যোৎস্না রূপে জড়াইয়া ধরিল। আমি অভিভূতের মতো শব্দ অনুসরণ করিয়া ঝরণার কাছে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া কি দেখিলাম জান?"

"কি—"

"দেখিলাম আমাদের কুল-দেবতা সেখানে বসিয়া আছেন। ঝরণার দুই পাশে অপরাজিতার কুঞ্জ আর তাহাতে অজস্র অপরাজিতা ফুল। দেখিলাম জ্যোৎস্নালোকে দেবতা ঘুমাইতেছেন, মনে হইল চক্ষু বুজিয়া কি যেন ভাবিতে-ছেন। ধবলকে মনে পড়িল। তাহাকেও কন্যানদীর তীরে গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেবতা আমাকে দেখা দিলেন কেন, ঝরণার অশ্রান্ত শব্দে জ্যোৎস্নাকে আকুল করিয়া আমাকেই কি তিনি ডাকিতেছিলেন? কেন! দেখিলাম তাঁহাকে ঘিরিয়া ঝরণার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা আবর্তিত হইতেছে, প্রতিটি বুদ্বুদে জ্যোৎস্না প্রতি-ফলিত হইয়াছে। মনে হইল, আকাশের চন্দ্র যেন লক্ষ লক্ষ রূপে নামিয়া আসিয়া আমার দেবতাকে পূজা করিতেছে। আমিও প্রণত হইলাম। তুমি যে শিরস্ত্রাণটি আমার মাথায় পরাইয়া দিয়াছিলে তাহা খুলিয়া পড়িল, দেখি-লাম তাহা জলস্রোতে-ভাসিয়া যাইতেছে। আমি আর তাহা তুলিবার চেষ্টা করিলাম না। শিরস্ত্রাণ পরিয়া থাকিবার আর প্রয়োজনও তো নাই সেইজন্য হয়তো দেবতাই উহা আমার মাথা হইতে খুলিয়া দিলেন—"

আমরা ঝরণার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। ঝরণা খুব বড় নয়, কিন্তু উচ্চ পর্বতশিখর হইতে নামিতেছিল বলিয়া শব্দ বেশী হইতেছিল। ঝরণাধারা

যেস্থানে সমতলে নামিয়াছে তাহার আশেপাশে দেখিলাম সত্যই অনেক অপরাজিতা লতা। ফুলও অনেক ফুটিয়াছে। পর্বতগাত্রে ঝরণাধারার দুইপাশেও অপরাজিতা দুলিতেছিল। সহসা মনে হইল এই অপরাজিতার দলই যেন পথ দেখাইয়া ঝরণাধারাকে পর্বতশিখর হইতে নামাইয়া আনিয়াছে। যতদূর দেখিতে পাইলাম ঝর্ণাধারার উভয় তীরে অপরাজিতার বনই দেখিলাম। কিছুদূর গিয়া জলস্রোত দিক পরিবর্তন করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গিয়াছিল। তখন জানিতাম না যে ইহাই কিছুদূরে গিয়া সরসরা নদীতে পরিণত হইয়াছে, যে সরসরা নদীর তীরে গজন্ধরের দলপতি উলম্ভন রাজত্ব করে।

"আমাকে তুমি নিজে হাতে স্নান করাইয়া দাও—"

আবদারমাখা কণ্ঠে নিনানি অনুরোধ করিল। স্নান শেষ হইলে সে বলিল—"আমার মাথায় অপরাজিতা ফুল পরাইয়া দাও।" তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার ছিল না।

নিনানিও আমার মাথায় কানে ফুল পরাইয়া দিল।

আমি বলিলাম—"উলম্ভনের সহিত আমাদের হয়তো যুদ্ধ বাধিবে। পাহাড়ের অপর পারে যে জাতি থাকে—যাহারা গরুর দুধ খায়—তাহাদের সহিতও উলম্ভনের যুদ্ধ বাধিতে পারে!"

কথাটা অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলাম, বলিয়াই কিন্তু বিপদে পড়িলাম। নিনানি পর-মুহূর্তে প্রশ্ন করিল,—"তুমি কেমন করিয়া জানিলে—"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সত্য কথাই বলিলাম।

"সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইয়াছিল।"

"কোন মেয়েটির?"

"যে তোমাকে সেদিন রাত্রে লতা দিয়াছিল।"

নিনানির মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল সহসা।

"ও, কখন দেখা হইল তাহার সহিত?"

"যখন এখানে আসিতেছিলাম।"

নিনানি আমার মুখের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়াছিল, সহসা মুচকি হাসিয়া বলিল, "মেয়েটি বেশ সুন্দর দেখিতে, নয়?"

"সুন্দর বটে, কিন্তু তোমার চেয়ে নয়।"

আজ মনে হইতেছে, সেই মুহূর্তে নিনানিকে যদি সরল সত্য কথা খুলিয়া বলিতাম, তাহা হইলে হয়তো যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঘটিত না। তাহাকে অনায়াসেই বলিতে পারিতাম—"হাঁ, শিলাঙ্গী খুবই সুন্দর, তাহাকে আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, হয়তো তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে।' সে যুগে একথা বলা মোটেই অশোভন ছিল না। সে যুগে প্রত্যেক পুরুষই প্রকাশ্যে একাধিক রমণীর প্রণয় কামনা করিত। আমি তাহা হইলে শিলাঙ্গীর কথা গোপন করিয়াছিলাম কেন? আজ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি কারণ ছিল। সে যুগেও আমার অন্তরতম সত্তা অনুভব করিয়াছিল যে প্রেমাস্পদা

একজনই হয়। যৌন-লালসায় আমি একাধিক স্ত্রী-লোককে কামনা করিতে পারি কিন্তু ভালবাসিতে পারি মাত্র একজনকে। আমি নিনানির কাছে ভালবাসার ভান করিতেছিলাম, তাই তাহার কাছে শিলাঙ্গীর কথা বলিতে পারি নাই। আমার নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি ভান করিতেছিলাম, কারণ ভালবাসার ভান না করিলে গরবিনী নিনানিকে লাভ করা সম্ভব ছিল না। নিনানি তাহার দেহ দান করিয়া বিনিময়ে ভালবাসাই চাহিয়াছিল। ভালবাসার সন্ধানেই সে পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কলঞ্জা তাহাকে লাভ করিয়াছিল প্রেমের অভিনয় করিয়াই। তাহাকে বিবাহ করিবার কিছুদিন পরে কলঞ্জার হৃদয় আমাদের দলের কাংকা নাম্নী যুবতীটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। আকৃষ্ট হইবার পর কিন্তু কলঞ্জা বেশীদিন বাঁচিয়া থাকে নাই। সহসা একদিন তাহার মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করে নিনানি কলঞ্জাকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছে। কাংকাও বাঁচে নাই, তাহারও কিছুদিন পরে মৃত্যু হইয়াছিল। বিঘাও বলিয়াছিল কণ্টক কণ্টককে উৎপাটিত করিল। ছলনাময়ী নিনানিকে ঘিরিয়া যে রহস্যলোক আমি কল্পনায় সৃজন করিয়াছিলাম, সে রহস্যলোকে দ্বিতীয় কোনও রমণীর অস্তিত্ব আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। শিলাঙ্গীর কথা তাই তাহার নিকট হইতে সযত্নে গোপন করিয়াছিলাম।

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া ওষ্ঠভঙ্গী সহকারে বলিল, "তুমি তো আমার চেয়ে সুন্দর কাহাকেও দেখ না। কিন্তু আমি যদি মরিয়া যাই?"

"ও কথা বলিও না।"

"আমি তো মরিয়াই গিয়াছি। তুমি নিজেই তো আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়াছ।"

নিনানির চোখের দৃষ্টিতে একটা সকৌতুক ভয় পরিস্ফুট হইল। দেখিলাম মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে সে কৌতুকান্বিত হইয়াছে, ভীতও হইয়াছে। মৃত্যুকে লইয়া মিথ্যা রসিকতা করিতেও আমরা ভয় পাইতাম তখন। নিনানি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিল বলিয়াই কৌতুকও অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তাহার এইসব গুণের জন্যই সে সকলকে আকৃষ্ট করিত।

"ওসব কথা ছাড়িয়া দাও। চল এবার ফেরা যাক। তুমি নিশ্চয় যক্ষিণীর কাছে ফিরিবে। বেচারীকে কাকের দল আবার হয়তো বিরক্ত করিতেছে!"

"হাঁ, চল! ময়াল সাপটার জন্য কয়েকটা খরগোসও ধরিয়া রাখিয়াছি। সেগুলোকে লইয়া যাইতে হইবে।"

"কোথায় খরগোস?"

"ঝোপের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

সহসা আমি কয়েকটা পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। মনুষ্য পদচিহ্ন। মনে হইল একাধিক মনুষ্যের। কারণ কয়েকটা চিহ্ন বড় বড়, কয়েকটা ছোট ছোট।

"এসব পদচিহ্ন কাহার?"

নিনানির চোখের দৃষ্টি হইতে হাস্য ুরিত হইতে লাগিল।

"কাল রাত্রে গজন্ধর এখানে আসিয়াছিল। আমি যখন ঝোপের মধ্যে খরগোসের ফাঁদ পাতিতেছিলাম তখন দেখি বিরাট প্রেতের মতো সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—"

"বল কি! সে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিল?"

"আমি নিজেই আগাইয়া গিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছি।"

"তাই না কি, এতক্ষণ তো এসব কথা বল নাই।"

মুচকি হাসিয়া নিনানি উত্তর দিল—"সব কথা কি সব সময় বলিতে আছে? আলাপ করিয়া দেখিলাম, গজন্ধর লোক ভাল—"

"এখানে সে কি করিতে আসিয়াছিল?"

"এখানে আসিয়াছিল পাথরের খোঁজে। তাহাদের দেশে নাকি পাথরের বড় বড় মন্দির হইতেছে—"

"তোমাকে দেখিয়া কি বলিল?"

"খুব ভাল কথাই বলিয়াছে।"

"কি?"

নিনানি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমরা দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিতেছিলাম। কিছুক্ষণ নীরবে পথ করিবার পর নিনানি বলিল —"যাহা বলিব তাহা আর কাহাকেও বলিও না। শুনিয়া তুমি বিচলিত হইবে না তো?"

"শুনিই না।"

"আমাকে দেখিয়া গজন্ধরও কম বিস্মিত হয় নাই। ভয়ও পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল কোনও প্রেতিনী বোধ হয়। চিনিতে পারিবামাত্র কিন্তু হাসি-মুখে আগাইয়া আসিল। বলিল—'ধবলের প্রিয়তমা পত্নী এত রাত্রে এখানে কি করিতেছে?' আমি উত্তর দিলাম, 'স্বামীর মঙ্গলের জন্য আমি উন্নগাকে পূজা করিতে আসিয়াছি, প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি বিপদের সময় ধবল যেন উন্নগার মতো ধৈর্যশীল ও শক্তিশালী হয়। ধবল কোথায়, সে কি ফিরিয়া আসিয়াছে? গজন্ধর বলিল—'ধবলের ফিরিতে এখনও কিছুদিন বিলম্ব আছে। আমার অনুচরেরা তাহাকে উলম্ভনের নিকট লইয়া গিয়াছে। উলম্ভনের সহিত আলাপ শেষ হইলে ধবল ফিরিবে। তাহার জন্য তোমার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই।' এই কথাগুলি বলিয়া গজন্ধর খানিকক্ষণ নীরব রহিল তাহার পর আবার বলিল, 'যদি তুমি রাগ না কর একটা কথা বলি'। আমি বলিলাম—'কথাটা না শুনিয়াই কি করিয়া বলিব যে, রাগ করিব কি না।' গজন্ধর তখন এক কাণ্ড করিয়া ফেলিল। সহসা আগাইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, ধবলের মতো দুর্বল ভীরু বৃদ্ধ তোমার উপযুক্ত স্বামী নয়। সে দলপতি বলিয়াই বোধ হয় তোমাকে দখল করিয়া রাখিয়াছে। তুমি আমাদের দেশে চল। উলম্ভন

তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। উলম্ভন তোমাকে এ প্রদেশের রাণী করিয়া দিবে। যে তিনশত রমণী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে তাহারা তোমারই দাসী হইবে। তুমি যদি সম্মত হও, এখনই তোমাকে স্কন্ধে করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইব। আমার অকপট বিশ্বাসই তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অপূর্ব রূপসী, তুমি সুলক্ষণা, তুমি যে পুরুষের নিকট থাকিবে তাহার সৌভাগ্য বর্ধিত হইবে। ধবল তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি উলম্ভনের কাছে চল। এই কথাগুলি বলিয়া গজন্ধর আমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আমি উত্তর দিলাম—তোমার স্পর্ধা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত আর অধিক বাকবিতণ্ডা করিতে চাহি না। তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি ওই অসঙ্গত প্রস্তাব আর উত্থাপন করিও না। তুমি কি এই কথা বলিবার জন্যই আবার ফিরিয়া আসিয়াছ? গজন্ধর বলিল, একথা বলিবার জন্য একদিন তোমার নিকট আসিব ঠিক করিয়াছিলাম, এখন আসিয়াছি প্রস্তরের সন্ধানে, ভাগ্যক্রমে তোমার দেখা পাইয়া গেলাম। তাহার পর গজন্ধর সাড়ম্বরে বর্ণনা করিতে লাগিল প্রস্তর দিয়া উলম্ভন কেমন বড় বড় সমাধি-গৃহ বড় বড় মন্দির প্রস্তুত করাইতেছে। ধবলের মুখে তোমরা যাহা শুনিয়াছ, গজন্ধরের মুখে আমিও তাহাই শুনিলাম।"

এই পর্যন্ত বলিয়া নিনানি চুপ করিয়া গেল।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম—"বড় বড় পায়ের দাগগুলি গজন্ধরের। কিন্তু ছোটা ছোট পায়ের দাগগুলি কাহার?"

"ওগুলি আমার। গজন্ধর আর এক কাণ্ড করিয়াছিল।"

"কি?"

আমি যখন কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না তখন সে বল-প্রকাশ করিয়াছিল, হঠাৎ আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়াছিল।"

"বল কি! তাহার পর?"

নিনানি হাসিতে লাগিল। তাহার তীক্ষ্ন দন্তগুলি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দন্তগুলি আরও বিকশিত করিয়া সে বলিল, "আমার এই দন্তের সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা করিয়াছি। গজন্ধরকে রক্তাক্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছে।"

নিনানির চোখে, মুখে, আলুলায়িত কেশ-পাশে, নগ্নদেহের বন্যশ্রীতে ক্ষণিকের জন্য যাহা প্রতিভাত হইয়া উঠিল তাহা ভয়ঙ্কর। মনে হইল কোন পুরুষের শৌর্যই তাহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না, এই মূর্তি যে কোনও পুরুষকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে। পরমুহূর্তেই কিন্তু তাহার রূপান্তর ঘটিল। আমার কটি-বেষ্টন করিয়া কোমলকণ্ঠে সে কহিল—"আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি জংলা। আমার ঘুম পাইতেছে। আমি আর চলিতে পারিতেছি না।"

আমি আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আমার স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। একটু পরেই কিন্তু সে নামিয়া পড়িল আবার।

"ঝোপের মধ্যে খরগোসগুলাকে রাখিয়া আসিয়াছি। অন্য কোনও জানোয়ার আসিয়া আবার লইয়া না যায়। গর্তের মধ্যে রাখিয়াছি অবশ্য, কিন্তু শৃগালগুলা বড় চতুর—"

দ্রুতপদে সে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। কে বলিবে একটু আগে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

খরগোসগুলি লইয়া কিছুক্ষণ পরেই আমরা যক্ষিণীর গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গুহার মুখ বন্ধ। কাকের দল উড়িয়া গিয়াছে। হরিণ কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যক্ষিণী ঘুমাইতেছিল, নিনানি চুপি চুপি বলিল—"এখন উহার ঘুম ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন নাই। ময়াল সাপটাকে খরগোসগুলো দিয়া চল আমরা আমাদের গুহায় যাই।"

"ময়াল সাপের গুহায় উঁকি দিয়া দেখিলাম সে আর কুন্ডলী পাকাইয়া নাই, দেহ বিস্তার করিয়াছে এবং আগড়টাকে ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহার চক্ষু দুইটিতে একটা হিংস্র দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। নিনানি ছয়টি খরগোস আনিয়াছিল। তিনটি খরগোসকে আমরা গুহার মধ্যে ছুঁড়িয়া দিলাম। বাকী তিনটিকে নিনানি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল।

"চল এবার যাওয়া যাক—"

...নিনানির গুহার ভিতর খড় বিছাইয়া আমরা শয্যা রচনা করিয়াছিলাম। তাহার উপরেই পাশাপাশি শুইয়াছিলাম দুইজনে। নিনানি আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া আমার কর্ণমূলে গুঞ্জন করিতেছিল, "আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাইও না জংলা। দেখ, আমি তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি। গজন্ধরের প্রলোভন-পূর্ণ প্রস্তাবও উপেক্ষা করিয়াছি তোমারই জন্য। তুমি আমাকে ছাড়িবে না তো?"

বলিলাম—"না—"

শিলাঙ্গীর মুখটা সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। সত্য কথাটা কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিলাম না। শিলাঙ্গী যে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে একথাটা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না বটে, কিন্তু নিনানিকে দেখিয়া কে বা কাহারা আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে নিনানির তো একবারও বাধিতেছিল না। তাহা লইয়া সে বরং আস্ফালনই করিতেছিল। ভাবটা যেন—'দেখ, ইহারা সকলেই আমাকে চায়, কিন্তু আমি তোমার জন্য ইহাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমিও তো বলিতে পারিতাম—'দেখ শিলাঙ্গী আমাকে চায় কিন্তু আমি তাহাকে ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।' কিন্তু আমি একথা বলিতে পারি নাই। বলিতে পারি নাই কারণ তাহা সত্য নহে। সত্যই

আমি শিলাঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া নিনানির কাছে আসি নাই। নিনানি কি সত্য কথা বলিতেছিল? তাহার পরবর্তী আচরণ দেখিয়া আমারও পরে সন্দেহ হইয়াছিল যে, নিনানি মিথ্যাবাদিনী। আজ কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আজ বুঝিয়াছি যে নিনানি একান্তভাবে আমাকেই চাহিয়াছিল। আমাকে পাইবার জন্যই সে কখনও কোমলা কখনও নিষ্ঠুরা হইতেছিল। আমি তাহার আন্তরিকতা অনুভবও করিয়াছিলাম, কিন্তু লোভের বশবর্তী হইয়া তাহার সম্পূর্ণ মূল্য দিতে পারি নাই। নিনানি কেবল আমাকেই চাহিয়াছিল, বহু-বল্লভ-প্রার্থিতা সে একমাত্র আমাকেই নির্বাচন করিয়াছিল, আমাকে পাইবার জন্য সে নিজেকে নির্যাতিত নিপীড়িত করিয়াছিল। আমিও তাহাকে চাহিয়াছিলাম কিন্তু আমি শিলাঙ্গীকেও চাহিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীও আমাকে কম মুগ্ধ করে নাই। শিলাঙ্গীর উল্লেখ নিনানি সহ্য করিতে পারিবে না আমি জানিতাম, তাই সত্য গোপন করিতে হইতেছিল। নিনানির সে প্রয়োজন ছিল না, শিল্যাঙ্গীরও ছিল না।

"আমি এবার যাই, অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছি। সকলে হয়তো আমাকে খুঁজিতেছে। খনিত্র পূজায় আমি অনুপস্থিত থাকিলে ইলচি দুঃখিত হইবে।

আমরা উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচিরও আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। সুযোগ পাইলেই সে আমার ঘরে আসিয়া আমাকে খাওয়াইত, আমার পরিচর্যা করিত।

নিনানি বলিল, "তুমি যাইবার সময় ওই খনিত্রটিকে লইয়া যাও, আমি যেটির পূজা করিয়াছি, তুমি গিয়া ইলচিকে বলিও যে, আমি উন্নগা পর্বত হইতে এই খনিত্রটি মূষিক-রক্ত মাখাইয়া আনিয়াছি, তোমরা এইটির পূজা কর। মূষিক খুঁজিতেছিলাম বলিয়াই এত দেরি হইয়াছে।"

"কিন্তু নিয়ম যে অন্যরূপ। মেয়েরা নিজের হাতে মূষিক ধরিয়া—"

অধীরভাবে নিনানি বলিল—"তাহা জানি। কিন্তু আমি চাই যে খনিত্রটি আমি পূজা করিয়াছি ইলচি সেইটিরই পূজা করুক। আমি যদি থাকিতাম নিম্ব সম্প্রদায়েরই সমস্ত নারী আসিয়া আমার খনিত্রকে পূজা করিত, এমন কি ইলচিও। ধবলের প্রিয়তমা পত্নীর খনিত্রকে অবহেলা করিবার সাহস কাহারও হইত না। আমার ইচ্ছা এবারও আমার খনিত্র যেন অবহেলিত না হয়। তুমি ওটিকে লইয়া যাও। হয়তো আগামীবারে আমি আর খনিত্র পূজা করিতে পাইব না—"

কথাটা বলিয়াই নিনানি থামিয়া গেল। আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা, কানা তো আমার কিছু করিল না। আমি তাহার আদেশ অমান্য করিলাম কিন্তু আমাকে কোনও শাস্তিই তো সে দিল না। সকলে জানে কানার আদেশ অমান্য করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়, কেহই তাহা রোধ করিতে পারে না। কিন্তু আমার তো কিছুই হইল না—"

যে সন্দেহ আমি মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমি

নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার মৃত্যু-সংবাদ রটনা করিয়াছিলাম নিনানির কথায় তাহা যেন দৃঢ়তর হইল।

বলিলাম, "আমার বিশ্বাস তোমার কিছুই হইবে না, কারণ মূর্চ্ছিত বিঘাও-য়ের মুখ হইতে যেসব কথা আমরা সেদিন শুনিয়াছিলাম তাহা কানার আদেশ নয়, তাহা বিঘাওয়ের আদেশ। বিঘাও তোমাকে শাস্তি দিয়াছে, কারণ বিঘাওয়ের বাসনা তুমি চরিতার্থ কর নাই।"

নিনানির চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমার কথার তাৎপর্য যে তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ছলনাময়ী মুখে কিন্তু বলিল, "না, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক নয়। বিঘাও শক্তিশালী লোক। তাহার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গিয়াছে। মনে নাই সে বলিয়াছিল যে, অন্ধকারের সহিত মিশিয়া নিম্ব-সম্প্রদায়ের সর্বনাশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে? উলম্ভন যদি নিম্ব-সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহার কথা ঠিক ফলিয়া যাইবে। কানা কবে কিভাবে আমাকে শাস্তি দিবে তাহা কে বলিতে পারে। না, না, বিঘাওকে অমনভাবে অবিশ্বাস করিও না, তাহা হইলে হয়তো আমাদের আরও অমঙ্গল হইবে—"

নিনানি শিহরিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি বলিলাম—"যদি ফিরিয়া গিয়া দেখি যে সত্যই উলম্ভনের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, অবিলম্বে আমাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, তখন তুমি কি করিবে?"

"আমি ওই দেবদারু বৃক্ষের নীচে আগুন জ্বালাইয়া যুদ্ধের নাচ নাচিব। ওই দেবদারু বৃক্ষকে উলম্ভন কল্পনা করিয়া তাহার বুকে তীর হানিব, অগ্নি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিব ধবল যেন জয়ী হয়—"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কিন্তু প্রার্থনা করিবার পূর্বে অগ্নি দেবতাকে তোমার প্রণয়ীর নামগুলি উপহার দিতে হইবে তাহা মনে আছে তো?"

"আছে বই কি। এই দেখ—নামের মালা আমি গাঁথিয়া রাখিয়াছি, এইটিই আমি অগ্নিকে উপহার দিব—"

নিনানি যে কড়ির মালাটি পরিত সেইটিই তুলিয়া দেখাইল।

হাসিয়া বলিল—"জীবনে আমার যতগুলি প্রণয়ী জুটিয়াছে প্রত্যেকের নামে এক একটি কড়ি গাঁথিয়া রাখিয়াছি। অগ্নি দেবতাকে এইটিই সমর্পণ করিয়া দিয়া বলিব—ইহারা আমাকে ভালবাসিয়াছিল, ইহাদের স্মৃতি তোমার কাছে গচ্ছিত রাখিতেছি, এই স্মৃতিগুলিই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, এইগুলি তোমাকে দিতেছি, ইহার বিনিময়ে হে দেবতা, তুমি ধবলকে জয়ী কর। আমাকে কিন্তু আরও কিছু কড়ি আনিয়া দিও, আর একটা মালা গাঁথিয়া রাখিব—"

পাথরের সূঁচ দিয়া মেয়েরা সেকালে কড়ির মালা, ঝিনুকের মালা গাঁথিত। সূত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করিত লতা বা পশুর অন্ত্র।

"কড়ি কোথায় পাইব?"

নিনানির চক্ষু দুইটি আবার হাসিতে লাগিল।

"পাহাড়ের কাছে যে বড় নিমগাছটি আছে, তাহারই তলায় খুঁড়িয়া দেখিও সেখানে কিছু কড়ি আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি।"

"তুমি কড়ি কোথায় পাইলে?"

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"সত্য কথা যদি বলি রাগ করিবে না তো?"

"না—"

"বিঘাও দিয়াছিল। মীংরাও দিয়াছিল কিছু। কড়িগুলি আমাকে আনিয়া দিও তুমি।"

"আচ্ছা।"

"তুমি আবার কখন ফিরিবে?"

"যত শীঘ্র পারি।"

"অনর্থক দেরী করিও না। তুমি কাছে না থাকিলে একটুও ভাল লাগে না। আমার মৃত্যু সংবাদ রটাইয়া দিয়া তুমি জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছ। তাহা না হইলে তোমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতাম। এভাবে কতদিন থাকিব? সত্যই যদি আমার মৃত্যু না হয়, সত্যই যদি কানা আমাকে ক্ষমা করে তাহা হইলে এই গুহাতেই চিরকাল বাস করিব না কি?"

"করিলেই বা ক্ষতি কি। তুমি আমার একার হইয়া থাকিবে।"

"না, একা আমি বেশীদিন থাকিতে পারিব না। কোনও বুদ্ধি করিয়া তুমি আবার আমাকে বাঁচাইয়া দাও, আমি আবার ফিরিয়া যাই।"

"যক্ষিণীর কি দশা হইবে?"

"আমি যদি ফিরিয়া যাই যক্ষিণীকেও লইয়া যাইব। ধবল আপত্তি করিবে না।"

"দেখি এখন ওদিকের অবস্থা কি রকম। তাহার পর যেমন বুঝি ব্যবস্থা করিব।"

...ফিরিয়া দেখিলাম ধবল কন্যা নদীর তীরে লম্বা হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। তাহার মুণ্ডটা জলের দিকে। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। মনে হইল নিবিষ্টচিত্তে সে কন্যা নদীর ভাষা শুনিতেছে। কন্যা নদীতে পুষ্পগুচ্ছ ভাসিয়া চলিয়াছে। ধবলের কাছে কেহ নাই। নদীর বাঁকে একাই সে শুইয়া আছে। আমার বর্ণনা অনুসারে এখানেই নিনানির মৃত্যু হইয়াছিল। দূরে ক্ষেতের ভিতর মেয়েরা কাজ করিতেছে দেখিতে পাইলাম। নীরবেই কাজ করিতেছে। কোথাও কোন কলরব নাই। এমন কি, শিশুদেরও গোলমাল নাই। সকলেই নিজ নিজ কুটিরের ভিতর ঢুকিয়াছে। একটা অজ্ঞাত ভয়ে চারিদিক যেন থমথম করিতেছে। আমি নীরবে ধবলের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম। ধবলের কিন্তু কোন ভাবান্তরই লক্ষ্য করিলাম না। মনে হইল, সে যেন কন্যা নদীর কলকল-ধ্বনিতে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি

উপবেশন করিলাম। তাহার সহিত কথা না বলিয়া আমার কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, তাহার ঠোঁট দুইটি নড়িতেছে, কিন্তু কোনও কথা শোনা যাইতেছে না। মনে হইল, নীরব ভাষায় সে যেন কাহারও সহিত কথা কহিতেছে। সহসা সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহার পর আমাকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া বসিল।

"জংলা, তুমি কতক্ষণ এখানে বসিয়া আছ?"

"অনেকক্ষণ—"

"খনিত্রপূজার সময় তুমি কোথায় ছিলে, সকলেই তোমাকে খুঁজিতেছিল।"

"আমি ইঁদুরের সন্ধানে উন্নগা পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। ইঁদুর-রক্ত মাখাইয়া একটি খনিত্র প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, ইলচিকে পূজা করিবার জন্য দিব।"

নিনানির সেই রক্তমাখা শাখাটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেটি ধবলকে দেখাইলাম।

ধবল সেটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, আমার মনে হইল সে যেন অন্য কিছু ভাবিতেছে। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কিছু একটা বলিতে হয় বলিয়াই সে যেন বলিল, "চমৎকার হইয়াছে। ইলচিকেই দিও। সে তোমাকে খুঁজিতেছিল।"

তাহার পর সে আবার নীরব হইয়া গেল। আমিও নীরবে বসিয়া রহিলাম।

"ঘিসু বা ভংগার কোনও খবর কি পাওয়া গিয়াছে"—কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করিলাম।

"ভংগা ফিরিয়াছে, ঘিসু ফেরে নাই। ঘিসুর মৃত্যু হইয়াছে। সেই অরণ্যে গজন্ধরের অনুচরেরা ঘিসু ও ভংগাকে পুনরায় বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঘিসু যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছে, ভংগা আহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ভংগা বলিতেছে উলম্ভনের দল যে কোনও মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। সে আরও বলিতেছে যে তাহাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমাদেরই গিয়া তাহাদের আক্রমণ করা উচিত। তাহারা যখন ঘিসুকে হত্যা করিয়াছে তখন সে অধিকার আমাদের অবশ্যই হইয়াছে। আমি এতক্ষণ কন্যা নদীর নির্দেশ শুনিবার জন্য কান পাতিয়াছিলাম। নির্দেশ পাইয়াছি" এই পর্যন্ত বলিয়া ধবল চুপ করিল এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"কন্যা নদী কি নির্দেশ দিল?"

"কন্যা যাহা বলিল তাহা গভীর অর্থপূর্ণ। কন্যা বলিল, মূল্য না দিলে কোনও কিছুই পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তোমরা নিনানির সম্যক মূল্য দাও নাই তাই নিনানি তোমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে। যে জমি তোমরা ভোগ-

দখল করিতেছ তাহারও মূল্য দিতে হইবে। মূল্য না দিলে তাহা তোমাদের থাকিবে না, থাকিলেও তাহা তোমাদের ফসল দিবে না। বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। আমি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ধরণের মূল্য দিতে হইবে। কন্যা তাহার ছল ছল কলকলধ্বনিতে কি যে উত্তর দিতে লাগিল প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে কান পাতিয়া রহিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম; শুনিলাম, কন্যা বলিতেছে—যাহা তোমার প্রিয়তম, মূল্যস্বরূপ তাহাই তোমাকে দিতে হইবে। প্রাণ দিতে হইবে, কারণ প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম মানুষের আর কিছু নাই। যাহা চাও তাহার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হও তবেই তাহা পাইবে। পাহাড় সমুদ্রকে কামনা করিয়াছিল, আমি তাহারই ফল। আমি জল-ধারা নই, আমি পাহাড়ের বুকের রক্ত-ধারা, আমিই তাহার প্রাণ। আমাকে সে ত্যাগ করিয়াছে, আমাকে সে বিলাইয়া দিয়াছে তাই আমিই তাহাকে সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়াছি। তোমাদের প্রাণ দিতে হইবে, রক্ত দিতে হইবে। কন্যার কল-কলধ্বনিতে আমি ইহাই শুনিলাম।"

"তাহা হইলে আমাদের কি যুদ্ধই করিতে হইবে?"

"যুদ্ধই করিতে হইবে।"

"আমরাই প্রথমে আক্রমণ করিব?"

"ভংগা তাহাই বলিতেছে। কিন্তু আমি ভাবিতেছি যুদ্ধ করিবার মতো অস্ত্রশস্ত্র আমাদের তো প্রচুর নাই। সমর্থ পুরুষের সংখ্যাও আমাদের দলে বেশী নাই। আমরা সকলে যদি যুদ্ধে চলিয়া যাই আমাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে, এমনিই তো ফসল খুব বেশী হয় নাই।"

আমি তখন বলিলাম—"উন্নগা পর্বতের অপর পারে কিছুদিন হইতে একটা নূতন সম্প্রদায় আসিয়া বসবাস করিতেছে। তাহারা গোদুগ্ধ পান করে। একদল বন্য গরুকে ঘিরিয়া তাহাদেরই তত্ত্বাবধান করিয়া তাহারা বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের দলের একটি মেয়ের সহিত আজ আমার দেখা হইয়াছিল। শুনিলাম, গজন্ধর তাহাদের দলেও হানা দিয়াছে। হয়তো তাহাদের সহিতও উলম্ভনের যুদ্ধ বাধিবে। সেই মেয়েটি বলিতেছিল, আমা-দের মধ্যে কেহ গিয়া যদি তাহাদের দলপতি রোহার সহিত দেখা করিয়া এ বিষয়ে আলাপ করে রোহা হয়তো আমাদের সহিত যোগদান করিবে। আমরা উভয় সম্প্রদায় যদি সম্মিলিত হই তাহা হইলে উলম্ভনকে এখনই আমরা আক্রমণ করিতে পারি।"

ধবল সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"তাহারা গোদুগ্ধ পান করে? কি করিয়া?"

শিলাঙ্গীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম ধবলকে বলিলাম। ধবল আরও বিস্মিত হইল। তাহার পর বলিল, "তাহাদের সহিত মিত্রতা করা কি সম্ভব? গরু তৃণভোজী, আমরাও তৃণ-ভোজন করিয়া থাকি। সে হিসাবে গরু আমা-

দের শত্রু। সেই গরু যাহারা পালন করে তাহাদের সহিত মিত্রতা হইবে কিরূপে?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ধবল বলিল,—"তাছাড়া তাহাদের নিকট এ প্রস্তাব লইয়া যাইবে কে?"

"আমি যাইতে পারি।"

"যে মেয়েটির সহিত তোমার আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত ওই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কি?"

"সে দলপতি রোহার কন্যা।"

"বিবাহিতা?"

"না।"

"বিবাহযোগ্যা?"

"হাঁ।"

ধবল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "যুবতী দেখিয়া আকৃষ্ট হওয়া পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তুমি যুবক তোমার পক্ষে আরও স্বাভাবিক। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিও, যাহা স্বাভাবিক তাহাই নিরাপদ নয়। বজ্র স্বাভাবিক, সর্পও স্বাভাবিক, ঝঞ্ঝা, বন্যা ইহারাও স্বাভাবিক কিন্তু ইহারা সব সময়ে নিরাপদ নয়। ইহাদের রূপ ধরিয়া অনেক সময় দেবতার রোষ আত্মপ্রকাশ করে, ক্ষুব্ধ প্রেতাত্মারা অনেক সময় ইহাদের রূপ ধরিয়া আমাদের শাস্তি দেয়। সুতরাং স্বাভাবিক বাসনার স্রোতে অবগাহন করিবার পূর্বে চিন্তা করিয়া রাখা উচিত তাহা নিরাপদ হইবে কিনা, তাহা কোনও দেবতার বা অপদেবতার বিশেষ ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে কি না।"

আমি বলিলাম—"আমি সমস্তই অকপটে বলিয়াছি। তোমরা আমাকে যেরূপ নির্দেশ দিবে সেইরূপই আমি করিব। তবে আমার মনে হয়, রোহার সহিত আলাপ করিলে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নাই। ওই মেয়েটিকেও দেবতার ছদ্মবেশী রোষ বলিয়া মনে হয় না আমার। মেয়েটি-খুবই সরল—"

ধবল বলিল—"চল ভংগাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক সে কি বলে। একাধিক লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া অগ্রসর হওয়াই ভাল।"

ভংগার পরামর্শ দিবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। পৃষ্ঠের কয়েকটি নিদারুণ ক্ষত তাহাকে কাতর করিয়াছিল। নিজের কুটিরে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল সে, তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল তাহার পত্নীরা। সকলেই নিমপাতা চিবাইতেছিল। সেই চিবান নিমপাতাগুলি লইয়া ভংগার প্রবীণা পত্নী সাংরা ক্ষতের উপর প্রলেপ দিতেছিল।

ধবলের কথা শুনিয়া ভংগা আর্তনাদ করিয়া শুধু একটি বাক্যই বলিল—"প্রতিশোধ চাই—"

ভংগার পত্নীরাও চীৎকার করিয়া উঠিল, "প্রতিশোধ চাই—"

ঘিস্‌র পত্নীদের মধ্যেও কয়েকজন ভংগার নিকটে বসিয়াছিল, তাহারাও বলিল, "প্রতিশোধ চাই—"

বিব্রত ধবল ভংগার কুটির হইতে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা হইল ইলচির সঙ্গে।

ইলচি ধবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমার মনে হয় তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। তুমি নিজের বুদ্ধিতে আমাদের এখন চালিত করিতে চাহিও না। তুমি বিঘাওয়ের পরামর্শ লও। সে যাহা করিতে বলে তাহাই কর!"

ধবল চকিতে আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর বলিল, "বেশ তাহাই হইবে। জংলা পাহাড় হইতে তোমার জন্য এই খনিত্রটি মুষিক-রক্ত মাখাইয়া আনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা তুমি ইহার পূজা কর—"

"তাই নাকি, তাই নাকি?"

বৃদ্ধা ইলচি যেন বিগলিত হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাত হইতে শাখাটি লইয়া বলিল—"আজ সকাল হইতে আমার কেবলই জংলার কথা মনে হইতেছিল, কেবলই ভাবিতেছিলাম, আমার জংলা কোথায় গেল। জংলা যে আমার জন্য পাহাড়ে গিয়াছে তাহা কি জানিতাম—"

ইলচি আমার থুতনিতে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিল।

...বিঘাও তখনও সেই বাঘের থাবাটি হাতে করিয়া বসিয়াছিল। দেখিলাম সেটির সাহায্যে সে মাছি মারিতেছে। মাছি তাহাকে বড় জ্বলাতন করিত। পায়ের ক্ষতগুলি সর্বদাই সে চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিত তবু তাহাকে ঘিরিয়া একদল মাছি ভনভন করিত সর্বদা। অন্যান্য দিন সে গাছের পত্রসমেত ছোট একটা ডাল ভাঙিয়া কাছে রাখিত এবং তাহা দিয়া মাছি তাড়াইত। সেদিন দেখিলাম বাঘের থাবা দিয়া মাছি মারিতেছে। মৃত মক্ষিকাগুলিকে সে কোথাও বৃত্তাকারে, কোথাও ত্রিভুজাকারে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। পিপীলিকার দলও আসিয়া জুটিয়াছিল প্রচুর। তাহারা বিঘাওয়ের বৃত্ত এবং ত্রিভুজ নষ্ট করিয়া মৃত মক্ষিকাগুলিকে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বিঘাও তাহাদের বাধা দিতেছিল না, পুনরায় নূতন মাছি মারিয়া বৃত্ত এবং ত্রিভুজ গঠন করিতেছিল। ধবল এবং আমি যখন তাহার নিকট গেলাম তখন সে একবারমাত্র আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না। লক্ষ্য করিলাম, তাহার নাসিকাগ্র কম্পিত হইতেছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ধবলই কথা কহিল। বলিল, "বিঘাও, আমাদের এই বিপদের সময় তোমার উপদেশ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। মীংরা যখন তোমাকে আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছিল তখন বলিয়াছিল যে, তুমি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি, বলিয়াছিল যে, আমাদের বিপদের সময় তুমি সাহায্য করিবে। আজ বিপদে পড়িয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। উলম্ভনের সহিত আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। জংলা বলিতেছে যে, উন্নগা পর্বতের অপর পারে একটি গো-পালক সম্প্রদায় আসিয়া বসবাস করিতেছে, তাহারা নাকি গো-দুগ্ধপায়ী। তাহাদের

সহিতও উলম্ভনের বিবাদ বাধিয়াছে। হয়তো যুদ্ধও বাধিবে। জংলা বলিতেছে যে আমরা যদি তাহাদের সহিত সম্মিলিত হই তাহা হইলে সুবিধা হইবে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কম। আমাদের লোকেরা এখনও কোনও বৃহৎ প্রস্তরখনি আবিষ্কার করিয়া দখল করিতে পারে নাই। প্রস্তরখনির সন্ধানে যাহারা বাহির হইয়াছে তাহারা এখনও ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং ইদানীং নূতন কোনও প্রস্তরের অস্ত্রই আমরা প্রস্তুত করিতে পারি নাই, পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র লইয়াই চালাইতেছি। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া কিছু অস্ত্র আমাদের নষ্টও হইয়াছে। আমাদের লোকবলও কম। সুতরাং ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিলে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। আমাদের এই প্রস্তাব লইয়া জংলা উহাদের দলপতি রোহার নিকট যাইতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু আমার একটা ভয় হইতেছে। উহারা গো-পালক, আমরা তৃণ-পালক। তৃণের সহিত গরুর ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্পর্ক। সেইজন্য আমার আশঙ্কা হইতেছে যে উহাদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব নিরাপদ হইবে কিনা। আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, বিঘাও, তুমি উপদেশ দাও, কি করিব।"

বিঘাও নীরবে বৃত্তরচনা করিতে লাগিল, অনেকক্ষণ কোনও উত্তর দিল না। মাঝে মাঝে কেবল বাঘের থাবা দিয়া মাছি মারিতে লাগিল। ধবল এবং আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। বৃত্তের পরিধিতে একটি মক্ষিকা নিপুণভাবে বসাইয়া সহসা বিঘাও ধবলের দিকে চাহিল এবং বৃত্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—"ইহার ভিতর কিছু দেখিতে পাইতেছ কি?"

"আমি মৃত মক্ষিকা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

"মৃত মক্ষিকারা তো বাহিরে রহিয়াছে। এই বৃত্তের ভিতরে কিছু দেখিতে পাইতেছ কি না।"

ধবল এবং আমি উভয়েই মনোনিবেশ সহকারে বৃত্তের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

ধবল বলিল, "আমি তো ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

"সামান্য ধূলিই যদি তোমার চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহা হইলে তোমার পক্ষে দেখা শক্ত—ভাল করিয়া দেখ—"

"কি দেখিতে পাইব?"

"তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তর ; আমি এতক্ষণ সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতেছিলাম। সহসা লক্ষ্য করিলাম, এই বৃত্তের মধ্যস্থলে তাহা মূর্ত হইয়াছে। ওই দেখ, ভাল করিয়া দেখ—"

বিঘাও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বৃত্তের দিকে চাহিয়া রহিল। আমরাও চাহিয়া রহিলাম। আমি কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ধবলও পাইল না, কারণ সে ক্ষণকাল পরে বিমর্ষকণ্ঠে বলিল, "আমি তো ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—"

বিঘাও যেন সর্পের মতো তর্জন করিয়া উঠিল।

বলিল, "কিন্তু আমি পাইতেছি। আমি দেখিতেছি, যেন বিরাট বন্যায় চতুর্দিক প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। কোথাও স্থল নাই, কোথাও কোন বৃক্ষ বা গুল্ম দেখা যাইতেছে না। চতুর্দিকেই কেবল জল। সেই জলের ভিতর হইতে একটিমাত্র শাখা বিরাট অঙ্গুলির মতো উত্থিত হইয়া আকাশের দিকে কি যেন নির্দেশ করিতেছে। শাখাটি সম্ভবত কোনও ভূপাতিত বৃক্ষের। আমি দেখিতেছি, সেই শাখার উপর একটি মূষিক এবং সর্প রহিয়াছে। মূষিকটি সর্পের মুখের নিকটই বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু সর্প তাহাকে ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে না।..."

বিঘাও চুপ করিল। আমরাও চুপ করিয়া রহিলাম।

সহসা ধবল আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"বিঘাওয়ের উপদেশের মর্ম বুঝিতে পারিয়াছি। জংলা তুমি অবিলম্বে রোহার নিকট গিয়া প্রস্তাব কর যে আমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব কামনা করিতেছি—"

ধবল এবং আমি উঠিয়া পড়িলাম। বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিঘাও বসিয়া রহিল। কিছুদূর গিয়া শুনিতে পাইলাম, বিঘাও অট্টহাস্য করিতেছে।

...শিলাঙ্গী আমার অপেক্ষায় ঝোপের ভিতর বসিয়াছিল। কতক্ষণ হইতে বসিয়াছিল জানি না, কারণ যখন ঝোপে উপস্থিত হইলাম তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, আমার কথা ছিল সন্ধ্যাবেলা আসিব, একটু আগেই আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি ঝোপে প্রবেশ করিবামাত্র শিলাঙ্গী একটা গাছ হইতে লাফাইয়া নীচে নামিল।

"তুমি আসিয়াছ? বাঁচা গেল। আমি ভাবিতেছিলাম না-জানি কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। নিনানিকে কেমন দেখিলে? সে ভালো আছে তো? আমি ভাবিয়াছিলাম, তাহার জন্য দুধ লইয়া যাইব কিন্তু গিয়া দেখি দুধ নাই, আমার দুধটা পর্যন্ত চিহাই খাইয়া বসিয়া আছে—"

"চিহাই আবার কে?"

"চিহাই আমার একজন সৎমা। ভাবিলাম দুধ যখন পাওয়া গেল না তখন যক্ষিণীর কাছে যাওয়া বৃথা। যক্ষিণী কেমন আছে?"

"যক্ষিণী মহা বিপদে পড়িয়াছিল।"

"কি?"

তাহাকে আদ্যোপান্ত সব বলিলাম।

"ও রকম বিপদে যক্ষিণী মাঝে মাঝে পড়ে"—শিলাঙ্গী হাসিয়া বলিল—"আমি একদিন গিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। সেদিনও যক্ষিণী একটা আস্ত ছাগল গিলিয়া নড়িতে পারিতেছিল না। সেদিনও কাক আর শকুনির দল উহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। নিনানি কেমন আছে?"

"বেশ ভাল আছে। যক্ষিণীর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে।"

"আমার সঙ্গেও ভাব হইয়া যাইবে। তুমি রোহার সঙ্গে দেখা করিতে কখন যাইবে? ধবল কি বলিল?"

"ধবল রাজি হইয়াছে। তুমি আমাকে রোহার নিকট লইয়া চল, আমি ধবলের প্রতিনিধিস্বরূপ তাহার নিকট যাইব এবং গিয়া বন্ধুত্বের প্রস্তাব করিব।"

"রোহা নিগম বনেই আছে। তাহাকে তোমার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখনই কি যাইবে?"

"যাইতে পারি।"

"তাহা হইলে চল। ঝোনাঝিরা এখন নাই, এখনই যাওয়া ভাল।"

সুড়ঙ্গপথে শিলাঙ্গীর অনুসরণ করিলাম। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া যখন উন্নগার অপর পারে উপস্থিত হইলাম তখন শিলাঙ্গী আমার কানে কানে বলিল, "তোমাকে কেহ যদি প্রশ্ন করে তুমি কেবল বলিও আমি নিম্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, রোহার নিকট বন্ধুত্ব কামনায় যাইতেছি, শিলাঙ্গী সব কথা জানে। ইহার বেশী আর কিছু বলিও না।"

পথে বিশেষ কাহারও সহিত দেখা হয় নাই। দেখা হইবার সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ শিলাঙ্গী আমাকে গাছের আড়ালে আড়ালে লইয়া যাইতেছিল। একটা ছোটখাটো বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছিল। সে স্থানে সে সময়ে কাহারও থাকিবার কথা নয়। শিলাঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছিল। আমি অন্ধকারে তাহার অনুসরণ করিতে পারিতেছিলাম না।

"শিলাঙ্গী একটু ধীরে ধীরে চল, আমি অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতেছি না। তুমি কোথায়—"

"এই যে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই যে গাছের তলায়।"

গাছের তলায় উপস্থিত হইবামাত্র শিলাঙ্গী আমার হাত ধরিল।

"আমি তোমার হাত ধরিতেছি, এইবার চল। একটু তাড়াতাড়ি চল, ঝোনাঝিরা আসিয়া পড়িতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। ঝোনাঝিরা আসিয়া পড়িলে সব গোলমাল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু রোহা যদি একবার তোমার প্রস্তাবে রাজি হইয়া যায় তাহা হইলে ঝোনাঝিরা আর কিছু করিতে পারিবে না। রোহার কথা মানিতে হইবে। ঝোনাঝিরা নাই, এই সুযোগ। চল, চল—"

আমার হাত ধরিয়া শিলাঙ্গী আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে শিলাঙ্গী এখনও থামে নাই। আমার হাত ধরিয়া এখনও সে ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু অন্ধকারে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তাহার স্পর্শটুকু আমার হাতে লাগিয়া আছে, তাহার অস্ফুট 'চল চল' ধ্বনি এখনও শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে আজও তাহাকে আমি খুঁজিতেছি। ঝোনাঝিরা আসিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঝোনাঝিরা আসিয়াছিল ভিন্নরূপে. ঝোনাঝিরারূপে নয়, তাই তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। শিলাঙ্গীও পারে নাই।

...অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া ঝিল্লীধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল, আমার বিক্ষুব্ধ চিত্তের আলোড়ন যেন বাঙ্ময় হইয়া উঠিতেছে। সহসা একটা নূতন ধরণের তীক্ষ্ণ শব্দ অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। শিলাঙ্গী দাঁড়াইয়া পড়িল সহসা।

"মনে হইতেছে হাতী আসিয়াছে। নিগম বনে মাঝে মাঝে হাতীর দল আসে। হাতী আসা খুব সুলক্ষণ। চল, চল, এখনও অনেকটা পথ যাইতে হইবে।"

আবার শিলাঙ্গী ছুটিতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া শিলাঙ্গী বলিল, "রোহা কিন্তু যাহা বলিবে তাহাতে তুমি আপত্তি করিও না। করিবে না তো?"

"রোহা কি বলিবে তাহা না শুনিয়াই কি করিয়া প্রতিশ্রুতি দিব! তাহার প্রস্তাব যদি আপত্তিজনক হয়—"

"আপত্তিজনক হইবে না—"

"কি করিয়া জানিলে?"

"আমি জানি।"

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টি নিশ্চয়ই হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে আমি তাহা দেখিতে পাই নাই।

"তাহা হইলে বল, শুনি—"

"আমি বলিব না, রোহার মুখে শুনিও।"

..রোহা চতুর্দিকে মশাল জ্বালিয়া বসিয়াছিল। একা বসিয়াছিল সে। তাহার সম্মুখে বাঁধা ছিল একটি গাভী, তাহাকেই সে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। শিলাঙ্গী আমাকে দূর হইতে দেখাইয়া দিল, তাহার পর আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, "ওই রোহা। আমি তোমাকে রোহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া চলিয়া আসিব। তাহার পর তুমি তোমার বক্তব্য বলিও। বেশী জোরে কথা বলিও না যেন, গাভীটা তাহা হইলে ভয় পাইবে, রোহাও চটিয়া যাইবে। জোরে কথা বলা রোহা পছন্দ করে না। ঝোনঝিরার উপর এইজন্যই রোহা চটা, সে বেশী চীৎকার করে—"

লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, নিগম বনের চতুর্দিকে মশাল জ্বলিতেছে এবং প্রত্যেক মশালকে কেন্দ্র করিয়া সশস্ত্র একদল লোক নীরবে বসিয়া আছে।

শিলাঙ্গী চুপি চুপি বলিল—"উহারা আমাদের গরুর দলকে পাহারা দিতেছে।"

দেখিলাম শিলাঙ্গীকে সকলেই চেনে। সকলেই তাহার সহিত সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করিল। আমার দিকে চাহিয়া দুই একজন ভ্রূকুটি করিল বটে, কিন্তু শিলাঙ্গীর সঙ্গে ছিলাম বলিয়া কেহ কোনও প্রশ্ন করিল না। রোহার নিকট গিয়া জানু পাতিয়া বসিল এবং নিম্নকণ্ঠে বলিল, "নিম্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তোমার সহিত কথা কহিতে আসিয়াছে। উহারাও

অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত। উলম্ভন উহাদের দলের একজনকে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর একজনকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছে। উহারা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া উলম্ভনকে আক্রমণ করিতে চায়। তোমার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য নিম্ব-সম্প্রদায়ের দলপতি ধবল এই যুবকটিকে পাঠাইয়াছে। তুমি ইহার সহিত কথা বল।"

রোহা গাভীটির দিকে যেমন চাহিয়াছিল তেমনি চাহিয়াই রহিল। শিলাঙ্গী আমাকে ইঙ্গিতে সম্মুখে আসিতে বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। কোথায় গেল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমিও রোহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম এবং অনুচ্চকণ্ঠে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম।

রোহা গাভীটির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল। মনে হইল চুপি চুপি সে যেন কোনও গোপন কথা বলিতেছে।

বলিল, "আমি শান্তিপ্রিয় লোক। অশান্তকে শান্ত করাই আমার ধর্ম। আমি বন্য গাভীকে ঘিরিয়া রাখিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া শান্ত করিতে চাই। ওই গাভীটিকে প্রথম যেদিন বন্দী করিয়াছিলাম সেদিন ও খুব বেশী ছটফট করিতেছিল। এখন আর তত ছটফট করিতেছে না। কিন্তু আহার ত্যাগ করিয়াছে। কাল উহাকে ছাড়িয়া দিব, আবার কিছুদিন পরে ধরিব। আমার বিশ্বাস বন্দী অবস্থাতে ক্রমশঃ ওই গাভী আমাদের প্রদত্ত খাদ্য আহার করিবে। আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ উহার অশান্ত প্রকৃতি শান্ত হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমি এই নির্জন বনে গরুদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতেছি। তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছি। আমি কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। ভাবিয়াছিলাম উলম্ভন যদি আমাকে বেশী বিরক্ত করে আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া গরুর দল লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব। কিন্তু অন্য কারণে এখন আবার অন্য প্রকার ভাবিতেছি। আমার কন্যা শিলাঙ্গীকে লইয়া আমি একটু বিব্রত হইয়াছি। তাহার জন্য আমার শান্তি বারম্বার বিঘ্নিত হইতেছে। প্রথমত আমার পত্নীদের মধ্যে যাহারা শিলাঙ্গীর সমবয়সী তাহারা কেহ উহাকে সুচক্ষে দেখে না। শিলাঙ্গী সুন্দরী এবং আমার প্রিয়পাত্রী বলিয়াই সম্ভবত তাহারা ঈর্ষান্বিতা। শিলাঙ্গীকে প্রায়ই তাহারা কষ্ট দেয়, প্রহার পর্যন্ত করে। দ্বিতীয়ত, শিলাঙ্গীকে ঘিরিয়া আমাদের একদল যুবক উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য তাহাদের মধ্যে প্রায়ই রক্তারক্তি হইতেছে। শিলাঙ্গী কিন্তু উহাদের কাহাকেও বিবাহ করিতে চায় না। শিলাঙ্গীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। আমার জননী যমক্ষী বলিত যদি কোন মেয়ে সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই দলপতির কর্তব্য; যমক্ষী তাহার নিজের একটি কন্যাকে হত্যাও করিয়াছিল। আমি কিন্তু যমক্ষীর এ নির্দেশ মানিতে পারিব না। শিলাঙ্গীকে হত্যা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাহাকে লইয়া বড়ই দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু কাল তাহার মুখে একটি সংবাদ শুনিয়া মনে হইতেছে যে হয়তো

আমার মানসিক উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে, হয়তো আবার শান্তি ফিরিয়া পাইব। শিলাঙ্গী নাকি তোমাকে পছন্দ করিয়াছে, তোমাকেই বিবাহ করিতে চায়। সেইজন্য আমি ঠিক করিয়াছি যে তোমরা সত্যই যদি আমাদের সহিত মিলিত হইতে চাও দুইটি সর্তে মিলিত হইতে পার। প্রথম সর্ত তুমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিবে। দ্বিতীয় সর্ত আমাদের গরুর জন্য তোমাদের তৃণশস্য দিতে হইবে। তোমরা যদি এই দুইটি সর্তে সম্মত থাক আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। আমি নিজে করিব না, আমার সম্প্রদায়ের যুবকেরা করিবে। ঝোনঝিরার নেতৃত্বে একদল যুবক যুদ্ধ করিবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হইয়া আছে। তাহারা সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইবে। তুমি তোমার দলপতিকে গিয়া এই সকল কথা বল, তিনি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হন আমরাও সম্মত আছি জানিবে। আগামী পরশ্ব পূর্ণিমা। সেই দিনই তাহা হইলে তোমার সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ দিব।"

রোহা নীরব হইল। আমিও নীরব হইয়া রহিলাম। আমি কি যে বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। এত সহজে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে শিলাঙ্গীকে পাইব তাহা কল্পনা করি নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাহাকে পাইলে যে আনন্দলাভ করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা যেন পাইলাম না, বরং মনে হইল একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্র জালে বোধহয় জড়াইয়া পড়িতেছি। ভয় হইল। সহসা নিনানির বিবর্ণ মুখটা মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তাহার কথাগুলি আবার যেন আমি শুনিতে পাইলাম—"আমার ভয় হইতেছে তুমিও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কথা বল, তুমি চুপ করিয়া থাকিও না—।"

রোহা ফিস ফিস করিয়া বলিল, "তোমার আর যদি কিছু বক্তব্য না থাকে তুমি যাইতে পার—আমি একা থাকিতে চাই।"

আমি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া শিলাঙ্গীকে দেখিতে না পাইয়া আমার অন্তরাত্মা যেন কাঁপিয়া উঠিল। একটু আগে আমার মনে যে ভয় জাগিয়াছিল তাহা প্রবলতর হইয়া আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিল। সেই অন্ধকারে মূঢ়ের মতো একা দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল শিলাঙ্গীকে আমি কয়দিন দেখিয়াছি? তাহার কতটুকু চিনি আমি? সে যে আমাকে ভুলাইয়া আনিয়া একটা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিতেছে না তাহার প্রমাণ কি? তখন বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। নানারূপ অহেতুক ভয়ে ভীত হইয়া আমি জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আজ বুঝিতে পারিতেছি ভয়ের কোনও হেতু ছিল না, আমি ভয় পাইতেছিলাম শিলাঙ্গীকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই বলিয়া। কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবার শক্তি আমরা তখনও অর্জন করি নাই। আমরা সকলকেই সন্দেহ করিতাম, সকলকেই স্বার্থপর মনে করিতাম, এমন কি দেবতাকেও। পুরোহিতের সহায়তায় স্বার্থপর দৈবী শক্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া আমাদের নিজেদের কার্যসিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতাম। দেবতার মহত্ত্বেও আমরা আস্থাবান ছিলাম

না, মানুষের মহত্ত্বেও ছিলাম না। যে শিলাঙ্গীকে কয়েক মুহূর্ত পূর্বে এত ভাল লাগিতেছিল তাহাকে ঘিরিয়া নানাবিধ বিভীষিকা আমাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পথ যদি জানা থাকিত আমি হয়তো পলায়ন করিতাম। কিন্তু অন্ধকারে অপরিচিত পথে যাইবার সাহস ছিল না। দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিঘাওয়ের বর্ণিত চিত্রটি মনে পড়িল—বন্যা-বিধ্বস্ত মূষিক সর্পের মুখের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। শিলাঙ্গী কি সত্যই মনুষ্যরূপিনী সর্পিণী? আর আমি মূষিক?

শিলাঙ্গী কিন্তু একটু পরেই ফিরিয়া আসিল।

"জংলা, জংলা, কোথায় গেলে তুমি—।"

"এই যে এখানে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

"তোমার জন্য দুধ আনিতে গিয়াছিলাম। নাও, একটু দুধ খাও, চল একটা মশালের কাছে যাই।"

শিলাঙ্গী একটা বাঁশের কেঁড়ে করিয়া আমার জন্য দুধ আনিয়াছিল। পান করিয়া শরীরে যেন নূতন শক্তি সঞ্চার হইল। শুধু শক্তি নয় একটা অনুভূতির বন্যায় আমার মনের সমস্ত গ্লানিও যেন ভাসিয়া গেল। শিলাঙ্গীকে ঘিরিয়া যে ভয় ভাবনা সন্দেহ আমাকে এতক্ষণ আকুল করিতেছিল তাহা যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া গেল। যে শিলাঙ্গীকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেই শিলাঙ্গীকে আবার যেন ফিরিয়া পাইলাম। মশালের নিকট কয়েকজন সশস্ত্র যুবক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আসিল এবং আমাকে প্রশ্ন করিল—"উলম্ভনের দূত কি তোমাদের কাছেও আসিয়াছিল?"

"হাঁ।"

"তোমরা কি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে ঠিক করিয়াছ?"

"আমাদের দলপতি তোমাদের দলপতির নিকট প্রস্তাব করিয়াছে যে আমরা উভয় দল মিলিত হইয়া যদি উলম্ভনকে আক্রমণ করি তাহা হইলে উভয় দলেরই সুবিধা হয়। রোহা দুইটি সর্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে রাজি আছে। আমাদের দলপতি ধবলকে গিয়া সর্ত দুইটি বলিব, ধবল যদি আপত্তি না করে আমরা সম্মিলিতভাবে উলম্ভনকে আক্রমণ করিব।"

"সর্ত দুইটি কি—"

"প্রথম সর্ত—"

শিলাঙ্গী ছুটিয়া আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল।

"না, না, বলিও না।"

তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

যুবকটির দিকে ফিরিয়া আমি বলিলাম—"ধবল যদি রাজি হয় কালই আমি আবার আসিব, তখন সমস্ত কথাই জানিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস ধবল

আপত্তি করিবে না, কারণ উলম্ভনের স্পর্ধা আমাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।"

"আমাদেরও করিয়াছে। ধবল বা রোহা যদি যুদ্ধ না করে আমরা যুদ্ধ করিব।"

"আমাদেরও তাহাই ইচ্ছা। দেখা যাক কতদূর কি হয়।"

শিলাঙ্গী বলিল—"চল, তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি। বেশী রাত হইয়া গেলে আবার মুশকিল হইবে।"

"চল—"

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই আমরা আবার বনের ভিতরে পড়িলাম। মনে হইল যেন সুর-লোকে প্রবেশ করিলাম, ঝিল্লীদলের সম্মিলিত ঝঙ্কার যেন আমাদের সম্বর্ধনা করিবার জন্য অরণ্যের অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চমকাইয়া উঠিলাম যখন আমাকে শিলাঙ্গী জড়াইয়া ধরিল।

"রোহা কি সর্ত করিয়াছে আমি জানি। বলিব? প্রথম সর্ত আমাকে বিবাহ করিবে, দ্বিতীয় সর্ত আমাদের গরুর জন্য ঘাস দিতে হইবে। তুমি রাজি আছ তো?"

"আমি রাজি থাকিলে তো হইবে না, ধবল যদি রাজি হয় তবেই তো।"

"ধবল নিশ্চয় রাজি হইবে।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"দেখিও।"

কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটিবার পর শিলাঙ্গী আবার বলিল—"ধবল ঠিক রাজি হইবে। সে ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।"

"কি ব্যবস্থা?"

"আমাদের পুরোহিত নম্বরুকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম। নম্বরু একটা তুক করিয়াছে। একটা বন্য মোরগ এবং একটা বন্য মুরগীর কানে কানে কি বলিয়া তাহাদের একসঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইয়াছে। নম্বরু বলিল ইহাতেই কাজ হইবে, ধবল আর অমত করিবে না। বন্য মোরগ এবং মুরগীর মিলন অগ্নিশিখার মধ্যে চিরস্থায়ী হইয়াছে, তোমাদের মিলনও হইবে।"

শিলাঙ্গী আবার আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আমিও তাহাকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিলাম। সেদিন সেই ঝিল্লীমন্দ্রিত পরিবেশে অরণ্যের অন্ধকারে আমরা যেন পরস্পরের অন্তরতম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, "ইহাতে তুমি সুখী হইয়াছ তো? তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে আমি যেন জোর করিয়া তোমাকে নিনানির নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতেছি। আমি জীবনে যাহা চাহিয়াছি চিরকালই তাহা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছি, রোহা আমার কোনও বাসনা কখনও অপূর্ণ রাখে নাই। কিন্তু

তুমি যদি সুখী না হও তোমাকে আমি বিবাহ করিব না। বল' তুমি সুখী হইয়াছ তো?"

শিলাঙ্গীকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া তাহার কানে কানে বলিলাম—"খুব সুখী হইয়াছি। তোমাকে যে পাইব ইহা আমার আশার অতীত ছিল—।"

শিলাঙ্গীকে মিথ্যা কথা বলি নাই। সত্যই আমি সুখী হইয়াছিলাম। আমার অন্তরতম সত্তা শিলাঙ্গীর অন্তরতম সত্তাকে আপন বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। যেদিন শিলাঙ্গীকে প্রথম দেখি । একটা কথা সেদিন কিন্তু বুঝিতে পারি নাই। আমার অন্তরত সত্তাকে ঘিরিয়া যে আর একটা প্রবল-তর পশু-সত্তা আছে যাহা লোভে লাল য়ত হয়, ভয়ে ভীত হয়, স্বার্থে বিচলিত হয়, যাহা অন্তরতম সত্তার প্রতি অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে যে কোনও দিকে চালিত করিতে পারে তাহার সম্বন্ধে সেদিন আমি সচেতন ছিলাম না, তাই শিলাঙ্গীর পরবর্তী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আমার দ্বিধা হইল না। শিলাঙ্গী বলিল, "আমি পূর্বে যে কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম তাহা আশা করি ভুলিয়া যাও নাই।"

"কি কথা?"

"আমি তোমার বন্ধু হইতে চাই, কেবল স্ত্রী নয়। আরও চাই যে তুমিও কেবলমাত্র আমার স্বামী হইও না, আমার বন্ধুও হও। এস আমরা শপথ করি যে সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে আমরা কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিব না। সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বড় শিথিল, কেহ কাহারও মঙ্গলের জন্য স্বার্থ-ত্যাগ করে না, বিপদের সময় পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে ইতস্তত করে না। তাহারা পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নয়, তাহারা কেবল স্বামী-স্ত্রী মাত্র। একজন স্বামীর বহু স্ত্রী থাকে, একজন স্ত্রীলোকের বহু পুরুষ থাকে, তাহারা কেহ কাহারও বন্ধু নয়। আমার ইচ্ছা আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হোক। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আরও বিবাহ করিতে পার আপত্তি করিব না। তুমি নিনানিকে ভালবাস তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, আমি কেবল তোমার বন্ধুত্ব কামনা করি। তুমি আমার কাছে তোমার কোনও কথা গোপন করিও না, আমিও তোমার কাছে কোনও কথা গোপন করিব না। তোমার বিপদে আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করিব না, আমার বিপদের সময় আমাকেও তুমি কখনও ত্যাগ করিও না। আমাদের সম্পর্ক শুধু যেন দেহের সম্পর্ক না হয়। ইহাতে তুমি রাজি আছ তো?"

"যদি রাজি না হই তুমি কি করিবে?"

"আমি উন্নগার শিখর হইতে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। বুঝিব এ সমাজে আমার স্থান নাই, আমার সরিয়া যাওয়াই ভাল।"

শিলাঙ্গীর মুখে এ কথা শুনিয়া আমি সেদিন বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলাম। স্বেচ্ছায় কেহ যে প্রাণত্যাগ করিতে পারে ইহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল তখন। যে জীবন রক্ষা করিবার জন্য এত আয়ো-

জন, এত কৃচ্ছ্রসাধন, এত আরাধনা, এত যুদ্ধবিগ্রহ—সেই জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে চাহিতেছে আমাকে পাইবে না বলিয়া? কি এমন আছে আমার মধ্যে? কি চায় ও? অন্ধকারে সেদিন তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই, বলিতে পারি না তাহার মুখে কি ভাব সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছিল। তাহার কথা শুনিয়া আমারও মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব অবর্ণনীয় ভাব সঞ্চারিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল আমি যেন এক নতুন দেশে সহসা নীত হইয়াছি, যেখানে আত্মত্যাগ করাই নিয়ম। মনে হইতেছিল আদর্শের জন্য আমিও হয়তো উদ্গার শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারিব। সেই ঝিল্লীমুখরিত অন্ধকারে ক্ষণিকের জন্য এক অনাস্বাদিতপূর্ব রস আমার চিত্তকে আপ্লুত করিয়া দিল, চকিতের মধ্যে আমি যেন এক নূতন জগতের আভাস পাইলাম।

"উত্তর দিতেছ না কেন? বল না তুমি রাজি আছ কি না?"

লক্ষ্য করিলাম শিলাঙ্গীর স্বর কাঁপিতেছে।

"নিশ্চয় রাজি আছি।"

পরমুহূর্তেই শিলাঙ্গী আমাকে জড়াইয়া ধরিল, আমিও তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। মনে হইল যাহাকে খুঁজিতেছিলাম তাহাকেই পাইয়াছি, বহুদিন পরে পাইয়াছি, জোলমার কথা তখন মনে থাকিবার কথা নয়, জোলমাই যে শিলাঙ্গীরূপে ফিরিয়া আসিতে পারে একথা মনে আসিবার কোনও সম্ভাবনাই তখন ছিল না, তখন অস্পষ্টভাবে এইটুকুই শুধু মনে হইয়াছিল যাহার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম তাহাকেই পাইয়াছি। আজ মনে হইতেছে যে, জোলমা ওহালির রঙীন বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া ভাসিতে ভাসিতে দিগন্তসীমায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল সেই জোলমাই বহু শতাব্দী পরে অন্ধকারে সেদিন শিলাঙ্গীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে সেদিন আমি চিনিতে পারি নাই।

আমরা কতক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াছিলাম জানি না, ব্যাঘ্রের নিদারুণ গর্জনে আমাদের চমক ভাঙিল। নিগম বনের মশালধারী প্রহরীরাও চীৎকার করিতেছে শুনিতে পাইলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, "সেই বাঘটা বোধহয় আজও বাহির হইয়াছে। গরু মারিবার জন্য নিগম বনে আসিয়া প্রায়ই হানা দেয়। কিন্তু রোহার প্রহরীরা খুব সতর্ক, এখনও পর্যন্ত একটাও গরু মারিতে পারে নাই। চল আমরা যাই।"

"যদি বাঘের মুখে পড়ি?"

"বাঘ আমাদের কিছু বলিবে না। চল না, আমি তোমাকে পাশ কাটাইয়া ঠিক লইয়া যাইব। একবার সুড়ঙ্গে ঢুকিতে পারিলে বাঘ আমাদের আর কি করিবে।"

শিলাঙ্গীর অনুসরণ করিতে লাগিলাম। আর আমাদের মধ্যে কোনও বাক্য বিনিময় হইল না। বাঘের ভয়েই যে আমি কথা কহি নাই তাহা নয় একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি আমাকে নির্বাক করিয়া দিয়াছিল, মনে হইতেছিল

কথা কহিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। শিলাংগীর হয়তো তাহাই মনে হইতেছিল। সে-ও একটি কথা বলে নাই। কিন্তু আমাদের নীরবতা আমাদের উভয়ের অন্তরে যে বার্তা বহন করিয়া আনিতেছিল বাক্য দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না। একটু পরে আমরা উভয়ে আসিয়া সুড়ংগের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সুড়ংগের ভিতরও আমাদের একটিও কথা হইল না। শিলাংগী প্রথম কথা কহিল সুড়ংগের অপর প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর যাইবার পর। চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভাসিয়া যাইতেছিল। সুড়ংগ হইতে বাহির হইবার পরও আমরা নীরবে পাশাপাশি হাঁটিয়া চলিয়াছিলাম। শিলাংগী বাম বাহুদ্বারা আমার কটি বেষ্টন করিয়াছিল। সহসা শিলাংগী দাঁড়াইয়া পড়িল।

"গাছের উপর ও কে! মানুষ কি?"

তাহার অংগুলি-নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম একটি বৃক্ষচূড়ায় সত্যই মনুষ্য-মূর্তির মতো কি যেন দেখা যাইতেছে। আমরা দাঁড়াইয়া পড়িতেই কিন্তু তাহা অন্তর্হিত হইল।

শিলাংগী বলিল, "বোধহয় কোনও শিকারী হরিণের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।"

"আমাদের দেখিয়া তবে লুকাইয়া পড়িল কেন?"

"আমাদের বোধহয় হরিণ ভাবিয়াছিল, কিন্তু আমরা হরিণ নয় দেখিয়া আবার আত্মগোপন করিয়াছে। আমরা হরিণ হইলে তীর ছুঁড়িত। আমাদের দলের ঘীটা প্রায়ই হরিণ-শিকার করিতে আসে—হয়তো ঘীটাই গাছে চড়িয়া বসিয়া আছে।"

"তবু চল একবার দেখিয়া আসি।"

গাছটা খুব কাছে ছিল না। তাহার নিকট পৌঁছিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়া গেল। শিলাংগী হরিণীর মতো ছুটিয়া চলিতেছিল, পাহাড়ের চড়াই উতরাই অবলীলাক্রমে পার হইয়া যাইতেছিল। আমিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতেই চলিয়াছিলাম, তবু সেই বৃক্ষতলে পৌঁছিতে অনেকটা সময় লাগিল। সেখানে গিয়া কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। গাছের উপরে উঠিয়াও তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কোথাও কেহ নাই। শিকারীই যদি হয় কোথায় সে আত্মগোপন করিল? কেনই বা করিল? আমরা পরস্পরের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। শিলাংগী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "তাহা হইলে ভূত বোধহয়। চল পালাই—। তুমি তোমার ধবলের কাছে যাও আমি রোহার কাছে যাই। রোহা আমার প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। এবার বোধহয় তুমি একা যাইতে পারিবে?"

"পারিব।"

আবার দুজন পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিলাম। বৃক্ষ-চূড়ালগ্ন সেই মনুষ্য-মূর্তিটা কিন্তু আমার মনের মধ্যে অনড় হইয়া রহিল। শিলাংগীর কথাই যদি

সত্য হয়, উহা যদি ভূতই হয়, তবে কাহার ভূত, কেন এভাবে দেখা দিল, বৃক্ষ-চূড়ায় আবির্ভূত হইল কেন, নানা প্রশ্ন মনে জাগিতে লাগিল, কিন্তু কোনটারই সদুত্তর আমার মাথায় আসিল না।

"কি ভাবিতেছ"—শিলাঙ্গী প্রশ্ন করিল সহসা।

"ওই ভূতটার কথা। কেমন যেন ভয় ভয় করিতেছে। তোমার?"

"আমার ভয় করে না। কেন করে না জান? আমি মরণকে মানিয়া লইয়াছি। মরণকে যখন কিছুতেই এড়ানো যাইবে না তখন তাহাকে মানিয়া লওয়াই ভাল। মানিয়া লইলে আর ভয় থাকে না। দেখ, দেখ, কি সুন্দর ফুলগুলি। জ্যোৎস্না উঠিলে ওগুলি ফোটে বলিয়া আমি উহাদের নাম জ্যোৎস্নামণি দিয়াছি—।"

শিলাঙ্গী লাফাইয়া লাফাইয়া ফুলগুলি পাড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। আমি তখন গাছে উঠিয়া লতাশুদ্ধ ফুলগুলি তাহাকে পাড়িয়া দিলাম।

"আমাকে পরাইয়া দাও।"

আমি তাহার চুলে, গলায়, বাহুমূলে, কোমরে ফুলের অলঙ্কার পরাইয়া দিলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে অলঙ্কারগুলি পরিল। তাহার পর বলিল—"এস তোমার মাথাতে আমি ফুলের চূড়া করিয়া দিই—।"

আমি মাথা পাতিয়া বসিলাম। সে আমার মাথায় পুষ্পচূড়া রচনা করিতে লাগিল। সহসা আমার মনে হইল কয়েকদিন পূর্বে নিনানির মাথাতেও আমি শাখাপত্র দিয়া আবরণ রচনা করিয়াছিলাম এমনি জ্যোৎস্নালোকে, এই উন্নগা পাহাড়েই। তাহার সে শিরস্ত্রাণ নদীর জলে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। নিনানিও কি ভাসিয়া যাইতেছে না? সে-ও কি আমার নাগালের বাহিরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবে? নিনানির জন্য সমস্ত চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সহসা মনে হইল সে আমার জন্য তাহার স্বামী, তাহার প্রতিপত্তি, তাহার সমাজ ত্যাগ করিয়া নির্জন গুহায় আসিয়া বাস করিতেছে কিন্তু আমি কি করিতেছি? এমন সময় আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল, শিলাঙ্গী কি করিয়া জানি না আমার মনের কথা টের পাইয়া গেল।

বলিল, "তুমি কি ভাবিতেছ বলিব? নিনানির কথা। নয়?"

"তুমি কি করিয়া টের পাইলে?"

"এমনি মনে হইল। নিনানির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দাও, আমি ঠিক তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিব।—"

"আমাদের বিবাহ হইয়া যাক তখন দিব।"

"এইবার চল আমরা যাই। রোহা নিশ্চয় আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।"

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতেই একদল হরিণ সচকিত হইয়া ছুটিয়া পলাইল। তাহারা বোধহয় কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে আমাদের নিরীক্ষণ করিতেছিল। নিমেষের মধ্যে তাহারা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

...ধবল আমার অপেক্ষায় সাগ্রহে বসিয়াছিল। ঠিক পথের ধারেই বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অগ্রসর হইয়া আসিল।

"জংলা, শীঘ্র বল তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ। তুমি চলিয়া যাইবার পর উলম্ভনের নিকট হইতে আর একজন লোক আসিয়াছিল। সে আসিয়া দাবী করিতেছিল শোহান্কি পর্বতে প্রস্তর বহন করিবার জন্য আরও লোক দিতে হইবে। এ লোকটিও দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। আমি তাহাকে বলিয়াছি কয়েক-দিন পরে লোক পাঠাইতে পারিব। এখন আমাদের মাঠের কাজ আছে। মাঠের কাজ শেষ হইলে লোক দিব। আমার স্তোকবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া লোকটি চলিয়া গিয়াছে। ঘিসু এবং ভংগার পরিবারবর্গ উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছে। তাহারা উলম্ভনের লোকটিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি অনেক বুঝাইয়া তাহাদের নিরস্ত করিয়াছি। আমি এখন দেখিতেছি, যুদ্ধ না করিয়া উপায় নাই। নিম্ব-দেবতারও হয়তো ইহাই ইচ্ছা। কারণ আমি লক্ষ্য করি-লাম, বাতাসের বেগে নিম্ববৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হইতে যে ধরণের শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা শান্তিসূচক নয়। কিছু পূর্বে তাহার মধ্যে আমি তর্জন গর্জনের আভাস পাইয়াছি। তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ শীঘ্র বল।"

আমি সমস্ত কথা ধবলকে খুলিয়া বলিলাম। ধবল কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "রোহার প্রথম সর্তে আমি সম্মত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে পার, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের তৃণশস্য তাহাদের গরুর মুখে সমর্পণ করিব কি করিয়া? তুমি তো জান, আমাদের শস্য এবার ভাল জন্মে নাই। প্রথম ফসলের সঞ্চিত শস্য আহার করিয়াই হয়তো আমাদের এবার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। ইহার উপর যদি উহাদের গরুদের জন্য শস্য দিতে হয় একদিনেই হয়তো আমাদের ক্ষেত্রগুলি শস্যশূন্য হইয়া যাইবে। আমরা তখন কি আহার করিব?"

আমি বলিলাম, "সে কথা আমিও চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু রোহার সহিত আলাপ করিয়া আর একটি কথাও আমার নিকট স্পষ্ট হইয়াছে। রোহা কিছুতেই তাহার মত পরিবর্তন করিবে না। আমরা যদি যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার সাহায্য চাই, এই দুইটি প্রস্তাবেই আমাদের রাজী হইতে হইবে। রোহার চরিত্রে আর একটি আশ্বাসজনক বৈশিষ্ট্যও আমি লক্ষ্য করিলাম, সে শান্তি-প্রিয় লোক। কাহারও সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি তাহার নাই। আমরা যদি আমাদের প্রকৃত অবস্থা তাহার নিকট খুলিয়া বলি সে আমাদের ক্ষেত্র-গুলি শস্যশূন্য করিয়া দিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তবে আমাদের তৃণশস্যের কিছু অংশ তাহাকে দিতেই হইবে। পরিবর্তে সে হয়তো তাহার দুগ্ধের কিছু অংশ আমাদের দিতে পারে।—"

ধবল অসহায়ভাবে বলিল—"দুগ্ধ আমরা কখনও খাই নাই। দুগ্ধ খাইয়া কি আমরা বাঁচিতে পারিব?"

"উহারা তো বাঁচিয়া আছে।"

"কি জানি।"

ধবল অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম—"আর একটা কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত। রোহার প্রিয়তমা কন্যা শিলাঙ্গী যখন আমাদের আপন লোক হইতেছে তখন রোহা এমন কিছুই করিবে না যাহাতে আমাদের অনিষ্ট হয়।—"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া ধবল সহসা প্রশ্ন করিল--"শিলাঙ্গী দেখিতে কেমন?"

"সুন্দরী।"

"বয়স কত?"

"অল্পই হইবে। নিনানির অপেক্ষাও ছোট মনে হয়।"

ধবলের চোখে অসহায় দৃষ্টি সহসা জীবন্ত হইয়া উঠিল।

"আমি একটা কথা ভাবিতেছি।—"

"কি?"

"আমি যদি তাহাকে বিবাহ করি কেমন হয়? নিনানি তো চলিয়া গেল। শিলাঙ্গী যদি আমার পত্নী হয় উহাদের উপর তাহার প্রভাব বেশী হইবে।"

এইবার বাধ্য হইয়া আমাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল।

বলিলাম—"সে প্রস্তাব আমি করিয়াছিলাম কিন্তু রোহা তাহাতে সম্মত নয়। শিলাঙ্গীর মতের বিরুদ্ধে রোহা কাহারও সহিত তাহার বিবাহ দিবে না। উহাদের দলেরই বহু যুবক শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু এই কারণেই রোহা কাহারও সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ দেয় নাই। শিলাঙ্গী বলিয়াছে আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

ধবল নির্নিমেষে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার মনে হইল তাহার শান্ত দৃষ্টির অন্তরালে একটা প্রচ্ছন্ন বহ্নির আভাস যেন ফুটিয়া উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধবল অবশেষে বলিল—"চল, বিঘাওয়ের সহিত পরামর্শ করি। সে কি বলে শোনা যাক।—"

আমরা বিঘাওয়ের কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমার বিঘাওয়ের নিকট যাইবার ততটা ইচ্ছা ছিল না, কারণ বিঘাওয়ের রহস্যময় কথাবার্তা হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে আমার এইরূপ একটা আশঙ্কা হইতেছিল। তবে একটা আশা আমার ছিল, হয়তো গিয়া দেখিব বিঘাও ঘুমাইতেছে। নিদ্রিত বিঘাওকে তুলিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার সাহস ধবলের হইবে না। কারণ ধবল বিঘাওকে মনে মনে বেশ ভয় করিত। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, বিঘাও জাগিয়া আছে। আগুনের ধারে বসিয়া একটা কাঠবিড়ালী পুড়াইতেছে। তাহার পুচ্ছটাকে কাটিয়া মাথার চুলে পরিয়াছে দেখিলাম। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, তাহার মেজাজটাও ভাল আছে। আমাদের সে সাদর সম্ভাষণ করিল।

"এস, এস, তোমরা যে আসিবে তাহা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম,

সেইজন্য তোমাদের অপেক্ষায় জাগিয়া আছি।"

"কি করিয়া বুঝিতে পারিলে?—"

"এই যে—"

কাঠবিড়ালীর কর্তিত পুচ্ছটি সে মাথা হইতে নামাইয়া দেখাইল।

"অনেক কষ্টে আজ জানোয়ারটিকে ধরিয়াছি। ইহারা পুচ্ছের সাহায্যে অনেক দূরের খবর পায়, সেইজন্য পুচ্ছটিকে সর্বদাই তুলিয়া রাখে। ইহার পুচ্ছ যাহার মাথায় থাকে সে-ও অনেক দূরের খবর পূর্বাহ্নেই জানিতে পারে। আর একটা যদি ধরিতে পারি তোমাকেও একটা পুচ্ছ দিব। মাথায় পরিয়া থাকিও, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি আর একটু খুলিবে।"

অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বিঘাও ধবলের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কাঠবিড়ালীর মাংস একটু খাইবে? খাও। জংলাকেও একটু দাও।"

অগ্নিকুণ্ড হইতে সে ঝলসানো কাঠবিড়ালীটিকে টানিয়া বাহির করিয়া বলিল—"মুণ্ডটি এবং বুকটি আমি খাইব, বাকীটা তোমরা দুজনে ভাগ করিয়া খাও।"

ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীটি খাইতে বেশী সময় লাগিল না। আহার শেষ করিয়া ধবল বলিল, "একটি বিশেষ প্রয়োজনে তোমার নিকট আসিয়াছি। জংলা রোহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। তাহার মুখ হইতে সব কথা শোন, শুনিয়া এখন কি করা উচিত তাহা বল।"

"রোহা কে?"

"উন্নগার অপর পারে যাহারা থাকে তাহাদের দলপতির নাম রোহা। তাহারা গরুর দুধ খায়। তোমার পরামর্শ অনুসারেই তো জংলা সেখানে গিয়াছিল। জংলা, সব কথা বিঘাওকে বল।"

আমি সমস্ত ঘটনা বিঘাওকে পুনরায় বিবৃত করিয়া বলিলাম। বিঘাও বিস্ফারিত নেত্রে সমস্ত শুনিল। শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ধবল পুনরায় প্রশ্ন করিল—"বল, এখন কি করা উচিত?"

বিঘাও সহসা মাটিতে দুই বাহু বিস্ফারিত করিয়া আবার ভেকের মতো বসিল এবং বলিতে লাগিল—"ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্"।—বলিতে বলিতে সে ঘুরিতেও লাগিল।

ধবল ভয় পাইয়া গেল, চক্ষু দিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিল, চল আমরা সরিয়া পড়ি। আমরা উভয়ে পরমুহূর্তে তাহার কুটীর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিঘাও অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার কথাও শোনা গেল।

"ধবল শোন শোন, ভয় পাইও না, আমার উত্তরটা বুঝিতে পারিলে কি না বলিয়া যাও।"

আমরা পুনরায় তাহার কুটীরে প্রবেশ করিলাম। ধবলের কথা শুনিয়া মনে হইল, সে একটু চটিয়াছে।

ধবল বলিল, "এইটুকু শুধু বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিপদের সময় তোমার পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ভয় দেখাইয়া আমাদের তাড়াইয়া দিতেছ।"

বিঘাও আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

"ভয় দেখাই নাই, উত্তরই দিয়াছি। আমি যে সম্প্রদায়ে মানুষ হইয়াছিলাম সেখানে ইঙ্গিতের ভাষায় গোপন কথাবার্তা বলা নিয়ম ছিল। ভেকের অনুকরণ করিয়া আমি তোমাদের জানাইয়াছিলাম যে, ভেকের মতো আচরণ করাই এখন আমাদের পক্ষে সমীচীন হইবে। স্থলে যদি অসুবিধা হয় জলে নামিতে হইবে। জলে অসুবিধা হইলে স্থলে উঠিবে। কিন্তু ভেকের মতো আচরণ করিয়াও আমাদের কুকুরের মতো সতর্ক থাকিতে হইবে—ঘেক ঘেক শব্দ করিয়া আমি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি।"

"রোহার সর্তে তাহা হইলে আমি সম্মত হই?"

বিঘাও নাসিকা কুঞ্চিত করিরয়া কি যেন শুঁকিতে লাগিল।

"বাতাসে আমি যেন বিপদের গন্ধ পাইতেছি। কিন্তু এখন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যুগপৎ ভেক এবং কুকুর না সাজিলে উপায় নাই।"

পুনরায় সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বাতাস শুঁকিতে লাগিল। আর কোনও উত্তর দিল না। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

ধবল বলিল, "যতদূর বুঝিতেছি বিঘাও সম্মত আছে। কিন্তু আর একটা কথা তো বিঘাওকে জিজ্ঞাসা করা হইল না—"

ধবল আবার বিঘাওয়ের কুটীরে প্রবেশ করিল।

"আচ্ছা বিঘাও, জংলার পরিবর্তে আমি যদি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করি তাহা হইলে সর্তটা কি আর একটু জোরালো হইবে না? শিলাঙ্গী যদি দলপতির পত্নী হয় তাহা হইলে তাহার প্রভাব আরও বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা।"

বিঘাও পুনরায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

"প্রস্তরকে যাহারা আরও কঠিন করিতে চায় তাহারা মূর্খ। জলকে যাহারা আরও তরল করিতে চায় তাহারাও মূর্খ। শিলাঙ্গীর কথা ভাবিবার আগে চিন্তা কর নিনানি কোথায় গেল? কেনই বা গেল?"

বিঘাও আবার হাসিয়া উঠিল।

পাংশুমুখে ধবল বাহিরে আসিয়া বলিল, "ইহার নিকট আসাই অবিবেচনার কার্য হইয়াছে। লোকটা পাগল। মীংরা যে কোথা হইতে এটাকে আনিয়া জুটাইয়া দিয়া গেল জানি না! চল, এখন বিশ্রাম করা যাক, কাল সকালে উঠিয়া যাহা হয় ঠিক করিয়া ফেলিব।"

আমি ঘরে গিয়া দেখি প্রৌঢ়া ইলচি আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আমার জন্য আহার শয্যা সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

"আমি জানিতাম তুমি আসিবে, সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। ধবলের জন্য

খাটিয়া খাটিয়া তুমি সারা হইয়া গেলে। দিবারাত্রি ক্রমাগত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতেছ। এখন খাইয়া একটু বিশ্রাম কর। আমার নিজের ভালুকের চামড়াটা তোমাকে পাতিয়া দিয়াছি। ওটা যেমন নরম তেমনি গরম। আরামে ঘুমাইবে। এখন খাও কিছু। কন্যা নদী আজ আমাকে একটা কাছিম উপহার দিয়াছে। সেটা তোমার জন্য ঝলসাইয়াছি। উহাদের সহিত কি ঠিক হইল?"

"উহারা আমাদের সহিত যোগ দিতে রাজি আছে, কিন্তু দুইটি সর্তে।"

সর্ত দুইটি বলিলাম।

"ধবল কি বলে?"

"ধবল নিজেই শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে চায়।"

"তাই না কি!"

ইলচির চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, "তুমি এক কাজ করিতে পার?"

"কি?"

"একটা পাথর বাঁধিয়া আমাকে কন্যা নদীতে ডুবাইয়া দাও। এ দুর্বহ জীবন আমি আর বহিতে পারিতেছি না।"

ইলচি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "ধবল শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে পারিবে না। কারণ, শিলাঙ্গী তাহাকে বিবাহ করিবে না।"

"কিন্তু শিলাঙ্গী তোমাকে তো বিবাহ করিবে? তাহাও কি আমার পক্ষে কম মর্মান্তিক?"

ইলচির কান্না কিছুতেই আর থামে না।

তাহার নিকট বারম্বার শপথ করিতে হইল যে শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিলেও তাহাকে আমি অবজ্ঞা করিব না।

"নিম্বদেবতার নামে শপথ করিতেছ?"

"তাহাই করিতেছি।"

ইলচির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার পীতবর্ণ অসমবৃহদ্দন্তগুলি মশাল আলোকে চকচক করিয়া উঠিল। আমাকে সযত্নে সে আহার করাইতে লাগিল।

"সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিশ্চয় তোমার পায়ে খুব ব্যথা হইয়াছে?"

"না, তেমন ব্যথা হয় নাই।"

"নিশ্চয় হইয়াছে। আমার কাছে কি লুকাইতে পারিবে? তুমি খাইয়া শোও আমি তোমার পা টিপিয়া দিতেছি।"

...কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, নিদারুণ কোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম ইলচি পাশে নাই, ভোর হইয়াছে। কোলাহলের কারণ কি জানিবার জন্য ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম, কন্যা নদীর তীরে একটা ভীড় জমিয়াছে এবং উত্তেজিতভাবে

অনেকেই চীৎকার করিতেছে। আমিও সেদিকে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ধবল তাড়াতাড়ি ভীড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"আজ সকালে কন্যা আমাদের কি উপহার দিয়াছে, দেখ।"

নিনানির জন্য শাখাপত্র দিয়া আমি যে শিরস্ত্রাণটি রচনা করিয়াছিলাম সবিস্ময়ে দেখিলাম, ধবলের হাতে সেই শিরস্ত্রাণটি রহিয়াছে। আমার সৃষ্টি আমার কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছে আবার। নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল নিনানিও কি ফিরিয়া আসিবে আবার? অনেকক্ষণ নিনানির সহিত দেখা হয় নাই। সে এখন কি করিতেছে। তাহার জন্য মনটা উন্মুখ হইয়া উঠিল। অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, সহসা কানে গেল ধবল বলিতেছে, "ইচ্ছা করিলে শাখাপত্র দিয়া আমরাও এইরূপ জিনিস প্রস্তুত করিতে পারি, ইহাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখিতে পারি।"

বেসু বলিল, "ইহার চতুর্দিকে যদি কাদার প্রলেপ দেওয়া যায় চমৎকার একটি পাত্র হইবে।"

আর একজন বলিল, "ঠিক বলিয়াছ—!"

আমাদের সমাজে এই শিরস্ত্রাণই বাসন সৃষ্টির প্রেরণা জোগাইয়াছিল। ধবলের কল্পনা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সহসা সে শিরস্ত্রাণটি মাটির উপর রাখিয়া করজোড়ে তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি সকলেই করজোড়ে বসিল। আমিও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, আমিও নিজের সৃষ্টির সম্মুখে করজোড়ে বসিয়া পড়িলাম। কন্যার তরঙ্গে তরঙ্গে একটা মৃদু কলতান জাগিয়া উঠিল।

ধবল বলিতে লাগিল—"নিগূঢ় ইঙ্গিত করিয়া কন্যা আজ আমাদের একটি সুপরামর্শ দিয়াছে। শাখাপত্রময় এই বস্তুটি শুধু যে আমাদের পাত্র প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিতেছে তাহা নয়। আমাদের এই বিপদের সময় কন্যা আমাদের যেন বলিতেছে, একত্রিত হইলে সামান্য শাখাপত্রও যেমন অসামান্য বস্তুতে রূপান্তরিত হইতে পারে একত্রিত হইলে তোমরাও সেইরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পার। উলম্ভনের যে শক্তি তোমরা দুর্জয় মনে করিতেছ একত্রিত হইলে তাহা আর দুর্জয় থাকিবে না। কলস্বরা কন্যা যেন বলিতেছে, তোমরা একত্রিত হও, একত্রিত হও, তাহা হইলে আর কোনও ভয় থাকিবে না।"

আমি চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলাম। মনে হইল, সুদূর অতীত হইতে কে যেন কথা বলিতেছে। তোমরা একত্রিত হও, একত্রিত হও, এই বাণী যেন নূতন নয়। মনে হইল, এই বাণী আশ্রয় করিয়া আমরা কবে কোথায় যেন কোন দুস্তর সমুদ্র পার হইয়াছিলাম। তুষার যুগের কথা মনে ছিল না, কাচিনের স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে যে আমরা বাঁচিতে পারি না এই সত্য মনের প্রচ্ছন্ন স্তরে যেন সুপ্ত ছিল, ধবলের কথায় তাহা যেন আবার জাগ্রত হইল। পুরাতন কথা যেন নূতন করিয়া শুনিলাম।

ধবল সহসা উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ওই দেখ, কন্যার পরপারে যে কুয়াসা জমিয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে কেমন কাটিয়া যাইতেছে। ওই শোন, কলস্বরা কন্যা বলিতেছে, তোমরা যদি একত্রিত হও তোমাদের ভয়ও কাটিয়া যাইবে।"

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, সত্যই নদীর পরপারে কুহেলি-যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। আমরা সকলেই সবিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রত্যহ যেমন হয় প্রভাত সূর্যের স্বর্ণ-কিরণ-জালে সেদিনও ধীরে ধীরে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সেদিন তাহা অপূর্ব মনে হইল। একটু পরেই কিন্তু সভয়ে আমরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কুহেলিকা সম্পূর্ণ অপসারিত হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম, পরপারের অরণ্য-প্রান্তে দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ এক ব্যক্তি বিরাট একটি প্রস্তরশূল হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটি যে উলম্ভনের চর তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। আমরা সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। নারীরা আর্তনাদ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পরিবেশটি যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল।

"জংলা, আমি মতিস্থির করিয়া ফেলিয়াছি। রোহার সর্তে আমি রাজি আছি। তুমি এখনই গিয়া তাহাকে সংবাদ দাও। আমরা সম্মিলিতভাবে অবিলম্বে উলম্ভনকে আক্রমণ করিব। তুমি এখনই চলিয়া যাও—জংলা, আর দেরি করিও না—" ধবল আমার দুই হাত ধরিয়া অনুনয় করিতে লাগিল। দলপতি হিসাবে সে আমাকে আদেশ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া অনুনয় করিতে লাগিল। শুধু সে নয়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বীর হিসাবে দলের মধ্যে আমার খ্যাতি ছিল, ধবলের আচরণ দেখিয়া সকলে মনে করিল, বর্তমান বিপদে আমিই বোধ হয় একমাত্র উদ্ধারকর্তা। সকলেই যুগপৎ বলিতে লাগিল—'জংলা, আর দেরি করিও না, চলিয়া যাও।' আমি আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, উন্নগা পর্বতের উদ্দেশ্যে আমাকে যাত্রা করিতে হইল।

...উন্নগা পর্বতে উঠিতেছিলাম। কিছুদূর উঠিয়া দেখিলাম পাহাড়ী ছাগলের দল উপত্যকায় নামিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নিনানির কথা মনে পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্বে যেমন শরীরী জনতা আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল অশরীরী স্মৃতিসমূহ তেমনি আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। নিনানির অসংখ্য স্মৃতি আমার মানসপটে অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া যেন বলিতে লাগিল—'জংলা, তুমি এ কি করিতেছ। আমাকে এমনভাবে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছ তুমি? তোমার জন্যই যে আমি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন গুহায় বাস করিতেছি তাহা কি ভুলিয়া গেলে? শিলাঙ্গী কি আমার চেয়েও বেশী সুন্দর? সে কি তোমার প্রতিশ্রুতির চেয়েও বড়?

রোহার কাছে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু চলিতে লাগিলাম পঞ্চ-পর্বতের উদ্দেশ্যে। ঠিক করিলাম, নিনানির সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার

পর রোহার সহিত দেখা করিব। ইহাও ঠিক করিয়া ফেলিলাম নিনানিকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব, শিলাঙ্গীর কথাও তাহার কাছে গোপন করিব না। তাহাকে বলিব যে আমাদের দলের হিতার্থে উলম্ভনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া আমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতেছি। কথাটা মিথ্যা হইবে না এবং দলের জন্য বাধ্য হইয়া কিছু করিলে নিনানি আপত্তিও করিতে পারিবে না। আজও যেমন তোমরা সত্যকে নানা মুখোস পরাইয়া আবৃত করিবার প্রয়াস পাও আমরাও ঠিক তেমনই পাইতাম। আমরা আরও বেশী করিয়া পাইতাম, কারণ যে যড়রিপু আমাদিগকে সত্য পথ হইতে বারম্বার ভ্রষ্ট করে সে যুগে আমরা সে ষড়রিপুর দাস ছিলাম। তাহাদেরই নির্দেশে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। সামাজিক প্রয়োজনে আত্মত্যাগমূলক যে সকল আইন আমরা করিয়াছিলাম সেই আইনকেই অনেক সময় আমরা মুখোস করিতাম, তখন আমি যেমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সমাজের কল্যাণের জন্য যখন শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে হইতেছে তখন নিনানি আইনগত কিছুই বলিতে পারিবে না। তাহার অন্তর্যামী মন হয়তো সব কথা জানিতে পারিবে। কিন্তু সে মনকেও কালক্রমে আমি প্রতারিত করিতে পারিব এ বিশ্বাস আমার ছিল। কি করিয়া তাহার কাছে কথাটা পাড়িব, তাহাকে কি কি বলিব, তাহার প্রতি আমার ভালবাসা যে অটুট আছে এবং চিরকাল যে অটুট থাকিবে তাহার কি প্রমাণ দিব, এই সব ভাবিতে ভাবিতেই আমি উন্নগা পর্বতের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম। সহসা একটা অপ্রত্যাশিত বাসনা আমার গতিরোধ করিল। মনে হইল, নিনানি ছাগলের মাংস খুব ভালবাসে। তাহার জন্য একটা ছাগল শিকার করিয়া লইয়া গেলে কেমন হয়! যদিও সঙ্গে তীর-ধনুক ছিল না, তবু মনে হইল পর্বতের সানুদেশে যে অরণ্য আছে তাহার ভিতর ঢুকিয়া সঙ্গোপনে যদি ওই পর্বতের নাতি-উচ্চ চূড়াটার উপরে উঠিতে পারি তাহা হইলে প্রস্তর ছুঁড়িয়াই একটা ছাগলকে বোধ হয় ঘায়েল করিতে পারিব। একটা ছাগলের মাথায় কিম্বা পায়ে যদি মারিতে পারি...। সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম এবং লোলুপ সরীসৃপের মতো পর্বতের সানুদেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

...আমার চেষ্টা বিফল হয় নাই। প্রস্তরের আঘাতেই একটা বড় ছাগলকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া সমর্থ হইয়াছিলাম। ছাগলটা মরে নাই। তাহাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। তাহার আর্তস্বর পার্বত্য বন-স্থলীকে সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। আমার অন্তরে পুলক সঞ্চারিত হইতেছিল, আমি আশা করিতেছিলাম, আমার অদর্শনে নিনানির মনে যদি কোনও ক্ষোভ সঞ্চিত হইয়া থাকে এই পুষ্টদেহ বন্য ছাগটি তাহা নিশ্চয়ই নিঃশেষে বিদূরিত করিবে। সে যখন প্রসন্ন হইবে তখনই শিলাঙ্গীর সহিত বিবাহের প্রসঙ্গটা তাহার নিকট উত্থাপন করিব। সমস্ত কথা শুনিয়াও কি সে আপত্তি করিবে? হয়তো সে মুখে কিছুই বলিবে না, কিন্তু ভয় হইতে

লাগিল, তাহার অনুরাগ-ভরা চাহনি, আবদারমাখা ওষ্ঠভঙ্গী নীরব ভাষায় হয়তো এমন কিছু বলিবে যে আমি বিপন্ন হইয়া পড়িব। শিলাঙ্গী আমার মনের কথা বুঝিয়াছে, তাহারও প্রথমে ইচ্ছা ছিল না যে আমি একাধিক স্ত্রীর সহিত যুক্ত থাকি, কিন্তু এখন সে মত পরিবর্তন করিয়াছে। বলিয়াছে, আমি যদি নিনানিকে বিবাহ করি তাহাতে সে আপত্তি করিবে না, নিনানিকে সে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। নিনানিই বা শিলাঙ্গীকে সহ্য করিবে না কেন? নিনানি অবুঝ, তাহাকে বুঝাইতে হইবে। যেমন করিয়া হোক বুঝাইতে হইবে যে শিলাঙ্গী যদিও আমার জীবনে অপরিহার্য কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়াও আমি থাকিতে পারিব না। তাহাকে বুঝাইতে হইবে শিলাঙ্গীকে আমি বাধ্য হইয়া নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলপতি ধবলের আদেশে বিবাহ করিতেছি, কিন্তু আমি তাহাকেই ভালবাসি। শিলাঙ্গী নামে মাত্র আমার পত্নী থাকিবে, নিনানিই হইবে আমার হৃদয়েশ্বরী। এই সব তাহাকে বুঝাইতে হইবে। কত কথাই সেদিন ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত ভয়-ভাবনা আশঙ্কা-সংশয়ের মধ্যে একটা বিশ্বাস অবিচলিত ছিল—নিনানি আমার প্রস্তাবে রাজি হইবে, সে রাগ করিবে, কাঁদিবে, অসম্মত হওয়ার ভান করিবে হয়তো আমাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হইবে সে।

যক্ষিণীর গুহার কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। প্রথম দিন গিয়া গাছে-গাছে যে বিচিত্রবর্ণ পক্ষীকুল দেখিয়াছিলাম সেদিনও তাহারা ঠিক তেমনিভাবে বসিয়াছিল। আর কাহাকেও কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, এমন কি ময়াল সাপটাকেও না। এলোমেলো হাওয়ায় দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর শাখাপত্রে একটা অদ্ভুত মর্মরধ্বনি উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল বহুদূরে কে যেন রোদন করিতেছে। অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় আমার সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল, আমি দ্রুতপদে যক্ষিণীর গুহার উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। গুহার দ্বারের কাছে আসিতেই দুইটি শকুনি ডানা ঝটপট করিয়া গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল। গুহার ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম যক্ষিণী নাই। মৃত হরিণের কঙ্কাল ও অন্ত্রগুলো চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। শকুনি দুইটা এই-গুলার লোভেই আসিয়াছিল। কিন্তু যক্ষিণী কোথায় গেল? ময়াল সাপের গুহার আগড়টাও দেখিলাম খোলা রহিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখি, ময়াল সাপটাও নাই। কোথায় গেল সব? তাড়াতাড়ি ছুটিয়া নিনানির গুহার কাছে গেলাম। নিনানিও নাই। গুহার ভিতর ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। খড়ের স্তূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, নিনানি নাই।

"নিনানি—"

কেহ সাড়া দিল না।

"নিনানি—"

পরিচিত উত্তরের আশায় উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না।

"নিনানি—নিনানি—নিনানি—"

আমারই আহ্বানের প্রতিধ্বনি বারম্বার আমার কাছে ফিরিয়া আসিল, নিনানি আসিল না।

উন্মত্তবৎ চতুর্দিকে সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু নিনানিকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। যেখানে নিনানি খনিত্রপূজা করিয়াছিল সেখানে গেলাম। ভূমিতে প্রস্তরে মূষিকরক্তের চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে, দুই একটা শুষ্ক ফুলের পাপ্ড়িও পড়িয়া আছে, কিন্তু নিনানি নাই। যে ঝর্ণায় নিনানিকে স্নান করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম, ছুটিয়া সেখানে গেলাম, কিন্তু সেখানেও নিনানি ছিল না। অপরাজিতা পুষ্পদল আমার মুখের দিকে চাহিয়া এক রহস্যময় হাসি হাসিতে লাগিল। মনে হইল তাহারা বুঝি নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অপরাজিতা কুঞ্জ ছিন্নভিন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু নিনানিকে পাইলাম না। নদীতট অরণ্য উপত্যকা সর্বত্র খুঁজিলাম কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। যক্ষিণী অথবা নিনানি কাহারও সন্ধান না পাইয়া শুধু যে বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা নয়, ভীতও হইয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, যে অনির্দিষ্ট অদৃশ্য শক্তি নিনানিকে এমনভাবে অপহরণ করিয়াছে, সে কি আমাকেও নিস্তার দিবে? দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিছুদূর ছুটিয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িলাম। সহসা মনে হইল নিনানিকে এই নির্জন অরণ্যে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইতেছি! আমিই যে তাহাকে এ স্থানে আনিয়াছিলাম, আমারই প্ররোচনায় সে যে এই ভয়াবহ স্থানে নির্জন গুহায় বাস করিতে সম্মত হইয়াছিল! এখন তাহাকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি? আবার ফিরিলাম। নিনানির গুহায় ফিরিয়া আসিলাম আবার।

"নিনানি—নিনানি—নিনানি—নিনানি—নিনানি—"

আমার চীৎকারে বনভূমি প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পক্ষীকুল চঞ্চল হইয়া কলরব করিয়া উঠিল। কিন্তু নিনানির সাড়া পাইলাম না। আমি তখন সেই শূন্য গুহায় সেই ইতস্ততবিক্ষিপ্ত শুষ্ক খড়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার হৃৎপিণ্ডটিকে দুই হাতে কে যেন মুচড়াইয়া দিতেছে, কোন অদৃশ্য হস্ত আমাকে যেন নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে। অসহায়ভাবে আমি সেই পরিত্যক্ত গুহায় লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না, তর্জন শুনিয়া আবার আমাকে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিতে হইল। দেখিলাম, গুহার সম্মুখে গাছের যে প্রকাণ্ড শিকড়টা বাহির হইয়াছিল সেই শিকড়টাকে বেষ্টন করিয়া ময়াল সাপটা আমার দিকে নিষ্পলক হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। পরমুহূর্তেই আমি আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলাম। গুহার মধ্যে কয়েকটা প্রস্তর খণ্ড পড়িয়াছিল

সেগুলি তুলিয়া তুলিয়া আমি তাহার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ময়ালের মুখে কয়েকটা লাগিল কিন্তু তাহাতে সে নিরস্ত হইল না। দেখিলাম, ধীরে ধীরে সে গুহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি এক লম্ফে গুহা হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া আবার একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। আহত ময়ালটা আমাকে অনুসরণ করিতেছে না কি? ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাই নাই, তাহার পর পাইলাম। দেখিলাম, আর একটা ময়াল। আমি যে ছাগলটাকে যক্ষিণীর গুহার সম্মুখে ফেলিয়া গিয়াছিলাম দেখিলাম আর একটা ময়াল সেইটাকে পাকে পাকে জড়াইয়া নিষ্পিষ্ট করিতেছে। আমি আবার ছুটিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, আশে পাশে বোধ হয় আরও ময়াল সাপ আছে, তাহারা হয়তো এইবার আমাকে আক্রমণ করিবে।

...সুড়ঙ্গের অপর পারে শিলাঙ্গী আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। আমি বাহির হইতেই সাগ্রহে সে ছুটিয়া আসিল।

"তুমি কত দেরি করিলে! কতক্ষণ যে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি—"

আমি যে নিনানির খোঁজে গিয়াছিলাম সে কথা তাহাকে আর বলিলাম না। এখন ভাবিতেছি, কেন বলি নাই?

"চুপ করিয়া আছ যে। ধবল কি বলিল?"

"রোহার সর্তে ধবল রাজি হইয়াছে।"

"হইয়াছে?"

শিলাঙ্গী হাততালি দিতে দিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

"ঝোনঝিরা এখনও ফেরে নাই। চল, রোহার কাছে যাওয়া যাক। রোহা নিশ্চয় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে।"

"চল।"

...রোহা আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমস্ত শুনিয়া সে চুপি চুপি বলিল, "সুখী হইলাম। কাল তোমার সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ হইয়া যাক। তাহার পর আমাদের লোক তোমাদের ক্ষেত হইতে তৃণশস্য কাটিয়া আনিতে যাইবে।"

"তাহারা কত তৃণশস্য কাটিবে তাহা কি ঠিক হইয়াছে?"

"হইয়াছে। আমাদের দুইজন লোক সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যত তৃণ কাটিয়া আনিতে পারে প্রতি পূর্ণিমায় তত তৃণ তোমাদের দিতে হইবে, আপাতত ইহাই আমি ঠিক করিয়াছি। ইহাতে ধবল আশা করি আপত্তি করিবে না। সমস্ত দিনে দুইজন লোকে কত তৃণই বা সংগ্রহ করিবে। তোমাদের কথা ভাবিয়াই আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছি। তোমার আশা করি ইহাতে আপত্তি নাই।"

"না।"

"বেশ, তাহা হইলে আমি বিবাহের আয়োজন করি। আমাদের বিবাহের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে। তুমি ধবলকে লইয়া কাল সকালেই এখানে চলিয়া আসিও। শিলাঙ্গী কিন্তু কাল সকাল হইতে লুকাইয়া থাকিবে। তুমি আসিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে তাহাকে। যতক্ষণ না খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে ততক্ষণ বিবাহ হইবে না। এই ব্যাপা একটু বিলম্ব হওয়ার আছে। শিলাঙ্গীকে খুঁজিয়া পাইবার পর অবশ্য বেশী বিলম্ব হইবে না। তোমরা তখন উভয়ে এক-পাত্র হইতে দুগ্ধ পান করিবে। তাহার পর আমি এবং তোমাদের দলপতি ধবল উভয়ে মিলিয়া তোমাদের এক সঙ্গে বাঁধিয়া দিব। দীর্ঘ বন্যলতা দিয়া তোমার হাতের সঙ্গে শিলাঙ্গীর হাত, তোমার কোমরের সঙ্গে শিলাঙ্গীর কোমর, তোমার পায়ের সঙ্গে শিলাঙ্গীর পা বাঁধিয়া দিয়া আমরা দুইজনে সরিয়া যাইব। তাহার পর আমাদের পুরোহিত নম্বরু আসিয়া তোমাদের কানে কানে কি বলিবে। কি যে বলিবে তাহা নম্বরু ছাড়া আর কেহ জানে না, কারণ, নম্বরু তাহা তোমাদের প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিবে। তাহার নিষেধ অমান্য করিলে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। নম্বরু বেশী সময় লইবে না। তাহার পর আসিবে কথক এবং আমাদের দলের যুবক যুবতীরা। তাহারা তোমাদের ঘিরিয়া নৃত্য গীত করিবে। তোমাদেরও তাহাদের সহিত নৃত্য গীত করিতে হইবে। নৃত্য গীত শেষ হইলে তাহারা মশাল জ্বালিয়া তোমাদের সঙ্গে করিয়া কন্যা নদীর তীরে পেঁাছাইয়া দিয়া আসিবে। ইহাই হইল আমাদের বিবাহের পদ্ধতি। কাল একটু সকাল সকাল আসিও।"

আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া রোহা ফিস ফিস করিয়া কথাগুলি বলিল। মনে হইল সে যেন বিবাহের কথা বলিতেছে না, কোন ষড়যন্ত্রের কথা বলিতেছে। আমি রোহার কাছে একাই ছিলাম, শিলাঙ্গী বাহিরে কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ আর একটি কিশোরী ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া রোহার কোলের উপর গিয়া বসিল। তাহার পর এক হাত দিয়া রোহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল সে। রোহা বিব্রত বোধ করিতেছিল, কিন্তু শান্তিপ্রিয়তার জন্যই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, সে মেয়েটির এই আচরণের কোনও প্রতি-বাদ করিল না।

মেয়েটি বলিল—"রোহা, শুনিতেছি নাকি শিলাঙ্গীর বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে?"

"হাঁ। এই যুবকটির সহিত কাল তাহার বিবাহ হইবে।"

মেয়েটি এমনভাবে আমার দিকে চাহিল যেন এতক্ষণ সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। একবার মাত্র আমাকে দেখিয়া তাহার পর এমন বিশ্রী মুখভঙ্গী করিল যাহার অর্থ ভাষায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—'আহা, কি পছন্দ!'

রোহা আমার দিকে চাহিয়া বলিল।—"এটি আমার কনিষ্ঠা পত্নী হিং।"

হিং তর্জন করিয়া উঠিল, "কেবল কনিষ্ঠা পত্নী? আর কিছু নই নাকি?"
"হাঁ, প্রিয়তমা পত্নীও।"
হিং আবার তাহাকে চুম্বন করিল। এবং পরমুহূর্তে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।
রোহা তখন চুপি চুপি বলিল, "ইহারাই শিলাঙ্গীর শত্রু। তুমি ইহাদের সহিত সাবধানে কথাবার্তা বলিও।"
"আমি কোন কথাই বলিব না।"
"সেই ভাল। নীরবতাই শান্তিলাভের সহজ উপায়।"
আমি তখন রোহাকে একটি প্রশ্ন করিলাম। কারণ ফিরিয়া গেলেই ধবল আমাকে এই প্রশ্নটি করিবে।
"বিবাহ হইয়া গেলেই কি আমরা সম্মিলিতভাবে উলম্ভনকে আক্রমণ করিব?"
"সেটা নির্ভর করিতেছে ঝোর্নাঝরার উপর। সে ফিরিয়া আসুক, তখন এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। আমি নিজে যুদ্ধের পক্ষপাতী নই। তুমি কি যুদ্ধ চাও?"
"না। এখন যুদ্ধ হইলে শিলাঙ্গীকে ফেলিয়া আমাকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। তাহা আমার ইচ্ছা নয়।"
গম্ভীর রোহাকে এতক্ষণে হাসিতে দেখিলাম। আমার এই কথায় তাহার দন্তরাজি নীরবে বিকশিত হইল এবং কিছুক্ষণ বিকশিত হইয়াই রহিল।
"আমি চেষ্টা করিব যাহাতে যুদ্ধ এখন না হয়। ঝোর্নাঝরা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তো কিছুই স্থির হইবে না।"
আমি চুপ করিয়া রহিলাম। হিং আর একবার উঁকি দিয়া চলিয়া গেল।
রোহা বলিল, "তোমার আর যদি কোনও বক্তব্য না থাকে, তুমি যাইতে পার। ধবলকে লইয়া কাল খুব ভোরেই এখানে চলিয়া আসিবে। কারণ শিলাঙ্গী যে কতক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই।"
আমি উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। শিলাঙ্গী বাহিরে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।
"রোহার নিকট সমস্ত শুনিলে তো? কাল সকাল সকাল আসিও, আমি এমন জায়গায় লুকাইব যে সহজে আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না, তোমাকে নাকাল করিয়া তাহার পর ধরা দিব।"
"ঠিক তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফেলিব, দেখিও।"
"আচ্ছা, দেখা যাইবে। শেষে খোসামোদ করিতে হইবে, শিলাঙ্গী কোথায় আছ দেখা দাও, যাহা চাও তাহাই দিব, দেখা দাও।"
"তোমাকে খোসামোদ করিতে আমার আপত্তি নাই। তুমি কি চাও বল না, তাহাও তোমাকে আনিয়া দিব। মীংরা এবার আসিবার সময় আমার জন্য

কুমীরের দাঁতের হার আনিবে বলিয়া গিয়াছে। যদি আনে তাহাই তোমাকে দিব।"

"তাহা দিও। কিন্তু সত্য সত্যই যে জিনিসটি আমি প্রাণ দিয়া চাই তাহা দিবে তো?"

"কি সেটি?"

"তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।"

"নিশ্চয় দিব।"

কাল আমাকে খুঁজিবার সময় বারম্বার এই প্রতিশ্রুতিটি চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে কিন্তু। নিগম বনের বৃক্ষলতা পশুপক্ষী সকলে সাক্ষী থাকিবে, উন্নগা পর্বত সাক্ষী থাকিবে, আমাদের দলের সকলেও সাক্ষী থাকিবে। বলিবে তো?"

"নিশ্চয় বলিব।"

"কাল কখন আসিবে তোমরা?"

"ধবলকে গিয়া বলি। তাহাকে সঙ্গে করিয়া যখন আনিতে হইবে তখন তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছি না। তবে চেষ্টা করিব খুব সকাল সকাল যাহাতে আসিতে পারি। আর একটা কথা। ধবল ওই সুড়ঙ্গ পথ দিয়া কি আসিতে পারিবে? এখানে আসিবার আর কোন পথ আছে?"

"আছে। কিন্তু তাহাতে অনেকটা ঘুরিতে হইবে। চল, সেটাও তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।"

আমরা উভয়ে উন্নগা পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলাম।

...আমি চলিয়া আসিবার পর কন্যা নদীর পরপারে শূলধারী ব্যক্তিটিকে আবার না কি দেখা গিয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম, নিম্ব-সম্প্রদায়ের সকলেই উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল। ধবলের মুখ দেখিলাম ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

"কি হইল? রোহা কি বলিল?"

ধবল ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল আমাকে।

"রোহা সম্মত হইয়াছে। কাল প্রত্যূষে উঠিয়া আমাদের দুইজনকে রোহার নিকট যাইতে হইবে। কালই সে শিলাঙ্গীর সহিত আমার বিবাহ দিতে চায়। আমাদের শস্যও সে অধিক লইবে না। তাহাদের দলের দুইজন লোক প্রতি পূর্ণিমায় আসিবে। আমার মনে হইল এ দাবী অন্যায় নয়, তাই আমি সম্মত হইয়া আসিয়াছি।"

"আমিও সম্মত। কালই বিবাহ হোক। আমাকেও যাইতে হইবে?"

"তাহাদের বিবাহের পদ্ধতি অনুসারে দলপতির থাকা প্রয়োজন।"

কিন্তু উলম্ভনের লোক যেরূপ ঘন ঘন হানা দিতেছে তাহাতে আমার অনুপস্থিত থাকা কি সঙ্গত হইবে?"

এমন সময় বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ করিয়া একটা শব্দ হইল। এরূপ শব্দ আমরা আর কখনও শুনি নাই। সকলেই ভীত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। শব্দটা ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। মেয়েরা এবং শিশুরা সবেগে নিজ নিজ কুটিরের দিকে ধাবিত হইল। ধবল আদেশ করিল—"সকলে নিজ নিজ কুটিরের দ্বারে গিয়া অবস্থান কর। বিপদ কোন দিক হইতে আসিতেছে সন্ধান করিয়া দেখি। তোমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া থাক।"

ধবল সবেগে নিম্ব বৃক্ষটির দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিপন্ন হইলে সে নিম্ব-দেবতারই আশ্রয় লইত। আমিও আমার নিজের কুটিরের দিকে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম সেখানে ইলচি এবং ধবলের অন্যান্য পত্নীগণও সন্তান-সন্ততি সহ সমবেত হইয়াছে। সকলেরই মুখে এই কথা,—"এইবার আমাদের সর্বনাশ হইল, এইবার আমরা সদলে সবংশে নিহত হইলাম। আর ধবল আমাদের বাঁচাইতে পারিল না। জংলা, চল তোমার সহিত পলায়ন করি।"

বিশেষ করিয়া ইলচি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত এই কথা বলিতে লাগিল। আমি দ্বারপ্রান্তে বিব্রত বিপন্ন হইয়া সবলে প্রস্তর কুঠারটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমারও মনে হইতেছিল এইবার বুঝি সব শেষ হইয়া গেল। শিলাঙ্গীকে আর দেখিতে পাইব না। নিনানির মুখটাও মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল সে যেন সুদূর লোকে বসিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহস্যময় হাসি হাসিতেছে। যেন বলিতেছে—'আমাকে প্রতারণা করিয়া শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে যাইতেছিলে, দেখ এইবার কি হয়! বিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণীকে অবিশ্বাস করিয়া আমাকে লুকাইয়া রাখিয়া আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে যে, আমার কিছু হইবে না, কানা কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে ভোলে নাই, আমার মৃত্যুই হইয়াছে। এইবার তুমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। তোমার এবার আর শিলাঙ্গীকে লাভ করা হইল না। শিলাঙ্গীর পরিবর্তে কঠোর মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রস্তুত হও।'

হঠাৎ বোঁ বোঁ শব্দটা থামিয়া গেল। আমার হৃৎস্পন্দনও সহসা থামিয়া গেল যেন। কুঠারের হাতলটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছিল, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। কাহারও মুখ দিয়া একটি শব্দ নির্গত হইতেছিল না, অন্ধকার ঘরে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমরা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। একটু পরেই একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। মনে হইল গল্প করিতে করিতে কাহারা যেন আমাদের কুটিরের দিকেই আসিতেছে। ধবলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আর একটু পরেই ধবল আমার কুটিরের সম্মুখে আসিয়া ডাক দিল।

"জংলা, বাহির হইয়া এস। মীংরা আসিয়াছে—"

আশঙ্কা মুহূর্তেই আনন্দে রূপান্তরিত হইল। আমরা সকলে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

ধবল বলিল, "এখন মীংরা আসাতে আমার একটা সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। কাল আমাকে রোহার নিকট যাইতে হইবে, ভাবিতেছিলাম কাহাকে এখানে রাখিয়া যাইব। মীংরা থাকিলে চিন্তার কোনও কারণ নাই। তোমরা মশাল জবাল, মীংরাকে খাবার দাও—"

মীংরাকে ঘিরিয়া আমাদের উৎসব জমিয়া উঠিল। আমাদের প্রত্যেকের জন্যই মীংরা কিছু না কিছু উপহার আনিয়াছিল। কাহারও জন্য রঙীন ঝিনুক, কাহারও জন্য কড়ি, কাহারও জন্য অদ্ভুতাকৃতির প্রস্তরখণ্ড, কাহারও জন্য পাখীর পালক, কাহারও জন্য পশু-চর্ম। আমার জন্য কুম্ভীর দন্তের মালা আনিতে সে ভোলে নাই। নিনানির জন্য সে একটি ভল্লুক-চর্ম আনিয়াছিল, কিন্তু ইলচি সেটি অধিকার করিল।

মীংরা প্রশ্ন করিল, "তোমাদের ফসল কেমন হইতেছে?"

"প্রথম প্রথম ভাল হইয়াছিল, এবার কিন্তু তেমন ভাল হয় নাই। আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।"

ধবলের মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মীংরা বলিল, "চিন্তার কোনও কারণ নাই। জমিকে ভাল করিয়া পূজা করিতে হইবে। পূজা করিবার নূতন পদ্ধতি আমি তোমাকে শিখাইয়া দিয়া যাইব। আমি নানাস্থান ঘুরিয়া অনেক নূতন জিনিস শিখিয়া আসিয়াছি।"

আমরা সকলে সবিস্ময়ে মীংরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মশাল আলোকে তাহার চোখের দৃষ্টিতে যে চতুরতা সেদিন পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহার অর্থ সেদিন বুঝিতে পারি নাই। অনেক পরে পারিয়াছিলাম।

"বোঁ বোঁ করিয়া শব্দটা কিসের হইতেছিল—"

আমি আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ধবলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মীংরা বলিল, "ওটি একটি প্রেতাত্মা, উহাকে আমি বশ করিয়াছি। উহার অদ্ভুত ক্ষমতা, উহা তোমাকে নির্ভুলভাবে চালিত করিতে পারে। আমি এখানে আসিবার পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ওই প্রেতাত্মাই শব্দ করিতে করিতে আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। উহার শব্দ অনুসরণ করিলে ভুল হইবার উপায় নাই। ওটি আমি ধবলকে উপহার দিয়া যাইব। আমি আর একটিকে বশ করিয়া লইব। বশ করিবার মন্ত্রটি আমি শিখিয়াছি।—"

মীংরা বলিল—"অনেক নূতন জিনিস আমি শিখিয়াছি, সব তোমাদের শিখাইয়া দিব। ঝিনা নদীর তীরে যে শাল সম্প্রদায় বাস করে তাহারা চমৎকার বাসন প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। কয়েক দিন তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া প্রণালীটি আয়ত্ত করিয়াছি। অনেকেই আজকাল বাসন প্রস্তুত করিতেছে। নীহু, রাবো, ঘংকাও হয়তো ইহা শিখিয়াছে। তাহারাও হয়তো একদিন আসিয়া তোমাদের ইহা শিখাইতে চাহিবে। তৎপূর্বে আমিই তোমাদের শিখাইয়া দিব; একটি পাথরের খনির সন্ধানও আনিয়াছি। কিন্তু সর্বপ্রথমে

উলম্ভনের সহিত বিবাদের একটা নিষ্পত্তি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আরও অনেক স্থানে উলম্ভনের কথা আমি শুনিয়াছি। মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া বিরাট বিরাট প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া সে নিজের কবর প্রস্তুত করিতেছে। যাদুকর টম্ভা তাহাকে বলিয়াছে সে যদি শৃঙ্গধারী পর্বতের উপর প্রস্তরনির্মিত একটি কবর গৃহ নির্মাণ করিতে পারে তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ু হইবে। সে আরও বলিয়াছে সেই কবরগৃহের প্রাচীরে এমন একটি ছিদ্র যদি থাকে যে ছিদ্র দিয়া প্রভাতের প্রথম সূর্যালোক তাহার সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ করিতে পারিবে তাহা হইলে উলম্ভন অমর হইবে। যাদুকর টম্ভা বলে যদি কোন আবৃত স্থানে কেহ নিজের কবর খনন করিয়া রাখে এবং সেই কবরে যদি প্রথম সূর্যালোক প্রত্যহ প্রবেশ করে তাহা হইলে সেখানে আর কোন মনুষ্যের শবদেহ স্থান পাইবে না, কারণ স্বয়ং সূর্য দেবতা ওই স্থানটি নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। টম্ভার পরামর্শ অনুসারে উলম্ভন তাই নিজের জন্য ওইরূপ একটি কবর গৃহ প্রস্তুত করিতেছে। টম্ভার নির্দেশে সে দূরবর্তী এক পর্বত হইতে বড় বড় প্রস্তর-খন্ড সংগ্রহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রস্তরগুলি কাটিয়া শৃঙ্গধারী-পর্বত-শীর্ষে লইয়া যাইতে হইলে অনেক লোক চাই। সেইজন্য উলম্ভন লোকের সন্ধান করিতেছে। ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হোক বহুলোক তাহাকে একত্রিত করিতে হইবে। সেইজন্য সে তোমাদের এখানে হানা দিয়াছিল। আরও অনেক সম্প্রদায়ে সে হানা দিয়াছে। শুনিয়াছি লোকটি অত্যন্ত বলশালী এবং অত্যন্ত কামুক। বহু সুন্দরী নারীকেও সে হরণ করিয়াছে। তোমরা উহার কবলে পড়িও না, পড়িলে তোমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। রোহার সহিত মিলিত হইয়া অবিলম্বে উহাকে আক্রমণ করাই উচিত। রোহা যে সব সর্ত করিয়াছে তাহা যদিও আমাদের অনুকূল নহে, শিলাঙ্গী মেয়েটি অপয়া হইবে কিনা তাহাও আমাদের জানা নাই, তথাপি বাধ্য হইয়া আমাদের এখন রাজি হইতে হইবে। রোহার গরুর জন্য কিছু তৃণ-শস্য দিলে আমরা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। আরও বেশী জমি চাষ করিয়া আমরা সে ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু মুশকিল হইবে শিলাঙ্গী যদি অপয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে আমি ঈগল সম্প্রদায়ের বর্তমান দলপতি মংখীর সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। ভালভিরা অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঈগল সম্প্রদায় বাস করে। মংখী খুব ভাল লোক। মংখীর মুখে শুনিলাম তাহার পুত্র টাকা শিকারে বাহির হইয়াছিল। দুই দিন পরে সে একটি মৃত ব্যাঘ্র এবং জীবন্ত যুবতী লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। বলিল, যুবতীটি তাহার মোহিনীশক্তি দ্বারা ব্যাঘ্রটিকে অবশ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই টাকা ব্যাঘ্রটিকে শিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে নাকি অঙ্গভঙ্গী সহকারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ব্যাঘ্রের গুহার সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিল, তাহাতে ব্যাঘ্র এমন মুগ্ধ হইয়া যায় যে টাকা কুঠারাঘাত করিবার পরও সে কিছুমাত্র শব্দ করে নাই। যুবতীটি পাপিয়া সম্প্রদায়ভুক্তা। গভীর

জঙ্গলে বড় বড় বৃক্ষেই তাহারা সাধারণতঃ বাস করে, ফলমূল পোকামাকড় ধরিয়া খায়। যুবতীর নাম হূহূ। অপরূপ রূপসী। মংখী বলিল, হূহূ কেবল ব্যাঘ্রকেই মুগ্ধ করে নাই, তাহার শার্দূল-পরাক্রম পুত্রকেও বশ করিয়াছিল। মংখী এই অজ্ঞাতকুলশীলার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত ছিল না। টাকার আগ্রহাতিশয্যেই অবশেষে বিবাহ হইল। বিবাহের পর কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা শোচনীয়। বিবাহের পরদিন বজ্রাঘাতে টাকার মা মারা গেল। তাহার কয়েকদিন পরে মংখীর কুকুর ঘর্ঘট পাগল হইয়া দলের কয়েকজনকে দংশন করিল। যাহাদের দংশন করিল তাহারাও পাগল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিবাহ করা বিপজ্জনক। রাক্ষসী প্রেতিনীরা অনেক সময় মানবীর ছদ্মবেশে বিচরণ করিয়া নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লয়। এই শিলাঙ্গী যে কেমন হইবে তাহা আমাদের জানা নাই, তথাপি আমাদের এখন বিঘাওয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ উপদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। কুকুরের মতো সতর্ক থাকিয়া ভেকের মতো যখন যাহা সুবিধা তখনই তাহা করিতে হইবে। ধবল, তুমি কাল প্রত্যূষেই জংলাকে লইয়া চলিয়া যাও। ইহার পর যদি আমরা কোনও বিপদে পড়ি আমি যে প্রেতাত্মাটিকে আনিয়াছি সে আমাদের নির্ভুল পথে চালিত করিবে। কোন ভয় নাই, নিম্বদেবতা আমাদের ঠিক মঙ্গল করিবেন।"

...সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত মীংরা নানারূপ গল্প করিল। তাহাকে ঘিরিয়া মশাল-হ সেদিন আমরা অনেক অদ্ভুত কথা শুনিলাম। বিঘাও মীংরাকে পাইয়া খুবই খুশী হইয়াছিল। সে তাহার ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় জানাইতেছিল যে মীংরা যখন আসিয়া পড়িয়াছে তখন আর চিন্তার কোনও কারণ নাই। সে কখনও বলিতেছিল—'হাওয়া যখন আসিয়াছে, তখন গাছের পাতা এবার নিশ্চয় নড়িবে।' কখন বলিতেছিল—'সূর্য যখন দেখা দিয়াছে তখন অন্ধকার আর থাকিবে না।'

...পরদিন প্রত্যূষেই আমরা রোহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। সমস্ত পথ ধবল আমার সহিত একটি কথা বলিল না। আমি নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছিলাম, কিন্তু ধবল আমার কথার উত্তরে যতটুকু কথা না বলিলে নয় ততটুকু কথাই বলিতেছিল। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া একটি কথাও বলে নাই। রাত্রে আমরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িবার পর বিঘাওয়ের কুটিরে গিয়া মীংরা, বিঘাও এবং ধবল আরও অনেক গল্প করিয়া নানারূপ পরামর্শ করিয়াছিল। তাহারই ফলে সম্ভবতঃ ধবল গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখন আমি তাহা অনুমান করিতে পারি নাই। ধবলের গাম্ভীর্যে আমি মনে মনে হাসিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম নিনানিকে হারাইয়া ধবল শিলাঙ্গীর মধ্যে আর একটি তরুণী ভার্যা লাভ করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ সে স্বপ্ন সফল না হওয়াতে সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাই গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

উন্নগার উপত্যকা অতিক্রম করিতে করিতে দেখিলাম বন্য গরুর দল চরিতেছে। মনে হইল শিলাঙ্গীর দুধুনী মধুনীও উহার মধ্যে আছে। ধবলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিলাম। ধবল কিন্তু বিশেষ কোনও উত্তর দিল না। গরুগুলির দিকে চাহিতে চাহিতেই আমি পথ অতিবাহন করিতেছিলাম, গরুগুলি আমার মনে এক অপূর্ব ভাব সঞ্চার করিতেছিল। এতদিন গরু দেখিয়া মনের মধ্যে হিংসা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ভাব উদ্রিক্ত হয় নাই, এখন কিন্তু তাহাদের দেখিয়া মন স্নেহ-রসে সিক্ত হইতে লাগিল। মনে মনে এ বাসনাও জাগিল যে শিলাঙ্গীর মতো আমিও একটি গরু পুষিব। আমার মনের এই কোমল ভাব বেশীক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হইতে পাইল না। আমরা একটি তরু-বীথির ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম অকস্মাৎ একটি গাছের উপর হইতে কুঠারপাণি এক যুবক লাফাইয়া পড়িল এবং আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল মানুষ নয়, যেন মনুষ্যাকৃতি একটি নেকড়ে বাঘ। ভ্রূকুটিকুটিল মুখে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল সে খানিকক্ষণ, তাহার পর বলিল, "আমি ঝোনঝিরা। আমাকে হত্যা না করিয়া কেহ শিলাঙ্গীকে লাভ করিতে পারিবে না।"

আমাদের কথা বলিবার পর্যন্ত অবসর না দিয়া ঝোনঝিরা আমাকে আক্রমণ করিল। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের সহিতও কুঠার ছিল এবং আমরা দুইজন ছিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের কুঠার যুদ্ধ হইল। ঝোনঝিরা আমাকেই আক্রমণ করিয়াছিল, আমিই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম। দেখিলাম ঝোনঝিরা কুঠার চালনায় খুবই দক্ষ। আমারও এ বিষয়ে পারদর্শিতা কম ছিল না। সুতরাং অনেকক্ষণ কেহই কাহাকেও আঘাত করিতে পারিলাম না। ধবল একটু দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে আমাদের যুদ্ধ দেখিতেছিল, সহসা সে পিছন দিক হইতে আসিয়া ঝোনঝিরার মস্তকের ঠিক মধ্যস্থলে সজোরে কুঠারাঘাত করিল। তাহার মস্তক চৌচির হইয়া গেল। ধবলের হাতের কব্জিতে যে এত শক্তি আছে তাহা আমার ধারণা ছিল না। তাহার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিতেই সে বলিল, "আমি কখনও দুইবার আঘাত করি না। এখন চল, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া শীঘ্র ফিরিতে হইবে। ইহার দেহটাকে আপাতত ওই ঝোপের মধ্যে গুঁজিয়া রাখ। কেহ যেন দেখিতে না পায়। কোনও জন্তু জানোয়ারে যদি টানিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে তো চুকিয়াই গেল, তাহা না হইলে উহাকে কবর দিবার ব্যবস্থা কাল কোন সময় আসিয়া করিতে হইবে। এ যুদ্ধের কথা তুমি যেন কাহাকেও বলিও না।" ঝোনঝিরার রক্তাক্ত দেহটাকে টানিয়া একটা ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর আবার আমরা রোহার উদ্দেশ্যে পথ চলিতে লাগিলাম। ধবল পুনরায় মৌন হইয়া গেল।

...শিলাঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করা সত্যই একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে যে কোথায় লুকাইয়াছিল তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। রোহা ধবলের সহিত আলাপ করিতেছিল, আমি একা

একা শিলাঙ্গীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। জটিল অরণ্যের ভেতর ঢুকিয়া চীৎকার করিতেছিলাম—"শিলাঙ্গী তুমি কোথায়, বাহির হইয়া এস, আমি শপথ করিতেছি যে আমি চিরকাল তোমার বন্ধু থাকিব।" আমার চীৎকার শুনিয়া কখনও এক ঝাঁক সচকিত টিয়া কলরবে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া উড়িয়া গেল, কখনও কয়েকটা শৃগাল একটা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আর একটা ঝোপে অন্তর্ধান করিল, কখনও ঘনপত্রপল্লবের একটা অদ্ভুত মর্মরে দূরাগত রোদন-ধ্বনির মতো কিসের যে আভাস দিতে লাগিল তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম না। অরণ্যের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইলাম একটি জলাশয় রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য জলজ পুষ্প ফুটিয়া আছে। জলাশয়ের এক অংশ মরকত-শ্যাম শৈবালে আচ্ছন্ন, তাহাতেও স্বর্ণকান্তি অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। জলাশয়ের অপরপারে সারস জাতীয় এক পক্ষী-দম্পতী ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল। আমার চীৎকার শুনিয়া তাহারা প্রথমে বিচলিত হয় নাই। বরং মনে হইল আমার বক্তব্যটা তাহারা প্রণিধান করিতেছে। একটি সারসের মুখভাবে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গও যেন আমি লক্ষ্য করিলাম। আমি ক্রমাগত চীৎকার করিতেছিলাম—"শিলাঙ্গী তুমি কোথায় ফিরিয়া এস, আমি শপথ করিতেছি যে চিরকাল তোমার বন্ধু থাকিব, তোমাকে বিপদে ফেলিয়া কখনও পলায়ন করিব না। আমি শপথ করিতেছি, শোন, তুমি দেখা দাও, বড়ই বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে—" আমার চীৎকারে বিরক্ত হইয়াই সারস-দম্পতী অবশেষে বোধ হয় উড়িয়া গেল। জলাশয়ের পুষ্পগুলি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। অরণ্যে বহুক্ষণ আমি ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু শিলাঙ্গীর দেখা পাইলাম না। অরণ্য পার হইয়া গিয়া পর্বত-সংলগ্ন একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম, দূরে দেখিতে পাইলাম কয়েকটি বন্য গরু চরিতেছে। একটি বলিষ্ঠাকৃতি ষণ্ড আমার চীৎকার শুনিয়া তাড়া করিয়া আসিল। একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হইল। ষণ্ডটি যে ঝোনাঝিরার প্রিয় ষণ্ড তাহা তখন জানিতাম না, পরে শিলাঙ্গীর মুখে শুনিয়াছিলাম। আমিই যে ঝোনাঝিরার মৃত্যুর কারণ ষণ্ডটি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল? অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় চীৎকার করিতে লাগিলাম। অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ লতা গুল্ম, প্রতিটি পশু আমার শপথ একাধিকবার শ্রবণ করিল। শিলাঙ্গী কিন্তু দেখা দিল না। সহসা আমার ভয় হইল শিলাঙ্গী বোধ হয় আর আসিবে না। ঝোনাঝিরার মৃত্যু সংবাদ সম্ভবতঃ তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমার নিষ্ঠুর আচরণে মর্মাহত হইয়া সে হয়তো আমাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়াছে। আর হয়তো তাহার দেখা পাইব না। কথাটা মনে হইবামাত্র আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া গেল। চলচ্ছক্তিহীন হইয়া আমি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলাম। সহসা আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আমি নীরবে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এখন ভাবিতেছি আমি রোদন করিয়াছিলাম কেন?

শিলাঙ্গীকে না পাওয়ার দুঃখটা কি শিলাঙ্গীর অভাবে, না আমার আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া? আমার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও কি আমি শিলাঙ্গীকে চাহিয়াছিলাম? ইহার সত্য উত্তর কয়েকদিন পরেই মূর্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহাকে চিনিতে পারি নাই।

...আমি কতক্ষণ রোদন করিয়াছিলাম জানি না, সহসা পিছন হইতে কে যেন আমাকে জড়াইয়া ধরিল। ফিরিয়া দেখি শিলাঙ্গী। "ছি, ছি, তুমি কাঁদিতেছ? চল, আর বিলম্ব হইবে না। তুমি কোথায় কোথায় গিয়াছ আমি জানি, কি কি বলিয়াছ তাহাও আমি শুনিয়াছি। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম, কেবল লুকাইয়াছিলাম। ধবল রোহা বোধ হয় এতক্ষণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। চল, এবার যাই।"...রোহা-বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারেই শিলাঙ্গীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। ধবল কিন্তু সমস্ত ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। রোহাও বিশেষ কিছু বলে নাই। আমার মনে হইল উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকর কি যেন একটা হইয়াছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হইল পরদিন। রোহা ধবলকে দুগ্ধ পান করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ধবল সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই। ধবল বলিল যে পানীয় সে স্পর্শ করিবার কল্পনা পর্যন্ত করে নাই তাহা পান করিতে অনুরোধ করিয়া রোহা তাহাকে অপমান করিয়াছে। রোহা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল ধবল তাহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে। উভয় দলপতির মনোমালিন্যের পটভূমিকাতেই সেদিন আমার সহিত শিলাঙ্গীর সামাজিক মিলনের চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রথা অনুসরণ করিয়া মেয়েরা যদিও নৃত্যগীত করিয়াছিল, কথক গানের সুরে সুরে লাল পাখীর সহিত নীল পাখীর প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু মৌন দুই দলপতির সৌহার্দ্যের অভাব একটা অজানিত আশঙ্কায় সমস্ত উৎসবকে যেন ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিল। এই আশঙ্কা আতঙ্কে পরিণত হইল আর একটু পরে, যখন আমি শিলাঙ্গীকে লইয়া নিজেদের আস্তানার উদ্দেশ্যে পর্বত আরোহণ করিতেছিলাম।

উহাদের প্রথা অনুযায়ী উহারা আমাদের সঙ্গে নিজেদের সীমানার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আসিল। রোহা নিজের সীমানায় শিলাঙ্গীকে স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়াছিল। সীমানার শেষ-প্রান্তে আসিয়া সে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এইবার তুমি শিলাঙ্গীর ভার বহন কর।" আমি শিলাঙ্গীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। রোহা তখন ধবলের হস্তে একটি জ্বলন্ত মশাল দিয়া বলিল, "অন্ধকারে তুমি উহাদের পথ দেখাও—"

...জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। একটা পার্বত্য পেচকের চীৎকার মধ্যে মধ্যে নৈশ নিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিতেছিল। শিলাঙ্গী আমার স্কন্ধারূঢ়া থাকিয়াই আমাদের পথ নির্দেশ করিতেছিল। প্রথা অনুসারে তাহার নামিবার উপায় ছিল না। রাত্রে আমরা পার্বত্য পথ ভাল চিনিতে পারিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর ধবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "রোহা নিজে উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে চাহে না। সে বলিল ঝোনঝিরা ফিরিয়া আসিলে সে-ই যুদ্ধের ব্যবস্থা করিবে। রোহার নিজের যুদ্ধ করিবার স্পৃহা নাই। উলম্ভন যদি তাহাকে বেশী বিরক্ত করে সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে বলিতেছে। রোহার নিকট হইতে এ আচরণ প্রত্যাশা করি নাই। সে অবিলম্বে যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করিবে এই আশাই করিয়াছিলাম। ঝোনঝিরার সহিত আমাদের সর্তের কি কোন সম্পর্ক ছিল?"

"রোহা আমাকে বলিয়াছিল যে ঝোনঝিরা আসিলে যুদ্ধের ব্যবস্থা হইবে।"

"তাহা হইলে তো মুশকিল হইল। তুমি তো একথা আমাকে ঘুণাক্ষরে বল নাই।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, শিলাঙ্গীও কিছু বলিল না। নীরবে আমরা পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম। উন্নগা পর্বতের উপত্যকায় অরণ্যে বৃক্ষশীর্ষে জ্যোৎস্না রহস্যময়ী হইয়া উঠিল। মনে হইল সে কি যেন একটা গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর ওই কর্কশ-কণ্ঠ পার্বত্য পেচকের চীৎকার যেন হাতুড়ির মতো তাহার রহস্যপুরীর দ্বারে আঘাত হানিতেছে। আমরা একটা ঘন তরুশ্রেণীর ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম, সহসা ধবল মশালটা ঊর্ধ্বে তুলিয়া আতঙ্কিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"নিনানি, নিনানি—"

আমিও মুখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম একটি বৃক্ষের চূড়া হইতে ঘন পত্র-পল্লব ফাঁক করিয়া নিনানি যেন আমাদের দেখিতেছে। নিমেষের মধ্যেই কিন্তু সে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শিলাঙ্গীও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

"নিনানির প্রেতাত্মা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। আর বোধ হয় আমাদের নিস্তার নাই। সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ সে এইবারে লইবে... .."

ধবল মশাল লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। আমিও কম ভীত হই নাই, আমিও ছুটিতে লাগিলাম।

শিলাঙ্গী কেবল একবার বলিল—"আমাকে কাঁধে করিয়া ছুটিতে তোমার কষ্ট হইতেছে, আমাকে নামাইয়া দাও" কিন্তু তাহাকে আমি নামাইয়া দিলাম না, আমার ভয় হইতে লাগিল নামাইয়া দিলে নিনানির প্রেতাত্মা হয়তো তাহাকে আক্রমণ করিবে। আমার সঙ্গে শিলাঙ্গীর প্রকৃত সম্পর্ক যে কি হইয়াছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্যই যে নিনানির প্রেতাত্মা ওই বৃক্ষে ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল তাহাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। নিনানির আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। এখন মনে হইল সে মারাই গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই দেখা দিত। কোনও বন্য পশুই হয়তো তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। কিম্বা সেই সর্বগ্রাসী ময়াল সাপগুলো......। যক্ষিণীও কি মরিয়াছে? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল শুধু শিলাঙ্গী নয়, নিনানিও যেন আমার স্কন্ধের উপর উঠিয়া চাপিয়া বসিয়াছে এবং শিলাঙ্গীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

...পরদিন প্রভাতে রোহার প্রেরিত দুইজন লোক আসিয়া আমাদের

তৃণশস্য কাটিয়া লইয়া গেল। সমস্ত দিনে তাহারা অনেক তৃণশস্য সংগ্রহ করিল। নিম্ব সম্প্রদায়ের সমস্ত নর-নারী ইহাতে বেশ অসন্তুষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। ধবল নিম্ববৃক্ষের নিম্নে সমস্তদিন বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। শিলাঙ্গীর দিকে বা আমার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিল না। মীংরা প্রভাতে উঠিয়াই যে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল সমস্ত দিন তাহার আর সাক্ষাৎ পাই নাই। শিলাঙ্গী হাসিমুখে আগাইয়া গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে আমল দিল না। ইলচির চোখের দৃষ্টি হিংস্র হইয়া উঠিল। সাংরা প্রকাশ্যেই বলিল—একটা পাহাড়ী ডাইনী আমাদের জংলার উপর ভর করিয়াছে। কেবল কয়েকটি শিশু শিলাঙ্গীকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মায়েরা তাহাদের তাহার নিকট আসিতে দিল না। আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু শিলাঙ্গী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল কেবল। মনে হইল এরূপ ব্যবহারে সে অভ্যস্ত। এখন মনে হইতেছে সে যেন সারাজীবন ধরিয়াই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল কিন্তু কেহই তাহার মর্মকথা শুনিতে চাহে নাই। তাহার শ্রীমণ্ডিত দেহটাই হইয়াছিল ইহার প্রধান অন্তরায়। তাহার আসন্নযৌবনপুষ্ট দেহটা কাহাকেও মুগ্ধ, কাহাকেও লুব্ধ, কাহাকেও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মোহ, লোভ অথবা ক্ষোভের ফেনিল স্রোতে আসল শিলাঙ্গী বারম্বার ভাসিয়া গিয়াছিল, শিলাঙ্গীর স্বরূপ কাহারও চোখে পড়ে নাই। তাহার জীবনে একমাত্র আমিই বোধহয় তাহার বন্ধুত্বের দাবী মানিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু আমিও কি সত্যই তাহা মানিয়াছিলাম? আমি মানিবার ভান করিয়াছিলাম মাত্র। অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া উচ্চকণ্ঠে আমি যে শপথ উচ্চারণ করিয়াছিলাম সে শপথের মর্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমিও তাহার দেহটা দেখিয়াই প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম, প্রলোভনের বশবর্তী হইয়াই তাহার নিকট মিথ্যা শপথ করিয়াছিলাম, তাহাকে পাইবার জনাই নিনানির সহিতও মিথ্যাচরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে পাই নাই। সেদিন বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না আজ কিন্তু বুঝিয়াছি শঠতার দ্বারা মহৎ কিছু লাভ করা যায় না। নাগালের মধ্যে পাইয়াও তাহাকে হারাইতে হয়। শিলাঙ্গী বিঘাওয়ের নিকটও আলাপ জমাইতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে পলাইয়া আসিতে হইল। বিঘাও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। শিলাঙ্গী আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল—"ও বিঘাও নয়, বাঘ। এখনই আমাকে খাইয়া ফেলিত। চল আমার দুধুনী মধুনীকে দেখিয়া আসি—।"

"চল।"

...যে ঝোপে শিলাঙ্গীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই ঝোপের ভিতর আমরা দুইজন সেই গাছের উপরই পাশাপাশি বসিয়া ছিলাম। দুধুনী মধুনীর দেখা পাওয়া যায় নাই। দুধুনী মধুনী এ ঝোপটিতে প্রায়ই না কি

আসিয়া ঢোকে, তাই আমরা আশা করিয়া বসিয়াছিলাম। নিনানির কথা হইতেছিল। শিলাঙ্গীও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

"আমি স্পষ্ট দেখিলাম নিনানি গাছের ডাল ফাঁক করিয়া আমাদের দেখিতেছে। সত্যই কি নিনানি মরিয়া গিয়াছে? আমার বিশ্বাস হয় না।"

"কিন্তু সে গেল কোথায়? যক্ষিণীও নাই।"

"খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। ঝোনাঝিরাও উলম্ভনের নিকট হইতে এখনও ফিরিল না কেন বুঝিতে পারিতেছি না। এক হিসাবে অবশ্য ভালই হইয়াছে, ঝোনাঝিরা থাকিলে নির্বিঘ্নে বিবাহ হইত না, একটা না একটা ঝঞ্ঝাট বাধাইত সে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ঝোনাঝিরার মৃত্যুসংবাদটা তাহাকে দিতে পারিলাম না। একটা শাখা আমার চোখের সম্মুখে বাতাসে দুলিতেছিল। মনে হইল সে যেন দুলিয়া দুলিয়া নীরব ভাষায় আমাকে বলিতেছে—"এই কি তোমার বন্ধুর মতো আচরণ? প্রথম দিন হইতেই কপটতার আশ্রয় লইলে!" সহসা আর একটা কথা মনে হওয়াতে ভীত হইয়া পড়িলাম। ঝোনাঝিরার প্রেতাত্মা আসিয়া ওই শাখাটা আশ্রয় করে নাই তো? ওই শাখাটাই এত বেশী দুলিতেছে কেন? শিলাঙ্গীর দিকে ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম তাহার দৃষ্টি দূর দিগন্তে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়, অধরে স্মিত মৃদু হাসি। আমি নির্ণিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যে আকস্মিক ভয়ে ভীত হইয়াছিলাম তাহা যেন আকস্মিকভাবেই অপনোদিত হইল। মনে হইল শিলাঙ্গী যতক্ষণ আমার কাছে আছে ততক্ষণ কেহই আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমার নির্ণিমেষ দৃষ্টির আকর্ষণেই শিলাঙ্গী যেন মুখ ফিরাইল, আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "কি দেখিতেছ?"

"তোমাকে।"

শিলাঙ্গীও আমার মুখের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল, "জংলা, বল, তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে তো?"

"থাকিব।"

কম্পমান শাখাটা দেখিলাম নিষ্কম্প হইয়া গিয়াছে। আমি নির্ভয় হইলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ভয় নূতন মূর্তিতে দেখা দিল আবার। আকাশ হইতে উড়িয়া আসিল। একটা সোঁ সোঁ শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পর দেখিলাম পঞ্চ-পর্বতের শিখর অতিক্রম করিয়া একটা মেঘ দ্রুতবেগে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মনে হইল ঝড় আসিতেছে না কি?

"পঙ্গপাল, পঙ্গপাল।—"

শিলাঙ্গী আতঙ্কিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"চল, বাড়ি যাই, চল, চল, পঙ্গপাল বড় ভয়ানক পতঙ্গ।"

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আমরা যখন উন্নগা পর্বত হইতে নামিয়া

আসিলাম তখন দেখিলাম লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল আমাদের তৃণক্ষেত্রে আসিয়া বসিয়াছে। ধবল, মীংরা উন্মাদের মতো চীৎকার করিতেছে—"মার, মার, নিঃশেষ কর।" আমাদের দলের সকলে—এমন কি ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত —পঙ্গপাল-নিধনে ব্যাপৃত হইয়াছে। বিঘাও দেখিলাম জীবন্ত পঙ্গপাল মুখে পুরিয়া চর্বণ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া বিঘাও দন্ত বাহির করিয়া হাসিল। বলিল, "কানা এইবার প্রতিশোধ লইতেছে। দেখা যাক কতক্ষণে তাহার রাগ কমে। তোমরা দাঁড়াইয়া আছ কেন? এক একটাকে ধর আর খাও—।"

...আমাদের সমস্ত তৃণশস্য নিঃশেষ করিয়া পঙ্গপালের দল উড়িয়া গেল। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের কয়েক সহস্রকে হয়তো নিধন করিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আমরা আমাদের তৃণশস্যগুলি বাঁচাইতে পারিলাম না। সমস্ত মাঠ শূন্য হইয়া গেল। নিম্বসম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা কন্যা নদীর তীরে সমবেত হইয়া হাহাকার করিতেছিল। ধবল বলিতেছিল, "এবার আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। কন্যা আমাদের উপর বিরূপ হইয়াছে। জমি আর তেমন শস্য দিতেছে না। এবার একে শস্য কম হইয়াছিল তাহার উপর পঙ্গপাল আসিল। কোন পাপে নিম্ব-দেবতা আমাদের এ শাস্তি দিল? বিঘাও বলিতেছে কানা প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু কানার ক্রোধেরই বা হেতু কি? আমি তো কোনও অপরাধ করি নাই। তোমরা কেহ যদি কোনও পাপ কোনও মিথ্যাচরণ করিয়া থাক, বল, অকপটে স্বীকার কর। আমাদের জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, এখন কেহ কপটতার আশ্রয় লইও না। যদি কেহ কিছু করিয়া থাক স্বীকার করিতে ভয় পাইও না, আমি তাহার হইয়া কানার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব, আমি নিজে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব। কেহ যদি কিছু করিয়া থাক, স্বীকার কর।—" কেহ কোনও উত্তর দিল না। কেবল বিঘাওয়ের অট্টহাস্যে সান্ধ্য অন্ধকার প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। মীংরা ভীড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া আর বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার আমরা ভবিষ্যতে কি করিব তাহাই স্থির করা প্রয়োজন। আমি কাল প্রভাতেই উঠিয়া নূতন স্থানের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িব। তৎপূর্বে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহা তোমাকে বলিয়া যাইতে চাই। নাঙ্গা নদীর তীরে নকুল সম্প্রদায়েরা বাস করে। তাহাদের ক্ষেত্রগুলি যখন শস্য দান করিতে পরাঙ্মুখ হইল তখন এক অভিনব উপায়ে নকুল-দলপতি ডোডো ক্ষেত্রগুলিকে পুনরায় উর্বর করিয়া তুলিয়াছিল। ধবল, সে উপায় আমি তোমাকে বলিয়া যাইব। তুমি বিচলিত হইও না, আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন চল আমরা নিজ নিজ কুটিরে যাই। কন্যা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া এমনভাবে সকলে যদি হাহাকার করি কন্যার শান্তি বিঘ্নিত হইবে, তাহাতে আমাদের আরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।"

মাংরার কথা শুনিয়া আমরা সকলে নিজ নিজ কুটিরে ফিরিয়া গেলাম। রাত্রির অন্ধকার ক্রমশ ঘনাইয়া আসিল। আর একটু পরে সে অন্ধকার জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত হইল। সে আলোক কিন্তু আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না। একটা নামহীন অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমরা মুহ্যমান হইয়া রহিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল আমিই যেন সমস্ত ব্যাপারটার জন্য দায়ী। আমার কপটতা, আমার মিথ্যা আচরণ, আমার শঠতাই আমাদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। যেদিন হইতে আমি শিলাঙ্গীকে দেখিয়াছি সেইদিন হইতেই আমি সরলতা পরিত্যাগ করিয়াছি। এমন কি যে নিনানির মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া আমি ধবলের সহিত প্রতারণা করিয়াছিলাম সেই নিনানির সহিতও আমি সরল ব্যবহার করি নাই। শিলাঙ্গীর কথা তাহাকে বলিবার সাহস সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাহাকে ক্রমাগত মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

...গভীর রাত্রি। কেন জানি না সহসা ঘুমটা ভাঙিগয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। চতুর্দিক নীরব। কেবল বহুদূরে একটা টিট্টিভ পক্ষী চীৎকার করিতেছিল। আর কোথাও কোন শব্দ ছিল না। মনে হইল টিট্টিভের অশ্রান্ত চীৎকার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিতেছে, একটা আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে আমাকে যেন সাবধান করিতেছে। কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া বসিয়া সেই দূরাগত চীৎকারধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। শিলাঙ্গী পাশেই শুইয়া ঘুমাইতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল তাহাকে জাগাই কিন্তু কি মনে করিয়া আর জাগাই-লাম না। টিট্টিভ ক্রমাগত বলিতে লাগিল—কি-যে-করিস্, কি-যে-করিস্, কি-যে-করিস। মনে হইল সে যেন আমাকে বলিতেছে ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া কি করিতেছিস, বাহিরে আসিয়া দেখ কি হইতেছে। তবু আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে পাখীর ডাকটা আমাকে যেন পাইয়া বসিল। সম্মোহিত হইয়া আমি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলাম। শিলাঙ্গী একা শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

...কন্যা নদীর তীরে সেদিন অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন জীবন্ত। মনে হইতেছিল কোন যাদুকরী যেন সম্মোহন-মন্ত্র-বলে সকলের নয়নপল্লবে কালনিদ্রা বিছাইয়া দিয়া সঙ্গোপনে নিগূঢ় কিছু করিতেছে। টিট্টিভ পক্ষীটা যেন সে কথা জানে, তাই সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছে। চতুর্দিক রহস্যে পরিপূর্ণ। আমি আমাদের শস্যশূন্য মাঠের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল ধর্ষিতা নারীর মতো সে যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ যেন নীরব ভাষায় আমাকে বলিতে লাগিল—"আমার এ দুর্দশা কেন হইয়াছে জান? শিলাঙ্গীর জন্য। ধবলই ঠিক বলিয়াছিল, তৃণভোজী গরুরা আমাদের শত্রু, সেই গরু যাহারা পালন করে, তাহারা কখনও আমাদের মঙ্গল করিতে পারে না। শিলাঙ্গী এখানে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাই পঙ্গপালের দল আসিয়া আমাদের লুণ্ঠন করিয়া

চলিয়া গেল। শিলাঙ্গী অপয়া, শিলাঙ্গী অলক্ষ্মী, শিলাঙ্গী ছদ্মবেশিনী প্রেতিনী। তুমি এখনও সাবধান হও। তুমি নিম্ব-সম্প্রদায়ের সমর্থ যুবক, ভবিষ্যতে হয়তো তুমিই দলপতি হইবে, তুমি সামান্য একটা নারীর জন্য সকলের স্বার্থকে বিনষ্ট করিও না। যে অত্যাচার আমরা সহ্য করিলাম তোমার নিকট তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি। এ অপমানের প্রতিশোধ চাই।"

...ঘিসু এবং ভংগার স্ত্রীরাও বলিয়াছিল 'প্রতিশোধ চাই'। তাহাদেরই সরব দাবী যেন জ্যোৎস্নালোকে নীরব ভাষায় আমার অন্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সহসা দেখিতে পাইলাম দূরে নিম্ববৃক্ষতলে কাহারা যেন বসিয়া আছে। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। নিম্ব বৃক্ষটির ঠিক পশ্চাতেই একটি ঘন ঝোপ ছিল। ঠিক করিলাম সেই ঘন ঝোপের ভিতর হইতে প্রথমে দেখিব কাহারা বসিয়া আছে, তাহার পর যদি প্রয়োজন মনে করি আত্মপ্রকাশ করিব। সংগে সংগে মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম এবং সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া ঘন ঝোপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। টিটিভ অবিচ্ছিন্ন সুরে বলিতে লাগিল—'কি-যে-করিস্', 'কি-যে-করিস' 'কি-যে-করিস'। স্বপ্নের ঘোরেই আমি সরীসৃপের মতো সেই ঝোপের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিলাম। কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে যেন এক নিদারুণ সত্যের সম্মুখীন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। স্বপ্নের ঘোর বেশীক্ষণ কিন্তু রহিল না।

...নিম্ববৃক্ষতলে ধবল, মীংরা এবং বিঘাও বসিয়াছিল। ঝোপের মধ্যে সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই ধবলের যে কথাগুলি আমার কর্ণগোচর হইল তাহা এতই ভীতিকর যে, ঝোপের মধ্যে একা বসিয়া থাকাই শেষপর্যন্ত আমার পক্ষে শক্ত হইল। ধবল বলিতেছিল—"আমি একটু আগে স্বচক্ষে আবার নিনানির প্রেতাত্মাকে দেখিয়াছি, স্বকর্ণে তাহার কথাও শুনিয়াছি। নিনানি বলিল, 'শিলাঙ্গীকে তোমরা যদি অবিলম্বে দূর করিয়া না দাও, তাহা হইলে তোমাদের আরও বিপদ হইবে। শিলাঙ্গী মানবী নয়, রাক্ষসী।"

বিঘাও বলিল, "সাধারণ মানবী যে নয় তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি।"

"কি প্রমাণ?"

"তাহা এখন বলিব না।"

"কিন্তু কি করিয়া এখন উহার কবল হইতে আমরা উদ্ধার পাই তাহা বল।"

মীংরা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে এইবার কথা বলিল। সে বলিল, "তোমার ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি কি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা তো তোমাকে বলিয়াছি। শিলাঙ্গীকে তুমি ব্যবহার করিতে পার!"

"তাহা তো পারি কিন্তু সে কথা শিলাঙ্গীকে বলিব কি করিয়া?"

"শিলাঙ্গীকে পৃথক করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কাল সকালে ঘোষণা করিয়া দাও যে কন্যা নদীর কলকলধ্বনিতে তুমি কর্তব্যের নির্দেশ পাইয়াছ। তুমি আমাকে যাহা বলিতেছিলে সকলকে তাহাই বল। বল কন্যা

বলিতেছে, বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। উপর্যুপরি শস্য দান করিয়া জমি ক্লান্ত ক্ষুধিত ও পিপাসিত হইয়াছে। নর-রক্ত না দিলে সে তৃপ্ত হইবে না, সঞ্জীবিত হইবে না। তাহার পর তুমি ঘোষণা কর যে মীংরা যে ভূতটি আমাকে দিয়া গিয়াছে সেই ভূতটির উপরই আমি নির্বাচনের ভার দিলাম। সেই ঠিক করিবে কাহার রক্ত আমরা ভূমিতে সেচন করিব। তাহার পর গভীর রাত্রে সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িবে তখন যে রজ্জুবন্ধ কাষ্ঠখণ্ডটি তোমাকে উপহার দিয়াছি সেইটি মাথার উপর বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিলাঙ্গীর কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিবে।"

ধবল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"জংলা যদি বাধা দেয়?"

"জংলাকেও হত্যা করিবে—সঙ্গে অস্ত্র লইয়া যাইও। বিঘাওকে সঙ্গে রাখিও।"

বিঘাও বলিল, "জংলাকে হত্যা করিতে আমার আপত্তি নাই। আমার ধারণা জংলাই নিনানির মৃত্যুর কারণ। ন্যায়ত এইজন্যই তাহার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।"

একথা শোনার পর আমি আর সেই ঝোপের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার পৃষ্ঠে যেন কাহার স্পর্শ অনুভব করিলাম, মনে হইল অশরীরী নিনানি আমাকে যেন উহাদের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া নিনানিকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু যাহা দেখিতে পাইলাম তাহাতেই আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। ঘনপত্রপল্লবাচ্ছন্ন একটি চারার পত্র-পল্লবের মধ্যে দুইটি ছোট ছোট ফাঁক ছিল। তাহার ভিতর জ্যোৎস্না প্রবেশ করাতে মনে হইতেছিল যেন দুইটি জ্বলন্ত চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া আছে, একপায়ে দাঁড়াইয়া কোনও প্রেতিনী ঝুঁকিয়া যেন আমাকে নির্ণিমেষে দেখিতেছে। আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বুকে ভর দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। কিছুদূর গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ছুটিতে লাগিলাম। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। শিলাঙ্গীর কথা আর মনে রহিল না, তাহার নিকট যে শপথ করিয়াছিলাম সে কথাও আর মনে রহিল না।

...উন্নগা পর্বতের যে গুহায় যক্ষিণী থাকিত সেই গুহায় আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হইতেছিল ময়াল সাপের মূর্তি ধরিয়া মৃত্যু বুঝি অতর্কিতে পিছন হইতে আসিয়া আক্রমণ করিবে। গুহার ভিতর খস খস শব্দ শুনিয়া বার বার ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার গুহায় প্রবেশ করিতে হইতেছিল, ভয় হইতেছিল বাহিরে কেহ যদি আমাকে দেখিতে পায়। অনাবিল জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে আলোকে বাহির হইবার সাহস আমার ছিল না। গুহার অন্ধকারেও আমি স্বস্তি পাইতেছিলাম না। আলোক অন্ধকার উভয়ই আমার নিকট ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। আমি খস খস শব্দ

শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছিলাম, আবার একটু পরেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলাম। সমস্ত রাত্রি এইরূপ ছুটাছুটি করিয়াই কাটিয়া গেল। ভোরের দিকে গুহার ভিতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা সমবেত একটা কলরবে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বুঝিতে পারিলাম, মানুষ নয়, পাখী ডাকিতেছে। লক্ষ লক্ষ পক্ষীর প্রভাতী কলরবে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গুহার ভিতর আবার খস খস শব্দ হইল, ঘাড় ফিরাইয়া এইবার দেখিতে পাইলাম সর্প নয়—শশক। অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার পর দেখিতে পাইলাম আগড়টা। ঠিক নীচেই পড়িয়াছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া সেটাকে তুলিয়া আনিয়া গুহামুখে লাগাইয়া ভিতরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম। ভয় কিন্তু মানুষকে কখনও নিশ্চিন্ত হইতে দেয় না। মনে হইল আগড়ে ফাঁক আছে, সেই ফাঁক দিয়া কেহ হয়তো আমাকে দেখিতে পাইবে, ফাঁক দিয়া সাপও ঢুকিতে পারে। আবার বাহির হইলাম, গাছের ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আগড়ের ফাঁক বন্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলাম। আমার মধ্যে যে ভীত পশুটা আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকক্ষণ সে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া রহিল। শিলাঙ্গীর কথা একবারও তাহার মনে পড়িল না যতক্ষণ না সে নিরাপদ হইয়া বসিল। তুষার যুগে যে পশু আত্মরক্ষার জন্য নিজের সঙ্গিনীকে হত্যা করিয়া আহার করিয়াছিল, সে পশু আমার মধ্যে তখনও বাঁচিয়া ছিল। আমার মানসপটে শিলাঙ্গীর যে ছবিটি ফুটিয়া উঠিল তাহাতে বহুকাল বিস্মৃত আমার সেই অন্ধ সঙ্গিনীর আর্ত আকুলতাও নিশ্চয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা অনুভব করিতেও পারি নাই। বরঞ্চ ইহাই আমার মনে হইতেছিল যে শিলাঙ্গী কোনও মোহিনী প্রেতিনী, আমাকে মুগ্ধ করিয়া আমাদের সর্বনাশ করিবার জন্য আসিয়াছে। মনে হইতেছিল তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার পর হইতেই যেন আমাদের সমাজে উপর্যুপরি দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। ইহাও মনে পড়িল প্রথম দিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে সেইদিনই আমার মৃত্যু হইত। মনে হইল শিলাঙ্গী বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল যে সাধারণ অস্ত্র দিয়া সহজে আমাকে কাবু করা যাইবে না, তাই সে মোহিনী অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আমাকে নিধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ধবল বুদ্ধিমান দূরদর্শী লোক, সে ঠিকই বুঝিয়াছিল যে যাহাদের গরু পালন করাই ধর্ম, তৃণ-পালকদের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হইতে পারে না। আর একটা কথা মনে হওয়াতে আমার ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল যে শিলাঙ্গী নিশ্চয়ই প্রেতিনী। সাধারণত যুবকেরাই যুবতীদের প্রণয় কামনা করিয়া তাহাদের খোশামোদ করে, যুবতীরা তাহাদের এই প্রচেষ্টায় হয় বাধা দেয়, না হয় বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু শিলাঙ্গী ঠিক বিপরীত আচরণ করিয়াছে। সে নিজেই যাচিয়া আমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে। আমার সহিত কি উপায়ে তাহার বিবাহ হইতে পারে তাহা আমি আবিষ্কার করি নাই, শিলাঙ্গীই করিয়াছে।

কাঙালিনীর মতো সে বারম্বার আমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিয়াছে। মনে হইল ইহা মানবী যুবতীর পক্ষে স্বাভাবিক নয়, ইহা ঠিক প্রেতিনীর কারসাজি। নিন্যানিকেও হয়তো ওই প্রেতিনী কোনও অচিন্ত্যপূর্ব উপায়ে নিধন করিয়াছে।" এইভাবে নির্জন গুহায় বসিয়া পলাতক কাপুরুষ আমি আমার ভীরুতার সমর্থনে নানা যুক্তির জাল বয়ন করিতে লাগিলাম, মনে হইল আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে নিজেকে ত্রাণ করিয়া কিছুমাত্র অন্যায় করি নাই। সেই অসভ্য প্রস্তর যুগে আমি যাহা করিয়াছিলাম আজও তোমাদের মধ্যে অনেকে কি তাহাই করিতেছ না? ভীরুতার সহিত অহমিকা যুক্ত হইয়া আজও কি তোমাদের পথভ্রান্ত করিতেছে না? যে নারী সভ্যতার জননী, যাহাকে ঘিরিয়া পুরুষের সর্ববিধ প্রচেষ্টা যুগে যুগে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার প্রেমে মানবজীবন ধন্য, মানব সভ্যতা পুষ্ট, সেই নারীকে সম্যকরূপে চিনিবার শক্তি আমার তখন ছিল না, আজও তোমাদের অনেকের নাই। আজ কিন্তু আমি জানিয়াছি নারীই শক্তি। পুরুষের ভোগ-লালসার শিখায় নিজেদের সমর্পণ করিয়াও নারীরা যুগে যুগে অগ্রগতির পথ আলোকিত করিয়াছে। পুরুষেরা যাহা কিছু করিয়াছে নারীর জন্যই করিয়াছে। তাহার উৎসাহ, তাহার প্রেরণা, তাহার প্রতিভা উদ্দীপ্ত হইয়াছে নারী-প্রেমেই। পুরুষের ভোগ-লালসার শিখায় বারম্বার পুড়িয়া ওই নারীরাই অবশেষে পুরুষদের ভোগের কবল হইতেও উদ্ধার করিয়াছে। নারীর সহায়তা না পাইলে পুরুষেরা নিরাসক্ত হইতেও পারিত না। যাঁহারা শক্তিকে নারীরূপে পূজা করিয়াছেন তাঁহারাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু আমার এ জ্ঞান তখনও হয় নাই, তাই আমি জোলমাকে পাইয়াও হারাইয়াছিলাম, শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারি নাই।

...কত রাত্রি হইয়াছিল জানি না, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকার গুহায় উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল একটা আর্তনাদে যেন চতুর্দিকে গুমরিয়া উঠিতেছে। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া যেন কাঁদি-তেছে। আর্তধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মনে হইল ওই আর্তধ্বনির প্রবল বন্যায় আমার অস্তিত্ব বুঝি এবার ভাসিয়া যাইবে, আমি কিছুতেই তাহা রোধ করিতে পারিব না। কিসের শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে, অনেকক্ষণ তাহা বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারিবামাত্র কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। আমার মনের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। মনে হইল যে বন্ধ ঘরে আমি এতক্ষণ বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম সেই বন্ধ ঘরটা যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, যে বন্ধন আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছিল সেই বন্ধনটা যেন হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। আমার অন্তর নিবাসী যে নির্ভীক সত্তা পশুত্বের কারা-গারে ছটফট করিতেছিল, যে সত্তা জোলমা-শিলাঙ্গীর স্বরূপ চিনিতে পারিয়া-ছিল, যে সত্তা সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া মহত্তর প্রেরণায় যুগে যুগে কর্তব্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে আমার সেই সত্তা

সহসা যেন মুক্তি পাইল। আমি যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম যে শব্দটা মীংরার মৌক-প্রেতিনীর শব্দ, ধবল ষড়যন্ত্র অনুসারে রজ্জুবদ্ধ কাষ্ঠ খণ্ডটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কুটিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই মুহূর্তে কেমন করিয়া জানি না আমি নিঃশঙ্ক হইলাম, শিলাঙ্গীর সহিত বহুদিন পূর্বে আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা যেন সহসা আবার সজীব হইয়া আমার শ্রবণে ধ্বনিত হইল।

"শপথ কর যে তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে।"

"তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আমি নিজেই উৎসুক, ইহার জন্য শপথ করিবার প্রয়োজন নাই।"

"তবু শপথ কর। মুখের বন্ধুত্ব আমি চাই না, সে রকম বন্ধুত্ব অনেকের সহিত আছে, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব চাই।"

মনে পড়িল আমি শপথ করিয়াছিলাম। একবার নয় বার বার করিয়াছিলাম, তারস্বরে করিয়াছিলাম। আমার শপথ এ অঞ্চলের তরুলতা পশুপক্ষী পর্বত-উপত্যকা সকলেই শুনিয়াছিল। আমি গুহা হইতে বাহির হইয়া আমাদের পল্লীর দিকে ছুটিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে যে শশকটিকে ভক্ষণ করিয়াছিলাম সেই আমাকে শক্তি যোগাইতে লাগিল।

...অন্ধকারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। তখনও চাঁদ ওঠে নাই। উন্নগা পর্বতের উপত্যকায় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু ছুটিতেছিলাম। প্রস্তরে কঙ্করে কণ্টকে পদদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছিল, পদস্খলিত হইয়া দুই একবার পড়িয়াও গেলাম, তবু কিন্তু থামিতে পারিলাম না। একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে অন্ধকারের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল। আমার মনে হইতে লাগিল সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার আচরণ লক্ষ্য করিতেছে। মনে হইল আমার এই মহৎ অভিযান আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা উদ্ভাসিত নয়নে দেখিতেছে, ঝিল্লীর ঝঙ্কারে তাহা সঙ্গীতে রূপায়িত হইতেছে। অন্ধকারকে সচকিত করিয়া একটা ব্যাঘ্র গর্জন করিয়া উঠিল, আমি ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেলাম, কিন্তু ভীত হইলাম না। আমার মনে হইল শক্তিমান শার্দুল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছে 'সাবাস।' আরও কিছুক্ষণ ছুটিবার পর হায়েনার হা-হা-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, অন্য সময় হইলে হয়তো আমি অবিলম্বে কোনও বৃক্ষে আরোহণ করিতাম, কিন্তু তখন আমার মনে হইল হায়েনার দল বলিতেছে —'বাহা, বাহা, বাহা।' বোঁ-বোঁ শব্দটা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিলাম। সহসা শব্দটা থামিয়া গেল। আমি আমার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম।

...চাঁদ উঠিয়াছিল। আমি আমাদের শস্যশূন্য ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া একটা গাছের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। চতুর্দিক নীরব, নির্জন। আকাশে বাতাসে একটা নির্বাক আতঙ্ক যেন মূর্ত হইয়াছিল। যে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম একটু পরে সেই গাছের তলায় একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া

প্রবেশ করিল। সহসা মনে পড়িয়া গেল এই গাছের তলাতে ওই জ্যোৎস্না-লোকেই আমি নিনানির মাথায় শাখা-পত্রের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলাম। একথা মনে হইবার পর আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। সেই জ্যোৎস্নার ফালির মুখে যে ব্যঙ্গতীক্ষ্ন হাসি ফুটিল তাহা যেন আমাকে তিরস্কার করিয়া সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিল। আমার মনে হইল আর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে জ্যোৎস্নার টুকরাটি বোধ হয় প্রশ্ন করিবে—"সেদিনের কথা কি মনে পড়ে?" গাছের তলা হইতে বাহির হইয়া আমি আমাদের শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। কোথাও কেহ নাই, চতুর্দিক ধূ ধূ করিতেছে। মনে হইল তবে কি কাল আমার শুনিতে ভুল হইয়াছিল? কিন্তু বোঁ বোঁ শব্দটা তো একটু আগেই শুনিয়াছি। আর একটু অগ্রসর হইলাম। সেই টিটিভ পক্ষীটা কোথা হইতে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল—'কি-যে-করিস', 'কি-যে-করিস', 'কি-যে-করিস'! নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম কিছুক্ষণ। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলাম এবং পর মুহূর্তেই দেখিতে পাইলাম শিলাঙ্গীর ছিন্ন-মুণ্ডটা একটু দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে কবন্ধটাও রহিয়াছে। বুঝিলাম কবন্ধটাকে টানিয়া টানিয়া ধবল ক্ষেত্রের প্রতি অংশে শিলাঙ্গীর উষ্ণ রক্তধারা সেচন করিয়াছে।

...তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, দূরে দূরে তখনও হায়েনার হা-হা-ধ্বনি শোনা যাইতেছিল, আমি সহসা স্থির করিলাম প্রতিশোধ লইব। ধবলকে হত্যা করিব। ছিন্নমুণ্ডটি একটি গাছের কোটরে লুকাইয়া রাখিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িলাম। টিটিভ পক্ষীটা তখনও বলিতেছিল—কি-যে-করিস, কি-যে-করিস, কি-যে-করিস। প্রভাতের অরুণাভা তখনও পূর্বদিগন্ত রঞ্জিত করে নাই, জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ অন্ধকার তখনও উন্নগার উপত্যকাকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। সেই অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মতো আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা ছিল অন্ধকারেই কাজ শেষ করিয়া সকলের অগোচরে আবার শিলাঙ্গীর কাছে ফিরিয়া আসিব। শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার নিকট আর শবমুণ্ড মাত্র ছিল না। তাহা আমার কল্পলোকে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি অনেকক্ষণ তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়া-ছিলাম, ধবলকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইব। আর একটা অদ্ভুত বাসনাও আমার মনে জাগিয়াছিল। বাল্যকালে ধবলের মাতামহীর মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। জিহ্না পর্বতের কন্দরে নাকি এক যাদুকরী আছে। সে নাকি কাটামুণ্ড কবন্ধের সহিত জোড়া লাগাইতে পারে। ঠিক করিয়াছিলাম, ধবলকে হত্যা করিয়া শিল্যাঙ্গীর কবন্ধটাকে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিব। তাহার পর যাত্রা করিব জিহ্না পর্বতের উদ্দেশ্যে, যেমন করিয়া পারি, সেই ক্ষমতাময়ী যাদুকরীকে খুঁজিয়া বাহির করিব।

...ধবলকে হত্যা করিতে হইলে প্রথমেই আমার প্রস্তর কুঠারটা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কুঠারটা ছিল আমার কুটিরে। আমি যখন কুটির ছাড়িয়া বাহির

হইয়াছিলাম, সঙ্গে কোন অস্ত্র লই নাই। আমি সেইজন্য দ্রুতপদে আমার কুটিরের উদ্দেশ্যেই ধাবিত হইতেছিলাম। কুটির পর্যন্ত কিন্তু পৌঁছিতে পারিলাম না। উন্নগা পর্বতের পাদদেশেই উলম্ভনের লোকেরা আমাকে বন্দী করিল। বলিষ্ঠাকৃতি আটদশ জন লোক আমাকে ঘিরিয়া নিমেষের মধ্যে আমার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল, তাহার পর আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া ছুটিতে লাগিল। আমি শুনিতে পাইলাম কন্যা নদীর তীরে হাহাকার উঠিয়াছে। বহনকারীদের আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কে?"

"আমরা উলম্ভনের লোক। উলম্ভনের আদেশে আমরা তোমাদের আক্রমণ করিয়াছি।"

"আমাকে এখন কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

"পাহাড়ে। তোমাকে প্রস্তর বহন করিতে হইবে।"

আরও কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করিলাম—"কিন্তু এমনভাবে আমাদের আক্রমণ করিবে উলম্ভনের দূত গজন্ধর তো সে কথা বলে নাই।"

"আক্রমণের ইচ্ছা উলম্ভনের ছিল না। সহসা উলম্ভন মত পরিবর্তন করিয়াছে।"

"কেন?"

"ঠিক জানি না।"

ইহার পর আমি অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু আর একটারও উত্তর পাই নাই।

...প্রস্তর বহন করিতেছিলাম। সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, তাহা আজ তোমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। আজকাল পশুকেও তোমরা বোধ হয় অত কষ্ট দাও না। বড় বড় বৃক্ষকাণ্ডকে মসৃণ করিয়া তাহার উপর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড চাপাইয়া আমাদের সেগুলি টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইতেছিল। প্রস্তরখণ্ডে এবং বৃক্ষকাণ্ডগুলিতে চর্ম নির্মিত বহু রজ্জু সংলগ্ন ছিল। সেই রজ্জুগুলি আমাদের কোমরে এবং বক্ষে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, আমরা টানিতে লাগিলাম। ঠিক টানিতেছি কিনা তদারক করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পর্যবেক্ষক ছিলেন, তাহাদের হস্তে চাবুকও ছিল এবং সে চাবুকের ব্যবহার করিতে তাঁহারা কার্পণ্য করেন নাই। অন্ততঃ পাঁচশত লোক মিলিয়া আমরা একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। আমাদের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গ কশাঘাতে রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে এক একজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, তখন তাহাকে সরাইয়া পর্যবেক্ষকগণ আর এক-জনের কোমরে এবং বুকে চর্মরজ্জু বাঁধিয়া দিতেছিলেন। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি নাই, দন্তে দন্তে চাপিয়া আমি নীরবে সেই গুরুভার টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। উপর্যুপরি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা পরম্পরায় আমি শুধু একটি জিনিসই প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। দেবতার রোষ। সমস্ত অন্তর দিয়া আমি অনুভব করিতেছিলাম, যে শাস্তি আমি ভোগ করিতেছি তাহা ন্যায়ত আমার

প্রাপ্য। আমি বিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অবিশ্বাস করিয়াছি, ধবলকে ঠকাইয়াছি নিনানির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, শিলাংগীর নিকট বারম্বার যে শপথ করিয়াছি সে শপথের মর্যাদা রক্ষা করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, সকলকে ফাঁকি দিয়া নিজের লালসাময় স্বার্থকে চরিতার্থ করিতে পারিব, ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সর্বদ্রষ্টা দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সুতরাং পর্যবেক্ষণকারীদের কশা যখন আমার নগ্ন পৃষ্ঠের উপর পড়িতেছিল তখন আমি বিদ্রোহ করি নাই। অবনত মস্তকে সমস্ত সহ্য করিতেছিলাম। একটি-মাত্র ক্ষীণ আশা কেবল মনের মধ্যে জাগিয়াছিল, প্রায়শ্চিত্ত অবসানে দেবতা হয়তো প্রসন্ন হইবেন।

...সরসরা নদীর তীরে উলম্ভনের রাজধানীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছে। দেখিলাম একটি নাতি উচ্চ পর্বতের উপর বিরাটকায় প্রস্তরখণ্ড সকল একত্রিত হইয়াছে। মশাল জ্বলিতেছে। সেই মশাল আলোকে বহু শ্রমিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত খনন করিতেছে. শুনিলাম সেইসব গর্তে এই প্রস্তরগুলি নাকি প্রোথিত হইবে। পর্যবেক্ষণকারীদের কশাঘাতের শব্দে নৈশ অন্ধকার শিহরিয়া উঠিতেছিল। শ্রমিকদের আর্তনাদে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। বাল্যকালে এক বৃদ্ধার মুখে নরকের বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, মনে হইল, সেই নরকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

"উলম্ভন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সহিত শ্রমিকদের পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন ,তোমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও।"

পর্বতের উপর হইতে একজন পর্যবেক্ষণকারী উচ্চকণ্ঠে এই আদেশ ঘোষণা করিবামাত্র মুখে মুখে তাহা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। আমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরেই দেখিতে পাইলাম মশাল আলোকে পরিবৃত হইয়া উলম্ভন দম্পতী পর্বত হইতে অবতরণ করিতেছে। তাহারা যখন নিকটস্থ হইল, তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। আমার নিজের চক্ষুকেই আমি যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। গজন্ধরই যে উলম্ভন এবং নিনানিই যে উলম্ভনের প্রিয়তমা পত্নী, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও সন্দেহাকুল হইতেছিলাম। তাহারা যখন আরও নিকটে আসিল. তখন আর সন্দেহ রহিল না। সবিস্ময়ে দেখিলাম প্রায়-নগ্না নিনানির দক্ষিণ বাহু গজন্ধরের কটিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নিনানির দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল, তাহার পর আবার সরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরিদর্শন করিয়া উলম্ভন অবশেষে আমাদের বিশ্রাম করিতে আদেশ দিল। অল্পক্ষণ পরেই আমি একটি ক্ষুদ্র কুটিরে নীত হইলাম। উলম্ভনের অনুচরেরা আমাকে কিছু খাদ্য ও পানীয় দিয়া গেল। আমার সমস্ত দেহমন অবশ হইয়া গিয়াছিল। খাদ্য পানীয় আমি স্পর্শ পর্যন্ত করিলাম না। আমি চক্ষু বুজিয়া কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"হে দেবতা, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, মৃত্যুদণ্ড দিয়া আমার পাপের চরম শাস্তি দাও

এবার। আমি পাপী, ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অধিকারও আমার নাই, আমাকে তুমি চরম শাস্তি দাও, মৃত্যুর জন্যই আমি প্রস্তুত হইয়াছি...”

...কাহার স্পর্শে গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, নিনানি বসিয়া আছে। দূরে মশাল জ্বলিতেছিল, সেই মশাল আলোকে দেখিতে পাইলাম, নিনানির অধরে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটিয়াছে।

“তুমি ভাবিয়াছিলে আমাকে সরাইয়া দিয়া শিলাঙ্গীর সহিত ঘর করিবে, কিন্তু জানিয়া রাখ, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা হইবে না। যক্ষিণীর মুখে প্রথম যখন কথাটা শুনিয়াছিলাম বিশ্বাস করি নাই। তাহার পর স্বচক্ষে দেখিলাম, তুমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিয়াছ। এ অপমান সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই আমি প্রেতিনী সাজিয়া ধবলকে প্ররোচিত করিয়াছি, যাহাতে সে শিলাঙ্গীকে দূর করিয়া দেয়, তাই আমি উলম্ভনের লালসাবহ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছি, যাহাতে সে তোমাদের আক্রমণ করিয়া তোমাদের বন্দী করিয়া আনে। আমি জানিতাম, বন্দী করিয়া না আনিলে তোমার নাগাল পাইব না। এইবার আমার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। যক্ষিণীর প্রতি আমার কর্তব্যও শেষ হইয়াছে। আমার অনুরোধে উলম্ভন তাহার ভার লইয়াছিল, গতকল্য তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার আর কোনও বন্ধন নাই। তোমাকে চাহিয়াছিলাম, পাইয়াছি—অধিকার করিয়াছি। চল -”

“কোথায় ?”

“আমার সঙ্গে। আমি এখনই তোমাকে সঙ্গে লইয়া উলম্ভনের এলাকা ত্যাগ করিব। এস—”

নিনানি হাত বাড়াইয়া দিল।

...নিনানি আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। কত প্রান্তর, কত অরণ্য, কত পর্বত যে পার হইলাম। জোলমা শিলাঙ্গীরাও যুগে যুগে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হাত ধরিয়া চলিবার যোগ্যতা আমার ছিল না, তাই বারবার তাহাদের পাইয়াও হারাইয়াছি। নিনানি কিন্তু আমাকে ছাড়ে নাই, যুগে যুগে নব নবরূপে সে-ই আমাকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহার মায়াজালে বন্দী হইয়াছি। ইকাকে আমি একদিন সবলে অধিকার করিয়াছিলাম বটে, ক্ষুধার তাড়নায় একদিন আমি জীবনসঙ্গিনীকে আহারও করিয়াছি। কিন্তু আমার এই অপ্রতিহত প্রতাপ বেশীদিন অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। জুর্মানির হস্তে পৌরুষের লাঞ্ছনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পুঠা এবং লুংয়ের হস্তে আমি নিজে ক্রীড়নকমাত্র হইয়াছিলাম, গো-য়ের প্রবল ব্যক্তিত্বের নিকট আমাকে হার মানিতে হইয়াছিল। শীলিনা, রাহুলা, লীরা, লালচুমের নিকট আমি বারম্বার নত-শির হইয়াছি। মাঝে মাঝে মনে হইতেছে যে শক্তি একদা সশঙ্ক মিনতির মূর্তি ধরিয়া কাচিন, এলাহি, টিনা, নিমার রূপে আমার নিকট করুণা ভিক্ষা

করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিল, নিনানি সেই শক্তিরই প্রখর প্রকাশ। আমি নিজেও মাঝে মাঝে নারী-জীবন যাপন করিয়াছি, অস্পষ্টভাবে তাই নিনানির মনোভাব যেন বুঝিতে পারি। মাঝে মাঝে জোলমা, শিলাঙ্গীর কথা মনে পড়ে, স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। মনে হয় আমার অন্তরতম সত্তা যেন জন্ম হইতে জন্মান্তরে নিনানির হাত ধরিয়া জোলমা-শিলাঙ্গীকেই অনুসন্ধান করিতেছে, আর সেই অনুসন্ধানের ফলেই বুঝি মানব-সভ্যতা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আশা করিয়া আছি, সে বিকাশ সম্পূর্ণ হইবে, যেদিন নিনানির সহিত জোলমা-শিলাঙ্গীর প্রভেদ থাকিবে না, নিনানিই যেদিন বিবর্তিত হইয়া জোলমা-শিলাঙ্গীতে পরিণত হইবে, কল্পলোকের স্বপ্নসঙ্গিনী যেদিন মর্তলোকের মানবীরূপে দেখা দিবে। কিন্তু সে যুগ এখনও আসে নাই। সেই অনাগত যুগের উদ্দেশ্যেই আমার যাত্রা। আমার যাত্রার যতটুকু ছবি কালের পট-ভূমিকায় স্থাবর হইয়া রহিয়াছে, তাহারই সামান্য একটু অংশ বীভৎসতায়, নগ্নতায়, নিষ্ঠুরতায়, ছন্দে, গানে, শিল্পে তোমাদের ইতিহাস রচনা করিয়াছে, কিন্তু সে ইতিহাস অতিশয় সীমাবদ্ধ ইতিহাস। আমার যাত্রাপথ অনন্ত অসীম। আমি চলিয়াছি, চলিতেছি এবং চলিব—ইহাই সত্য। আমি মরি নাই, মরিব না। নিনানিকে লইয়া আমি নীলাম্বু নদীর তীরে বিশাল অপরাজিতা বংশ স্থাপন করিয়াছিলাম। নিনানির পরও আরও কত নারী আসিয়াছিল, আরও কত নারীর তীব্র মধুর সঙ্গ-মদিরা আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে আমি ধরিতে চাহিয়াছিলাম সেই অধরাকে, যাহাকে আমি পাইয়াও পাই নাই। আজও তাহাকেই চাহিতেছি। দূরদিগন্ত সীমায় দেখিতে পাইতেছি জোলমা ভাসিয়া যাইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি বৃক্ষকোটরে শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার পথ চাহিয়া আছে, নিনানি কিন্তু আমার হাত ধরিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আশা আছে, মুক্তি একদিন আসিবেই আসিবে। হয়তো অভাবিতরূপে, কিন্তু আসিবে।



বনফুল

রচনাবলী ০৯